চক্র
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

"রা-স্বা"

"বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম"

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

অনেকের গল্প
অসুখের পরে
আদম ইভ ও অন্ধকার
আলোয় ছায়ায়
আলোর গল্প, ছায়ার গল্প
আশ্চর্য ভ্রমণ
উজান
উপন্যাস সমগ্র (১ম-১০ম)
ঋণ
কাগজের বউ
কাপুরুষ
কালো বেড়াল সাদা বেড়াল
কীট
কোনও দিন এরকমও হয়
কোলাজ
ক্ষয়
খেলনাপাতি
গতি
গয়নার বাক্স
গুহামানব
ঘটনাক্রমে
ঘুণপোকা
চুরি

ধন্যবাদ মাস্টারমশাই
নরনারী কথা
নানা রঙের আলো
নীচের লোক উপরের লোক
নীলু হাজরার হত্যারহস্য
পরিহাটির হরিণ
পারাপার
পার্থিব
পিদিমের আলো
প্রজাপতির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম
ফজল আলি আসছে
ফুলচোর
বনদেবী ও পাঁচটি পায়রা
বাঁশিওয়ালা
বিকেলের মৃত্যু
ভুল করার পর
মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক
মানবজমিন
ম্যাডাম ও মহাশয়
যাও পাখি

চোখ
জাদুনল
জাল
ঝাঁপি
দশটি উপন্যাস
দিন যায়
দূরবীন
দ্বিচারিণী
দ্বিতীয় সত্তার সন্ধানে
রহস্য সমগ্র
লাল নীল মানুষ
শিউলির গন্ধ
শ্যাওলা
সতীদেহ
সন্ধি প্রস্তাব
সাঁতারু ও
জলকন্যা
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে
হৃদয়বৃত্তান্ত

শ্রীনীলাঞ্জন ভট্টাচার্য
স্নেহাস্পদেষু

সূচিপত্র

বাইশ

তেইশ

চব্বিশ

পঁচিশ

ছাব্বিশ

সাতাশ।

আটাশ

ঊনত্রিশ

ত্রিশ

একত্রিশ

বত্রিশ

তেত্রিশ

চৌত্রিশ

পঁয়ত্রিশ

ছত্রিশ

সাঁইত্রিশ

আটত্রিশ

ঊনচল্লিশ

চল্লিশ

একচল্লিশ

বিয়াল্লিশ

তেতাল্লিশ

চুয়াল্লিশ

পঁয়তাল্লিশ

ছেচল্লিশ।

সাতচল্লিশ

আটচল্লিশ

ঊনপঞ্চাশ

পঞ্চাশ

একান্ন

বাহান্ন

তিপ্পান্ন

চুয়ান্ন

পঞ্চান্ন

ছাপান্ন

সাতান্ন

আটান্ন

ঊনষাট

ষাট

একষট্টি

বাষট্টি

তেষট্টি

চৌষট্টি

পঁয়ষট্টি

ছেষট্টি

সাতষট্টি

আটষট্টি

ঊনসত্তর

সত্তর

একাত্তর

বাহাত্তর

তিয়াত্তর

চুয়াত্তর

পঁচাত্তর

এক

ওই এল তার ঘুমের সময়। বাতাসে শীতের শিস, তার দীর্ঘ শরীরে ঘুমের রিমঝিম। আর সময় নেই। শরীরে ভরে নিতে হবে যথাসাধ্য রসদ। তারপর মাটির নীচে কবোষ্ণ অন্ধকারে ঢুকে পড়বে সে। ঘুম আর ঘুম। নেমে আসবে ঘুমের ভারী পর্দা। তার মন নেই, বিবেক নেই, সে কে বা কেমন তাও জানা নেই। তার আছে কেবল শরীর। আছে সন্ধানী চোখ, বিদ্যুতের মতো গতি, আর ক্ষুধা, আর ভয়।

নবীন ভট্‌চাযের লাকড়িঘরের পিছনে শ্যাওলা-ধরা একটা ইটের খাঁজে ব্যাঙটাকে পেয়ে গেল সে। বিশাল হলদেটে ব্যাঙ। তাকে দেখে ব্যাঙটা প্রাণভয়ে একটা লাফও দিয়েছিল। দ্বিতীয় লাফটা দেওয়ার মুখে প্রায় শূন্য থেকে তাকে সে লুফে নিল মুখে। খাদ্যগ্রহণ তার কাছে সুখপ্রদ নয়। তার জিহ্বা আস্বাদহীন। কম্পিউটারে ভরে দেওয়া তথ্যের মতোই সে শুধু জানে কোনটা খাদ্য, আর কোনটা নয়। আর খাদ্যগ্রহণও কি কম কষ্টের? ধীরে, অতি ধীরে বিশাল গরাসটাকে গিলতে হয় তার। চোয়াল ছিঁড়ে যেতে চায়, গলা আটকে আসে, বঁড়শির মতো দাঁতে আটকানো ব্যাঙটা বারবার ঝটকা মারে আর কাঁপে আর ‘কঁ-অঁ-ক, কঁ-অঁ-ক’ করে প্রাণভয়ে অন্তিম আর্তনাদ করতে থাকে। আস্তে আস্তে তিল তিল করে তাকে আত্মসাৎ করতে হয় জীয়ন্ত গরাস। বড় কষ্ট তার। ঘুমিয়ে পড়ার আগে খেয়ে নিতে হবে আরও খাবার। আরও কষ্ট, আরও অধ্যবসায়।

অনেকক্ষণ সময় লাগল তার। আতাগাছের চিকড়ি-মিকড়ি ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে রোদের বল্লম এসে বেঁধে তার চোখে। বাতাসে শীতের নির্ভুল সংকেত, হাওয়া ঘুরছে, ঘুরে যাচ্ছে উত্তরে। সূর্য হেলে যাচ্ছে দক্ষিণে। তার শরীরে সব খবর পৌঁছে যায়।

শত্রুর অভাব নেই তার। ছোট্ট বিচরণভূমি ভরে আছে প্রতিপক্ষে। তাই ঘাসে, ঝোপে, মাটির খাঁজে, গর্তে কেবলই আত্মগোপন করে থাকা। অন্তরালই একমাত্র বাঁচিয়ে রাখে তাকে।

গলার কাছ বরাবর শ্বাসরুদ্ধ করে আটকে আছে ব্যাঙটা। প্রবল পরিশ্রমে শরীর নিথর। মাটিতে সামান্য কম্পন, চোখে একটা ছায়া পড়ল, একটু নড়াচড়া। সে জানে এখন সে বড় অসহায়। অবসন্ন শরীরে সেই বিদ্যুতের গতি নেই, আক্রমণও নেই। সে ভয় পাচ্ছে। সে একবার প্রতিপক্ষকে দেখে নিল। তারপর শরীরের ভার টানতে শুরু করল। প্রতি মুহূর্তেই তাকে আত্মগোপন করতে হয়।

তার দীর্ঘশ্বাসে বাতাস কেঁপে উঠল। পিঙ্গল শরীরটাকে বইয়ে দিল সে। কিন্তু বড় কষ্ট। শরীর জুড়ে যেন ব্যথার মৃদঙ্গ বেজে যাচ্ছে।

পেচ্ছাপের বেগটা ছেড়ে দিয়েই ধীরেন কাষ্ঠ বুঝতে পারল কাজটা ঠিক হয়নি। উঁচু ঢিবিমতো জায়গা দেখে বসে পড়েছিল, চারদিকটা খেয়াল করেনি। ব্যাঙটার প্রাণঘাতী আর্তনাদ শুনে তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। দু চোখেই ছানি বলে নজর ঘষাকাচের মতো। সামনে শুকনো পাতার ডাঁই, গাছের ছায়া। প্রথমে নজরে

পড়ল না। ঠাহর করে দেখতে পেল, হাত দেড়েক দূরে পাকা গোখরোটা ব্যাঙটাকে ধরেছে আর তার পেচ্ছাপের ধারাটি ছড়ছড় শব্দ তুলে তেড়েফুঁড়ে ওই দিকেই যাচ্ছে। অতি বিপজ্জনক পরিস্থিতি। চমকে গেলে পেচ্ছাপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ধীরেন কাষ্ঠর কপালটাই খারাপ। বয়সকালে এখন পেচ্ছাপ পেলে বেগ চেপে রাখতে পারে না। শরীরের যন্ত্রপাতি ক্রমেই কেলিয়ে পড়ছে। পেচ্ছাপ তার নিজের মনেই হয়ে যাচ্ছে, ধীরেনের সাধ্যই নেই এখন বন্ধ করে। তা হলে কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে যাবে। পারবে না জেনেও একটা চেষ্টা করল ধীরেন, মুখ ফসকে একটা কোঁতানির শব্দও বেরোল। কিন্তু আটকানো গেল না। খাওয়ার সময় সাপটা বিরক্ত হচ্ছে। যদি রেগেমেগে তেড়ে আসে তাহলেই হয়ে গেল। না, কাজটা ঠিক হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না। আজকাল তার এইসব ছোটখাটো কাজে বড় মাপের সময় লাগে। বয়সকালে লাগত না। অসহায় ধীরেন কাষ্ঠ তাই তার বিশ্বঘাতক পেচ্ছাপের ধারাটাকে নজরে রাখছিল। হ্যাঁ, ওই আঁকাবাঁকা হয়ে ব্যাটা ঠিক গিয়ে সাপটার পেটের তলায় ঢুকে পড়ল। ভয়ে চোখ বুজে ফেলল ধীরেন। শরীরটা শক্ত হয়ে এল আতঙ্কে। ভরসার কথা এই, মুখে ব্যাঙটা ধরে থাকায় চট করে ছোবল দিতে পারবে না। তবে সাপকে বিশ্বাসই বা কী?

ঠিক এই সময়ে সাপটা ফস্‌স্‌ করে একটা বিচ্ছিরি শব্দ করায় ধীরেন 'বা প রে' বলে চেঁচিয়ে উঠে পড়ল। পেচ্ছাপ তখনও হয়ে যাচ্ছে।

ধীরেনের চাপা চিৎকার শুনতে পেল পান্না। ডান হাতের দুটো আঙুল—মধ্যমা আর তর্জনী চোখের সামনে তুলে ধরে সে তখন লটারি করছে—গলায় দড়ি না গায়ে আগুন? গায়ে আগুন না গলায় দড়ি? কদিন হল তার এই চলছে। মনটাকে স্থির করতে পারছে না। তবে করবে সে ঠিকই। কিন্তু কোনটা বাছবে তা ঠিক করতে দেয়ালঘড়ির দোলকটার মতো দোল খাচ্ছে। কখনও মনে হয় গায়ে আগুন, কখনও মনে হয় গলায় দড়ি। উনিশের ভরা যুবতী সে, এই বয়সেই তো মরতে সাধ হয় সবচেয়ে বেশি। মনে একটু টুস্কি লাগলেই মনে হয়, মরি। আকাশে রাঙা চাঁদ উঠলে কি একটু ভালবাসা না পেলে, কি শীতের দুপুরে মন হু হু করলেই হল, মরণ মুচকি হেসে শ্যামের বাঁশি বাজাতে থাকে।

সে মরলে কী কী হবে ভাবতেই আনন্দে গায়ে কাঁটা দেয় তার। লুটোপুটি খেয়ে কাঁদবে মা, ও পান্না, ফিরে আয়। বেশ হবে। যত অবিচার করেছে মা তা শোধ হবে চোখের জলে। আর কখনও বলবে না, গতরখাকী মর না। আর বাবা? বাবা এমন স্তম্ভিত হয়ে যাবে যে কাঁদতেও পারবে না। মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকবে দাওয়ায় আর অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়বে, এ হয় না, এ হয় না। আর হীরা, হীরার কথা কিছু বলা যায় না। হিংসুটিটা কে জানে বাবা খুশিও হতে পারে। আবার হয়তো দিদির শোকে লুটোপুটি খেয়ে কাঁদতেও পারে। মনে হয় কাঁদবেই। কাঁদলে খুব কাঁদবে। আর 'সে'? 'সে' কী করবে তা জানে না। পান্না। তবে খুব বিষণ্ণ আর আনমনা হয়ে যাবে। হু-হু করবে বুক, চোখ ভিজে যাবে বারবার। এ কী করলে পান্না, আমাকে একা রেখে গেলে নির্বান্ধব পৃথিবীতে? এই 'সে'-টা যে কে তা আজও জানে না পান্না। 'সে'-র সঙ্গে তার চেনাই হয়নি। 'সে' যে কেমন তাও ঠিক করে ভাবেনি সে। আবছা আবছা একটা মুখ কল্পনা করে নেয়। আবার মুখটা কেমন বদলেও যায়।

মরার কথা ভাবতে ভাবতে দুপুরের নিরালা যখন একরকম সুখে ভরে উঠছিল তখনই চিৎকারটা শুনতে পেল সে। বুড়ো মানুষের গলায় 'বাপ রে!' শোওয়া অবস্থাতেই শরীরটা গড়িয়ে উপুড় হয়ে জানালা দিয়ে মুখ

বাড়িয়ে সে দেখতে পায়, ধীরেন কাষ্ঠ দাঁড়িয়ে। হাতে ধরা ধুতির খুঁট, ছড়ছড় করে ধুতি ভিজিয়ে পেচ্ছাপ পড়ে যাচ্ছে পায়ের লালচে রঙের ক্যাম্বিসের জুতোর ওপর। এঃ মা!

লজ্জায় মুখটা সরিয়ে নিয়ে পান্না বলে, কী হয়েছে জ্যাঠামশাই?

সাপ।

কামড়েছে নাকি?

না, আর একটু হলেই কামড়াত।

কোথায় সাপটা?

ধীরেন কাষ্ঠ হাত তুলে লাকড়িঘরের দিকে দেখিয়ে বলল, ওইখানে।

ঘোষবাড়ির সুপুরিগাছের ডগায় উঠে মরণ নানা দৃশ্য দেখছিল। আফ্রিকার ম্যাপের মতো দেখতে একটা বড় মেঘ একটা শ্রীলংকার মতো ছোট মেঘকে আস্তে আস্তে গিলে ফেলল আর তারপর দুটিতে মিলে হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। আর দেখল, নয়নদের বাড়ির উঠোনে শীতের লেপকাঁথা বের করে চাটাই পেতে রোদে দেওয়া হয়েছে। আর চাটুজ্যেবাড়ির গৌরহরিদাদুর শ্রাদ্ধের সাদা ম্যারাপ ফুলে ফুলে উঠছে হাওয়ায়। আর সন্ধ্যাদির বাড়ির দোতলার গ্রিল দেওয়া বারান্দায় আজও সেই ফুটফুটে মেয়েটা উদাসভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আর সন্ধ্যাদির উদুখলের ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ শব্দটা পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডের শব্দের মতো উঠে আসছে। গাছের ঘষটানিতে বুকের নুনছাল উঠে গিয়ে জ্বালা করছে। ঘোষ জ্যাঠাইমা তাড়া দিচ্ছে, ও মরণ, তোর হল? তাড়াতাড়ি কর বাবা। সুপুরিগুলো গোছ করে রেখে শ্রাদ্ধবাড়িতে যাব যে!

মাঝে মাঝে এত আনমনা হয়ে যায় বলেই তার বিপদ। একবার আমগাছ থেকে পড়ে বাঁ হাত ভেঙেছিল তার। তবু ওই আনমনা হওয়া তাকে ছাড়ে না। পেকে ওঠা সুপুরির গোছ মাত্র দুটো কেটে ফেলেছে, তারপর কেমন সব ভুলে বিস্ময় ভরা চোখে দেখছে তো দেখছেই। আর নানা কথার ভুড়ভুড়ি উঠছে মনের মধ্যে।

হঠাৎ সাপে ধরা ব্যাঙের ডাকটা কানে এল তার। কী করুণ আর্তরব! কঁ-অ-ক, কঁ-অ-ক। হাতের দা-টা ঠাঙাৎ করে নীচে ফেলে দিল সে। দু পায়ে দড়ির ফাঁস ছিল, নাড়া দিয়ে সেটাও ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি নামতে লাগল সে।

ও মরণ, নামছিস যে! পাড়বি না?

দাঁড়ান জ্যাঠাইমা, আগে সাপটাকে মারি।

সাপ মারবি কী রে? কোথায় সাপ?

আছে।

সে জানে মানুষ বিপদে পড়লে যে বিপদসংকেত পাঠায় তাকে বলে এস ও এস। সেভ আওয়ার সোল। আমাদের প্রাণরক্ষা করো। ব্যাঙটাও সেই বার্তা পাঠাচ্ছে চারদিকে। জলে জঙ্গলে, ঘাটে আঘাটায় এমনই সব তুচ্ছ নানা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, মানুষ টেরই পায় না। কিন্তু ব্যাঙটা কার কাছে পাঠায় ওই বিপদসংকেত? ওর কি ভগবান আছে? নাকি আছে কোনও কমিউনিটি? অন্য ব্যাঙেরা কি এসে বাঁচাবে ওকে কখনও? তবে ও কাকে ডাকে? মরণ জানে সাপের মুখ থেকে ব্যাঙটাকে ছাড়িয়ে নিলেও বাঁচবে না! কিন্তু সাপটাকে যে তার মারতেই হবে।

শেফালী বউদি বলে, তুই কেমনধারা ছেলে রে? প্রজাপতির পাখা ছিঁড়ে দিস, চড়াইপাখির বাসা ভাঙিস, ফড়িং-এর পায়ে সুতো বেঁধে ওড়াস, সাপ মারিস! এমন পাষাণ কেন রে তুই?

সে ভাল ছেলে নয়, সে জানে।

গাছ থেকে নেমে দুটো ইটের ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটছিল মরণ। ভট্চাযবাড়ির লাকড়িঘরের সামনে ধীরেন জ্যাঠার মুখোমুখি।

ধীরেন কাষ্ঠ বলল, দেখ বাবা কী কাণ্ড। শ্রাদ্ধবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি, পথে এই বিপত্তি।

এঃ জ্যাঠামশাই, আপনি যে পেচ্ছাপ করে ফেলেছেন।

বুড়ো বয়সে কিছুই কি আর বশে থাকে রে বাবা। আর সাপটাও এমন ফোঁস করে উঠল যে, পালাতে গিয়ে কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে গেল। দিবি বাবা একটু টিউবওয়েলটা পাম্প করে? এখানেই একটু ধুয়ে-টুয়ে নিই। গায়ে গায়ে শুকিয়ে যাবে। কাপড় পালটাতে হলে আবার মাইলটাক হেঁটে যাওয়া। যা খাড়া রোদ।

আসুন জ্যাঠামশাই, পাম্প করে দিচ্ছি।

রাস্তার কলে ধুতিটা ধুতে ধুতে ধীরেন কাষ্ঠ বলছিল, আজকাল আর কেউ ডাকখোঁজ করেও না তেমন। গৌরহরিদার পরিবার তবু তো ডেকেছে।

সাপটা এ যাত্রায় বেঁচে গেল। বিশাল গরাসটা কণ্ঠায় আটকে আছে তার। ধীরে সে একটা পরিত্যক্ত জমি আর ভাঙা বাড়ি পার হল। তারপর বেগুনক্ষেত। বাঁশের বেড়া। আগাছার জঙ্গল। ধীরে ধীরে পিছল গতিতে পার হয়ে যাচ্ছে সে। তার শীতল রক্তে শীতের পদধ্বনি। আর সময় নেই।

ঝিরঝিরে চঞ্চল নিমের ছায়ায় বসে একমনে সর্ষে গুঁড়ো করছে সন্ধ্যা। মস্ত এলো খোঁপা ভেঙে পড়েছে পিঠে। দামাল বাতাসের দিন আজ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে শুকনো পাতা আর উড়ছে তার চুল।

উদুখলের ডান্ডাটা রেখে যখন খোঁপা ফের বেঁধে নিচ্ছিল সন্ধ্যা তখন সাপটাকে দেখতে পেল। ঘন জঙ্গল থেকে উঠে উঠোনের কানা দিয়ে দীর্ঘ শরীরটা খুব আস্তে টেনে নিয়ে খড়ের মাচানের নীচে তার অন্ধকার জগতে ঢুকে যাচ্ছে। গলার কাছটায় একটা ঢিবি। ব্যাঙ বা ইঁদুর গিলে এসেছে এইমাত্র।

মাই গড! ইটস এ বিগ কোবরা!

সন্ধ্যা মুখ তুলে বুডঢাকে দেখল।

বুডঢা বলল, দেখতে পাওনি? জাস্ট বিলো দি হে স্ট্যাক।

দেখব না কেন? চোখের সামনে দিয়েই তো গেল।

লাঠি-ফাঠি কিছু নেই বাড়িতে?

থাকবে না কেন? লাঠি দিয়ে কী করবে?

বাঃ, মারতে হবে না সাপটাকে?

ওটা বাস্তুসাপ মারতে নেই।

হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বাস্তুসাপ? এ স্নেক ইজ এ স্নেক। ইট মে বাইট এনিবডি এনিটাইম।

খুব ক্ষতি না করলে কামড়ায় না। তিনটে আছে, আজ অবধি কাউকে কামড়ায়নি।

গড! ও মাই গড! ক্যান এ স্নেক বি ওয়ান অফ দি ফ্যামিলি!

কদিন যাবৎ ইংরিজিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যা। মায়ে মেয়েতে ছেলেতে মিলে দিনরাত ইংরিজিতে কথা কইছে, তার এক বর্ণও সন্ধ্যা বোঝে না। তবে এটা বুঝতে পারে, ওরা তিনজনে মিলে এ-বাড়ির লোকেদের নিয়ে ঠাট্টাইয়ার্কি করে। ভাল কথা যে বলে না তা মুচকি হাসি, বাঁকা চাউনি আর ঠোঁট ওলটানো দেখে টের পাওয়া যায়। বড্ড অপমান লাগে, কান-টান ঝাঁ-ঝাঁ করে। কিন্তু কিছু করারও তো নেই।

বুড়ো ওপর দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলে, ডিড ইউ সি ইট দিদি? এ বিগ কোবরা।

ইয়াঃ, আই স ইট। মে বি এ ক্রাইট।

নো, ইট ওয়াজ এ কোবরা। দিস ফুলিশ উওম্যান সেজ ইটস এ রেসিডেনশিয়াল স্নেক। এ মহাত্মা। ডাজ নট বাইট।

শি ইজ এ মোরোন।

সন্ধ্যা বুঝতে পারছে, তাকে নিয়ে কথা কইছে ওরা। খারাপ কথা। সে ভারী ডান্ডাটা তুলে নিল। শক্ত চোয়ালে অপমানটা গিলে ফেলতে চেষ্টা করল। আর সব আক্রোশ নিয়ে দুম দুম করে গুঁড়ো করতে লাগল সর্ষে। ঝাঁঝ আসছে নাকে, সর্ষের গুঁড়ো ছিটকে যাচ্ছে চারদিকে। ঠোঁট নড়ছে সন্ধ্যার, কী কেলেঙ্কারি করে এসেছ তোমরা সে কি আর জানি না! পাঁচকান তো করতে পারি না। হাটে হাঁড়ি ভাঙলে টের পেতে বাপু। দিনরাত মায়ে মেয়েতে যে ইংরিজিতে ঝগড়া করছ সে কি এমনি এমনি? আমরা কথাগুলো বুঝতে না পারি, ঝগড়া যে হচ্ছে তা তো বুঝতে বাকি নেই। ছিটেফোঁটা বুদ্ধি আমাদেরও আছে বাপু। কলকাতা ছেড়ে গাঁয়ের বাড়িতে এসে ঘাপটি মেরে আছ সে তো সোহাগ করতে নয়, গা-ঢাকা দিতে। সোহাগ-সুন্দরী, তোমার মুখখানা সুন্দর হলে কী হবে, মনে বিষ।

সোহাগ ওপর থেকে অনুচ্চ স্বরে বলল, শি হেটস মি।

বুড়টা নীচে থেকে বলল, শি হেটস মি টু। অ্যান্ড আই লাইক দ্যাট।

সর্ষে গুঁড়ো করতে করতে সন্ধ্যা বিড়বিড় করতে থাকে, কেমন ইংরিজি বলিস তোরা জানি। বাবা তো কালকেই বলছিল, ওরা যতই ফটাফট ইংরিজি বলুক না কেন, গ্রামারে ভুল আছে। নিমাই মাস্টারের ছেলে অঞ্জনকে নিয়ে এসে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে তো চুপসে যাবি তোরা। ইংরিজিতে সে আশি নব্বই নম্বর পায়...

অনেকক্ষণ ধরেই সোহাগ সাপটাকে দেখছিল। বাঁ ধারে জঙ্গুলে মাঠটার মাঝখানে একটা ছাগল বাঁধা। সেটাই কেমন যেন হঠাৎ ম্যা ম্যা করে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল। সোহাগের আজকাল কোনও কৌতুহল নেই। কোনও ব্যাপারেই নেই। সে উদাসভাবেই চেয়ে দেখছিল। ঘাস খেতে খেতে শান্ত ছাগলটা হঠাৎ ভয় পেল কেন? ছুটতে গিয়ে পায়ে দড়ি জড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, ডাকতে লাগল। তখনই লম্বা শরীরটা ধীরে আঁকাবাঁকা হয়ে চলে আসছে। ছাগলটার কাছ ঘেঁষেই এল। তারপর তকতকে উঠোনের কোণ দিয়ে ধীরে ধীরে খড়ের মাচানের নীচে চলে যেতে লাগল। সোহাগ উদাস চোখে সাপটাকে দেখল শুধু। সাপ দেখলে কেউ ভয় পায়, কারও গা ঘিনঘিন করে। তারও ওরকম হয়। এখন হল না। ধীরে ধীরে সে ভেজিটেবল হয়ে যাবে। সে জানে।

সোহাগ, ভিতরে এসো। তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে।

মা ডাকছে। সোহাগ। উদাস মুখটা ফিরিয়ে বলল, এখন খাব না। খিদে নেই।

তুমি তো চাওমিন খেতে চাইলে। তাই করা হয়েছে।

রেখে দাও। পরে খাব।

পরে গরম করবে কে? এখানে তো মাইক্রোওয়েভ নেই। নুড্‌লস জোগাড় করতেই কমলদাকে বর্ধমান যেতে হয়েছিল। এখানে এসব ফ্যান্সি ফুড অ্যারেঞ্জ করা মুশকিল।

গরম করতে হবে না। ঠান্ডাই খাব।

এসব ভাল হচ্ছে না সোহাগ। তুমি কোনও রুটিন ফলো করছ না।

আই হ্যাভ নো অ্যাপেটাইট। প্লিজ।

তার মানে ইউ উইল স্কিপ দি লাঞ্চ। ব্রেকফাস্টে মোটে একটা বয়েলড ডিম খেয়েছ। এখন বেলা বারোটা বেজে গেছে।

বেলা বারোটা ইজ নট টু লেট।

রাগ করে না খেয়ে থাকাটা প্রিমিটিভনেস। ইট উইল নট হেলপ।

না খেয়ে থাকব কেন? খাচ্ছি তো।

মোটেই খাচ্ছ না। ইউ আর লুজিং ওয়েট। তোমার স্কিন ড্রাই হয়ে যাচ্ছে।

আমি বেশ ভাল আছি। ডোন্ট বদার।

আজ তোমার বাবা আসছেন। তাকে সব বলব।

বোলো। হি ইজ নট এ মেসায়া।

তিনি তোমার বাবা।

সো হোয়াট?

ডোন্ট ডিগ সোহাগ। ডিগিং উইল নট হেলপ। বলছি খেয়ে নাও।

খাব না বলিনি তো। পরে খাব।

ইউ আর ইমপসিবল।

ও কথা কেন বলছ? আই অ্যাম ডুয়িং হোয়াট এভার আই অ্যাম টোল্ড টু ডু। যদি হুকুম করো তা হলে ছাদে উঠে নীচে লাফিয়েও পড়তে পারি। কিন্তু খিদে না থাকলে কিছুতেই খাওয়া যায় না।

খিদে নেই তো সবসময়েই বলছ। এক্সারসাইজ করছ না, মেডিটেশন করছ না, শুধু ঘরে বসে আছ, খিদে না পাওয়ার তো দোষ নেই।

আমার ওসব ভাল লাগছে না।

এই যে বললে ইউ আর ডুয়িং হোয়াটএভার ইউ আর টোল্ড টু ডু?

তুমি কি আমাকে এক্সারসাইজ করতে বলছ?

বলছি। শরীরের জন্য করতে দোষ কী?

আমার ইচ্ছে করে না। মানুষ তো শুধু শরীর নয়।

অন্তত ইউ মে টেক এ ওয়াক।

আমার ভাল লাগে না। লোকেরা তাকায়।

সে তো কলকাতাতেও তাকায়। তাকায় না?

এমন হাঁ করে তাকায় না। আমার হাঁটতে ভাল লাগে না।

সোহাগ, আর ইউ ট্রায়িং টু কিল ইওরসেলফ?

আমার এত কথা বলতে ভাল লাগছে না মা, আমি নীচে যাচ্ছি।

পারুল আজ সকাল থেকে পথ চেয়ে আছে। এক বুক তেষ্টা কেন তার আজও? না, এ বোধহয় তেষ্টা নয়, আকাঙ্ক্ষা নয়, এ এক গভীর কৌতূহল। বাঁধা পড়ে গেছে কবেই পারুল। এখন সংসারে জেবড়ে আছে। আর অমলদাও তো কী ভীষণ ব্যস্ত মানুষ।

পারুল চ্যাটার্জি আর অমল রায়ের গভীর প্রেমের ঘটনা মোটেই চাপা থাকেনি। বিশ বাইশ বছর আগে এই ঘটনায় সারা গাঁ তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। পথেঘাটে মজলিশে আলোচনা হত। বিয়েতেও কোনও বাধা ছিল না। সবর্ণ, পালটি ঘর। কিন্তু ঘটনা সবসময়ে সোজা পথে ঘটতে চায় না।

অমল রায় মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করেছিল। এই গাঁয়ের মুষ্টিমেয় কৃতী ছেলেদের মধ্যে সে একজন। হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ। মাধ্যমিকের পরও দুরন্ত অমল অনেক বেড়া টপকাল। যা চায় তাই পায় অবস্থা। পারুলকেও পেয়ে গিয়েছিল অনায়াসে। প্রায় কৈশোরকাল থেকে।

ঘটনাটা ঘটেছিল যে সময়ে সে সময়ে আই আই টি-র শেষ পরীক্ষা দিয়ে অমল গাঁয়ে ফিরেছে। দুজনের দেখাসাক্ষাৎ ছিল পরস্পরের বাড়িতে। যাতায়াতের তেমন কোনও বাধা ছিল না। কিন্তু সেই সময়ে অমলের চোখেমুখে একটা ঘোর পরিবর্তন দেখতে পায় পারুল। কেমন খিদে ফুটে থাকে মুখে, চোখের দৃষ্টি সরু হয়ে আসে। কামুক পুরুষের দৃষ্টি চিনতে মেয়েদের কোনও অভিজ্ঞতার দরকার হয় না। তারা ও ক্ষমতা নিয়েই জন্মায়। পারুল নির্ভুল বুঝতে পেরেছিল, অমল যে কোনও দিন তাকে চাইবে। আর তখনই একটু ভয় হয়েছিল তার।

একদিন এক প্রচণ্ড গরমের দুপুরে অমল উদভ্রান্তের মতো এসে হাজির। পারুল তার দোতলার পড়ার ঘরে নিরিবিলি বসে পরীক্ষার পড়া করছিল। অমলের চেহারা দেখে সে শিউরে উঠেছিল। মাথায় বড় বড় চুল উড়ছে, মুখখানা রোদে পুড়ে লাল, আর দুখানা চোখে ধক ধক করছে এমন একটা দৃষ্টি যা বুঝতে কোনও মানে-বইয়ের দরকার হয় না।

অমলদা, কী হয়েছে?

অমল হাঁফাচ্ছিল। এত জোরে হেঁটে এসেছে, এত উদভ্রান্ত, এতই দেহতাড়িত যে সে আর স্বাভাবিক নেই। চাপা গলায় সে বলল, পারুল আমি আর পারছি না।

পারুল প্রবল আতঙ্কে সিঁটিয়ে গিয়ে বলে, কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না।

বুঝতে হবে না, শুধু চুপ করে থেকো।

প্রবল এক পুরুষ শরীর, সেই শরীরের ঘাম, উত্তাপ, আবেগ, আশ্লেষ আচমকা আক্রমণ করেছিল তাকে। সে শুধু চাপা চিৎকার করেছিল, না না না না

দরজাটা বন্ধ করতেও ভুলে গিয়েছিল অমল। তখন সে উন্মাদ, কাণ্ডজ্ঞানহীন। কাম ছাড়া তখন আর তার কোনও অনুভূতিই কাজ করছে না।

সে এক তুমুল লড়াই হয়েছিল। দুজনের মধ্যে। আক্রমণ আর প্রতিরোধ। আর তার ভিতর থেকেই পারুলের মনে জন্ম নিচ্ছিল ঘৃণা।

বিধ্বস্ত পারুলকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল অমল। অনুতাপ হয়েছিল পরে।

পারুল তবু মা করে দিতে পারত অমলকে। নিশ্চয়ই পারত। ভালবাসলে ওটুকু পারাই যায়। জোর একটা ধাক্কা খেয়ে হয়তো মানুষটা সম্পর্কে তার ধারণা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন তার সতেরো বছর বয়স, ও বয়সের আবেগ অনেক কিছুকে উপেক্ষা করতে পারে। তার ওপর সেই দুপুরের দুর্ঘটনায় সে যদি মা হয়ে পড়ত তাহলে অমলকে ক্ষমা করা ছাড়া তার উপায়ও থাকত না।

পরদিন সকালে শান্ত ভদ্র অমল লাজুক মুখে এসে হাজির।

ইস্। কাল কী কাণ্ডই না করে ফেললাম পারুল।

পারুল সারা রাত কেঁদেছিল, ঘুমোয়নি, রাতে খায়ওনি। শরীর ভীষণ খারাপ লাগছিল সকালে। ফুপিয়ে উঠে বলল, কেন করলে এরকম? বিয়ের আগে কেউ ওসব করে? ছিঃ ছিঃ, এখন কী যে হবে।

ভয় পেও না।

ভয় পাব না? তুমি পুরুষমানুষ বলে কত সহজে কথাটা বলে ফেললে। মেয়ে হলে পারতে না। সব দায় তো মেয়েদেরই বইতে হয়। তাদের নামেই নিন্দে হয়, তাদেরই জীবনভর কলঙ্ক থেকে যায়। বাচ্চা। নষ্ট করতে গিয়ে তারাই তো মরে।

ওভাবে ভাবছ কেন? প্রেগন্যান্সির লক্ষণ দেখলে বোলো, বিয়ের ব্যবস্থা করব।

সেটাই বুঝি খুব সহজ সমাধান? সবাই ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। প্রেগন্যান্সি হলে বাড়ির সবাই টের পাবে। ফিসফাস হবে, লোক জানাজানি হবে। অমলদা, তুমি আমার খুব ক্ষতি করলে। তোমার কথা ভাবলেই আমার ভিতরে একটা আলো জ্বলে উঠত। সেই আলোটা নিবে গেছে। আর জ্বলবে না।

কী করব পারুল, তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব?

না, ক্ষমা চাইবে কেন? ক্ষমা চাইতে হয় কেন তোমাকে? একটু ধৈর্য ধরে রাখতে পারলে না কেন?

অপরাধী মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ বসে রইল অমল। তারপর বলল, আমি মাঝে মাঝে বড্ড বেসামাল হয়ে পড়ি। কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। অনেক চেষ্টা করেছি নিজেকে সামলাতে। পারিনি। এমন পাগল হয়ে যাই তখন যে মাথায় খুন চেপে যায়। এ ব্যাপারে আমি এত হেলপলেস। ভাবছি ডাক্তার দেখাব। এ বোধহয় কোনও ডিজিজ।

তুমি যদি আমাকে ভালই বাসো তা হলে রেপ করো কী করে? এরকম কি কেউ করে?

যা হয়েছে হয়েই তো গেছে। কিছুতেই তো আর সেটাকে মুছে ফেলা যাবে না। বরং পজিটিভ কিছু ভাবি এসো।

না অমলদা, আমার মাথার ঠিক নেই। ভয়ে আতঙ্কে আমি মরে যাচ্ছি। আমি কিছু ভাবতে পারছি না। এ-বাড়িতে এরকম ঘটনা আর কারও ঘটেনি। বিয়ের আগে— এ মা।

অমল মিনমিন করে ফের বলল, আমাদের বিয়ে তো হবেই। তখন তো আর এসব দুশ্চিন্তা থাকবে না।

থাকবে। তোমাকে নিয়ে আমার ভয় থাকবে। তোমার সংযম নেই, তুমি বেহাল হয়ে যাও, মেয়েরা তাদের পুরুষকে ওরকম দেখতে ভালবাসে না।

আমার মনে হয় এটা আমার একটা অসুখ। চিকিৎসা করালে নিশ্চয়ই সেরে যাবে।

এসব কথায় বুকের জ্বালাপোড়া একটুও কমল না পারুলের। তার ভিতরটাই যেন হঠাৎ মরে গেছে। ভালবাসা যেন খোঁটা উপড়ে পালিয়ে গেছে কোথায়। শুধু এক জৈব ভয় তাকে দিনরাত নখে দাঁতে ছিঁড়ে খাচ্ছে। শরীর যে তাদের মধ্যে এমন দেওয়াল তুলে দেবে কে জানত।

কুড়ি দিন দম বন্ধ করা টেনশন। পারুল ঘর থেকে বেরোত না। শুধু কাঁদত, মন খারাপ করে বসে থাকত, সারা রাত ভয়ে তার ঘুম হত না। আর ঠাকুর-দেবতাদের ডাকত। নিজের পেটে হাত রেখে অনুভব করার চেষ্টা করত সেখানে কোনও সম্ভাবনার জন্ম হচ্ছে কিনা। ওই কুড়িটা দিন তার জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়। দুঃস্বপ্নের মতো। একুশ দিনের দিন রজোদর্শন করে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে আর কুমারী নেই বটে, কিন্তু লোকলজ্জা থেকে বেঁচে গেল এ যাত্রা। বেঁচে গেল তার পরিবারও।

তাদের ঠিকে ঝি হেনার মা একদিন রান্নাঘরে মশলা পিষতে পিষতে পারুলের মায়ের সঙ্গে কথা কইছিল। পারুল সেটা শুনে ফেলে।

ওই ছেলের সঙ্গেই কি বিয়ে দেবে নাকি গো মা?

হ্যাঁ, সেরকমই তো কথা চলছে। ছেলে তো রত্ন। কপালে আছে কি না দেখি।

রত্ন কিনা জানি না বাপু, তবে বলে রাখছি ছেলের কিন্তু আলুর দোষ আছে।

কীসের দোষ?

আলুর দোষ গো। স্বভাব ভাল নয়।

কেন কী করেছে?

খড়্গপুরে যখন পড়ত রোজ বেশ্যাবাড়ি যেত।

অ্যাঁ!

আমার বর তো আই আই টি-তেই ঠিকাদারের কাছে কাজ করে। সে বলেছে। একটু ভেবেচিন্তে এগিয়ে বাপু।

সেদিন মায়ের ব্লাড প্রেশার বেড়ে শয্যা নেওয়ার জোগাড়। কিন্তু পারুল একটুও অবাক হল না। যে অত অসংযমী তার পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক। সঙ্গে সঙ্গে পারুলের আর একটা ভয় হল। বেশ্যাবাড়ি যখন যায় তখন আবার খারাপ রোগ-টোগ হয়নি তো! সেই রোগ যদি পারুলের শরীরেও ঢুকে থাকে!

এইভাবেই গাঁয়ের উজ্জ্বল যুবকটির প্রতি তার দুরন্ত প্রেমের অবসান ঘটে গেল একদিন। এমনকী আই আই টি-র পরীক্ষায় অমলের ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার খবরেও বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হল না সে।

ওদের বাড়ি আর যেত না পারুল। অমল কিন্তু প্রায়ই আসত। পাসের খবর নিয়েও হাসিমুখে অমল এসেছিল। তখনও পারুলকে বিয়ে করার কথা ভাবছে। বসে বসে অনেক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলছিল সেদিন।

বিদেশে তো আমাকে যেতেই হবে। ভাবছি তোমার পাসপোর্ট এখনই করিয়ে রাখলে হয়।

কেন?

তোমাকে নিয়েই যেতে চাই।

কেন, ওদেশে কি প্রস কোয়ার্টার নেই?

স্তম্ভিত অমল তার দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, কী বলছ?

কথাটা বলে লজ্জা পেয়েছিল পারুল। কাউকে সে চট করে অপমান করতে পারে না। মাথা নিচু করে বলল, কিছু না।

কিছুক্ষণ ম্লানমুখে চুপ করে বসে রইল অমল। তারপর দুখানা করুণ চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, কে তোমাকে এসব বলেছে জানি না। তুমি কি এসব বিশ্বাস করো?

বিশ্বাস করব কিনা তা বুঝতে পারছি না। আমার মন ভাল নেই।

ভাবলাম আমার ভাল রেজাল্টের খবর পেয়ে তুমি খুশি হবে।

খুশি হইনি কে বলল? তবে নতুন কিছু তো নয়, তুমি বরাবরই ভাল ছেলে।

আবার কিছুক্ষণ মনোকষ্টে বসে থেকে ম্লান মুখে অমল বলল, তুমি আমার ভাবী স্ত্রী। ব্যাপারটা তুমি এভাবে দেখো। ধরো আমি একজন মনোরুগি, আমার রুচি এবং শালীনতাবোধ দিয়েও আমি আমার ভয়ংকর প্যাশনকে ঠেকাতে পারছি না। তুমি যদি সাহায্য করতে পারব।

তুমি কি স্বীকার করছ তুমি প্রস কোয়ার্টারে যাও?

অনেকেই যায়। অনেক ভাল লোকে, গণ্যমান্য মানুষও যায়।

তুমি যাও কিনা সেটা নিয়েই আমার দুশ্চিন্তা।

যাই পারুল। আমাকে নিশিতে পায়। কিন্তু বিয়ের পর এভরিথিং উইল চেঞ্জ।

পারুল মাথা নিচু করে বলল, আমার মন ভাল নেই অমলদা। আমার মাথায় কিছু আসছে না।

আমি তোমাকে বড্ড ভালবাসি যে পারুল। সবসময়ে আমি তোমাকে চিন্তা করি। তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকা যে আমার পক্ষে অসম্ভব।

তাই তো জানতাম।

তুমি কত নরম-সরম মেয়ে ছিলে, আমাকে দেখলেই তোমার মুখে খুশির ঝাপটা লাগত, কত লজ্জা পেতে আমাকে। এখন তুমি কেমন শক্ত হয়ে গেছ, কেমন মনমরা। ওই একটা শরীরের ঘটনা কি আমার এত বড় অপরাধ? কত ছেলেমেয়েই তো বিয়ের আগে—

ওসব বোলো না অমলদা, পায় পড়ি।

আচ্ছা পারুল, বলব না। তবে এটুকু বলে যাই, আজকের দুনিয়ায় ওসব কেউ গায়ে মাখে না। ওটা খুব তুচ্ছ ব্যাপার।

অনেকের কাছে হয়তো তাই।

হতাশায় মাথা নেড়ে বিষণ্ণ অমল বলল, না পারুল, তোমার চোখ বলছে তুমি আমাকে আর চাও না। কিন্তু আমার জীবনটা যে তাহলে বড্ড একার হয়ে যাবে। তোমাকে ছাড়া যে পারব না আমি। কিছুতেই পারব না। আমাকে কি তাহলে আত্মহত্যা করতে হবে?

ওসব বোলো না অমলদা। আমি এখনও তো তোমাকে কিছু বলিনি। আমাকে ভাবতে দাও। বড্ড মনে কষ্ট দিয়েছ আমায়। আমাকে এখন ভাবতে হবে।

ভেবে লাভ নেই পারুল। তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। একটা ভুল করে ফেলেছি। কী আর করব।

একটু মায়া কি অবশিষ্ট ছিল না পারুলের মনে? ছিল। খুব ছিল। অমল রায় যে তাকে গভীর ভালবাসে তাও সে বোঝে। কিন্তু অমল রায়ের দিকে নিজেকে এগিয়ে দিতে কিছুতেই সে পারছে না। বাধা হচ্ছে।

অমল বোম্বেতে চাকরি পেয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে দেখা করে বলল, যদি ক্ষমা করতে পার তবে করো পারুল। চাকরি পেয়েছি। মাস দুয়েকের ভিতরে বিদেশেও চলে যেতে পারি। আমার খুব ইচ্ছে তোমাকে নিয়ে যাই। আমার কথা একটু নরম মন নিয়ে ভেবো পারুল।

পারুল ডাকের সুন্দরী। সারা তল্লাটে তার পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ ছিল না। বিজু বলত, তুই মিস ইন্ডিয়া হতে চাইলে ইজিলি পারবি ছোড়দি। কথাটা মিথ্যেও হয়তো নয়। নানা জায়গা থেকে তার বহু ভাল বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। অমল রায়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর আর বিশেষ প্রস্তাব আসত না।

অমল রায় বোম্বে চলে যাওয়ার পরই একদিন পারুল তার মাকে বলল, তোমরা যদি আমার বিয়ে দিতে চাও তাহলে আর দেরি কোরো না।

মা ভ্রূ তুলে বলল, অমলকে?

না মা, তোমরা পছন্দ করে দেখো।

মা একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, বাঁচালি মা। ও ছেলে সম্পর্কে যা সব কানে আসছে আমার বুকটা কেমন দুরদুর করে। তোর জন্য তো পাত্রের অভাব হবে না।

হয়ওনি। পাত্রের গাদি লেগে গিয়েছিল। সুন্দরী মেয়েদের জন্য যা বরাবরই হয়। বিলেত আমেরিকা বা প্রবাসী বাঙালি সরিয়ে রেখে একজন ভালমানুষ, কর্মঠ, স্বনির্ভর লোককে বেছে নেওয়া হয়েছিল। পারুলের আপত্তি হয়নি। মানুষটি খুব সুপুরুষ নয়, কিন্তু তার চোখে একটা যোগীচক্ষুর ভাব ছিল। কষ্ট করে ওপরে উঠেছে। জামশেদপুরে তার নিজস্ব কারখানা। ছোট যন্ত্রাংশ তৈরি করে। সবচেয়ে বড় কথা, কর্মচারীরা তাকে ভীষণ পছন্দ করে।

বিয়ে হয়ে গেল। কাজটা অমল রায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হল কি না তা ভেবে পেল না পারুল। কিন্তু মনটা মেঘমুক্ত হয়ে গেল, সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল এবং লোকটাকে হঠাৎ ভালও বেসে ফেলল। স্বামী জ্যোতিপ্রকাশ গাঙ্গুলি তাকে স্পোকেন ইংলিশ শেখাল, সেক্রেটারিয়েটশিপ প্রশিক্ষণ নেওয়াল, এবং ঘরে বসিয়ে না রেখে ব্যবসার সঙ্গী করে নিল। কী সাংঘাতিক পরিশ্রমী মানুষটা! আর ভীষণ সৎ। কথার নড়চড় করে না কখনও। রাগ বলে কিছু নেই। একবারও ভালবাসার সাজানো বানানো মিথ্যে কথাগুলো বলেনি তাকে, কিন্তু পরম বিশ্বাসে নির্ভর করেছে পারুলের ওপর। এরকম সংবর্ধনা কটা স্বামী দিতে পারে তার স্ত্রীকে!

পারুল আজ অপেক্ষা করছে অমল রায়ের জন্য। এতদিন পর কেমন লাগবে মানুষটাকে? হয়তো তার জন্য কেঁদেছে লোকটা, মন খারাপ করেছে। কে জানে কী। এই কৌতূহল নিশ্চয়ই ক্ষমার যোগ্য। তারা বদলে গেছে।

গৌরহরি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধে আজ আসবে অমল রায়। মস্ত প্যান্ডেলের নীচে লোক জড়ো হচ্ছে ধীরে ধীরে। বহু লোক আসবে। পারুলের আজ ব্যস্ত থাকার কথা। তবু পারুল এক ফাঁকে আজ এসেছে বাগানে।

একা। আজ সেই কিশোরীবেলার পারুলকে খুব মনে পড়ছে তার। কী ছেলেমানুষ ছিল সেই পারুল! কী বোকা।

হঠাৎ একটু শক্ত হয়ে গেল পারুল। মাত্র দু হাত দূর দিয়ে একটা লম্বা, প্রকাণ্ড গোখরো সাপ চলে যাচ্ছে। গলায় একটা ঢিবি। যেতে যেতে তাকে একবার পাশ-চোখে দেখে নিল কি? পারুল নড়ল না। পলকহীন চোখে চেয়ে রইল সাপটার দিকে। উচ্চাবচ ভূমি আর গাছ আর পাতার আড়ালে মিলিয়ে যাচ্ছে সাপটা।

বিড় বিড় করে পারুল বলল, আস্তিক মুনি, আস্তিক মুনি, আস্তিক মুনি।

দুই

সন্ধেবেলার ঝুঁঝকো আঁধারে হঠাৎ তাকে দেখে খুব অবাক আর খুশি হয়ে সন্ধ্যা বলে উঠল, পারুলদি না কি? ও মা, আয় আয় পারুলদি! কতদিন পর!

যারা কাজ করে, যারা বেঁচে থাকার জন্য ক্রমাগত লড়াই করতে থাকে তাদের সৌন্দর্য বুঝতে পারে পারুল। ভাবালু মানুষ বা কামুক কখনও এই সৌন্দর্য খুঁজে পায় না। তাদের চোখে সন্ধ্যা কালো, বেঁটে, একটু মোটা, ছোটো ছোটো চোখ এবং লাবণ্যহীন মুখ। বয়সও হল সন্ধ্যার। হিসেবমতো তেত্রিশ বা চৌত্রিশ।

সন্ধ্যা যখন আবেগবশে তাকে জড়িয়ে ধরল তখন তার গা থেকে ঘাম আর নানা মশলার একটা ঝাঁঝালো গন্ধ পেয়েছিল পারুল। সেন্ট, পাউডার, রূপটানের কোনও গন্ধ নয়।

এসবই পরশু দিনের কথা। এ-বাড়িতে গত কুড়ি বছর আসেনি পারুল। বাপের বাড়িতে এলেও এ-বাড়িতে কখনও নয়। কিন্তু পরশুদিন নিশিতে পেয়েছিল তাকে, যখন শুনল, অমল রায়ের বউ আর ছেলেমেয়ে গাঁয়ের বাড়িতে এসে কয়েকদিন ধরে রয়েছে। অবাক হওয়ার মতোই খবর। পারুলের বিয়ের এক বছরের মধ্যেই অমল রায় বিয়ে করে। হয়তো পারুলের ওপর ওটা একটা নিস্ফল প্রতিশোধ। তারপরই জার্মানিতে চলে যায়। বছর পনেরো বাইরে বাইরে কাটিয়ে বছর পাঁচেক হল কলকাতায় ফিরে বড় চাকরি করছে। গাঁয়ে আসবে কখন তারা? সবাই যে ভীষণ ব্যস্ত। আর আসবেই বা কেন? বুড়ো বাপ আজও বেঁচে আছে বলে অমল মাঝে মাঝে আসে। খুব দায় না ঠেকলে ওর বউ ছেলেমেয়েরা কখনও নয়।

আয়, ঘরে আয় পারুলদি। তোকে একটু দেখি।

সন্ধ্যার ঘরের মধ্যেও সেই ঝাঁঝালো মিষ্টি টকচা নানারকম গন্ধের রেণু উড়ছে। সারাদিন ও কাসুন্দি, আচার, ডালের বড়ি, আমসত্ব, আমলকীর মুখশুদ্ধি, জোয়ানের হজমি, পাঁপড় এই সব তৈরি করছে। ঘরে উদুখল থেকে শুরু করে প্রকাণ্ড শিল-নোড়া, মশলা গুঁড়ো করার যন্ত্র আর শিশি বোতলের ছড়াছড়ি। ভোল্টেজ কম থাকে বলে ইলেকট্রিকের বাতিতে ঘর আলো হয় না। তাই একটা কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। একটা মোটা মোমবাতির আগুনে দুটো অল্পবয়সি মেয়ে মেঝেতে বসে প্লাস্টিকের প্যাকেটের মুখ জুড়ছে।

ভারী ভাল লাগল পারুলের। একটুও ভাবালুতা নেই সন্ধ্যার। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ও জীবনের একটা হারা লড়াই অন্যভাবে জেতার চেষ্টা করছে।

কত কালো কুচ্ছিত মেয়েরও কত ভাল বিয়ে হয়ে যায়, সুখেই ঘরকন্না করে তারা। সন্ধ্যার কপালটা তত ভাল নয়। তার জন্য পাত্র খুঁজে খুঁজে হয়রান মহিমকাকা অবশেষে দুর্গাপুরের এক পাত্র পেয়ে লটারি জেতার মতো মুখ করে ফিরলেন। পারুল শুনেছে, পাত্রপক্ষের খাঁই ছিল। পঁচিশ হাজার নগদ এবং গয়না আর জিনিসপত্রের বহর বড় কম ছিল না। বিয়ের দু মাসের মাথায় সন্ধ্যা ফেরত হল। কী, না এ পাত্রীকে বরের পছন্দ হচ্ছে না। এমনই অপছন্দ যে, পাত্র বিয়ের পর দুবার বিবাগী হয়ে গিয়েছিল। না, সে সন্ধ্যাকে মারধর

করেনি, অত্যাচারও নয়। এর টেকনিক ছিল অন্যরকম। সে নাকি কান্নাকাটি করে সন্ধ্যার কাছ থেকে মুক্তি চাইত। এমনকী পায়ে অবধি ধরতে বাকি রাখেনি। এমন নারাজ পুরুষের সঙ্গে থাকেই বা কী করে সন্ধ্যা? তবু সে তার বরকে বলেছিল, আমি কুচ্ছিত হতে পারি, কিন্তু খেটেপিটে সব পুষিয়ে দেবো। তোমার এমন যত্ন করব যা কেউ কখনও করেনি। একদিন দেখবে আমার চেহারাটার কথা তোমার আর মনেই থাকবে না। আমাকে ফিরিয়ে দিও না, তা হলে আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না। গলায় দড়ি দিতে হবে আমাকে। এ কথা শুনে তার বর ভেউ ভেউ করে কেঁদেছিল।

সেটা অভিনয় কিনা বোঝা যায়নি। অত বুদ্ধি সন্ধ্যার নেই। কান্নার জবাবে সেও কেঁদে ফেলেছিল। তার বর অনুনয় বিনয় করে বলেছিল, তুমি মোরো না। মরলে আমার বড় কষ্ট হবে। তুমি মরলে আমাকেও মরতে হবে।

কেউ মরেনি শেষ অবধি। বরের সঙ্গে সন্ধ্যার আইনমাফিক ডিভোর্সও হয়নি। বর বলেছিল, ডিভোর্স করলে অনেক হাঙ্গামা। তুমি ব্যাপারটা মেনে নাও। আমি জানি তুমি ভাল মেয়ে, কিন্তু আমার যে কোনও উপায় নেই।

সন্ধ্যা চলে এল। বর তাকে বর্ধমান স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বাসেও তুলে দিয়ে গেল। চোখের জল ফেলতে ফেলতেই বিদায় নিল। নিজের বর সম্পর্কে একটা ধাঁধা তাই আজও আছে সন্ধ্যার। ফেরত হওয়ার পরও তার আশা ছিল মানুষটা হয়তো ভালই। একদিন ভুল বুঝতে পেরে তাকে ফের নিয়ে যাবে।

তা অবশ্য হয়নি। লোকটা বছরখানেক বাদেই আর একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে। সন্ধ্যা খবরটা পেয়েও মামলা মোকদ্দমা করতে যায়নি। কী হবে হাঙ্গামা করে? গাঁয়ে তাদের পরিবারের একটা সম্মান তো আছে। আশ্চর্যের বিষয় তার দাদাবাও কেউ তার হয়ে লড়তে যায়নি, কোনও ব্যবস্থাও করেনি খোরপোশ আদায়ের। শুধু তার বাবা মহিম রায় গিয়ে জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন। জামাই তাঁরও পায়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে “আমাকে জুতো মারুন, আমাকে ফাঁসি দিন” বলে অনেক বিলাপ করে। মহিম রায় অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে আসেন।

মনের বিষণ্ণতা এবং ঘটনার আকস্মিকতা কাটতে এবং চোখের জল শুকোতে একটু সময় লাগল সন্ধ্যার। বছর দুয়েক। তার মধ্যেই সে বুঝে গেল সংসারে তার অবস্থান গলগ্রহের মতো। কোনও সম্মান নেই, কেউ গুরুত্ব দেয় না, বাঁকা কথা কানে আসে, পাড়া প্রতিবেশীরাও টিটকিরি দিতে ছাড়ে না।

এই অপমান ভুলতেই একদিন সে কাজে নেমে পড়ল। কাজে তার কখনও কোনও আলস্য ছিল না। বরাবরই তার শরীর খুব মজবুত। প্রথমে আচার নিয়ে পড়ল সন্ধ্যা। তারপর কাসুন্দি। অনভিজ্ঞতার ফলে দাম হয়ে গেল বেশি। নগেন হালদার নামে একটা ফড়ে ধরনের লোক এসে একদিন বলল, ওভাবে কি হয় দিদি? দামের ঘাট বাঁধা আছে। খরচ কমাও, নইলে পরতায় আসবে না। ব্র্যান্ডের মালের চেয়ে কম দামে না দিলে লোকে নেবে কেন? তা নগেন হালদারই তাকে খুব সাহায্য করল। এমনকী তার তৈরি জিনিস শহরের দোকানে দোকানে পৌঁছে দেওয়া অবধি। একটু একটু করে পয়সা আসতে লাগল। গত সাত আট বছর ধরে সন্ধ্যার যে-পরিশ্রম তার ফল আজ সে পায়। ব্যবসা তার বিরাট বড় কিছু নয়, কিন্তু তার জিনিস চলছে শহরে গাঁয়ে, চাহিদা বেড়েছে। এখন মাসে তার কম করেও তিন চার হাজার টাকা রোজগার।

পারুল এ সবই জানে। তিন রকম আলোয় সন্ধ্যার মুখশ্রীতে সে যে সৌন্দর্য আজ দেখতে পেল তা সে আগে দেখেনি।

সন্ধ্যা তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজে একটা টুলে মুখোমুখি বসে দুঃখের গলায় বলল, হরিজ্যাঠা মারা যাওয়ায় এত খারাপ লেগেছিল যে কী বলব। মনে হল আপনজনই কেউ চলে গেল। আপনজনই তো, না কী বল পারুলদি! হরি জ্যাঠা মরে যাওয়াতে বাবাও খুব ভেঙে পড়েছে। কেবল বলছে, এই হরিদা চলে গেল, এবার আমার পালা।

পারুল বলল তা কেন, মহিমকাকা তো বাবার চেয়ে অনেক ছোট।

অনেক নয়। বাবা তো বলে পাঁচ ছয় বছরের তফাত। আজকাল কারও মরার খবর পেলেই বাবা কেমন ধড়ফড় করে।

এই বয়সে হয়।

বাবার ঊনআশি চলছে। আমাদের সকলেরই কেমন বয়স হয়ে যাচ্ছে, না রে পারুলদি?

তোর আবার বয়স হল কোথায়? বেশ তো আছিস। তোকে দেখে আমার বড্ড ভাল লাগছে। বেশ নিজের চেষ্টায় দাঁড়িয়ে গেছিস।

সলজ্জ হেসে সন্ধ্যা বলে, দাঁড়ানো মানে আর কী? আমার তো ছোট ব্যবসা। কষ্টেসৃষ্টে চলে যায়।

পাড়াগাঁয়ে থেকে যা করেছিস ঢের করেছিস। তোর রোখ আছে, আর এইজন্যই তোকে ভাল লাগে।

এইটুকুর জন্যই বেঁচে গেছি পারুলদি। নইলে এ-বাড়িতে ঝি-গিরি করে খেতে হত।

সেই লোকটা আর খোঁজখবর করেনি, না?

না। খোঁজখবর করবেই বা কেন? সুখে সংসার করছে।

তোরা কাজটা ভাল করিসনি সন্ধ্যা। লোকটাকে ছেড়ে দিলি কেন? একটু শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল।

ধরতেই তো পারলুম না, ছেড়ে দেওয়ার কথা বলছিস কেন? ওসব আর ভাবিই না। আমার কপালের দোষ। তোর মতো সুন্দর হয়ে জন্মালে কি আর সে আমাকে ছাড়ত?

পারুলের খুব দুঃখ হল কথাটা শুনে। একটু ভেবে বলল, তুই যে কত সুন্দর তা দেখার মতো চোখ কটা পুরুষের আছে? এই যে দিনরাত হাড়মাস নিংড়ে কাজ করছিস, এই যে স্নো-পাউডার মাখিস না, সাজিস না, এই যে লড়াই করছিস এর জন্যই তো তুই সুন্দর।

সে তো তোর চোখে। পাঁচজনের চোখে তো নয়।

বউ সুন্দর হলেই বা। স্বামীর চোখে সেই সৌন্দর্যের আয়ু কতটুকু? কিছুদিন পর তো আর হাঁ করে তাকিয়ে বউয়ের সুন্দর মুখ দেখে এলিয়ে পড়বে না। তখন অন্য সব পয়েন্ট প্রমিনেন্ট হবে, কাজের মেয়ে কি না, বুদ্ধিমতী কি না, যত্নআত্তি করে কি না।

সে তো ঠিক কথাই পারুলদি। কিন্তু সে কথা ওই মেনিমুখখাকে বোঝাতে পারলুম কই? আমি কাছে গেলেই ওর বোধহয় মনে হত একটা ভালুক আসছে।

পারুল হেসে ফেলল।

সন্ধ্যাও একটু হেসে বলে, তোর ব্যবসার কথা বল পারুলদি। তোর বর নাকি মস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।

দুর বোকা, বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হওয়া কি সোজা? আদিত্যপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে আমাদের কারখানা। ছোট ছোট পার্টস তৈরি হয়। তেলের লাইনের জয়েন্ট, আরও সব ছোটখাটো জিনিস। টাটা স্টিল, টাটা অটোমোবাইল, রেল এরাই নেয়। কিন্তু এই একরত্তি একটা জিনিস তৈরি করতেও কতরকম ড্রয়িং, কত মাপজোখ, আর আটটা নটা অপারেশন দরকার হয়। তাই ভাবি বড় বড় কলকারখানায় আরও কত কমপ্লিকেটেড বাপার। ভাবলে মাথা ঘুরে যায়।

তুই আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছিস। একটুও মোটা হসনি। পারুলদি, তুই যে কেন মেজদাকে বিয়ে করলি না! তা হলে আজ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম।

কেন রে? অমলদার বউকে কি তোর পছন্দ নয়?

এতক্ষণ সন্ধ্যার মুখে যে নির্লিপ্ত, হাসিখুশি, আলগা ভাবটা ছিল সেটা তীব্র ভ্রূকুটিতে মুখোশের মতো খসে পড়ে গেল। চাপা গলায় বলল, পছন্দ! ওরকম একটা বিচ্ছিরি স্বভাবের মেয়েমানুষকে আবার পছন্দ!

পারুল অবাক হয়ে বলে, কেন, কী করলেন উনি? ঝগড়া নাকি?

সে করলেও ভাল ছিল। ঝগড়ায় অনেক সময়ে সম্পর্ক পরিষ্কার হয়ে যায়। এ তো সে রকম নয়। মনের ভিতরে চক্কর। এ-বাড়ির কাউকে মানুষ বলেই মনে করে না। কিন্তু খুব মিষ্টি করে হেসে আর হাবেভাবে সেটা বুঝিয়ে দেবে, গলা তুলবে না, চেঁচাবে না।

তাই বুঝি?

এখন খুব মনে হয়, তোর সঙ্গে যদি মেজদার বিয়ে হত কী ভাল হত তবে। হ্যাঁ রে পারুলদি, তুই নাকি ভাল ইংরিজি বলতে পারিস?

পারুল হেসে বলে, পারব না কেন? আমার বরের পাল্লায় পড়ে শিখতে হয়েছে। কত অবাঙালি বা সাহেবসুবোকে নিয়ে ডিল করতে হয়, না শিখে উপায় আছে!

ওদের একটু ইংরিজি শুনিয়ে দিয়ে আয় না!

পারুল অবাক হয়ে বলে, ইংরিজি শোনাব কী রে? কেন?

ওরা বুঝুক গাঁয়ের মেয়েরাও ইংরিজি বলতে পারে।

পারুল হেসে বলে, তাতে কী লাভ হবে বল তো! ওরা খুব ইংরিজি বলে নাকি?

দিনরাত মায়েতে আর ছেলেমেয়েতে কেবল ইংরিজিতে কথা হচ্ছে। আমাদের নিয়ে খারাপ খারাপ কথা বলে। ঠিক বুঝতে পারি না, হাবেভাবে টের পাই। চল না পারুলদি, গিয়ে মুখের ওপর ইংরিজি বলে আসবি।

পারুল স্মিত মুখে বলে, সেটা ঠিক হবে না। ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, পরিচয় করার ইচ্ছেও নেই। আর ইংরিজি বলাটাও কোনও ক্রেডিট নয়। কিন্তু তুই ওদের ওপর রেগে আছিস কেন?

সন্ধ্যার মুখে আবার একটা শান্ত বিষণ্ণতা দেখা দিল। বলল, দেখ পারুলদি, তুই তো আমার কত প্রশংসা করলি। কিন্তু আমি ভিতরে ভিতরে নিজেকে নিয়ে লজ্জায় মরে থাকি। দেখতে কালো-কুচ্ছিত, স্বামী নেয় না, তার ওপর তেমন লেখাপড়াটাও হয়নি। অমল রায়ের মায়ের পেটের বোন বলে কি আমাকে চেনা যায় বল? তার ওপর দিনরাত কামিনের মতো খাটি, তাতেই ওরা বোধহয় আমাকে লেবার ক্লাসের লোক বলে মনে করে। ছেলেমেয়ে দুটো কখনও আমাকে পিসি বলে ডাকে না। দ্যাট উওম্যান বলে কী সব যেন নিজেদের মধ্যে

বলে। তাই ভাবি, তুই মেজদাকে বিয়ে করলে কত ভাল হত। কেন হলি না রে পারুলদি? মেজদার কোনও দোষ ছিল?

দোষ কার মধ্যে নেই? ওসব কথা থাক।

তুই মেজদার কথা আর ভাবিস না, না রে?

ও মা! ভাবব না কেন? সকলের কথাই ভাবি।

তোদের মধ্যে কত ভালবাসা ছিল।

পারুল একটু হেসে বলল, আজকাল ভালবাসা কথাটা শুনলেই আমার যে কী বিচ্ছিরি লাগে। টি ভি খুললেই ভালবাসা, বই খুললেই ভালবাসা, সিনেমায় গেলেই ভালবাসা। যত ভালবাসার বাদ্যি বাজছে তত ভালবাসা জিনিসটাই উবে যাচ্ছে।

তা হলে তোদের মধ্যে কী ছিল?

যা ছিল তা ওই সিনেমা টিভি উপন্যাসের মতোই, বিজ্ঞাপনের মতো ব্যাপার। আসলে ছিল কি না পরীক্ষাই হয়নি। আর ও বয়সটাও তো বুঝবার মতো বয়স নয়।

কী জানি বাবা, সেই ছেলেবেলা থেকেই তো জেনে এসেছি তুই আমার মেজো বউদি হবি। কিন্তু শেষ অবধি হল একটা—

পারুল হাসছিল। বলল, থামলি কেন?

একটা খারাপ কথা মুখে আসছিল, সেটা আটকালুম।

ভাল করেছিস। হ্যাঁ রে, অমলদার বউকে আড়াল থেকে একবার দেখিয়ে দিস তো!

আড়াল থেকে কেন? আলাপ করলেই তো হয়।

না, আলাপ করব না।

কেন রে?

আমার কেন যেন ইচ্ছে করছে না। শুধু দেখলেই হবে।

সন্ধ্যা মৃদু হেসে বলে, তোর কিন্তু এখনও একটু হিংসে আছে। ভয় নেই, সে তোর কড়ে আঙুলের নখেরও যুগ্যি নয়। দেখবি? আয় তবে। এখন ওরা নিজেদের ঘরে বসে কথা কইছে। ঝগড়াই হয় বেশির ভাগ।

ঝগড়া?

হ্যাঁ, মা আর মেয়েতে।

কী নিয়ে ঝগড়া?

সে কি আর বুঝতে পারি? ইংরিজিতে ঝগড়া। সন্দেহ হয় মেয়েটা কোনও কেলেঙ্কারি করে এসেছে। নইলে এ সময়ে হঠাৎ গাঁয়ে এসে বসে আছে কেন? পুজোর ছুটিও শুরু হয়নি, স্কুল কলেজ সব খোলা।

মেয়েটার বয়স কত?

ষোলো সতেরো তো হবেই।

পারুল একটু আনমনা হয়ে গেল। তারও তখন সতেরো বছর বয়স। মেয়েদের যৌবন মানেই চার দিকে পুরুষদের মধ্যে গুনগুন করে বার্তা পৌঁছে গেল, মেয়েটা সোমত্ত হল, ডাগর হল হে। কামগন্ধ উড়ল বাতাসে। আপনা মাসে হরিণা বৈরী। এই বয়সেই বাঘে খেয়েছিল তাকে। প্রেমিকের মতো নয়, লুঠেরার মতো তার

কুসুম ছিন্ন করেছিল অমল। কিন্তু তাদের আমল আর নেই। এখন যৌবনের কেলেঙ্কারিকে অত কি আমল দেয় মা বাপেরা? যুগ কত পালটে গেছে। তার ওপর এরা বিদেশেও ছিল, যেখানে শরীর হল জলভাত।

যাবি ওপরে পারুলদি?

গিয়ে?

মেজদার বউকে দেখবি বললি যে!

ও হ্যাঁ। কিন্তু আড়াল থেকে।

হ্যাঁ, আমি তো আড়াল থেকেই দেখি। মায়ের ঘরের দরজায় একটা ফাঁক আছে। ঘরের আলো নিবিয়ে—

অমলের বউকে দেখার ইচ্ছেটা হঠাৎ কেন যেন উধাও হল পারুলের। তবু সে উঠল।

সন্ধ্যার মা মারা গেছে বছর দশেক। এ-ঘরে এখন আর কেউ থাকে না। মহিম রায় সিঁড়ি ভাঙতে অপারগ বলে আজকাল একতলায় থাকেন। দু ঘরের মাঝখানে বন্ধ দরজার ফাটলে চোখ রেখে সন্ধ্যা আগে দেখে নিল। তারপর চাপা গলায় বলল, মেয়েটা নেই। মায়ে পোয়ে বসে আছে। দেখ।

পারুল দেখল। কোন কোনও মহিলা আছে যাদের রূপ যেন পুরুষের দিকে তেড়ে আসে। সব কিছুই যেন বড় বেশি উগ্র। অমলের বউকে সুন্দরী বলতেই হবে। তবে সেটা বড় উচ্চগ্রামে বাঁধা। অতি ফর্সা, নাক অতি টিকোলো, চোখ অতি টানা, ঠোঁটে নিষ্ঠুর ক্ষীণতা। শরীরটা কাঠ-কাঠ। মেয়েলি ভাব একটু যেন কম। আর বয়সটাও একটু বেশি, অমলের কাছাকাছি।

বেশ সুন্দরীই তো রে।

আহা, ওকে সুন্দর বলে নাকি?

মেমসাহেব-মেমসাহেব দেখতে।

স্বভাবও মেমসাহেবদের মতোই। এঁটোকাঁটা মানে না, বাঁ হাতে জল খায়।

মুখটায় একটু টেনশন আছে।

বলেছি না, দিনরাত ঝগড়া হচ্ছে। মুখে মেচেতা আছে, দেখেছিস?

ছেলেটা এদিকে পিছু ফিরে ছিল। একবার মুখ ঘোরাতেই বোঝা গেল, ছেলের মুখ তার মায়ের মতো।

মেয়েটা কোথায় গেল?

হাঁটাহাঁটি করতে গেছে বোধহয়। দিনরাত তো তিনজনে ঘরবন্দি হয়ে থাকে।

তোদের সঙ্গে কথা বলে না?

না। শুধু বড়দার সঙ্গে। তাও কাজের কথা। এটা ওটা আনতে ফরমাশ করে।

সরু সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মেয়েটার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। মেয়েটা দু-তিন সিঁড়ি উঠে এসেছিল, তাদের পাশ দেওয়ার জন্য নেমে দাঁড়াল। সিড়ির মাথায় টিমটিমে ডুমের আলোয় মেয়েটাকে দেখল পারুল। ফুটফুটে সুন্দর ডল পুতুলের মতো মেয়ে। মায়ের মতো কাঠ-কাঠ ভাব নেই শরীরে। একেবারেই মেয়েলি মেয়ে। মুখে হয়তো-বা অমলের আদল আছে। তবে অমল সুপুরুষ ছিল না। মুখে বাপের আদল থাকলেও মেয়েটা কিন্তু খুব সুন্দর।

মেয়েটা তাকে দেখছিল। একটু অবাক হয়েই দেখছিল। উঠোনের ওপাশে সন্ধ্যার ঘরের দরজায় উঠে ফিরে দেখল পারুল, মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে।

সন্ধ্যার ঘরে আরও প্রায় আধঘণ্টা বসে কথা কইল পারুল। সবই পুরনো কথা, ছেলেবেলার কথা।

যে মেয়ে দুটো বসে কাজ করছিল তারা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ লাজুক মুখে সন্ধ্যা বলল, দেখ পারুলদি, তোকে একটা কথা বলব?

বল না। কী কথা রে?

একটা ছেলে—হি হি—একটা ছেলে আমাকে বিয়ে করতে চাইছে।

পারুল অবাক হল না। এরকম তো হতেই পারে। বলল, কে রে?

তুমি চিনবে না। যারা আমার জিনিস নিয়ে দোকানে দোকানে সাপ্লাই করে তাদেরই একজন। বামুনের ছেলে।

প্রেমে পড়েছে নাকি? তুই পড়লি, না ও পড়ল?

দুর! সেসব নয়। আসলে আমাদের ওসব করার সময় নেই, প্রেম আবার কীসের? ও বলে বিয়ে করলে ব্যবসাটা বাড়ানো সহজ হবে। দুজনে মিলে একটা পার্টনারশিপের মতো হয় তা হলে।

পারুল একটু ভেবে বলল, খারাপ কী? মহিমকাকাকে বলেছিস?

না। কেউ জানে না। আমরা তো আর ঢলাঢলি করি না। তোমাকেই প্রথম বললুম।

তোর এখন কিছু টাকা হয়েছে সন্ধ্যা, আর সেইটেই ভয়। টাকার লোভে যদি বিয়ে করতে চেয়ে থাকে তা হলে সাবধান হওয়া ভাল।

আমিও অনেক ভাবছি। হিসেব-নিকেশ করছি। বাড়ির লোকেই বা কী ভাববে বল! আমি তাই এখনও মত দিইনি।

খুব ঝোলাঝুলি করছে নাকি?

না না, সেসব নয়। অত আঠা নেই আমাদের। শুধু বলেছে বিয়ে করলে পরস্পরকে বিশ্বাস করতে সুবিধে হবে।

তোকে কিন্তু খুশি-খুশি দেখাচ্ছে।

মা কালীর দিব্যি, খুশি-টুশি নয় রে, বরং ভয়ে বুক শুকিয়ে আছে। নেড়া আবার বেলতলায় যাওয়ার আগে একটু ভয় পাবে না, বল?

ছেলেটা যদি ভাল হয় তবে বিয়ে করে ফেল সন্ধ্যা। নইলে যখন বয়স হবে তখন দেখবি এককাঁড়ি টাকা ছাড়া আর তোর কিছু নেই।

কিন্তু কী জানিস পারুলদি, ওই লোকটার জন্য আমার আজও একটু কেমনধারা মায়া আছে। বাজে লোক, খুব পাজি লোক, তবু কেমন যেন মনে হয়, বিয়ে করলে একটা বুঝি পাপ-টাপ কিছু হবে। এটা বোধহয় কুসংস্কার, না রে?

পারুল মাথা নেড়ে বলে, আমার তা মনে হয় না। কুসংস্কার কেন হবে! লোকটা পাজি হোক, শয়তান হোক, তুই হয়তো তবু ভালবেসেছিলি। তুই তো বোকা। আর বোকারাই অন্ধের মতো ভালবাসতে পারে। চালাকরা পিছল প্রাণী।

তাই ভাবছি।

তা হলে আরও ভাবতে থাক। যা করবি ভেবে করিস।

আমার কথা তুইও একটু ভাবিস পারুলদি। ভেবে একটা বুদ্ধি দিস। আমার একদম বুদ্ধি নেই।

ভাবতে ভাবতে অন্ধকার উঠোনটা পার হচ্ছিল পারুল। অমল রায়ের বউকে দেখার জন্য এত কৌতূহল কেন তার? এতদিন বাদে সে কি নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছিল ওকে? ওই জায়গাটা তারই বাঁধা ছিল বলে তার কি আজও একটু দুঃখ আছে? না তো! নিজের মনকে সে খুব ভাল চেনে না বটে, কিন্তু এতদিনের বিবাহিত জীবনে অমল রায়ের জন্য তার কোনও দুঃখবোধ ছিল না তো! পড়তি বয়সে তাহলে এসব কী হচ্ছে? কেন হচ্ছে? অমল তো তার নাকচ করা পুরুষ।

এক তুমুল বর্ষার রাতে ভিতরে চেপে রাখা গোপন কথার কীটদংশন সইতে না পেরে সে তার স্বামী জ্যোতিপ্রকাশকে সবই বলে দিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, সব প্রকাশ না করলে জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে তার জীবনটা সম্পূর্ণ হবে না। খাদ থেকে যাবে। ভারমুক্ত হতে পারবে না সে।

শান্ত মানুষ জ্যোতিপ্রকাশ মন দিয়ে সব শুনল। তারপর বলল, শরীরের তো পাপ নেই, পাপ মনে। মনে যদি শিকড়-বাকড় না থাকে তবে আর ভয় কী?

না, আমার মনে কোনও দুর্বলতা নেই।

তাহলে সব ঠিক আছে পারুল। মেয়েদের মনে একাধিক পুরুষের ছাপ থাকলে তার সন্তান অস্থিরমতি হয়।

কী করে জানলে?

জানি। যে মেয়ের মন একমুখী, কোনও কারণে তার দেহ অশুচি হলেও খুব ক্ষতি হয় না। তার সন্তান ভালই হওয়ার কথা।

তুমি শুধু সন্তানের কথা ভেবে বলছ?

বিয়ের উদ্দেশ্যই তো সন্তান। তার জন্যই শরীর লাগে, মনও লাগে। কোনওটাই তুচ্ছ নয়। সন্তান মানে সমতান। একদিন আমাদের জৈব প্রয়োজন শেষ হয়, আয়ু ফুরোয়, তখন ওই সন্তানের ভিতর দিয়ে আবার আমরাই বেঁচে থাকি।

জ্যোতিপ্রকাশ একটু প্রাচীনপন্থী, একটু গোঁড়াও হয়তো। আর কেন যেন সেই কারণেই লোকটার ওপর নির্ভর করতে ভরসা পায় পারুল।

নিজের রূপ নিয়ে বিয়ের পরও ঝামেলা কিছু কম হয়নি। জান সিং এক মস্ত খদ্দের তাদের। লম্বা-চওড়া আখাম্বা চেহারার রূপবান পুরুষ। কিছু তরলমতি এবং ফুর্তিবাজ। লোকটা জান-কবুল প্রেমে পড়ে গিয়েছিল পারুলের। কাণ্ডজ্ঞানরহিত অবস্থায় সে একদিন অফিসঘরে একলা পেয়ে পারুলের হাত চেপে ধরে বলল, আমার অনেক টাকা আছে। দিল্লি আর হরিয়ানায় আমার অনেক সম্পত্তি। চলো আমার সঙ্গে।

পারুল সেই শক্তিমান পুরুষটির দিকে চেয়ে ফের অমল রায়কেই দেখতে পেয়েছিল। সে খাদ্য, পুরুষেরা খাদক। সে মিষ্টি ও কঠিন করে বলেছিল, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি একটা কিছু গড়ে তোলার জন্য। মানুষ সবসময়েই কিছু গড়ে তুলতে চায়। আবহমানকাল ধরে মানুষের সেই চেষ্টা। তুমি সব ভেঙে দিতে চাও? ছক উলটে দেবে? মিসমার হয়ে যাবে সব? তুমি আমাদের মস্ত ক্লায়েন্ট সিং সাহেব, কিন্তু তোমাকে ছাড়াও আমাদের চলে যাবে।

জান সিং বার্তা পেয়ে গেল। কিন্তু হাত ছেড়ে দিয়ে সে বলেছিল, দেয়ার ইজ সামথিং উই কল লাভ। আই অ্যাম ইন লাভ উইথ ইউ। সেই প্রেমটাকে একটা সম্মান তো দেবে?

আমার ভালবাসা শুধু পুরুষমানুষ নিয়ে তো নয়। আমি এবং আমার স্বামী উই শেয়ার বেড, বিজনেস, বিয়ারিংস। আমাদের ভালবাসা হুট করে হয়নি, ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে। হুট করে তা ভেঙেও যাবে না। আমি দমকা প্রেমে বিশ্বাস করি না।

ডু ইউ অ্যাডোর মি?

না সিং সাহেব, আই ডোন্ট অ্যাডোর ইউ। ইউ আর এ বিগ অ্যান্ড উইক ম্যান।

একটা মেয়েই জানে কতরকম লড়াই একটা মেয়েকে গোপনে এবং একা করে যেতে হয়। প্রত্যাখ্যানের পর প্রতিশোধের পালাও শুরু হয় কখনও কখনও। বদনাম ছড়ানো, মুখে অ্যাসিড মারা, খুন অবধি। জান সিং বহু টাকার অর্ডার ক্যানসেল করল, গুণ্ডা লাগিয়ে কারখানায় গোলমাল পাকাল। খুব অশান্তি গিয়েছিল কয়েক দিন।

জান সিং একাই তো নয়। কেউ গভীরভাবে তার প্রেমে পড়েছে, কেউ হালকা ফুর্তি লুটে নিয়ে যেতে চেয়েছে, কেউ নানা সুবিধে করে দেওয়ার টোপ ফেলেছে, কেউ নিজেকে ময়ূরের মতো সাজিয়ে জাহির করেছে। আর ট্রেনে বাসে গায়ে অঙ্গ স্পর্শ করানো তো আছেই। খদ্দের সবাই। প্রায় সবাই। সারি সারি মুখ মনে পড়ে যায় তার। নির্লিপ্ত মানুষও কি নেই? ঢের আছে। তাই সব পুরুষকে সে ঘেন্না করে না, বেছে বেছে করে। মুখচোখ দেখেই তার মেয়েলি অ্যান্টেনায় পুরুষের তরঙ্গ ঠিক ধরা পড়ে।

তবু অমল রায়ের প্রতি তার কেন কৌতূহল? কেন এখনও? নিজেকে এই প্রশ্নের ছোবলে ছোবলে অস্থির করে তুলে সে খুব আনমনে টর্চের আলো ফেলে ফেলে বড় উঠোনটা পার হচ্ছিল।

পিছন থেকে সন্ধ্যা বলল, আবার আসিস পারুলদি।

পারুল কথাটা শুনতেই পেল না। উঠোন পেরিয়ে সরু কাঁচা রাস্তা, দুধারে গাছপালার ডালপাতা গায়ে লাগছিল তার। আচমকাই কামিনী ঝোপটার পাশে টর্চের আলোয় মেয়েটাকে দেখতে পেল সে। পরনে হলুদ রঙের কুর্তা সালোয়ার।

থমকে দাঁড়াল পারুল। মেয়েটা এখানে কী করছে?

পারুল হয়তো কথা না বলেই পাশ কাটিয়ে চলে যেত। কিন্তু মেয়েটাই হঠাৎ পরিষ্কার বাংলায় বলল, আপনি পারুল না?

"পারুল" শুনে ভ্রূ কোঁচকাল পারুল। পিসি বা মাসি বা দিদি নয়, শুধু পারুল! অবশ্য ওরা বিদেশে ছিল, সেখানে এরকমই রেওয়াজ।

পারুল রাগ না করে স্নিগ্ধ গলাতেই বলল, হ্যাঁ। তুমি আমাকে চিনলে কী করে?

আমি সোহাগ, অমল রায়ের মেয়ে। আমাদের অ্যালবামে আপনার একটা ছবি আছে।

আমার ছবি! আশ্চর্য!

নাই ড্যাড অ্যাডোর্স ইউ।

ঝম করে লজ্জার একটা ঝাপটা লাগল তার মুখে। পারুল বলল, তাই নাকি? হতে পারে। আমরা তো এক গাঁয়েরই মানুষ।

আপনার যে ছবিটা আমাদের অ্যালবামে আছে সেটা অনেক কম বয়সের। বোধ হয় সতেরো আঠেরো।

উদাস গলায় পারুল বলে, তা হবে।

ইউ আর এ ভেরি বিউটিফুল উওম্যান।

তুমিও তো সুন্দর।

মে বি। কিন্তু বাবা বলে আপনার মতো নাকি বাবা আর কাউকে দেখেনি।

অমলদা এসব বলেছে বুঝি তোমাদের।

হ্যাঁ। আমাদের মধ্যে খুব ফ্র্যাঙ্ক আর ট্রুথফুল কথা হয়।

তাই বুঝি!

আপনার যে বয়সের ছবিটা আমাদের অ্যালবামে আছে বোধহয় সেই বয়সেই ইউ ওয়্যার ডি-ফ্লাওয়ারড বাই মাই ড্যাড।

পারুলের শরীর সিঁটিয়ে গেল লজ্জায়। বুকের ভিতরটা ঝমঝম করছে রাগে। তারপর ফণা তুলল।

তোমরা বুঝি এতটাই ফ্র্যাঙ্ক?

অ্যান্ড হোয়াই নট?

তোমার বাবা একটা শিক্ষিত গাধা। একে ফ্র্যাঙ্কনেস বলে না, একে বলে ফুলিশনেস।

মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়ে বলে, হি ইজ অফকোর্স অ্যান ইডিয়ট।

রাগে ফুঁসছিল পারুল। মেয়েটাকে একটা থাপ্পড় মারার প্রবল ইচ্ছে যে কী করে সে দমন করল কে জানে।

আর ইউ ক্রস উইথ মি পারুল?

ইয়েস আই অ্যাম ক্রস উইথ ইউ।

হোয়াই কান্ট ইউ টেক এ ট্রুথ অ্যাজ এ ট্রুথ? তা ছাড়া বাবা প্রথম কথাটা আমাদের কাছে বলে ফেলে আফটার এ ফিউ রাউন্ডস অফ হুইস্কি। আমি আর মা বসে অ্যালবামটা দেখছিলাম, তখন। পরে যখন আমরা বাবাকে চেপে ধরি তখন সোবার অবস্থাতে বাবা স্বীকার করেছিল। নো হার্ড ফিলিং পারুল। আই অ্যাম সরি।

পারুল তখনও ফুঁসছিল। কিন্তু সে বোকা বা অবিবেচক নয়। সে হয়তো জানে না, দুনিয়াটা তার অজান্তে কত পালটে যাচ্ছে দ্রুত। বিশাল প্রজন্মের ব্যবধান। এইসব ছেলেমেয়ে হয়তো তাদের কাছে মঙ্গলগ্রহের জীবের মতোই অচেনা। সে মাথা নেড়ে বলে, তুমি আমার আজকের দিনটা খুব তেতো করে দিলে।

মেয়েটা একটু যেন অবাক হয়ে বলে, ইজনট ইট এ ট্রুথ? টেক ইট ইজি ডিয়ার। আমি কিছু ভেবে বলিনি। ওরকম তো কত হয়।

পারুলের মনে পড়ল, কুড়ি বছর আগে অমল রায়ও এই কথাটা বলেছিল। এরকমই নাকি আকছার হয়, এতে মনে করার কিছু নেই, আজকালকার ছেলেমেয়েরা ওসব মাইন্ড করে না। ইত্যাদি।

পারুল টর্চটা নিবিয়ে ফেলেছিল। ফের জ্বেলে বলল, এরকম হওয়া উচিত নয়। ইট ইজ এ শেম।

ফের অবাক সোহাগ বলে, কেন পারুল? হোয়াই ইট ইজ এ শেম?

সেটা তুমি হয়তো এখনই বুঝবে না। হয়তো কোনওদিনই বুঝবে না। তোমার পরিবার তোমাকে অন্যরকম শিখিয়েছে।

ও কে পারুল, আই ডিড সামথিং রং। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতেই চেয়েছিলাম। আপনার ছবিটা আমাকে পাগল করে দিত। কী সুন্দর। ইউ আর স্টিল ভেরি বিউটিফুল।

কমপ্লিমেন্টটা পারুলের গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে সে বলল, বারবার ওকথা বলছ কেন? আমি জানি আমি সুন্দর। কিন্তু তাতে এখন আর আমার কিছু এসে যায় না।

মেয়েটা বোধহয় এবার অপমানিত বোধ করল। বলল, আপনি কি একজন নান? এ পিওর উওম্যান?

নিজেকে আমি তাই মনে করি। তুমি একটি অসভ্য মেয়ে।

মেয়েটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, উই হ্যাভ আওয়ার ওন অবসেশনস।

পারুল মেয়েটার পাশ কাটিয়ে খানিকটা চলে এসেছিল।

মেয়েটা হঠাৎ ডাকল, পারুল!

পারুল অনিচ্ছের সঙ্গে দাঁড়াল।

আই হ্যাভ টু টেল ইউ সামথিং।

দৌড়ে এসে হাঁপাচ্ছিল মেয়েটা।

পারুল ঠান্ডা গলায় বলল, আবার কী বলবে?

আমি বলতে চাই, ইন আওয়ার ফ্যামিলি এভরিবডি হেটস এভরিবডি। মাই ড্যাড অ্যান্ড মম হেটস ইচ আদার, আই হেট মাই ড্যাড অ্যান্ড মম অ্যান্ড দে হেটস মি। ইভন মাই ব্রাদার হেটস ড্যাড অ্যান্ড ড্যাড হেটস হিম। কিন্তু তার মধ্যেই দেখতে পাই, আমার বাবা অ্যালবাম খুলে আপনার ছবিটা যখন দেখে তখন তার মুখটা কেমন সফ্ট আর পেনসিভ হয়ে যায়। ছবিটা আমিও মাঝে মাঝে দেখি। দেখতে দেখতে আমারও কেমন যেন হয়। মোনালিজার ছবিতে যেমন ম্যাজিক আছে তেমনই কিছু। বুড়ঢাও কথাটা আমাকে অনেকবার বলেছে। আমার মন খারাপ লাগলেই আমি ছবিটা দেখি আর মন ভাল হয়ে যায়। ইউ হ্যাভ বিকাম এ কাল্ট ফিগার অ্যান্ড ইভন এ গডেস টু আস। অ্যান্ড ইটস এ ট্রুথ।

এত অবাক হয়েছিল পারুল যে মুখে প্রথমে বাক্যই সরল না। তারপর বলল, এসব তো তোমার কল্পনা। আমি সামান্য মেয়ে, দেবী-টেবী নই।

উই হ্যাভ আওয়ার ইলিউশনস, আই নো। তবু আপনাকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। মে বি ইউ আর নট এ গডেস, বাট মাস্ট বি সামওয়ান ভেরি স্পেশাল।

তুমি ভুল ভাবছ সোহাগ। ওরকম ভেবো না।

আমি একটু বেশি কথা বলে ফেলেছি আজ, কিছু মনে করবেন না। বাই।

মেয়েটা চলে যাচ্ছিল। পারুল টর্চটা জ্বেলে ওর পথের ওপর আলো ফেলে বলল, শোনো সোহাগ, এটা গ্রামদেশ। অন্ধকারে হুটহাট বেরিয়ে পোড়ো না, সাপ-খোপ আছে কিন্তু।

অন্ধকারে সোহাগের হাসি শোনা গেল, আই লাভ স্নেকস। স্নেকস আর অলওয়েজ ওয়েলকাম।

এসবই পরশুদিনের কথা। আজ তার বাবা গৌরহরি চাটুজ্জের শ্রাদ্ধের দিনে বৃহৎ লোকসমাগম থেকে একটু সরে এসে বাগানের নিরিবিলিতে দাঁড়িয়ে পারুল ভাবছিল মেয়েটা কি একটু পাগল? সাপটা সামনে দিয়ে চলে যাওয়ার পরই মেয়েটার কথা মনে পড়ল তার। সুন্দর, তবে মুখটায় একটু বিষণ্ণতা মাখানো ছিল।

অমল রায় তার ছবির দিকে চেয়ে আজও কি পুরনো ভালবাসার কথা ভাবে? নাকি তার বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে করে মনে মনে তেতো হয়ে যায়?

কে যেন পারুলকে ডাকছে চেঁচিয়ে। পারুল ফিরে আসছিল। উঠোনে পা দিতেই সামনে বুড়ো মানুষটা এসে পড়ল।

হ্যাঁ মা, তা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি ছাদে করা হয়েছে?

হ্যাঁ ধীরেনখুড়ো। আপনি ভাল আছেন তো!

ভাল আর কী, গৌরহরিদা গেলেন, আমরাও সব পা বাড়িয়ে আছি।

একটা পেচ্ছাপের গন্ধ পাচ্ছিল পারুল। এসব গন্ধ সে একদম সইতে পারে না। নাকে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, ইস, কী বিচ্ছিরি গন্ধ! কেন যে এরা ব্লিচিং পাউডার বা ফিনাইল ছড়ায় না!

ধীরেন কাষ্ঠ তাড়াতাড়ি দু পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, খাওয়া-দাওয়া কি শুরু হয়ে গেছে মা? আমার আবার অনেকটা পথ— এই রোদ্দুরে—

যান না খুড়ো, ওপরে চলে যান। বোধহয় শুরু হয়েছে।

তিন

গত দশদিন যাবৎ বড় জ্যাঠামশাইয়ের ভূত চারদিকে আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চটির শব্দ শোনা যায়, গলাখাঁকারির শব্দ পাওয়া যায়, নিশুত রাতে দীর্ঘশ্বাস অবধি ভেসে বেড়ায়। দশ দিন আগে বড় জ্যাঠামশাই যখন মারা যান তখন ভরসন্ধেবেলা। চারদিকে ধোঁয়াটে আবছা অন্ধকার নেমে আসছে। সন্ধেবেলাটা হল সবচেয়ে মন খারাপ করার সময়। কালিঝুলিমাখা এক ডাইনি বুড়ি যেন এসে হাজির হলেন। প্রত্যেক দিন এই সময় তার খুব মরার কথা মনে হয়।

এক ছুটের রাস্তা। অবস্থা খারাপ শুনে তারা সব গিয়েছিল দেখতে। কয়েকজন মুরুব্বিগোছের পাড়াপ্রতিবেশী, বর্ধমান থেকে গাড়ি-চেপে-আসা গম্ভীরমুখো ডাক্তার আর আত্মীয়স্বজনে বারান্দা আর ঘর ভর্তি। তাদের জ্যাঠার ঘরে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। নিঃশব্দ ঘরে জ্যাঠা একা একা মারা যাচ্ছিল যখন, সেই সময়ে দুটো-তিনটে বাড়ি থেকে শাঁখের আওয়াজ এল, জ্যাঠামশাইয়ের গোয়ালঘর থেকে একটা গোরু গাঁ গাঁ করে ডাকছিল। সে বোধহয় আলো। সাদা ধবধবে আললা বড় জ্যাঠামশাইয়ের এমন বাধুক যে, জ্যাঠা গায়ে হাত রেখে পাশে না দাঁড়ালে সে দুধ ছাড়ে না, আটকে রাখে। আলো কি কিছু টের পেয়েছিল? অবোলা জীবরা বোধহয় ঠিক বুঝতে পারে। জাম্বো কুকুরটা যেমন। জ্যাঠার বারান্দার এক কোণে কেমন ঝুম হয়ে বসা। সামনের দু পায়ের ফাঁকে মাথাটা রাখা। নড়ছে না, চড়ছে না। এত লোক দেখেও একটা ঘেউ পর্যন্ত দিল না।

আর বাড়ির বাতাসটা কেমন ভারী হয়ে উঠছিল ক্রমে। শূন্য থেকে সাদা প্রেতের মতো একটু কুয়াশা যেন হঠাৎ নেমে এসে ঝুলে থাকল উঠোনের ওপর। কেমন ছমছম করছিল চারধার। যেন প্রেতলোকের ছায়া চারধারে। পান্না সিঁড়িতে বসেছিল চুপচাপ। বড় জ্যাঠা মরে যাচ্ছে। কেন যে মরে যাচ্ছে! আর ওই ভুতুড়ে সন্ধ্যা আর ওই আলোর করুণ ডাক আর ওই কুয়াশার পাতলা সর, সব মিলিয়ে কান্না পাচ্ছিল।

আর তখন উঠোনের উত্তর ধারে মরা আলোয় একমনে এক্কাদোক্কা খেলে যাচ্ছিল দুখুরি। কালো রোগা মেয়েটার পরনে একখানা কার যেন মস্ত ঢলঢলে ফ্রক। শোকাহত বাড়িতে আসন্ন মৃত্যুর নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু ওই মেয়েটা একমনে খেলে যাচ্ছে। এখন তাকে কেউ কাজে ডাকছে না, ফাই-ফরমাশ করছে না। এই ফাঁকটুকুতে সে আপনমনে খেলে নিচ্ছে। মৃত্যুহিম বাড়িটায় ওই একটু যেন জীবনের লক্ষণ— হৃৎপিণ্ডের মতো। লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে মেয়েটা।

প্রথমে শাঁখের আওয়াজ বলেই ভুল হয়েছিল। এক ঝটকায় ভুল ভাঙল। জ্যাঠাইমা কেঁদে উঠল না? ওঁ-ওঁ-ওঁ শব্দের একটা লম্বা টানা শব্দ। কে একজন বলে উঠল, সময়টা লিখে রাখো, লিখে রাখো, ছটা বেজে সতেরো মিনিট। আর একজন বলল ও ভট্‌চামশাই, লগ্নটা কী পেল দেখুন তো, দোষ-টোষ কিছু পেল নাকি? নবীন ভট্‌চাযের গলা পাওয়া গেল, তেমন কিছু নয়, গৌরহরিদা ভালই গেছেন।

জ্যাঠাইমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে অনেকগুলো কান্নার আওয়াজ উঠল আর গম্ভীরমুখো ডাক্তার বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে উঠোনে নেমে চলে গেলেন। কান্না শুনে দুখুরি খেলা থামিয়ে মুখের ওপর থেকে ঝুরো চুল সরিয়ে পান্নার দিকে চেয়ে বলল, মরে গেছে?

মরা মানুষ দেখবে না বলে পান্না আর দাঁড়ায়নি। এক ছুটে বাড়ি। আর বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করছিল ফাঁকা, অন্ধকার, হাঁ-হাঁ করা ঘর, উঠোন জোড়া অন্ধকার, আর ধোঁয়াটে অশরীরী কুয়াশার কুণ্ডলী। পান্না উঠোনে দাঁড়িয়ে, চোখ বুজে, শক্ত হয়ে প্রাণপণে চিৎকার করেছিল, বাসন্তী... বাসন্তী... বাসন্তী...

বাসন্তী গিয়েছিল পুকুরঘাটে। বাসনের পাঁজা ফেলে রেখেই উঠে এল।

কী হয়েছে গো? চেঁচাচ্ছ কেন?

আমার ভয় করছে।

ও মা! ভরসন্ধেবেলা ভয়ের কী?

বাড়িতে কেউ নেই দেখছিস না? সব ও-বাড়িতে।

তা তুমি চলে এলে যে! গৌরকর্তার কি হয়ে গেল?

হ্যাঁ। আমার ভীষণ ভয় করছে।

সেদিন সন্ধেবেলা কারেন্ট ছিল না। বাসন্তী লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে বলল, আমার তো বসে থাকলে চলবে না, বাড়ি ফিরতে হবে। ছেলেটার জ্বর দেখে এসেছি। একা যদি না থাকতে পারো তা হলে ভশ্চায খুড়িমাকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।

ভয়! ভয়ের কি শেষ আছে! কোথা থেকে যে হঠাৎ হঠাৎ তার ভয়েরা এসে হাজির হয় তা সে নিজেও জানে না। কিন্তু ভয় তার অমনি হয় না। তার ভয়ের পিছনে সবসময়েই গূঢ় কারণ থাকে। কিন্তু সেটা কেউ বুঝতে চায় না। ভয়ের জন্য কত বকুনি খায় সে।

মানুষ মরে যে কেন ভূত হয় কে জানে বাবা! ভটচায খুড়িমা বলল, মরার পর আত্মা দশ দিন প্রেতলোকে থাকে, শ্রাদ্ধের পর দেবলোকে চলে যায়। আর প্রেতলোকটা বেশি দূরেও নয়, আশেপাশেই।

কী যে গা ছমছম করল তার। রাতে মায়ের সঙ্গে লেগে শুয়েও ঘুম এল না। নিশুত রাতে জ্যাঠামশাইয়ের দীর্ঘশ্বাস ঘুরে বেড়াতে লাগল উঠোনে। শুকনো পাতার সড়সড় শব্দে কীসের যে সঞ্চার ঘটছিল। তাদের কুকুরটা অকারণে কেঁদে উঠেছিল একবার বারান্দায়। অকারণে নয়, পান্না জানে। ঠিক জ্যাঠামশাইকে দেখতে পেয়েছিল।

দাহকাজ শেষ করে তার বাবা রামহরি চাটুজ্যে ফিরল শেষ রাতে। আগুন ছোঁয়ানো, লোহা ছোঁয়ানো এসব করতে উঠে গেল মা। তখন পান্নার চোখ জুড়ে ঘুম এল।

বিয়ে করলে আমি বাপু, কলকাতায় করব। মেলা লোক, আলো, ভিড়ভাট্টা, অত গা ছমছম করবে না। আমার যা ভয়।

নিতু বলে, দুর! কলকাতা আমার ভাল লাগে না। তুই কী রে ভিড় ভালবাসিস! আমার ভাল লাগে পাহাড়, উপত্যকা, শীত-শীত ভাব আর খুব নির্জন, গাছগাছালি...

সেসব আমারও ভাল লাগে। কিন্তু একা থাকলে ভয়েই মরে যাব।

তোর যে কী অদ্ভুত ভয়। আর কলকাতায় বুঝি ভয় নেই। কত খুনখারাপি, অ্যাকসিডেন্ট।

তাও ভাল বাবা।

আজ বড় জ্যাঠার শ্রাদ্ধ। সকাল থেকে বাবা ও-বাড়িতে। মাও একটু আগে গেল। পান্নাকে ডেকে বলে গেল, দেরি করিসনি যেন। চানটা করেই চলে আয়। যা মাঠো মেয়ে তুই।

তা আছে একটু পান্না। মাঠোই বোধহয়। সব কাজে তার গড়িমসি। শরীরটা নড়তে-চড়াতে ভালই লাগে না তার। তার ভাল লাগে বসে বসে ভাবতে।

শরীরের গভীর আলসেমি যেন মদের নেশার মতো। আর মাথার মধ্যে লাগাম-ছাড়া উদ্ভট সব ভাবনা। পান্না ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে বসে গড়িয়েই কাটিয়ে দিতে পারে। আর মনে মনে সে যে কোথায় কোথায় উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তার ঠিক-ঠিকানা সে নিজেও জানে না।

আজ কোনও সাজ নেই। শ্রাদ্ধবাড়ির নেমন্তন্নে কেউ তো সাজে না। সাদামাটা একটা সাদা খোলের শাড়ি, মুখে একটু পাউডার, চুলে সামান্য চিরুনি। ব্যস হয়ে গেল। তাই আজ একটু গড়িমসি করে নিচ্ছে পান্না। মোটে সাড়ে এগারোটা বাজে। হাতে এখনও অনেক সময়। কাজের বাড়িতে আগে-ভাগে গিয়ে হাজির হলে লোকে বড্ড ফাই-ফরমাশ করে। এটা নিয়ে আয়, ওকে ডেকে দে, পানগুলো সেজে ফেল, আরও কত রকম। আর অত ভ্যাজর ভ্যাজর, কূটকচালি ভাল লাগে না তার।

গনগনে পুরুষের মতো দুপুর, নির্জন বাড়ি, আর অন্যরকম এক দামাল হাওয়া। আজ তার খুব "সে"-র কথা মনে হচ্ছে। এই ফাঁকা বাড়িতে পান্না এখন একা, এ সময়ে যদি "সে" এসে সামনে দাঁড়ায়! মাগো, ভাবতেই গা সিরসির করে, রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায়। কেমন হবে সে? আজও স্পষ্ট কোনও চেহারা মনে পড়ল না পান্নার। না বাবা, কার্তিক ঠাকুরটার মতো সুন্দর চেহারা চাই না। তবে পুরুষমানুষের মতো। একটু অগোছালো, একটু আনমনা, ভুলো মন, একটু পাগলাটে হোক না তাতেও ক্ষতি নেই। খুব সুন্দর ঝকঝকে মসৃণ দাঁত আর হাসিটা হবে খুব সুন্দর। হাসলে যেন মাড়ি না বেরিয়ে পড়ে বাবা। পান্নাকে খুব ভালবাসবে, কিন্তু বউ-মুখো যেন না হয়।

বউ-মুখো একদম দেখতে পারে না পান্না। শেফালী বউদি তো বরকে নিয়ে ওইজন্যই ভাজা-ভাজা হল। বরুণদা যা মাগী-মার্কা পুরুষ, বউয়ের মাথা টিপে দেয়, কুটনো কুটে দেয়। গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঘোরে। শেফালী বউদি মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে বলেই ফেলে, ও বাবা, এ যেন একটা মেয়েমানুষকেই বিয়ে করেছি রে!

পান্না বলে, তা কেন বউদি, বরুণদা তোমাকে কত ভালবাসে, মাথা টিপে দেয় জ্বর হলে।

দেয় কেন? মাথা টিপে না দিলে কি মরে যাব?

অত ভালবাসা তোমার বুঝি সয় না?

তোরও সইবে না। পুরুষমানুষ যদি সবসময়ে গায়ে গায়ে লেগে থাকে মেনি বেড়ালের মতো, যদি সংসারের সব ব্যাপারে নাক গলায় তা হলে কি ভাল লাগে বল? ঘেন্নায় মরে যাই ভাই, কী সুন্দর রিপু করতে পারে, উল বুনতে পারে, কুরুশকাঠিতেও দিব্যি হাত।

বলে হেসে গড়িয়ে পড়ে শেফালী বউদি।

আর মনে মনে পান্না বলে, হে ঠাকুর, আমার পুরুষমানুষটা যেন কিছুতেই বরুণদার মতো না হয়।

নয়না শিবেনদার সঙ্গে ছুঁকছুঁক করছে, পায়েল তার মাস্টারমশাই জিতু সমাদ্দারের সঙ্গে লাইন দিচ্ছে, শুধু পান্নারই গাল উঠল না। এ নয়, ও নয়, সে নয়। তার "সে" এদের কারও মতো নয়। অন্যরকম। এই

অন্যরকমটা রোজ রোজ বদলে যায়।

হীরা বলে, অত খুঁতখুঁত হলে তোর কেউ জুটবে না শেষ অবধি, দেখিস। তোর জন্য কি বর কলে তৈরি হবে? মেড টু অর্ডার?

তাও বটে।

কিন্তু এই নির্জন দুপুরে সেই আবছা পুরুষের কথা খুব মনে আসে পান্নার। তার বান্ধবীরা খুব সেক্স নিয়ে কথা বলে। পান্নার ও ব্যাপারটা ভাবতে ভাল লাগে না। শরীরের গ্যাদগ্যাদে ব্যাপারটা তো আছেই বাবা। কিন্তু ওটাই সব নয়। সে চায় ভাবের পুরুষ, শরীরের পুরুষ নয়।

ইলাবতী আর সোমেশ্বর প্রেমে পড়েছিল। ইলাবতীর পনেরো, সোমেশ্বরের কুড়ি। জানাজানি হওয়ার পর ইলাবতীকে তার মা বাবা খুব মেরেধরে বেঁধে রাখল ঘরে আর সোমেশ্বর রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মতো ঘুরতে লাগল। তারপর একদিন ফাঁক পেয়ে দুজনেই পালাল। শ্মশানের ধারে দুজনকে পাওয়া গেল পরদিন। জড়াজড়ি করে মরে পড়ে আছে।

কী যে কেঁদেছিল পান্না। হ্যাঁ, ভালবাসা হবে ওইরকম। কেমন মরে গেল দুজনে। আর তারপর দুজনেই তুচ্ছ শরীর ছেড়ে ফেলে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াত মনের আনন্দে। কত লোক তাদের দেখেছে। নদীর ধারে বা হাট মুকুন্দপুরের জঙ্গলে, নিশুত রাতে অলকেশ স্মৃতি সংঘের ফুটবল খেলার মাঠে। পান্না দেখেনি, কিন্তু পান্না তাদের ফিসফাস মধ্যরাতে কতদিন শুনেছে। স্বর নেই, শুধু শাসের শব্দে কথা। গায়ে কাঁটা দেয়।

হ্যালো! এনিবডি হিয়ার!

ঝিমঝিম দুপুরে তন্দ্রাচ্ছন্ন তন্তুজাল ছিঁড়ে সপাটে উঠে বসল পান্না। বুকটা ধক ধক করছে। মেয়ে গলায় ইংরিজি বলছে কে? এরকম তো হওয়ার কথা নয়! কণ্ঠা পর্যন্ত আতঙ্ক উঠে এল তার।

উঠোনের জানালাটা দিয়ে উকি দিতেই সে সোহাগকে দেখতে পেল। অমল রায়ের মেয়ে। খুব দেমাক, ইংরিজি ছাড়া কথাই বলে না। সন্ধ্যাদি আরও বলেছে, কলকাতায় নাকি কেলেঙ্কারি করে এসেছে। সন্ধ্যাদি পান্নাকে খুব ধরেছিল, যা না, গিয়ে ওদের ইংরিজিতে দুটো কথা শুনিয়ে দিয়ে আয়। বুঝবে আমরাও মুখ্যু নই। পান্না রাজি হয়নি। সে ইংরিজি বলবে কি, ভয়েই মরে যাবে। কথাই ফুটবে না।

অবাক হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল পান্না, কিছু বলছ?

মেয়েটার তেমন সাজগোজ নেই, পরনে একটা লম্বা ঝুলের ফ্রকমতো ম্যাদাটে পোশাক, চুল উড়োখুড়ো। তার দিকে চেয়ে বলল, সরি, আমি ভুল করে তোমাদের কোর্ট ইয়ার্ডে ঢুকে পড়েছি বোধহয়। এখানে কোনটা রাস্তা আর কোনটা নয় তা বোঝা মুশকিল। এখান দিয়ে কি রাস্তায় যাওয়া যাবে?

যাবে। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

মেয়েটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, এনি হোয়ার। নাথিং ম্যাটারস।

তুমি তো সোহাগ। অমল রায়ের মেয়ে!

হ্যাঁ। আর তুমি?

আমি পান্না চট্টোপাধ্যায়। আমাদের বাড়িতে একটু বসবে?

মেয়েটা ঠোঁট উলটে বলল, বসতে পারি, ইফ ইউ আর নট ডিস্টার্বড।

পান্না মাথা নেড়ে বলল, না না, ডিস্টার্বড হব কেন? এসো।

মেয়েটা বারান্দায় উঠে এসে পেতে রাখা কাঠের চেয়ারে বসল।

খুব সাহস হয়ে যাচ্ছে পান্নার। এই ইংরিজি বলা বিলেত ফেরত মেয়েটার সঙ্গে টক্কর দেওয়া তার কর্ম নয়। তবু কী জানি সুন্দর মেয়েটার এমন মলিন চেহারা দেখে তার মায়া হচ্ছিল।

কোথায় যাচ্ছিলে ভাই?

কোথাও না। বাড়ির বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করছিল।

এক গেলাস জল দেব? খাবে?

মেয়েটা অবাক হয়ে বলে, জল খাব কেন? আমার তেষ্টা পায়নি তো!

তুমি তো বেশ বাংলা বলতে পার। আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় বাংলা জানোই না।

মেয়েটা হাসল, বলতে পারি, পড়তে পারি, লিখতেও পারি একটু একটু।

বিদেশে যারা থাকে তাদের ওরকম হয়।

মেয়েটা একটু হাসল। হাসলে এত সুন্দর দেখায় ওকে।

দু চোখে তৃষিতের মতো মেয়েটাকে দেখে নিচ্ছিল পান্না। যেন এক পরি এসে আলগোছে বসেছে তাদের বাড়িতে। একটু পরেই উড়ে যাবে।

তোমরা কি বেড়াতে এসেছ?

মেয়েটা ভ্রূ কুঁচকে বলল, বেড়াতে! তাও বলতে পার, সর্ট অফ এ চেঞ্জ। কলকাতার পলিউশনে আমার অ্যালার্জি হয়। অ্যাজমার মতো। ডাক্তার বলেছে মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে থাকতে হবে।

কিছুদিন থাকবে তো?

না। আই হ্যাভ মাই স্টাডিজ। আজ বাবা আসবে। তারপর আমরা হয়তো ফিরে যাব।

এ-জায়গাটা তোমার ভাল লাগছে না?

ভাল, কিন্তু একটু হ্যাপহ্যাজার্ড। কোনও প্যাটার্ন নেই। আর নেই বলেই আমি ভুল করে তোমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি।

ভাগ্যিস নেই। থাকলে তোমার সঙ্গে ভাবই হত না। তুমি কিছু খাবে?

না তো! আই অ্যাম নট হাংরি।

মুখ দেখে পান্নার মনে হল মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে। মুখটা শুকনো, খিদের ছাপ আছে।

তোমরা কি ভাত ডাল খাও?

কেন খাব না? তবে আই প্রেফার চাইনিজ।

উঃ, চাইনিজ আমারও ভীষণ ভাল লাগে। কলকাতায় গেলেই আমি চাইনিজ খাই। তবে অনেকে বলে কলকাতার চাইনিজ নাকি আসল চিনে খাবার নয়।

হ্যাঁ। অন্যরকম।

আমাদের বাড়িতে অনেক রকম আচার আছে। খাবে?

মেয়েটার চোখদুটো একটু উজ্জ্বল হল। মুখে একটু হাসি। বলল, ইউ আর এ রিয়েল চার্মার।

খাবে?

মেয়েটা এক গাল হেসে ঘাড় কাত করে বলল, খাব।

তা হলে এসো, কোন আচারটা খাবে পছন্দ করে দাও।

মেয়েটা লক্ষ্মীর মতো উঠে তার সঙ্গে এল। সহবত জানে। ঘরে ঢোকার সময় চটিজোড়া বাইরে ছেড়ে রাখল।

পান্না যখন তাক থেকে আচারের বয়ম নামাচ্ছে তখন সোহাগ ঘরের চারধারটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। পান্নারা গরিব নয়। তবে ঠাঁটবাটও তেমন কিছু নেই। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরদোর।

ওয়া! সোনি টু থাউজ্যান্ড মিউজিক সিস্টেম! বিগ সাউন্ড।

পান্না একটু হাসল, হ্যাঁ, বড্ড আওয়াজ ওটার।

ক্যাসেটের কেসটা দেখতে দেখতে সোহাগ বলল, রক মিউজিক, জ্যাজ এসব তুমি শোনেনা বুঝি?

না বাবা, ওসব আমার দাদা শোনে। আমাকেও জোর করে বসিয়ে শোনায়। আগে কিছু বুঝতাম না, শুনতে শুনতে এখন একটু-আধটু বুঝতে পারি।

তোমার দাদা কোথায়?

ও তো কলকাতায়। যাদবপুরে ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং পড়ে। আচ্ছা, আচার খেলে তোমার আবার অ্যাজমা বাড়বে না তো?

না। আমার অ্যালার্জিটা পলিউশন থেকে হয়। ডাস্ট, স্মোক এইসব থেকে।

পাঁচরকম আচার প্লেটে সাজিয়ে দিয়ে পান্না ভাবল এই ফুলপরিকে আর কী দেওয়া যায়। তার আরও কিছু সাজিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে যে!

এই সোহাগ, তুমি শুধু আচার কী করে খাবে?

সোহাগ অবাক হয়ে বলল, আচারটাই তো খাবার।

পান্তাভাত আছে। খাবে?

সোহাগ হেসে ফেলল, তুমি ভারী সুইট মেয়ে তো!

খেয়েছ কখনও? লেবুপাতা দিয়ে মেখে খেতে বেশ লাগে। খাও না।

সোহাগ লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘাড় কাত করে বলল, দাও।

পান্না এক ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে পান্তাভাত একটা চিনেমাটির বাটিতে করে নিয়ে এল। সঙ্গে লেবুপাতা, নুন।

মাখতে পারবে? না মেখে দেব?

মৃদু হেসে সোহাগ বলে, তুমিই মেখে দাও।

ঘেন্না পেও না কিন্তু। আমার হাত পরিষ্কার। তবু সাবান দিয়ে ধুয়ে আসছি।

যখন সোহাগ খাচ্ছিল তখন খাওয়ার ধরন থেকে তার খিদেটা বুঝতে পারল পান্না। সামান্য পান্তাভাত কত যত্ন করে খাচ্ছে।

একটা ডিম ভেজে দেব তোমাকে? এক মিনিট লাগবে।

সোহাগ মিষ্টি করে হেসে বলে, এর সঙ্গে ডিম ম্যাচ করবে না। ইটস ভেরি টেস্টফুল। তোমার হাতের গুণ আছে।

আমার হাতের কোনও গুণ নেই। পান্তাভাত দিতে হল বলে লজ্জা করছে।

কেন, লজ্জা কীসের? আমরা বিদেশেও পান্তাভাত খেয়েছি। বাবা খুব ভালবাসে কি না। আচ্ছা, তোমার বাড়ির লোকেরা সব কোথায় বললা তো! কাউকে দেখছি না।

আমার জ্যাঠামশাই গৌরহরি চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন তো, আজই তাঁর শ্রাদ্ধ। সব সেই বাড়িতে।

ইউ মিন পারুলের বাড়ি!

অবাক হয়ে পান্না বলে, তুমি চেনো নাকি?

সোহাগ একটু হাসল, চিনি। শি লুকস লাইক এ গডেস।

হ্যাঁ। আমাদের বংশে ওরকম সুন্দরী আর কেউ নেই। তারপর একটু লজ্জা-লজ্জা মুখ করে রাঙা হয়ে পান্না বলে, জান তো একসময়ে তোমার বাবার সঙ্গে পারুলদির বিয়ে হওয়ারও কথা হয়েছিল। সেসব অবশ্য আমার জন্মেরও আগেকার ঘটনা। বিয়েটা হলে আজ তুমি আমার বোনঝি হতে, জানো? আমি হতুম তোমার মাসি।

খুব হাসল সোহাগ, মাসি? তোমার বয়স কত বলো তো!

সতেরো চলছে।

সতেরো প্লাস?

না, যোলো প্লাস।

আমার সতেরো প্লাস। তোমার চেয়ে আমি বড়। ভেরি ইয়ং মাসি।

ভারী ভালই তো মেয়েটা। একটুও তো দেমাক দেখাচ্ছে না। সন্ধ্যাদিটা যে কী আজেবাজে বলে! তবে মেয়েটার এঁটোকাঁটার বিচার নেই। ভাত খেতে খেতে কতবার যে চুলে হাত দিয়ে পাট করল, কোলের ওপর বাটিটা রাখল। তা হোক, ওরা কি অত সব শিখেছে তাদের মতো?

মাঝে মাঝে একটু উদাস হয়ে যায় মেয়েটা। মুখে একটা বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে। ভাত খেয়ে মেয়েটা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে কুলুঙ্গিতে গণেশের মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তার দিকে চেয়ে বলল, দে ওয়্যার ইন লাভ, বাট দে ডিড নট ওয়েড। পারুলের মেয়ে হলে আমি অন্যরকম হতাম। তাই না? কী অদ্ভুত!

পান্না কথাটা ভাল বুঝতে পারল না। আবছা মনে হল, পারুলের মেয়ে হয়ে জন্মায়নি বলে ওর একটু বুঝি দুঃখ আছে।

মেয়েটা ফের যেন, পান্নাকে নয়, আকাশ বাতাসকে বলল, ইউ ক্যান্ট চুজ ইওর পেরেন্টস। ক্যান ইউ?

এ কথাটাও পান্না বুঝল না। মেয়েটার মনে বোধহয় একটা কষ্ট আছে। কিন্তু পান্না কী বলবে! মুখখানা হাসি-হাসি করে বসে রইল, যদিও কথাটা মোটেই হাসির নয়।

বাটিটা রেখে মেয়েটা উঠল। বলল, থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং।

আবার আসবে না?

হাসি মুখে সোহাগ বলে, আসব। ইউ আর সিম্পলি চার্মিং। তুমিও চলে আসতে পার। তবে ইউ মে নট লাইক আওয়ার লট। আমরা একটা আনহ্যাপি ফ্যামিলি।

পান্না জানে, এখন কৌতূহল প্রকাশ করা উচিত নয়। তাই সে বলল, তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

থ্যাংক ইউ।

তোমাকে পথ দেখিয়ে দেব? নইলে ফের রাস্তা গুলিয়ে ফেলে অন্য কারও উঠোনে গিয়ে উঠবে হয়তো।

সোহাগ হেসে ফেলল, না না, পারব।

মানুষ চলে গেলেও তার একটা রেশ থেকে যায়। কিছুক্ষণ রেশটা বাতাসে অনুভব করল পান্না। দু-একটা কথা যেন গুনগুন করে উড়ে বেড়াতে লাগল তার চারপাশে।

কালো কলকা পাড়ের সাদা খোলের শাড়িটা পরে নিতে নিতে সে দেয়ালঘড়ির দিকে চাইল। একটা পাঁচ। আজ মায়ের বকুনি খেতে হবে। বড্ড দেরি করে ফেলেছে সে।

ফুল ফুটলেই যেমন মৌমাছি এসে জোটে তেমনই যেন পারুলদিকে ঘিরে মেয়েপুরুষের একটা ছোট্ট ভিড়। একে সুন্দরী তায় বড়লোকের বউ। বাবার কাছে শুনেছে ওদের নাকি বছরে দশ বারো কোটি টাকার টার্নওভার। টার্নওভার কথাটার মানেই জানে না পান্না। ব্যবসাবাণিজ্যের কথা সে কী বুঝবে? তবে ওদের যে অনেক টাকা সেটা আঁচ করতে পারে।

এই, কাছে আয় তো! বাঃ, দিব্যি মিষ্টি হয়েছিস তো দেখতে!

যাঃ, তোমার কাছে আমি! কী যে বলো!

বেশি সুন্দরী হওয়া কি ভাল? এরকমই ভাল। রোগা কেন রে!

পান্না লজ্জা পেয়ে বলে, এমনি। আমার গায়ে মাংস লাগতেই চায় না।

শেষবার যখন তোকে দেখেছিলুম তখনও ফ্রক পরতিস।

এখনও পরি।

পরিস? তোর মতো বয়সে আমিও পরতুম। কিছুতেই বড় হতে ইচ্ছে হত না। কিন্তু বয়স কি আটকানো যায় বল! চোরাপথে ঠিক বয়স বেড়ে যায়।

কিন্তু পারুলদি, তোমার তো একটুও বয়স বাড়েনি।

তোর চেয়ে আমি কুড়ি বছরের বড় তা জানিস? তুই যদি যুবতী তো আমি থুত্থুড়ি।

হি হি করে হেসে ফেলে পান্না। কী মিষ্টি গন্ধ আসছে পারুলদির গা থেকে। আজ সাজেনি একদম, তবু চারদিকে যেন রূপের ঢেউ ভেঙে পড়ছে। চারদিকে মুগ্ধ দৃষ্টির ভিড়।

পান্না সরে এল। এটুকুই ভাল। এর চেয়ে বেশি ভাল নয়। পারুলদি ঈশ্বরীর মতো। সাঁইত্রিশেও ব্যালেরিনার মতো শরীর, গজদন্তের মতো রং, ভগবানের অনেক পরিশ্রমে তৈরি মুখের ওই কারুকার্য। এত সুন্দরীর নাকি সুখী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কপাল। স্বামীর সোহাগ যে মেয়েদের মুখে ফুটে থাকে। তাকে কি লুকোনো যায়। দূর থেকে ওই সোহাগের আলো স্পষ্ট দেখতে পেল পান্না পারুলের মুখে। ওর মেয়ে হয়ে জন্মায়নি বলে সোহাগের কি খুব দুঃখ?

বড় জ্যাঠামশাইয়ের আত্মা আজ প্রেতলোক ছেড়ে দেবলোকে চলে গেল। ভিড়ে ভিড়াক্কার মণ্ডপ। লুচি ভাজার গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল পান্নার।

এই, তুই কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ! খুঁজে খুঁজে মরছি।

এক দঙ্গল মেয়ে ধেয়ে এল। পনেরো যোলো সতেরো আঠেরোর পায়েল, নয়না, ঝুমুর, রুমকি, পুকু। তারপর হা-হা, হু-হু, হি-হি। দমকা বাতাসে মনের সব ধুলোময়লা উড়ে গেল। তারপর একসঙ্গে বসে খাওয়া আর খেতে না পারা।

তারও পর একসময় নির্জন আর একা হয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যা নামে। শাঁখ বাজে। প্রেতলোকের অন্ধকার থেকে ধোঁয়াটে ভূতেরা নেমে এসে ঝুলে থাকে একটু ওপরে। তখন কান্না পায়। তখন রোজ মরতে ইচ্ছে করে।

তখনই মন কু-ডাক ডাকতে থাকে, গায়ে আগুন, না গলায় দড়ি? গলায় দড়ি, না গায়ে আগুন?

দশ দিন গান-টান গাওয়া নিষেধ ছিল অশৌচ বলে। আজ হারমোনিয়াম নিয়ে বসল একটু। অমনি মা এসে হাজির।

এখন আবার হারমোনিয়ম নিয়ে বসলি কেন? সামনে পরীক্ষা না?

মনটা খারাপ লাগছে মা।

রোজই মন খারাপ, রোজই শরীর খারাপ, এ কেমনধারা কথা? গতর বসিয়ে রাখলে যে শুঁয়োপোকা ধরবেই।

মা তাকে দু চোখে দেখতে পারে না। মা সবচেয়ে বেশি ভালবাসে দাদাকে, তারপর হীরাকে। পান্না তার দু চোখের বিষ, যেন সৎ মেয়ে। আজ কেন যে কান্না পেল খুব। হারমোনিয়াম তুলে রেখে পড়ার টেবিলে বসে সে বই খুলে চেয়ে চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগল। মরবে, সে একদিন মরে সবাইকে ঠিক এইরকম কাঁদিয়ে ছাড়বে।

কান্না থেকে ঢুলুনি, দুলুনি থেকে ঘুম।

মাস ছয়েক আগে এরকমই এক সন্ধেবেলা সাঁঝঘুম থেকে তাকে ঠেলে তুলেছিল মা। বকাঝকা নয়, বরং খুব আহ্লাদের গলায় বলেছিল, ওরে ওঠ, ওঠ, দেখ কারা এসেছে।

অবাক হয়ে বলল, কারা এসেছে মা?

ওরে তারা মস্ত মানুষ, বিরাট গাড়ি নিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি চোখে মুখে জল দিয়ে আয় দেখি।

কিচ্ছু বুঝতে পারেনি সে। চোখে জল দিয়ে আসতেই মা বলল, ওই শাড়ি বের করে রেখেছি। চুল-টুল আঁচড়ে একটা টিপ পরো, শাড়িটা ঠিকমতো পরবে কিন্তু, কুঁচি-টুচিগুলো লক্ষ রেখো। মুখে একটু পাউডার দিয়ে নিয়ে বাইরের ঘরে এসো। হড়বড়িয়ে এসো না, ধীরে সুস্থে।

কিছু বুঝতে পারেনি পান্না। ঘুমচোখে সাজতে কারও ভাল লাগে।

হীরা এসে উত্তেজিত চোখমুখে বলল, ইস, কী বিরাট গাড়ি রে দিদি, একেবারে ঝকমক করছে। উর্দিপরা ড্রাইভার।

ওরা কারা?

তোকে দেখতে এসেছে।

দেখতে এসেছে! দেখতে এসেছে কেন?

এ মা, তোর বিয়ের কথা হচ্ছে না?

মাথায় বজ্রাঘাত হলে বোধহয় এরকমই অবশ হয়ে যায় মানুষ। ছয় মাস আগে যে সবে যোলো পেরিয়েছে, এর মধ্যেই বিয়ে? সে বিছানায় বসে পড়ে খাটের বাজুতে মাথা রেখে ঝিম ধরে রইল। বুকে ধড়ফড়ানি তো ছিলই, তার ওপর বমি-বমি ভাব হতে লাগল। তখনও মনে হয়েছিল, মরি।

কী সুন্দর সুন্দর সব চেহারা ওদের। ফর্সা টকটক করছে। গিন্নিমার গা ভর্তি গয়না। সেজে আয় না একটু।

একটুও নড়েনি পান্না। ঝিম ধরে বসেই ছিল। মাথা ঘুরছিল তখন।

মা এসে বলল, এ কী! শরীর খারাপ করল নাকি? সর্বনাশ। ওঁরা যে বেশিক্ষণ বসবেন না। ওঠ ওঠ, লক্ষ্মী মা আমার। অমন করতে নেই। ব্যস্ত মানুষ ওঁরা, সময় করতে পারেন না বলে অসময়ে এসেছেন। এই রাতেই

ফের বর্ধমানে ফিরে যাবেন। উঠে পড় মা।

কেমন বোধহীন, যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো সে উঠল, সাজল এবং বৈঠকখানায় গেল।

বৈঠকখানা আলো করেই কর্তা-গিন্নি, দুজন যুবক যুবতী এবং একজন বয়স্ক মানুষ বসা। চা খাবার দেওয়া হয়েছিল, ছোঁয়ওনি। তবে তাকে দেখেছিল ড্যাব ড্যাব করে।

বাবা বলে উঠল, গান জানে, লেখাপড়াতেও ভাল।

কর্তা বোধহয় তার নাম জিজ্ঞেস করেছিল, গিন্নি জিজ্ঞেস করেছিল তার বয়স কত। খালি গলায় একটা গানও শোনাতে হয়েছিল, মনে আছে। অমন শুকনো গলায় প্রাণান্তকর গান সে জীবনে গায়নি।

তারা বাবাকে জানিয়ে গিয়েছিল, এই মেয়ে তাদের খুব পছন্দ হয়েছে। এখন কোষ্ঠী মিললেই হয়।

বাবার সেই রাত্রে কী আস্ফালন, বড়দা ভেবেছে তার মেয়ের মতো পাত্র আর কারও জুটবে না? অ্যাঁ! এই যে পাত্রপক্ষ দেখে গেল এরা দশটা জ্যোতিপ্রকাশ গাঙ্গুলিকে কিনতে পারে।

কিছুদিন বাবাকে ওই পাগলামি পেয়ে বসেছিল। গৌরহরি চাটুজ্যে দুই ভাইকে টাকা দিয়ে পৈতৃক বাড়ির দুটো অংশ কিনে নেন। সেখানে কোনও গোলমাল ছিল না। দুই ভাই নরহরি আর রামহরি কাছাকাছি নিজেদের বাড়ি করে ফেলেছিল। গোলমাল বেঁধেছিল জিনিসপত্র, বাসন-কোসন এবং গয়নাগাঁটি ভাগাভাগি নিয়ে। গৌরহরি চাটুজ্জে তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী এবং প্রবল ব্যক্তিত্বওলা লোক। তার ওপর দুঁদে উকিল। মামলা মোকদ্দমা না হলেও সালিশির বিচারে দুই ভাই হেরে গেল। রামহরির সেই থেকে হঠাৎ হীনম্মন্যতা দেখা দেয়। তার হঠাৎ মনে হয়েছিল বড়দা যেন বড় উঁচুতে উঠে গেছে। এর একটা বিহিত করতেই হবে। নানাভাবে রামহরি গৌরহরিকে টপকানোর একটা অক্ষম চেষ্টা করেছিল কিছুদিন। তার মধ্যে একটা ছিল বড়লোক হওয়ার চেষ্টা। লটারির টিকিট কেনা, পলিটিক্সে নাম, ঠিকাদারি, পতিত জমি কিনে চাষ আবাদ। তাতে রামহরি কোনওটায় সফল, কোনওটায় বিফল হলেও গৌরহরিকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। গৌরহরির মেয়ের বিয়েটাও তার চক্ষুশূল হয়েছিল। জামাই ছোটখাটো শিল্পপতিই শুধু নয়, অতিশয় সজ্জনও। রামহরি জামাই-ধরা প্রতিযোগিতায় বড়দাকে হারিয়ে দিতে কিছুদিন মরিয়া হয়ে নাবালিকা মেয়ের জন্য বড় বড় পাত্র ধরতে লেগে গিয়েছিল।

ভাগ্যিস এই পাগলামি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। হলে এতদিনে পান্না কোনও বড়লোকের বাড়ির বউ হয়ে নির্বাসনে যেত। কে জানে বাবা। জীবনের রহস্যময় নানা আনন্দের শিহরন কোথায় হারিয়ে যেত। একদিন বিবেচক গৌরহরিই এসে রামহরিকে ঠান্ডা মাথায় কথা বলে শান্ত করলেন। বললেন, ভাগজোখ যদি তোর অন্যায্য বলেই মনে হয়ে থাকে তবে আমাকে এসে বলিস না কেন? যা চাস পাবি। পরিবারটাকে বিপদে ফেলিস না।

ভাব হয়ে যাওয়ায় তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল।

এই মুখপুড়ি, সন্ধেবেলায় ঘুমুচ্ছিস যে!

মুখে জোরালো টর্চের আলো পড়তেই ধড়মড় করে উঠে বসে পান্না।

ও মা! পারুলদি!

কাল চলে যাচ্ছি, তাই দেখা করতে এলাম।

এ সময়ে ভোল্টেজ কম থাকে বলে ঘরের টিমটিমে আলোয় ভাল করে কিছু দেখাই যায় না। তবু এই ম্লান আলোতেও যেন জ্যোতির্ময়ীর মতো দেখাচ্ছে পারুলদিকে।

তুমি যে কী করে এত সুন্দর থাকো কিছুতেই বুঝতে পারি না।

দুর বোকা, সুন্দর আর কোথায়! মা বলছিল রং নাকি অনেক কালো হয়ে গেছে। বয়সও কি কম হল? সাঁইত্রিশ। ও বাবা, সাঁইত্রিশ মানে তো বুড়ি।

তোমার একটুও বয়স হয়নি পারুলদি।

হয়েছে হয়েছে। অনেক কষ্ট করে ফিট রাখতে হয়। এক চুল এদিক ওদিক হলেই ওজন চট করে বেড়ে যেতে চায় আজকাল।

একটা মেয়ের সঙ্গে আজ ভাব হল, জানো! তার নাকি খুব ইচ্ছে ছিল তোমার মেয়ে হয়ে জন্মায়।

পারুল অবাক হয়ে বলে, সে কী রে! কে সেই মেয়েটা?

অমলদার মেয়ে সোহাগ।

পারুল একটু গম্ভীর হয়ে বলে, মেয়েটি এঁচোড়ে পাকা। ওর সঙ্গে বেশি মিশিস না।

মিশব কী? আজ পথ ভুল করে এসে পড়েছিল বলে আলাপ হয়ে গেল। অমলদা আজ আসবে, কালপরশুই চলে যাবে ওরা।

অমল রায় আসেনি। ওদের মধ্যে একটু গণ্ডগোল চলছে বোধহয়। তুই বেশি মাখামাখি করতে যাস না। ওরা অন্যরকম। মাথা গুলিয়ে দেবে।

কিন্তু পারুলদি, মেয়েটাকে যে আমার ভীষণ ভাল লাগল। সে বলছিল, তুমি নাকি একজন গডেস।

পারুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, গডেস হওয়া কি অত সোজা? মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে কত পাপ চারদিক থেকে ফণা তোলে। গডেস হয়ে থাকতে দেয় কই?

একটু আনমনা হয়ে গেল পারুলদি। হাতের বড় টর্চটা কয়েকবার ছেলেমানুষের মতো জ্বালাল, নেবাল।

তোর কত বয়স হল রে পান্না?

সতেরো।

সতেরো! বলে একটু ভাবল পারুলদি। ওই সতেরো শব্দটাই যেন পারুলদিকে একটু দূরে নিয়ে গেল। বোধহয় সতেরোয় ফিরে যাচ্ছিল সে।

তখনও জন্মায়নি পান্না। কুড়ি বছর আগে পারুলদির সঙ্গে প্রেম হয়েছিল অমল রায়ের। কীরকম প্রেম ছিল ওদের কে জানে। বিয়ে হয়নি। তাতে ভালই হয়েছে। বিয়ে হলে হয়তো প্রেমটা গ্যাদগ্যাদে হয়ে যেত।

তার খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, পারুলদি এখনও অমল রায়ের কথা ভেবে মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিনা। ট্র্যাজেডি বড় ভাল লাগে পান্নার। ট্র্যাজেডির মতো এমন রোমহর্ষ আর কীসে আছে?

চার

মাঘ মাসের রাত দশটায় হঠাৎ বাই চাপল রুইমাছের কালিয়া খাব। খাবেন তত খাবেনই। হ্যারিকেন নিয়ে বড় ছেলে গৌরাঙ্গ আর চাকর শিবু গিয়ে পুকুরে জাল ফেলল। উঠল দশসেরী পেল্লায় এক রুই। কেটেকুটে রান্না করতে করতে রাত বারোটা। তৃপ্তি করে খেয়ে উঠে গৌরহরি গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কালিয়া খেতে চেয়েছিলেন, খাওয়া হয়েছে, ব্যাস আর কী। ওদিকে বাড়ির গিন্নিকে ওই রাতে পাহাড়প্রমাণ সেই মাছ সাঁতলাতে হল। পেটের খিদে পেটেই মরে গেল। যখন এক গেলাস জল খেয়ে শুতে গেলেন তখন ভোর হতে আর বাকি নেই। পরদিন সেই বিপুল মাছ পাড়াপ্রতিবেশীদের বিলি করা হয়েছিল, মাছের সঙ্গে সঙ্গে কালিয়ার গল্পও বিলি হল। বৃত্তান্ত শুনে এসে হাজির হয়েছিল মহিম রায়।

এসব কী হরিদা, বাড়ির পাঁচজনের সুখসুবিধের কথা যে একটুও ভাবেন না। এ কি ভাল?

গৌরহরি অতীব সুপুরুষ, গৌরবর্ণ, লম্বাচওড়া হাড়েমাসে চেহারা। মুখে একটু বিদ্রূপের হাসি, তুই খুব ভাবিস বুঝি? সেইজন্যই তোকে কেউ মানে না।

কথাটা পাথুরে সত্যি। একটা লোক কীভাবে আধিপত্য করে, কোন মন্ত্রবলে মান্যগণ্য হয়ে ওঠে এ তত্ত্বটা আজও বোঝা হল না মহিমের।

একটা মামলার রায় বেরোল বিকেলে। সতেরো জন ফৌজদারি মামলার আসামি। খালাস হতে হতে সন্ধে পেরিয়ে গেল যখন, তখন আর তাদের বাড়ি ফেরার বাস নেই। ট্যাঁকেও নেই পয়সা। গৌরহরি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বর্ধমান থেকে তাদের সোজা নিজের বাড়িতে এনে তুললেন। সতেরোটা উপোসি ষণ্ডামার্কা গেঁয়ো লোক। এমনিতেই তারা ভাতের পাহাড় এক চোপাটে উড়িয়ে দেয়। সেদিন তারা দুনো খিদে নিয়ে যে পরিমাণ ভাত খেল তা টিকিট কেটে দেখার মতো দৃশ্য। সতেরোটা মুখের ভাত ডাল জোগাতে বাড়ির গিন্নির কী হাল হল তা ফিরেও দেখেননি গৌরহরি। ওটা দেখা যেন তার কাজ বা কর্তব্য নয়।

তিন ভাইয়ের পৈতৃক বাড়ি। দালানকোঠা জমি নিয়ে বিরাট সম্পত্তি। হঠাৎ গৌরহরির খেয়াল হল দুই ভাইয়ের অংশ কিনে নিতে হবে। প্রস্তাব উঠতেই রামহরি আর নরহরি গাঁইগুঁই করতে লাগল। পৈতৃক ভিটে ছাড়বে না। গৌরহরি তখন দাম বাড়াতে লাগলেন। শেষমেশ সেই দাম এত অবিশ্বাস্য রকমের উঁচুতে তুলে দিলেন যা দিয়ে গোটা বাড়িটাই দুবার কেনা যায়। তখন আর ভাইরা আপত্তি করল না, আপত্তি করাটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু আপত্তি তুলতে পারত বাড়ির লোকেরাই। দুই উপযুক্ত ছেলে, গিন্নি। তারা বুঝিয়ে বলতে পারত, এরকম আকাশছোঁয়া দাম দিয়ে দুটো অংশ কেনা আহাম্মকি হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কেউ শ্বাসটুকুও ফেলেনি।

কিন্তু মহিম রায় বলেছিল, দাদা, এ যে হাতির দামে নেংটি ইঁদুর কেনা হল!

গৌরহরির প্রতিক্রিয়া হল সামান্যই। ভূ দুটো একটু উঁচুতে তুলে বললেন, দামের তুই জানিস কী? সারা জীবন চার আনা আট আনার হিসেব কষে মরলি, দাম কাকে বলে তা শিখলি কই?

মহিম আর পারেনি। বলে ফেলেছিল, আপনি যেন শরৎ চাটুজ্জের নবেলের ক্যারেক্টার, রক্তমাংসের মানুষ নন।

গৌরহরির ঠোঁটে বাঁকা বিদ্রূপের হাসিটি বদলাল না। ঠান্ডা গলায় বললেন, তুই বড্ড গেরস্ত। অত গেরস্ত হোস না, কষ্ট পাবি।

যে সুরে চাকর-বাকরকে হুকুম করতেন সেই একই সুরে নিজের দুই ছেলেকেও হুকুম করতেন। ছেলে দুটো দিশেহারা হয়ে বাপের হুকুম তামিল করতে ছুটত। ফুলের মতো সুন্দর দুটো মেয়েও কদাচিৎ আসকারা পেত তাঁর কাছে। ছেলেপুলেদের নাড়াঘাঁটাও করতেন না বড় একটা।

সেই মেজাজি, অহংকারী, দাপুটে এবং খানিকটা আত্মসর্বস্ব ও অত্যাচারী পুরুষটি যখন মারা যাচ্ছিলেন তখন মহিম রায় সেখানে আগাগোড়া উপস্থিত। ডাক্তার নাড়ি দেখছেন, আর পুরো পরিবারটা একাগ্র হয়ে ঝুঁকে আছে তাঁর ওপর। চোখ পলকহীন। শ্বাস পড়ছে না কারও। শিয়রে পাথরপ্রতিমার মতো বউঠান। ডাক্তারের একটা নেতিবাচক মাথা নাড়ার পরই একটা দীর্ঘ হাহাকারে ভরা আর্তনাদ করে বউঠান অজ্ঞান হয়ে সোজা মেঝেতে পড়ে গেলেন। দুই ছেলে আছড়ে পড়ল বাবার বুকে। দুটি পুত্রবধূ দুই পা আঁকড়ে ধরে সে কী কান্না!

সারাটা জীবন যে পরিবারটিকে নাজেহাল করে ছেড়েছেন গৌরহরি, যাঁর মর্জি সামলাতে পরিবারের লোকজনকে ধিন ধা নাচতে হয়েছে, তাঁর মৃত্যুতে তো পরিবারটার হাঁফ ছাড়ার কথা। কিন্তু সেরকম হল না তো! বরং মনে হল, গৌরহরির সঙ্গে সঙ্গে যেন এ বাড়ির সূর্যাস্ত হয়ে গেল।

জ্ঞান ফেরার পর বউঠান কেবল বলছিলেন, আমি ওঁর সঙ্গে যাব, কিছুতেই আমি আর বেঁচে থাকতে পারব না।

মহিম রায় মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখছিল, মুগ্ধ কানে শুনছিল। এ সে শুনছে কী? একজন স্বাধিকারপ্রমত্ত অত্যাচারী স্বামীর নির্যাতিতা স্ত্রী বলছে এ কথা? এও কি সম্ভব?

মেলে না, মেলে না, হিসেব কিছু মিলতে চায় না। এই ঊনআশি বছর বয়সে জীবনের অঙ্কে ভুল ধরা পড়ে সে যেন মনে মনে কানমলা খায়। হরিদার কাছে সে অনেক ব্যাপারেই হেরে-যাওয়া মানুষ, কিন্তু মরার ভিতর দিয়ে সেই পরাজয়ের বিপুলতা যেন আরও উদঘাটিত করে দিয়ে গেছে লোকটা।

যে ছেলেটিকে বাপের খেয়াল মেটাতে মার্চ মাসের হাড়কাঁপানো শীতের রাতে পুকুরে জাল ফেলে মাছ তুলতে হয়েছিল, ফিজিক্সের কৃতী অধ্যাপক সেই ছেলে ঝান্টু বাপের বুক থেকে হঠাৎ মুখ তুলে ছোট ভাইকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠল, এই মন্টু, দেখ দেখ, বাবার বুকে যেন হার্টবিট পাচ্ছি! কেমন শব্দ হচ্ছে বুকের মধ্যে। বাবা নিশ্চয়ই মরেনি! ফকিরবাবার জল-পড়া খাইয়েছি, মরতে পারেই না।

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ছোট ছেলে মন্টু ভ্যাবলার মতো বাবার বুকে কান পেতে কী শুনছিল কে জানে। কিন্তু মহিমের মনে হচ্ছিল, ফকিরবাবার জল-পড়ার গুণ নয় বাবারা, বেঁচে উঠলে হরিদা তোমাদের পিতৃভক্তির জোরেই বেঁচে উঠত। ঘোর কলিকাল বাবারা, নইলে এত ভালবাসা বৃথা যেত না।

দুটি ছেলে সারাজীবন বাপের সঙ্গে কথা বলার সময় দাঁড়িয়ে কথা বলেছে, কখনও বসেনি। বউমারা এই আধুনিক যুগের মেয়ে হয়েও শশুরের সামনে ঘোমটা ছাড়া আসেনি। শোকের বাড়ি যখন মুহ্যমান, চারদিকে কান্নার রোল, তখন মহিম মৃতের ঘরে আনন্দে অভিভূত হয়ে বসে আছে। তার চারদিকে যেন সত্যযুগের হাওয়া বইছে।

শরীর ভাল নয়, সবাই বারণও করেছিল, তবু মহিম রায় গৌরহরির মৃতদেহের অনুগমন করেছিল। তখন গভীর রাত, তিন মাইল রাস্তা ভেঙে যেতে যেতে মনে মনে বলেছিল, কায়দাটা শিখিয়ে দিয়ে গেলেন না হরিদা! বহুকাল ধরে চেলাগিরি করলুম তবু শিখতে পারলুম কই? না কি এসব শেখার বা শেখাবার জিনিসই নয়, এসব কেউ কেউ নিয়ে আসে!

না, মহিম রায় কখনও গৌরহরি চাটুজ্জের মতো ছিল না। সে বরাবর তার পরিবারের প্রতি অত্যধিক স্নেহশীল। পাঁচজনের দুঃখকষ্টের কথা ভেবে সর্বদাই নিজেকে আরাম আয়েস থেকে গুটিয়ে রেখেছে, এক গেলাস জল কাউকে গড়িয়ে দিতে বলতেও ছিল ভারী কুণ্ঠা। ছেলেদের সঙ্গে এক সারিতে খেতে বসেছে, বড় মাছের টুকরোগুলো ছেলেদের পাতেই দিয়েছে দেবিকা—তার বউ। কখনও তাতে কিছু মনে করেনি মহিম। ভুলটাও কি সেখানেই? তখন থেকেই কি সংসারে সে উদ্বৃত্তের খাতে?

যখন মেজো ছেলে অমল ক্লাসে কাঁড়ি কাঁড়ি নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হওয়া শুরু করল তখন হল আরও চিত্তির। প্রথমে আনন্দ এবং বিস্ময়। পুত্রগৌরবে বুক তিন ইঞ্চি বেড়ে গেল। মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করে যখন সেই ছেলে হইচই ফেলে দিল তখন এল ভয়। ছেলেকে সেই থেকে সমীহ করতে শুরু করেছিল সে। বাপকে কোনওদিনই ছেলেরা সমীহ করত না। অমলের তাচ্ছিল্যটা ছিল আরও প্রকট। কৃতী ছেলেদের বোধহয় সেই অধিকার জন্মায়—এই ভেবে মহিম মেনেও নিল ব্যাপারটা। দেবিকা মাঝে মাঝেই বলত, অমল! অমল তো মানুষ নয়, ভগবান।

জিন থেকেই সব হয়-টয় বলে শুনেছে মহিম। বংশধারার কোন গাঁটে কোন জিন যে ঘাপটি মেরে থাকে আর তা থেকে কী করে যে এক একজন এরকম দলছুট জন্মায় কে জানে! নইলে তার মতো অ্যাভারেজ সাদামাটা মানুষের ঘরে অন্য সব সাদামাটা ছেলেমেয়ের মধ্যে একটা কী করে অমন মাথাওলা বেরোল!

ঠোঁটকাটা, বদরসিক রসময় একবার বলেছিল, ওরে, এ যে কাকের ঘরে কোকিলের ছা। তোর হাতে আর কেউ তামাক খেয়ে গেল না তো!

এ কথায় প্রায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। ঠাট্টাই হবে, তবু অমন ঠাট্টা কেউ করে? আজ অবশ্য কথাটা ভাবলে রাগ হয় না। অমল কি সত্যিই তার ছেলে? সে কি ওর নির্মাতা? ওর চোখ, কান, মুখ, মন, মেধা এসব তো মহিমের তৈরি নয় হে বাপু। সে জন্মদাতা হতে পারে, সৃষ্টিকর্তা তো নয়।

অমলের সঙ্গে ভাবভালবাসা হয়েছিল গৌরহবিদার ছোট মেয়ে পারুলের। সেটা মহিমের কাছে আনন্দের ব্যাপারই ছিল। হরিদার সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক তার আকাঙ্ক্ষারই বস্তু! তা ছাড়া ও-বংশের মেয়ে ভালই হওয়ার কথা। যে মেয়ে নিজের বাবার সেবা করে বড় হয়েছে সে স্বামীর ঘরে এসেও সবাইকেই সুখী করে।

কিন্তু আচমকাই পারুলের অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

মহিম রায় দৌড়ে গিয়েছিল গৌরহরির কাছে।

হরিদা, এ কী শুনছি!

গৌরহরি বৈঠকখানায় বসে দলিলপত্র দেখছিলেন। তলচক্ষুতে তাকে একটু দেখে নিয়ে বললেন, কখনও প্রেমে-ট্রেমে পড়েছিস?

আমি! কী যে বলেন! আমাদের সুযোগ ছিল কোথায়?

তাহলে বুঝবি কী করে? ও-বস্তু আমারও তো হয়নি। পঁচিশ বছর বয়সে একটা দশ বছর বয়সি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল বাবা। সে প্রেম করবে কী, ভয়েই মরে। তাই বলছি এসব আমাদের বোঝবার কথা নয়।

কিন্তু ওদের যে ভালবাসা ছিল, বিয়ের কথা হয়ে আছে।

তাই তো বলছি। তুই কি ভাবছিস আমি জোর করে পারুলের বিয়ে অন্য জায়গায় দিচ্ছি? সেসব ভাবিসনি। অমল ভাল ছেলে, আমাদের সকলেরই পছন্দ। কিন্তু বিয়েটা হচ্ছে পারুলের ইচ্ছেতেই।

কেন এরকম হল হরিদা?

বললুম যে, তুই আর আমি দুজনেই পুরনো আমলের মানুষ, এসব আমাদের বোঝার কথা নয়। তবে এসব প্রেম-ট্রেম হল কাঁচা মাটির কাজ। জলে বৃষ্টিতে গলে ধুয়ে যায়। সংসারের আঁচে না পড়লে কি এসব পাকাপোক্ত হয়? ওদের প্রেম কেঁচে গেছে।

মনটা বড় দমে গেল মহিমের।

গণ্ডগোলটা কোথায় হল হরিদা?

গৌরহরি মাথা নেড়ে বলেছিলেন, সবটাই গণ্ডগোল, আগাপাশতলাই গণ্ডগোল। মন খারাপ না করে বাড়ি যা। অমলের একটা ভাল দেখে বিয়ে দে।

দেবিকা ফুঁসেছিল খুব, হুঁ, অমন সুন্দরী কত আমার অমলের পায়ে গড়াগড়ি যাবে। কত বড় ঘরের মেয়ে যেচে আসবে। দেখে নিও।

দেখা ছাড়া মহিমের কিছু করারও ছিল না। সংসারের প্রায় কোনও ব্যাপারেই তার মতামতের তোয়াক্কা কেউ করত না কখনও। পারুলের বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই অমল আর তার মায়ে মিলে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলল। সেই বিয়েতে মহিমের ভূমিকা বরকর্তার মতো ছিল না, ছিল আমন্ত্রিত একজন অতিথির মতোই। বড় ঘরেরই মেয়ে, সুন্দরীও। কিন্তু মহিমের তেমন কোনও আহ্লাদ হল না। বিয়ের পরই ছেলে-বউ উধাও হয়ে গেল বোম্বেতে। তারপর বিদেশে। মুছেই গেল জীবন থেকে। যেমনটা হয়ে থাকে।

আজ তৃষিত চোখে বসে গৌরহরিদার দুই ছেলের পিতৃতর্পণ মন দিয়ে আগাগোড়া দেখছিল মহিম। দুটো ছেলেই নিষ্ঠার সঙ্গে হবিষ্যি করেছে, ন্যাড়া হয়েছে, নাবালক দুটি অনাথের মতো বসে বাবার স্বর্গের পথ পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। প্রচুর দানসামগ্রী, বিরাট আয়োজন। কোথাও কিছু অভাব রাখেনি। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। স্বর্গের পথ পরিষ্কার না হোক এত ভালবাসার কি দাম নেই নাকি? মহিম মরলে তার ছেলেরাও হয়তো নেড়া হবে। কিন্তু হবে বিরক্তির সঙ্গে। শ্রাদ্ধও কি করবে না? করবে, তবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। মনে মনে বলবে, বাপটা মরে বড্ড ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছে।

কাকা, অমন চুপটি করে বসে আছেন যে!

চোখ তুলে চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল মহিমের। পারুল।

ক্লিষ্ট হেসে বলল, এই বসে বসে দেখছি।

ওসব আপনাকে দেখতে হবে না। বরং ঘরে এসে মায়ের সঙ্গে বসে গল্প করুন।

বুদ্ধিমতী মেয়ে। হয়তো ভেবেছে, বুড়ো মানুষের এই বসে বসে অন্যের শ্রাদ্ধ দেখাটা বোধহয় ভাল হচ্ছে না।

মহিমের চোখে জল আসছিল। বলল, মরার কথা মনে হচ্ছে না মা, ভালবাসার কথা মনে হচ্ছে। হরিদা বড় ভাগ্যবান।

না কাকা, ওসব ভাবতে হবে না। ঘরে চলুন, এখানে যজ্ঞের ধোঁয়া লাগছে আপনার। মুখটাও তো শুকিয়ে গেছে! ডাবের জল খাবেন?

না মা, ওসব দরকার নেই।

তাহলে বরং আপনাকে এক কাপ চা দিই।

হাতে চায়ের কাপ নিয়ে অভিভূতের মতো বসে রইল মহিম। এইটুকু সমাদরও যেন অনেক। অমলের সঙ্গে পারুলের বিয়েটা হয়নি বলে আজ বিশ বছর বাদে নতুন করে বুকটা ব্যথিয়ে উঠছিল তার। চায়ে চুমুক দেওয়া হল না। হাতে ধরা চায়ের কাপ ঠান্ডা হয়ে গেল, বুকের ভিতরটা হল না। একটা চাপা-পড়া আগুন বহুকাল বাদে ধীইয়ে উঠল।

সারাদিন আজ শ্রাদ্ধবাড়িতেই কেটে গেল মহিম রায়ের। গৌরহরিদা নেই, না থেকেও বাড়ির সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন। মরে যাওয়ার পরও এক একটা মানুষ বহুকাল থেকে যায়। ধ্যানে, শোকে, মনে পড়ায়, শূন্যতায় সে বারবার জয়ন্ত হয়ে ওঠে। কারও কারও মরার পরেও মরে যেতে অনেক সময় লাগে।

সন্ধের পর ফিরছিল মহিম। বেলা ছোট হয়ে গেছে, টক করে বড্ড অন্ধকার হয়ে যায়। টর্চটাও আনেনি সঙ্গে। চোখের তেমন জোর নেই আজকাল। বেগুনক্ষেতের পাশ দিয়ে মেটে রাস্তা ধরে আনমনে ধীর পায়ে হেঁটে ফিরছে মহিম। বিষণ্ণতায় সামান্য নুয়ে-পড়া শরীর।

হঠাৎ আবছা আঁধারে একটা সাদা ছায়ামতো ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এসে আবার অন্ধকারে দ্রুত মিলিয়ে গেল। থমকাল মহিম। কে ওটা? আবার সাদা ছায়ামতো কী যেন দুলে উঠল সামনে। লহমায় মিলিয়ে গেল।

কে? কে রে?

কেউ জবাব দিল না। সামনে বুক সমান ফণীমনসার আড়াল। তার ওপাশে ফটিক কাঞ্জিলালের পতিত জমি। ফটিক বাড়ি করবে বলে জমিটা কিনে ভিতপুজো অবধি করেছিল। তারপর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আমগাছে ফাঁসি দিয়ে মরে। বাড়িটা আর হয়নি। জমিটা আগাছায় ভরা। মাঝখানে অভিশপ্ত আমগাছটা ঝুপসি হয়ে দাঁড়িয়ে। সাপ-খোপের আড্ডা। লোকে অশরীরীর ভয়ও পেত আগে। ফটিক নাকি ওখানেই গেড়ে বসে আছে, জ্যান্ত লোকদের মরার জন্য ডাকাডাকি করে।

মহিমের ভূতের ভয় নেই। কিন্তু সাদাটে ছায়াটা কীসের তা বুঝতে পারল না। এ সময়ে কুয়াশা একটু হয় বটে, কিন্তু কুয়াশা তো ছুটে বেড়াবে না। চোখেরই ভুল হল কি?

মহিম রায় গুটি গুটি আরও কয়েক পা এগোল। না, চোখের ভুল নয়। ফটিকের পতিত জমিতে বাস্তবিক একটা সাদা মূর্তি দু হাত দুদিকে পাখির ডানার মতো ছড়িয়ে দিয়ে ধীরে ঘুরে ঘুরে ঢেউ হয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। শিউরে উঠল মহিম। কত ইট কাঠ পড়ে আছে জমিতে, কত আগাছার দুর্ভেদ্য জঙ্গল। সাপ-খোপ এবং হীন দংশক প্রাণীদের আড্ডা। কোনও মানুষ এই সন্ধেবেলা ওখানে যায় পাগল না হলে?

কে? কে রে ওখানে?

মূর্তিটা যে মেয়েছেলের তাতে সন্দেহ নেই। মহিম স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগল। মেয়েটা ঢেউয়ের মতো শরীর বইয়ে দিচ্ছে, নানা বিভঙ্গে হেলে যাচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে পিছনে। ঝুঁঝকো আঁধারে বোঝা যাচ্ছে গলা থেকে গোড়ালি অবধি একটা সাদা পোশাক পরে আছে মেয়েটা।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল এরকম একটা পোশাক কয়েকদিন আগে সোহাগকে পরতে দেখেছিল মহিম। পোশাকটার ওপর জরির বুটি আছে। নিজের নাতনি, কিন্তু ওর সঙ্গে ভাল করে পরিচয়ই নেই মহিমের। ওরা কথা-টথা বিশেষ বলতে চায় না কারও সঙ্গে। একটা কঠিন, নীরব দূরত্ব বজায় রাখে। কিছুদিন আগে অমল হঠাৎ একদিন এসে ওদের পৌঁছে দিয়ে গেল। বলে গেল, ওরা এখন কিছুদিন এখানেই থাকবে। মেয়ের নাকি একটু চেঞ্জ দরকার। খরচের টাকাপয়সাও দিয়ে গেল দাদা কমলের হাতে।

একটু অবাকই হয়েছিল মহিম। ওরা কস্মিনকালেও কেউ এখানে আসে না। দু মাস চার মাস পরে হয়তো কখনও অমল এসে হাজির হয়, এক বেলা থেকেই চলে যায়। হয়তো চেনা দিয়ে যায়, সৌজন্য বজায় রাখে। অমল এলেও পরিবার কখনও আনে না। তাই ওদের সঙ্গে ভাব বা ভালবাসা কিছুই হল না। আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ক্রমেই বস্তাপচা বর্জ্য ধারণা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একদিন হয়তো বাপ-ছেলের সম্পর্কও ঘুচে যাবে। যাবে কেন, যাচ্ছেও ক্রমে ক্রমে। শ্বশুর, ভাসুর, দেওর, ননদ এসব শব্দ থাকবে শুধু ডিকশনারিতে। সেটা মহিম এই জীবনেই টের পেয়ে যাচ্ছে।

বউমাটি এসে প্রথম দিন তাকে একটা প্রণাম করেছিল। খুব ভক্তিভরে নয়, পা দুটো ভাল করে ছোঁয়ওনি, একটু ভান করেছিল মাত্র। ব্যস, তারপর সেই যে আলগোছ হল, তারপর আর মুখোমুখিই হল না একই বাড়িতে থেকেও। নিজেরা নিজেরা থাকে, নিজেদের মধ্যেই ইংরিজিতে কথা কয়, ঝগড়া-টগড়ার শব্দও কানে আসে।

মহিমাদীপ্ত রায় নামে যে ছেলেটি একসময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরিজিতে এম এ পাস করেছিল তাকে আজকের মহিম রায় বলে চেনা মুশকিল। না, দুটো লোক এক নয়। মহিমাদীপ্তর দীপ্তি আর মহিমা দুটোই অস্তাচলে গেছে। এখন এই যে মহিম রায় নামে লোকটি এ এক গেঁয়ো ভিতু মানুষ, দেখলে মুখ্যু বলেই ধরে নেবে মানুষ। মুখ্যু ছাড়া আর কী? কবে দু পাতা অংবং ইংরিজি পড়েছিল তার জোরে কি আর বিদ্বান বলে পরিচয় দেওয়া যায়। লোকে ভুলে গেছে, মহিম রায় নিজেও ভুলে গেছে। কোন তোরঙ্গের অন্ধকারে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে সার্টিফিকেটখানা।

তবে ওই ডিগ্রির জোরে রেলে চাকরি পেয়েছিল মহিম রায়। শিয়ালদার ক্রু ইন চার্জ। কিন্তু বেশিদিন চাকরিটা করে উঠতে পারেনি। বদলির চাকরি, ঘুরে ঘুরে কয়েক জায়গায় বদলি হওয়ার পর শরীর খারাপ হতে লাগল, পেটে জাপ্লো আমাশা। বাবা বলল, চাকরির দরকার নেই, জোতজমি যথেষ্ট আছে, গাঁয়ের হাই স্কুলে ইংরিজির মাস্টারও দরকার। এলেই হয়।

সেই চলে আসা। কিছুদিন হাই স্কুলে ইংরিজি পড়িয়েছিল। তারপর বিদ্যাচর্চা সেই যে থেমে গেল আর চালু হয়নি।

ভুলেই গিয়েছিল সবাই, হঠাৎ বুঝি একদিন সন্ধ্যার মনে পড়ে গেল যে, তার বাবা ইংরিজিতে এম এ পাস। একদিন সন্ধেবেলা সে এসে হামলে পড়ল, ও বাবা, তুমি কী গো!

কেন, হলটা কী রে?

ওরা যে অত কটর কটর করে ইংরিজি বলে আমাদের দিনরাত জব্দ করছে, আর তুমি চুপ করে বসে আছ! তুমি না ইংরিজিতে এম এ পাস!

তাতে কী হল?

মুখের ওপর দুটো ইংরিজি কথা শুনিয়ে দিতে পারো না ওদের?

অবাক হয়ে মহিম বলল, কেন রে, ওরা ইংরিজি বলছে বলে আমি কেন ইংরিজি বলতে যাব?

কেন বলবে না শুনি? ওরাও দেখুক, আমরা ওদের চেয়ে কিছু কম নেই।

মায়াভরে একটু হেসেছিল মহিম। তার এই মেয়েটির লেখাপড়ার মাথা ছিল না। ক্লাস সিক্স অবধি উঠতেই গলদঘর্ম হয়ে ইস্তফা দিল। হয়ত সেইজন্য মনে মনে নিজেকে ছোট ভেবে কষ্ট পায়, হিংসেতে জ্বলেও হয়তো একটু।

মহিম রায় স্নিগ্ধ গলায় বলেছিল, তুই কি ভাবিস ওরা ইংরিজি শুনে জব্দ হয়ে যাবে? ব্যাপারটা তা নয় রে।

না বাবা, দিনরাত বড় অপমান লাগছে আমার। ইংরিজিতে আমাদের নিয়ে খারাপ খারাপ কথা বলে, ঠাট্টাইয়ার্কি করে। অন্তত আমরা যে ওদের কথা বুঝতে পারছি সেটা ওদের জানিয়ে দেওয়া দরকার। তাহলে সাবধান হবে, আর বলবে না। যখনই ওরা কেউ উঠোনে নেমে আসবে তখনই এই জানালা দিয়ে তুমি ওদের লক্ষ করে খুব ইংরিজি বলে দিও। দু-চারবার বললেই দেখবে কাজ হচ্ছে।

মহিম রায় কী বলবে ভেবে পেল না। মুখ্যু-সুখ্যু মেয়েটার জীবনে অনেক দুঃখ। তার ওপর এই ইংরিজি না-জানার দুঃখটা চেপে বসায় মাথাটা গরম হয়েছে। জানালা দিয়ে খামোখা ইংরিজি আউড়ে যাওয়ার হাস্যকরতা ও বুঝতেই পারছে না।

সন্ধ্যা বুঝবে না, ইংরিজি কোনও বাধা নয়। ওদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব শুধু ইংরিজিই তো রচনা করেনি। করেছে মনোভাব। সেটা সন্ধ্যা বুঝবে না।

মহিম রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

সন্ধ্যা ফিস ফিস করে বলল, অত দেমাক দেখাচ্ছে, জানো তো মেয়েটা কলকাতায় একটা কিছু কেলেঙ্কারি করে এসেছে।

কেলেঙ্কারি! কী করেছে?

কিছু একটা হবে। যখন মায়ে মেয়েতে ঝগড়া হয় তখন বুঝতে পারি।

মহিম ক্লান্ত বোধ করে। সন্ধ্যা ওদের পছন্দ করে না বলেই বানিয়ে বলছে বোধহয়। বড্ড জ্বলুনি হচ্ছে মেয়েটার। কিন্তু এসবের নিদান তো তার জানা নেই।

ঘরে বসে অবশ্য লক্ষ করে মহিম। ছেলেটা, মেয়েটা, বউমা মাঝে মাঝে আলাদা আলাদা উঠোনে নেমে আসে। জানালা দিয়ে দেখে ওদের মহিম। আপনজন বলে মনে হয় না। বহু দূরের মানুষ বলে মনে হয়। ওরা ভাল না খারাপ তা জানে না মহিম। জেনে হবেটাই বা কী? এ-ঘরে কখনও উঁকিও দেয় না তারা। একটা হ্যাগার্ড বুড়ো এক কোণে পড়ে থাকে, উকি মারার আছেটাই বা কী?

এই সন্ধেবেলা মেয়েটাকে ফটিকের পতিত জমিতে নেচে বেড়াতে দেখে প্রমাদ গুনল মহিম। সাপে কামড়ালে মরবে যে। এ সময়ে সাপ-খোপ বেরোয়।

কে রে? সোহাগ নাকি তুমি! অ্যাঁ।

কোনও জবাব নেই। নৃত্যের কোনও বিরতিও পড়ল না। যেন শুনতেই পায়নি। উপেক্ষা করছে কি?

শোনো সোহাগ, ওখানে সাপ-খোপ আছে, চলে এসো।

জবাব নেই।

কথা বলছ না কেন? আমি দাদু। ওখান থেকে চলে এসো। ও-জায়গাটা ভাল নয়। মেলা কাঁটাগাছ আছে, কাচের টুকরো আছে, ইট আছে। পড়ে যাবে যে!

মেয়েটা তেমনই বিভোর হয়ে হালকা পরির মতো ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়াতে লাগল। মহিম শুনতে পেল, মেয়েটা গুন গুন করে কী যেন বলছেও। গান কি? না, গান নয়, অনেকটা স্তোত্রের মতো কিছু। ভাল শোনা যাচ্ছে না।

মহিম ব্যাপারটার অস্বাভাবিকতা হঠাৎ টের পেল। হয়তো মাথার গণ্ডগোল আছে বা আর কিছু। এভাবে মেয়েটাকে রেখে তো চলে যাওয়া যায় না। অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। মেয়েটা নিজের বিপদ বুঝতে পারছে না। নিরস্ত্র, টর্চহীন মহিম রায় রাস্তা ছেড়ে ছোট শুখা নালাটা পার হয়ে জমিতে ঢুকল।

সোহাগ! সোহাগ! আমি দাদু। এই যে—বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ খপ করে নৃত্যপর মেয়েটার একটা হাত চেপে ধরল সে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মেয়েটা আছড়ে পড়ে গেল মাটিতে। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেল মহিম। এ আবার কী হল? মূর্ছা গেল নাকি?

হাঁটু গেড়ে পাশে বসে মেয়েটাকে একটু নাড়া দিয়ে সে ডাকছিল, সোহাগ! দিদিভাই! কী হয়েছে তোমার?

মেয়েটার গায়ে জবজব করছে ঘাম। গায়ের পোশাক ভিজে সপসপ করছে। শরীরে একটা কাঁপুনিও উঠে আসছে। হঠাৎ অস্ফুট বিড়বিড় করে স্তোত্রপাঠের মতো কী যেন বলে যেতে লাগল মেয়েটা। কিছু বোঝা গেল না।

কী করবে মহিম? ভয়ে তার শরীর হিম হয়ে গেল। এই তল্লাটে লোকজনের যাতায়াত নেই, বাড়িঘরগুলোও একটু দূরে দূরে। উলটোদিকে নির্জন আমবাগান। দৌড়ে গিয়ে তোকজন ডেকে আনা যায় বটে, কিন্তু ততক্ষণ এই নিরালায় মেয়েটা অরক্ষিত থাকবে। কাজটা ঠিক হবে না।

একা নিয়ে যেতে পারবে সে? ঊনআশি বছর বয়সের শরীরে কি আর সেই ক্ষমতা আছে? মেয়েটাও তেমন রোগাপটকা নয়। কিন্তু চেষ্টা তো করতেই হবে। কিছুতেই তো ফেলে যাওয়া যায় না।

দু হাতে পাঁজাকোলা করে যখন সোহাগকে তুলতে যাচ্ছিল মহিম তখনই হঠাৎ এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। অলৌকিক! সম্পূর্ণ অলৌকিক! যখন মেয়েটাকে প্রাণপণে তুলতে চেষ্টা করছে তখনই হঠাৎ তার নিজের ভিতরেই ঘটে গেল সেই অলৌকিক।

হঠাৎ যেমন জলভারনম্র মেঘ থেকে অঝোর বৃষ্টি নেমে আসে ঠিক তেমনই বুকের ভিতরে এক রক্তের কলরোল উঠল। সমস্ত শরীর ভেসে গেল মায়ায়। এ তো তারই প্রাণ থেকে প্রাণ পেয়ে জন্মানো মেয়ে, এ যে তারই রেতঃবাহী, শোণিতবাহী একজন! ওরা মানে না। জানে না বলে মানে না। না মানুক, আজ এই সন্ধ্যায় পরম্পরার এক সূত্রপথ উদঘাটিত করে দিল ওই অলৌকিক অনুভূতি। এ সোহাগ, এ তো সে নিজেই, মহিমাদীপ্ত রায়।

শরীর ভেঙে আসছিল মেয়েটাকে তুলতে। ঊনআশি বছরের শরীর তবু হার মানেনি। ধীরে ধীরে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে একটু টলোমলো পায়ে বন্ধুর জমিটা পা চেপে চেপে পার হয়ে মেটে পথে উঠে এল মহিম। হাঁফ ধরে যাচ্ছে, হাত ভেরে আসছে। পারবে কি?

পারত না। পথে উঠে সোহাগের এলানো শরীরটাকে একটু দাঁড় করাল সে, তারপর নিচু হয়ে ডান কাঁধে পাট-করা চাদরের মতো তুলে নিল সে। তাতে একটু সহজ হল ব্যাপারটা। কিন্তু তবু শরীর দিচ্ছে না। বহুকাল পর গায়ত্রী জপ করতে লাগল মহিম। আর কোনও মন্ত্র তো জানা নেই। গায়ত্রীতে কাজ হবে কি না জানা নেই। অন্তত কিছু একটা চলতে থাকুক ভিতরে। কুলি মজুররাও তো শক্ত কাজের সময় হেঁইও-হেঁইও করে। সেরকমই একটা কিছু ধরা যাক।

পথটুকু পার হতে ঘেমে গেল মহিম। বুকটা যেন ফেটে যেতে চাইছে। এই পরিশ্রম শরীর হয়তো সইবে না। হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে। হলে হোক। সারা জীবন কার কোন উপকারে লেগেছে মহিম। আজ এই বাচ্চাটাকে উদ্ধার করে আনতে গিয়ে যদি মরতে হয় তো দুঃখের কিছু নেই।

সন্ধ্যার এক সাপ্লায়ার ছোকরা তার সাইকেলের হ্যান্ডেলে ক্যাম্বিসের ব্যাগে মাল বোঝাই করছিল। মহিম উঠোনে পা দিতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, কী হয়েছে জ্যাঠামশাই? দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমি ধরছি!

সাইকেল রেখে ছুটে এসেছিল ছেলেটা।

কিন্তু মহিম রায় বারণ করলেন, তুমি ছুঁয়ো না বাছা। এতদূর এনেছি, বাকিটুকুও পারব। তুমি বরং ওর মাকে ডেকে দাও।

নিজের ঘরে এনে বিছানায় সোহাগকে শুইয়ে দিল মহিম। তারপর চেয়ারে বসে কলকল করে ঘামতে আর কুকুরের মতো হাঁফাতে লাগল। হার্টফেল হওয়ারই কথা। তবু হচ্ছে না এখনও। শরীরটা যন্ত্রণায় অবশ।

খবর পেয়ে দৌড়ে এল মোনা। মোনালিসা না কী যেন নাম বউমার। অমল মোনা বলেই ডাকে।

ঘরে ঢুকেই মেয়ের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল মোনা। দুটো শ্বাস ফেলার সময়টুকু ফাঁক দিয়ে বলল, কী হয়েছে?

পরে শুনো। এখন ওর চোখেমুখে জল দাও। ওই ঘটিতে জল আছে।

মোনার মুখে কোনও উদ্বেগ দেখা দিল না। দেখা দিল চাপা রাগ। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেল, কপালে ভ্রূকুটি, ফর্সা মুখটায় লাল আভা। ঘটিটা তুলে নিয়ে তীব্র আক্রোশে কয়েকটা জলের ঝাপটা মেরে রাগে গনগনে গলায় বলতে লাগল, ইউ আর ডুয়িং দি ভুডু এগেইন, ইউ বিচ... ইউ বিচ... বিচ...

বুকটা শান্ত হচ্ছিল না মহিমের। মস্ত হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিল।

সন্ধ্যা ঘরে ঢুকে এসে তাড়াতাড়ি বাবাকে ধরল, কেমন লাগছে বাবা? ডাক্তার ডাকব?

মহিম মাথা নেড়ে বলল, না। ঠিক হয়ে যাবে।

সন্ধ্যা হঠাৎ এবার মোনার দিকে ফিরে বলল, ওভাবে জল ছিটোচ্ছ কেন মেজো বউদি? বিছানাটা যে ভিজে যাচ্ছে!

মোনা তীব্র বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধমকে উঠল, তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। গেট আউট ফ্রম হিয়ার...

সন্ধ্যা ফুঁসে উঠে বলল, অত মেজাজ দেখাচ্ছ কেন? বিছানাটা ভিজে যাচ্ছে, তাই বলেছি। খারাপ কথা বলেছি কিছু?

মোনা তেমনই বিষাক্ত গলায় বলে, মেয়েটার চেয়ে বিছানাটা বেশি হল? ক্রাঙ্ক হেড কোথাকার?

সন্ধ্যা ছাড়বার পাত্রী নয়, সমানে গলা তুলে বলল, বাঃ বেশ তো! আমার বুড়ো বাবা তোমার ন্যাকা মেয়েকে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে এল, আর এখন একেবারে দরদ উথলে উঠছে! একটু আগে তো মেয়েকেই গালাগাল করছিলে।

বেশ করেছি। তুমি তোমার কাজে যাও।

আমি কোথায় যাব সেটা আমি বুঝব। এটা আমার বাবার ঘর। আমাকে যদি সইতে না পার তাহলে তুমি নিজের ঘরে যাও। আমাকে যেতে বলার তুমি কে?

ঝগড়া থামানোর জন্য যে দুজনের মাঝখানে পড়ে সামাল দেবে সেই শক্তিও নেই মহিমের। অসহায়ভাবে সে দেখছিল, যেন দুটো বনবেড়াল কথা দিয়ে আঁচড়াআঁচড়ি কামড়াকামড়ি করছে। সে একবার হাতটা তুলল। দুর্বল হাতটা পড়ে গেল ধপাস করে।

পাঁচ

হরিহরপাড়ার কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে, গাছগাছালির আড়াল-আবডালে ঢাকা পড়তে পড়তে এবং ফের প্রকাশ পেতে পেতে যেন একটা চিরুনির ভিতর দিয়ে ওই আসছে রসিক বাঙাল। পরনে কালচে পাতলুন, তাতে হলদে জামাটা গোঁজা, হাতে অ্যাটাচি কেস।

চৌধুরীদের পুকুরে আজ টিকিট কেটে মাছ-ধরার কম্পিটিশন। কাতারে লোক হুইল ছিপ নিয়ে বসে গেছে। মেলা লোক জুটেছে মাছ-ধরা দেখতে। ভিড়ে ভিড়াক্কার। সকাল থেকেই জায়গাটায় থানা গেড়ে ছিল মরণ। খানিকক্ষণ মাছ-ধরা দেখে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে একটু বল খেলল। খিদে চাগাড় দেওয়াতে বাড়ি-মুখোই ফিরছিল সে। তখনই দূর থেকে দেখল রসিক বাঙাল আসছে। আজ বুধবার, বাঙালের আজ আসার কথা নয়। তার মানে কলকাতায় ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া করে এলে রসিক বাঙালের মেজাজ বড় তিড়িক্কি থাকে।

সুতরাং মরণ ছুট লাগাল। বাড়িতে গিয়ে মাকে আগাম জানান দেওয়া দরকার। আর জিজিবুড়িকেও তাড়াতে হবে। বেরোবার সময়ে দেখে এসেছে, জিজিবুড়ি উঠোনে বসে হাপড়হাটি বকে মরছে। জিজিবুড়ির হল অভাবের সাতকাহন। সব সময়ে এটা চাই, সেটা চাই। রসিক বাঙাল জিজিবুড়িকে দু চোখে দেখতে পারে না।

মরণ অঙ্কে চল্লিশের বেশি পায় না বটে, কিন্তু দৌড়ে বরাবর ফার্স্ট হয়। ক্লাবঘরের খেলার মাঠ পেরিয়ে সে চোখের পলকে চাটুজ্যে বাড়ির উঠোন দিয়ে শর্টকাট মেরে নিজেদের বাড়ির উঠোনে ঢুকেই চেঁচাল, বাঙাল আসছে! বাঙাল আসছে!

জিজিবুড়ি পানের বাটা কোলে নিয়ে রোদে বসে ছিল। মুখে দোক্তা দেওয়ার পর জিজিবুড়ির চোখে যেন আরামের তন্দ্রা চলে আসে। চেঁচানি শুনে জিজিবুড়ি চমকে উঠে বলে, আ মোলো! আজ আবার বাঙাল এল কেন?

পালাও জিজিবুড়ি, এসে পড়ল বলে।

তড়িঘড়ি উঠতে গিয়ে কোলের পানের বাটা ঠনাৎ করে পড়ে গেল উঠোনে। খোলা কৌটো থেকে সুপুরির টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, চুন লেপটাল, দোক্তা ছিটিয়ে গেল।

দ্যাখ দিকিনি কাণ্ড! অমন চেঁচাতে আছে! এখন এসব তোলে কে?

তুলতে হবে না জিজিবুড়ি, পালাও শিগগির।

যাচ্ছি বাপু, যাচ্ছি। দোক্তাগুলো একটু কুড়িয়ে দিবি ভাই? যতীনকে কত বলে বলে তবে আনাতে হয়। দামও কি কম? এই দোক্তাটুকুর জন্যই বেঁচে আছি, প্রাণটা এখনও ওই জন্যই ধুকপুক করে।

তুমি বড্ড বকো জিজিবুড়ি। বাড়ি যাও না, মুক্তাদি কুড়িয়ে তোমাকে দিয়ে আসবেখন।

মাজায় ব্যথা, জিজিবুড়ি তাই একটু বাঁকা হয়ে উঠোনের পিছনভাগে এগোতে এগোতে বলে, দিস কিন্তু পাঠিয়ে ভাই।

দোতলার বারান্দায় এসে মা বলল, কী হল রে? কে আসছে বললি?

বাঙাল আসছে।

মায়ের মুখ শুকোল। বলল, তবে বড়গিন্নির সঙ্গে অশান্তি হয়েছে ঠিক। যা যা পড়তে বস গে। আলায়-বালায় ঘুরিস, টের পেলে আস্ত রাখবে না।

সেটা খুব জানে মরণ। জিজিবুড়িকে রওনা করে দিয়ে সে এক লাফে ঘরে ঢুকে পড়তে বসে গেল। অসময়ে, অ-দিনে বাঙাল আসা মানেই গণ্ডগোল। বই খুলে কান খাড়া করেই বসে রইল সে। পরবর্তী দৃশ্য ও ঘটনাগুলি তার খুব জানা। বাঙাল আসবে, এসে ওপাশের একতলার কোণের ঘরে ঢুকে সোজা গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে। কারও সঙ্গে একটিও কথা কইবে না। একদম পাথরের মতো চুপ। ওই সময়ে কেউ কাছে যাওয়ার সাহস পায় না। অন্তত আধঘণ্টা মা পর্যন্ত চৌকাঠ ডিঙোয় না। আধঘণ্টা বাদে মা এক কাপ গরম চা নিয়ে গিয়ে টেবিলে রাখবে। তারপর খুব মোলায়েম গলায় বলবে, চা এনেছি।

তার পরেও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবে বাঙাল। মা খুব সন্তর্পণে বিছানার এক পাশে বসে পায়ের ওপর একটু হাত বোলাবে। বাঙাল তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। তারপর 'হু-উ-উম' করে একটা অদ্ভুত শব্দ করবে। তারপর উঠে বসবে। তখনও কোনও কথা নেই। বসে বসে কিছুক্ষণ সুড়ৎ সুড়ৎ করে চা খাবে। গরম চা যত পেটে যাবে তত মেজাজ শীতল হয়ে আসবে।

মরণের একটা হামা-দেওয়া বোন আছে। সেটা একেবারে নরম তুলতুলে, গোবরের নাদা। মরণ তাকে কোলে-টোলে নিতে পারে না কখনও। সেই বোনটাকে নিয়ে এসে মুক্তা এর পর বাঙালের কোলে ফেলে দেবে। বাঙাল তখন হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ করে অদ্ভুত শব্দ করতে করতে মেয়েটাকে খুব আদর করবে। মরণের বোনটাও কে জানে কেন বাঙালের ভীষণ ভক্ত। সে তখন বাঙালের নাক কামড়ে দেবে, কান ধরে টানাটানি করবে। মরণ যখন ছোট্টোটি ছিল তখনও নাকি বাঙালের মেজাজ বিগড়ালে তাকে এনে বাঙালের কোলে ফেলে দেওয়া হত আর বাঙাল ঠিক ওইরকম করে আদর করত তাকে। আর মেজাজ আরও শীতল হয়ে যেত।

সবাই বলে বাঙালের মেজাজটা একটু টং বটে, কিন্তু সে লোক ভাল। কিন্তু মরণ জানে বাবারা কখনও ভাল লোক হয় না। এই যে বাঙাল ফি শনিবার আগেভাগে তার পোস্তার দোকান বন্ধ করে এখানে বিকেল-বিকেল এসে পৌঁছোয় তখন মরণকে তৈরি থাকতে হয়। বাড়িতে পা দিয়েই বাঙাল তার খোঁজ করবে, বান্দরটা গেল কই?

সে ভয়ে ভয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই বাঙাল তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হঠাৎ বলবে, এইটার মাথাডা যে কাউয়ার বাসা হইয়া আছে দ্যাখে না কেউ? এই হারামজাদা, মাথা খাউজ্যায় না তর? খাউজ্যায়? এঃ উকুনও হইছে মনে হয়। কাইলকাই নাইপত্যা ডাকাইয়া মাথাটা লাউড়া কইরা দিতে হইব।

রসিক বাঙালের এসব কথা জলের মতো বুঝতে পারে মরণ। যদিও এ তাদের ভাষা নয়, কিন্তু জ্ঞান হওয়া অবধি শুনে শুনে সে বুঝতেও পারে, বলতেও পারে অনেকটাই। রসিক বাঙালের পাল্লায় পড়ে তাকে বার দুই ন্যাড়াও হতে হয়েছে। বাঙালের গোঁ, যে-ই কথা সে-ই কাজ।

কখনও বা হাতের নখ দেখে বলে, এঃ, এইটার তো দেখি, পিচাশের মতো নখ হইছে। ইস রে, নখের মইধ্যে কালা কালা মাটি।

নেল কাটার দিয়ে রসিক বাঙাল ডাব্বিয়ে তার নখ কেটে দেয়। এমন মুড়িয়ে কাটে যে কয়েকদিন তার আঙুলের ডগা টনটন করে।

আর সবচেয়ে দুঃখের কথা, শনি রবি দুদিনই তাকে দুবেলা রীতিমতো পড়তে হয়। টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ। শ্বাসটাও ফেলতে হয় হিসেব করে। আর বাঙালের সঙ্গে বাগানের কাজে সাহায্য করতে হয়, ফাই-ফরমাশ খাটতে হয়।

আর সবচেয়ে যেটা লজ্জার কথা, এই বছর দশ-এগারো বয়সে সে তো বেশ বড়টিই হয়েছে, তবু রসিক বাঙাল মাঝে মাঝেই তাকে কলতলায় নিয়ে গিয়ে ন্যাংটো করে সাবান মাখিয়ে ছোবড়া দিয়ে ঘসে ঘসে চান করিয়ে দেয়। একে ন্যাংটো হওয়ার লজ্জা, তার ওপর ছোবড়ার ঘষটানিতে গায়ের জ্বালা। কিন্তু বাঙালের সঙ্গে এ নিয়ে কথা কইবে কে? না, রসিক বাঙালকে তার মোটেই পছন্দ হয় না। সোমবার সকালে ভাতে ভাত খেয়ে বাঙাল কলকাতার বড়বাজারে তার দোকান খুলতে রওনা হয়ে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে মরণ। মনে হয়, এক সপ্তাহ ছুটি।

রসিক বাঙালকে নিয়ে ঠাট্টা-রসিকতারও প্রচলন আছে। তারাপদদা তাকে ইংরিজি পড়ায়। মাঝে মাঝে বলে, ও হল তোর উইক এন্ড ড্যাডি। আর বন্ধুরা বলে, রসিক বাঙাল হল তার ফিফটি পারসেন্ট বাবা।

কথাগুলো আজকাল বোঝে মরণ। একটু লজ্জা করে, রাগও হয়।

জানালা দিয়ে সাবধানে পাশ-চোখে মরণ দেখল, বাঙাল আগড় ঠেলে উঠোনে ঢুকছে। মাথার লম্বা চুল হাওয়ায় উড়োখুড়ো, মুখখানা চোয়াড়ে বটে, তবে গম্ভীর নয় যেন। হাড়ে মাসে কেঠো চেহারা। এইরকম পাকানো চেহারার লোকগুলোই রাগী হয়।

না, আজ বাঙাল রাগ করে আসেনি। উঠোনে ঢুকেই উঁচু গলায় হাঁক মারল, কই গো, কই গেলা?

মা ওপরে দম বন্ধ করে ছিল বোধহয় এতক্ষণ। বাঙালের হাঁক শুনে বলল, এই যে যাচ্ছি!

হাসিমুখে নেমে এসে বলল, আজ এলে যে!

বাঙাল বারান্দায় বসে পাশে অ্যাটাচি কেসটা রেখে বলে, আর কইও না, সুধীর মণ্ডল খবর পাঠাইছে খালপাড়ের জমিটা বেচব। তাই আর দেরি করলাম না। আইজই রেজিস্টারি।

যাক বাবা, ওই জমিটার ওপর তোমার কত কালের শখ।

অখনই বাইর হইতে হইবো, কখন ফিরুম ঠিক নাই। আইজ আর কইলকাতায় ফিরন যাইব না।

এখনই বেরোবে কি? না খেয়ে বুঝি? চান-টান করো, আমি ভাত বেড়ে দিচ্ছি।

বাঙাল তেমন আপত্তি করল না। বলল, তা হইলে লুঙ্গি গামছা দেও। গরম লাগত্যাছে।

মবণ প্রমাদ গুনল। বাঙালি তাহলে আজ থাকছে। দিনটাই মাটি। ডানধারের জানালা দিয়ে জিজিবুড়ির ভাঙাচোরা মুখ উকি মারল, ও ভাই মরণ, দোক্তাগুলো তুলেছিস?

সময় পেলুম কোথায়? বাঙাল এসে পড়ল যে।

ও আমার কপাল, না তুললে যে কে কখন মাড়িয়ে দেবে, কাক এসে মুখ দেবে।

হি হি করে হেসে মরণ বলে, কাক বুঝি দোক্তা খায়?

না খেলেও ছিষ্টি ছড়াবে ভাই, গু-মুত-খাওয়া ঠোঁটে ঠোকরাবে—সে বড় নিঘিন্নে ব্যাপার।

বাঙাল বারান্দায় বসে আছে যে!

চোখ কপালে তুলে জিজিবুড়ি বলে, বসে আছে বুঝি! গোঁসাঘরে যায়নি এখনও?

না গো জিজিবুড়ি, বাঙাল আজ ঝগড়া করে আসেনি।

তবে কী মতলবে?

কী যেন জমিজমা কেনার কথা শুনছি।

বাঙাল ওই করেই শেষ হবে। জমি-জমি করে এমন পাগল আর কাউকে দেখিনি। থাকবে নাকি আজ?

তাই তো শুনছি।

তাহলে গেল আমার অতগুলো দোক্তা।

তুমি এখন যাও জিজিবুড়ি, মুক্তাদি তোমার দোক্তা কুড়িয়ে দিয়ে আসবেখন।

আর দিয়েছে। ও আমার ভূতভুজ্যিতেই গেল। বাঙাল কার জমি কিনছে কিছু শুনলি?

সুধীর মণ্ডলের।

জমি কিনেই শেষ হবে বাঙালটা।

তুমি এখন যাও জিজিবুড়ি, বাঙাল দেখতে পেলে কুরুক্ষেত্র করবে।

যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। তা বলি বাঙালের নয় মাথার দোষ, পাগলের মতো জমি কিনছে, কিন্তু আমার মেয়েটাই বা অমন মেনিমুখো কেন? দুটো উচিত কথা মুখের ওপর কি বলতে নেই। কী দিয়ে যে বশ করে রেখেছে কে জানে বাবা। স্বামী তো নয়, যেন গুরুঠাকুরটি এলেন। সব সময় হ্যাঁ-হুজুর জো-হুজুর করে যাচ্ছে। জন্মে এমন দেখিনি বাবা। কই, বড় বউ কি ছেড়ে কথা কয় বাঙালকে? দিচ্ছে তো গুষ্টির পিণ্ডি চটকে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। তখন তো ল্যাজ গুটিয়ে এখানে এসে গোঁসাঘরে টান টান হয়ে শুয়ে থাকে, পারে কিছু বলতে গিয়ে তাকে? আমার মেয়েটাই হল গে মেনিমুখো।

কথাটা ঠিক নয়। তার মায়ের সঙ্গে রসিক বাঙালের কখনও-সখনও ঝগড়া হয়। তবে সেটা বেশি দূর গড়ায় না। মা পায়ে-টায়ে ধরে মিটিয়ে ফেলে। মরণের আগে মনে হত, মা রসিক বাঙালকে খুব ভয় পায়। আর শুধু ভয়ই পায়। আজকাল বুঝতে পারে, মা বাঙালকে ভালও বাসে খুব। এইটে মাঝে মাঝে মরণের তেমন পছন্দ হয় না।

বাঙাল উঠোনে দাঁড়িয়েই লুঙ্গি গলিয়ে প্যান্ট, জাঙ্গিয়া ছাড়ল, জামা গেঞ্জি খুলে ফেলল। মা সেগুলো নিয়ে উঠোনের তারে মেলে দিল ঘাম শুকোনোর জন্য। বাঙাল গেল টিউবওয়েলে চান করতে।

বাঙালদের জমির নেশা থাকে বলে শুনেছে মরণ। সেই নেশাতেই একদিন জ্ঞাতিভাই মাখন দত্তের সূত্রে এখানে এসে জমিজিরেত কিনেছিল বাঙাল। ইচ্ছে ছিল এখানেই থাকবে, ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতার ব্যবসা বজায় রাখবে। কিন্তু বাঙালের বউ শেষ অবধি গাঁয়ে এসে টিকতে পারেনি। রসিক তখন ফাঁপড়ে। কে এই জমিজমা, বাড়িঘর দেখে! ভাড়া করা লোক দিয়ে তো আর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। বেচে দিয়ে চলে যাওয়ার পরামর্শই লোকে দিয়েছিল, কিন্তু বাঙালের গোঁ যাবে কোথায়! সে বলল, বেচুম ক্যান? জমির লগ্নির মাইর নাই।

বাঙালের সেইসব গল্প আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। নিজের মায়ের কাছে খানিক, আর খামচা খামচা নানা জনের মুখে শুনেছে মরণ। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক হল বউ। তাই বাঙাল একদিন ঠিক করে ফেলল, এখানে আর একটা বিয়ে করবে। খুঁজে খুঁজে স্বজাতি স্বঘর গরিবের একটা মেয়েকে পছন্দও করে ফেলল সে। আর তখনই গাঁয়ে বিরাট শশারগোল উঠল। বাঙাল দেশ থেকে এসে একটা লোক গাঁয়ে নষ্টামি করছে। বাঙালকে মারধর করারও চেষ্টা হল। পুলিশ ডাকা হল। সে অনেক ঘটনা।

বাঙাল তখন গিয়ে ধরে পড়ল গৌরহরি চাটুজ্যেকে। মস্ত উকিল, মান্যগণ্য বিচক্ষণ মানুষ। গৌরহরি চাটুজ্যে তলচক্ষুতে খানিকক্ষণ বাঙালকে দেখে নিয়ে নাকি বলেছিল, বুকের পাটা আছে হে!

বুকের পাটা আর টাকা এ দুটো যার থাকে তাকে জব্দ করা কঠিন। গৌরহরি চাটুজ্যে একদিন মিটিং ডেকে সবাইকে বলল, রসিক সাহা একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে বলে তোমরা আপত্তি করছ শুনলাম। আপত্তি ওঠারই কথা। তবে বাপু, রসিক বিয়ে না করে যদি চারটে মেয়েমানুষ রাখত তাহলে তোমরা কী করতে? বড় জোর আড়ালে-আবডালে ফিসফাস গুজগুজ বা নিন্দেমন্দ। তার বেশি কিছু নয়। আমি বলি কী, এ লোক তো বুকের পাটা আছে বলেই বিয়ে করছে। বাইগ্যামির চার্জে যদি ওর বউ ওকে জেলে পাঠায় তো পাঠাবে। সে দায় ওর। তবে বাসন্তী যাতে ফাঁকে না পড়ে তার জন্য রসিক সাহা বাসন্তীর নামে সম্পত্তি লিখে দিতে রাজি আছে। সে ভার আমিই নিচ্ছি।

একজন মাতব্বর বলেছিল, দাদা, আপনি জেনেশুনে এই বে-আইনি কাজকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন?

গৌরহরি বললেন, মানুষের প্রয়োজন বুঝেই বরাবর আইন তৈরি হয়েছে, সেরকমই হওয়া উচিত। মানুষের প্রয়োজনে কাজে না এলে আইন বোঁদা জিনিস। রসিক ফুর্তি করার জন্য তো আর একটা বিয়ে করছে না। তার সম্পত্তি দেখাশোনার জন্যই দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রয়োজন। প্রাচীন কালে সামাজিক প্রয়োজনেই মানুষকে এরকম বিয়ে করতে হয়েছে। উদ্দেশ্য খারাপ না হলে আমি অন্তত দোষ দেখছি না।

অনেক গণ্ডগোলের ভিতর দিয়ে বিয়েটা অবশ্য হয়ে গেল। কিন্তু খবরটা কলকাতায় রসিক বাঙালের বাড়িতে পৌঁছোনোর পর হয়েছিল আরও সাংঘাতিক কাণ্ড। বাঙালের বউ দুবার গলায় দড়ি দিতে গেল, থানা-পুলিশ হল, বাঙালকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাটকেও পুরল পুলিশ।

কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে কালের নিয়মে উত্তেজনা প্রশমিত হল, রাগের পারদ নেমে গেল। বাঙাল তার দুই সংসারের মধ্যে ভাগ হয়ে দিব্যি চলতে শিখল।

কলকাতার মা বা বড়মা কেমন তা অবশ্য জানে না মরণ। তার একটা দাদা আর একটা দিদিও আছে। তাদের কখনও দেখেনি সে। কিন্তু সে মাঝে মাঝে খুব ঝুম হয়ে বসে তাদের কথা ভাবতে চেষ্টা করে। দেখা হলে তারা কি মরণকে দুর-দুর ছাই-ছাই করবে? করবে বোধহয়। কিন্তু মরণের মনে হয়, তারা বোধহয় তার খুব পর-মানুষ নয়। বাঙাল কাঠখোট্টা লোক, কলকাতার বাড়ির কথা বিশেষ তার মুখে শোনা যায় না। তবে মাঝে মাঝে যে ও-বাড়িতে খুব ঝগড়া হয় তা টের পায় তারা, যখন বাঙাল মুখ গোমড়া করে অসময়ে এসে হাজির হয়।

মায়ের ওপর রাগ করে মরণ কখনও কখনও বলে, আমি একদিন বড়মার কাছে, দাদা দিদির কাছে চলে যাব।

মা বলে, যা না, তা-ই যা, গিয়ে বুঝবি কত ধানে কত চাল। গালভরে আবার বড়মা বলা হচ্ছে। গিয়ে বুঝবি পেটে ধরা মা আর ডাকের মায়ের তফাত কী।

তফাত বোঝার মতো বয়স হয়নি মরণের। কিন্তু কলকাতার বাড়ি, বড়মা, দাদা বা দিদি সম্পর্কে তার একটা রূপকথার মতো কুহক আছে। তারা হয়তো খুব সুন্দর মানুষ, বাড়িটা হয়তো রাজপ্রাসাদের মতো। তারা হয়তো দুর-ছাই করবে না তাকে।

বাঙাল বারান্দায় বসে ভাত খেল। তারপর জামা-প্যান্ট পরে রওনা হওয়ার সময় বলল, তা হইলে আসি গিয়া।

এসো। তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু?

হ। দুর্গা দুর্গা।

দুর্গা দুর্গা।

বাঙাল চলে গেল। মরণ ঘর থেকে বেরিয়ে লাফ দিয়ে উঠোনে নেমে হোঃ হোঃ করে দু হাত ওপরে তুলে দু চক্কর নেচে নিল।

মা ভ্রূ কুঁচকে বলে, ও মা! অমন করছিস কেন?

মায়ের সামনে বাবাকে বাঙাল বললে মা রাগ করে। তাই সে ভয়ে ভয়ে বলে, এমনি।

মা শুধু বলল, ওরকম করতে নেই।

নিকোনো উঠোন থেকে জিজিবুড়ির পড়ে যাওয়া দোক্তা বাঁ হাতের তেলোতে তুলে জড়ো করতে করতে মরণ বলল, বাবা আসছে শুনে জিজিবুড়ি এমন ভয় পেল যে দোক্তা ফেলে পালিয়েছে।

মা বাঙালের ভেজা লুঙ্গি তারে মেলতে মেলতে বলল, মায়ের যেমন কাণ্ড! ভয় পাওয়ার আর দোষ কী? কম লেগেছিল লোকটার পিছনে? এখন মুখোমুখি হলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

ঘটনাটা জানে মরণ। মায়ের সঙ্গে বাঙালের বিয়ে দিতে গিয়ে এককাঁড়ি টাকা আদায় করেছিল জিজিবুড়ি। বিয়ের পরেও নানা অভাবের কথা বলে টাকা নিত। নিজের দুই পাষণ্ড ছেলে কানাই আর বলাইকে লাগিয়েছিল বাঙালের চাষ আবাদে। তারা ধান-চালের হরির লুট ফেলে দিয়েছিল। বাঙালের গোলায় ফসল আর উঠতই না। মতলব ছিল বাঙালকে তাড়িয়ে সম্পত্তি দখল করার। কারণ সম্পত্তি সবটাই প্রায় মেয়ের নামে। তা সেটা প্রায় ঘটেও গিয়েছিল। কলকাতার সংসারে যখন অশান্তি লাগে তখন বাঙালের যাতায়াত গিয়েছিল কমে। সেই ডামাডোলে বাঙাল যখন প্রায় 'নেই' হয়ে গেছে সেসময় দুই ভাই এসে বোনকে নানা কানমন্তর দিত। বাঙাল যে খারাপ লোক, সে যে ঘুরে ঘুরে বিয়ে করে বেড়ায় এবং তার যে আরও নানা দোষ আছে সেসব কথা। সেই দুর্দিনে মায়েরও খুব মনের কষ্ট গেছে। পেটে তখন মরণের বড় বোনটা, যেটা বাঁচেনি। বাঁচার কথাও নয়। সেই সময়ে মন খারাপের চোটে মূর্ছা রোগ হয়েছিল। কয়েকবার মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে মেয়েটা পেটের মধ্যে মরে গেল।

বাঙাল যখন ফিরে এল বিষয়ী মানুষের চোখে তখন পরিস্থিতি বুঝে নিতে দেরি হয়নি। দুই শালাকে তাড়িয়ে নিজের বউকে আগলে যখন সে রুখে দাঁড়াল তখনই জিজিবুড়ি আর তার ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্কটা বিষ হয়ে গেল। মারাত্মক ঘটনাটা ঘটল তার পরেই। কানাই আর বলাই দুটো গুণ্ডা ভাড়া করে লাগাল বাঙালকে নিকেশ করতে। সেটা হলে বোনের সম্পত্তির দখল নিতে আর বাধা হত না। দুটো গুণ্ডা বাঙালকে

কুপিয়েও দিয়েছিল বাসরাস্তার কাছে বাঁশবনে। কিন্তু বাঙাল একটাকে পেড়ে ফেলেছিল। ধরা পড়ে দুজনেই কবুল করেছিল তারা কানাই বলাইয়ের টাকা খেয়ে এ কাজ করেছে।

মোকদ্দমা হতে দেয়নি বাসন্তী। বাঙালের হাতেপায়ে ধরে ভাইদের বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কেলেঙ্কারির ভয়ে বাঙালও বেশি কিছু করেনি। কিন্তু সেই থেকে বাঙাল এলে ও-বাড়ির কেউ ভয়ে আর এ-বাড়িতে আসে না। কিন্তু বাঙাল না থাকলে তারা এখনও এসে টাকাটা সিকেটা ধানটা চালটা মেগে-পেতে নিয়ে যায়।

এসব ঘটনার পর মরণ হয়েছিল। ওপরের বোন মারা যাওয়ায় তার নাম রাখা হয়েছিল মরণকুমার। যমকে খুশি করতেই রাখা।

জিজিবুড়ি বলছিল, জমি কিনে কিনেই বাঙাল একদিন শেষ হয়ে যাবে।

জমি কিনে শেষ হবে কেন? জমি রাখতে জানলে জমির মতো জিনিস নেই। আর শোনো, তুমি এখন বড় হয়েছ, এখন আর বাবাকে তাঁর আড়ালেও বাঙাল বলবে না।

সবাই বলে যে, তাই মুখে এসে যায়।

অন্যের কাছে উনি যা, তোমার কাছেও কি তাই? একটা মান্যিগন্যি নেই?

আছে বাবা, খুব আছে। মরণ তার বাপকে যমের মতো ভয় খায়। আর ভয় খায় বলেই আড়ালে 'বাঙাল' ডেকে সেই ভয়টার সঙ্গে লড়াই করে।

বাঙালের লুঙ্গিটা টান টান করে খুব যত্নের সঙ্গে মেলে দিয়ে ক্লিপ আটকাচ্ছে মা, অনেক সময় নিয়ে। এমন আদুরে ভাব, যেন লুঙ্গিটাই বাঙাল। তেমনি যত্ন করে গামছাটা মেলতে মেলতে মা আপনমনে বলল, তোমার বাবা ভাল লোক।

জিজিবুড়ি ঠিক উলটো কথা বলে, ও হল বাঙাল দেশের লোক, ওদের জাতজন্মের ঠিক নেই। তেলি সাউ না শুঁড়ি সাউ কে জানে বাবা, ভোল পালটে সব আসে। আর কথারই বা কী ছিরি। উর্দু বলছে না পার্সি বলছে বোঝার জো নেই। মুড়িকে বলে হালুম, কাদাকে বলে প্যাক। ছিছিক্কার যাই বাবা। তার ওপর ঊর্ধ্ববায়ু, রগচটা মুষল। ওরা কি সব ভাল লোক? ভাল লোকেরা কি লুকোছাপা বিয়ে করে বাপ? আরও কটা করে বসে আছে তার খোঁজ নেয় কে? কপালটাই আমার অমন, লোভ দেখিয়ে মেয়েটার সব্বোনাশ করল।

তাই যদি হবে তাহলে বাঙাল এলে মায়ের চেহারায় একটা ভেজা ভেজা স্নিগ্ধ ভাব কেন ফুটে ওঠে? চোখ দুখানা কেন অমন নরম হয়ে যায়? বাঙালের লুঙ্গি আর গামছাখানা কেমন টান টান করে মেলে দিল মা, আর কারও জামাকাপড় অত যত্ন করে মেলে না তো! হাঁ করে দেখছিল মরণ। বাঙাল ভাল লোক না খারাপ লোক এই অঙ্কটা তার মিলতে চায় না কিছুতেই।

জিজিবুড়ি পিছনের দিকের খিড়কি দরজায় কচুপাতার আড়াল থেকে উদয় হয়ে সাবধানে মুখ বাড়িয়ে বলল, বাঙালটা বিদেয় হয়েছে?

কথাটা শুনে মায়ের ভ্রূ কোঁচকাল।

জিজিবুড়ি উঠোনে ঢুকতে ঢুকতে বলল, দিন নেই ক্ষণ নেই এসে উদয় হলেই হল। এমন আঁতকে উঠলুম যে পানের বাটাখানা পড়ে সব ছয়ছত্রখান। পিলে চমকানো লোক বাপু। দিলি ভাই তুলে দোক্তাটুকু? সুপুরিও পড়ে আছে দেখ কয়েক কুচি।

বাসন্তী একটু ঝাঁঝের গলায় বলে, সবসময় অমন ঠেস মেরে বাঙাল-বাঙাল বলল কেন বললা তো! শুনে শুনে বাচ্চারাও শিখছে। তোমার যে কবে আক্কেল হবে।

ও মা! বাঙালকে বাঙাল বলব না তো কী? নবদ্বীপের গোসাঁই তো নয় রে বাপু। ওসব মনিষ্যি আমাদের মতো তো আর নয়।

ওসব কী কথা মা! এতকাল বলে এসেছ, শুনেছি। কিন্তু এখন একটু মুখটা সামলাবে তো। ছেলেপুলেরা বড় হচ্ছে না? ভক্তিছেদ্দা শিখবে কিছু ওসব শুনলে?

ও মা! বাঙাল লোকদের আবার ভক্তিছেদ্দা কীসের রে? ওসব ডাকাত লুঠেরা লোক। দেখলি না গাঁয়ে এসেই কেমন রসালো জমিগুলো গাপ করে নিল। যারা দুটো-চারটে করে বিয়ে বসে তারা আবার ভাল লোক! রাঁঢ় পুষলেও না হয় কথা ছিল, বিয়ে বসে কোন আক্কেলে রে?

তুমি দোক্তা কুড়িয়ে নিয়ে বিদেয় হও তো! বেশি কথা কয়ো না। আমার বাঙাল বরই ভাল। জন্মে জন্মে যেন আমার অমন বাঙাল বরই হয়।

বলিস কী লো মুখপুড়ি? এ যে নিজে কুড়িয়ে অভিসম্পাত নিলি! মাথাটা তোর খেয়েছে দেখছি।

যখন দশটি হাজার টাকা নিয়ে নিজের মেয়েকে ওই বাঙালের কাছে বেচে দিয়েছিলে তখন এত শাস্ত্রজ্ঞান কোথায় ছিল? তখন তো বাঙাল বলে ঠোঁট বাঁকাওনি, হাতও গুটিয়ে নাওনি!

ও মা! তখন কি বুঝেছিলুম রে বাপু! এমন সোনাহারা মুখ করে এসে দাঁড়িয়েছিল যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। ওরা সব কামিখ্যের ডাকিনী বিদ্যে জানে, এক এক সময়ে এক এক রূপ ধরে। বুঝতে পারলে কি আর গুখেকোর মতো কাজ করি! একটা বাঙাল মরলে দুটো গোখরো সাপ জন্মায়।

খুব হয়েছে মা, তোমার আর বেশি বুঝে কাজ নেই। এতই যদি সে খারাপ তবে তার বাড়িতে এসে রাজ থানা গেড়ে বসে থাকো কেন, তার চাল ডাল টাকা হাত পেতে নিয়ে যাও কোন লজ্জায়?

বাঙালের জিনিস হলে নিতুম নাকি রে পোড়ারমুখি? তোর জিনিস বলে নিই। না দিস তো না-ই দিবি, অত কথা কীসের? তবে এও বলি বাপু, বাঙাল তোকে ওষুধ করে রেখেছে। ঘোর কাটলে টের পাবি।

এ যেন একটা টেপ রেকর্ডারে একই ক্যাসেট ঘুরে ফিরে বাজছে। জ্ঞান হয়ে অবধি মা আর জিজিবুড়ির এইসব চাপানউতোর শুনে আসছে মরণ। দুজনে লাগলেই মরণ মনে মনে নারদ মুনিকে ডাকতে লাগে। মা যত রাগবে সেদিন ততই মায়ের হাতের রান্না খোলতাই হবে। এর কখনও নড়চড় হয়নি। রেগে গেলে মায়ের হাত যেন অন্নপূর্ণার হাত। আজ আবার বাঙাল এসেছে, দু-চারটে ভালমন্দ হবে।

তোমরা কত ভাল তা জানা আছে। মানুষটাকে খুন অববি করতে চেয়েছিল তোমার হিরের টুকরো ছেলেরা। আজও লোকটার কাঁধে আর পিঠে ভোজালির দাগ দগদগে হয়ে আছে।

ওসব বাজে কথা। বাঙাল রটাল আর তুইও বিশ্বাস করলি। কার সঙ্গে কোথায় গণ্ডগোল করে রেখেছিল তারা খুনোখুনি করতে লোক লাগায়। সত্যিই যদি হবে তাহলে বাঙাল মামলা করল না কেন শুনি!

সে আমি হাতেপায়ে ধরেছিলুম বলে। সবাই জানে মা, আর গুণধর ছেলেদের সারতে চেয়ো না। খুব তো ছেলেদের হয়ে টানছ, তা সেই গুণধর ছেলেরা এখন দেখছে তোমায়? লাথি ঝাঁটা মুখনাড়া খেয়ে তো পড়ে আছ, আর রোজ এসে এ-বাড়িতে একখানা ঘর দেওয়ার জন্য ঘ্যান ঘ্যান করছ।

ছেলেদের দোষ কী? বউগুলো খচ্চড়।

তোমার হাতের পাতের টাকাকড়িগুলো তো আর বউরা কেড়ে নেয়নি, গয়নাগুলোও তারা গাপ করেনি। করেছে তোমার অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেরা। আর কত মিছে কথা কইবে মা!

জিজিবুড়ি একটু দম ধরে বসে রইল উঠোনে। তারপর হঠাৎ গলাটা মিহিন করে বলল, তা বাঙালের মেজাজটা ঠান্ডা হলে একবার কথাটা তুলিস। বেশি কিছু তো নয়, ওই পশ্চিমের দালানের নীচেরতলায় কোণের ঘরটা যদি দেয়। আর দুবেলা দুমুটো ভাত। এটুকু কি আর তার গায়ে লাগবে? দোহাত্তা তো কামাচ্ছে বাবা।

ওসব মতলব ছাড়ো মা। সে রাজি থাকলেও আমি রাজি নই। কিছুতেই সেরকম বন্দোবস্ত হবে না।

পেটের শত্তুরের মতো শত্রুর নেই, বুঝলি?

গজর গজর করতে করতে জিজিবুড়ি পাছদুয়ার দিয়ে বিদেয় হল।

মা কিছুক্ষণ বারান্দার সিঁড়িতে চুপ করে বসে রইল ঝুম হয়ে। দুটো চোখ ধীরে ধীরে টস টস করতে লাগল জলে। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে নীরবে কাঁদছে মা। কেন কাঁদে মরণ তা বুঝতে পারে। এখন সে বড় হয়েছে। মা বাঙালের কথা ভেবে কাঁদে। মা বাঙালকে বড্ড ভালবাসে। বাঙালকে কেন যে মরণ অত ভালবাসতে পারল না কে জানে।

সে কাছে গিয়ে ডাকল, মা!

হাত বাড়িয়ে মা তাকে ধরে পাশে বসিয়ে ধরা গলায় বলল, চুপটি করে বসে থাক। কথা বলিস না। আমার মনটা ভাল নেই।

একটু উশখুশ লাগছিল বটে, তবু মরণ চুপ করেই বসে রইল। মা আঁচল সরিয়ে কিছুক্ষণ উদাস চোখে সামনের দিকে চেয়ে রইল। সামনে ফর্সা উঠোন, চাটাইয়ে সর্ষে শুকোচ্ছে আর পুরনো তেঁতুল। একটা দুটো কাক ঘুরে ঘুরে উঠোনে নেমে আসছে। মা কাকগুলোকে হুড়ো অবধি দিল না। মায়ের মন আজ সত্যিই খারাপ।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মা হঠাৎ বলল, বড্ড ভয় করছে বাবা, শুনছি নাকি সুমন আসবে।

সুমন! সে কে মা?

বড়গিন্নির ছেলে।

ধম করে উঠল মরণের বুক। উত্তেজিত গলায় বলল, দাদা?

হ্যাঁ বাবা। তোর বাবা আজ খেতে বসে বলছিল, ছেলের নাকি খুব ইচ্ছে হয়েছে গাঁয়ের বাড়ি দেখে যেতে।

তাতে ভয় কী মা?

ভয় বলে ভয়। কী মনে করে আসছে তা তো জানি না। আমি তো তাদের শত্তুর।

কেন মা?

সংসার ভাঙিনি আমি? একটা সংসার দু টুকরো হল তো আমার জন্যই। ছেলে কি ভাল মন নিয়ে আসবে?

কথাটা ভাববার মতো। মরণেরও ভয় হচ্ছে একটু, আনন্দ হচ্ছে খুব। শহরের দাদা বা দিদির কথা সে কত ভাবে কত স্বপ্ন দেখে তাদের নিয়ে। বড়মার কথাও খুব ভাববার চেষ্টা করে সে।

সত্যিই আসবে মা?

তোর বাবা তো বলল।

কবে?

তার কোনও ঠিক নেই। হয়তো আসছে সপ্তাহে, বা তার পরে কোনওদিন। বড়গিন্নি তো তাদের কানে বিষ ঢালতে ছাড়েনি। তাই বড় ভয় হচ্ছে। কী জানি বিষয়সম্পত্তি নিয়ে দাবি তুলবে কিনা।

তাহলে কী হবে মা?

কে জানে কী হবে। সম্পত্তি তো তোর বাবার, আমার নামে দলিলটুকুই যা। তাই ভয় হচ্ছে।

মরণ চুপ করে বসে রইল। ভিতরে যে আনন্দের আলোটা জ্বলে উঠেছিল সেটা ফের নিবে গেল। মরণ ভাবছে। মরণ বড় হচ্ছে।

ছয়

বিকেল যখন ঘনিয়ে আসে তখন মাঠের ওধারে জড়ামরি গাছপালার ফাঁকে যে কী তুলকালাম একটা কাণ্ড ঘটে যায় রোজ তা কেউ তাকিয়েই দেখে না ভাল করে। আকাশ থেকে আলোর চাকাটা তখন নামতে থাকে আর সেই সময়ে কোথাও কিছু না হঠাৎ একটা ভুতুড়ে মেঘ এসে তিন-চার খণ্ড হয়ে ভাসতে থাকে। আর গাছপালার কালচে রঙের ছায়া থেকে অশরীরীর মতো ভেসে উঠতে থাকে ঘোর ঘোর কুয়াশার মতো, ধোঁয়ার মতো, প্রেতের মতো সব জিনিস। পশ্চিমের আকাশে তখন লাল সাদা কালো মেঘের তুলির টান। দিগন্ত দ্রুত তার আলোর গালিচা গুটিয়ে নিতে থাকে। প্রথমে দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হতে থাকে, আর অন্ধকার বুনে চলে কালো এক মাকড়সা। প্রতিদিন এইভাবে দিন যায়, দিন আসে। কেউ ঘটনাটা গ্রাহ্যও করে না তেমন। বাসরাস্তায় ব্যস্ত দোকানপাট অন্ধকার নামতেই দিল না কখনও। পটাপট জ্বলে উঠল আলো। ঝাঁই ঝাঁই করে বেজে যায় কালীপদর ক্যাসেটের দোকানের গান। অষ্টধাতুর আংটি বিক্রি করতে বসা লোকটা একঘেয়ে গলায় তার আংটির গুণের কথা বলে, বিফলে মূল্য ফেরতের ভরসা দিয়ে যাচ্ছে। সেই কবে থেকে। তেলেভাজার গন্ধ ছড়িয়ে দেয় হরিপদ দাস। মাঠের ওধারে নানা দৃশ্য অবতারণার পর আলোর চাকা ডুবে গেল হায় হায় করে। কেউ দেখল না। টেরই পেল না ভাল করে। ধুলো উড়িয়ে দুখানা বাস গেল পরপর। লোক নেমেছে মেলা। বাস-আড্ডায় এখন মেলা লোক, বিস্তর বিকিকিনি। এ সময়টায় তার যে খিদেটা পায় সেটা হল বিস্কুটের খিদে।

মানুষের বুদ্ধিরও বলিহারি যেতে হয়। মাথা খাটিয়ে যে কোন জিনিসে কী প্যাঁচ বের করে তার ঠিকঠিকানা পাওয়া মুশকিল। এই যে নিতাইয়ের দোকানের নিমকি বিস্কুট—শুনতে সোজা হলে কী হয়, বিস্কুটখানা বিস্তর প্যাঁচালো। সে গুণে দেখেছে বিস্কুটখানায় অন্তত আটখানা থাক। পরতে পরতে জুড়ে কী করে যে বানিয়েছে মাথা খাটিয়ে, কে জানে বাবা! যেমন মুচমুচে তেমনই গালভরা স্বাদ। জিব যেন জুড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে এক-আধটা কালোজিরে দাঁতে পড়লে ভারী চমৎকার লাগে। গোটাগুটি কামড়ে খায় না সে। খবরের কাগজের ঠোঙায় বিস্কুটখানা নিয়ে প্রথম কিছুক্ষণ চুপ করে অনুভব করে। ছোঁয়ার মধ্যেও একটা উপভোগ হয় না কি? তার তো হয়। তারপর বিস্কুটখানা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দেখে। এই দেখাটাও খাওয়ারই একটা অঙ্গ। গানের আগে যেমন হারমোনিয়মের প্যাঁ পোঁ আর তবলা বাঁধার ঠুকঠাক। খুব সাবধানে বিস্কুটের ওপরের পরতটা দু আঙুলে ধরে ছাড়িয়ে নেয় সে। পাতলা ফিনফিনে চমৎকার লম্বাটে জিনিসটি টুক করে দাঁতে কামড়ে একটুখানি মুখে নেয় সে। অনেকক্ষণ ধরে চিবোয়। সঙ্গে সুড়ুত করে এক চুমুক চা। কী যে ভাল লাগে তখন! একটা পরত শেষ হলে আর একটা পরত, তারপর আর একটা। মোট আটখানা খেতে খেতে চা কখন শেষ হয়ে যায়। শেষ পরতখানা খাওয়ার সময় মনটা খারাপ লাগে। শেষ হলেই তো শেষ। আরও একখানা যে খাওয়া যায় না তা নয়, তবে সেটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। এক একখানা বিস্কুট এক এক টাকা।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর খাওয়ার রেশটা অনেকক্ষণ মুখের মধ্যে থেকে যায়। তখন চুপটি করে বসে সেটা উপভোগ করতে হয়। গোরু যেমন জাবর কাটে অনেকটা তেমনই। খাওয়াটা ফুরিয়ে গিয়েও যেন ফুরোয় না, তার স্বাদ জিবকে জড়িয়ে ধরে থাকে অনেকক্ষণ। বিস্কুট আর চায়ের স্মৃতি তাকে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে।

মাথাটা কিছু ভুলভুম্বুল হয়েছে আজকাল। কাছেপিঠের কথাই ভুল হয় বেশি। এই যদি হঠাৎ করে আদিগন্ত সব কথাই আচমকা ভুল পড়ে যায় তা হলেও খারাপ কিছু তো নয়। বাড়িঘর, ঠিকানা, বউ, ছেলেপুলে সব ভুলে স্তূপাকার হয়ে এই বাস-আড্ডার বেঞ্চে বসে হাঁ করে চেয়ে থাকা সেও কি খারাপ রে বাপু! বেশ জায়গা এটা। আলো-টালো আছে, গান বাজছে, বিকিকিনি হচ্ছে, বাস আসছে যাচ্ছে, মানুষের সঙ্গে বসে মানুষ সুখদুঃখের দুটো কথা কইছে, লোকের গ্যাঞ্জাম। এখানে বসেই কত কী দেখে দেখে সময় কেটে যায়। উত্তর দিকে কখন থেকে একটা মাল-বোঝাই ট্রাক খারাপ হয়ে পড়ে আছে। এখন হ্যাজাক জ্বেলে একটা খালাসি জ্যাক লাগিয়ে হ্যান্ডেল মেরে মেরে সেটা তুলছে। দেখার মতোই দৃশ্য। মানুষের বুদ্ধির কোনও কূলকিনারাই করে ওঠা মুশকিল। কী বুদ্ধি! কী বুদ্ধি! একরত্তি একটা যন্ত্র লাগিয়ে একটা মাত্র রোগভোগা খালাসি ওই গন্ধমাদন ট্রাকটাকে কেমন তুলে ফেলছে দেখ! ট্রাকটা উঠছে একটু কেতরে। কুকুরে যেমন পিছনের ঠ্যাং তুলে পেচ্ছাপ করে ঠিক তেমনই। যত দেখে তত মুগ্ধ হয় সে। মুগ্ধ হয়, আর ভাবে। ভেবে ভেবে কূলকিনারা পায় না। বুদ্ধি খাটিয়ে খাটিয়ে মানুষ কত কী বানিয়েছে! রেলগাড়ি, হাওড়ার পোল, মনুমেন্ট। এইসব বসে বসে ভাবে সে। আর খুশি হয়। আর ফিচিক ফিচিক হাসে আপনমনে। তার মেজো ছেলের বউ কুসুম সেদিন তার শাশুড়িকে বলছিল বটে, বাবার একটু মাথার দোষ হয়েছে মনে হয়, একলা একলা বসে কেমন বিড়বিড় করে কথা কইছে আর হাসছে গো। দরমার বেড়ার ওপাশ থেকে কথাটা কানে এসেছিল। মাথার দোষ একটু হয়েও থাকতে পারে তার। ভুলভুম্বুল ভাবটা যেন একটু বেড়েই পড়েছে। গোটাগুটি সব ভুলে মেরে দিলে মন্দ হবে না তখন।

কিছু চাষিবাসি লোক ক্ষেতের কাজ সেরে ঘরমুখো ফেরার পথে এইখানে চায়ের দোকানে বসেছে বেঞ্চ জুড়ে। তাদের হাতে চায়ের গেলাস আর কোয়ার্টার পাঁউরুটি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী লোকটি বলছিল, সেবার জাজপুরে যাত্রার আসর বসেছিল, বুঝলি। হই হই রই রই কাণ্ড। রামের বনবাস পালা হচ্ছে। খোদ লালমুখো সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট যাত্রা দেখতে এসেছে। আসরের পাশেই চেয়ারে বসা। তা পালা তো শুরু হল। কিন্তু রামের বনবাসে যাওয়া নিয়ে ঘ্যানঘ্যানানি, প্যানপ্যানানি, কান্নাকাটি সাহেবের তেমন পছন্দ হচ্ছিল না। ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছে মাঝে মাঝে ভেড়ুয়াদের কান্নাকাটি দেখে। এমন সময় আসরে নামল বীর হনুমান। হনুমান দেখে সাহেব ভারী খুশি। হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা জম্পেস ব্যাপার হল। সাহেব সঙ্গে সঙ্গে হনুমানের গায়ে একখানা দশ টাকার নোট ছুড়ে দিয়ে বলে উঠল, মোর হনু। মানে বুঝলি? মানে হল, আরও হনুমান চাই। অধিকারী তো তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে আর একজনকে হনুমান সাজিয়ে আসরে নামিয়ে দিল। উপায় তো নেই, সাহেবের মর্জি, সাহেব ফের দশ টাকা বখশিস দিয়ে হেঁকে উঠল, মোর হনুমান। অধিকারীমশাই ফের ছুটে গিয়ে আর একজনকে হনুমান সাজিয়ে নামিয়ে দিল। ফের দশ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম, মোর হনু। সে আমলের দশ টাকা তো কম নয়। টাকার ছড়াছড়ি দেখে তখন রাম সীতা লক্ষ্মণ সবাই গিয়ে হনুমান সেজে এসে আসরে নেমে পড়ল। রামের বনবাস চুলোয় গেল, আসর জুড়ে শুধু হনুমানদের হুপহাপ ধুপধাপ। তা আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। যার রামচন্দ্র হওয়ার কথা ছিল, যার সতীলক্ষ্মী সীতা হওয়ার কথা ছিল, যার

ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ হওয়ার কথা ছিল সবাই নিজের নিজের পাঠ শিকেয় তুলে হনুমান হয়ে নেমে পড়েছে। দেশ জুড়ে এখন শুধু হনুমানদের দাপাদাপি। তাই বলছিলুম, গান্ধীবাবা আর সুভাষ বোস মিলে যে সাহেবদের তাড়াল তাতে লাভটা কী হল বল তো! এক পয়সার পাঁউরুটি দেড় টাকায় ঠেলে উঠেছে।

বিড়ি ধরানোর গন্ধটা বড্ড ভাল লাগল তার। গন্ধেরও কত রকমারি আছে। মিষ্টি ঝাঁঝাঁলো গন্ধে মনটা চনমনে হয়ে যায়। জ্ঞানী লোকটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে বলল, বুড়োশিবতলার জলায় এক সাহেবের মোটরগাড়ি কাদায় বসে গিয়ে হাঁসফাঁস অবস্থা। কিছুতেই তোলা যায় না। তখন কাশীনাথ আর শিবনাথ দুই ভাই ক্ষেতের কাজ সেরে ফিরছিল। কাঁধে হাল, হাতে বলদের দড়ি। অবস্থা দেখে দু ভাই নেমে পড়ল কাদায়। দড়ি বেঁধে বলদ দিয়ে টেনে গাড়ি তুলে দিল। তারপর ঠেলে নিয়ে পৌঁছে দিল দু মাইল দূরের ডাকবাংলোয়। সাহেব খুশি হয়ে দুই ভাইকে একশো টাকা করে বখশিস দিলেন। তখনকার একশো টাকা বাবা! তার অনেক দাম। দুই ভাই টাকা পেয়ে জমিজিরেত কিনে ফেলল। চাষবাস করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলল লহমায়। গাঁয়ে পুকুর কেটে দিল, শিবমন্দির গড়ে দিল। গায়ে সেন্ট মেখে জুতো মসমসিয়ে যখন রাঁড়ের বাড়ি যেত তখন রাস্তার দুধার থেকে লোকে সেলাম ঠুকত। তাই বলছিলুম, গান্ধীবাবা আর সুভাষ বোস মিলে সাহেব তাড়িয়ে কাজটা ভাল করেননি মোটে। সাহেবরা মাথার ওপর ছিল, সে একরকম। এখন যে কে কখন মাথায় চড়ে বসছে নগেনের পোষা বাঁদরটার মতো কে জানে বাবা! যিনি যখন চড়েন তখন তিনিই আমাদের জো-হুজুর।

ট্রাকটা তেমনই কেতরে কুকুরের মতো ঠ্যাং তুলে আছে। খালাসিটা একখানা চাকা খুলে ফেলে আর একখানা লাগাচ্ছে। তার ওপাশে ঝুপসি গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে আলোর চৌহদ্দির বাইরে থেকে ঠেলে উঠছে চাপ-বাঁধা অন্ধকার। ফিনফিনে কুয়াশার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে চায়ের উনুনের ধোঁয়া আর বাসের চাকায় ওড়া ধুলো। উত্তুরে বাতাসে শীতের চোরা টান টের পাওয়া যায়।

মানুষের একটা ফেরা থাকে। কোথা থেকে যে আসে, কোথায় যে ফিরে যায় তার মীমাংসা আজও হল না। দিনশেষে সে বাড়ি ফেরে বটে, কিন্তু এটা ঠিক ফেরা নয়। আর একটা আসল ফেরা আছে তার। সেইটে একটু একটু ভাবিয়ে তোলে তাকে আজকাল।

ধীরেন কাষ্ঠ উঠে পড়ল। পেচ্ছাপের বেগটা আর সামলানো যাচ্ছে না। চাপতে গেলে আজকাল হয়ে পড়ে।

শিশুগাছের তলায় বসে বেগটা ছেড়ে দিয়ে ধীরেন কাষ্ঠ একটা ভারী আরাম পেল। এইসব ছোটোখাটো প্রাকৃতিক কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে একটা ভারী আনন্দ হয় তার। পেচ্ছাপ করার আরামটা কি সবাই টের পায়? কে জানে বাবা! ধীরেন কাষ্ঠ পায়।

ব্যাপারটা যাচাই করার জন্যই সে ভালমানুষের মতো গিরীশ মুহুরিকে জিজ্ঞেস করেছিল, মুতে কেমন আরাম পাও হে গিরীশ?

গিরীশ তখন মাচা থেকে কচি লাউডগা কাটছিল। সুতোয় বেঁধে ভাতে দিয়ে সর্ষের তেল মেখে খেতে চমৎকার। প্রথমে কথাটা বুঝতে পারেনি। তারপর বুঝতে পেরে ভারী চটে উঠে বলল, ও তোমার কেমন কথা ধীরেনদা! মাথাটাই গেছে দেখছি! বলি সব ছেড়ে মুতের খতেন নিতে লেগেছ কেন?

কথাটা আরও দু-চারজনের কাছে যাচাই করার ইচ্ছে ছিল ধীরেনের। কিন্তু আর সাহস পায়নি। আজকাল লোকে বড় খপ করে চটে যায়। অথচ কত কী যে জানতে ইচ্ছে করে, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে লোককে।

ফ্যান্সি স্টোর্সের সামনে দাঁড়িয়ে শো-কেসে সাজানো জিনিসপত্র ভারী অবাক চোখে দেখছিল ধীরেন। যত দিন যাচ্ছে কত কী নতুন নতুন জিনিস আসছে। মানুষের যে কত কী লাগে আজকাল! ধীরেনের লাগে না বটে, কিন্তু জিনিসগুলি সম্পর্কে তার অপার কৌতূহল। এই যেমন শ্যাম্পু বা কর্নফ্লেক বা বোতলের কড়াইশুঁটি কি দাড়ি কামানোর ফোম—যত দেখে তত ভাল লাগে তার।

দোকানি স্বপন একটু ঝুঁকে বলল, টর্চ নেবেন বলেছিলেন, নিলেন না তো জ্যাঠা!

ধীরেন একটু তটস্থ হয়ে বলে, নেব বাবা। বড্ড দাম।

চল্লিশ-পঞ্চাশের নীচে ভাল জিনিস নেই যে। দশ-পনেরো টাকার মালে গ্যারান্টি নেই, আলোও হয় না তেমন।

দেখি। আর দু-চারদিন যাক।

আগে টর্চ লাগত না, আজকাল মনে হয় একটা হলে হত। অন্ধকারে সাপ-খোপের ভয় আছে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি আজকাল কেমন যেন গা ছমছম করে। দিন দিন গা ছমছমে ভাবটা বাড়ছে আর বরুণ মিদ্দার যেন আজকাল কাছেপিঠেই ঘোরাঘুরি করে, তক্কে তক্কে থাকে। ধীরেন আজকাল এসব টের পায় খুব। গত পঁয়তাল্লিশ বছর বরুণ মিদ্দারের চিহ্নও ছিল না, এখন কেন যে ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে কে জানে বাবা।

কথাটা পাঁচকান করার মতো নয়। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ধীরেন কাষ্ঠ নামে বাইশ-তেইশ বছরের যে তরতাজা জোয়ান দাপিয়ে বেড়াত তার সঙ্গে এখনকার এই ধীরেন কাষ্ঠর সম্পর্কটাই বুঝতে কষ্ট হয়। কালোর মধ্যেও ভারী নাকি সুন্দর চেহারা ছিল সেই ধীরেন কাষ্ঠর। আর ছিল নানা দিকে মন। ম্যাট্রিক পাসটা করেছিল কোনওক্রমে, তারপর আর পড়া হল না। তবে হাতের কাজে ঝোঁক ছিল খুব। ভাল লাটাই তৈরি করতে পারত, পুতুল গড়ত, মূর্তি তৈরি করতে পারত, কাঠের কাজেও ছিল ভাল হাত। কিন্তু পাঁচ রকম জিনিসে মন দিতে গেলে কোনওটাই তেমন হয়ে ওঠে না। বাবা চরণ কাষ্ঠ তাড়না করত খুব। টাকা আয় না করলে ঘরছাড়া করার হুমকি দিত।

সেই সময়ে পাশের গাঁ শূলপুরে বরুণ মিদ্দারের কাছে গিয়ে জুটল সে। গুণী মানুষ, ঘরে বসে মৃদঙ্গ, খোল, দোতারা এইসব তৈরি করত। বিক্রিবাটা কিছু খারাপ হত না। তবে হাঁফি রুগি বলে সারা বছর কাজ তুলতে পারত না। ধীরেনকে পেয়ে তার সুবিধে হল। ধীরেন চিৎপুর থেকে কাঁচা মাল কিনে আনত, খদ্দের ধরে আনত আর বাকি সময়টা কাজ শিখত।

কিন্তু জীবনটা তো সবসময় সোজা পথে চলে না। হঠাৎ হঠাৎ বাঁক ফেরে। আর তখনই ভাঙন লাগে।

মিদ্দারের ঘরে ছিল কালনাগিনী। যেমন তার লকলকে চেহারা, তেমনই তার ঠাটঠমক। চোখের ভিতর থেকে যেন ইলেকট্রিক ঠিকরে আসত। বাপ রে! প্রথম প্রথম দেখে তো ভয়ই খেয়ে যেত ধীরেন। এই ফুটন্ত যুবতী বউকে সামলায় কী করে রোগাভোগা বরুণ মিদ্দার!

কারণে অকারণে তাদের কাজের ঘরে এসে উদয় হত বাতাসী। দু হাত তুলে খোঁপা ঠিক করত—তাতে বুকখান ঠেলে উঁচু হয়ে উঠত বেশ, অকাজের কথা বলে বলে ভাব করত ধীরেনের সঙ্গে। বরুণ মিদ্দার কিছু বলত না। তবে মুখ দেখে মনে হত বউ নিয়ে তার স্বস্তি নেই।

কিছুদিনের মধ্যেই ইশারা ইঙ্গিত শুরু করে দিল বাতাসী। সুরেলা গলায় উঠোন থেকে হয়তো একটু রসের গান গেয়ে উঠল, বা ছাগলছানাটাকে কোলে নিয়ে এমন সব কথা বলে আদর করত যা ছাগলছানাকে বলার

কথা নয়।

সেই বয়সে তখনও ধীরেনের মেয়েমানুষের বউনি হয়নি। বাধো-বাধো ভাব তো ছিলই, ভয়ও ছিল বেশ। কীসে পাপ লেগে যায় কে জানে বাবা! কিন্তু ওই দামাল বয়সে বাঁধ রাখাও কঠিন কাজ।

মুশকিল হল বরুণ মিদ্দার ঘর থেকে বেরোত না মোটে। রোগাভোগা মানুষ বলেও বটে আর তার কাজটাও ঘরে-বসা কাজ বলেও বটে। ফলে বাতাসীর বিশেষ সুবিধে হচ্ছিল না। ধীরেনও নিজেকে খুব সংযত রাখত। ইশারা ইঙ্গিত পেয়েও চোখ তুলে তাকাত না।

কিন্তু সুযোগসন্ধানীদের কখনও সুযোগের অভাব হয়নি। ভগবানই কি পাপীদের জন্য নানা ফাঁকফোকর তৈরি করে দেন? তাই যদি না হবে তবে হঠাৎ সেদিন সন্ধেবেলা ঘটকবাড়ি থেকে বরুণ মিদ্দারের ডাক আসবে কেন? ঘটকরা বড় মানুষ, ডাকলে না গিয়ে উপায় নেই। মেয়ের স্কেল চেঞ্জার হারমোনিয়ম খারাপ হয়েছে, ফলে তাকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে, আজই গিয়ে হারমোনিয়ম সারিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

বরুণ মিদ্দার যখন শশব্যস্তে যন্ত্রপাতির ব্যাগ নিয়ে রওনা হচ্ছিল তখন ভালমানুষের মতো ধীরেন বলেছিল, চলুন আমিও সঙ্গে যাই। কাজটা শেখাও হবে।

কথাটা শুনে ঘাড়ও কাত করেছিল মিদ্দার। তারপরই দোনোমোনোতে পড়ে গেল। নিয়তি কেন বাধ্যতে। যে খোলটার কাজ চলছিল সেটা সত্যকিশোর দাসের। মস্ত কীর্তনীয়া। কাজটাও জরুরি। কাল সকালেই সত্যকিশোরের লোক আসবে খোল নিতে। নগদ টাকার কারবার। তাই মিদ্দার একটু ভেবে বলল, হারমোনিয়ম সারাতে সময় লাগবে। তুই বরং খোলটা এগিয়ে রাখ, আমি এসে বাকিটুকু করব।

নিয়তি! নিয়তি ছাড়া আর কী? মিদ্দার কুকুরের মুখের কাছে রসালো মাংসের টুকরো রেখে চলে গেল। আহাম্মক আর কাকে বলে!

বোধহয় পাশের শোওয়ার ঘরে দম বন্ধ করে অপেক্ষায় ছিল বাতাসী। তাকেই কি দোষ দিতে পারে ধীরেন? না, আজও দোষ দিয়ে উঠতে পারে না। উপোসি শরীর, তীব্র অতৃপ্ত কাম কামনা, মনের জ্বালা মানুষের মাথা ঠিক রাখতে দেয় নাকি?

মিদ্দার বাড়ির চৌহদ্দি ডিঙোতে না ডিঙোতেই বাতাসী যেন বাজপাখির মতো উড়ে এল।

অ্যাই!

ধীরেন ধুকপুক করা বুকে নিচু মাথা উপরে তুলেই দেখল দুটো চোখ জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। শরীরের ছিলা টান টান।

ধীরেন ভালমানুষের মতো বলল, কী?

যেন ভারী অবাক হয়ে বড় বড় চোখ করে বাতাসী বলল, কী? কী?

তারপরই ছুটে এসে তার ঝাঁকড়া চুল দু হাতে খামচে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে পাগলের মতো বলতে লাগল, কী? কী? তুমি জানো না কী? তুমি জানো না? ন্যাকা কোথাকার...

গায়ে কী জোর রে বাবা! ধীরেনের মতো জোয়ান লোককে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ফেলল পাশের ঘরের বিছানায়। উন্মাদিনীর মতো তাকে খাবলাচ্ছে, খিমচোচ্ছে আর বলছে, জানো না কী? জানো না? বদমাশ! শয়তান! জানো না?

ধীরেনের বাঁধ ভেঙেছিল আগেই। এবার ভেসে গেল।

কতটা পাপ হল তা ধীরেন জানে না। কিন্তু কোনওদিন যদি ভগবান তাকে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন তা হলে ধীরেনও সপাটে বলবে, আমি কি ইচ্ছে করে করেছি কিছু? আপনিই তো ঠাকুর, ঘটকবাড়ির হারমোনিয়ম খারাপ করে রেখেছিলেন। তাও ভর সন্ধেবেলা। তার ওপর আবার পরদিন ঘটকবাড়ির মেয়েকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসছে বলে তাদের তর সয় না। এই এতগুলো যোগাযোগ এই ত্র্যহস্পর্শ ঠাকুর, আপনি ছাড়া আর কে ঘটাতে পারে? আমি তো সঙ্গেই যেতুম, কিন্তু সত্যকিশোরের খোল বাদ সাধল যে!

পাপবোধটা বড্ড খোঁচা দিচ্ছিল, যখন একটু বেশি রাতের দিকে বরুণ ফিরে এল। তখন ধীরেন নতুন খোল ছাওয়ার কাজটা অনেক এগিয়ে রেখেছে। বরুণ তার মুখখানা ভাল করে দেখল। তারপর মুখটা একটু তেতো করে বলল, রাত হয়েছে বাড়ি যা।

মিদ্দার বোকা লোক নয় যে, টের পাবে না। এসব বাতাসেই টের পাওয়া যায়, টের পেতে চাইলে। খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে, দুরুদুরু বুকেই অত রাতে দু মাইল পথ হেঁটে বাড়ি ফিরেছিল ধীরেন। দুশ্চিন্তায় আর ভয়ে রাতে ভাল ঘুম হয়নি। তন্দ্রার মধ্যেও মনস্তাপে বারবার চমকে ঘুম ভেঙে গেছে।

পরদিন অপরাধী মুখ নিয়ে সে যখন গিয়ে মিদ্দারের বাড়িতে হাজির হল তখন কোনও বৈলক্ষণ চোখে পড়ল না। মিদ্দার তার কাজের ঘরে বসে কাজ করছে, বাতাসী ঘরকন্নার কাজ করছে। তাকে দেখে একটু হাসল। খুব মিষ্টি আর মানেওয়ালা হাসি।

একবার হলে পাপ আবার হতে চায়। একবার পর্দাটা সরে গেলে আর ঢাকা-চাপা দেওয়া যায় না কি না।

কিন্তু বরুণ মিদ্দার তো আর নিত্যি নিত্যি সন্ধেবেলা ঘটকবাড়ি হারমোনিয়ম সারাতে যায় না। সুতরাং বাতাসী অন্য পন্থা নিল। রান্নায় মিশিয়ে কী যেন একটা খাইয়ে দিল মিদ্দারকে। সেই খেয়ে মিদ্দারের ছুটল হাগা। একে রোগাভোগা মানুষ, চার-পাঁচবার দস্তি করেই নির্জীব হয়ে নেতিয়ে পড়ল বিছানায়। গাঁয়েগঞ্জে ডাক্তারের ব্যবস্থা নেই। গ্যাঁদাল থানকুনি ছেঁচে বাতাসীই খাওয়াল তাকে। দুর্বল মানুষটা যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন ফের ব্যাপারটা হল। কী শরীর! কী শরীর বাতাসীর!

তবে ষড়যন্ত্রটা মোটেই ভাল লাগল না ধীরেনের। সে বলল, তুমি খুব পাষণ্ড আছ বাপু। মিদ্দারকে ওষুধ খাওয়ালে, মরে-টরে যেত যদি?

যেত তো যেত। মরলে বাঁচি। সারাজীবন ওই নপুংসককে গলায় ঝুলিয়ে বেঁচে থাকব নাকি?

কাজটা ভাল করোনি। এরকম করলে আমি কিন্তু আর আসব না।

ইস্! না এসে পারবে?

পারবে না, সে ধীরেনও জানে। তার তখন নেশা ধরেছে।

বাতাসী একদিন প্রস্তাব দিল, আমাকে নিয়ে পালাবে?

এ প্রস্তাবে আকাশ থেকে পড়ল ধীরেন। বিয়ে করার মতো অবস্থাই তার নয়। বাপ এমনিতেই রোজ চাকরি-বাকরি করার জন্য হুড়ো লাগাচ্ছে। মাও মুখনাড়া দিয়ে তবে দুটি ভাত দেয়। তার ওপর অন্যের বউ ফুসলিয়ে বাড়ি নিয়ে তুললে তো চিত্তির। বাড়িতে কাকচিল বসতে পারবে না। তার ওপর বাতাসীর মতো মেয়েছেলে। এ তো দিনকে রাত করতে পারে। একে বিশ্বাস কী?

সে মিন মিন করে বলল, কাজটা ঠিক হবে না।

কেন হবে না শুনি? তোমার আপত্তি কীসের?

শত হলেও বরুণদাদা আমার গুরু, তার কাছে কাজ শিখছি। তার সঙ্গে নেমকরাহামি করব কী করে?

আহা, সাধুপুরুষ রে! নিমকহারামি যা করার তো করেই ফেলেছ। আমার পেটে তোমার ছেলে। নিমকহারামির আর বাকি আছে কিছু?

খবরটা শুনে ধীরেন অগাধ জলে পড়ল। ঘটনাটা সত্যি হয়ে থাকলে তো জল অনেক দূর গড়িয়েছে। ভয় খেয়ে ধীরেন বলল, আমার চালচুলো নেই বাতাসী, তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার মতো অবস্থাও নয়।

বাতাসী বলল, তা হলে মিদ্দারকে সরাও। সরিয়ে দুজনে বেশ এখানেই থাকব।

ধীরেন অবাক হয়ে বলে, সরাব? সরাব কোথায়?

আহা, সরানো মানে বুঝলে না? দুনিয়া থেকে সরাও।

ধীরেনের মাথায় বজ্রাঘাত। মেয়েটা বলে কী? এ যে মিদ্দারকে খুন করাতে চাইছে! ভীষণ ভয় খেয়ে সে বলল, ছিঃ, ওসব বোলো না। বলতে নেই। শুনলেও পাপ হয়।

মশা মাছি মারলে যা পাপ হয় ভগবানের দুনিয়ায় মানুষ মারলে তার বেশি হয় না। বুঝলে? যদি পাপের ভয়ে পিছিয়ে যাও তা হলে তুমি বোকা। ভগবানের কাছে মশা, মাছি, পোকা, মানুষ সব সমান।

ধীরেন মাথা নেড়ে বলল, ওসব মরে গেলেও আমি পারব না।

তা হলে কাজটা আমিই করব। তুমি সাহায্য কোরো, তাহলেই হবে।

ধীরেন এ কথায় এত ভয় পেয়েছিল যে বলার নয়।

যে সময়ে তাদের কথা হচ্ছিল সে সময়ে মিদ্দার হাটে গিয়েছিল। ফিরে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে তাদের কথা বলতে দেখে গম্ভীর মুখ করে নিজের কাজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ভারী অপরাধবোধ হচ্ছিল ধীরেনের। একটু আগেই দুপুরবেলা মিদ্দারের বিছানাতেই জড়ামড়ি করে শুয়ে থেকেছে সে আর বাতাসী। দুপুর তুফানের মতো উড়ে গেছে। এখন বড় অবসাদ, বড় পাপবোধ। মিদ্দার বোধহয় সবই টের পায়, তবে কেন ফুঁসে ওঠে না? কেন তাড়িয়ে দেয় না ধীরেনকে? কেন ঝাঁটাপেটা করে না বাতাসীকে?

ধীরেন বড় টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে গেল। কী যে অবস্থা গেছে কদিন তা বলার নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এসব কাণ্ড যখন চলছে তখনও কিন্তু বরুণ মিদ্দার শান্ত, চুপচাপ। আপনমনে নিজের কাজ করে যায়। তার ঘর থেকে নানা বাদ্যযন্ত্র পরীক্ষার নানা সুরেলা শব্দ ওঠে। আর কোনওদিকেই যেন মন নেই মিদ্দারের।

তখন ঘোর বর্ষাকাল। এক তুমুল বৃষ্টির রাতে বরুণ মিদ্দার বলল, আজ কি আর যেতে পারবি?

ধীরেন বলল, পারব। বর্ষাবাদলায় আমার অসুবিধে হয় না।

বরুণ মিদ্দার বলল, কাজ কী ফিরে? চাট্টি ভাত খেয়ে এখানেই শুয়ে থাক।

ধীরেন আপত্তি করল না। রাতে বাতাসী খিচুড়ি রেঁধেছিল। তাই খেয়ে বাদ্যযন্ত্রের ঘরে মাদুরে শুয়ে রইল ধীরেন। তুমুল বৃষ্টি আর প্রলয়-বাতাসে ঘরদোর ভেঙে পড়ার অবস্থা। পাশের ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী হচ্ছে তা ভাবতে ভাবতে একটু ভয়-ভয় ভাব নিয়েই ধীরেন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অচেনা যে-ভয়টা তার মনের মধ্যে ছিল সেই ভয়টা যে কেন তা হঠাৎ করে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যখন নিশুত রাতে হঠাৎ একটা উন্মাদিনী মেয়েমানুষের শরীর তাকে সাপের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল।

ধীরেন সেই আলিঙ্গন ছাড়াতে ছাড়াতে চাপা গলায় বলল, করো কী? বরুণদা টের পাবে যে!

ভয় নেই, ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছি।

কী ওষুধ?

ও তুমি বুঝবে না।

বিষ দাওনি তো?

না গো না, ঘুমের ওষুধ। ভয় পেও না।

মনে একটা ধন্দ থেকেই গিয়েছিল তবু ধীরেনের। এ পাগলি কী করে এল মিদ্দারকে ফাঁকি দিয়ে কে জানে! বাতাসীকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল না। সে তার পাওনাগণ্ডা আদায় করে যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল হঠাৎ। বৃষ্টির তেজ আরও বাড়ল। হাওয়ায় তখন ঝড়ের গর্জন। ধীরেন অশান্ত মনে খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

ম্যাদাটে আলোয় ভোরবেলা উঠে ধীরেন দেখল, ঝোড়ো বাতাস থামলেও বৃষ্টি পড়েই চলেছে। উঠোনে এক হাঁটু জল। ঘরের ভিটে ডুবে যেতে আর খুব বাকি নেই। কেঁচো, কেন্নো, উইচিংড়েরা বারান্দা ভরে ফেলেছে। আর উঠোন, বাগান, সব জলে একাকার। কোথাও ডাঙাজমি দেখা যাচ্ছে না। ঘটির জলে চোখমুখ ধুয়ে সে কিছুক্ষণ চারদিকের অবস্থা দেখল দাঁড়িয়ে। এই অবস্থায় বাড়ি ফেরা শক্ত হবে। কিন্তু ফেরাটাও দরকার। কাল রাতে যা হল তাতে তার আর এ-বাড়িতে থাকতে সাহস হচ্ছে না। বরুণ মিদ্দার কিছু টের পেয়ে থাকলে বড় লজ্জার কথা।

ও-ঘর থেকে অবশ্য কোনও সাড়াশব্দ আসছিল না। আকাশের আলো দেখে ধীরেন অনুমান করল, সকাল ছটা-সাড়ে ছটা হবে। এত বেলা অবধি ওদের ঘুমোনোর কথা নয়।

ধীরেন ঘরে এসে মাদুরে চুপচাপ বসে রইল। মনে বড় দুশ্চিন্তা।

আরও কিছুক্ষণ বাদে দরজা খোলার শব্দ হল। ও-ঘর থেকে বরুণ মিদ্দার এসে মাদুরে বসল। তাকে দেখে খুশিই হল ধীরেন। যাক, বাতাসী তাহলে লোকটাকে বিষ-টিষ দেয়নি। কিন্তু মিদ্দারের অবস্থা ভাল নয়। বর্ষার ঠান্ডা আর জোলো বাতাসে তার হাঁফের টান উঠেছে, গলায় শ্লেষ্মার শব্দ হচ্ছে, চোখ দুটো লাল আর টসটসে। গলা আর মাথায় কম্ফর্টার জড়ানো। গায়ে চাদর।

এঃ, শরীরটা যে খারাপ দেখছি বরুণদাদা?

বরুণ মিদ্দার কথাই কইতে পারল না। কিছুক্ষণ হাঁফাল, বারান্দায় গিয়ে অনেকটা শ্লেষ্মা ফেলে এসে ফের কিছুক্ষণ কাহিল শরীরে বসে হাঁফ ছাড়ার জন্য হাঁসফাঁস করল। আবার গিয়ে শ্লেষ্মা ফেলল।

বার কয়েক শ্লেষ্মা উগড়ে একটু ধাতস্থ হয়ে বরুণ মিদ্দার হঠাৎ তাকে বলল, তোর তো গায়ে বেশ জোর-টোর আছে। একটা ভারী জিনিস তুলতে পারবি?

ধীরেন অবাক হয়ে বলল, কী তুলতে হবে বরুণদাদা?

একটা লাশ। মেয়েমানুষের লাশ।

ধীরেন এত স্তম্ভিত হয়ে গেল যে, মুখ দিয়ে বাক্য সরল না। বড় বড় চোখে চেয়ে রইল।

পারবি না?

ধীরেন স্খলিত কণ্ঠে শুধু বলল, অ্যাঁ!

বরুণ মিদ্দার হঠাৎ একটা হাত বাড়িয়ে তার ডান হাতের কবজিটা শক্ত করে ধরে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, আয়।

ধীরেনের আজও মনে আছে, সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে মিদ্দারের সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। শরীরে একরত্তি শক্তি নেই, পা দুটো ভেঙে আসছে ভয়ে, মাথাটা বড্ড ধোঁয়াটে।

দরজা জানালা বন্ধ বলে ঘরটা এখনও অন্ধকার। আবছা দেখা যাচ্ছিল, বাতাসী বিছানায় আড়াআড়িভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। দুটো পা বেরিয়ে আছে চৌকির বাইরে।

ধীরেন হাঁ করে চেয়ে রইল।

বরুণ মিদ্দার বলল, এতকাল লুকিয়ে-চুরিয়ে নষ্টামি করছিল, টের পেয়েও কিছু বলিনি। আমি কি বুঝি না যে, ওরও একটা পুরুষমানুষ দরকার! টের পেয়েও না-পাওয়ার ভান করতুম। কিন্তু কাল রাতে যা করল তা কি সহ্য করা যায় বল তো! হাঁফানির টান বেড়েছে বলে ঘুমোতে পারছি না। এপাশ ওপাশ করছি। জেগে আছি জেনেও দিব্যি উঠে চলে এল এ-ঘরে। আমি গলাখাঁকারি দিয়ে জানান দিলুম যে জেগে আছি। তবু গ্রাহ্য করল না। যেন আমি কেউ না, কিছু না। চলে এল, আর আমি তখন বসে বসে ভাবলুম যা করার আজই করতে হবে। এ জিনিস আর সহ্য করা যায় না।

ধীরেন তখনও হাঁ করে পলকহীন চোখে চেয়ে আছে মিদ্দারের দিকে। বরুণ মিদ্দার তার চাদরের তলা থেকে তার হাতটা বের করল। হাতে একটা তারের কাঁস। বাদ্যযন্ত্রের সরু স্টিলের শক্ত তার দিয়ে তৈরি। একপ্রান্তে কাঠের হাতল লাগিয়ে নিয়েছে, যাতে টান মারতে সুবিধে হয়। এ অস্ত্র যে ভয়ংকর তা ধীরেন জানে, একটা হ্যাঁচকা টান মারলেই গলার মাংস কেটে বসে যাবে। আধখানা গলা নেমে যাবে লহমায়। দড়ির ফাঁসের চেয়ে বহুগুণ ভয়ংকর।

বরুণ মিদ্দার বলল, একটা শব্দ করারও সময় পায়নি। হাসি-হাসি মুখ করে তোর ঘর থেকে এসে দিব্যি আমার পাশে শুয়ে পড়ল। এমনকী আমি জেগে আছি জেনেও নির্লজ্জের মতো বলল, একটু সরে শোও তো, গরম লাগছে। যেন কিছুই হয়নি। গায়ে জ্বালা করে না, বল তো! কিন্তু আমি হড়বড় পছন্দ করি না। ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে পছন্দ করি। চমকে দেওয়ার জন্য বললুম, হ্যারিকেনটা একটু উসকে দেখ তো, ঘরে বোধহয় সাপ ঢুকেছে। সাপ শুনে টক করে উঠে বসে বলল, কোথায় সাপ? ব্যস, ওইটাই শেষ কথা। তৈরিই ছিলুম, ও উঠে বসতেই গলায় ফাঁসটা গলিয়ে টেনে দিলুম।

ধীরেন ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। শুধু ভাঙা গলায় বলল, সর্বনাশ!

একটু হাত লাগাতে হবে যে রে। লাশটা ইট বেঁধে পিছনের ডোবায় ফেলতে হবে।

ধীরেন আতঙ্কিত গলায় বলল, আমি পারব না।

বরুণ মিদ্দার হাসল, পারব না বললে কি হয়! ফুর্তি টবে আর দায় সারবে না তাই কি হয়?

পায়ে ধরছি বরুণদা, ও আমি পারব না।

পারত না ধীরেন। তার হাত-পা ভয়ে অবশ। দৌড়ে পালাবে ভেবেছিল, কিন্তু শরীরে তখন একরত্তি ক্ষমতা নেই।

আচমকাই বরুণ মিদ্দার হাতের ফাঁসটা তার গলায় গলিয়ে হালকা একটা টানে সেঁটে দিয়েছিল ফাঁস। ওই একটু টানেই ধারালো তার বসে গেল গলায়, দম আটকে এল তার। টপটপ করে গরম রক্ত ঝরে পড়ছিল গলা থেকে বুকে।

ফাঁসটা আলগা করে বরুণ মিদ্দার বলল, এই। ওকে কাঁধে নে। গড়বড় করলে কিন্তু বাঁচবি না।

ধীরেনের বাঁচার কথাই ছিল না সেদিন। বরুণ মিদ্দার রোগাভোগা মানুষ হলেও রাগে আর প্রতিহিংসায় সেদিন তার শরীর লোহার মতো শক্ত। আর ধীরেন সেদিন ভয়ে আতঙ্কে কেঁচো। গলায় তারের ফাঁস, তার হাতলটা মিদ্দারের শক্ত মুঠোয় ধরা। সেই অবস্থাতেই বাতাসীর ঠান্ডা শক্ত শরীরটা যে কীভাবে কাঁধে তুলেছিল ধীরেন তা আজও রহস্য। প্রাণের ভয়ে মানুষ কী না পারে! বাতাসীর গলা অর্ধেক নেমে গিয়েছিল, রক্তে ভেসে যাচ্ছিল বিছানা। বরুণ মিদ্দার ফাঁসের হাতল ধরে থেকেই দরজা খুলল, বলল, নাম।

উঠোনে হাঁটু জল, এঁটেল পিছল মাটি, কাঁধে বাতাসী। সে যে কী অবস্থা তার! সে যদি হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যায় তাহলে মিদ্দারের হাতে ধরা ফাঁস ঘ্যাঁস করে গলায় বসে যাবে। আর মিদ্দার যদি পা পিছলে পড়ে তাহলেও একই পরিণতি। ধীরেনের তখন দু চোখে জলের ধারা। এরকম বিপদে সে কখনও পড়েনি। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। চারদিক অন্ধকার। লোকজনের চিহ্ন নেই। উঠোন পেরোনোই হয়ে দাঁড়িয়েছিল শক্ত কাজ। পা টিপে টিপে সেটা পেরোনোর পর পিছনে ডোবার ঢাল। ঢালু দিয়ে এই লাশ কাঁধে নিয়ে নামা তো সোজা নয়। একটু এদিক ওদিক হলেই তার গলায় ফাঁস বসে যাবে।

সজনেগাছের তলায় কিছু ভাঙা ইটের স্তূপ ছিল। সেখানে এসে মিদ্দার বলল, ওকে নামিয়ে ওর পেট-কোঁচড়ে ইটের টুকরোগুলো ভাল করে বাঁধ। তাড়াতাড়ি কর, সময় নেই।

সেই জলের মধ্যে বাতাসীকে নামাতে হল। তারপর ইটের টুকরো জড়ো করে আঁচলে বেঁধে তা কোমরে জড়িয়ে গিট দেওয়া—ওই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে কাজটা তো সোজা নয়। তার ওপর ধীরেনের হাত-পা তখন বশে নেই। তবু সে অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য প্রাণের তাড়নায় জন্তুর মতো—মিদ্দার যেমন বলছিল—করে যাচ্ছিল। কাজটা যে খুব সুষ্ঠু হল তাও নয়। আঁচল কোমরে জড়িয়ে বাঁধতে গিয়ে বারবার বাতাসীর মুখের দিকে চাইতে হচ্ছিল তাকে আর চোখ বুজে ফেলছিল সে।

এবার সাবধানে ডোবার ঘাটে নাম।

নাবব? পড়ে যাব যে! আর পড়লেই—

বৃষ্টিতে ভিজে এখন বরুণ মিদ্দারের অবস্থাও ভাল নয়। হাঁফের টান চৌগুণে উঠেছে। তবু গর্জন করল, নাম বলছি। মরলে দুজনেই মরব। মরতে ভয় কী রে শালা? ফুর্তি লোটার সময় মনে ছিল না?

ডোবার নাবালে ওই লাশ নিয়ে নামতে গিয়েই ধীরেন বুঝল, আজ মৃত্যু নির্ঘাৎ। এত পেছল মাটি যে দাঁড়ানোই যাচ্ছে না। এক ধাপের পর দ্বিতীয় ধাপেই হঠাৎ পা হড়কে চিত হয়ে পড়ে গেল ধীরেন। বাতাসীর লাশ পড়ল তার ওপর। চোখের পলকে তার গলায় ফাঁসটা টাইট হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু হঠাৎ সেটা ফের আলগাও হয়ে গেল।

হাঁচোড়-পাঁচোড় করে মাথা তুলেই ধীরেন দেখল, বরুণ মিদ্দারও পড়ে গেছে জলে। হাতে ফাঁসের হাতলটা নেই। সাদা মুখ, বড় বড় চোখ, হাঁ করে শ্বাস টানতে টানতে উঠতে চেষ্টা করছে। ধীরেন দেখল, এই সুযোগ। এক মুহূর্ত দেরি না করে সে বরুণ মিদ্দারের মাথাটা ধরে চেপে দিল জলের তলায়। হাত পা ছুড়েছিল বটে মিদ্দার। আঁকুপাঁকু করেছিল। কিন্তু এক মিনিটও নয়। জলের তলায় স্থির হয়ে গিয়েছিল সে। গলার ফাঁসটা খুলতে ভুলে গিয়েই ধীরেন জল ভেঙে ছুটতে শুরু করেছিল।

সাত

ভোররাতের নির্জনতায় একটা অ্যালার্ম ঘড়ি বেজে উঠল। কুক-কুক-কুক-কুক।

নিস্তব্ধতার ওপর শব্দের ছুরি বসে যাচ্ছে উপর্যুপরি। সেই শব্দে তন্দ্রা ভেঙে নিরর্থক খানিকক্ষণ প্রথমে ভুক ভুক, তার পর ভৌ ভৌ করে চেঁচাল কেলো নামে কুকুরটা। তার কোনও বীরত্ব নেই, সে জানে। মাঝে মাঝে তবু তাকে নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে হয়। মহিম রায়ের বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে সে খানিকক্ষণ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে ঘড়িটাকে বকাঝকা করল। অ্যালার্ম থামল না। কোয়ার্টজ ঘড়ির অ্যালার্ম সহজে থামেও না। তীক্ষ্ণ শব্দটা বারবার চারদিকের নির্জনতায় ছুরির মতো ঢুকে যাচ্ছে।

কেলোর চিৎকারেই ধড়মড় করে উঠে বসেছিল সন্ধ্যা। চোর এল নাকি? চোরেদের খবর থাকে। কাল রাতেই ছ হাজার সাতশো টাকা পেমেন্ট দিয়ে গেছে রাতুল নস্কর। টাকাটা এখনও তার বালিশের তলায়। কাল রাতে আলমারিতে তুলে রাখার সময় পায়নি। বালিশের নীচে হাত ঢুকিয়ে সে তাড়াতাড়ি বান্ডিলটা দেখল। অনেক কষ্টের রোজগার তার। টাকাও কি সহজে আদায় হয়েছে এতকাল? দোকানদাররা টাকা দিতে কত গড়িমসি করে। কতবার ঘোরায়। বেশি তাগাদা দিলে মাল তুলতে চায় না। আজকাল আদায় উশুল খানিকটা সহজ হয়েছে। টর্চ জ্বেলে চারদিকটা দেখে নিল সন্ধ্যা। না, কেউ ঢোকেনি ঘরে। ওপাশের আর একটা চৌকিতে সীমন্তিনী নামে কাজের মেয়েটা ঘুমোচ্ছে। গাঢ় ঘুম। সারাদিন যা অসুরের মতো খাটুনি যায় তাতে সন্ধ্যারও ঘুম গাঢ় হওয়ার কথা। কিন্তু হয় না। মাঝে মাঝে নিশুতরাতে অকারণে ঘুম ভেঙে যায়। না, ঠিক অকারণে নয়। ঘরে নগদ টাকা থাকে তার। সব সময়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে দিয়ে আসার সময় হয় না। চোরছ্যাঁচড়ের ভয়েতেই বোধহয় আজকাল ঘুম খুব সজাগ হয়েছে তার। পঞ্জিকা থেকে চোরের মন্তর শিখে নিয়েছে সে। রোজ সেইসব মন্তর বিড়বিড় করে আওড়ায়। তারপর শোয়। কিন্তু মন্তরের ভরসায় আর কে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় বাবা! ঘুম ভাঙার আরও একটা কারণ হল, তার এই জীবনটা। এ যে কোথায় গিয়ে কেমনভাবে শেষ হবে কে জানে! মাঝে মাঝে একজন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় বটে, কিন্তু বড় বাধো-বাধো ঠেকে। বাবা বা দাদারা শুননে কী বলবে। বাবা হয়তো শয্যাই নিয়ে নেবে। ওসব ভাবতে কেন যেন সাহস হয় না তার, আবার ইচ্ছেও করে। স্বামীটার কথাও সারা দিনে না হলেও এই নিশুতি রাতে ঠিক মনে পড়বেই। হাড়েবজ্জাত লোকটার ওপর তার রাগ হয় বটে, কিন্তু কেন যেন মায়াও হয়। পুরুষ জাতটা তো ভালবাসতে জানে না। ভালবাসে মেয়েরাই। আর সেই জন্যই মরে।

কেলোর চিৎকার ছাপিয়ে ঘড়ির অ্যালার্মটা হঠাৎ শুনতে পেল সন্ধ্যা। মুরগি যেমন উঠোনে দানা খুঁটতে খুঁটতে আদুরে শব্দ করে ঠিক তেমনই শব্দ। কুক-কুক-কুক-কুক। দোতলা থেকে আসছে। টর্চ জ্বেলে দেয়ালঘড়িটা দেখল সন্ধ্যা। ভোর পৌনে চারটে বাজে। মেমসাহেব এত সকালে তো ওঠে না। বেলা আটটা বাজলে বারান্দায় এসে নাইটি-পরা অবস্থায় ভাসুর-শ্বশুরের চোখের সামনে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ব্রাশ

দিয়ে দাঁত মাজে। তখন সন্ধ্যার ইচ্ছে করে একটা ঢেলা তুলে ছুড়ে মারতে। কিন্তু মেয়েটা একটু কিম্ভূত আছে। সন্ধ্যা ওঠে ভোর পাঁচটায় বা তারও একটু আগে। উঠে প্রায় সময়েই দেখতে পায়, মেয়েটা ভূতের মতো বারান্দার এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কেন ওরকম দাঁড়িয়ে থাকে কে জানে বাপু!

সন্ধ্যার সন্দেহ ক্রমে ঘনীভূত হচ্ছে। ছেলেটা কলকাতায় যাতায়াত করে বটে, কিন্তু মা আর মেয়েতে পনেরো-ষোলোদিন ধরে কেন যে থানা গেড়ে আছে সেটাই সন্দেহের বিষয়। মেজদা কিছুতেই ওদের নিয়ে যাচ্ছে না। শুধু মেয়েটার অ্যালার্জি সারাতেই এখানে রয়েছে, এটা গুয়ে হাত দিয়ে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। কেলেঙ্কারির গন্ধটা খুব পাচ্ছে সন্ধ্যা, কিন্তু সেটা কতদূর খারাপ সেটাই ধরতে পারছে না। কথা বললে পাছে মুখ ফসকে দু-একটা কথা বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়েই বাড়ির কারও সঙ্গে কথাই বলে না ওরা। এমনকী ওদের খাবার পর্যন্ত ঝি সাবিত্রীকে দিয়ে ঘরে পৌঁছে দিতে হয়।

আমলকীটা খুব চলছে। বিটনুন দিয়ে জাবিয়ে রোদে শুকিয়ে প্যাকেট করে ছেড়েছে সন্ধ্যা। খুব চলে। গত শীতে এক কুইন্টাল আমলকী কিনেছিল, তার কয়েক কেজি মাত্র পড়ে আছে। ঘরে রাখলে ছাতা ধরে যায় বলে মাঝে মাঝে রোদে দিতে হয়। পরশু দিন উঠোনে চাটাই পেতে যখন আমলকীগুলোকে রোদ খাওয়াচ্ছিল সে তখন মেয়েটা হঠাৎ দোতলা থেকে নেমে এল। একটু এদিক ওদিক পায়চারি করে কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যা আড়চোখে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। পাত্তা দেয়নি।

মেয়েটাই আচমকা বলল, এগুলো কি আমলকী?

সন্ধ্যা একটু অবাক হল। তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে, এতটা ভাবেনি। ভদ্রতার খাতিরেই সন্ধ্যা বলেছিল, হ্যাঁ।

তাকে আরও অবাক করে দিয়ে মেয়েটা বলল, একটু টেস্ট করে দেখতে পারি?

ভারী অবাক হল সন্ধ্যা, একটু খুশিও হল কি? একটু কথা বলার ভিতর দিয়ে যে কত মেঘ কেটে যায়। সন্ধ্যা বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাও না, খাও।

সোহাগ নিচু হয়ে দু-তিনটে আমলকী তুলে মুখে দিয়ে তার দিকে চেয়ে ছেলেমানুষের মতো বলল, এগুলো কি চিবিয়ে খেতে হয়?

সন্ধ্যা একটু হেসে বলে, না না। শুকনো আমলকি চিবিয়ে খাওয়া যায় না। গালে রেখে দাও। ভিজে নরম হয়ে গেলে তখন চিবোবে।।

সোহাগ খানিকক্ষণ মুখের আমলকী এ-গাল ও-গাল করে বলল, বেশ লাগে তো খেতে।

সন্ধ্যা খুশি হয়ে বলল, আরও নাও না। নিয়ে গিয়ে ঘরে রেখে দাও। যখন ইচ্ছে হবে খেও।

তার দরকার নেই। খেতে ইচ্ছে হলে আপনার কাছে এসে খেয়ে যাব।

সন্ধ্যা এটুকুতেই যেন গলে গেল। বলল, আমি পিসি হই। আমাকে আপনি-আজ্ঞে করতে নেই।

সোহাগ হঠাৎ উদাস হয়ে গেল যেন। শুধু বলল, আচ্ছা।

তারপর মুখ ফিরিয়ে খানিক আনমনে উঠোনের এদিকে সেদিকে একটু হেঁটে বেড়াল। যখন প্রথম এসেছিল তখন যেমন ঢলঢলে দেখতে ছিল এখন আর তেমন নেই। একটু যেন রোগা হয়েছে, একটু রুক্ষ। সন্ধ্যা লক্ষ করেছে মেয়েটা একদম সাজে না, চুলটা পর্যন্ত আঁচড়ায় না ভাল করে, সন্ধ্যা মনে মনে খুব চাইছিল মেয়েটা তার সঙ্গে আরও একটু কথা বলুক, একটু ভাব করুক।

না, আর কোনও কথা বলেনি সোহাগ। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে যেমন এসেছিল তেমনই আবার ওপরে চলে গেল। গতকাল কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকবার সোহাগকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সন্ধ্যা। কিন্তু তার দিকে তাকায়নি সোহাগ। আমলকী খেতেও আসেনি। কিন্তু সন্ধ্যা খুব অপেক্ষা করেছিল। যদি আসে!

সন্ধেবেলা কাসুন্দি আর আচারের শিশি ভর্তি করে লেবেল লাগাতে খুব ব্যস্ত ছিল সন্ধ্যা। তিনটে মেয়ে মেঝেতে বসে মন দিয়ে লেবেল লাগিয়ে যাচ্ছে। মাটির মালসায় আঠা, ডাঁই করা লেবেল, স্তুপাকার ঝুড়িভর্তি শিশি-বোতল। সকালেই মাল নিতে আসবে চার-পাঁচজন। আজ অনেক রাত অবধি জাগতে হবে সন্ধ্যাকে।

ঠিক এমন সময়ে খোলা দরজার ওপাশ থেকে মিষ্টি মিহি গলা পাওয়া গেল, আমি একটু ভিতরে আসতে পারি?

তেমনই অবিন্যস্ত চুল, তেমনই ঝ্যালঝ্যালে একটা মেটে রঙের ঢলঢলে কামিজ আর বিবর্ণ একটা প্যান্ট-পরা সোহাগ চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। দেখে এত ব্যস্ততার মধ্যেও সন্ধ্যা হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে গেল। বলল, এসো এসো।

মেয়েটা ঘরে ঢুকতেই সন্ধ্যা চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে বলল, বোসো।

সোহাগ চেয়ারে বসল না, মেঝেতে মেয়েগুলোর পাশেই ঝুপ করে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল।

সন্ধ্যা মোলায়েম গলায় বলল, মেঝেতে বসলে ঠান্ডা লাগবে। এখন শীত পড়ছে।

সোহাগের কানে কথাটা গেলই না। সে খুব মন দিয়ে মেয়েদের কাজ দেখল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বলল, আমি কি কিছু করতে পারি?

সন্ধ্যা অবাক হয়ে বলে, ওমা! তুমি আবার কী করবে? এসব কি তোমার কাজ?

কাজের মেয়েগুলো কাজ থামিয়ে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে সোহাগকে দেখছিল। তাদের চোখে বিস্ময় আর কৌতুক।

সন্ধ্যার সব কাজেই খুব যত্ন। পরিষ্কার চকচকে মস্ত মেটে হাঁড়ি থেকে বড় হাতায় কাসুন্দি তুলে ফানেল দিয়ে শিশিতে ভরছিল সে। ছিপি লাগানোর একটা ছোট হাতযন্ত্র কিনেছে সে, দুটো মেয়ে সেই যন্ত্রে পটাপট ছিপি আটকে দিচ্ছে। যাতে কেউ নকল করতে না পারে তার জন্য পিলফার প্রুফ করার ব্যবস্থা। ব্যবস্থাটা অবশ্য খুবই দুর্বল, কিন্তু খদ্দেররা আজকাল এসব চায়।

সোহাগ উঠে এসে সন্ধ্যার কাছে দাঁড়িয়ে কাণ্ডটা দেখছিল। ওর গা থেকে একটা মৃদু সুঘ্রাণ আসছে। বিদেশি সেন্ট।

সন্ধ্যা একটু লাজুক মুখে বলল, এইসব নিয়েই বেঁচে আছি, বুঝলে? আমি তো লেখাপড়া শিখিনি।

সারাদিন তুমি খুব কাজ করো, না?

তাকে শেষ অবধি সোহাগ 'তুমি' বলছে দেখে ভারী খুশি হল সন্ধ্যা। বুক থেকে যেন একটা ভার নেমে গেল। গতকাল অবধি মেয়েটাকে কী ঘেন্নাই করত। এখন বড় মায়া হচ্ছে। আর মায়াবশে অন্যমনস্ক ছিল বলে হাতের শিশি ভরে একটু কাসুন্দি উপচে পড়ল। হেসে সন্ধ্যা একটা ন্যাকড়ায় হাত মুছে নিয়ে বলল, হ্যাঁ। গতরে খাটুনির কাজ। আর তো কিছু জানি না।

সোহাগ খুব কৌতূহল নিয়ে ছিপি আটকানোর যন্ত্রটা দেখছিল। বলল, ওই যন্ত্রটা তো খুব মজার।

ওটা দিয়ে ছিপি আটকায়। এসব তো আধুনিক কল নয়, শস্তার জিনিস।

এ-ঘরটায় কেমন সুন্দর একটা গন্ধ!

তোমার ভাল লাগছে বুঝি? এসব হচ্ছে মশলার গন্ধ। বোসো না, গল্প করি। তোমাদের সঙ্গে তো ভাল করে আলাপই হল না। ওই মোড়াটা টেনে বোসো।

সোহাগ লক্ষ্মী মেয়ের মতো বসল।

আমলকী খেতে এলে না তো আজ!

আমলকীর একটা ল্যাটিন নাম আছে বোধহয়। জানো?

সন্ধ্যা হেসে ফেলে, না। এসব ল্যাটিন-ট্যাটিন কি আমি শিখেছি?

আমিও জানি না।

এক প্যাকেট নিয়ে গিয়ে কাছে রেখো। শুনেছি আমলকীর অনেক উপকার।

আমি কি রোজ তোমার কাজে একটু হেলপ করতে পারি?

সন্ধ্যা ফের হাসে, শোনো কথা! এসব মৈষালি কাজ, এসব কি তুমি পারো?

ওই যে তুমি একটা কাঠের জিনিসে মশলা গুঁড়ো করো ওটা আমি পারব।

না গো মেয়ে, ওসব তোমাকে করতে হবে না। তোমার মা রাগ করবে।

মা তো সব ব্যাপারেই রাগ করে। তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

তুমি মাঝে মাঝে এসে গল্প কোরো, তাহলেই হবে।

কিন্তু আমার কিছু করতে ইচ্ছে করছে। আই ওয়ান্ট টু কিপ মাইসেলফ বিজি।

সন্ধ্যা মায়াভরে মেয়েটার দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, একটু একঘেয়ে তো লাগবেই। এসব গাঁগঞ্জ জায়গা তো, তাই তোমার বোধহয় ভাল লাগে না।

একটা ঝটকা মেরে মাথা নাড়া দিয়ে মেয়েটা বলে, না না, শহর আমার একদম সহ্য হয় না। আমি তো গ্রামই ভালবাসি। তার চেয়েও ভালবাসি জঙ্গল।

ও হ্যাঁ, শুনেছিলুম শহরে থাকলে তোমার নাকি শরীর খারাপ করে। কীরকম অসুখ হয় তোমার?

ওটা একটা অ্যালার্জি। পলিউশন থেকে হয়।

তা হলে তো মুশকিল। পড়াশুনো করতে তো শহরেই থাকতে হবে।

পড়াশুনো করতে আমার ভাল লাগে না।

ওমা! সে কী? শুনেছি তুমি খুব ভাল ছাত্রী!

না তো! আমি একদম ভাল ছাত্রী নই। আমার ভাল লাগে শুধু হিস্টরি আর ন্যাচারাল সায়েন্স। ক্লাসের পড়া হিসেবে নয়।

সন্ধ্যা কী বলবে ভেবে পেল না। পড়াশুনোর কথা উঠলেই সে জব্দ। তবু সে বলল, তা হলে তুমি কী করবে?

মেয়েটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা অসহায় ভঙ্গি করল। তারপর মৃদু স্বরে বলে, আমি যা করতে চাই তা তো আমাকে কেউ করতে দেয় না।

কী করতে চাও তুমি?

মৃদু একটা দুষ্টু হাসি খেলে গেল সোহাগের মুখে। তারপর বলল, বলব?

বলোই না!

আমার ইচ্ছে করে খুব গভীর জঙ্গলে গিয়ে সব পোশাক খুলে ফেলে ঘুরে বেড়াই।

এ কথা শুনে কাজের মেয়েরা খিলখিল করে হেসে উঠল।

সন্ধ্যা একটা ধমক দিল, অ্যাই চুপ। মানুষের তো কতরকম ইচ্ছেই হয়। হাসতে আছে? জানিস আমার ভাইঝি বিলেত আমেরিকা ঘুরে এসেছে?

বাণী নামে একটা মেয়ে বলল, আমারও কিন্তু অমন ইচ্ছে যায়।

তোর আবার কী ইচ্ছে?

ওই যে গো, যেখানে কেউই থাকবে না তেমন জায়গায় গিয়ে সব খুলে ফেলে রোদে হাওয়ায় এলোচুলে বসে থাকি।

সোহাগ রাগ করল না। হাসল। তারপর হঠাৎ মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। খুব মৃদু স্বরে বলল, আমার খুব হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সন্ধ্যা মায়াভরে বলে, ষাট, ষাট, হারিয়ে যাবে কেন? মানুষ হারিয়ে গেলে বড় কষ্ট।

কেন, ও কথা বলছ কেন? ওয়ার্ল্ড ইজ এ বিগ প্লেস।

সন্ধ্যা একটু আনমনা হল। তারপর বলল, হারিয়ে যেতে নেই। কদিনই বা বাঁচে বলল মানুষ, তার মধ্যেই কত শোকতাপ, কত দুঃখদুর্দশা! আমার জীবন থেকেও তো একটা লোক হারিয়ে গেল বলে—

সন্ধ্যা আর বলল না। ভাইঝির কাছে হয়তো বলতে নেই।

তুমি কি তোমার হাজব্যান্ডের কথা বলছ?

সন্ধ্যা চুপ করে থাকে।

সোহাগ বলে, আই নো অ্যাবাউট ইউ। ইউ আর এ কনজুগাল ডিসকার্ড। সো হোয়াট? ইউ স্টিল হ্যাভ ইওর লাইফ।

সন্ধ্যা একটু হেসে বলে, আমি কি অত ইংরিজি বুঝি?

সোহাগ একটু লজ্জা পেয়ে বলে, সরি।

সন্ধ্যা তার এই একটু ছিটিয়াল, একটু সরল ভাইঝির দিকে চেয়ে বলে, তোমার আর কী ইচ্ছে করে?

সোহাগ একটু লজ্জার হাসি হেসে বলে, আমার বয়সের ছেলেমেয়েরা যা করে, মানে পড়াশুনো, ক্যারিয়ার, কম্পিউটার—আমার একদম ভাল লাগে না। তুমিই না বললে কদিনই বা বাঁচে মানুষ! ঠিক তাই। আমাদের লনজিভিটি তো খুব বেশি নয়, এত পড়াশুনো, ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবাভাবি, কত সময় চলে যায় বলো! তা হলে বাঁচব কখন? কদিন? আয়ুর নাইনটি পারসেন্টই তো চলে যাবে বাবা!

ওমাঃ ঠিক বলেছ তো! আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, এত খাটাখাটনিতে কত সময় চলে যাচ্ছে, দুনিয়াটাকে টেরই পাচ্ছি না।

সোহাগ স্মিত মুখে বলে, কিন্তু তোমার কাজটা আমার বেশ ভাল লাগছে।

কেন বলো তো? এ-কাজ আবার কীসের ভাল?

ইউ আর উইথ নেচার। ডুয়িং এ জব অফ ইওর ওন।

বাংলা করে বলো। বুঝতে পারি না যে! তোমার সব কথা আমার বুঝতে ইচ্ছে করছে।

মনে হয় তুমি তোমার কাজটাকে প্যাশোনেটলি ভালবাসো। তাই না?

সন্ধ্যা এবার এক গাল হাসে, কথাটা ভুল বললানি। করতে করতে কাজটা এখন খারাপ লাগে না।

ওটাই তো আসল কথা। আমরা যে কাজ করতে ভালবাসি তা আমাদের করতে দেওয়া হয় না। ক্যারিয়ার আমাদের সব নষ্ট করে দেয়। নো লাভ ফর লাইফ, নাথিং।

দোতলা থেকে মোনার গলা পাওয়া যাচ্ছিল, সোহাগ! সোহাগ, আর ইউ হিয়ার সামহোয়ার? প্লিজ কাম আপস্টেয়ার্স। ডিনার ইজ রেডি।

সন্ধ্যা বলল, যাও, তোমার মা ডাকছে।

সোহাগ উঠে পড়ল, যাই পিসি।

সন্ধ্যার কান জুড়িয়ে গেল 'পিসি' ডাক শুনে। মনটা হালকা লাগল, খুশির বাতাস লাগল বুকটায়। পিসি বলে ডেকেছে এতদিনে। পিপাসাটা তার বুকের ভিতরে লুকিয়ে ছিল এতদিন।

নীলিমা বলল, তোমার ভাইঝিটা পাগলি আছে দিদি।

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বলে, ও তুই বুঝবি না। কত ভাল কথা বলে গেল। ওইটুকু তো বয়স, এক রত্তি মাথায় কত চিন্তা করেছে দেখলি! বড় ভাল মেয়ে।

কুক কুক করে ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজছে। মৃদু কিন্তু খর শব্দ। এ-শব্দ গভীর ঘুমের ভিতর ঠিক ঢুকে যেতে পারে। ঘুম না ভাঙিয়ে ছাড়ে না।

আগে এসব অ্যালার্ম ছিল না। মহিমকে তার বাবা একখানা ঘড়ি কিনে দিয়েছিল, রোজ দম দিতে হত কটর কটর করে চাবি ঘুরিয়ে। তার অ্যালার্ম ছিল ঝনঝনে। সাইকেলের বেলের মতো বেজে থেমে যেত, তাতে ঘুম ভাঙলে ভাল, না ভাঙলে ঘড়ির কিছু করার নেই। আজকাল এসব কোয়ার্টজ ঘড়ির আওয়াজ অন্যরকম। কানে নয়, যেন আঁতে গিয়ে ঢুকে পড়ে।

অ্যালার্মটা বাজছে দোতলায়, মেজো বউমার ঘরে, ভোর পৌনে চারটের গভীর নিস্তব্ধতায় শব্দটা চারদিকে যেন ছুরির ফলার মতো বারবার ঢুকে যাচ্ছে।

মহিমের ঘুম ইদানীং এমনিতেই পাতলা। শেষরাতে ঘুম আরও মিহি হয়ে আসে। চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে উঠে পড়ে সে।

আজ বুডঢা কলকাতা যাবে। বর্ধমান থেকে ভোর ছটায় একটা লোকাল আছে, সেইটে ধরবে। খবরটা মহিমের জানার কথা নয়। যাওয়াআসার স্বাধীনতা ওদের তো আছেই। জিজ্ঞাসাবাদ অনুমতি নেওয়া ইত্যাদির বালাই নেই।

কাল রাত দশটা নাগাদ হঠাৎ মোনা—অর্থাৎ মোনালিসা তার ঘরে এসে হাজির। 'বাবা' বলে ডাকে না কখনও। কালও ডাকেনি। তবে বেশ নরম গলায় বলল, বুডঢা আজ কলকাতা থেকে এসেছে। খুব টায়ার্ড। কিন্তু কাল সকালেই ওকে কলকাতা ফিরতে হবে।

মহিম কথাটার প্যাঁচ ধরতে না পেরে তাকিয়ে ছিল। বুড়ঢা যে কলকাতা থেকে এসেছে, এ খবরটাও তার জানা নেই, যেমন জানা নেই বুড়ঢা এখান থেকে কলকাতা গিয়েছিল কবে।

মোনা বলল, মুশকিল হয়েছে ট্রেনটা খুব ভোরে। ছটায়। এখান থেকে অত ভোরে বাস বর্ধমান যায় কি না কে জানে। কিন্তু ট্রেনটা ওকে ধরতেই হবে। সকাল সাড়ে নটায় ওর কম্পিউটার ক্লাস।

মহিম তাকিয়ে ছিল। বুঝতে পারছিল, আসল কথাটা এর পর আসবে।

মোনা এবার বলল, কমলদার ছেলে রতনের তো মোটরবাইক আছে। ওকি সকালে একটু বুড়ঢাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারবে?

এ কথাটা মহিমকে জিজ্ঞেস করার মানেই হয় না। যার মোটরবাইক তাকে জিজ্ঞেস করলেই হত। মহিম মৃদু গলায় বলল, বতনের সঙ্গে কি বুড়ঢার আলাপ পরিচয় নেই?

মোনা একটু অপ্রতিভ হল কি? ফর্সা রংটা যেন একটু রাঙা হয়ে গেল। বলল, আসলে ওরা ভাইবোন তো তেমন মিশুকে নয়।

মিশুকে নয়—এ কথাটা মিথ্যে। ওরা ও-বাড়ির লোকজনকে মেশবার যোগ্য বলেই মনে করে না। কিন্তু কথাটা তো আর বউমাকে বলা যায় না। মহিম বলল, স্টেশনে পৌঁছে দেওয়াটা তো কোনও ব্যাপার নয়। নিশ্চয়ই দেবে। আমি বলে দেবোখন।

মহিম এটুকু বলেই চুপ করে গিয়েছিল।

মোনা একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, কথাটা হয়তো রতনকে আমারই বলা উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে তেমন রাপো তৈরি হয়নি বলে বলতে সংকোচ হচ্ছে।

একটু হাসল মহিম। বলল, সংকোচের কোনও কারণই ছিল না। আপনজনই তো। বললেই পারতে। ওরা তাতে খুশিই হত।

মোনা বলল, আপনি বললে বলব। তবে রতন তো বাড়িতে থাকেই না, অনেক রাতে ফেরে শুনেছি। কমলদাকে বলতে পারতাম, কিন্তু তিনি আজ কোথায় যেন গেছেন, রাতে ফিরবেন না।

ওঃ, ঠিক আছে, রতনকে আমি বলে দেব।

মোনা চলে যাওয়ার পর মহিম রায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। টানা প্রায় পনেরো-ষোলো দিন এখানে আছে, তবু কেন যে পর্দাটা এখনও টেনে রেখেছে, কোথায় বাধছে, কোথায় বাধক হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। মেজো বউমার সঙ্গে ভাসুর কমলের একটু আলাপ আছে বটে, কিন্তু সম্পর্কটা ফাই-ফরমাশের। মহিমের ছেলেদের মধ্যে কমলই একটু ব্যক্তিত্বহীন এবং ভালমানুষ। আত্মসম্মানের বালাইও নেই তেমন। উপযাচক হয়ে সে-ই ওদের খোঁজখবর নেয়, গায়ে পড়ে কাজ করে দেয়। আর কেউ ওদের ছায়াও মাড়ায় না।

মহিম খুব ভোরেই ওঠে। পরশুদিনও উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে ঠাকুরপুজোর ফুল তুলতে বাইরে বেরিয়েছিল। বেশি দূর যেতে হয় না, ঘরের পিছনেই বাগান। সকালে তখনও অন্ধকার ঝুলে আছে চারদিকে, কুয়াশা আছে, ঠান্ডা ভাবও আছে, একটু পাতলা আলোর আভাসও আছে, কাক ডাকছিল, দূরে একটা মোরগও ডেকে উঠল। রোজকার মতোই ভোর। নতুন কিছু নয়।

বাগানে বেশি দূর ঢুকতেও হয় না, সামনেই শিউলি ফুলের ঝুপসি গাছ। নীচে অজস্র ফুল পড়ে থাকে ভোরবেলা। সেগুলো পুজোয় লাগে না। বোঁটা-খসা ফুল অনেক আটকে থাকে পাতায় আর ডালপালায়। ফুল

তুলতে গিয়ে আচমকা তার চোখ গিয়ে পড়ল বাগানের মাঝখানে। কেন যে তার চোখই পড়ল। সাদাটে ঢিলা পোশাক-পরা স্থির মূর্তিটা দেখে আঁতকে ওঠবারই কথা তার। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল বলে একটু চমকাল মাত্র।

কে ওখানে? সোহাগ নাকি?

না আজ মেয়েটা সেদিনের মতো আচ্ছন্ন নেই। মহিমের সাড়া পেয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল।

দাদু!

ভারী অবাক হল মহিম। এর আগে কখনও 'দাদু' বলে ডেকেছে কিনা মনে পড়ল না। ডাকটা শুনেই তাই ভাল লাগল।

তুমি ওখানে কী করছ ভাই?

সোহাগ এগিয়ে এল কাছে, তুমি রোজ ভোরে ওঠো বুঝি?

মহিম বলে, হ্যাঁ। ওখানে কী করছিলে?

এমনি দাঁড়িয়েছিলাম। ট্রায়িং টু ফিল দি ওয়ার্ল্ড।

তোমার পায়ে জুতো বা চটি নেই কেন দিদিভাই?

চটি পরলে আই ক্যান্ট ফিল দি আর্থ।

কিন্তু কাঁটা ফুটতে পারে তো!

ফুটলেই বা!

আর শুঁয়োপোকা, সাপ এসবও তো থাকতে পারে।

আমার একটুও ভয় করে না।

মহিম স্নেহভরে বলে, তোমার গাছপালা ভাল লাগে বুঝি?

ভীষণ। মাঝে মাঝে ভাবি, ইস্ আমি যে কেন গাছ হয়ে জন্মালাম না।

ঠান্ডা লাগবে দিদিভাই, গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে এসো গিয়ে।

একদিন তো মানুষের কোনও পোশাক ছিল না। তখন কীভাবে থাকত মানুষ?

মহিম একটু থতমত খেয়ে বলে, সেসব তো আদ্যিকালের কথা দিদিভাই। তখন মানুষের ইমিউনিটি ছিল।

এখন নেই?

না, মানুষের অভ্যাস পালটে গেছে।

পোশাক একটা বাধা।

মহিম বড্ড অবাকের পর অবাক হচ্ছে, মেয়েটার কি একটু মাথার দোষ আছে?

দিক-বসন কাকে বলে জানো দাদু?

হ্যাঁ, দিক-বসন মানে আবরণহীন। দিকই যার বসন।

আমি জানি। কথাটা খুব সুন্দর, না?

ওসব ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার দিদিভাই। মানুষের ক্ষেত্রে খাটে না।

ইট হ্যাজ এ মেসেজ, এ মেসেজ ফর হিউম্যানিটি।

মহিম প্রমাদ গুনছিল। বিদেশে ন্যুডিস্ট কলোনি আছে বলে শুনেছে সে। মেয়ে-পুরুষ ন্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। পাগলের কাণ্ড সব। এ মেয়েটা তাদের খপ্পড়ে পড়েনি তো রে বাবা! বিদেশে যে কত কুশিক্ষাই আছে!

মেয়েটা কি তার মনের কথা শুনতে পেল? স্বগতোক্তির মতো করে বলল, তা বলে আমি ন্যুডিস্ট নই, দে আর এ স্যাড অ্যান্ড পারভারটেড লট! আমার শুধু মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে চারদিকটাকে সমস্ত শরীর দিয়ে শুষে নিতে।

একটু পাগুলে ব্যাপার আছে মেয়েটার। মহিম বলল, এ নিয়ে তোমার সঙ্গে একদিন কথা বলব। এখন শিশির পড়ে তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে।

আমি ইমিউন হওয়ার চেষ্টা করছি।

ওসব কি সইবে তোমার? শুনেছি তোমার একটা অ্যালার্জি আছে।

হ্যাঁ, কিন্তু গাছপালার মধ্যে আমি তো ভাল থাকি।

গাছপালা তো ভালই, কিন্তু বিপদের কথাও খেয়াল রাখতে হয়, এটা ঋতু পরিবর্তনের সময়।

তুমি একজন খুব কারেজিয়াস লোক!

মহিম তটস্থ হয়ে বলে, আমি! কে বলল তোমাকে? না দিদিভাই, আমি একটা ভিতু লোক।

তুমি সেদিন আমাকে কাঁধে করে অনেক দূর থেকে নিয়ে এসেছিলে। অ্যান্ড ইউ আর অ্যান অকটোজেনেরিয়ান।

বিপদে পড়লে মানুষ বাঁচার তাগিদে অনেক কিছু করে। কিন্তু দিদিভাই, তোমার যে বড্ড সাহস! একা একা ওভাবে ঘুরে বেড়াও কেন?

মেয়েটা হাত উলটে বলে, জানি না।

তুমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলে।

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে, সামটাইমস ইট হ্যাপেন।

তুমি কি রোজ এত ভোরে ওঠো?

না, কখনও কখনও আমি বেলা আটটা-নটাতেও উঠি, কিছু ঠিক নেই। মাঝে মাঝে রাতে আমার ঘুম আসে না।

এই বয়সে ঘুম আসে না কেন?

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে যায়।

কী ভাবো তুমি?

মাই রিলেশন উইথ দিস ভাস্ট ইনফাইনিট ইউনিভার্স। আরও কত কী, ভাবতে ভাবতে আমি উঠে বসে থাকি, তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।

কিন্তু তাতে যে বিপদ হতে পারে।

হিহি করে একটু হাসল সোহাগ, সেই হাসিতে ওর শৈশব ফুটে উঠল যেন। বলল, কাল রাত দুটো-আড়াইটার সময় আমি উঠে নীচে নেমে আসি। তারপর হেঁটে হেঁটে কোথায় কোথায় যে চলে গেলাম।

সর্বনাশ!

কিন্তু কিছু বিপদ হয়নি তো, আমার সঙ্গে তোমাদের ওই কালো কুকুরটা ছিল।

কতদূর গিয়েছিলে?

অনেক দূর, আমি তো এ-জায়গাটা ভাল চিনি না, জঙ্গল-টঙ্গল মাঠঘাট দিয়ে অনেক হেঁটে তারপর একটা হাইরোডে উঠে দেখলাম, ট্রাক যাচ্ছে, তখন ফিরে আসি।

কী করে ফিরলে?

কুকুরটাই পথ দেখিয়ে নিয়ে এল, যখন এসে কোর্ট ইয়ার্ডে ঢুকছি তখন—ওই যে ওই ঘরে যিনি থাকেন—উনি কে বললা তো! জেঠিমা না?

হ্যাঁ, উনি তোমার জেঠিমা।

উনি হঠাৎ ভয় পেয়ে "চোর, চোর" বলে কাকে যেন ডাকছিলেন। আমি তখন জানালার কাছে গিয়ে বললাম, আমি চোর নই, আমি সোহাগ। উনি খুব অবাক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, মাঝরাতে একা মেয়েছেলে এলোচুলে ঘুরছ যে বড়! হাওয়া-বাতাস লাগবে যে! ঘরে যাও।

উনি ঠিকই বলেছেন।

হাওয়া-বাতাস লাগার কথাটা আমি বুঝতে পারিনি। তুমি জানো?

অস্বস্তিতে পড়ে মহিম বলে, উনি বোধহয় ভূতপ্রেতের কথাই বলতে চেয়েছেন। গাঁয়েগঞ্জে তো অনেক সংস্কার থাকে।

সংস্কার মিনস সুপারস্টিশনস?

হ্যাঁ, এসব জায়গায় মানুষকে মাঝে মাঝে নাকি ভূতে পায়। ওসব বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কিন্তু আই বিলিভ ইন গোস্টস।

মহিম একটু হাসল। বলল, কেন বিশ্বাস করো?

আই ফিল দেম। আই ইভন সি দেম।

মহিম অবাক হয়ে বলে, কী দেখেছ তুমি?

আমার মনে হয় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যেসব মানুষ মরে গেছে তাদের প্রত্যেকের একটা করে ইমপ্রেশন রয়ে গেছে অ্যাটমোসফিয়ারে। আই সি দেয়ার শ্যাডোজ, আই ফিল দেয়ার প্রেজেন্স।

সেটা কীরকম দিদিভাই, বুঝিয়ে বলো।

তারা তো আমাদের মতো নয়, তারা কেউ নেইও। কিন্তু তাদের ইমপ্রেশন, তাদের অনেক কথাবার্তা, অনেক সময় তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসও টের পাই এবং মাল্টিচুডস অব দেম।

তুমি যে আমাকে চিন্তায় ফেললে দিদি। তোমার এরকম হয় কেন?

আমি তা জানি না। আমার বন্ধুরা কেউ ভূতে বিশ্বাস করে না, তারা শুনলে অবাক হয়। বলে অল বোগাস।

হয়তো তুমি খুব ভাববা বলেই ওসব কল্পনা মাথায় আসে।

মে বি। আই হ্যাভ এ ভেরি স্ট্রং ইমাজিনেশন। কিন্তু আমার মনে হয় আমি ভুল দেখি না। ভূতকে অনেকে ভয় পায়। আমার একটুও ভয় করে না, আমার মনে হয় দে আর মাই ফ্রেন্ডস, মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস।

চিন্তিত ও শঙ্কিত মহিম রায় ভোরের আবছা আলোয় তার এই প্রায় অচেনা নাতনিটির মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে এসো। আমি তোমার কথাগুলো আরও একটু বুঝতে চেষ্টা করব।

কিন্তু বিশ্বাস করবে না তো? আমার কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

মহিম একটু হাসল, পৃথিবীতে কত রহস্যই যে আছে, সব কি উড়িয়ে দেওয়া যায়? না দিদি, আমি তোমার কথাগুলো নিয়ে ভাবব। হয়তো বিশ্বাসও করব, কে জানে! এই বুড়ো বয়সে খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে মানুষ মরে গেলেও একেবারে শেষ হয়ে যায় না। তার কিছু একটু থেকে যায়।

এসব কাল ভোররাতের কথা। আজ এই ভোররাতে বিছানায় মশারির মধ্যে বসে অ্যালার্ম ঘড়ির শব্দ শুনতে শুনতে কত ভাবনাই যে সিনেমার ছবির মতো মাথার ভিতরে ভেসে ভেসে যায়। মাঝে মাঝে যতিচিহ্নের মতো মৃত্যুর কথাও মনে পড়ে।

অচেনা অমল এবং ততোধিক অচেনা অমলের বউ, ছেলে, মেয়ে এদের সঙ্গে তার একটা সেতুবন্ধন হল কি? সেতুটি ওই ছিটিয়াল, বায়ুগ্রস্ত, চঞ্চলমতি সোহাগ। ঠিক বুঝতে পারছেনা মহিম, সেতুবন্ধনটি টিকে থাকবে কিনা।

মশারি তুলে পাকাপাকি উঠে পড়ল মহিম। প্রাতঃকৃত্য, বাসি ছাড়া, ঠাকুরঘর সারা, ফুলতলা, পুজোয় বসা।

তার মাঝখানেই নিস্তব্ধ ভোরে বজ্রাঘাতের মতো রতনের মোটরবাইক গর্জে উঠল। পাঁচটা বাজে। বুড়ঢাকে অবশেষে স্টেশনে পৌঁছে দিচ্ছে রতন, দুর্গা, দুর্গা।

রতন আর তার মোটরবাইক যেন দুটো জিনিস নয়। একটাই। যেন মোটরবাইকে করেই জন্মেছিল রতন। দিনরাত সে ওটায় চড়ে ঘুরছে, মোটরবাইক ছাড়া রতনকে আজকাল ভাবাই যায় না, মাঝে মাঝে বলে, যখন মোটরবাইকে চড়ে থাকি তখন নিজেকে আমার চে গুয়েভারা, ফিদেল কাস্ত্রো, জোসেফ স্তালিন, মাওসেতুং কত কী মনে হয়, মনে হয় আমি একজন লিডার, একজন পায়োনিয়ার।

কিন্তু ওরা কি মোটরবাইকে চড়তেন?

তা কে জানে। মোটরবাইকে চড়লে আমি ওরকম কেউ হয়ে যাই।

বন্ধুরা বলে ভটভটিয়া রতন। মোটরবাইকই ওর হাত পা মগজ। কাউকে জরুরি খবর দিতে চাও, অসময়ে হঠাৎ কিছু আনতে চাও বাজার থেকে, কাউকে কোথাও পৌঁছে দিতে চাও, রতন সঙ্গে সঙ্গে রাজি, মোটরবাইকে যতই তাকে দৌড় করানো হোক তার ক্লান্তি নেই।

মহিম রায় উঠোনের একধারে পাতা কাঠের চেয়ারে এসে বসল, বাঁ ধারে বাঁশবনের ফাঁকফোঁকর দিয়ে অন্ধকারকে ঝাঁঝরা করে দিয়ে আলো আসছে।

আরও একটা দিন। আরও এক পা এগিয়ে যাওয়া।

আট

আশি চুটকি, নব্বে তাল তব জানিয়ো খইনিকে হাল। খইনি মজানেনা কি সোজা কথা রে বাপু? দু-চারবার ডলেই ঠোঁটে ফেলে দিলেই হল? ও হল চাষাড়ে জিনিস, ধকের চোটে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত চমকে ওঠে। খইনির গভীরে যে প্রাণরস আছে তাকে টেনে বের করা চাই তো। সেই মোলায়েম নেশা শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে চনমনে করে তোলে মানুষকে। হ্যাঁ, তবে তার জন্য ধৈর্য চাই। পরিমাণমতো চুনটুকু দিয়ে মলো, মলো, মলো। ফিন তালি লাগাও। চুণা উড়েগা, ধূল উড়েগা। ফিন মলো, মলো, মলো। ফিন তালি লাগাও—হাঁ। আশি চুটকি, নব্বে তাল, তব জানিও খইনিকে হাল…

উত্তরের দাওয়ায় বসে খইনিটাকে মজিয়ে ফেলেছে প্রায় বাঙালি। বাঙালি রাম কাহার। পাশে বিস্কুটের কাচ লাগানো টিন। দাওয়ার নীচে ছাড়া মোটা চামড়ার ধুলিধূসর একজোড়া শস্তা জুতো। বাঙালির পরনে হেঁটো জনতা ধুতি, গায়ে মোটা কাপড়ের পিরান। মাথা ন্যাড়া, মস্ত টিকি, খইনি ডলতে ডলতে তার চোখ এখন ভাবালু।

হাত চারেক তফাতে উঠোনে উবু হয়ে বসে আছে গোকুল আর বাসু। তারা মুখ চোবলাচ্ছে, জিব রসস্থ, ভারী উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে বাঙালির দিকে। ব্যাটা খইনিটা বানায় বড় ভাল। মিহি, মোলায়েম, খুব সোয়াদ। তবে বড্ড সময় নেয়। গোকুলের কাজ বেশির ভাগই গোয়ালঘরে। তিনটে গোরুকে মাঠে খোঁটায় বেঁধে এসে গোয়াল পরিষ্কার করেছে এতক্ষণ। এই একটু হাঁফ ছাড়ার সময়। বাসু বাগান সামলায়। নিড়েন দিতে দিতে উঠে এসেছে বাঙালিকে দেখে। দুজনেই কিছু উশখুশ। কিন্তু বাঙালিকে হুড়ো দিয়ে লাভ নেই। তার মনের মতো না হওয়া ইস্তক সে খইনির ভাগা দেবে না।

রুখু চুলের খোঁপায় আজ একটা কলাবতী ফুল গুঁজেছিল দুখুরি। হাঁসের ঘর থেকে বারোটা ডিম বের করল। আজ তার মনে একটু আনন্দ ছিল সকাল থেকেই। মেলা লোক আসবে আজ। দুই দিদিমনি, দুই দাদাবাবু, তাদের বরেরা, বউয়েরা, ছেলেমেয়েরা। আজ খুব হই-চই লেগে যাবে বাড়িতে। দুখুরি তাই ঘরদোর পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে মুছছিল। টেবিল, চেয়ার, তাক, জানালার গরাদ, দরজার পাল্লা। ওই জানালা দিয়েই সে তার বাপকে দেখেছিল একটু আগে। অমনি মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওই যে এসেছে তার যম।

গিন্নিমার ঘরে ঢুকেই দুখুরি কাঁদুনে গলায় বলল, ওই আবার এসেছে গো, দ্যাখো গে।

বলাকা চট্টোপাধ্যায়ের বয়স এখন বাহাত্তর চলছে। শরীরে এখনও মেদের সঞ্চার নেই। সাদা থানে গৌরবর্ণা বলাকাকে অনেক সময়ে মানবী বলে মনে হয় না। শোকের একটা গাম্ভীর্য তাকে আরও একটু অবাস্তব দূরত্বে নিয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা কেউ কাছে নেই। একা বাড়ি আগলে তার পড়ে থাকা। এই দুখুরি, রাঁধুনি বামনি, কাজের মেয়েরা, মুনিশ, দু-চারটে কাজের লোক, পাড়া-প্রতিবেশী, জ্ঞাতিরা, কিছু স্মৃতি, কিছু চিহ্ন আর বস্তুপুঞ্জ নিয়ে তার বাস। এই আগলে থাকা ভাল লাগে না বলাকার। একটা মানুষ যতদিন ছিল

ততদিন সেই মানুষটার জন্যই এত ফাঁকা লাগত না কখনও। তার স্বামী গৌরহরি চট্টোপাধ্যায় মেজাজি, প্রতাপশালী, খেয়ালি এক মানুষ। তবু সারা জীবন বলাকার কাছে ওই মানুষটাই ছিল যেন সবচেয়ে বেশি। ওই মানুষটাকে ছাড়া যে বেঁচে আছে বলাকা তাতেই সে ভারী অবাক হয়ে যায়। ওকে ছাড়া একটা দিনও কাটবে বলে কখনও ভাবেনি। অথচ অবাক কাণ্ড, এখনও বলাকা বেঁচেই আছে দিব্যি।

ঝন্টু আর মন্টু তাকে নিজেদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য টানাটানি করে। বকুল, পারুল, জামাইরা সবাই তাকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কোথাও যেতে ইচ্ছেই হয় না তার। মানুষটা নেই, কিন্তু তার শ্বাসপ্রশ্বাসটুকু যেন এখনও আছে।

স্টিলের আলমারি খুলে আজ শাড়ির ডাঁই বের করে মেঝেয় পাতা মাদুরে জড়ো করেছে বলাকা। কমলা আর কালী সাজিয়ে রাখছে থাকে থাকে। কত শাড়ি তার। গৌরহরি কোনও বড় মামলায় জিতলেই একটা শাড়ি বা গয়না আনত। এইভাবে জমেছে মেলা, অনেকগুলো তো পরাই হয়নি আজ অবধি। বলাকা গুণে দেখেছে বেনারসিই আঠারোখানা, পিওর সিল্ক অন্তত পঞ্চাশটা, গরদ কম করেও বারোটা, তাঁত আর সিন্থেটিকের হিসেব নেই।

দুই মেয়ে আর দুই বউমাকে এ সবই আজ ভাগ করে দেবে বলাকা। কোনটা কাকে সেই নিয়েই কথা হচ্ছে। কমলা পুরনো লোক, তার টান বেশি বকুল আর পারুলের ওপর। ভাল শাড়িগুলো সে ওদের ভাগে ফেলতে চাইছিল। বলাকা বলল, তাই কি হয়? বউমারা কী ভাববে তা হলে?

বলাকা আবার একথাও ভাবে, ওদের কারও তো কম নেই। এসব পুরনো শাড়ি-টাড়ি পেয়ে খুশি হবে তো? নাকি মনে মনে নাক সিঁটকোবে?

একখানা ডুরে শাড়ি বেরোল এক ডাঁই শাড়ির তলা থেকে। সাদা খোলের ওপর টানা লাল সবুজ নীল ডুরে। তেমন কোনও বাহারি শাড়িও নয় এবং বহরে একটু খাটো। শাড়িটা এত পুরনো যে সাদা রংটা হলদেটে হয়ে গেছে। তেমন মজবুতও নেই আর, টানাহ্যাঁচড়া করলে ফেঁসে যাবে। শাড়িটা কোলে নিয়ে একটু বসে রইল বলাকা। চোখে জল আসি-আসি করে যে!

দশ সাড়ে দশ বছর বয়সে বিয়ে হল পরিপূর্ণ যুবক গৌরহরির সঙ্গে। বলাকা তখন মেয়েমানুষই হয়ে ওঠেনি ভাল করে। ভয়ে আধমরা। আর বরটি এত ছোট্ট একটা বউ পেয়ে মোটেই খুব স্বস্তিতে ছিল না। নাক সিঁটকে বলত, এ বাবা এর তো এখনও নাক টিপলে দুধ বেরোয়! গৌরহরি তাকে তার বউ বলেই ভাবতে পারত না। স্বামীর বিছানাতেই শুত বটে সে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মতো নয়। ঘুমের মধ্যে হাত-পা ছোড়ার অভ্যেস ছিল তার, গৌরহরি তাই খ্যাপাত, ঘুমের ভান করে তো দিব্যি লাথি ঘুঁষি চালাও দেখছি! ভীষণ লজ্জা পেত বলাকা। তেরো বছর বয়স অবধি ওরকমই চলেছিল। প্রাপ্তবয়স্ক এক পুরুষের পাশে একটি নাবালিকাই মাত্র ছিল সে। তেরো বছর বয়সে একবার টাইফয়েড হয়ে বলাকার যায়-যায় অবস্থা। তখন গৌরহরি তাকে বেডপ্যান দিত, জামাকাপড় পালটে দিত। লজ্জায় আজও মরে যায় বলাকা। কিন্তু গৌরহরি তখনও তাকে তো মেয়েমানুষ হিসেবে দেখতেই শুরু করেনি। বিয়ের পর চার বছরের মাথায় একদিন গৌরহরি একটা মামলার কাজে কলকাতা যাচ্ছে। সেই রাতে তার ফেরার কথা নয়। কিন্তু হঠাৎ বলাকা তাকে বলে বসল, আজ ফিরবে কিন্তু, আজ আমাদের বিয়ের তারিখ। গৌরহরি অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি?

তখন বৈশাখ মাসের শেষ। দুদিন পরই সংক্রান্তি। সেই দিন সন্ধের পর এক ক্ষ্যাপা মহিষের মতো মেঘ উঠল আকাশে। সেই সঙ্গে এক অতিকায় কালবোশেখী। জীবনে ওরকম ভয়ংকর ঝড় বলাকা আর দেখেনি। চারদিকে যেন মধ্যরাতের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল, আর পাগলা মোষের মতোই ছুটে এল ঝড়। উপড়ে পড়তে লাগল গাছ, উড়ে গেল আশপাশের চালের টিন। গোরু, কুকুর, হাঁসমুরগিদের যে কী প্রাণান্তকর আর্তনাদ! আর সেই সঙ্গে শাঁখের শব্দ, মানুষের চেঁচামেচি। সেই প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট গেল ভেসে, গাছ উপড়ে পড়ে চলাচল বন্ধ।

খুব ভাবছিল বলাকা। জানালায় দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল অঝোরে। এই ঝড়ের দিনে সে লোকটাকে ফিরতে বলে দিয়েছে, যদি ফেরে তা হলে কোন অপঘাত ঘটে তার ঠিক কী?

ভয়টা অমূলক ছিল না তার। বউয়ের কথার দাম রাখতে প্রবল ঝড়ের সূচনা দেখেও গৌরহরি হাওড়ায় এসে ট্রেন ধরেছিল। বর্ধমান পৌঁছতে সময় লেগেছিল অনেক। তারপর ওই ডাকাবুকো মানুষটা সেই ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত মাথায় করে হেঁটে অতিক্রম করেছিল গোটা পথ। চারবার আছাড় খেয়ে, ভিজে, জলকাদা মেখে যখন বাড়ি পৌঁছেছিল তখন ভোর চারটে। ঘুম-কাতুরে বলাকা সেই রাতে ঘুমোতেই পারেনি। দু চোখ সটান মেলে শুয়ে শুয়ে শুধু ঠাকুর-দেবতাকে ডেকেছে। গৌরহরি উঠোনে পা দিতেই কী করে যেন সে-ই টের পেয়েছিল তার মানুষটা এসেছে। কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে দিয়ে সে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, তুমি এসেছ?

গৌরহরি খুব অবাক। একটু হেসে বলল, কী করে টের পেলে?

অভিমানভরে বলাকা বলেছিল, আমি পাবো না তো কে টের পাবে?

গৌরহরির মুখটা হ্যারিকেনের আলোতেও উদ্ভাসিত দেখাচ্ছিল। পোর্টম্যান্টো খুলে শাড়ির প্যাকেটটা বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, ইংরিজি মতে বিয়ের তারিখ পার হয়ে গেছে। কিন্তু দিশি মতে এখনও পেরোয়নি। শাড়িটা পরো।

এই শাড়ির দাম কে দেবে? কে জানবে এ-শাড়ির প্রতিটি সুতোয় কত ভালবাসা জড়িয়ে আছে! সেই প্রথম গৌরহরি তাকে মেয়েমানুষের দাম দিল। হয়তো সেদিনই তাকে প্রথম বউ বলে মনে হল তার।

চোখের জল মুছে শাড়িটা কমলার হাতে দিয়ে বলল, এটা আলমারিতে তুলে রাখ।

কালী বলল, কেন যে তুমি থান পরো তা বুঝি না। আজকাল বিধবারা অত মানে না তোমার মতো। সাদা খোলের শাড়ি পরলেই তো হয়।

বলাকা জবাব দিল না। বড় দেওরের ছেলে বিজুটা বড্ড ফচকে। সেদিন এসে বলল, ও বড়মা, থানটা কি বিধবাদের জার্সি নাকি? তুমি কি জানো যে, থান পরলে তোমাকে পাথরপ্রতিমা বলে মনে হয়?

আজকাল বিধবারা অম্বুবাচী করে না, কেউ কেউ মাছমাংসও খায় এসবও বলছিল বিজু। বলাকা হেসে বলল, আর বলিসনি রে ছেলে। বিধবারা তো বিয়েও করছে। আমরা সেকেলে লোক, আমাদের ছেড়ে দে বাবা, আর একেলে করে তুলবার চেষ্টা করিসনি।

না বড়মা, তোমাকে আর মানুষ করা গেল না। তবে থাকো তুমি দেবী-টেবী হয়ে।

পুরনো শাড়িগুলোর প্রত্যেকটার গায়েই একটা করে গল্প আর ঘটনা জড়িয়ে আছে। আছে দীর্ঘশ্বাসও। কয়েকটা বেছে আলমারিতে তুলে রাখল বলাকা। কোনওদিন পরবে না আর, শুধু মাঝে মাবে নেড়ে-চেড়ে দেখবে।

ও মা! কথা কানে যাচ্ছে না তোমার?

চোখ তুলে দুখুরিকে দেখে বলাকা বলে, কী হয়েছে?

বলছি না, বাবা এসেছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ গো, উঠোনে বসে খইনি ডলছে।

তাতে কী হল?

ফের বিয়ের কথা বলবে যে! আজ খুব বকে দাও তো!

বিয়ের কথা বলবে কী করে বুঝলি?

খুব জানি। আমাকে বেচে দোকান আর মোষ কিনবে।

ব্যাপারটা সবাই জানে। তবু কমলা আর কালী খুব হাসছিল। বলাকা হাসল না, দুখুরির বয়স এখন দশ-এগারো, ঠিক যে বয়সে তার নিজের বিয়ে হয়েছিল। দেহাতে এখনও এই বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। পরে গাওনা হয়। কিন্তু মুশকিল হল, দুখুরি তার বাপের মতো দেহাতের মানুষ নয়। পাঁচ ছয় বছর বয়সে তার মা মারা যাওয়ার পর বাঙালি রাম কাহার মেয়েটাকে বলাকার কাছে গচ্ছিত করে দিয়ে নিজে আর একটা বিয়ে করে। গত পাঁচ ছয় বছরে দুখুরির গায়ে অন্য হাওয়া লেগেছে। সে এখন লেখাপড়া করে, ইস্কুলে যায়, চারদিকটা দেখে এবং বুঝতেও পারে, দেহাতি নিয়ম চাপালে চলবে কেন?

কিন্তু বাঙালিরও কিছু বক্তব্য আছে। মাত্র হাজার খানেক টাকা হলে সে ননী পালের দোকানঘরটা নিতে পারে। আরও হাজার দুয়েক পেলে একটা বাচ্চা মাদী মোষ কিনবার জো হয় তার। শুধু বেকারির দিশি বিস্কুট বেচে অত বাড়তি টাকা ফেলবার উপায় নেই। কিন্তু দুখুরির বিয়ে দিলে দু-আড়াই হাজার তার হাতে আসে। পাত্রও প্রস্তুত। বর্ধমানের পান-বিড়িওলা লছমন দাসের ছোট ছেলে রণবীর। কথা হয়ে আছে। তাই কিছুকাল যাবৎ ঘুরঘুর করছে বাঙালি। মেয়েকে নিজের অধিকারবলে টেনে নিয়ে যাবে তেমন তাকত নেই তার। চাটুজ্যেদের প্রতিপত্তির কথা সে জানে। সহিষ্ণুতা এবং বিনয়বচন আর কাকুতিমিনতি ছাড়া তার অন্য পথ নেই। দুনিয়া যে অনেক এগিয়ে গেছে, মেয়েদের যে আর ধরে বেঁধে বিয়ের ফাঁস পরানো যায় না এসব খবর সে রাখে না। সে শুধু সাদাসাপটা হিসেবটা বোঝে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলে তার দোকানঘর আর একটা মোষ হয়ে যায়। আর এটা হলে তার অনেক দিনের স্বপ্নটাও সার্থক হয়।

বলাকা বলল, অত ভয় পাস কেন? আমি তো আছি। বাঙালিকে তো বলেছি তোর বিয়ে আমি দেবো।

তবে কেন ঘুরে ঘুরে আসে বলো তো! আজ ভাল করে বকে দিও।

তোকে অত ভাবতে হবে না, ভাল করে ঘরদোর ডাস্টিং কর।

দুখুরি চলে গেলে মায়াভরে দরজাটার দিকে চেয়ে থাকে বলাকা। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, বাঙালিকে তিন হাজার টাকা দিয়ে দুখুরিকে রেখেই দেয়। কিন্তু একজন দুঁদে উকিলের ঘর করে বলাকার কিছু বাস্তববুদ্ধি হয়েছে। সে জানে টাকা নিয়ে আপাতত মহানন্দে চলে যাবে বটে বাঙালি, কিন্তু কিছুদিন বাদে ফের টাকায় টান পড়লে এসে হাজির হবে। ফের ঘ্যান ঘ্যান করবে। এ এক জ্বালা!

দুখুরি যে খুব কাজের মেয়ে তা নয়, ফাঁক পেলেই খেলতে লাগে। ঘুমোনোর নেশা আছে। কাজের জন্য নয়, দুখুরি বলাকার একটা সম্বল। ফাঁকা বাড়িতে ও সারাদিন কাছেপিঠে থাকে, ডাকলে সাড়া দেয়। কত কথা

কয় বসে বসে। বলাকার এখন জনের অভাব।

তা বলে কি বাঙালিকে দুর দুর করে তাড়িয়ে দিতে পারে বলাকা? পারে না, কারণ যত দূরের মানুষ হোক, বাঙালির তো পিতৃত্বের একটা অধিকার আছেই।

খইনিটা মজে এসেছে। শেষ কয়েকটা তালি লাগিয়ে আর একটু ডলে বাসু আর গোকুলকে ভাগা দিয়ে নিজেরটুকু ঠোঁটে ফেলল বাঙালি। হ্যাঁ, জমেছে। মুখে দিতেই মনটা যেন খুশ হয়ে গেল।

গোকুল বলল, ও বাঙালি, উঠোনে থুথু ছিটোস না যেন। মা দেখলে আস্ত রাখবে না।

আরে নেহি বাবা, উঠানমে কৌন থুক ফেলবে?

দোতলা থেকে বলাকাকে নামতে দেখে গোকুল আর বাসু পালাল।

কী রে বাঙালি, কিছু বলবি?

বাঙালি শশব্যস্তে উঠে হাতজোড় করে "রাম রাম" দিয়ে এক গাল হাসল, তবিয়ত ঠিক আছে তো মাতাজি?

আছি একরকম বাবা। তা তোর কী খবর? বিয়ে পাকা করে এলি নাকি?

ভারী লজ্জা পেয়ে মাথা নত করে বাঙালি বলে, ঠিকঠাক তো সব আছে। আমি বলেছি কী, শাদি এখুন হোবে, গাওনা দশ বরষ বাদ।

দশ বছর বাদে দুখুরি যে কলেজে পড়বে সে খেয়াল আছে তোর? পাত্র তো লেখাপড়াই জানে না ভাল করে।

হাঁ হাঁ, কেনো জানবে না, উ ভি ইস্কুলে পড়ছে। পাস ভি দিবে।

ও তোর বানানো কথা। বিয়ে দিবি দেশওয়ালির সঙ্গে, দুখুরি তো দেহাতি ভাষা বলতেই পারে না।

তো কী আছে মাতাজি? বাংলা বলবে। রণবীর ভি বাংলা বলতে পারে।

তোকে তো বলেছি, দুখুরিকে আমায় দিয়ে দে। ওর ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। বিয়েও আমিই দেবো। কথাটা কেন পছন্দ হচ্ছে না তোর?

উ বাত তো ঠিক আছে মাতাজি। লেকিন ননীবাবুর দুকানটা শম্ভুবাবু লিয়ে লিবে। ভৈঁষওয়ালা ভি বলছে আর দেরি হলে মুশকিল।

আঠারো বছর বয়সের আগে মেয়ের বিয়ে দিলে জেল খাটতে হয় তা জানিস?

যেন খুব একটা হাসির কথা হয়েছে, এমনভাবেই হাসল বাঙালি, হাঁ, উ তো বাবুলোগদের জন্য আছে। মুলুকমে উরকম শাদি হরবখত হচ্ছে।

তা জানি বাবা। তোরা আইনকানুন একটুও মানিস না। কিন্তু মেয়ে যদি থানায় যায় তা হলে বিপদে পড়বি। দুখুরির একটুও মত নেই বিয়েতে।

ভারী অবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ে থাকে বাঙালি, থানায় যাবে? থানায় যাবে দুখুরি?

তুই বেশি চাপাচাপি করলে যাবে না তো কী? তোকে দেখলেই মেয়েটা ভয় পায় কেন রে?

বাঙালি উবু হয়ে বসে পড়ল। মাথায় হাত। দুখুরি থানায় যাবে, এতটা ভাবেনি বাঙালি। খইনির থুতু গিলে ফেলায় একটা দুটো হেঁচকি উঠল তার।

বলাকার একটু মায়া হল। বলল, শোন মুখপোড়া, দুখুরি এখন আমার কাছেই থাকবে। বড্ড মায়া পড়ে গেছে আমার। দোকান আর মোষ কেনার টাকা আমি তোকে দেবো। কিন্তু টাকা নিবি লেখাপড়া করে। পরে ফের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলে কিন্তু বিপদে পড়বি। বুঝেছিস?

খুব বুঝেছে বাঙালি। তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে বলে, রাম কি কৃপা মাতাজি। দুকানটা আর ভৈঁষটা হলে হামার আর কুছু লাগবে না।

মনে থাকে যেন। কখানা ভাল বিস্কুট রেখে যা। আমার নাতি-নাতনিরা দিশি বিস্কুট খেতে ভালবাসে। খাস্তা দেখে দিস বাবা।

বাঙালি বিস্কুট নিয়ে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

গৌরহরি চাটুজ্যে দুঁদে উকিল হলেও বিষয়বুদ্ধি তেমন ছিল না। খরচের হাত ছিল বড্ড বেশি। এ নিয়ে বলাকার চাপা ক্ষোভ ছিল। স্বামী-স্ত্রীতে কখনও ঝগড়াঝাঁটি বা মন কষাকষির বালাই ছিল না তাদের। গৌরহরির কথাই সুপ্রিম কোর্ট। তবু এ নিয়ে মাঝে মাঝে মৃদু একটু-আধটু অনুযোগ কখনও তুলেছে বলাকা। গৌরহরি জবাবে বলত, ভার কমাও বলাই, ভার কমাও। নইলে মরার সময় বড্ড কষ্ট হবে যে!

বলাই বলে বলাকাকে ডাকার আর কেউ নেই। ঠাট্টার ওই ডাক আজও যেন কানকে স্নিগ্ধ করে দেয়। আর কী আশ্চর্য, গৌরহরি চলে যাওয়ার পর বলাকারও যেন টাকাপয়সা, বিষয় সম্পত্তির ওপর টান হঠাৎ ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল। জেটি থেকে স্টিমার যেন পৃথক হয়ে ভেসে আছে। কোনও বাঁধন নেই। তাই দোনোমোনো করেও টাকাটা বাঙালিকে কবুল করে ফেলল বলাকা। সামান্যই টাকা। তার তো অভাব নেই। গৌরহরি অনেক রেখে গেছে, তার ওপর ছেলেরা পাঠায়, মেয়েরা পাঠায়। টাকা কোন কাজে লাগে তার? চাল ডাল সবজি কিছুই কিনতে হয় না তাকে। বরং ধান, সবজি, দুধ, সর্ষে এসব বিক্রি করেও বেশ টাকা পায় সে। কটা টাকা দিয়ে যদি মা-মরা মেয়েটার মুখে হাসি ফোটানো যায়।

ঘরে এসে ফের আলমারির সামনে বসে বলাকা। চারদিকে ডাঁই করা সব শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ।

কমলা গলা নিচু করে বলে, গয়নাগুলোও কি সব দিয়ে দিচ্ছ মা?

কেন বল তো!

নিজের হাতের পাতের কয়েকখানা রেখো।

গয়না দিয়ে করব কী? ওসব আপদ বিদেয় করাই ভাল। শেষে চোরে ডাকাতে নেবে।

তুমি যেন কেমনধারা হয়ে যাচ্ছ। কর্তাবাবা মরল তো তুমি যেন যোগিনী হলে। এমন দেখিনি।

দুর মুখপুড়ি। বুড়ো বয়সে কি গয়না পরে বসে থাকব নাকি?

তাই বললুম বুঝি। বলছি, গয়না তো একটা সম্বল। সোনা-দানা হাতে রাখে না মানুষ?

তা রাখে। দুর্দিনের ভয় পায় বলে রাখে, লোভেও রাখে। আমার সেসব নেই। আমার আসল গয়নাই চলে গেল তো সোনা-দানা দিয়ে কী হবে?

আসল গয়না যে কে তা কমলা জানে, কালী জানে। গাঁয়ের লোকও জানে।

কমলা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, একটা মটরদানা হার ছিল না তোমার! সেই যে ডায়মন্ড কাটা মটরদানা গো, কী ঝিকমিকই না করে!

হ্যাঁ। কর্তা দিয়েছিলেন। খয়রাশোলের বড় মামলাটা জিতে খুব আনন্দ হয়েছিল। তাই দিয়েছিলেন।

ওইটে রেখো। তোমাকে বড্ড সুন্দর দেখায়।

দুর! গলায় একটা চেন পরি, এই যথেষ্ট। মেয়েরা, বউমারা খালি গলায় থাকতে দেয় না বলে পরি। আর এই হিরের আংটিটা। এটা ঝন্টু চাকরি পেয়ে দিয়েছিল, তাই খুলিনি। ব্যস, আর কিছু রাখব না।

উঠোনে একটা শোরগোল উঠল। দুজন মুনিশ পুকুরে জাল ফেলেছিল। মস্ত একটা কাতলা তুলে এনে উঠোনে ফেলেছে।

দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে মাছটা দেখল বলাকা। পাকা কাতলা, এখনও কানকো নড়ছে। তার কি মাছ দেখে লোভ হয়? একটুও হয় কি?

মুখটা ফিরিয়ে নিল বলাকা। না, তার কোনও লোভ নেই। একটা মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই যেন চলে গেল ওসব। এখন আঁশটে গন্ধে তার গা গুলোয়।

এই যে আজ তার ছেলেমেয়েরা আসবে, নাতি-নাতনিরা দামাল পায়ে সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াবে, হাসিখুশি হইহট্টগোল হবে এসব ভালই লাগবে বলাকার। ভর ভরন্ত সংসার কার না ভাল লাগে? তবু সব থেকেও বুকের একটা পাশ যেন চিরকালের মতো ফাঁকা হয়ে গেছে। ওইখানে অন্ধকার আর হু হু করে বিরহের বাতাস বহে যায় সারাক্ষণ।

ভালবাসা কারে কয়? দশ বছর বয়সের বালিকা কামবোধহীনা বলাকা তা জানতই না। আবার মেয়েদের সহজ সংস্কারবশে জানতও। সে এক জানা না-জানার রহস্যময় আলো-আঁধারিতে তাদের শুভদৃষ্টি। ঘুমকাতুরে বলাকার বিছানায় এক প্রাপ্তবয়স্ক অচেনা পুরুষ—তার তথাকথিত স্বামী। পনেরো বছর বয়সের তফাত। দেহ জাগেনি, মন জাগেনি। রজোদর্শনও হয়নি তখনও। তার শোওয়া খারাপ ছিল বলে লোকটা তাকে সযত্নে পাশ ফিরিয়ে দিত। পাছে চঞ্চলতাবশে ঘুমের ঘোরে খাট থেকে পড়ে যায় সেই জন্য বারবার উঠে পাশবালিশের ব্যারিকেড ঠিকঠাক করে দিত। আর টাইফয়েডের সময় তো কোলে তুলে বাথরুমেও নিয়ে গেছে। টাইফয়েডের যখন বাড়াবাড়ি যাচ্ছে তখন আর বাথরুমে গিয়ে বসবার ক্ষমতাও ছিল না বলে বেডপ্যান দিত ওই লোকটাই। এসবের ভিতর দিয়েই বুনে ওঠে ভালবাসা। তার অত বাহার নেই, রোমান্স নেই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে এমন বজ্রবাঁধন তৈরি করে যে আর জোড় ভাঙে না কখনও, ভালবাসা কি শুধু উথালপাথাল ঝড় জল, নাকি উথলে-পড়া দুধ, নাকি বর্ষায় ফুলে ফুলে ছেয়ে যাওয়া কদম গাছ, নাকি সুফলা বছরে সম্পন্ন গৃহস্থের ধানের গোলা, সে কি সেতারের মির, নাকি আশ্চর্য সুগন্ধ কোনও? না না, ওরকম নয়। ওরকম নয় কিছুতেই। দুটো নারী-পুরুষের সম্পর্কই তো শুধু নয়, তার মধ্যে শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর-ননদ, গোরু-ছাগল, পাখি-পশু, খরা-বন্যা, কাঙাল-ভিখিরি কত কী ঢুকে পড়ে এসে। সহবত, নিয়মকানুন, অভদ্রতা ভদ্রতা—সব মিলিয়ে সম্পর্ক কি সোজা কথা? তারা যেন এক কুলি আর এক কামিন সযত্নে খেটেপিটে রচনা করেছিল এই সংসার। কাজ ভাগ করা ছিল, দায় ছিল, দায়িত্ব ছিল।

দশ বছর বয়সে বিয়ে। একটি সমর্থ পুরুষের ছায়ায় সে ক্রমে ক্রমে বয়ঃসন্ধি পেরোল। তার সংযত পুরুষটি স্ত্রীর যৌবন সমাগমের জন্য অপেক্ষা করেছিল, কখনও নিয়ম ভাঙেনি কোনও। পৌরুষের অন্যায্য জোর খাটায়নি কখনও। তার কাম কখনও ছিল না অন্ধ ও বধির। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, অতীব সুপুরুষ এই লোকটি কখনও ছিল বাবার মতো স্নেহশীল ও প্রযত্নপরায়ণ, কখনও ছিল বন্ধুর মতো বিশ্বস্ত দোসর, কখনও নির্জন

রাতে গোপনে হ্যারিকেন জ্বেলে ষোবলা গুটি খেলতে খেলতে হয়ে যেত তার সঙ্গী খেলুরি। বলাকা বুঝতেই পারেনি, লোকটি তার কে? শুধু বুঝত, একে ছাড়া তার চলে না।

তারপর ক্রমশ শরীরে বন্যার জল এল তার, কূল ভাসিয়ে। কানায় কানায় ভরে এল সে। এক পাগল বর্ষার রাতে হ্যারিকেনের নিবু নিবু আলোয় মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ যেন চিনতে পেরেছিল তাকে বলাকা। দুটি লীলায়িত হাতে তার কণ্ঠ বেষ্টন করে লজ্জায় মরে গিয়ে খুব আস্তে বলেছিল, এবার...।

সেই রাতের কথা মনে পড়লে আজও এই বাহাত্তর বছরের শরীর ও মনে একটা ঝংকার ওঠে, রক্তে নুপূর বেজে যায়। বিবশ হয়ে যায় মন। সে তো শুধু কাম নয়, সে এক অপার্থিব নিবেদন। একটি চুম্বন গড়ি, দোঁহে লই ভাগ করি, এ বিশ্বে মরি মরি এত আয়োজন। এ হল সেই পৃথিবীর কথা যখন দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতেন। যখন শরীর জুড়ে শঙ্খধ্বনি আর জোকার শোনা যেত।

বড়মা! ও বড়মা।

দুটি টইটুম্বুর চোখ তুলে দরজাটা বড্ড আবছা দেখল বলাকা। গলার স্বরটা অবশ্য চেনা।

আয়। দুদিন আসিসনি তো! কী হয়েছিল?

পান্নার সঙ্গে ওর বয়সি একটা মেয়ে। চোখের জলটা আঁচলে মুছে ভাল করে দেখল বলাকা। ভারী ফুটফুটে চেহারার মেয়ে। কিন্তু মুখটা বড় দুঃখী।

কাঁদছিলে নাকি বড়মা? জ্যাঠার কথা মনে পড়লে আমারও যে কী ভীষণ কান্না পায়!

কষ্ট করে একটু হাসল বলাকা।

কিন্তু অনেক কেঁদেছ বড়মা। আর কেঁদো না। অজ্ঞান হয়ে জ্যাঠার খাট থেকে পড়ে গিয়েছিলে সেদিন, মাথা কেটে রক্তারক্তি। কী ভয় পেয়েছিল সবাই।

বলাকা একটু হেসে বলল, তবু তো মরিনি। তার আগেই যে কেন গেলাম না সেই দুঃখ কি কম? আয় বোস সামনে। তোকে একটু দেখি।

সঙ্গে কাকে এনেছি বলো তো! চেনো একে?

বলাকা একটু তাকিয়ে থেকে বলল, আমলের মেয়ে না?

ও মাঃ চিনলে কী করে, আগে দেখছ কখনও?

না রে। শুনেছি ওরা গাঁয়ে এসেছে। তা ছাড়া ওর মুখে অমলের মুখের আদল আছে।

মেয়েটা এগিয়ে এসে একটু আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বলল, আচ্ছা, আমি কি আপনাকে প্রণাম করব?

না, না, প্রণাম করতে হবে না, একটা মোড়া টেনে নিয়ে বোসো।

মোড়াতে নয়, মেয়েটা ঝুপ করে মেঝেতেই বলাকার মুখোমুখি বসে পড়ল। পাশে পান্না।

কী করছিলে বড়মা? আজ তো তোমার খুব আনন্দ, না? সবাই আসছে।

বলাকা হেসে বলল, আনন্দ তো বটে মা, কিন্তু ফের যখন চলে যাবে সবাই, তখন আমি যে একা সে-ই একা।

ও বড়মা, বাবাকে বলো না, আমি এসে তোমার কাছে থাকি।

থাকবি?

এত বড় বাড়িতে তুমি একা একা থাকো, তোমার ভয় করে না?

বলাকা হেসে বলে, ভয়! ভয়টা কীসের?

আমার যা ভয়! বাব্বাঃ, ভয়ে যেন মরে যাই। মাঝে মাঝে এমন হয়, যেন ভয়ে হার্টফেল হয়ে যাবে।

তোর তো চিরকাল ভয়। সেই ছোট থেকে। আমার কাছে এসে থাকতে চাস সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু এই ফাঁকা বাড়িতে তো তোর আরও ভয় করবে।

ম্লান মুখে পান্না বলে, সেটাই তো প্রবলেম। তোমার কেন ভয় করে না বলো তো!

কাকে ভয় করব? ভূতপ্রেতকে! আমি নিজেই তো ভূতপ্রেতের কাছাকাছি চলে গেছি, আর ভয় করে কী হবে?

তুমি বড় জ্যাঠাকে দেখতে পাও?

না, তবে দেখতে পেলে ভয় পেতাম না। খুশিই হতাম।

তোমার দুর্জয় সাহস বড়মা। আর এই যে দেখছ সোহাগ, এরও খুব সাহস। রাতে একা একা বেরিয়ে পড়ে, জানো? বলে কী, ভূতেরা নাকি ওর বন্ধু! হিঃ হিঃ!

মেয়েটার দিকে তাকাল বলাকা। মুখের বিষণ্ণতাটা ভারী গভীর। পোশাকটাও ভাল নয় তেমন। রংচটা একটা ঢোলা বুলেটে রঙের কামিজ আর একটা কালচে সালোয়ার। গায়ে কোথাও গয়নার চিহ্ন নেই।

বলাকা মৃদু স্বরে বলে, রাতবিরেতে একা একা বেরোনো ভাল নয়। গাঁ-গঞ্জেও পাজি লোক আছে

মেয়েটা বড় বড় চোখ করে বলাকার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। খুব এক নজরে। হঠাৎ বলল, আপনাকে দেখলে রিয়েল বলে মনেই হয় না, মনে হয় ম্যানেকুইন বা স্ট্যাচু।

এটা প্রশংসা না নিলে বুঝতে না পেরে বলাকা হেসে ফেলল, বলল, হ্যাঁ, এখন স্ট্যাচুই হয়ে গেছি। বোধবুদ্ধিও বোধহয় আর কাজ করে না।

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে, তা বলছি না, ইউ লুক হেভেনলি। আপনি তো পারুলের মা!

'পারুলের মা' শুনে একটু অবাক হল বলাকা। পারুল তো আর ওর সমবয়সি নয়। তবু রাগ হল না। সাহেবি কেতায় ওরকমই সব বলে বোধহয় ওরা। ঠিকঠাক সব হলে আজ তো পারুলেরই ওর মা হওয়ার কথা ছিল।

আজ মনে হয়, বিয়েটা না হয়ে বেঁচেছে পারুল। সবটুকু অবশ্য বাঁচেনি। মায়েরা অনেক কিছু টের পায়। বলাকাও পেয়েছিল। পারুল কিছুই ভেঙে বলেনি তাকে। তবু ঘটনা যে একটা ঘটেছিল এটা খুবই স্পষ্ট টের পেয়েছিল বলাকা। মা আর মেয়ের মধ্যে একটা লুকোচুরি চলছিল বটে, কিন্তু বলাকা নজর রেখেছিল, অঘটনের ফল কতদূর গড়ায়। গড়ায়নি, কিন্তু মর্মে গভীর আঘাত পেয়েছিল বলাকা।

কোনও কথাই সে কখনও স্বামীর কাছে গোপন করেনি। এক রাতে সে গৌরহরিকেও নিজের আশঙ্কার কথা বলে ফেলে। রাগী ও মেজাজি গৌরহরি সটান উঠে বসে বলেছিল, বলো কী? হারামজাদার এত সাহস!

গৌরহরিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠান্ডা করতে হয়েছিল। বলাকা বলেছিল, অমলকে শাসন করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে যে! চারদিকে রটে যাবে।

গৌরহরি কুঁসছিল রাগে। গরগর করছিল। সেই পুরুষের রাশ ধরা বড় সহজ ছিল না তখন।

মেঘটা কেটে গিয়েছিল কয়েকদিন পর। তারপর পারুলই বেঁকে বসল, অমলকে বিয়ে করবে না। বলাকার মন থেকে ভার নেমে গিয়েছিল।

আজ মেয়েটাকে দেখে সেইসব পুরনো কথা একটা ঝটকা মেরে গেল যেন।

হ্যাঁ, আমি পারুলের মা। পারুলকে চেনো?

হ্যাঁ, চিনি। শি ইজ এ গডেস।

বলাকা হেসে ফেলে, সে কী? পারুল আবার গডেস কীসের?

ওকে আমার ওরকমই লাগে। আই অ্যাডোর হার।

বলাকা খুশিই হল। বলল, বেশ তো, ভালই তো।

সোহাগ আর আমি খুব বন্ধু হয়ে গেছি, জানো বড়মা? ও-ও একটু পাগল, আমিও একটু পাগল। তাই খুব মিল।

তাই বুঝি? তা কী পাগলামি করিস তোরা?

খুব হোঃ হেঃ হিঃ হিঃ করে হাসি, আবোলতাবোল কথা বলি, আচার চুরি করে খাই আর ক্যারিক্যাচার করি।

কিন্তু সোহাগের মুখে তো হাসির চিহ্ন দেখছি না। মুখখানা ভার কেন?

ও খুব চিন্তা করে যে!

কীসের চিন্তা?

সেটাই তো আমি বুঝতে পারি না। সব সময়ে কেবল ভাবে আর ভাবে।

এইটুকু বয়সে অত ভাবো কেন?

সোহাগ মৃদু হেসে মাথাটা নোয়াল।

পুজো অবধি কি থাকবে তোমরা?

সোহাগ উদাস মুখে বলে, কী জানি!

তোমাদের তো কয়েকদিন আগেই চলে যাওয়ার কথা ছিল, শুনেছিলাম।

হ্যাঁ, বাবা হঠাৎ জরুরি কাজে লন্ডন গেছে, তাই আমরা আর যাইনি, কলকাতায় আমার হেলথ হ্যাজার্ড হয়।

সেও যেন শুনেছিলাম। ভালই তো, থাকো। আজ তোমার পছন্দের পারুলও আসবে। সেও পুজো অবধি থাকবে বলেছিল। মাঝে মাঝে এসে গল্প-টল্প করে যেও।

হঠাৎ হি হি করে হেসে পান্না বলে, ও কী বলে জানো বড়মা? বলে, আমি যদি পারুলের মেয়ে হতাম তো খুব ভাল হত।

বলাকার মনটায় একটা ধাক্কা লাগল। হঠাৎ এ কথা বলে কেন মেয়েটা? এরকম ভাবা তো স্বাভাবিক নয়?

আলগা গলায় বলাকা জিজ্ঞেস করে, তাই নাকি সোহাগ?

কথাটার জবাব না দিয়ে সোহাগ হঠাৎ বলল, আপনার নামটা খুব অদ্ভুত, না?

কেন বলো তো!

বেশ আধুনিক নাম।

মোটেই না। রবীন্দ্রনাথ বলাকা লিখেছিলেন সেই কবে। সেই থেকেই তো বাবা আমার নাম রেখেছিল বলাকা। পড়েছ বলাকা?

ঘাড় হেলিয়ে সোহাগ বলে, হ্যাঁ। মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা, লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা। ইট ইজ ফ্যানটাস্টিক।

এ কথায় মুগ্ধ হল বলাকা। না, ততটা সাহেবি চাল নেই তো!

কী খাবে বলো তো!

ফের ঘাড় হেলিয়ে বলল, এনিথিং, এখানে সবাই খুব খাওয়াতে ভালবাসে, না?

বলাকা স্মিত মুখে বলে, খাওয়ানোর মধ্যে একটা আদর থাকে তো!

সোহাগ হাসিমুখেই বলল, আমার মাও আমাকে খুব খাওয়াতে চায়। কিন্তু তার মধ্যে আদরটা থাকে না।

নয়

প্রথম দৃশ্য। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক জীবনের উপান্তে পৌঁছে গেছেন। জরাজীর্ণ শরীর, বিরলকেশ মাথা, বেশবাসের ঠিক নেই। মধ্য রাতে বৈজ্ঞানিক একটি পুরনো, প্রকাণ্ড, কীটদষ্ট, জীর্ণ পুঁথির ওপর ঝুঁকে বসে আছেন। উত্তেজনায় তাঁর হাত-পা কাঁপছে, চোখ বারবার ঝাপসা হয়ে আসছে অতি পঠনের ফলে, বুক ধড়ফড় করছে আবেগে। জরাজীর্ণ এই প্রাচীন পুঁথির ভিতরেই তিনি নানা সংকেত পেয়ে যাচ্ছেন এবং জীবনের বহু সাধনা, অধ্যবসায়, অনেক বিনিদ্র রাত্রি ও বিশ্রামবিহীন দিন কাটিয়ে অবশেষে তিনি তাঁর অভীষ্টের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন প্রায়। এই বিরল, অজ্ঞাত পুঁথির ভিতরেই লুকোনো রয়েছে মানুষের অমরত্ব লাভের বীজ। আর কয়েকটি পৃষ্ঠা অতিক্রম করলেই সেই বাতিঘর, যা মৃত্যুর অন্ধকার মহাসাগরে মানুষকে অনন্তকাল বেঁচে থাকার গুপ্তমন্ত্রের সন্ধান দেবে।

একটা মাছি বিরক্ত করছে বারবার। নাকের ওপর, চোখের সামনে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, টাকের ওপর বসে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। বৈজ্ঞানিক বিরক্ত হয়ে পতঙ্গ নিধনের জন্য চামড়ার ফলক লাগানো শলাকাটি তুলে ফটাস করে মাছিটাকে টেবিলের ওপরে মেরে ফেললেন। অতি ব্যগ্রতায় ঝুঁকে পড়লেন পুঁথির ওপর।

একটা বাতাস এল জানালা দিয়ে। দমকা বাতাসের ঝটকায় পুঁথির জীর্ণ পাতা পট করে উলটে গেল। বৈজ্ঞানিক বিরক্ত হয়ে ধমক দিলেন, থামো! এ সময়ে বিরক্ত কোরো না।

দ্বিতীয় দমকা হাওয়াটি আরও একটু জোরালো। ফড়ফড় করে পুঁথির পাতা উলটে গেল কয়েকটা, বৈজ্ঞানিকের নোটবই পড়ে গেল মেঝের ওপর। কলম গড়িয়ে যেতে লাগল।

বৈজ্ঞানিক ধমক দিলেন, এসব কী হচ্ছে এ সময়ে?

তৃতীয় দমকা বাতাসটা এল হা-হা রবে প্রবল ঝঞ্ঝার বেগে, জানালা দরজার কপাট প্রবল ঝাপটায় আর্তনাদ করে উঠল। বৈজ্ঞানিক পাগলের মতো উঠে জানালা বন্ধ করতে গেলেন আর তখনই লুঠেরা বাতাস জীর্ণ পুঁথির পাতার বাঁধন ছিন্ন করে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল। বিপরীত জানালা দিয়ে কাটা ঘুড়ির মতো উড়ে যাচ্ছে পাতাগুলি, অমূল্য পাতাগুলি। বৈজ্ঞানিক আর্তনাদ করে উঠলেন, থামো ছিন্নপত্র, স্থির হও! আমার কাজটুকু শেষ করতে দাও দয়া করে।

কেউ শুনল না তাঁর কথা। বাইরের অন্ধকার মুক্তাঞ্চলে পাতাগুলি উড়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক পাগলের মতো দরজা খুলে ছুটে গেলেন বাইরে। অসহায় চোখে চেয়ে দেখলেন, মহার্ঘ পাতাগুলি অন্ধকারে কোন অদৃশ্য ঠিকানায় ভেসে চলে যাচ্ছে, গাছের মগডালে, পুকুরের জলে, বিছুটি বনে, আকাশে। বজ্রপাত হল, মেঘ ডেকে উঠল গম্ভীর কণ্ঠস্বরে, প্রবল বৃষ্টি ছুটে এল তার অসংখ্য খরসান বল্লমে চতুর্দিক বিদ্ধ করতে করতে। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

শরীর কেঁপে উঠল বয়সের শীতে। বিধ্বস্ত বৈজ্ঞানিক ফিরে এলেন ঘরে। স্মৃতিভ্রংশ, স্থাণুর মতো বসে রইলেন নিজের আসনে। হাতে একটি পানীয়পাত্র। সেটি মুখে তুলতে ভুলে গেছেন। তাঁর চোখের জল ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে পাত্রের ভিতরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য। অন্ধকার মঞ্চে একটি নারীকণ্ঠ চিৎকার করে উঠল, আমি শ্রেষ্ঠীকন্যা অম্বালিকা। দুষ্কৃতীরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। নগরবাসীগণ, তোমরা অবহিত হও, আমার পিতা এক কোটি টাকা মুক্তিপণ দিয়ে আমাকে মুক্ত করেছেন। দেখ, আমি অম্বালিকা, এক মহার্ঘ মেয়ে। আমার দাম কোটি টাকা।

মঞ্চ আলোকিত হল। গাছতলায় দুটি কাঙাল ভিখিরি মেয়ে বসে আছে। কিশোরী। মঞ্চের মাঝখানে একটি বেদির ওপর দাঁড়িয়ে শ্রেষ্ঠীকন্যা অম্বালিকা হাত তুলে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছে।

কাঙাল মেয়েদের একজন আর একজনকে বলে, হ্যাঁ লা দিদি, এক কোটি টাকা কত টাকা রে?

তা কী জানি! হাজার টাকা অবধি জানি, তা সেও অনেক টাকা। গুণে শেষ করা যায় না।

আর মুক্তিপণটা কী বল তো!

ওই তো, একজনকে ধরে নিয়ে যায়, তারপর টাকা আদায় করে ছেড়ে দেয়।

ছোট মেয়েটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমাদের কেউ ধরে নেবে না কখনও।

সে কথা বলিসনি, আমাদেরও মাঝে মাঝে ধরে বইকী। ভিক্ষে বা বেশ্যাবৃত্তি করাতে নিয়ে গিয়ে লাগায়। এই যে আমাদের রোগাভোগা, কালো চেহারা, মেয়ে-শরীর বলে মনেই হয় না, এই শরীরেরও কিছু ব্যবহার আছে। মেয়ে বলেই একটু-আধটু কাজে লাগি আজও। দুখানা রুটি একটু গুড় খাইয়ে আমাকেও একজন আধবুড়ো লোক ভোগ করেছিল।

আমাকে ভোগ করেছিল একজন মাতাল। আমার তুচ্ছ শরীর নিয়ে সে যখন ব্যস্ত ছিল তখন আমি তার পকেট থেকে টাকা তুলে নিই।

শ্রেষ্ঠীকন্যা অম্বালিকাকে ঘিরে ধরেছে সাংবাদিকরা। একজন বাচাল সাংবাদিক বলল, মুক্তির জন্য অভিনন্দন অম্বালিকা। দয়া করে বলুন, দুষ্কৃতীরা আপনাকে ধর্ষণ করেনি তো!

অম্বালিকা অবিচলিত হয়ে বলল, আমি এ কথার জবাব দেব না। আমি শুধু বলতে চাই, মুক্তি কীসের? কেমন মুক্তি? এক বন্দিদশা থেকে আর এক বন্দিদশায় গমন করা ছাড়া মেয়েদের কোনও মুক্তি কি কোথাও আছে? ভদ্রমহোদয়গণ, ওই দেখুন, দক্ষিণ দিকে একটু দূরে ওই দাঁড়িয়ে আছেন আমার প্রেমিক, আমি ওঁর বাগদত্তা। যখন আমাকে হরণ করা হয় তখন নগর-উদ্যানে মনোরম এক অপরাহ্ণে আমি ও আমার প্রেমিক বিশ্রম্ভালাপে রত ছিলাম। গদগদ ভাব, পরস্পরের শ্বাসবায়ুতে ঘটে যাচ্ছিল প্রগাঢ় ভালবাসার আশ্চর্য সংক্রমণ। সেই সময়ে সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা অস্ত্র উদ্যত করে আমাদের ঘিরে ফেলে। না, আমার প্রেমিক কোনও প্রতিরোধ করেননি। আত্মরক্ষা সকলেরই জীবনধর্ম। উদ্যত অস্ত্রের সামনে তাঁর কিছুই করার ছিল না। কোটি টাকা মুক্তিপণ দিয়ে আমাকে মুক্ত করা হয়েছে বটে, কিন্তু দেখুন, আমার প্রেমিকের মুখে কোনও হাসি নেই, আনন্দ নেই। বিষণ্ণ ও দ্বিধাগ্রস্ত মুখে ওই তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওই বিষণ্ণতা অকারণ নয়। উনি চেয়েছিলেন এক শুদ্ধ ও অনাঘ্রাতা নারী। কিন্তু দুষ্কৃতীদের ডেরায় কী ঘটেছিল তা উনি জানেন না। আমার শুদ্ধতা নিয়ে উনি আজ বিচলিত, দোলাচলায়মান, দ্বিধাগ্রস্ত। পৌরাণিক সীতাই কখনও সন্দেহপাশ থেকে মুক্ত হননি, আমি তো সামান্যা নারী। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি তাই প্রশ্ন করতে চাই, নারীর মুক্তিপণ এক ব্যর্থ প্রয়াস। তার মুক্তিই

যে আদপে নেই। বরং ওই দেখুন, গাছতলায় ওই যে দুটি ভিখিরি মেয়ে বসে আছে ওরাও আমার চেয়ে কত স্বাধীন, কত সুখী ...

ওলো দিদি, মাগী কী বলছে শুনলি?

ভদ্দরলোকেরা ওরকম কত আজগুবি কথা কয়। আয়, বরং একটু ঘুমিয়ে নিই দুজনেই।

তাই ভাল। জেগে থাকলেই খিদে চাগাড় দেয়।

তৃতীয় দৃশ্য। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক চারধারে পাগলের মতো পুঁথির নিরুদ্দেশ পাতাগুলি খুঁজছেন। এক-আধটা পেয়ে যাচ্ছেন। হতাশায় মাথা নেড়ে বলছেন, না, না, সব মুছে গেছে। সব মুছে গেছে।

বুড়োটা কী খুঁজছে রে দিদি?

পাগল-টাগল হবে। ছেঁড়া ভেজা কাগজ কুড়োচ্ছে।

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক এগিয়ে এলেন তাদের দিকে, ওহে, তোমরা একটা পুঁথির কিছু ছেঁড়া পাতা পেয়েছ কুড়িয়ে?

বড় জন হাই তুলে বলল, ঝড়বৃষ্টির সময় কতক উড়ে যাচ্ছিল দেখেছি। কাগজ কুড়িয়ে কী হবে? আমরা কি পড়তে জানি!

মূর্খ বালিকা। কী অমূল্য সম্পদ যে ওই কাগজের মধ্যে ছিল তা তোমরা জান না।

লটারির টিকিট নাকি রে পাগলা-বুড়ো?

তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। ওতে লেখা ছিল মানুষের মৃত্যুর প্রতিষেধক। মৃত্যুহীনতার মোহনায় মানুষকে পৌঁছে দিচ্ছিলাম আমি। বিধি বাম। মৃত্যুকে রোধ করা গেল না।

কী বলছে রে দিদি?

বলছে এমন ওষুধ বের করবে যাতে মানুষ আর মরবে না।

মরণ! একটু আগে ঝড়বৃষ্টির সময় ওই তালগাছে যে বাজটা পড়ল সেটা আমাদের মাথায় পড়লেও কি মরব না?

ওগো ও বিটলে বুড়ো, মানুষ মরবে না তো খাবে কী?

বৈজ্ঞানিক হতবাক হয়ে বললেন, তার মানে?

বলি মানুষকে যে বাঁচিয়ে রাখতে চাও তার খোরাকির জোগাড়টা আগে করে রাখ বাপু।

মূর্খ বালিকা, মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি চাও না তোমরা?

দুই বোন হেসে গড়িয়ে পড়ল। বড় জন বলল, বেঁচে আছি কিনা সেটাই যে টের পেলুম না এখনও। আয় তো বিটলে বুড়ো, গায়ে একটা চিমটি কেটে দেখ তো বেঁচে আছি কিনা।

নাটকের নাম "মুক্তিপণ"। কিংবা ঠিক নাটকও নয়। ঈষৎ নাটকীয় গদ্য। কী এটা, কী সে বলতে চাইছে তা অমল নিজেও জানে না। কিন্তু কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তার আজকাল এরকম কিছু কিছু লেখার ঝোঁক চেপেছে। শুরু হয়, কিন্তু প্রায়ই শেষ হয় না। তবে নানা ছদ্মবেশে এসব লেখার মধ্যে সে নিজে ঢুকে যায়, আর চলে আসে পারুল। পারুলের সঙ্গে কখনও আর কেউ মিশে যায়, যেমন তার নিজের আদলেও আসে অন্যের আদল।

অম্বালিকা কি পারুল? না, ওর মধ্যে সোহাগও রয়েছে কিছুটা। কীভাবে যে মিশে গেল দুজন কে জানে। ছয় সাত বছর আগে তাদের কলম্বাস শহরের বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল সোহাগ। তখনও সে নিতান্তই

বালিকা। দশ এগারো বছর বয়স। এইলিন নামে একজন ব্রাজিলীয় মেয়ে আসত তাদের বাড়িতে। সে এক এজেন্সির মাধ্যমে বুডঢার বেবি সিটিং-এর কাজ পায়। সেই থেকে যাতায়াত। এইলিন প্রায়ই ব্ল্যাক ম্যাজিক হিপনোটিজম এবং অদ্ভুত সব বিষয়ে কথা বলতে ভালবাসত। ভুডুর প্রতি ছিল অমোঘ আকর্ষণ। সোহাগকে নিয়ে গিয়েছিল সে-ই।

সোহাগকে অপহরণের পরই বাড়িতে ফোন আসত যাতে তার খোঁজখবর করা বা পুলিশে জানানো না হয়। আশ্বাস দেওয়া হত, সোহাগকে নিরাপদে ফেরত দেওয়া হবে। উদ্বিগ্ন অমল আর মোনা পুলিশকে জানায়, কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। এইলিনের চিহ্নও খুঁজে পায়নি তারা। দিন সাতেক বাদে এক ভোরবেলায় একটা গাড়ি সোহাগকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে যায়। যে সোহাগ ফেরত এল সে যেন ঠিক আগের সোহাগ নয়। একটু গম্ভীর, একটু ভাবুক, একটু বিষণ্ণ আর উদাসীন। অমল আর মোনা এবং পুলিশের লোকেরা তাকে প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করেছে। সে নানা উলটোপালটা জবাব দিত। রেপ করা হয়েছে কিনা। তার ডাক্তারি পরীক্ষাও হয়। রেপ না হলেও তার গায়ে বিশেষ জায়গায় কয়েকটি উল্কি পাওয়া যায়। পুলিশ বলেছিল, কোনও ধর্মোন্মাদ গোষ্ঠীর কাজ। কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। সোহাগ গোপনে নানা প্রক্রিয়া করত, অদ্ভুত ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করত এবং কখনও কখনও তার অর্ধচেতন অবস্থা হত। অনেক সময় মধ্যরাত্রে সে নিশি-পাওয়ার মতো সারা ঘর ঘুরে ঘুরে নাচত। মোনা মাঝে মাঝে মারধরও করেছে ওকে। সোহাগের ই-মেল-এ কিছু অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য বার্তা আসতে শুরু করেছিল। অমলের কলকাতায় ফিরে আসার কতকগুলো কারণের মধ্যে সোহাগও একটা কারণ।

সোহাগ ফিরল, কিন্তু তার সত্তার খানিকটা অংশ রয়ে গেল অন্য কোথাও, কোনও এক রহস্যময় গোষ্ঠীর কাছে। এখনও সোহাগের ই-মেল মার্কিং করলে সেই সব অদ্ভুত বার্তা পাওয়া যায়। কী যে হল মেয়েটার! কোন বিটকেল মানুষদের পাল্লায় পড়ল তার সমাধান আজও করতে পারেনি অমল রায়।

শ্রেষ্ঠীকন্যা অম্বালিকার মধ্যে পারুলই রয়েছে বটে, একটু সোহাগও আছে যেন। আর ওই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক কি তারই প্রতিচ্ছবি নয়? স্বপ্ন আর সম্ভাব্যতার মধ্যে কী বিপুল ফাঁক? এখন সে মাসে এক কাঁড়ি টাকা মাইনে পায়। দেড় লাখেরও কিছু বেশি। দিল্লি বা বম্বে বা বিদেশে গেলে আরও অনেক বেশি পেত। কিন্তু শুধু টাকা রোজগারের যন্ত্র হওয়ার ইচ্ছে তো ছিল না তার। সে হতে পারত একজন আবিষ্কারক, একজন দার্শনিক বা না হয় একজন কবিই। এখন তার মনে হয় এত টাকাই তার সব সম্ভাব্যতা নষ্ট করে দিল। বানিয়ারা মগজ কিনে আনে, নষ্ট করে দেয়। এর চেয়ে কত ভাল ছিল গবেষণাগার, ভাল ছিল একাগ্র চিন্তার গৃহকোণ।

শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের এ.সি. চেয়ারকারে বসে অমল রায় কিছুতেই ভারতের শিল্পমন্ত্রীর নামটা মনে করতে পারছিল না। গত কয়েক দিনে অফিসের বিভিন্ন মিটিংয়ে কয়েকবারই নামটা শুনেছিল সে। এখন কিছুতেই নামটা যে কেন মনে আসছে না। মনে করার কোনও জরুরি কারণও নেই। শরতের এই সুন্দর সকালে শিল্পমন্ত্রীর নাম নিয়ে কে-ই বা মাথা ঘামায়? কিন্তু সে ভিতরে ভিতরে অস্পষ্ট একটা তাগিদ টের পাচ্ছে, নামটা তার মনে পড়া উচিত। ইদানীং তার স্মৃতিশক্তি কমে যাচ্ছে। সন্দেহ হয়, এখন ফের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসলে, স্ট্যান্ড করা তো দূরের কথা, সে আদৌ সেকেন্ড ডিভিশনেও পাস করবে কিনা। আজকাল হঠাৎ যেন বিস্মৃতি এসে বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়ায়, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, লোপাট করে দেয় মাথার যত প্রোগ্রামিং, যত ডাটা, যত ফাইল। কী যে হয় মাঝে মাঝে। যত দিন পরেই দেখা যোক, চেনা মানুষের মুখ

দেখলেই তার নাম ঠিক মনে পড়ে যেত অমলের। মাসখানেক আগে একসঙ্গে ওয়ান থেকে টেন অবধি পড়া সহপাঠী এবং গলাগলি বন্ধু গৌরাঙ্গ যখন তার অফিসে দেখা করতে এসেছিল, কিছুতেই নামটা মনে পড়ল না তার। ঠিক বটে, গৌরাঙ্গর সঙ্গে মাধ্যমিকের পর আর দেখাই হয়নি। তবু তার স্মৃতিশক্তি কখনও এরকম ডিলিট হয়ে যায়নি কখনও। তিনটে ক্ষিপ্র জিনিস ছিল তার। ক্ষিপ্র চিন্তা, ক্ষিপ্র স্মৃতি, ক্ষিপ্র কাজ।

হঠাৎ অমল টের পেল, আজ যেন এ.সি. চেয়ারকারে প্রার্থিত নিস্তব্ধতাটা নেই। বড্ড বেশি কথাবার্তা হচ্ছে চারদিকে। সামনে পিছনে। সুবেশ ও সুভদ্র কয়েকজন এক রকমের স্যুট-পরা তোক আইল দিয়ে ঘন ঘন যাতায়াত করছে। অমল বিরক্ত হয়ে সদ্য কেনা ইংরিজি খবরের কাগজটা খুলে খুঁজতে লাগল, যদি কোথাও ভারতের শিল্পমন্ত্রীর নামটা পাওয়া যায়। খুবই হাস্যকর এই চেষ্টা। কারণ নামটা জানার কোনও প্রয়োজনই নেই তার। কিংবা সূক্ষ্মভাবে আছেও। শিল্পমন্ত্রী নয়, সে খুঁজছে তার স্মৃতির হারানো তথ্যগুলিকে। কেন হারিয়ে যাচ্ছে তারা, কেন উবে যাচ্ছে অকারণে?

আজকাল কি এ.সি. চেয়ারকারে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়? তাই তো মনে হচ্ছে। সুবেশ ও সুভদ্র স্যুট-পরা লোকগুলো ট্রে-ভর্তি বাক্স সাজিয়ে এনে বিলি করছে, সঙ্গে সিল-করা বোতলে জল। ভাল, বেশ ভাল। এরা এ.সি-র যা ভাড়া নেয় তাতে ব্রেকফাস্ট তো দেওয়াই উচিত। খাবারের আমিষ-গন্ধে অমলের পেটের ভিতরটা কেমন করে ওঠে। সে আজ সকালে এক কাপ কফি ছাড়া কিছুই খেয়ে আসেনি। বাসুদেব ব্রেকফাস্ট করে দিতে চেয়েছিল, তার তখন খাওয়ার ইচ্ছে হয়নি। আজ সকালে কিন্তু ক্লান্ত ও অবসন্ন ছিল অমল। কাল রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখার পর শেষ রাতে ঘুম আসেনি আর।

দুঃস্বপ্ন! ঠিক দুঃস্বপ্নও বলা চলে না সেটাকে। একটা অন্ধকার গলি। এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে অমল। গলির অন্য প্রান্তে একটা মরা আলোর মলিন চৌখুপি। গোধূলির মতো পাঁশুটে আলো। কেউ কোথাও নেই। ওপরে নিরেট কালো অন্ধকার আকাশ। কিংবা হয়তো আকাশ বলেও কিছু ছিল না। শুধু ওই জনহীন গলিটাই দেখতে পেয়েছিল অমল। ঘেয়ো কুকুর বা রাস্তার বেড়ালও ছিল না, ছিল না দৌড়ে-যাওয়া ইঁদুর কি আরশোলা। এত প্রাণহীন গলি আর কখনও দেখেনি অমল। গলির ও-প্রান্তে ওই পাঁশুটে আলোর চৌখুপিও যেন এক নিষ্প্রাণতা। কোনও যাতায়াত নেই কারও, ছায়া নেই, গাছ নেই, প্রাণ নেই, শব্দ নেই। অমল দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই, এক পা-ও এগোনোর সাধ্য নেই তার। আর তার চোখ বেয়ে অঝোরে জল পড়ে যাচ্ছিল।

অন্ধকারের চেয়েও ভয়ংকর ওই পাঁশুটে আলো। সম্মোহিতের মতো চেয়ে থেকে অমল টের পাচ্ছিল, এখানেই সব শেষ। এখানেই মানুষের সব আয়াস ও প্রয়াসের শেষ, সভ্যতার শেষ, মানুষের স্বপ্ন ও সাধ্যের শেষ। আর কোথাও যাওয়ার নেই তার। বৃথা তার বেঁচে থাকা, বৃথা তার দর্শন বিজ্ঞান। এই গলিমুখ আর ওই পাঁশুটে আলোর চৌখুপি এক ভয়ংকর সংকেতের মতো নিশ্চুপে বলে দিচ্ছে, কিছু নেই, আর কিছু নেই।

একটুও বাতাস ছিল না, শ্বাসের শব্দও নয়, জ্যোৎস্না নয়। এত কান্না আসছিল তার। এইভাবে শেষ হয়ে যায় বুঝি সব কিছু?

যখন জেগে উঠল অমল তখন তার আকাশপাতাল জুড়ে ভয়। এত ভয় সে কখনও পায়নি। কিন্তু ভয়ের স্বপ্ন তো নয়! আশ্চর্য! তবে সে এত ভয় পেল কেন? পিপাসায় ব্লটিং পেপার হয়ে গিয়েছিল জিব। ভয় আর অজানা এক হাহাকার ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার শূন্য বুকের খাঁচায়। চোখে জল ছিল তখনও। হাত-পা কাঠ হয়ে ছিল।

বারবার স্বপ্নটার কথা ভাবছে। ভাবছে স্বপ্নটার মধ্যে ভয়ের বীজ কীভাবে ছড়ানো ছিল? কোন সর্বনাশের সংকেত ছিল তার মধ্যে? কোন কূট আভাস?

এখনও ভাবছে সে। যদিও একটা স্বপ্নের জন্য এত বিচলিত হওয়ার কোনও মানেই হয় না। স্বপ্নের মধ্যে সত্য থাকে না কখনও। আবার কোনও জটিল প্রক্রিয়ায় হয়তো থাকেও। স্বপ্নটা নিয়ে অনিচ্ছের সঙ্গেও সে হয়তো আরও কয়েকদিন ভাববে।

যে লোকটা খাবারের বাক্স দিচ্ছিল সে অমলের ডান ও বাঁপাশের দুজনকে দুটো বাক্স দিয়ে অমলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছিল। অমলের রাগ হল। তাকে কি দেখতে পায়নি নাকি লোকটা! আশ্চর্য তো!

সাধারণত সে যা করে না আজ তাই করে ফেলল অমল। হয়তো হঠাৎ নিজের খিদেটাকে আবিষ্কার করেই সে ধৈর্য হারিয়ে হঠাৎ এগিয়ে যাওয়া লোকটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এই যে, এখানে দেননি কিন্তু।

লোকটা একটু বিস্মিত চোখে ফিরে তাকাল তার দিকে। লোকটার মাথায় টাক এবং বেশ ভারী গোঁফ। হঠাৎ একটু হেসে লজ্জিতভাবে বলল, সরি, আপনাকে দেওয়া হয়নি। বলে একটা বাক্স এগিয়ে দিল তার হাতে।

লোকটাকে ক্ষমা করে দিয়ে অমল ফোল্ডিং টেবিলটা নামিয়ে তার ওপর রেখে বাক্সটা খুলল। চমৎকার ব্যবস্থা। বড় একটা পরোটা রোল, দুটো চিকেন স্যান্ডউইচ, ডিমসেদ্ধ, এক টুকরো চিজ, দুটো সন্দেশ, একটা কলা। অমল খেতে খেতে হঠাৎ একটু অস্বস্তিবোধ করছিল কেন যেন। তার মনে হল দুপাশের দুজন যাত্রী তাকে মাঝে মাঝে কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে। আইলের ওপাশের সিট থেকেও যেন দুজন একটু ঝুঁকে চকিতে দেখে নিল তাকে। হঠাৎ তাকে ঘিরে একটু নিস্তব্ধতাও ঘনিয়ে উঠল যেন।

হঠাৎ ডানপাশের লোকটা খুব বন্ধুর মতো তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার এজেন্সিটার নাম কী?

অমল বিরক্ত হল। গায়ে-পড়া তোক তার পছন্দ নয়। বলল, আমার এজেন্সি নেই।

ও! লোকটা আর কিছু বলল না।

হঠাৎ যেন বোধবুদ্ধির একটা ঝিলিক জেগে উঠল মাথার মধ্যে। কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল, যখন সে লক্ষ করল, কামরার সবাই ব্রেকফাস্টের বাক্স পায়নি। তার সামনের সিটের অন্তত দুজন, আড়াআড়ি সামনের ডানদিকের সারির তিনজন এবং লক্ষ করলেই, আরও অনেকেই খাচ্ছে না। জলের বোতলটা খুলে দু ঢোঁক জল খেয়ে অমল তার ডানদিকের লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, সামথিং ইজ রং, ইজনট ইট! আপনারা কারা?

লোকটা খেতে খেতে মুখ তুলে একটু হেসে বলে, আমরা একটা ইলেকট্রনিক গুডস কোম্পানির সাব এজেন্ট। ইয়ারলি কনফারেন্সে শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি।

ইস ছিঃ ছিঃ, আমার বড্ড ভুল হয়ে গেছে—

লোকটা হাসিমুখেই বলল, তাতে কী? ইউ আর ওয়েলকাম—

বিস্তারিত ক্ষমাপ্রার্থনা বা ক্ষতিপূরণের সময় ছিল না। বর্ধমান এসে গেছে। অমল অ্যাটাচি কেসটা তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে আইল পেরিয়ে স্প্রিং-এর দরজাটা ঠেলে বেরিয়ে আসার সময়ে পিছনে, কামরার ভিতর থেকে একটা বড়সড় হাসির রোল শুনতে পেল।

তার কান গরম, লজ্জায় ঝাঁঝা করছে মাথা। একদল ডেলিগেট কনফারেন্সে যাচ্ছে, তাদের জন্য কোম্পানি রাজকীয় ব্রেকফাস্ট আয়োজন করেছে এই সহজ ব্যাপারটা অমল রায়ের মতো বুদ্ধিমান, দুনিয়া-চষা একজন

লোক বুঝতে পারল না!

ঘটনাটা হয়তো সামান্যই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "গিন্নী" গল্পের সেই ছোট ছেলেটির মতো তার আজ মনে হচ্ছিল, এ ঘটনাটা ওরা কেউ হয়তো কোনওদিনই ভুলতে পারবে না।

লজ্জা, নিজের ওপর বিরক্তি আর রাগ নিয়ে অমল স্টেশনের ফটক পেরিয়ে এল, নিজেকে চোর, লোভী, বেকুব ও অপদার্থ ভাবতে ভাবতে আনমনা অমল তার অ্যাটাচি কেসটার একটা গুঁতো লাগাল একজনকে হাঁটুতে। লোকটা বাপ-রে বলে চেঁচিয়ে উঠতেই অমলের ইচ্ছে হল দৌড়ে পালায়। আজ তার এসব কী হচ্ছে?

সামনে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মডার্ন আর্ট। অবিশ্বাস্য রিকশার জড়াজড়ি, সাইকেল, গাড়ি, মানুষ, হর্ন, চিৎকার, ধুলো। এই জটিলতার দিকে হতাশভাবে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমল। সুশৃঙ্খল লন্ডন শহর থেকে সদ্য ফিরে এসে এই ভিড়ে ভিড়াক্কার, রিকশা-গাড়ি-মানুষের বিশৃঙ্খলা বড় ক্লান্তিকর মনে হয়। এই জটাজাল পার হয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে ভিড়ের বাসে ঠেলে ওঠা গন্ধমাদন বহন করার মতোই কঠিন ব্যাপার। অমলের হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে। মনে হয় সে কখনওই কোথাও গিয়ে পৌঁছতে পারবে না।

পৌঁছনোর কোনও তাড়াও নেই তার। ভিড় একটু হালকা হওয়ার জন্য থাম ঘেঁষে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের গন্তব্য বিষয়ে সে যেন নিশ্চিত নয়। বউ, ছেলে, মেয়ের প্রতি সাধারণ গৃহস্থের যেমন টান থাকে কেন তার সেরকম নেই তা সে ভেবেও পায় না।

এর মূলে কি পারুল? ওই নামটা তার মনের মধ্যে উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাড্রেনালিন প্রবাহ বেড়ে যায়। এখনও। বাড়ে অস্থিরতা। আর আচমকা অন্ধ রাগ তাকে ছোবল মারতে থাকে। পারুলকে তার খুন করতে ইচ্ছে করে, আর কাঁদতে ইচ্ছে করে পারুলের জন্যই।

মোনালিসা বিয়ের সাত দিনের মধ্যেই জেনে গিয়েছিল সব কিছু।

নতুন বউয়ের প্রতি আদিখ্যেতার অভাবই মোনালিসাকে হয়তো একটু সন্দিহান করে থাকবে। তারপর উড়ো কথা, ফিসফাস, রটনা এসব থেকেও কিছু আঁচ করে নিয়েছিল। গোয়ায় মধুচন্দ্রিমা যখন নিতান্ত ম্যাড়ম্যাড়ে, রসকষহীন একটা সাইট সিয়িং-এ পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছিল তখনই কথাটা তুলেছিল মোনালিসা।

পারুল কে?

পারুল! পারুল একটা বন্ধ দরজা।

দরজা বন্ধ হলেও ওপাশে কেউ তো থাকতেও পারে।

সে আছে। পারুলের কথা নিয়ে আমাদের ভাববার দরকার নেই।

তুমি রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তিনী গল্পটা পড়েছ?

না। কিন্তু প্লিজ, গল্পটা আমাকে আবার শোনাতে বসো না।

যে মানুষটা অ্যাবসেন্ট তার প্রেজেন্স অনেক সময়ে খুব স্ট্রং হয়ে ওঠে।

এসব তো ফিলজফি।

তাই কি? ফিলজফিও কিন্তু ফ্যালনা নয়।

লিভ পারুল অ্যালোন, প্লিজ মোনা।

তোমার আর আমার মধ্যে পারুল যে বড্ড বেশি ঢুকে বসে আছে।

উত্তেজিত অমল বলেছিল, না, নেই! নেই!

অত জোর দিয়ে বলছ বলেই সন্দেহ হচ্ছে।

পারুলের কথা মনে হলেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। ও আমাকে ভীষণ অপমান করেছিল।

আমি পারুলের বিষয়ে আরও একটু জানতে চাই। বলবে?

পারুল একটা নষ্ট মেয়ে।

নষ্ট? কীরকম নষ্ট?

শি ওয়াজ নট ফেইথফুল।

তোমার বোন ছায়া বলছিল, পারুল দেখতে খুব সুন্দর আর খুব ভাল মেয়ে। আমাকে ঠেস দেওয়ার জন্যই বলছিল। কথাটা কি মিথ্যে?

অ্যাপারেন্টলি লোকে ওকে ভালই বলবে।

তুমি বলছ না?

না। পারুল ভাল নয়।

তোমাকে রিফিউজ করেছে বলে?

কেন যে এসব কথা খুঁচিয়ে তুলছ মোনা! অকারণ অশান্তি করে লাভ কী তোমার?

স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে এসব গোপন থাকলে পরে আমাদের অসুবিধে হবে। বরং ফ্র্যাঙ্ক হওয়া ভাল। তাতে আমরা আমাদের প্রবলেমগুলো সর্ট আউট করতে পারব।

তোমাকে নিয়ে আমার কোনও প্রবলেম নেই। আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি এখন একজন সুখী মানুষ।

সে তো খুব ভাল কথা। ভালবাসাটা কীরকম জানো? মুখের কথা নয় কিন্তু। কেউ ভালবাসলে সেটা ফিল করা যায়। আমি সেটা ফিল করছি না।

ফিল করছ না, তার কারণ পারুলকে নিয়ে তোমার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সন্দেহ এক মারাত্মক ব্যাধি।

আমি তা জানি। আমার এক কাকিমা স্বামীকে সন্দেহ করত। শেষ অবধি স্বামীর এমন সব অসম্ভব যৌন সম্পর্কের কথা বলত যে আমরা কানে আঙুল দিয়ে পালাতাম। মিথ্যে সন্দেহটাই হল ব্যাধি। আমি তো তোমাকে সন্দেহ করছি না। কাউকে ভালবাসা তো অপরাধ নয়। সন্দেহের কী আছে বল!

এতই ফর্সা ছিল মোনা যে ওর গায়ের তিলগুলো পর্যন্ত তেমন কালো হয়ে উঠতে পারেনি ফর্সা রঙের ঠেলায়। সেগুলো ছিল লালচে বা বাদামি। মুখের একটা খর সৌন্দর্য ছিল। নাকটা পুরুষালি রকমের তীক্ষ্ণ। কিন্তু ওর রূপ চেয়ে দেখার মতো মুগ্ধতা কখনওই অমলকে পেয়ে বসেনি। অসহায় এক দেহভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল মোনার প্রতি তার মনোভাব।

পারুলের কথা তুমি না তুললেই আমি স্বস্তি বোধ করব।

সেটা হবে অভিনয়। পারুলের কথা জেনেও তার কথা কখনও তুলব না সে কি হয়?

অতীত নিয়ে পড়ে থাকলে লাভ কী?

অতীত যে কখনও কখনও বর্তমানকে বিষিয়ে দেয়।

তাহলে কী জানতে চাও বলো!

সব জানতে চাই। বলবে?

কোন একটা উপন্যাসে যেন পড়েছিলাম, একটি মেয়ে তার প্রেমিক সম্পর্কে বলছে, আমরা এক বৃন্তের দুটি ফুল, আমাদের ছিড়িলেন কেন?

এতটা?

হয়তো এতটাই। ছেলেবেলা থেকে চেনাজানা, যাতায়াত। সেই থেকে একটা বোঝাপড়া। পারুলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে এটা সকলেই জানত। অন্যরকম যে হতে পারে এটা ভাবাই যেত না।

তাহলে অন্যরকম হল কেন? কী নিয়ে তোমাদের বনল না?

আমি জানি না।

অন্য কোনও পুরুষ?

আমি জানি না। শুধু জানি হঠাৎ একদিন পারুল আমাকে ঘেন্না করতে শুরু করে।

তাই কি পারা যায়?

হল তো! আমার কিছু করার ছিল না।

তুমি কোনও দোষ করনি?

না। কোনও দোষ করিনি। তুমি বড্ড উকিলের মতো জেরা করছ। জেনে রাখো, এসব ঘটনা আমাকে আর স্পর্শ করে না।

শুনেছি পারুল তার মা-বাবার পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করেছে।

হ্যাঁ।

ওর বাবা-মা জোর করে বিয়ে দেয়নি তো!

না। ওঁরা ওরকম লোক নন।

ব্যাপারটা অদ্ভুত। তোমাকে হঠাৎ ঘেন্না করার কী হল?

অহংকারীদের অনেক প্রবলেম মোনা।

পারুল কি অহংকারী?

ভীষণ। শি ইজ অলসো এ পিউরিটান।

পিউরিটান! তার মানে কী?

আমাকে কখনও ওর হাতটাও ধরতে দিতে চাইত না।

মাই গড! তাহলে কি তুমি কখনও ওর পিউরিটি নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলে?

এ কথায় আতঙ্কিত হয়ে অমল প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিল, না, না। আমি কিছু করিনি।

কথার চক্করে ফেলে সেদিনই মোনা তার মুখ থেকে সত্যটা প্রায় বের করে ফেলেছিল। আর সেইদিন থেকেই এই চালাক, গোয়েন্দার মতো তদন্তে ওস্তাদ, প্রোবিং, ন্যাগিং মেয়েটিকে সে ভয় পেতে শুরু করে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘেন্নাও।

যেই ঘেন্না শুরু হল অমনি অমলের নজরে পড়তে লাগল অদ্ভুত সব ব্যাপার। মনে হত, ওর গালে কি মেচেতা আছে? মাথার চুল তেমন ঘেঁষ নয় তো, টাক পড়ে যাবে কি? নীচের ঠোঁটটা একটু ঝুলে-পড়া না? ইস্, দাঁতের সেটিং কী বিচ্ছিরি! বেশ মোটা কিন্তু। লোকে কি ওর মুখখানা একটু চোয়াড়ে দেখে না? হাতে বেশ লোম আছে তো! আর ও কি একটু গোঁফের রেখা?

অথচ অমল জানে নিরপেক্ষ বিচারে তা নয়। মোনা বেশ সুন্দরী। খুবই সুন্দরী। ওর এত বেশি চোখধাঁধানো রূপটাও যেন একটা অপরাধ বলে মনে হত তার।

জার্মানিতে বা ইংল্যান্ডে বা আমেরিকায় তাদের বিবাহিত জীবন যখন পুরনো হচ্ছে তখন তাদের ঝগড়াও হতে লাগল খুব। মোনা মাঝে মাঝেই বলত, তোমাকে বিয়ে না করে পারুল ঠিক কাজই করেছে। পারুলই ঠিক চিনেছিল তোমাকে।

পারুলের নাম মুখে আনার যোগ্যতাও তোমার নেই।

সে যোগ্যতা তোমারও নেই।

এইভাবেই তাদের সম্পর্ক থেকে মুছে-যাওয়া পারুল আবার স্পষ্ট হয়ে উঠত, জেগে উঠত। নবীকরণ হত পারুলের, পারুল তাই পুরনো হতে পারল না, বিস্মৃত হতে পারল না কখনও।

শেষ অবধি ধরা পড়ে গিয়েছিল অমল। একদিন নেশার ঘোরে সে ঘটনাটা প্রকাশ করে দেয়। বউয়ের সামনে, মেয়ের সামনে।

পরদিন মোনা তাকে বলেছিল, আমার এরকম সন্দেহ ছিলই। ছিঃ ছিঃ!

তোম্বা মুখ করে অমল বসে রইল কিছুক্ষণ। তার পর মুখ তুলে বলেছিল, সো হোয়াট! উইল ইউ ডেজার্ট মি?

আমি তোমাকে ছেড়ে গেলেও তো শূন্য স্থান ভরাতে পারুল ফিরে আসবে না।

আমি তোমাকে ঘেন্না করছি মোনা।

তার চেয়ে ভাল হত তুমি যদি নিজেকে ঘেন্না করতে কাপুরুষ।

আশ্চর্যের বিষয় হল, মেয়েদের সহজ সংস্কারবশে মোনার রাগ হওয়ার কথা পারুলের ওপর। কিন্তু অবাক কাণ্ড, সে কখনও পারুলের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি কখনও। বরং পারুলের ছবিখানা আলাদা করে সযত্নে অ্যালবামের একটা আলাদা পৃষ্ঠায় সেঁটেছিল সেই। সে জানত, মাঝে মাঝে অমল ছবিটা খুলে দেখে। ধরা পড়লে সংকোচ বোধ করত অমল। কিন্তু মোনা বলত, দেখ, দেখ, ওই ছবি দেখে তোমার বিবেক জাগ্রত হোক।

ভিড় কমেছে। অমল ক্লান্ত পায়ে স্টেশনচত্বর পার হল। এখন তার কানে এত কোলাহল কিছুই ঢুকছে না। বড্ড আনমনা সে আজ। দিনটা বিচ্ছিরিভাবে শুরু হল। দিনশেষে কী ঘটবে আরও, বলা যায় না। শরীরের ভার টেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। অফুরান মনে হচ্ছে পথ। পথের শেষে কেউ নেই তার। কেউ নেই।

দশ

ওইখানে ওই কদমগাছের তলায় শিব এসে দাঁড়ান। বেশ পেল্লায় চেহারা, একটু ভুঁড়ি আছে, বেশ বড় জটা, গোঁফ আছে, দাড়ি নেই। কাঁধ আর মাথার ওপর তিনটে সাপ ফোঁস ফোঁস করছে ফণা তুলে। বাঁ হাতে কমণ্ডলু, ডান হাতে ত্রিশূল, পরনে শুধু বাঘছাল। পিছনে ষাঁড়। শিবঠাকুর তাকে ডেকে বলেন, বৎস, তুমি তিনটে বর চাও।

মরণের এইখানেই মুশকিলটা হয়। তার এত কিছু চাওয়ার আছে যে তিনটে বরে তার সিকিভাগও হয় না। কিন্তু ঠাকুর-দেবতাদের নিয়মই হল, তিনটের বেশি বর দেন না, তাই মরণ খুব হিসেবনিকেশ করে রোজ। এমন তিনটে বর চাইতে হবে যে, আর কিছু চাওয়ার না থাকে। খুব কায়দা করে, বুদ্ধি খাটিয়ে তিনটে বর তৈরি রাখতে হবে। শিবঠাকুর একটু ভেলেভালা আদমি। কৌশল করে যদি একটা বরের মধ্যেই তিন-চারটে বর ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলেও হয়তো খেয়াল করবে না। এই নিয়ে তার গ্যাঁড়ার সঙ্গে কথাও হয়েছে। গ্যাঁড়ার অবশ্য বর নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা নেই। সে শুধু চায় অমিতাভ বচ্চনের মতো লম্বা হবে, কুংফু ক্যারাটের ওস্তাদ হবে আর বড় হয়ে আমেরিকায় যাবে। ব্যস, ওতেই তার তিনটে বর ফুস।

কিন্তু মরণের সমস্যা অত সরল নয়, প্রথমে সে ভেবেছিল, শিবঠাকুরের কাছে রসিক বাঙালের বদলে একজন ভাল বাবা চেয়ে নেবে। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছে, তার মা রসিক বাঙাল বাবাকে এতই ভালবাসে যে, বাবা বদলালে মা কেঁদেই মরে যাবে। তার চেয়ে বরং রসিক বাঙালই তার বাবা থাক, শুধু মেজাজটা অমন তিরিক্ষি না হয়ে যেন একটু নরম-সরম হয়, আর তাকে যেন ন্যাংটো করে চান না করায়, আর যেন ন্যাড়া করে না দেয়। দুনম্বর হল, কলকাতার বড়মা আর দাদা-দিদিরা যেন বেশ ভাল লোক হয় আর তারা যেন তাকে খুব ভালবাসে। মরণের মাঝে মাঝে মনে হয়, বোনটা হওয়ার পর থেকে তার মা যেন তাকে আর ততটা ডাক-খোঁজ করে না। তার ধারণা, এক মায়ের জায়গায় দুটো মা হলে আদর-টাদর ডবল হয়ে যাবে। সুতরাং তার দু নম্বর বর হল, বড়মা আর দাদা-দিদিরা যেন এখানে এসেই থাকে। তিন নম্বর বরটা নিয়ে সে খুব ভাবছে। ভেবে কোনও কূলকিনারা করে উঠতে পারছে না।

সকাল থেকে জিজিবুড়ি বারবার টানা মারছে। মুখ শুকনো। চোখ কপালে উঠেছে, সাতসকালে এসে ধপাস করে বারান্দায় বসে পড়ে খানিক হাঁফ ছেড়ে বলল, ওরে ও বাসি, কাল রাত থেকে বাড়িতে যে সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই হচ্ছে। তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না যে।

মরণের মা দোতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে বলল, আহা, ভারী নতুন বৃত্তান্ত কিনা। ও তো নিত্যি হচ্ছে।

জিজিবুড়ি কাহিল গলায় বলে, এ তা নয় মা, এবার একটা খুনোখুনি না হয়ে যায়। সারা রাত কুরুক্ষেত্তর হল, সকালেও হচ্ছে। পাড়াসুদ্ধু সবাই ঝেটিয়ে এসে মজা দেখছে। এই রঙ্গে লোক।

ছেলেদের যেমন শিক্ষা দিয়েছ তেমনই তো হবে। আমার ধান চাল কম হরির লুট করেছে? ধার বলে টাকা নিয়ে যায়, একটা পয়সা আজ অবধি শোধ করেনি, মায়ের পেটের ভাই বলতে লজ্জা করে।

ওঃ, খুব যে ফোঁটা কেটে বমি হয়েছিস আজ। তুইও তো একই ঝাড়ের বাঁশ। বাঙালের টাকায় দুদিন ধরে না হয় ফুটুনি করছিস, তা বলে নিজের জনদের দিকে চাইবি না? এই কি ধর্মের বিচার?

আমাকে আর ধর্ম দেখিও না মা, তোমার গুণধর ছেলেরা আমার সর্বনাশ করে পথে বসাতে চেয়েছিল, তখন তোমার ধর্ম কি পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছিল নাকি? এখন যেই অশান্তি লেগেছে অমনি নাকি-কান্না কাঁদতে এসেছ! ধর্ম এখনও আছে বলেই দু ভাইয়ে খুনোখুনি হচ্ছে। আরও হোক, সত্যনারায়ণের সিন্নি দেব।

বলতে পারলি ও কথা? অভাবের সংসার বলে ঝগড়া হয়, তা কোথায় না হচ্ছে শুনি? তা বলে নিজের ভাইদের শাপশাপান্ত করবি? এতে কি তোরই ভাল হবে ভেবেছিস?

খবরদার মা, শাপশাপান্ত করবে না বলে দিচ্ছি! সেবারও খুঁড়েছিলে বলে ছেলেটার একশো চার-পাঁচ জ্বর উঠেছিল, তোমার মুখে বিষ আছে, শাপশাপান্ত করলে এ-বাড়িতে ঢোকার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

জিজিবুড়ির গুণ হল টক করে ভোল পালটাতে পারে। হঠাৎ ভারী নরম হয়ে বলল, ওমা! খুঁড়লুম কোথায়? বলছিলুম যে, মেয়েদের বাপের বাড়ির ওপর কত টান থাকে, তুই যে কেন ওদের ওরকম বিষনজরে দেখিস!

জিজিবুড়ি কিছুক্ষণ বারান্দার থামে মাথা হেলিয়ে বসে রইল। তারপর বলল, তোকে তো ও-বাড়িতে যেতে বলিনি। বলছিলুম, দু ভাইয়ের একটা ব্যবস্থা করে দে। বাঙালকে বল না তার দোকানে কর্মচারী করে নিক।

আর বাঁধানো কথা বোলো না তো মা। তোমার ছেলেরা সেই চরিত্রের মানুষ কিনা! দোকানের টাকা ভেঙে জুয়ো খেলবে, মদ-গাঁজা খাবে, গুণের তো শেষ নেই।

জিজিবুড়ির সঙ্গে সবসময়ে পানের বাটা থাকবেই। এসব কথার পর পান সাজতে সাজতে বলল, বাঙালের ঘর করে করে তোরও মায়া-দয়া সব উবে গেছে। বাঙাল এলে এবার না হয় আমিই তাকে বলব, দু-দুটো হুমদো হুমদো সম্বন্ধী বেকার বসে আছে বাপু, দোষঘাট থাকতে পারে, কুটুম তো, তাদের কথাও একটু ভেব বাপু। না হয় বাসরাস্তায় দুখানা মুদির দোকান করে বসিয়ে দাও।

আহা, একেবারে গিল্টি করা কথা। দোকান করে বসিয়ে দাও। তোমার ভীমরতি হলেও তার তো হয়নি। সম্বন্ধীদের সে খুব চেনে। তুমিই চিনলে না কী ছেলে পেটে ধরেছ!

ভীমরতি কি তোকেও ধরতে বাকি রেখেছে? ক বিঘে জমি আর একটা পাকা বাড়ি পেয়ে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে আছিস। বাঙালের যে লাখো লাখো টাকা কারবারে খাটছে তার কাছে এ তো চুষিকাঠি। দেবে ভেবেছিস তোকে সে টাকার ন্যায্য ভাগ? সব ওই বড়বউয়ের গর্ভে যাচ্ছে। বাঙাল চোখ বুজলে উকিল লাগিয়ে আইনের প্যাঁচে তোর সম্পত্তিও এক ঝটকায় নিয়ে নেবে। তাই বলছি, এখনও সময় আছে, সব বুঝে-সুঝে নে। দুটো দোকান না হয় তোর নামেই করে দেবে, ভাইরা খেটেখুটে দোকান চালিয়ে তোর ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা মাসকাবারে মিটিয়ে দেবে।

সাধে কি বলে যে, তোমার মুখে বিষ! এর মধ্যে আমার স্বামীর মরণের ভাবনাও ভেবে ফেলেছ! তোমার আর কবে আক্কেল হবে মা? জামাইয়ের বাড়বাড়ন্ত দেখে তোমার চোখ টাটায় কেন? মেয়ে সুখে আছে সেও তোমার সহ্য হয় না। তুমি কেমনধারা মানুষ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজিবুড়ি উঠে পড়ল। বলল, জামাইয়ের বাড়বাড়ন্ত দেখেই তো বলছি, বেশি বাড়ও তো ভাল নয়। তোর ভাল ভেবেই বলছি, টাকাপয়সা নগদ যা পারিস বেঁকে নে। বাসরাস্তায় দুখানা দোকানঘর বন্দোবস্তে আছে শুনেছি। দশ বিশ হাজারে হয়ে যাবে।

তুমি এখন যাও তো, আমার মাথাটা আর খারাপ করে দিও না।

জিজিবুড়ি গেল, পড়া ফেলে দিব্যি জানালা দিয়ে দৃশ্যটা দেখে খুব হাসছিল মরণ। আজ মায়ের হাতের রান্না খুলবে। রেগে গেলে মা দারুণ রাঁধে।

জিজিবুড়ি আর দুবার এল, শেষবার দশটা নাগাদ। এসে বলল, ও বাসি, কাল রাত থেকে দানাপানি জোটেনি মা, ছোটবউ খানকির মেয়ে ওই নয়নটা এমন ধাক্কা দিয়েছে যে কাঁকলে বড্ড ব্যথা, আজ তোর এখানে দুটো ভাতে ভাত করে দিবি? এক ফোঁটা ঘি দিয়ে—

আজ সুবিধে হবে না মা, আজ তোমার জামাই আসছে।

মোলো যা, আজ আবার বাঙাল আসছে কেন?

তাতে কি তোমার গতরে শুঁয়োপোকা ধবল? তার বাড়িতে সে আসবে, তাতে কথা কীসের?

তাই কি বললুম, বলছি, আজ তো আর শনিবার নয়, কাজকারবার ফেলে আসছে তো!

তার বিশ্বাসী কর্মচারী আছে, তোমার অত মাথাব্যথা কীসের?

ঘরে যে যেতে পারছি না মা, ধুন্ধুমার কাণ্ড দেখে এসেছি একটু আগে। শোনা যাচ্ছে থানা-পুলিশেও খবর গেছে। তারা এল বলে! কী যে হবে কে জানে বাবা।

কী আবার হবে, নতুন বৃত্তান্ত তো নয়। থানা-পুলিশ তো আগেও হয়েছে। চাটুজ্যেদের গোক নিয়ে হাটে বেচে দিয়ে তোমার বড় ছেলে হাজতে গিয়েছিল মনে আছে?

মনে আছে বাবা, সব মনে আছে। কপালের দোষ মা, ও কি খণ্ডায়?

দুধ চিঁড়ে দিয়ে ফলার করতে পার। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মুখটা বিকৃত করে জিজিবুড়ি বলে, ম্যাগো, পেটে এখন ভাতের খিদে, দুধ চিঁড়ে কি গলা দিয়ে নামে বাছা!

ঠিক আছে। মরণের ঘরে গিয়ে বসে থাক, ভাতের কথা বলেছ, গেরস্থের ঘর বলে কথা, খেও খন দুপুর বেলায়।

তবে দুটো পোস্তর বড়া করিস আর একটু টক, টক ছাড়া মুখে রোচে না।

মরণের আজ দুঃখের কপাল, বাবা আসছে, বাবা আসা মানেই যমদূতের আগমন, আজ সকাল থেকেই মা পড়তে বসিয়ে দিয়েছে। পড়ছে তো লবডঙ্কা, কিন্তু পড়ার টেবিলে বই-খাতা মুখে করে এই বসে থাকাও এক যম-যন্ত্রণা। বাইরে খোলা মাঠঘাট আয়-আয় করে ডাকছে। স্কুলটা খোলা থাকলেও হয় হত। কিন্তু কপাল খারাপ, স্কুলের এক প্রাক্তন হেডমাস্টার মারা যাওয়ায় স্কুলও আজ ছুটি।

হ্যাঁ লা বাসি, তোর ঘরে কি পান আছে?

মা দোতলা থেকেই বলল, না মা, আমরা কেউ পান খাই নাকি যে থাকবে?

তবে যে মুশকিল হল। আমার পান ফুরিয়েছে, পান ছাড়া আমার এক দণ্ড চলে না। ও ভাই মরণ, দিবি এনে একটু পান?

মরণ আনন্দে লাফিয়ে উঠল, এক লাফে উঠোনে নেমে বলল, পয়সা দাও এনে দিচ্ছি।

ওপর থেকে মা ধমক দিয়ে বলে, ওকে বলছ কেন মা? ওর বাবা টের পেলে রাগ করবে। ওই মুনিশ-টুনিশ কেউ এলে এনে দেবে খন।

মরণ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে করুণ গলায় বলে, আমার পড়া হয়ে গেছে মা, এক ছুটে যাব আর আসব।

তোর বাবা এসে যদি দেখে —

বাঃ, তা বলে সারা দিন পড়ব নাকি? সকাল থেকে তো পড়ছি।

ওঃ, কী রকম পড়া তা খুব জানা আছে। বই খুলে বসে থাকলেই বুঝি পড়া হয়?

যাই না মা।

বাসন্তী আর আপত্তি করল না, বলল, যাবে যাও, দয়া করে তাড়াতাড়ি ফিরো।

পয়সা নিয়ে মরণ দুই লাফে বেরিয়ে পড়ল। ছুটি! ছুটি!

অবারিত মাঠ-ঘাট, আলো-হাওয়ায় এসে বুকটা হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে তার। ছুট! ছুট! হালকা পায়ে খানিকক্ষণ দৌড়ে নেয়, কদমতলায় দুর্গাপূজার প্যান্ডেল হচ্ছে। দাঁড়িয়ে একটু দেখে নেয় সে। দক্ষিণপাড়ায় ফুটবল ম্যাচ। তাও একটু দেখে, তারপর হাটতে থাকে। পান্নাদির বাড়ি থেকে ঘুঙুরের আওয়াজ আসছে। ঘোষ জ্যাঠাইমার বাড়ি থেকে গুড় আর নারকেল পাক দেওয়ার মিঠে গন্ধ। আর রায়বাড়ির বারান্দায় আজও সেই মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে, যাকে দেখলে ঠিক মনে হয় এক রাজপুত্তুর এসে ওকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে বলে অপেক্ষা করে আছে। চাটুজ্যে বাড়ি থেকে খুব হাসিখুশির একটা শব্দ আসছে। খোলা উঠোনে কানামাছি খেলছে একদঙ্গল হুমদো হুমদো মেয়ে-পুরুষ, মাঝখানে ওটা পারুলমাসি না? হ্যাঁ, পারুলমাসিই। রুমালে চোখ বাঁধা পারুলমাসি হাসতে হাসতে টলোমলো পায়ে দু হাত সামনে বাড়িয়ে কাউকে ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে এরকম জমায়েত হয়, আবার সব সুনসান হয়ে যায়। দাদু আর দিদা একা পড়ে থাকত, দাদু ওই একতলার বড় দালানের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকত সকালের দিকটায়, তাকে দেখলেই ডাক দিত, এই বাঙাল আয় তো দেখি তোর লেজ আছে কিনা। গৌরহরি দাদু বাবাকে বড় ভালবাসত। বলত, বাঙালটার রসকষ কম বটে, কিন্তু লোকটা জব্বর খাঁটি, আর এখন দিদা একদম একা, মরণ মাঝে মাঝে হাজির হয়ে যায় এসে। দিদার নারকেল বা সুপুরি পেড়ে দেয়, গোয়ালঘরের চাল থেকে চালকুমড়ো। দিদা প্রায়ই রাগ করে বলে, তুই তো বড়লোকের ছেলে, তবে কেন চেহারাটা অমন চাষাভুসোর মতো করে রেখেছিস? ভাল জামাকাপড় নেই তোর? দাঁড়া তোর বাবা আসুক, বলব।

কানামাছি খেলায় কাউকে ছুঁতে পারল না পারুলমাসি। একটা টু দিয়ে পালাচ্ছিল বিজুদা, ছুঁতে গিয়ে দক্ষিণের দালানের বারান্দায় উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে হেসে উঠল। কাকে কী ডাকবে তার বেলায় সম্পর্কে ঠিক রাখতে পারে না মরণ। গৌরহরিদাদুর ছোট ভাই রামহরিকে সে ডাকে জ্যাঠামশাই। আবার পারুলমাসির খুড়তুতো বোন পান্নাদিকে তো দিদিই ডাকে সে। মা অবশ্য বলেছে, ওদের সঙ্গে তো আর আত্মীয়তা নেই, যা খুশি ডাকতে পারিস।

বাসরাস্তার কাছে এসে খানিক দাঁড়িয়ে লোজন দেখল মরণ, বেশ লাগে তার। বেঁটে, লম্বা, সরু, মোটা, কালো, ফর্সা কত রকমের যে লোক আছে দুনিয়ায়। কোথা থেকে যে আসে আর কোথায় যায়।

গাঁ গাঁ করে বর্ধমানের একটা বাস এসে ধুলো উড়িয়ে থামল। লোক নামছে। বাবা নামে কিনা তা সতর্ক চোখে দেখছিল মরণ। না, বাবা নামল না। তবে সবার শেষে যে নামল তাকে সে খুব চেনে। তার স্কুল থেকেই

অমলদা মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করেছিল। সারা গ্রামে নাকি হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল সেই ঘটনায়। স্ট্যান্ড করা ছেলে দেখলে কি বোঝা যায়? মরণ তো কিছু বুঝতে পারে না। লোকটা কেমন টালুমালু চোখে চারদিকে চাইল, যেন জায়গাটা চিনতে পারছে না। ডান হাতের ভারী অ্যাটাচি কেসটা টানতে লোকটার যেন কষ্ট হচ্ছে। মাথায় বড় বড় চুল, এলমেলো হয়ে কপালে ঝুলে আছে। মুখটায় রাজ্যের দুশ্চিন্তা যেন। মরণের একবার ইচ্ছে হল, গিয়ে বলে, দিন আপনার অ্যাটাচি' কেসটা পৌঁছে দিয়ে আসি। কিন্তু কেমন যেন সাহস হল না।

দীনু সিংহের এস টি ডি বুথের পাশে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ লোকের টেলিফোন করা দেখল সে, মাঝে মাঝে তার খুব ইচ্ছে হয় এখান থেকে বড়মার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। বড়মা তাকে চিনতেই পারবে না।

আর একটা বাস এসে ওই দাঁড়াল। লোক নামছে। আর হঠাৎ সে ভিড়ের মধ্যে এক মাথা উঁচু তার বাবা বাঙালকে দেখতে পেল।

পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগল মরণ, হঠাৎ খেয়াল হল, এই যা, পান কেনা হয়নি যে!

পান কিনতে বাজারের নাবালে নেমে গিয়ে সে একটু আড়াল হয়ে দেখতে গিয়ে দেখল, বাবা একা নয়, সঙ্গে একটা সুন্দরমতো ছেলে, আঠারো-উনিশ বছর বয়স হবে। হাতে স্যুটকেস। ছেলেটার মুখ খুব গম্ভীর।

পানটা কিনেই ফের ছুট লাগাল মরণ। বাড়িতে ঢুকেই অভ্যাসবশে চেঁচাল, ও মা, বাঙাল এসেছে, সঙ্গে বোধহয় দাদা!

দোতলার রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে বাসন্তী বলল, সঙ্গে কে বললি?

মনে হচ্ছে দাদা, বেশ লম্বাপানা, সুন্দর দেখতে।

ও মা গো! এখন কী হবে!

কী হবে মা?

কী জানি কী হবে বাবা! বড্ড ভয় করছে। শহুরে ছেলে। ঘরদোর তো গোছগাছও করা নেই, ও মরণ, তোর দিদিমাকে বল যেন এ সময়ে ঘর থেকে না বেরোয়।

আমি কি ফের পড়তে বসব মা?

আর পড়ার দরকার নেই বাবা, বরং ওপরে এসে ফর্সা জামা-প্যান্ট পরে যা, ফিটফাট না দেখলে কী মনে করবে।

একটু বাদে উঠোনের ওপর যে দৃশ্যটা দেখা গেল সেটা যেন যাত্রা- থিয়েটারের একটা সিন। মাকে কোনওদিন সাজতেগুজতে দেখে না মরণ। এমনকী যেদিন বাবা আসে সেদিনও না। কিন্তু মা আজ। পাটভাঙা একটা ঢাকাই শাড়ি পরেছে, চুল আঁচড়ানো, মাথায় ঘোমটা, কপালে টিপ, তাড়াহুড়োয় যতটা করা যায়। মায়ের পাশে ইস্তিরি করা নীল জামা আর খাকি হাফ প্যান্ট পরা মরণ। তারও চুল আঁচড়ানো, পায়ে আবার হাওয়াই চটি—যা সে কস্মিনকালেও পরে না। তিন পা পিছনে বোনটাকে কোলে নিয়ে মুক্তাদি দাঁড়িয়ে। সব কেমন অ্যাটেনশন হয়ে আছে। মায়ের মুখটা দেখে মায়া হচ্ছে মরণের, কেমন কান্না কান্না ভাব, অথচ ঠোঁটে আবার একটু হাসিও। মা ভীষণ ঘাবড়ে গেছে, বারবার ঢোঁক গিলছে।

ও মুক্তা, সব ঠিক আছে তো, উঠোনটা ভাল করে দেখেছিস? কোথাও গোবর-টোবর বা কুকুরের গু পড়ে নেই তো?

না বউদি, সব দেখেছি।

একটু আগে জিজিবুড়ি মরণের ঘর থেকে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে বলেছিল, আদিখ্যেতা দেখে মরে যাই, যেন বড়লাট আসছেন!

মা যেন উঁকিঝুঁকি না দেয়, বলেছিস?

হ্যাঁ, কিন্তু এঃ মা, তুমি যে দু পায়ে দু রঙের চটি পরে আছ।

বাসন্তী নিজের পায়ের দিকে চেয়ে জিব কেটে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এমা কী হবে?

মুক্তা বলল, দাও তো, কচুগাছের আড়ালে রেখে দিয়ে আসি।

খালি পায়ে থাকব, কেমন দেখাবে?

এর চেয়ে তো ভাল।

মরণ ফিক করে হেসে ফেলেছিল। বাসন্তী তার দিকে চেয়ে ধমকে বলল, ওরকম হাসতে নেই, দাদা উঠোনে এসে দাঁড়ালে গিয়ে পেন্নাম করিস, বাবাকেও, মনে থাকে যেন!

মরণ জানে, এসব তাকে একটু আগেই শিখিয়েছে মা।

হ্যাঁ রে ভুল দেখিসনি তো! আসতে দেরি হচ্ছে কেন?

বাবা তো মাঝে মাঝে কেনাকাটা করতে বাজারে ঢোকে।

যত দেরি হচ্ছে তত আমার বুক কাঁপছে বাবা। ও মুক্তা, মেয়েটা কাজলের টিপটা জেবড়ে ফেলেনি তো!

না বউদি, কাঁধে মাথা রেখেছে, ঘুমোবে মনে হয়।

একটু জাগিয়ে রাখ, ওর বাবা আবার এসে মেয়েকে জাগা না দেখলে খুশি হয় না। আর হাঁক দিয়ে মুনিশটাকে বল তো, এ সময়ে যেন হুট করে গোরু-ছাগল না ঢুকে পড়ে উঠোনে।

জানালা দিয়ে জিজিবুড়ির গলা পাওয়া গেল, গাঁয়ে তো গোরু-ছাগলই থাকে রে বাপু, আর সেসব দেখতেই তো বাবু ভায়েরা আসে।

ফের ফিক করে হেসে ফেলল মরণ, ইস্তিরি করা জামায় তার গরম লাগছে। এমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকারও অভ্যাস নেই তার। কেবল মনে হচ্ছে তারা একটা থিয়েটারের পার্ট করতে নেমেছে।

একটু চুপ করবে মা? মুখে আঁচল ঢুকিয়ে বসে থাকো তো, যখন তখন ফুট কেটো না, আমার বলে বুক কাঁপছে আর উনি কুট কুট করে কথা ফোটাচ্ছেন, ও নবীনা তোর হল?

দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে এসে নবীনা বলল, হ্যাঁ গো বউদি, ফুলদানিতে ফুল সাজিয়েছি, ছোট কার্পেটটাও পেতে দিয়েছি।

বেডকভারটা টানটান করে পেতেছিস তো!

হ্যাঁ গো, ধূপকাঠিও জ্বালিয়ে দিয়েছি।

বারান্দার কাপড় মেলার দড়িগুলো খুলে ফেল, বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।

মরণেরও একটু বুক কাঁপছে, তেষ্টা পাচ্ছে। সে জানে তাদের পরিবারটা আর পাঁচ জনের মতো নয়। কলকাতা আর পল্লীগ্রাম ভাগ হয়ে যাওয়া একটা ব্যাপার আছে তাদের। একবার ক্লাসে একটা ছেলের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল। ছেলেটা ঝগড়ার সময়ে বলে ফেলেছিল, যা যা, বেশি কথা বলিস না, তোর বাবার তো দুটো বউ।

বাড়িতে এসে সে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, দুটো বউ থাকা কি খারাপ মা?

মা বলেছিল, খারাপ কেন বাবা? যার সাধ্য আছে সে দুটো-তিনটে বিয়ে করতেই পারে। আগে তো আরও কত বিয়ে করত লোকে।

তবে যে ওরা বলে!

বলে বলুক। ওদিকে কান দিও না, বাবার ওপর যেন অশ্রদ্ধা না আসে। তোমার বাবা ভাল লোক।

সে তো জানি। কিন্তু লোকে বলে যে, আইন নেই নাকি!

আইন কি মানুষের জীবনের সঙ্গে সবসময়ে মেলে? দরকার পড়লে মানুষকে কত বে-আইনি কাজ করতে হয়। আমি না থাকলে তোমার বাবার এত বিষয়সম্পত্তি কে যক্ষীর মতো আগলাত বলো তো! লোকের কথায় কান দিও না, বড় হলে নিজেই বুঝতে পারবে সব কিছু।

বাবার দুই বিয়ের কথা আজকাল খুব ভাবে মরণ। মনে হয় তার বাবার দুটো ভাগ। একটা শহুরে লোক আর একটা পেঁয়ো লোক। ওই বড়মা, দাদা, দিদি ওরা একটু ওপরতলার লোক। সে তার মা, বোন এরা সব একটু নিচুতলার লোক। তাই তার বুক কাঁপছে, তেষ্টা পাচ্ছে।

উঁচু মাথার লোকটাকে শেফালি ঝোপের ওপর দিয়ে এক ঝলক দেখা গেল।

মরণ চাপা গলায় বলল, ওই আসছে!

সঙ্গে ছেলে আছে ঠিক দেখেছিলি তো!

সেরকমই তো মনে হল।

আগে জানলে একটু আয়োজন করে রাখতাম। কী খেতে ভালবাসে তাই তো ভাল করে জানি না।

মায়ের যে কত উদ্বেগ! ভয়ে ভাবনায় কাঁটা হয়ে আছে। মরণের একটু কষ্ট হয় মায়ের জন্য।

কই গো! আরে দ্যাখো কারে আনছি! বলতে বলতে রসিক বাঙাল আগর ঠেলে উঠোনে ঢুকল। হাতে একটা মস্ত ইলিশ মাছ। সামনেই তাদের এমন নাটুকে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকেও গেল। পিছনে লম্বাপানা, ফর্সা, ছিপছিপে সুন্দর ছেলেটা, মরণ জানে তার দাদা সুমন উচ্চ মাধ্যমিকে স্টার পেয়ে পাস করেছে। ডাক্তারি পড়বে বলে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষাও দিয়েছিল। পাসও করেছে হয়তো। সে মুগ্ধ স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে রইল।

মা হাসি-কান্না মেশানো মুখে বলল, এই বুঝি—?

আরে হ, এই হইল সুমন। হারু বইল্যাই ডাইক্যো, আয় রে হারু, এই হইল গিয়া তর ছোটমা। আরে, বান্দরটা দেখি আইজ সাইজ্যা গুইজ্যা খাড়াইয়া আছে!

মরণ গিয়ে টপাটপ প্রণাম সেরে ফেলল।

দাদা মাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, মা প্রায় সাপ দেখার মতো চমকে গিয়ে পিছিয়ে তার হাত ধরে ফেলে বলল, না না, ছিঃ ছিঃ আমাকে প্রণাম করতে হবে না বাবা, এসো, কতকাল পথ চেয়ে আছি তোমাদের জন্য। আমি এক অভাগী মা।

এসব কথা মা বোধহয় আগে থেকে তৈরি করে রেখেছিল মনে মনে। 'অভাগী মা' কথাটা ঠিক খাটল না যেন, ঘাবড়ে গিয়ে মা নাটকের ডায়লগ দিচ্ছে।

তবে হ্যাঁ, দাদাটাকে খুব পছন্দ হল মরণের। হালকা নীল জিনসের প্যান্ট আর খুব কারুকাজ করা লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবিতে খুব টং দেখাচ্ছে। নরম পাতলা গোঁফ আছে, অল্পস্বল্প দাড়িও। মাথায় বেশ ঢেউ খেলানো লম্বা চুল, ডান ধারে সিঁথি, কাঁধে একটা ব্যাগ।

ও মরণ দাদাকে দাদার ঘরে নিয়ে যা বাবা।

সুমন ওরফে হারু চারদিকটা চেয়ে দেখছিল। তার দিকে ফিরে বলল, তুমি মরণ?

মরণ কৃতার্থ হয়ে গেল। ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

আর বোনটা?

মা বলল, ওই তো মুক্তার কোলে। ঘুমিয়ে পড়ল বোধহয়। যাও বাবা, তুমি ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করো। জামাকাপড় পালটাও, চা খাবে তো!

না, আমি চা খাই না।

কী খাবে এখন বলল তো! ময়দা মাখা রয়েছে, একটু লুচি-টুচি ভেজে দেব?

না। খেয়ে এসেছি। একেবারে দুপুরে খাব।

গলার স্বরটা বড্ড ভাল দাদার। বেশ গমগমে। একটু লাজুক আছে। চোখ তুলে চাইছে না বেশি।

জড়তা, আড়ষ্টতা, লজ্জা অনেক কিছু মিশে আছে দু পক্ষের সম্বন্ধের মধ্যে।

হাত বাড়িয়ে মাছটা মার হাতে দিয়ে বাবা বলল, ভাপা কইরো তো, প্যাটে ডিম থাকলে ভাইজ্যা দিও।

এখন খাওয়া-দাওয়া নিয়ে মাতে আর বাবাতে কিছুক্ষণ কথা হবে। বাঙালরা খুব খাওয়া নিয়ে কথা কইতে ভালবাসে।

তার পিছু পিছু দাদা উঠে এল ওপরে। দক্ষিণ পশ্চিমের বড় ঘরখানায় ভুরভুর করছে চন্দন ধুপকাঠির গন্ধ। খোলা জানালা দিয়ে আলো-হাওয়া আসছে। এক ধারে বড় খাটের ওপর বিছানা। নতুন একটা ফুলকারি বেডকভার দিয়ে ঢাকা, খাটের পাশে টুল, তার ওপর ঢাকা দেওয়া কাচের গ্লাসে জল, পাশে সাদা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের জগে আরও জল। দুটো স্টিলের ফোল্ডিং চেয়ারের ওপর আসন পাতা। ঘরের কোণে একটা টেবিলে কিছু বই। তাদের বাড়িতে বেশি বই নেই। যে কখানা আছে তাই মা টেবিলে সাজিয়ে রেখেছে। টেবিলের ওপর ফুলদানিতে টাটকা কিছু গোলাপ আর গোলাপের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে রাখা শিউলি ফুল। এ-ঘর অনেকদিন ধরেই দাদার জন্য সাজিয়ে রেখেছে মা। যদি কখনও আসে!

দরজায় দাঁড়িয়েই ঘরটা একটু দেখল সুমন। তারপর তার দিকে চেয়ে একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল, আমার একটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে। বাড়িতে পরার চটি আনিনি। এখানে হাওয়াই চটি পাওয়া যায় না?

হ্যাঁ, বাজারে মাখন দাসের দোকানে ভাল জিনিস পাওয়া যায়। এনে দেব!

পরে হলেও চলবে।

চটি বাইরে ছেড়ে ঘরে ঢুকল সুমন। ব্যাগটা বিছানায় রেখে তার দিকে চেয়ে বলল, এ ঘরে কে থাকে?

আপনি না তুমি কী বলবে ঠিক করতে পারছিল না মরণ, শেষমেশ আপনি করে বলাটাই সাব্যস্ত করে বলল, কেউ থাকে না। এ-ঘরটা আপনার জন্যই রেখে দিয়েছে মা।

তাই বুঝি! বলে অবাক চোখে চারদিকটা ফের দেখল সুমন।

ওইটে বাথরুম। আপনি হাতমুখ ধোবেন না?

সুমন একটু হেসে বলল, তার চেয়ে চলো জায়গাটা একটু ঘুরে দেখে আসি।

কোথায় যাবেন?

বিশেষ কোথাও নয়। এমনিই একটু ঘুরে দেখব।

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে মরণ বলে, চলুন।

যখন নীচে নামল তারা তখনও মায়ের সঙ্গে বাবার খাওয়া নিয়ে কথা হচ্ছে। বাবা মাকে কইমাছ রান্নার একটা পদ্ধতি শেখাচ্ছিল।

মা বলল, ও মা, দাদাকে নিয়ে এই দুপুরে কোথায় চললি? ওর স্নান-খাওয়া নেই?

মরণ জবাব দেওয়ার আগে সুমনই বলল, একটু ঘুরে আসি।

বাবা বলল, যাউকগা, ঘুইরা-টুইরা আসুক। গ্রামের হাওয়া-বাতাস লাগাইয়া আসুক একটু শরীরে। কইলকাতায় তো অন্ধকূপে থাকে।

বাইরে বেরিয়ে দাদার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে মরণের ইচ্ছে হচ্ছিল সবাইকে ডেকে ডেকে বলে, দেখ, দেখ, এই আমার দাদা, স্টার পাওয়া দাদা, কেমন সুন্দর চেহারা দেখেছ? আছে তোমাদের এমন দাদা?

সুমন বেশি কথা বলছিল না। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল শুধু।

ঘোষবাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উঠোনে টিনের পাতের ওপর বড়ি দিতে দিতে জ্যাঠাইমা চেঁচিয়ে উঠল, ও মরণ, আমার সুপুরিগুলো পেড়ে দিয়ে গেলি না বাবা! কবে থেকে খোশামোদ করছি।

আজ নয় জ্যাঠাইমা। পরে পেড়ে দিয়ে যাব। আজ কলকাতা থেকে আমার দাদা এসেছে।

কথাটা বেশ অহংকারের সঙ্গেই বলেছিল মরণ, কিন্তু তার জবাবটা এল বিছুটির মতো।

ঘোষ জ্যাঠাইমা কপালে হাত দিয়ে নিরীক্ষণ করে বলল, অ বাঙালের আগের পক্ষ বুঝি?

লজ্জায় কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল মরণের। ওভাবে বলতে আছে? গাঁয়ের লোকগুলোর মুখের কোনও আগল নেই। দাদা শুনে কী ভাবল? ছিঃ ছিঃ। আর কখনও জ্যাঠাইমার সুপুরি যদি পেড়ে দেয় তো তার নাম মরণই নয়।

সুমনের মুখে অবশ্য খুব একটা ভাবান্তর দেখতে পেল না মরণ। মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে বলল, তুমি গাছে উঠতে পার বুঝি?

হ্যাঁ।

নারকেল গাছে উঠতে পার?

হ্যাঁ। খুব সোজা।

তোমার তো খুব সাহস দেখছি। যদি পড়ে যাও?

প্রথম প্রথম ভয় করত। এখন বেশ ভাল পারি।

আর কী পার?

আর? বলে একটু ভাবল মরণ। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আর কিছু পারি না।

খেলতে পার? ফুটবল ক্রিকেট?

তা পারি। আর হ্যাঁ, আমি খুব জোরে দৌড়োতে পারি।

কত জোরে?

তা তো কখনও মাপিনি, এখানে তো স্টপ ওয়াচ নেই। তবে প্রতি বছর স্পোর্টসে আমি তিনটে দৌড়ে ফাস্ট হই।

লেখাপড়াতে?

না। টেনে-মেনে পাস করে যাই।

লেখাপড়া ভাল লাগে না তোমার?

না।

সুমন একটু হাসল, আর কিছু বলল না।

হাওয়াই চটি কিনে যখন তারা ফিরল তখন অনেক বেলা হয়েছে।

মা বলল, ও মরণ, তুই আলাদা বসে রান্নাঘরে খেয়ে নেগে যা। ওদের বাপ-ব্যাটাকে দোতলার ডাইনিং হল-এ দিচ্ছি।

আচ্ছা মা।

কিন্তু খাওয়ার সময় সুমন বাসন্তীকে বলল, মরণ কোথায়?

ও রান্নাঘরে বসে খাবেখন বাবা। তোমাদের জন্য এই ব্যবস্থা।

না না, ওকে ডাকুন, ও আমার পাশে বসে খাবে।

বাসন্তী হেসে বলল, আচ্ছা ডাকছি।

মরণ লজ্জায় মরে গিয়ে ওপরে এল। আসলে বাবার সঙ্গে বসে সে কখনও খায় না। তাই আজ ভারী লজ্জা করছে, এক সঙ্গে দাদা আর বাবার সঙ্গে বসে খাওয়া! আজ তার পেটই ভরবে না।

সুমন বাপকে তেমন ভয় পায় না। অন্তত মরণের মতো তো নয়ই। খেতে বসে কত কথা কইতে লাগল তার সঙ্গে।

দুপুরে মা যখন রান্নাঘরে খেতে বসেছে তখন মরণ গিয়েছিল লেবুপাতা দিতে। মা ছলো ছলো চোখে বলল, দেখলি, এখনও পর্যন্ত একবারও মা বলে ডাকল না আমাকে ছেলেটা!

মরণ বলে, তাতে কী মা! আমি তো মা বলে ডাকি।

মা আঁচলে চোখ মুছে বলল, আমি শওুর বই তো নয়। ডাকবে কেন?

বড় কষ্ট হল মরণের।

দুপুর যখন ঘন হল, বেলা গড়িয়ে গেল তখন মরণ চুপি চুপি কদমগাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। এইখানে শিবঠাকুর আসেন। চোখ বুজে মরণ তার তিন নম্বর বরটা চেয়ে ফেলল, ঠাকুর, দাদা যেন মাকে একবার মা বলে ডাকে।

এগারো

পাঁউরুটি জিনিসটা হল অনেকটা ব্লটিং পেপারের মতো। যাতেই ডোবাও সুট করে রসটা টেনে নিয়ে একেবারে ভোঁট হয়ে যায়। চায়ে ডোবালে পাঁউরুটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্ধিসন্ধিতে ঢুকে যায় চায়ের রস। কী ভালই যে লাগে তখন খেতে। চায়ে টুসটুসে পাঁউরুটি যে না খেয়েছে তার জন্মই বৃথা। রসগোল্লার রসে ডুবিয়ে খাও, যেন অমৃত। পাঁউরুটি নিজেই যেন তখন ছ্যাদড়ানো রসগোল্লা। রসে-পাঁউরুটিতে সে যেন দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এ বলে আমাকে দ্যাখ, ও বলে আমাকে। আর দুধে যদি ডোবাও, তা হলে তো কথাই নেই। গরম দুধে পাঁউরুটি ছেড়ে একটুক্ষণ বসে থাকো। দুধে-পাঁউরুটিতে ভাব-ভালবাসা হওয়ার জন্য একটু সময় দিতে হয়। তারপর দেখবে দুটিতে মিলেজুলে থকথকে মতো হয়ে গেছে। তখন চামচে করে মুখে দাও। পায়েস কে পায়েস, রসমালাই কে রসমালাই, কিংবা রাবড়ি কে রাবড়ি। চোখটি বুজে যা ভেবে মুখে দাও না কেন তেমনটিই মনে হবে। জিভ থেকে পেট অবধি সোয়াদ ছড়াতে ছড়াতে যাবে।

এ-বাড়িতে দুধের রোজ নেই। গত বছর গাইটা বিক্রি করে দিতে হল বড় বউমার প্রসবের সময়। বড় ছেলে নয়ন সাট্টায় অনেক নাকি টাকা লাগিয়েছিল, পথে বসেছে। খুব দুর্ভোগ গেছে তখন। গাই গোরু, এক বিঘে জমি, খোরাকির ধানও গেল কিছু। সেই থেকে দুধের জোগাড় নেই। তিনটে দুধের শিশু আছে বটে, শটিফুডের সঙ্গে একটু গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে তাদের খাওয়ানো হয়। শটিফুডই বাঁচিয়ে রেখেছে। বেঁচে থাক শটিফুড। আর বাচ্চারা দুনিয়ার অনিয়ম অবিচার তেমন বোঝেও না বলে রক্ষে।

কিন্তু ধীরেনের এখন এই বয়সে নানান ইচ্ছে চাগাড় দিয়ে ওঠে। গত তিন রাত্তির সে স্বপ্ন দেখেছে দুধ-পাঁউরুটি খাচ্ছে। ঘুমের মধ্যেই জিভে আর টাগরায় এমন টকাস টকাস শব্দ করেছিল যে তার বউ বিরক্ত হয়ে তাকে নাড়া দিয়ে তুলে দেয়। শেষ রাতের স্বপ্ন বলে কথা। পাঁউরুটির জোগাড় হয়, কিন্তু দুধটাই কঠিন। জোগাড় হলেই যে মুখে তুলতে পারবে তাও তো সহজ নয়। তিনটে দুধ-উপোসি শিশু মুখের দিকে চেয়ে থাকবে না কি? আর তার বউ কি বলবে না, কোন আক্কেলে বুড়ো মানুষ তুমি এতগুলো চোখের সামনে দুধ নিয়ে বসতে পারলে? গলা দিয়ে নামবে? পাষণ্ড আছ বাপু!

কিন্তু তিন দিন স্বপ্ন দেখার পর ধীরেনকে এখন দুধ-পাউরুটি নিশিতে পাওয়ার মতো পেয়েছে। যখন নিশিতে পায় তখন আর কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু থাকে না। নাতি-পুতি বউ-বাচ্চা তখন বিস্মরণ হয়ে যায়।

জামার আড়ালে পিতলের ঘটিটি নিয়ে সকালবেলাতেই বেরিয়ে পড়ল ধীরেন। মুখ বারবার রসস্থ হয়ে পড়ছে। সামনের গোটা চারেক দাঁত নেই বলে মাঝে মাঝে সুট করে মুখের ঝোল টেনে নিতে হয়। বয়স হলে নান অসুবিধে।

বাঙালের বাড়িই ভরসা। তিনটে দুধেল গাই কামধেনুর মতো অনবরত দুধ দিয়ে যাচ্ছে। দুধের সমুদ্র একেবারে। তবে মুশকিল হল বাসি নগদ ছাড়া দুধ দেয় না বড় একটা। এমনিতে নরম-সরম মেয়েই ছিল।

ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। ফ্রক পরে গোবর কুড়িয়ে বেড়াত, কাঠকুটো জোগাড় করত, পুকুরে ডাঁই কাপড় কাচত খার দিয়ে, আবার কদমতলায় এক্কাদোক্কাও খেলত। কথা কইলে কাঁচুমাচু হয়ে যেত। কিন্তু সেই দিন তো আর নেই।

বাঙালের বউ হয়ে ইস্তক বাসি ধিঙ্গির মা সিঙ্গি হয়েছে। জমিজমা, মুনিশ, ঝি-চাকর, গোরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি নিয়ে ফলাও সংসার। চারদিকে যেন মা লক্ষ্মী ঢেউ তুলে দিয়েছেন। রোগা, শ্যামলা মেয়েটাকে আর চেনার জো নেই। গায়ে গত্তি লেগেছে, মেজাজও হয়েছে একটু।

বাবা-বাছা বলে যদি একটু আদায় হয় সেই ভরসাতেই বেরিয়েছে ধীরেন। তবে সে বুঝতে পারে, আজকাল মায়া-দয়া জিনিসটা বড্ড কম পড়ে যাচ্ছে চারধারে। কোথাও যেন আর জিনিসটা তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। আগে এ-গাঁয়েই দুধের গাহেক খুঁজলে পাওয়া যেত না। বাড়তি দুধ চাইলে ফেরাত না কেউ।

রসিক বাঙালের বাড়িতে ঢুকবার আগে একটু দাঁড়াল ধীরেন। আহা, কী বাড়িই করেছে বাঙাল। ডানধারে বিশাল প্রাসাদের মতো দোতলা দালান। দক্ষিণে উঠোনের দিকে টানা লম্বা বারান্দা। এক এক তলায় পাঁচ ছয়খানা করে ঘর। তাও এখনও দালানের গায়ে পলেস্তারা পড়েনি। পড়লে আরও দেখনসই হবে। পুবে একখানা একতলা দালান, তাতেও তিন চারখানা ঘর আছে। পাকা গোয়ালঘর, গোলাঘর, ঢেঁকিশাল, কী নেই বাঙালের। দু আড়াই বিঘে জুড়ে ফলাও বাগান। মেলা সুপুরি আর নারকোলের গাছ। সবজিও ফলছে দোহাত্তা।

ধীরেন মেটে পথটায় তাকিয়ে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন দেখতে পায় যেন। লক্ষ্মী ঢুকেছেন, সহজে বেরোবেন না।

এই সব দেখার মধ্যে আনন্দ আছে। অনেকে বাঙালকে হিংসে করে বটে, কিন্তু ধীরেনের হিংসে হয় না। কারও বোলবোলাও হয়েছে জানলে ধীরেন তাকে দেখতে যায়। বাড়ি দেখে, ঘর দেখে, মানুষটার মুখে আহ্লাদ আর খুশির আভা দেখে। তখন তার মনটা খুব হে-হে করতে থাকে। ভারী একটা সুড়সুড়ে সুখ হতে থাকে তারও। কেন হয় কে জানে।

ধীরেন দেখতে বড় ভালবাসে। চোখে ছানি পড়ায় দৃষ্টি একটু ঝাপসা বটে, কিন্তু তাই দিয়েই সে অনেক কিছু দেখে। ছানি কাটাবে বলে বর্ধমানের লায়নস ক্লাবে একটা দরখাস্তও দিয়ে এসেছে সে। পঞ্চায়েতের সার্টিফিকেটও জুড়ে দিয়েছে তাতে। এখনও জবাব আসেনি। নির্যস গরিব বলে প্রমাণ হলে বিনা পয়সায় ছানি কাটিয়ে দেবে। দেখার নেশা আছে বলেই ছানিটা কাটানো বড় দরকার।

ফটকের বাইরে মুগ্ধ চোখে বাড়িটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল ধীরেন।

জ্যাঠামশাই, কাকে খুঁজছেন?

ধীরেন তাকিয়ে মরণকে দেখে এক গাল হাসল, এই দেখছি তোদের বাড়িটা। তা তোদের কী খবর-টবর রে? বাঙাল আসে-টাসে?

হ্যাঁ। পরশু এসেছিল, আজ সকালে চলে গেছে।

ধীরেন আগল ঠেলে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, বাসি নেই?

আছে। ডেকে দেব?

তাড়া নেই। কাজ-টাজ করছে হয়তো। বসি একটু দাওয়ায়।

বসুন না। বারান্দায় উঠে চেয়ারে বসুন।

ধুতির খুঁটে দাওয়ার মেঝেটা একটু ঝেড়ে বসে পড়ল ধীরেন। বলল, এই ভাল।

সকালের মিঠে রোদ নিকোনো উঠোনে রুপপার থালা হয়ে পড়ে আছে। বাঃ বাঃ। যার ভাল তার সবই ভাল। এ-বাড়ির রোদটাও যেন ধীরেনের বাড়ির রোদের চেয়ে অনেক বেশি সরেস, অনেক বেশি জমকালো। এরকমই সব হয়, ললাকে বিশ্বাস করে না বটে, কিন্তু হয়।

দোতলা থেকে বাসি রেলিং-এ ঝুঁকে বলল, ও ধীরেনখুড়ো, কিছু বলবেন?

এই মা, তেমন কিছু নয়। তত্ত্বতালাশ করতেই আসা। তা খবর-টবর সব ভাল তো!

আছি খুড়ো একরকম। ঝামেলা ঝঞ্ঝাট তো কম নয়।

তা তো হবেই রে বাসি। কত বড় বিষয় সম্পত্তি, কত লোকলস্কর খাটছে, কত দিক সামাল দেওয়া। হওয়ারই কথা কি না।

বেরিয়েছেন কোথা?

এই ঘুরে-টুরে দেখছি। ঘরে আর কাজটা কী বল!

তা তো বটেই। বড় ছেলে কী করছে এখন?

কে জানে মা। সাট্টার পেনসিলার না কী যেন শুনি। বর্ধমানে যায় রোজ।

সে কি ভাল কাজ খুড়ো?

কে জানে মা? ভাল কাজ করার মতো বিদ্যে কি আছে?

যখন ইস্কুলে যেতুম তখন রোজ পিছু নিত আমার। ভারী অসভ্য ছেলে।

ধীরেন ছেলের অপরাধে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ওই সবই তো করত। মায়ের আসকারায় শাসনও করা যায়নি কি না।

একলা দোতলায় কথা চালাচালির অসুবিধে। চেঁচিয়ে তো আর দুখের কথাটা বলা যায় না।

বাসন্তী বলল, একটু বসুন খুড়ো, আসছি।

তা বসে ধীরেন। ওদের কাজের মেয়েটা পুকুর থেকে কাচা কাপড়-চোপড় এনে উঠোনের তারে মেলছে। দৃশ্যটা খুব মন দিয়ে দেখে ধীরেন। কমলা সবুজ নীল রঙের নানা শাড়িতে উঠোনটা যেন ভারী রঙিন হয়ে গেল। বাতাসে দুলে দুলে যেন হাসছে শাড়িগুলো। যেন বলছে, দেখেছো, কেমন চান করে ফর্সা হয়ে এলুম!

দুনিয়ায় দেখার জিনিসের কোনও শেষ নেই। এইটুকু এক রত্তি একটু গাঁয়ের চৌহদ্দির মধ্যেই ঘোরাফেরা তার। কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই যেন অফুরান সব দৃশ্য, কুলিয়ে ওঠা যায় না।

জ্যাঠামশাই, মা জিজ্ঞেস করল চা খাবেন?

এক গাল হাসল ধীরেন, দিবি? তোদের কষ্ট হবে না তো!

না না।

তবে দে একটু। চিনি আর দুধটা একটু যেন বেশি দেয় দেখিস।

আচ্ছা জ্যাঠা।

হ্যাঁ রে মরণ, বলি দুধে ভিজিয়ে পাঁউরুটি খেয়েছিস কখনও?

মরণ মুখটা বিকৃত করে বলে, এঃ বাবা! দুধে পাঁউরুটি! ওয়াক।

পাষণ্ড আর কাকে বলে। এ ছেলে দুধ-পাঁউরুটির মর্মই বোঝে না। ধীরেন তটস্থ হয়ে বলে, তা বাবা, খাসনি বুঝি কখনও?

নাঃ। ও তো পিটুলিগোলার মতো খেতে!

দুর! তুই জানিস না। একটু দানা চিনি ছড়িয়ে খেতে—

বাসি নেমে এল নীচে। বেশ চেহারাটা হয়েছে এখন। সেই রুখু শরীরে এখন একটু তেল চুকচুকে ভাব। ফর্সা একটা মেজেন্টা রঙের শাড়ি পরা, কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ, সিঁথি ভর্তি সিঁদুর থেকে খানিক নাকের ডগায় ঝরে পড়েছে। স্বামী-সোহাগের লক্ষণ। না, বেশ আছে মেয়েটা। সময়মতো বাঙালের চোখে পড়ে গেল, তাই বেঁচে গেছে। চোখে পড়াটাই হল আসল কথা। ওই হল ভাগ্য, ওই হল গ্রহানুকূল্য। ভাল চোখ যদি পড়ে তবে তরে গেলে। আর মন্দ চোখ যদি পড়ে তবে হেঁচড়ে হেঁচড়ে জীবন যাবে।

কিছু বলবেন খুড়ো?

হ্যাঁ মা, তা তোদের গোরুগুলো দুধ-টুধ কেমন দেয়?

আর বলবেন না। কালো গাইটা দুধ বন্ধ করেছে সেই কবে। দুটো দিচ্ছে এখনও, তবে কমে এসেছে। আমার বড় ছেলে এসেছে কলকাতা থেকে, তাকে কোথায় একটু পিঠে পায়েস করে খাওয়াবো, তাই হচ্ছে না ভাল করে। মাসিক বন্দোবস্তের গাহেকও তো আছে।

ঘটিটা জামার তলা থেকে আর বের করল না ধীরেন। না, হবে না।

কাজের মেয়েটা কাপে চা নিয়ে এল, প্লেটে দুটো থিন এরারুট বিস্কুট। চলকানো চায়ে বিস্কুট দুটো নেতিয়ে গেছে। তা যাক। এটুকুই বা মন্দ কী?

খুব যত্ন করে চাটুকু খেল ধীরেন। চায়ে ভেজানো বিস্কুটেরও একটা স্বাদ আছে।

উঠছেন খুড়ো? আবার আসবেন।

আসব বইকী! এই ঘুরে ঘুরেই সময় কাটাই। যোগাযোগটাও রাখা হয়, সময়ও কাটে।

মরণ পোশাক পরে ইস্কুলে বেরোচ্ছে। তার পিছু পিছুই বেরিয়ে পড়ল ধীরেন। ফাঁকা ঘটিটা জামার নীচে ধরা আছে এখনও। ছোট ঘটি, বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না।

বেগুনক্ষেতটা পার হওয়ার সময় ধীরেন দাঁড়াল। গাছে ফুল এসে গেছে। দু-একটা গাছে কচি বেগুনের শিশুর মত নিস্পাপ মুখ উঁকি মারছে। কী সুন্দর দেখতে। শীতের বেগুন, তার স্বাদই আলাদা। বেগুন বড্ড তেল টানে বলে তার মা চাকা-বেগুনে আগে একটু চিনি মাখিয়ে রাখত। তাতে নাকি তেল কম লাগে। তা হবে হয়তো। আজকাল আর বেগুন ভাজা হয় না। মাঝে মধ্যে একটু পোড়া-টোড়া হয় বড় জোর।

খুব ধীর পায়েই এগোয় ধীরেন। সকালটা এখনও আছে। শীত শীত ভাবটাও ক্রমে বাড়ছে বাতাসে। নাকি বয়স হচ্ছে বলেই শীতভাব হয় তার?

রায়বাড়ির উঠোনে ইজিচেয়ারে মহিমাই বসে বোধহয়। ঠিক ঠাহর হয় না। সজনের ছায়ায় ঝিরঝিরে বাতাসে এই অলস বসে থাকাটা ভালই লাগে ধীরেন কাষ্ঠর।

উঠোনে চাটাই বিছিয়ে নানা জিনিস রোদে দিচ্ছে সন্ধ্যা। আমলকী, আমসি, সারি সারি আচার আর কাসুন্দির বোতল।

একটু কাছে গিয়ে ভুল বুঝতে পারে ধীরেন। মহিমদা নয়, বসে আছে অমল।

ভারী খুশি হয়ে ওঠে ধীরেন।

উরে বাপ রে! অমল নাকি?

অমল মানে হচ্ছে এক চোখ-ধাঁধানো ছেলে, গ্রামের গৌরব। বিলেত আমেরিকা ঘুরে এসেছে। এক এক মাসে যা বেতন পায় তা দিয়ে হাতি কিনে ফেলা যায়। গরিবগুর্বোর সম্বৎসরের খরচ।

অমল একটা বই পড়ছিল। ইংরিজি বই-ই হবে। তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভারী আনমনা চোখে চেয়ে রইল। চিনতে পারল না। তারপর সোজা হয়ে বসল। একটু হেসে বলল, ধীরেনকাকা না?

হ্যাঁ বাবা।

ইস, একদম বুড়ো হয়ে গেছেন যে! চিনতেই পারিনি।

অমল তাকে চিনতে পারায় ভারী আপ্যায়িত হয়ে ধীরেন বলে, তা বয়সও হল। আমাদের তো আর কিছু হয় না, শুধু বয়সটাই হয়।

বসুন কাকা। বাবাকে ডেকে দিচ্ছি। ঘরেই আছে।

তোমার সঙ্গে কতকাল পরে দেখা! দেশের গৌরব তুমি।

অমল কথাটা শুনে খুব খুশির ভাব দেখাল না। মুখটা শুকনো। ধীরেনের চোখ যদি খুব ভুল না হয়, তা হলে মুখে একটু দুঃখের ছাপও যেন আছে। হওয়ার কথা নয় এরকম। লম্বা বেতন, হোমরা-চোমরা চাকরি, পেটে গিজগিজ করছে বিদ্যে, এরকম মানুষের মুখে তো আহ্লাদ ফেটে পড়ার কথা!

আপনি কেমন আছেন ধীরেনকাকা?

এই আছি বাবা। টিকে আছি।

ছেলেরা সব দাঁড়িয়েছে তো?

এই একরকম। টুকটাক করে আর কী। তোমার তো ভালই চলছে বাবা! আমাদের কথা বাদ দাও। পাপীতাপী লোক আমরা।

চারদিকে জল, জল আর জল। ডাঙাজমির দেখাই নেই। তার ভিতর দিয়ে জল ভেঙে ছুটতে ছুটতে হাঁফ ধরে যাচ্ছিল ধীরেনের। কতবার যে খানা ডোবায় পড়ল, কতবার পা হড়কাল তার হিসেব নেই। কতটা সময় লেগেছিল তাও ভেবে পায়নি কখনও ধীরেন। যখন ডাঙাজমিতে উঠল এসে তখন তার সর্বাঙ্গ জলে কাদায় মাখামাখি। চোখ উদভ্রান্ত, মনে বিভীষিকা, পাপবোধ, পাগলের মতো অবস্থা।

যখন বাড়ি ফিরল তখন সে প্রায় উন্মাদ। আপনমনে বিড় বিড় করছে, কখনও চিৎকার করে কেঁদে উঠছে, কখনও নিজের চুল ছিড়ছে দু হাতে মুঠো করে। ওর মধ্যেই তার বাবা ঠ্যাঙা নিয়ে মারতে এসেছিল তাকে। মা এসে ঠেকাল, দেখছ না কী অবস্থা! নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। আগে ঠান্ডা হতে দাও।

মা-ই তার গলায় তারের ফাঁসটা আবিষ্কার করেছিল। বলল, এটা তোর গলায় কী রে? কে তোকে তুক করেছে? অ্যাঁ!

কিছু বলতে পারেনি ধীরেন। দিন দুই লেগেছিল সেই বিকারের ঘোর কাটতে। তারপর পুলিশের ভয়ে সে কালনায় তার মাসির বাড়িতে পালিয়ে গেল। মাসখানেক বাদে যখন ফিরল তখনও পুলিশ তাকে খোঁজেনি। খোঁজার কথাও নয়। বৃষ্টি বাদলা কেটে গিয়ে জোড়া লাশ যখন পাওয়া গিয়েছিল তখন দিন পাঁচেক কেটে

গেছে। মড়া পচে ঢোল। পুলিশ একটা তদন্ত করেছিল বটে, কিন্তু তখন গ্রামদেশে এসব নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামানোর রেওয়াজ ছিল না। যেটা রটেছিল তা হল, বরুণ মিদ্দার তার বউকে মেরে ডোবায় ফেলতে গিয়ে নিজেও ডুবে মরেছে।

ধীরেন খুনের দায় থেকে বেঁচে গেল। ধীরে ধীরে স্মৃতি আবছা হল, সময়ের পলিমাটি পড়তে লাগল, কিন্তু আচমকা কখনও-সখনও মনে পড়ত দৃশ্যটা। শিউরে উঠত।

ইদানীং ধীরে ধীরে স্মৃতিটা ফের কেন যেন জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। আর তাকে একা পেলেই কেন যে বরুণ মিদ্দার কাছেপিঠে চলে আসতে চায়! সে আজকাল অন্ধকার ভয় পায়, একা ঘরে ভয় পায়, নিরিবিলি মাঠ পেরোতে ভয় পায়। বাতাসে যেন একটা ফিসফাস শুনতে পায় সে। বরুণ মিদ্দারের গলা বলেই কেন যেন মনে হয় তার।

ইদানীং জ্ঞানগম্যিওলা মানুষদের কাছেপিঠে গিয়ে বসার একটু ঝোঁক হয়েছে ধীরেনের। যারা অনেক জানে-টানে তাদের কাছে গেলে অনেক ধাঁধা কেটে যায়।

এ-অঞ্চলে অবশ্য জ্ঞানী লোক বেশি নেই। গৌরহরিদা ছিলেন, মহিম রায় এখনও আছে।

তা হরিদার কাছে ব্যাপারটা একবার বলে ফেলেছিল সে। বেশি বলতে চায়নি, শুধু একটা "পাপ" কথা বলে ভণিতা করেছিল মাত্র। কিন্তু গৌরহরি দুঁদে উকিল। জেরা করে করে সবই পেট থেকে বের করে নিল। তারপর বলল, তা কি প্রাশ্চিত্তির করতে চাস নাকি?

এর কী প্রশ্চিত্তির আছে হরিদা?

কিছু নেই রে, কিছু নেই। বরাতজোরে খুনের দায় থেকে বেঁচে গেছিস, এসব কথা পাঁচকান না করাই ভাল।

কাউকে বলিনি, নিজের বউকে অবধি নয়।

বউকে আরও বলবি না। মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকে না।

বলি না। কিন্তু আজকাল বড় মনে পড়ে যায়। ওই আদিগন্ত জল, ওই সাংঘাতিক বর্ষা, বরুণ মিদ্দার, বাতাসী সব যেন মাঝে মাঝে এসে ঘিরে ফেলে। বিশেষ করে মিদ্দার।

কেন যে অমলের মুখোমুখি বসে কথাটা আজ মনে পড়ল কে জানে। মাঝে মাঝে বড্ড মনস্তাপ হয়। জীবনটা ভণ্ডুল হয়ে গেছে বলে মনে হয় যেন। পাপটা কি সইবে তার?

বসুন কাকা, বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।

ঘটিটা মোড়ার পাশে নামিয়ে রাখল ধীরেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হঠাৎ হঠাৎ মিদ্দার আজকাল মনের মধ্যে হানা দেয়। হানা দেয় বাতাসীও।

সন্ধ্যা বলল, ঘটিতে কী নিয়ে যাচ্ছেন ধীরেনকাকা?

কিছু নয় মা। বাঙালের বাড়িতে একটু দুধের খোঁজে গিয়েছিলাম। তা পাওয়া গেল না।

ওঃ দুধের যা টানাটানি চলছে আমাদেরও! মেজদারা সব এসেছে তো! দুটো মোটে গোরু। বাবার বরাদ্দই কমিয়ে দিতে হয়েছে।

ধীরেন চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

উরেব্বাস, কত রকমের আচার করেছিস রে সন্ধ্যা! অ্যাঁ!

হ্যাঁ কাকা, মাথা থেকে সব বের করতে হয়।

তাই বুঝি? আমাদের তো ভাতপাতে একটু তেঁতুল হলেই হয়।

সে দিন আর নেই কাকা। এখন লোকে সব কিছুরই আচার চায়। শুনেছি নাকি বিলেত-টিলেতে মাংসেরও আচার হয়।

বাপ রে! বটে!

হ্যাঁ। এই যে দেখুন না, কেউ কখনও গাজরের আচার খায় শুনেছেন? এক খদ্দের চেয়েছে বলে তাও করে দিচ্ছি।

অমল উঠে গেছে। আরাম-কেদারার ওপর বইটা পড়ে আছে উপুড় হয়ে। ডানামেলা পাখির মতো দু মলাট দুদিকে ছড়ানো। বইটার নাম একটু ঝুঁকে দেখল ধীরেন। ইংরিজি পড়ার অভ্যাস নেই। সেই কবে একটু শিখেছিল। শুধু নামের শেষটুকু পড়তে পারল, গ্লোরি।

সন্ধ্যা বলল, খাবেন একটু আচার? দেব প্লেটে করে?

ধীরেন হাসল। বলল, দে একটু। চেখে দেখি।

একটা প্লেটে দুরকম আচার নিয়ে এল সন্ধ্যা, দেখুন তো খেয়ে কেমন টেস্ট হয়েছে!

ভাল বলার জন্য মুখিয়েই আছে ধীরেন। খেতে খেতে মাথা নাড়া দিতে দিতে বলল, বাঃ বাঃ, এ তো ফার্স্ট ক্লাস জিনিস দেখছি।

সন্ধ্যার মুখে যে হাসিটা ফুটল তা অহংকারের।

ভাল?

খুব ভাল রে মা। তাই তোর জিনিস এত চলে।

চলে তো কাকা। কিন্তু টাকা থাকলে ব্যবসাটা আরও বড় করতে পারতাম। একটা কারখানাই করে ফেলতাম।

দুধটা এখানেও হল না। আচার খেয়ে ধীরেন উঠে পড়ল। মহিমা এল না। দরকারও নেই। খানিক গল্প করা যেত।

উঠলেন কাকা?

উঠি।

বাবা বোধহয় বাগানে ঢুকেছে। ডাকব?

না মা। আবার আসবখন।

টুক টুক করে ধীরেন হাটে। আচারগন্ধী একটা সুবাসিত ঢেঁকুর উঠল। বেশ ভালই লাগল ঢেঁকুরটা তুলে। ঢেঁকুরও যে একটা উপভোগ্য জিনিস সেটাও কি সবাই বোঝে? যদি জিজ্ঞেস করে কাউকে, ওহে, ঢেঁকুর তুলে যদি মাংসের বা পায়েসের গন্ধ পাও তা হলে কেমন লাগে? তা হলে হয়তো চটেই উঠবে লোকটা। ধীরেন কাউকে জিজ্ঞেস করে না বটে, কিন্তু কথাগুলো মনে মনে খুব ভুড়ভুড়ি কাটে।

ওই গৌরহরিদার বাড়ি। এই গাঁয়ের টাটা-বিড়লা যা-ই বললা তা ছিল ওই গৌরহরি চাটুজ্যে।

দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বাড়িটা নিরীক্ষণ করে ধীরেন কাষ্ঠ। দুই ভাইয়ের অংশ কিনে নিয়েছিলেন হরিদা দুনো দামে। যা করার ইচ্ছে তা করবেনই। জান কবুল। ওরকম মানুষকে রোজ সকালে উঠে পেন্নাম করতে হয়। বড় বড় থাম, মজবুত খিলানের ওপর বাড়ি। তিন তিনটে দোতলা দালান, কত যে ঘর তার হিসেব নেই। হরিদা

কি জানতেন না শেষ অবধি কেউ গাঁয়ের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে না? ছেলেরা যাবে, মেয়েরা যাবে, পড়ে থাকবে বুড়োবুড়ি? জানতেন। জেনেও ভাইয়েদের অংশ কিনে নিয়েছিলেন। রাজা-জমিদারের মতো মেজাজটা ছিল খুব।

সসংকোচে বাগানের লোহার ফটক পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকল ধীরেন। ভিতর থেকে অনেক লোকের গলা পাওয়া যাচ্ছে। ছেলেরা এসেছে বোধহয়।

উঠোনের মুখে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা। বিজু, নরহরির ছেলে। ভারী ফর্সা, সুন্দর চেহারা। কী যেন খেলে-টেলে। ফুটবল বা ক্রিকেট যাই হোক। লেখাপড়াতেও চৌখশ।

বীরেনখুড়ো নাকি?

ধীরেন সরে সাইকেল যাওয়ার রাস্তা দিয়ে বলল, হ্যাঁ বাবা।

কিছু মনে করবেন না খুড়ো, পানুকে যে মেরেছিলাম সে এমনি নয়। পাতা খায় বলেই মেরেছি। যারা ওসব নেশা করে তাদের দোষ কী জানেন? তারা আর পাঁচজনকে জুটিয়ে নিতে চেষ্টা করে। পুরো গাঁয়ের আবহাওয়াই নষ্ট করে দেবে। একটু খেয়াল রাখবেন।

ধীরেন হাঁ করে চেয়ে থাকে। পানু তার ছোট ছেলে। সে যে বিজুর কাছে মার খেয়েছে এ-খবরটাই জানা নেই ধীরেনের। তবে পাতা-র কথাটা সে আবছা শুনেছে। খুব খারাপ নেশা নাকি, কিন্তু ধীরেনের কীই বা করার আছে! ছেলেরা এখন দূরের মাস্তুল, দরিয়ায় অনেক তফাতে চলে গেছে। পড়লে, মরলে শোক হবে বটে, কিন্তু নোঙর নেই যে!

সসংকোচে ধীরেন বলে, ঠিকই তো, ঠিকই করেছ বাবা মেরেছ।

একটু সামলে রাখবেন। নইলে ঘটিবাটি চাঁটি করে দেবে। এ নেশা যে করে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

ধীরেন মাথা নাড়ে। বুঝেছে, আবার বোঝেওনি সে। বিড়ি-আসটা খায়, ঠিক আছে। ধেনো-টেনো খেলেও না হয় একরকম। দুনিয়া যত এগোচ্ছে নেশাও তত এগোলে বড় কঠিন পরিস্থিতি।

যান ধীরেন খুড়ো, ভিতরে যান।

ভিতরে এক আনন্দের হাট। স্বর্গের ছবি যেন। দুটো বিশাল বারান্দার সিঁড়ির বিভিন্ন ধাপে নানা বিভঙ্গে বসে আছে সুন্দর সুন্দর সব নারী ও পুরুষ। খুব হাসছে, হল্লা করে কথা বলছে।

ধীরেন হঠাৎ শিহরিত হয়ে মাথা নেড়ে আপনমনে বলে উঠল, না, না, উচিত হচ্ছে না। এখানে আমার ঢোকাটা উচিত হচ্ছে না।

সে তাড়াতাড়ি এই সুন্দর দৃশ্যটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য পিছু হটে চলে আসছিল। একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এসে সামনে দাঁড়াল, এ কী খুড়া, চলে যাচ্ছেন যে।

পারুল, বরাবরই জগদ্ধাত্রীর মতো দেখতে ছিল। এখন যেন আরও জমকালো হয়েছে।

ধীরেন ভারী অপ্রস্তুত হয়ে বলে, না মা, তেমন কোনও কাজ ছিল না। এমনিই দেখা করতে আসা। ঘুরে ঘুরে খোঁজখবর নিই আর কী।

আসুন না ভিতরে, মার সঙ্গে দেখা করবেন না?

আজ থাক।

থাকবে কেন খুড়ো? আমরা যখন থাকি না তখন তো আপনারাই যা তোক খোঁজখবর নেন। আপনাদের ভরসাতেই তো মা আছে এখানে। আসুন।

কী সহবত! তার মতো নকড়াছকড়া লোককেও কী আপ্যায়ন। গৌরদা তার ছেলেমেয়েকে কী শিক্ষাটাই দিয়ে গেছে! বুক ভরে যায়।

হাতে ওটা কী খুড়ো? ঘটি নাকি?

সসংকোচে ঘটিটা ফের আড়াল করতে করতে ধীরেন হে হে করে একটু হাসে, ও কিছু নয় মা। গাঁয়ের মানুষ তো, এক কাজে বেরিয়ে অন্য কাজও সেরে নিই। একটু দুধের খোঁজে বেরিয়েছিলুম, তাই।

পেলেন না?

সে হবে খন।

উঠোনে নিমের ছায়ায় পাতা একখানা কাঠের চেয়ারে সাদা থান পরা বউঠান বসা। গায়ের রং আগে দুধে-আলতায় ছিল, এখন শ্বেতপাথরের মতো। একটু ফিরে তাঁকে পাশচোখে দেখছেন।

ধীরেন ঠাকুরপো বুঝি! এই দেখুন আমার বাচ্চারা সব এসেছে। সবাইকে তো চিনবেনও না।

ধীরেন খুব হাসি হাসি মুখ করে কয়েক পা এগোল। বড্ড লজ্জা হচ্ছে তার। এমন সুন্দর দৃশ্য— যেন মা দুর্গা আর কার্তিক গণেশ আর লক্ষ্মী সরস্বতীরা সব জড়ো হয়েছে। তার মধ্যে সে এক মহিষাসুর যেন ঢুকল এসে।

বলাকা তার দিকে চেয়ে বলে, অনেকদিন দেখিনি আপনাকে। চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে কেন?

ধীরেন বড় বেকায়দায় পড়েছে, জোড়া জোড়া চোখ তার দিকে।

অসুখ-বিসুখ করেনি তো ঠাকুরপো?

না বউঠান, বুড়ো হচ্ছি তো!

বলাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তা তো সবাই হচ্ছি।

আজ যাই বউঠান, আপনারা গল্প-টল্প করুন। অসময়ে এসে পড়েছি।

কোনও কথা ছিল নাকি?

না না, এই খবরটবর নিতেই আসা। আসি তাহলে?

আসবেন মাঝে মাঝে।

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে আসছিল ধীরেন। শুনতে পেল, পেছনে একটা মেয়ে বলে উঠল, জানো, জ্যাঠামশাইয়ের কাজের দিন ধীরেন জ্যাঠা আমার ঘরের পাশে সাপ দেখে কাপড়ে পেচ্ছাপ করে ফেলেছিল!

একটু হাসির ঢেউ উঠল। বড় যন্ত্রণা হয় ধীরেনের। যা ঘটে তার কোনওটাই সে আর আটকাতে পারে না। ছেলে পাতা খায়, অন্য ছেলে সাট্টা খেলে, সে আটকাতে পারে না। এই যে পেচ্ছাপ বেরিয়ে পড়ে তাও কি পারে আটকাতে? এবারে চলে যাওয়ারই সময় হল বুঝি! তবে বানের জলে মিদ্দারকে ডুবিয়ে মেরেছিল তার পাপই কি অর্শাচ্ছে?

একটা শিউলি গাছের কাছে পারুল। ডিং মেরে পাতায় পাতায় আটকে থাকা ঝরা শিউলি তুলছে।

খুড়ো চললেন?

হ্যাঁ মা।

এত তাড়াতাড়ি? মায়ের সঙ্গে দেখা হল?

হ্যাঁ। এই একটু দেখে গেলুম। ঘুরে ঘুরে সবার খোঁজখবর নিই আর কী। আজ মহিমার মেজো ছেলে অমলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কত কাল পর, চিনতেই পারছিল না।

একটু ভ্রূ কোঁচকাল পারুল, কে বললেন?

সেই যে মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করেছিল মনে নেই? এখন কেষ্টবিষ্ট হয়ে উঠেছে। বড় ভাল লাগল দেখে।

পারুল ফুল তুলতে তুলতেই বলল, অমলদা এসেছে বুঝি?

হ্যাঁ।

আর কথা নেই। ধীরেনের কথা বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। ধীরে হেঁটে সে রাস্তার দিকে যাচ্ছিল।

ধীরেনখুড়ো!

ধীরেন থমকে দাঁড়ায়, কী মা?

আপনি কি এখন দুধ জোগাড় করতে যাচ্ছেন?

ধীরেন ক্লিষ্ট একটু হেসে বলে, দেখি যদি পাই।

দিন তো, ঘটিটা আমাকে দিন।

অ্যাঁ!

পারুল ঘটিটা তার অবশ হাত থেকে নিয়ে লঘু পায়ে ভিতরবাড়িতে চলে গেল। ধীরেন একটু আশাভরসায় বুক বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল। নিজেকে একটু কাঙাল ভিখিরির মতোই লাগছে বটে, কিন্তু সে তো তাই। সমাজের নীচের তলাতেই বাস ছিল তার। হয়তো আরও কয়েক ধাপ নেমে গেছে। কে জানে! তবে কী এসে যায় তাতে? এইসব বড় বড়, উঁচু উঁচু মানুষের দয়াধর্মের ওপরেই তো বেঁচে থাকা, ছোট ছোট ইচ্ছাপূরণ!

দেবী যেমন বর দেন তেমনই ছোট ঘটিটা দুধে ভরে নিয়ে এসে তার হাতে দিল পারুল। মুখটা কচুপাতায় ঢেকে দিয়েছে। কী বুদ্ধি মেয়েটার।

সাবধানে নিয়ে যাবেন খুড়ো।

কৃতজ্ঞতায় গলে যেতে ইচ্ছে করে ধীরেনের। চোখে জল আসতে চায়। একটু উথলানো গলায় বলে, দিলে মা! দিলে!

বেশি তো নয়। ছোট্ট ঘটি আপনার।

যথেষ্ট মা, এই যথেষ্ট।

আর খুড়ো!

হ্যাঁ মা।

অমলদার সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে একবার আমাদের বাড়িতে আসতে বলবেন। বলবেন আমি বলেছি।

ধীরেন মাথা হেলিয়ে বলে, আচ্ছা মা। এখনই বলে আসব?

পারুল একটু হেসে বলল, আমি কয়েকদিন এখানে থাকব। যখন হয় বলবেন, আপনার সময়মতো।

হ্যাঁ মা।

দুধ! শেষ অবধি ঘটি ভর্তি দুধ! আনন্দে ধীরেনের বুকটা একটু তোলপাড় হল। এবার একটু পাঁউরুটি জোগাড় হলেই হয়। ঘটিটা দু হাতে মণিরত্নের মতো ধরে ধীরেন সাবধানে হাঁটে। হোঁচট-টোচট খেলে দুধ চলকে যাবে বাবা। আর হঠাৎ যদি এখন তার পেচ্ছাপ পেয়ে বসে তাহলেও বিপদ। পাজি পেচ্ছাপটা যে কখন পেয়ে বসে তার কিছু ঠিক নেই। শালা ঠিক মিদ্দারের ভূতের মতো। যখন-তখন এসে হানা দেয়। কাণ্ডজ্ঞান থাকে না তখন।

পাঁউরুটি কিনতে বাসরাস্তায় এসে ধীরেন চায়ের দোকানে বসল একটু। অনেক কিছু ভাবার আছে। এই দুধ নিয়ে বাড়ি গেলে কি তার ভোগে লাগবে? চারদিকে লোভী চোখ। ঘটিটা সাবধানে টেবিলের ওপর রেখে এক হাতে যখের মতো ধরে থাকল ধীরেন। তারপর অনেকক্ষণ ভাবল। ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক কাপ চা আর কোয়ার্টার রুটি নিল ধীরেন। চায়ে ডুবিয়ে পাঁউরুটি কিছু খারাপ নয়। চায়ের মধ্যেও তো একটু দুধ থাকে রে বাপু। চোখ বুজে মনে মনে ভেবে নিলেই হয় যে, দুধে ভিজিয়েই খাচ্ছি।

কাঙাল গরিবদের ভগবান কল্পনাশক্তিটাও খুব দেন বটে। ওইটুকু আছে বলেই তারা পান্তাকে পোলাও মনে করে খেয়ে নিতে পারে। না না, পোলাও-টোলাও গরিবেরা ভালবাসে না। তাদের জিভে পোলাও বা লুচির কোনও স্বাদ নেই। তারা ভালবাসে মিঠে ভাত, লঙ্কার ঝাল বা তেঁতুলের টক। তাই দিয়েই ভরপেট উঠে যায়।

চায়ে ভিজে গেলাসের মধ্যে পাঁউরুটিটা টইটম্বুর হয়ে উঠল। দৃশ্যটা মুগ্ধ চোখে দেখল ধীরেন। তারপর একটু একটু চুমুক দিয়ে আর দু-তিন আঙুলে চায়ে ভেজা পাঁউরুটির দলা মুখে দিয়ে খেতে লাগল সে। খুব ধীরে ধীরে। অন্য হাত দুধের ঘটির ওপর সতর্ক পাহারা দিচ্ছে।

অনেকক্ষণ সময় নিল ধীরেন। সব জিনিস রয়ে-সয়ে করতে হয়। জিভ, টাকরা কণ্ঠনালি বেয়ে পেট অবধি স্বাদের আলো ছড়িয়ে নেমে যাচ্ছে চায়ে ভেজানো পাঁউরুটি। পুরো এই ব্যাপারটা খুব মন দিয়ে উপভোগ করছে সে। প্রতিটি বিন্দু।

দুধটুকু থাক। এটুকু বাড়িতেই নিয়ে যাবে সে। দুধ-উপোসি শিশুরা আজ দুধ দেখে ভারী খুশি হবে। না, ধীরেনের বরাতে জুটবে না। তা না জুটুক। আজ তার একটু মহৎ হতে বড্ড ইচ্ছে করছে।

বারো।

প্রস্ফুটিত কমলের মতো তোমার আশ্চর্য আনন। মনে হয় এখনই মধুকর গুনগুন করে উড়ে এসে ভুল করে ফুল ভেবে বসবে ওই আননে। এইভাবে পুরুষের স্তাবকতা শুরু হল, শেষ হল না আজও। কত ভূর্জপত্র, তালপাতার পুঁথি, কত কাগজ আর কলমের কালি খরচ হয়ে গেল, রচনা হল কত কাব্য, মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস। উপমায় উপমায় চাঁদ, ফুল, শ্রাবস্তীর কারুকার্য গেল ফুরিয়ে। পুরুষ দমেনি এখনও।

দেখন-সুন্দরী না হলেও হয়। হয়তো মুখে জুতসই একটা তিল বা আঁচিল, ঠোঁটের একটু অভিমানী ভাঁজ, মুখের ডৌল, চোখ বা চাহনি, হয়তো বা গজদন্ত, গালের টোল কিছু একটা হলেই হল। বোকা পুরুষ তাই নিয়েই মাতল, মজল, পাগল হল। ডোবাল জাহাজ, ছারখার করে দিল দেশ, লাগাল ধুন্ধুমার যুদ্ধ। না পারলে হয়তো মদ খেয়ে হল দেবদাস বা কবি, আত্মহত্যা করে বসল, পাগল বা সাধু হয়ে গেল।

হ্যাঁ গা, শুধু রূপটুকু চাই? কুরূপার বুঝি প্রেম নেই?

ওই যে বারান্দার উত্তর কোণে এসে বসে আছে রাইকিশোরী। সামনে মুড়ির বস্তা, বেতের দাড়িপাল্লা নামিয়ে রেখে আঁচলে মুখের ঘাম মুছছে। ওর একটুও শ্রী নেই। খর্বুটে পুরুষালি গড়ন, দাঁত উঁচু, মুখে অনেক খানাখন্দ। কোনও পুরুষ বিরলে বসে একবারটিও ভাববে না ওর কথা। এক লাইন কবিতাও কোথাও লেখা হবে না ওর জন্য। তবু হয়তো ওরও একদিন বিয়ে হয়ে যাবে। প্রকৃতির নিয়মে ছেলেপুলে হবে, সংসার করবে। কিন্তু প্রেম হবে না।

আজ সে জানালা দিয়ে চেয়ে মুড়িউলি রাইকিশোরীকে দুপুরের আলোয় দেখছে আর রূপের কথা আর বেহদ্দ পুরুষের কথা ভাবছে।

আজ জানালা দিয়ে কে তার বিছানায় একখানা ভাঁজ করা প্রেমপত্র ফেলে দিয়ে গেছে। ভাল কাগজও জোটেনি। শস্তা এক্সারসাইজ বুকের একখানা ফ্যাঁস করে ছেঁড়া পাতা। হাতের লেখাটা অবশ্য তত খারাপ নয়।

আজকাল আবৃত্তিকারদের কল্যাণে জীবনানন্দ ঘরে ঘরে। চিঠির মধ্যেও সেই বিদিশার নেশা, পাখির নীড়ের মতো চোখ, হালভাঙা নাবিক এইসব আছে। ভাল করে পড়লও না পান্না। তার সতেরোখানা প্রেমপত্রের সঙ্গে আঠেরো নম্বরটাও রেখে দিল চন্দনকাঠের বাক্সে। নীচে যার নাম সই সেই মণীশকে সে চেনেও না। হয়তো কারও বাড়িতে এসেছে। কারও আত্মীয়স্বজন হবে।

প্রেমপত্র পেলে পান্না খুশি হয় না। আবার রেগেও যায় না। আসলে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়াই হয় না তার। এসব ছ্যাবলাদের সঙ্গে নিজেকে ভাবতে তার ইচ্ছেই হয় না কখনও।

তবু ট্রফি হিসেবে থাকে। প্রেমপত্র একধরনের সার্টিফিকেটও তো বটে।

দুপুরবেলাটা গড়িমসি। আলিস্যিতে ভরা তার শরীর। তবু উঠতে হল। আজ বড়মার বাড়িতে তার নেমন্তন্ন। নেমন্তন্ন প্রায়ই থাকে। একা ফাঁকা বাড়িতে বড়মা একা বসে খায় বলে তাকে প্রায়ই ডেকে পাঠায়।

কিন্তু বড়মার বাড়িতে সে কিছুতেই মাছটা খেতে পারে না।

বড়মা অবশ্য জোর করে, কেন মাছ খাবি না? খা, একটু তফাতে বসে খেলেই হবে।

না বড়মা, নিরামিষই ভাল।

তোর যে তাহলে পেট ভরবে না?

কেন বড়মা? গোবিন্দভোগ চালের ভাত, সরবাটা ঘি, আলুভাজা, পোস্ত, আলুর দম, টক—এতেও ভরবে না?

তাহলেও তোর কষ্ট তো হবে।

একটুও না। মাছে আমার আজকাল আঁশটে গন্ধ লাগে।

আজ অবশ্য তা নয়। আজ নেমন্তন্ন করেছে পারুলদি, কী সব চাইনিজ আর ইটালিয়ান রান্না করবে বলে নানারকম জিনিস আনিয়েছে কলকাতা থেকে। কাল রাতে বলল, তোর জামাইবাবু একটু আনইউজুয়াল ডিশ পছন্দ করে। তুইও খাবি। দুবেলাই নেমন্তন্ন। মনে থাকে যেন।

আর কাকে বলবে?

কাউকে না। বাইরের লোক ডাকলে বাপু ঘরোয়া আড্ডার মেজাজটা থাকে না। নিজেরা বেশ গল্প-টল্প করব। অনেকদিন বাদে নিজের হাতে রান্না করব, কীরকম হবে কে জানে বাবা। নুন-টুন কমবেশি হতে পারে।

কেন, তুমি রান্না করো না?

দুর! সময় পাই কোথায়? এক মিশিরজি আছে, সেই রাঁধে। আমাকে তো তোর জামাইবাবুর অফিস সামলাতে হয়।

তাই তো! পাস-টাস করলে আমাকে তোমার অফিসে একটা চাকরি দেবে?

কেন রে মুখপুড়ি, চাকরি করবি কেন?

খারাপ কী বল! চাকরি, না হয় বিয়ে করে ঘরসংসার—এই তো! আর কোনও অলটারনেটিভ আছে?

পারুলদি একথায় হাসল না, ভাবল। বলল, অলটারনেটিভ অনেক হয়তো আছে। কিন্তু আমরা তা ভাবি না। তবে তোকে বলি, বিয়ে না করে চাকরি করলেই কিন্তু কিছু সুখ হয় না, ওটা ভুল ধারণা। বিয়ে যদি দাসত্ব হয় তবে চাকরি আরও দাসত্ব। ওসব চাকরির চিন্তা মাথা থেকে তাড়া।

ধর, চাকরি না করে যদি বুটিকের দোকান করি বা ফ্যাশন সেন্টার বা বিউটি পার্লার!

ব্যস, ফুরিয়ে গেল তো! আজকাল সব মেয়েই কেবল ওসব লাইনে ভাবে। প্রফেশনাল হয়ে যে কিছু লাভ হয় না তা বুঝতে চায় না। ভাবে গাদা গাদা টাকা রোজগার করলেই বুঝি খুব সুখ।

কী করব তাহলে বল তো! ঘরসংসার? সেও তো ফুরিয়ে যাওয়া। কী সুখ আছে বল!

পারুলদি একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলে, সত্যি বলতে কী, আমার কেবল মনে হয়, আমরা একটা ভুল জীবন কাটিয়ে যাচ্ছি। আমার কথাই ধর না। তোর জামাইবাবু তো ভীষণ ভাল একটা লোক। আমার কোনও অভাব নেই। কাজকর্ম, সংসার নিয়ে দিব্যি সময় কেটে যায়। তবু মাঝে মাঝেই কেমন যেন হাঁফ-ধরা লাগে।

চোখ গোল গোল করে পান্না বলল, তোমারও হাঁফ ধরে যায়। তাহলে আমাদের কী হবে?

তাই তো বলছি, অলটারনেটিভ খুঁজে কিছু লাভ নেই। স্বামীর দাসত্ব করবি না, ঠিক আছে। কিন্তু আর যা করতে যাবি কোনওটাই বেটার অলটারনেটিভ নয়। বেশি টাকা রোজগার করারও একটা একঘেয়েমি আছে।

মনে হবে, দুর ছাই, এত টাকা দিয়ে কী হবে?

যাঃ, আমার তা কখনও মনে হবে না।

এ বয়সে বুঝবি না। টাকা জিনিসটাকে কিছুতেই ভালবাসা যায় না।

কেন?

টাকা হচ্ছে বায়িং পাওয়ার। কেনা-বেচার মিডিয়াম। তাই যদি হয় তাহলে শুধু বেচা-কেনার জন্যই তো টাকা। ওটার তো আর কোনও মূল্য নেই। কনভার্টিবিলিটি ছাড়া টাকার আর কোন গুণ আছে বল।

ও বাবা, ওসব শক্ত কথা বুঝতে পারি নাকি?

তোকে অত বুঝতে হবেও না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত আমার কাছে টাকা জিনিসটা অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

তোমার অনেক টাকা আছে বলেই ওরকম মনে হয়।

মাথা নেড়ে পারুলদি বলল, না রে, তা নয়। মানুষ তো ভোগ করবে বলেই রোজগার করে। কিন্তু বুঝতে পারে না তার ভোগ করার ক্ষমতা খুব বেশি নয়। ধর আমি যদি পাঁচশোটা বেনারসি কি বমকাই কিনি, হাজার ভরি গয়না গড়াই, দশটা গাড়ি এনে গ্যারেজে ভরি বা দশটা বাড়ি তৈরি করি—কিছু লাভ হবে তাতে? ক্লান্তি লাগবে না?

ইস্, আগে তোক তো!

পারুলদি হেসে ফেলল, আচ্ছা যা, এখন ওসব বোঝার বয়স হয়নি তোর। পরে বুঝবি।

না পারুলদি, এসব বয়স হলেই বোঝা যায় না। এসব বোঝার জন্য অন্যরকম মন চাই। তুমি হলে বড়মার মতো। দেখ না, বড়মা কেমন যেন হয়ে গেছে। শাড়িগুলো বিলিয়ে দিল সবাইকে। গয়নাগুলো দিয়ে দিল। জ্যাঠামশাই চলে যাওয়ার পর থেকে বড়মা একদম পালটি খেয়ে গেছে। আমাকে তিনটে পিওর সিল্ক আর একটা আংটি দিয়েছে, জানো? হীরাকে দিয়েছে দুটো ঢাকাই, একটা বেনারসি আর ঝুমকো দুল।

পারুলদির চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বলল, ঠিকই বলেছিস হয়তো, মায়ের মনটাই হয়তো পেয়েছি। মা যেন বেঁচেই ছিল শুধু বাবার জন্য। বাবাই ছিল মায়ের ধ্যানজ্ঞান। এখন মা যেন ঠিক বেঁচেও নেই। মাঝে মাঝে ভয় হয় মা বোধহয় মনে মনে সহমরণেই চলে গেছে। চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, কথা কইছে, মজার কথা শুনে হাসছে, কিন্তু মা যেন মা নেই।

উঃ পারুলদি, ওভাবে বোলো না। শুনে এখন আমার কেমন ভয়-ভয় করছে। সহমরণ কেন হবে? বড়মার মনটা খুব খারাপ, তা তো হতেই পারে।

পারুলদি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, সারাদিন আমি কেবল মাকে ঘুরে ঘুরে দেখি, স্টাডি করি, বুঝবার চেষ্টা করি। বড্ড ভয় হয়, এত শোক সইতে না পেরে মাও যদি চলে যায়?

না না, বড়মা কেন মরবে? শোক কত কেটে গেছে দেখ না? এখন বড়মা অনেক সামলে গেছে।

মাকে দেখে রাখিস। মা তো কিছুতেই আমাদের কারও কাছে গিয়ে থাকবে না। তোরাই ভরসা।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব পারুলদি?

বল না।

সোহাগ খুব তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তোমাদের বাড়িতে অনেক লোকজন আছে বলে আসতে চায় না।

কেন রে, আমার কাছে আসতে চায় কেন?

কী জানি। তোমাকে ওর খুব পছন্দ।

তোর সঙ্গে ভাব হয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ।

তোকে বলেছিলাম না ওর সঙ্গে বেশি মিশিস না।

কী করব বলল, বেচারার বন্ধু নেই। আমার কাছে আসে গল্প করতে।

এঁচোড়ে পাকা মেয়ে, না?

না পারুলদি, একটু পাগলি, কিন্তু ভারী ভাল মেয়ে।

মাও বলছিল, ওর নাকি আমাকে গডেস বলে মনে হয়।

হ্যাঁ। ও তো কতবার সে কথা বলে।

আর কী বলে?

তোমার প্রতি ওর ভীষণ সফটনেস!

বাজে কথা কিছু বলে না তো?

কী বাজে কথা?

খারাপ কিছু?

তোমার সম্পর্কে? না তো!

আমার গা ছুঁয়ে বল।

পান্না অবাক হয়ে পারুলের হাত ধরে বলল, গা ছুঁয়ে বলছি।

ফিক করে একটু হেসে পারুল বলে, তা হলে আনিস একদিন। সবাই চলে যাওয়ার পর।

ওরা বোধহয় খুব বেশিদিন থাকবে না। পুজোর পর কলকাতা চলে যাবে।

তা হলে পরে কখনও হবে।

একটু আনিই না একদিন পারুলদি?

পারুল একটু গম্ভীর হয়ে বলল, এখন বড় হয়েছিস, কাজেই তোকে বলা যায়। অমলদার সঙ্গে আমার একটা রিলেশন ছিল। সবাই জানে। ওর মেয়ে এলে সকলের সামনে আমার একটু অস্বস্তি হয়।

দুর! তুমি ভীষণ পিউরিটান। তাতে কী হয়? সেসব তো কবে চুকেবুকে গেছে।

পারুল হাসল, সে অবশ্য ঠিক। কিন্তু মেয়েটাকে কেন যেন আমার পছন্দ হয় না।

কেন হয় না বলো তো!

কী জানি। ভিতর থেকে একটা অপছন্দের ভাব আসে।

সোহাগ কিন্তু হেলপলেস মেয়ে।

কেন, হেলপলেস কেন?

ওর মা-বাবার সঙ্গে রিলেশন খুব খারাপ। ওর মা বাবার ধারণা ওর মধ্যে কেউ ইভিল স্পিরিট ঢুকিয়ে দিয়েছে।

যাঃ!

হ্যাঁ গো। আমেরিকায় থাকতে নাকি একটা বাজে গ্রুপ ওকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর নাকি ব্রেনওয়াশ করে ফেরত দেয়।

ধ্যেত! গাঁজাখুরি গল্প বলেছে।

গল্পটা ও বলেনি।

তাহলে?

বলেছে ওর মা।

ওর মাকে তুই চিনিস নাকি?

হ্যাঁ, সোহাগ নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

মহিলা কেমন?

খারাপ নয় তো!

ওটা একটা কথা হল? খারাপ না হোক, একটা রকম আছে তো!

আমার তো ভালই লাগে। কাছে গেলে গল্প-টল্প করে।

কীসের গল্প?

বিদেশের গল্প।

আমার কথা কখনও জিজ্ঞেস করেনি তো!

না। কিন্তু ভদ্রমহিলা ভীষণ ডিপ্রেশনে ভোগেন।

কেন?

তা জানি না।

রাইকিশোরী নামটা শুনলেই একটা কবিতার মতো কিশোরী মেয়ের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠবেই উঠবে। সরু কোমর, সদ্য ফুটে-ওঠা বুক, অবাক মুখ, আর চোখে মুগ্ধ চেয়ে থাকা। হায়, এই রাইকিশোরী কিছুতেই মেলে না ছবিটার সঙ্গে।

বস্তা তুলে বড় টিনে সাবধানে এক অবিশ্বাস্য দক্ষতায় মুড়ি ঢেলে দিচ্ছে সে। এ—বাড়িতে মুড়ির খুব টান। চারটে মুনিশ ওই পুবের বারান্দায় বসে বড় বড় অ্যালুমিনিয়ামের কানা উঁচু থালায় মুড়ির পাহাড় নিয়ে বসবে। একটা তরকারি আর ডাল ঢেলে দিতে হয় মুড়ির মাথায়। তার ওপর জল ছিটকে ছিটকে মুড়িটা মেখে নিয়ে বড় বড় সূর্যমুখী লঙ্কা কামড়ে খেয়ে নেবে চোখের পলকে। দুদিন বাদে বাদেই রাইকিশোরীকে আসতে হয়।

সামান্য একটু সেজে নিতে নিতে দৃশ্যটা জানালা দিয়ে দেখছিল পান্না। কোনও মণীশ ওকে চিঠি দেবে কি কখনও? মুড়ি ফেরি করে করে যৌবন যায় রাইকিশোরীর। রূপহীনার তো প্রেম নেই।

আয়নায় নিজেকে একটু মন দিয়ে দেখে পান্না। না, নিজের চোখ দিয়ে নয়। অজানা এক মণীশের চোখ দিয়ে।

হাই।

পান্না হেসে বলে, হাই।

কোথাও বেরোচ্ছ?

সে একটু পরে গেলেও হবে। বোসো না।

আমি কি তোমাকে ডিস্টার্ব করলাম?

না তো! বাসো।

বসব না। আমার আজ চারদিকটা খুব ভাল লাগছে। শরৎকালটা এখানে ভীষণ ভাল, না?

ভীষণ।

চলো একটু হেঁটে আসি।

চলো।

আমার একটা মুশকিল হয়েছে।

কী মুশকিল?

চলো, হাঁটতে হাঁটতে বলব।

উঠোন পেরিয়ে সরু পথটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভারী উদাস গলায় সোহাগ বলে, বাস্তুসাপ কাকে বলে জানো?

হ্যাঁ। কেন জানব না? এখানে অনেকের বাড়িতে আছে।

আমাদের বাড়িতেও আছে। সাপের একটা হিপনোটিক পাওয়ার আছে, তাই না?

ও বাবা! ওসব জানি না। সাপ শুনলেই আমার গা সিরসির করে।

আমি রোজ আমাদের খড়ের মাচানটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসে সাপগুলোর জন্য অপেক্ষা করি।

তুমি একটা ক্ষ্যাপা মেয়ে। ওরকম করতে আছে?

আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু একদিনও আমার সামনে বেরোয় না।

আচ্ছা, সাপ দেখে তোমার কী লাভ হবে বলো তো!

আমার ভীষণ একটা অ্যাট্রাকশন। সাপ তো ইভিল, যেমন, ডেভিল। সাপই ইভকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়েছিল। তাই না?

তাতে কী হল?

সাপ ভীষণ মিস্টিরিয়াস একটা প্রাণী। আমার অনেকদিন ধরে একটা সাপ পুষতে খুব ইচ্ছে করে। সাপটা আমার গায়ে বেয়ে বেড়াবে, গলায় পেঁচিয়ে থাকবে, মাথার ওপর উঠে ফণা তুলে থাকবে। অনেকটা শিবের মতো।

ও মা! মাথাটা তো গেছে দেখছি! কী বিটকেল ইচ্ছে রে বাবা।

সবাই তাই বলে।

সাপ-খোপের চিন্তা মাথা থেকে তাড়াও তো।

আজ একটা কাণ্ড করে ফেলেছি।

কী করেছ?

আজ সকালে একটা সাপুড়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে ডেকে একটা সাপ কিনতে চাইলাম। তাতে সে খুব অবাক হয়ে গেল। বলল, সাপ নিয়ে কী করবেন? বললাম, পুষব। লোকটা মাথা নেড়ে বলল, সাপ পোষা বিপদের কাজ। বিদ্যে না জানলে নাকি ওসব করতে নেই।

ঠিকই তো বলেছে।

তখন আমি তাকে কিছু টাকা বখশিস দিয়ে বললাম, তাহলে আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দাও। খড়ের মাচার নীচে তিনটে গোখরো সাপ আছে, সেগুলো যদি সে ধরে তাহলে আমি কায়দাটা শিখে নেব। টাকার লোভে সে রাজি হয়ে গেল।

বাস্তুসাপ ধরতে বললে? কী সর্বনাশ! তারপর?

তখন বাড়িতে তেমন কেউ ছিল না। পিসি বর্ধমানে গেছে, জেঠিমা পাড়ায় বেরিয়েছে। শুধু বাচ্চারা কয়েকজন ছিল। সাপুড়েটা কী সব মন্ত্র বলে একটা শেকড়ের টুকরো মাচার নীচে ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগল। আর ভেঁপুতে কুক কুক করে অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল।

মা গো! তুমি তখন কোথায় দাঁড়িয়েছিলে?

আমি ওর সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম।

তোমার দুর্জয় সাহস ভাই! তারপর কী হল?

হঠাৎ ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে করতে ইয়া বড় একটা সাপ খুব তেড়ে বেরিয়ে আসছিল। কী সাংঘাতিক স্পিড! লোকটা চেঁচিয়ে আমাকে বলল, দিদি সরে যান। কিন্তু জানো, সাপটা যখন বেরিয়ে এল আমি তখন তার দুটো পুঁতির মতো চোখের দিকে চেয়ে একদম হিপনোটাইজড হয়ে গেলাম। একটুও নড়তে পারিনি।

ও বাবা!

লোকটা আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে না দিলে ইট কুড বি ফ্যাটাল। সাপটা আমার খুব কাছে চলে এসেছিল দুম করে।

ইস্, কী যে হত আজ!

লোকটা কিন্তু খুব এক্সপার্ট। সাপটা বেরিয়ে আসতেই চট করে একধারে সরে গিয়ে এক ঝটকায় সাপটার লেজ ধরে তুলে ফেলে একটা ঝাঁকুনি দিল শুধু। তারপর ঝুড়িতে ভরে ফেলল। বলল, আমার আর ঝাঁপি নেই দিদি, আজ এই একটাই ধরলাম। অন্যগুলো এখন গর্তে নেইও, ওরা এই সময়ে নাকি খেতে বেরিয়ে যায়।

ব্যাপারটা বাড়ির লোক জানে?

হ্যাঁ। জানতে পেরেই তো আজ খুব চেঁচামেচি হল। জেঠিমা ফিরতেই বাচ্চারা তাকে সাপ ধরার কথা বলে দেয়। জেঠিমা ভীষণ ভয় পেয়ে চেঁচাতে থাকে, সর্বনাশ হয়ে যাবে! বংশ থাকবে না। ভিটেমাটি উচ্ছেদ হবে... আরও কত কী! খবর পেয়ে জ্যাঠামশাই এল, বাবা কোথায় গিয়েছিল, চলে এল। তারপর রতনদাকে ডাকিয়ে আনা হল। বাবা আমাকে ভীষণ বল আজ। তারপর রতনদার মোটরবাইকে চেপে বাবা আর রতনদা বেরোল সাপুড়েকে খুঁজে বের করতে।

পাওয়া গেল তাকে?

হ্যাঁ। বাসরাস্তায় গুমটিতে বসেছিল। তাকে ধরে নিয়ে আসা হল। সে যেসব ওষুধ ছড়িয়েছিল সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে গেল ফের। আমি এখন বাড়িতে খুব আনপপুলার।

তুমি হাসছ! কাজটা মোটেই ভাল করনি। বাস্তুসাপ ধরাও ভাল নয় শুনেছি।

আমি জাস্ট শিখতে চেয়েছিলাম। আর কিছু নয়।

ওসব শিখতে অনেক সময় লাগে, গুরুর কাছে শিখতে হয়।

সোহাগ ঠোঁট উলটে বলে, তা হবে, কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা কিছু কঠিন নয়। আসলে দরকার স্পিড, আর ঠিক জায়গায় ধরে ফেলা, আর ভয় না পাওয়া।

তার মানে! তুমি কি সাপ ধরার চেষ্টা করবে নাকি?

মনে হচ্ছে চেষ্টা করলে পারব।

খবর্দার সোহাগ ও—কাজও করতে যেও না।

একটু দূর থেকে নিউ স্পোর্টিং ক্লাবের বারান্দায় কয়েকটা ছেলেকে বসে থাকতে দেখতে পেয়েছিল পান্না। চেনা ছেলেই সব।

ক্লাবঘরটা পেরিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটা ছেলে বেশ উঁচু গলায় বলে উঠল, এখানে বেশি রংবাজি মারাতে এলে মুখের জিওগ্রাফি চেঞ্জ করে দেব। গাঁয়ে ফুটানি মারতে এসেছে...

পান্না অবাক হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে ছেলেগুলোর দিকে চেয়ে বলে, কাকে বলছেন?

একটা ছেলে বলল, তোমাকে নয়। যাকে বলেছি সে বুঝতে পেরেছে।

কাকে বললেন?

বললাম তো তোমাকে নয়।

সোহাগ অন্য দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। পান্নার হাতটা টেনে বলল, চলে এসো। দে আর কাওয়ার্ডস।

হাঁটতে হাঁটতে পান্না বলে, কাকে বলছিল বলো তো!

আমাকে।

তোমাকে! কেন বলছিল?

তা জানি না, আমি রাস্তায় বেরোলেই আজকাল কয়েকটা ছেলে আওয়াজ দেয়।

তুমি রুখে দাঁড়াওনি?

না, ঝগড়া করতে আমার ভাল লাগে না। তিন-চার দিন আগে যখন প্রথম ব্যাপারটা হয় তখন আমি একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কথাটা কি আমাকে বললেন? সে জবাব না দিয়ে চলে গেল।

খুব সাহস হয়েছে তো এদের! দাঁড়াও বিজুদাকে বলে ঠান্ডা করে দেব।

বিজুদা কে?

আমার জ্যেঠতুতো দাদা, স্পোর্টসম্যান, বিজুদাকে সবাই ভয় পায়।

তার মানে একজন পুরুষের সাহায্য চাইবে?

তাতে কী?

মাথা নেড়ে সোহাগ বলে, তাতে আমার আত্মসম্মানে লাগবে। পুরুষের অ্যাটাক থেকে বাঁচার জন্য পুরুষেরই সাহায্য নেওয়াটা কি ভাল?

এটা পুরুষ-মেয়ের ব্যাপার তো নয়, এরা বাজে ছেলে, এদের টিট করা দরকার।

না পান্না। বিজুদাকে বলার দরকার নেই। সব জায়গায় তো আর আমি এক একজন করে প্রোটেক্টর খুঁজে পাব না। পৃথিবীর সব জায়গাতেই অল্পবিস্তর এসব হয়। সেসব আমাকে একাই তো হ্যান্ডেল করতে হবে।

ওদের তোমার ওপর এত রাগ কেন বলো তো!

আমি তো ওদের পাত্তা দিই না, তাই বোধহয়। দিন সাতেক আগে একটা ছেলে নির্জন রাস্তায় আমার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ায় চেষ্টা করে। আমি মাঝে মাঝে খুব ঘোরের মধ্যে থাকি, জানো তো! সেদিনও ছিলাম। ছেলেটা কী বলছিল আমাকে, শুনতে পাইনি। ছেলেটা আমার হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে চলে যায়। তাতে ভুল ইংরিজিতে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা লেখা ছিল।

এ মা! কী লেখা ছিল তাতে?

ফোর লেটার ওয়ার্ডও ছিল।

কে ছেলেটা বলো তো!

তাকে আবার দেখলেও চিনতে পারব না। বললাম না, আমি তখন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

এসব আগে এখানে কখনও হত না, আজকাল হচ্ছে।

প্লিজ তোমার বিজুদাকে বোলো না।

যে ছেলেটা চেঁচাল তাকে আমি চিনি। শিবেন্দ্র, কামার পাড়ার দিকে থাকে। দাঁড়াও খোঁজ নিতে হবে।

কিন্তু আমাকে নিয়ে কোনও হইচই হোক আমি চাই না। আমরা তো কিছুদিন পরেই চলে যাব।

শোনো সোহাগ, আমাদের গ্রাম সম্পর্কে তুমি যদি খারাপ ইমপ্রেশন নিয়ে যাও তাহলে তুমি হয়তো আর আসতে চাইবে না, একটা খারাপ ধারণা নিয়ে বসে থাকবে।

উদাস মুখে সোহাগ বলল, একমাত্র গভীর অরণ্য ছাড়া সব জায়গাই তো খারাপ, কলকাতা ভাল নয়, মিউনিক ভাল নয়, লন্ডন ভাল নয়, নিউ ইয়র্ক ভাল নয়। না পান্না, আমার কোনও রাগ বা অভিমান হচ্ছে না।

তুমি খুব অদ্ভুত!

সবাই তাই বলে।

জানো, আজ একটা ছেলে আমাকে প্রেমপত্র দিয়ে গেছে!

সোহাগ হাসে, তাই বুঝি?

হ্যাঁ। সেটা অবশ্য লাভ লেটার, অসভ্য কথা নেই।

পরনে ধুতি, গায়ে হাতাওয়ালা একটা গেঞ্জি, আর ধুতির খুঁটটা তার ওপর জড়াননা, এই পোশাকে অমল গাঁয়ের রাস্তায় ঘুরতে বেরিয়েছিল, ভারী অন্যমনস্ক, এসে অবধি সে গাঁয়ের কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের চেষ্টা করেনি, পুরনো বন্ধুদের খোঁজখবর নেয়নি, কারও বাড়িতে গিয়ে বসেনি, শৈশবের স্মৃতিচারণাও তার ভাল লাগে না।

কয়েকদিন ছুটি আছে তার। ঘরে বসে বই পড়ে আর একা একা ঘুরে ঘুরে ছুটিটা কাটিয়ে দেবে সে, বাবা, ভাই, বোন, বউ, ছেলেমেয়ে কারও সঙ্গেই সে আজকাল স্বচ্ছন্দ বোধ করে না। শুধু একা থাকতে ভাল লাগে। হৃদয় খুঁড়লেই ব্যথা-বেদনার উৎসমুখ খুলে যায়।

জনহীন জায়গাগুলো তার জানা, সন্ধের পর খেলার মাঠ, পতিত জমি, জংলা জায়গা, শুধু রতনের সঙ্গে তার কিছু কথাবার্তা হয়। ছেলেটার সংসারী বুদ্ধি নেই। মোটরবাইক হল তার নেশা। সারা দিন ঝাড়ে, মোছে, যত্ন করে, টুকটাক সারাইও করে নেয়। মোটরবাইকই তার ধ্যানজ্ঞান। অন্য খেয়াল নেই, সে অমলকে প্রায়ই দুর্গাপুর বা কালনা নিয়ে যেতে চায় তার বাইকে। বর্ধমান ঘুরিয়ে আনল কাল, বেশ চালায়।

ঘুরে ঘুরে তেষ্টা পেল অমলের। একটু চা পেলে হত। কোনও অসুবিধে নেই। যে কোনও বাড়িতে ঢুকে পড়লেই হল। আদর করে বসিয়ে চা খাওয়াবে। চা পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু আজকাল কথা বলা বা শোনা তার কাছে অসহ্য ঠেকে।

বাড়িতে ফিরে ধীর পায়ে দোতলায় উঠতেই মোনালিসা দরজা খুলে দিয়ে বলল, এসো দেবদাস। তোমার পারু তোমাকে দেখা করতে বলে পাঠিয়েছে।

থতমত অমল বলে, কে?

পারু গো পারু। ভুলে গেলে নাকি?

অমল গোরুর মতো নিস্পৃহ চোখে চেয়ে থাকে।

তেরো।

আমি ভারী অবাক হয়ে দেখছি তোকে।

কেন, অবাক হওয়ার মতো কী দেখলেন?

আমার হিসেবমতো তোর বয়স এখন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। ঠিক তো!

না মশাই, আপনার শ্যালিকার বয়স এখন আটত্রিশ।

বাজে বকিস না। আচ্ছা, ছত্রিশই ধরছি।

স্নেহের পাত্রী বলে সত্যি কথাটা স্বীকার করতে চান না তো!

তা নয়। হিসেব করেই বলছি।

আচ্ছা, নয় তাই হল, এবার অবাক হওয়ার কথাটা বলুন।

আমি দেখছি তোর শরীরে এক ফোঁটাও চর্বি জমেনি। আশ্চর্য সেটাই।

কেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে বিশুদা?

কিছু মানুষ থাকে দড়কচা-মারা চেহারা, তাদের কখনও চর্বি হয় না। কিন্তু তোর তো সেরকম সিঁটকোনো চেহারা নয়। তোর চর্বি হওয়ার কথা। এমনকী তোর পেট বা কোমরেও ভাঁজ পড়ে না। হ্যাঁ রে, ডায়েটিং করিস নাকি।

খাটে বসে আপন মনে উল বুনে যাচ্ছিল বকুল। সে পারুলের চেয়ে নয় বছরের বড় দিদি। এতক্ষণ চুপ করে থেকে এবার বলল, চিরকাল ডায়েটিং করাই তো ওর স্বভাব। সেই ছেলেবেলাতেও একটুখানি খেয়েই ওর পেট ভরে যেত।

বিশ্বনাথ মাথা নেড়ে বলে, যতই কম খাক, চর্বি না জমার কথা নয়। ওর দেখো, একটুও নেই। বেশি ডায়েটিং করলে চেহারায় একটা অসুস্থ শীর্ণতার ছাপ পড়ে, ওর তাও হয়নি।

পারুল হাসছিল, এসব ম্যাজিক মশাই, ম্যাজিক।

তুই কি ব্যায়াম করিস?

খুব বেশি কিছু নয়। সকালে বরের সঙ্গে একটু হাঁটি। আর সামান্য কয়েকটা আসন করি।

তোর বয়সটাও এক জায়গায় আটকে আছে। এখনও কলেজের ছাত্রী বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

বকুল বলে, ওগো, ওকে অত নজর দিও না তো! তোমার নজর বাপু খুব খারাপ। জানিস পারুল, ও যখনই আমাকে ভাল দেখে তখনই আমার শরীর খারাপ হয়।

বিশ্বনাথ হাসে, নজরের দোষ কী বল! পারুল যে আমাকে বড় অবাক করে দিয়েছে। দু-তিন বছর বাদে দেখা, একইরকম আছে। একটুও বদলায়নি।

হ্যাঁ রে, আমার বয়সটা বোঝা যায়, না?

তা কেন? তবে তুই একটু মোটা হয়ে গেছিস দিদি।

কী করব বল! জল খেলেও মোটা হই।

বিশ্বনাথ একজন সরকারি আমলা। রিটায়ার করার মুখে। কালোর ওপর চেহারাটা একসময়ে ভালই ছিল। কালো বলে বিয়েতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না বকুল। আপত্তি ছিল বকুলের মা বলাকারও। এ বংশে সবাই ফর্সা। ছেলেমেয়ে কেউ কালো নয়। তা হলে কালো জামাই কেন পছন্দ করা হচ্ছে?

গৌরহরি তাঁর স্ত্রী বলাকাকে বলেছিলেন, কালো বলে আমারও যে আপত্তি হচ্ছে না তা নয়। বকুল ফর্সা, কালো বরে তারও আপত্তি হওয়ারই কথা। কিন্তু বিশ্বনাথের যে-গুণটার জন্য সম্বন্ধ করছি তা হল ছেলেটি খুব সৎ। যে-ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে সেখানে লাখপতি হওয়া কোনও ব্যাপারই নয়। এই ছেলেটি ঘুষ খায় না, মিথ্যে কথা বলে না, নেশা নেই। এর বাবাও সরকারি অফিসার ছিলেন, সেই মানুষটিও সৎ।

বলাকা বললেন, খুঁজলে কি অমন আর পাওয়া যাবে না?

যাবে বলাই, যাবে। খুঁজলে কী না পাওয়া যায়!

তা হলে আর একটু দেখো না। মেয়ে তো সুন্দরী, আর বয়সও বয়ে যাচ্ছে না।

গৌরহরি একটু চিন্তিত হলেন। বললেন, তুমি কখনও আমার মতের বিরুদ্ধে মত দাও না। এবার যখন দিলে তখন ভাবতে হবে। চট করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না।

গৌরহরিকে যতই স্বাধিকারপ্রমত্ত এবং খেয়ালি বলে মনে করুক অন্য লোক, পারুল জানে, তার বিবেচনাশক্তি বড় কম ছিল না।

বলাকা বললেন, ওগো, তুমি আবার আমার কথায় কিছু মনে কোরো না। পাত্র ভাল স্বীকার করছি। কিন্তু ওরা আবার বাঙাল দেশের লোক, সেটাও একটু ভেবে দেখো।

গৌরহরি চিন্তিত মুখে বললেন, সবই ভেবেছি। আবার ভাবব। চট করে কিছু করব না। কিন্তু বলাই, একটা জিনিস ভেবে দেখেছ?

কী গো?

এমন পরিবার কি আজকাল খুঁজে পাবে যারা বংশানুক্রমে ছেলের বিয়েতে পণ নেয় না?

সেটা পাওয়া মুশকিল। কিন্তু আমাদের তো টাকার অভাব নেই। পণ দিয়ে যদি ভাল পাত্র পাওয়া যায়, না হয় দিলুম পণ!

গৌরহরি হাসলেন, বেশ বললে বলাই, বেশ বললে। পণ দিলে যদি ভাল পাত্র পাওয়া যায়! কিন্তু ভেবে দেখেছ কি যারা পণ নেয় তাদের কিছুতেই ভাল বলা যায় না?

ওটা যে রেওয়াজ।

মৃদু মৃদু মাথা নেড়ে, সহাস্যে গৌরহরি বলেন, রেওয়াজ নয়, রেওয়াজ নয়। করাপশন-যখন ছড়িয়ে যায় তখন সেটাকে কাস্টম বলে মেনে নেওয়া যে ভয়ংকর রকমের অন্যায়।

বলাকা একটু ভয় পেলেন। দুঁদে উকিলের সঙ্গে পেরে ওঠা তাঁর কর্ম নয় বুঝে বললেন, পণ ছাড়াও কি পাত্র জুটবে না?

জুটবে। চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। দেখছি চেষ্টা করে।

তুমি রাগ করলে না তো!

না। বলছি, মেয়েটার ভালমন্দ বিবেচনা করার অধিকার তো আমার চেয়ে তোমার কম নেই। এক্ষেত্রে আমার মতামত জোর করে চাপানো ঠিক হবে না।

বিশ্বনাথকে তোমার কি খুব পছন্দ?

সে কথা থাক বলাই। আমি আর তার কতটুকু জানি? সৎ হওয়াটাই বড় কথা নয়, অন্যান্য ব্যাপারও দেখা উচিত। এইজন্যই তো বলে, লাখ কথা ছাড়া বিয়ে হয় না।

বিশ্বনাথ এরকম বাতিলই হয়ে গেল সেদিন।

বুড়ো ঘটক সর্বানন্দ ভট্টাচার্য তখনও বেঁচে। এ সম্বন্ধ তাঁরই করা। তিনি একদিন বলাকার সঙ্গে এসে দেখা করে বললেন, মা, এ সম্বন্ধ তোমার পছন্দ নয় বলে শুনলাম।

বলাকা ঘোমটা দিয়ে আড়াল থেকে বললেন, ছেলে যে কালো।

সর্বানন্দ হাসলেন। সত্তর বছর বয়সেও ঝকঝকে দাঁত। সুঠাম চেহারা। বললেন, তাই তো মা! বামুন কালো হলেই গেরো! তবে কিনা সব ক্ষেত্রেই কিছু ব্যতিক্রম থাকে। তা হলে মা, মুগেবেড়ের ছেলেটার কথা ভেবে দেখো। কুলীন, ফর্সা, যেমনটি চাও তেমন।

কী করে?

পড়তি জমিদার। ছেলে ফেলনা নয়। ডাক্তার।

তবে তো ভালই কাকা।

হ্যাঁ। ভাল। দেখো, কথা কয়ে। আমি গৌরহরিকেও বলেছি। পাত্র অপছন্দের নয়।

পণ দিতে ওঁর তো খুব আপত্তি। এরা কি পণ চায়?

তা এখনও কিছু বলেনি। কথা এগোলে বোঝা যাবে।

মুগবেড়ের পাত্রের নাম সায়ন্তন। চেহারা ভাল, ডাক্তারি পাস, জমিদারের ছেলে। আর কী চাই!

তরতর করে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। হ্যাঁ, পণের ব্যাপার একটু ছিল তবে ঠিক পণও বলা যায় না। পাত্রের বাবা মেয়ে দেখে পছন্দ করে আর পাঁচটা কথার পর দেনা-পাওনার প্রসঙ্গ উঠতে বললেন, পণ-টন নয়। তবে আমাদের অবস্থা এখন পড়তি। ছেলের বিলেত গিয়ে এম আর সি পি করার প্ল্যান। ফিরে এসে বাড়িতেই নার্সিংহোম করবে। অনেক টাকার পাল্লা। যদি লাখখানেক টাকা ধার হিসেবে দেন তা হলে আমি বাকিটা সামলে নিতে পারব। এ টাকাটা আমরা ধীরে ধীরে শোধ দিয়ে দেব। চাইলে সুদও পাবেন।

গৌরহরি শান্ত গলায় বললেন, সায়ন্তনকে আমার স্ত্রীর খুবই পছন্দ হয়েছে। সে উপযুক্ত পাত্র। এক লাখ টাকা ধার হিসেবে নয়, যৌতুক হিসেবেই দেব। ও নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

ভদ্রলোক একটু ভাবিত হলেন, যৌতুক দেবেন!

দেব।

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমাদের আগের অবস্থা থাকলে এসব কথা উঠত না। অবস্থা বিপাকে পড়েই—ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছে।

ওঁরা চলে যাওয়ার পর বাড়িটা কিছুক্ষণ থমথম করেছিল, মনে আছে পারুলের। বলাকার মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি ছিল না। বকুলেরও মন খারাপ। ব্যাপারটা বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল যেন।

পরদিন সর্বানন্দ এলেন। বলাকাকে ডেকে বললেন, কেমন মা, সব দিক রক্ষে হয়েছে তো!

বলাকা হতাশার গলায় বললেন, মনটা ভাল নেই কাকা। এত টাকা দিয়ে বিয়ে!

তা মা, ভাল পাত্র চেয়েছিলে পেয়েছ। গৌরহরি টাকা কবুল করেছে, পুরুষের মতোই কাজ করেছে।

কিন্তু কাকা, ওঁরা তো ধার হিসেবেই চেয়েছিলেন। উনিই যৌতুক দিতে চাইলেন।

সর্বানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বিয়ের শুরুতেই একটা ধারকর্জের সম্পর্ক কি ভাল লক্ষণ মা? শুভ কাজে ঋণ সুলক্ষণ নয়। তার চেয়ে এই তো ভাল হয়েছে।

আমার খারাপ লাগছে। উনি হয়তো আমার ওপর একটু রাগ করেই কাণ্ডটা করলেন।

সর্বানন্দ মাথা নেড়ে বললেন, তা নয় মা, তা নয়। গৌর তোমার ওপর রাগ করেনি। সেও ধারকর্জের মধ্যে যেতে চাইল না, উকিল মানুষ তো, মানুষ চরিয়ে খায়। মনুষ্য চরিত্র ওরা খুব বোঝে। ধর, ধার দিলে যদি ওঁরা শোধ দিতে না-পারেন বা ইচ্ছে করেই শোধ না-দেন তখন গোলমাল বেধে উঠতে পারে। আত্মীয়—কুটুম মানুষ তাঁরা, মামলা-মোকদ্দমাও করা যাবে না, ঝগড়া বিবাদ করলেও বিপদ। তিক্ততা যাতে না ঘটে তার জন্যই গৌরহরি গোড়া মেরে রাখল। ভালই হল, তোমার মেয়েরও খানিক হক থাকবে। শ্বশুরবাড়িতে মাথা উঁচু করে থাকতে পারবে।

আমার স্বামী কখনও টাকাকে টাকা মনে করেন না। ওইটেই ওঁর দোষ। যেখানে তিন টাকায় হয় সেখানে উনি তিনশো টাকা দিয়ে বসেন।

সর্বানন্দ ফের হাসলেন। বললেন, গৌরহরি কাঁচা মানুষ নয় মা। মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবেই সে টাকাটা দিতে রাজি হয়েছে। পুরনো জমিদারবাড়ি তো! তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনেক ঝুল ময়লা পোকামাকড় থাকে যে! অনেক প্রথা আছে, সহবত আছে, সেসব মেনে চলার হ্যাপা আছে। তোমার মেয়ে সব সয়ে-বয়ে নিতে যদি না পারে মা? টাকাটা সেই ব্যাপারে কাজ দেবে। মেয়ের দোষঘাট আর তত দেখবে না কেউ। কাজটা গৌরহরি ঠিকই করেছে।

সম্বন্ধটা কি ভাল হল বলে আপনি মনে করেন?

ভাল মানে! খুব ভাল। পাঁচজনকে বুক ফুলিয়ে বলার মতো সম্বন্ধ।

আমারও তাই মনে হচ্ছিল। এখন যেন মনটা কেমন আড় হয়ে আছে।

ওসব নিয়ে ভেবো না। কথা পাকা হয়ে গেছে। বিয়ের তোড়জোড় শুরু করে দাও।

পারুলের মনে আছে বিয়ে পাকা হয়ে যাওয়ার পর তার দিদি বকুল যেন কেমন মনমরা হয়ে গেল। বলতে লাগল, আমার বিয়ে দিয়ে বাবা তো সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। এ বিয়েতে আমার সুখ নেই।

সবাই তাকে বোঝাতে লাগল।

দুই বোন তখন এক খাটে শোয়। এক রাতে বকুল বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছিল।

পারুল বলল, দিদি, কাঁদছিস কেন? এ মা, বিয়ে হবে, এখন কেউ কাঁদে?

আমার ইচ্ছে যাচ্ছে না রে। এ বিয়ে ভাল হবে না।

কেন? জামাইদা দেখতে কেমন সুন্দর, ডাক্তার, বড়লোক—আর কী চাস তুই?

সে আমি জানি না। আমার ভাল লাগছে না।

এক লাখ টাকা নগদ দিয়ে ক্ষান্ত হবেন না বলে গৌরহরি সোনা-দানা, দানসামগ্রীরও বেশ এলাহি আয়োজন করতে লাগলেন।

বলাকাকে বললেন, এক লাখ টাকাটা তো ওরা পাবে। আমার মেয়ে তো পাবে না। তার হাতে কী থাকবে বল! গয়নাগুলোই হবে তার অ্যাসেট।

বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!

তা যোক বলাই, তা হোক। এই আমার প্রথম মেয়ের বিয়ে। একটু পাগলামি করতে দাও।

পাত্রপক্ষ কি জানে যে, তুমি এতসব দিচ্ছ?

জানবে না কেন? সর্বানন্দ ঘটক রীতিমতো তাদের সব খবর পৌঁছে দিচ্ছে।

তারা কি খুশি?

খুশি না হওয়ার কী আছে?

বলাকা আর কিছু বললেন না। শুকনো মুখে উঠে গেলেন।

বিয়ের বোধহয় সাতদিনও তখন বাকি নেই, হঠাৎ এক মধ্যরাতে পারুলের ঘুম ভেঙে গেল বকুলের ধাক্কায়।

কী রে দিদি?

চুপ। আয় আমার সঙ্গে।

কোথায়?

পাশের ঘরে মা-বাবার কথা হচ্ছে। চল শুনি।

এঃ মা।

আয় না।

পিঠোপিঠি না হলেও তাদের দুই বোনের ভাব ছিল সাংঘাতিক। ভীষণ বন্ধুর মতো। কোনও কথাই গোপন থাকত না তাদের মধ্যে।

চুপি চুপি দুই বোন উঠে পাশের ঘরের দরজায় কান পাতল।

বলাকা বলছিলেন, আমার ঘাট হয়েছে তোমার কথা না-শুনে। বরাবর দেখে আসছি তুমি যা বল, ঠিকই বল। আমিই বারবার ভুল করে ফেলি।

তা কেন বলাই? আমি তোমার ওপর তো নির্ভরই করি। করি না বললা! যদি জানতাম তুমি বিচক্ষণ নও তা হলে কি নির্ভর করতাম। না, তা নয়। আমি তোমার মতো সাংসারিক বুদ্ধি রাখি না। আমি আমার ছেলেমেয়ের মানসিকতারও খোঁজ রাখি না। এসব ভালমন্দ বিচার করার ভার আমি তোমার ওপরেই দিয়ে রেখেছি।

তোমার পায়ে পড়ি, এ বিয়ে ভেঙে দাও।

সে কী বলছ বলাই! এখন বিয়ে ভাঙা কি সম্ভব?

কেন নয়?

এতদূর এগিয়ে কি পিছোনো যায়?

আর কেউ না পারুক, তুমি ঠিক পারবে বুদ্ধি করে বিয়েটা ভেঙে দিতে। ওগো, দশটা গাঁয়ের লোক যে তোমার বুদ্ধি-পরামর্শ নিতে আসে সে কি এমনি?

কিন্তু বিয়ে ভাঙতে চাইছ কেন?

তুমি যখন টাকাটা যৌতুক হিসেবে দিতে চাইলে তখন ভদ্রলোক একবারও আপত্তি করলেন না, মনে পড়ে?

খুব পড়ে।

ওখানেই আমার খটকা। ভদ্রলোক হলে অন্তত একবার আপত্তি করত।

দুনিয়াটা চিনলে না বলাই। শতকরা নিরানব্বই জনই তো ওরকম। কাকে ফেলে কাকে বাছবে।

না বাপু, আমার মন সায় দিচ্ছে না।

তা হলে আর মনমতো পাত্র পাবে কোথায় বললা! পাত্র তো অনেক দেখলাম। সবাই কিছু না কিছু প্রত্যাশা করেই। কারও খাঁই বেশি, কারও কম। কারও চোখের চামড়া নেই, কেউ রয়ে-সয়ে চায়। কিন্তু চায় তো সকলেই। কী করবে বলো!

তোমার সেই বিশ্বনাথের কী হল?

বাঃ বলাই! সে যে কালো বলে বাতিল হয়েছে।

সে তো শুধু কালো, আর তো কিছু নয়।

না। উদ্বাস্তু পরিবার। তবে শিক্ষিত। খেটে খায়। তাদের গুণ ওইটুকুই।

তাকেই দেখো না আবার।

সেখানে তো একরকম অমত জানিয়েই দেওয়া হয়েছে। এখন কী আর—

তোমার চোখ বড় একটা ভুল করে না গো। তুমি যখন তাকে পছন্দ করেছ তখন সে ভালই হবে। দেখো না গো একটু।

ভাল করে ভেবে দেখ বলাই।

ভাল করেই ভেবেছি।

তারা কিন্তু দানসামগ্রীও নেবে না। বিশ্বনাথের বাবা সাফ বলেছে, জিনিসপত্র সোনা-দানা রাখার জায়গা তাদের নেই। এসব তারা নেবে না।

তোমার পায়ে পড়ি।

ঠিক আছে বলাই, তোমার কথা আর কবে ফেলেছি?

কালো, কিন্তু কেষ্টঠাকুরের মতো কমনীয় মুখশ্রীর ভালমানুষ বিশ্বনাথ লাজুক মুখে যেদিন বিয়ে করতে এল সেদিনই তাকে খুব ভালবেসে ফেলল পারুল।

বিশুদা তার এগারো বছর বয়সি শালিটিকে বাসরঘরে একটাই মাত্র ইয়ার্কির কথা বলেছিল, আগের দিনে বিয়ে করলে শালি ফাউ পাওয়া যেত, জানো?

শুনে কী যে রোমাঞ্চ হয়েছিল পারুলের। ওই বয়সটাই অমনি।

তারপর সারাক্ষণ জামাইদার সঙ্গে লেগে লেগে ছিল সে। কী ভাল! কী নরম কথাবার্তা, কী লজ্জাশরম!

সেই বিশুদা এখন প্রবীণ এক মানুষ! চুল পেকেছে কিছু, গোঁফেও পাক। শোনা যায় তিনি বড় চাকরি করলেও তেমন সচ্ছলতা অর্জন করতে পারেননি। এখনও তাঁর বাড়িতে শৌখিন জিনিস দেখা যায় না। বকুলের গায়ে গয়না ওঠেনি, তার আলমারি ভর্তি শাড়ি নেই, যথেচ্ছ খরচ করার মতো টাকাও তারা হাতে

পায় না। তাদের দুটি ছেলেই লেখাপড়ায় ভাল, এইটুকুই যা সান্ত্বনা। বড়টি এখন চল্লিশ হাজার টাকা মাইনের চাকরি করে।

না, বিশ্বনাথ জাগতিক অর্থে একজন সফল মানুষ নয়। কিন্তু এই মানুষটাকে শ্রদ্ধা করতে কখনও পারুলের অসুবিধে হয়নি।

বিশুদা, আমি আপনার সঙ্গে আমার বাবার স্বভাবের খুব মিল পাই, তা জানেন?

বিশ্বনাথ একটু হাসল। তারপর বলল, তা একটু আছে বোধহয়।

কী মিল বলুন তো!

সেটা তোরা ভেবে বলবি। আমার কেন যেন গৌরহরি চাটুজ্জেকে খুব পছন্দ হত। বিয়ের আগেই বউয়ের চেয়ে শ্বশুরের প্রতিই আমার আকর্ষণ হয়েছিল বেশি, তাই বিয়ে করতে আপত্তি করিনি।

বকুল বলল, বাবা তোমাকে ভালবাসত খুব। বলত, বিশ্বনাথের মতো ছেলে হয় না। এ মা, ওই দেখ তোমার নাম এনে ফেললাম! কী হবে!

গঙ্গাজল খাও।

তিনজনে একটু হাসাহাসি হল।

পারুল বলল, পতির নামে গতি। অত ভাবছিস কেন?

বিশ্বনাথ স্নিগ্ধ চোখে পারুলের দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ রে, পারুল, তোকে একটা কথা বলব?

বলুন না।

ভাবছি, তুই আবার টেনশনে না-পড়ে যাস।

কীসের টেনশন?

অমলকে তুই শেষ অবধি কেন বিয়ে করিসনি তা জানি না। তাই জিজ্ঞেস করছি, অমলের কি কিছু দোষ ছিল?

পারুল একটু গম্ভীর হয়ে বলে, দোষ না থাকলে তাকে বাতিল করলাম কেন বিশুদা?

কিন্তু কী জানিস, অমলকে সেদিন রাস্তায় দেখে খুব মায়া হল। কেমন উদাস, উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, গায়ে ধুতির খুঁট জড়ানো। আমাকে অবশ্য চিনতে পারেনি। কী ব্যাপার কিছু জানিস?

না। তবে ওদের বোধহয় কিছু প্রবলেম আছে।

পরশু দিন সন্ধেবেলায় বেগুনক্ষেতের ওপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে এ—বাড়ির দিকে চেয়ে ছিল। আমি একটু চিন্তায় পড়লাম। ভাবলাম, সেই পুরনো প্রেম থেকে আবার পাগলামি দেখা দিচ্ছে না তো!

চেয়ে ছিল?

হ্যাঁ।

চেয়ে থাকার তো কিছু নেই। অনায়াসে এ—বাড়িতে আসতেই তো পারে।

সেটাই স্বাভাবিক হত। দূর থেকে চেয়ে থাকাটা ভাল লক্ষণ নয়। তুই একটু সাবধানে থাকিস।

পারুল হেসে ফেলল, কেন বলুন তো! আপনার কি ধারণা অমল রায় এখনও আপনার প্রৌঢ়া শালিটির প্রতি দুর্বল?

ওরে পাগলি, তুই প্রৌঢ়া হলে আমি তো ভবলীলাই সাঙ্গ করেছি। তোর চেয়ে আমি কত বড় জানিস?

জানি। উনিশ বছর।

তবে? যাক গে, তোকে জানিয়ে রাখলাম।

না বিশুদা, অমলদাকে আমিই আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে পাঠিয়েছি। কিন্তু বেচারা হয়তো এখন একটু লজ্জা পাচ্ছে। আসতে চেয়েও চক্ষুলজ্জায় আটকাচ্ছে। তাই হয়তো চেয়ে থাকে।

সিরিয়াস কিছু নয় বলছিস?

দুর! ওসব কবে চুকে-বুকে গেছে।

প্রেম-ট্রেমের কিছুই জানি না রে ভাই। আমার সব দৌড় তো ওই যে ওই উলবুনুনির কাছে গিয়ে গিয়ে শেষ হয়।

বকুল ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবছিল। হঠাৎ বলল, অমলকে আসতে বলেছিস কেন? ওর এখন না-আসাই ভাল। জ্যোতিপ্রকাশ যদি কিছু ভাবে?

পারুল হেসে বলল, তুই যেন কী দিদি! আমরা কি সেই আগের আমরা আছি না কি? ম্যাচিওরড হইনি? তা ছাড়া আমি তো আমার কর্তার কাছে কিছু গোপন করিনি। সব বলে দিয়েছি। সেও তো বিশুদার মতোই একজন সরল সহজ মানুষ। কিছু মনেই করেনি।

না বাবা, কী থেকে কী হয়ে যায়! তোর বড্ড সাহস পারুল।

ও মা, সাহসের কী?

ওই তো শুনলি, বাইরে থেকে চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকা কি ভাল?

অমলদার বয়স কত হল জানো?

পুরুষমানুষ সব বয়সেই খারাপ। বেশি বয়সে আরও খারাপ।

অমল ধরা পড়ে গেল পরদিন সন্ধেবেলায়। নানা আঘাটায় ঘুরে সে বেগুনক্ষেতটার বেড়ার ধারে এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ক্ষেতের ওপাশে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দোতলার আলো-জ্বলা ঘরটা দেখা যায়। যেন স্বপ্নের ঘর। রোজই কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে অমল। কাউকে দেখা যায় না। দেখতে চায়ও না অমল। কয়েক মিনিট সে তৃষিতের মতো চেয়ে থেকে ফিরে যায়।

আজ সে হয়তো একটু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ একটা সাইকেল কোথা থেকে সাঁ করে এসে তার কাছেই ব্রেক কষল।

এই, কে রে ওখানে?

অমল চমকাল না। ধীরে শুধু মুখটা ঘোরাল।

কে? এখানে দাঁড়িয়ে কী হচ্ছে?

অমল জবাব দিল না। ছেলেটা সাইকেল থেকে নেমে কাছে এল।

আরে! অমলদা?

অমল চিনতে পারল। বিজু।

এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন অমলদা?

এমনি। দেখছি। অনেকদিন বাদে এলাম তো!

আসুন না ভিতরে।

না থাক।

থাকবে কেন? আসুন। বড়মা খুব খুশি হবে।

চোদ্দো

পুরনো কৌটো-বাউটো ডাঁই হয়ে জমে আছে খাটের তলায়, তাকে, রান্না আর ভাঁড়ারঘরে। মায়াবশে কিছুই ফেলা হয়নি তেমন। কত কৌটো বহুকাল খোলাই হয়নি। কী আছে তার মধ্যে কে জানে বাবা। আমসি, শুকনো কুল, ত্রিফলা কি গোলমরিচ। কৌটোগুলো বিদেয় না করলেই নয়। খাটের নীচে মশার আড্ডা হয়েছে, পোকামাকড় বেড়েছে, ইঁদুরের খুটখাট বাড়ছে, বাড়ির বেড়ালটা এই নিয়ে তিনবার প্রসব করল বলাকার খাটের তলায়।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে বলাকা কৌটো নিয়ে পড়লেন। তা শ' দেড় দুই তো হবেই। নানা মাপ, নানা আকৃতির সব কৌটো, দু-চারটে সেই ইংরেজ আমলের জিনিসও আছে।

পুরনো, ভুলে-যাওয়া কৌটো খোলার মধ্যে একটি রহস্যরোমাঞ্চ আছে। কোন কৌটো থেকে কী বেরিয়ে পড়ে তা কে জানে! একবার একটা ওভালটিনের পুরনো কৌটোর মধ্যে হঠাৎ একছড়া সোনার হার পেয়েছিলেন বলাকা। বোধহয় কোনও কাজের মেয়ে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু নেওয়ার সময় পায়নি। সেই হারছড়া ছিল তাঁর মেজো জায়ের। পেয়ে সে কী আনন্দ!

দুখুরি কৌটো টেনে আনছে আর বলাকা একটা চ্যাপটা চাবির মুখ দিয়ে ভুটভাট শব্দে কৌটো খুলছেন। বেরোচ্ছেও জিনিস অনেক। একটা হালকা কৌটো না খুলেই বাতিল করতে গিয়ে কী ভেবে খুলে দেখলেন তার মধ্যে ঠাসা তেজপাতা। কবেকার কে জানে! আর একটা হালকা কৌটো থেকে তিনটে বঁধুলের ছোবড়া বেরোল। শ্বশুর-শাশুড়ি আর তিন ভাইয়ের যৌথ সংসারেই জমেছিল এসব। কিছু জায়েরা নিয়ে গেছে, কিছু পড়ে আছে।

ভাগাভাগির ব্যাপারটা কখনও ভাল চোখে দেখেননি বলাকা। গৌরহরি যখন তাঁর দুই ভাইয়ের অংশ বিপুল দামে কিনে নিয়েছিলেন তখন বলাকা রাগ না করে খুব আদুরে গলাতেই বলেছিলেন, ওগো, এত বড় বাড়ি দিয়ে আমরা কী করব? শ্বশুরমশাই তিন ছেলের জন্য তিনটে দালান করে গেছেন, আমাদের তো অকুলান হচ্ছিল না!

ভাইয়ে ভাইয়ে একটু তফাত থাকলে সম্পর্কটা ভাল থাকে।

সম্পর্ক কি খারাপ হচ্ছিল? কিছু তো বুঝতে পারিনি। বেশ তো ভাবসাবই ছিল সকলের।

তা ঠিক বলাই। বাইরের সম্পর্ক ভালই ছিল। কিন্তু হঠাৎ আমার রোজগারপাতি বেড়ে যেতে লাগল। তখন মনে হচ্ছিল শিবে আর রেমো কেমন যেন মুখ গোমড়া করে থাকছে। হয়তো হিংসে হতে লেগেছে। কাছাকাছি থাকলে ক্রমে ক্রমে ওটা বেড়ে যেত। তাই গোড়া মেরে রাখলুম।

কিন্তু মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেরা বাইরে থাকে, এত বড় বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে যে গো!

অভ্যেস হয়ে যাবে বলাই, ধৈর্য ধরো।

খেয়ালি পুরুষটির সব সিদ্ধান্তের উচিত-অনুচিত আজও বুঝতে পারেন না বলাকা। মন মানতে চায়নি তবু গৌরহরি যা বলেছেন তা বরাবরই মেনে নিয়েছেন বলাকা। মানুষটা তাঁর চেয়ে পনেরো বছরের বড়, ইয়ারবন্ধু তো নয়। বরং যেন খানিকটা বাবার মতোই এক অভিভাবক।

পুরনো কৌটোর অন্ধকারে সেকেলে বাতাস জমে আছে আজও। মুখ খুললেই ভ্যাপসামতো গন্ধ। বলাকার বেশ লাগে। কত বছরের সঞ্চিত বাতাস তার মুখে এসে লাগে। গা সিরসির করে।

কৌটোয় কী খুঁজছ মা? পয়সা?

বলাকা হেসে ফেলেন, হ্যাঁ, পয়সাই খুঁজছি। পেলে তোকে দেব।

আমি সারা বাড়িতে কত পয়সা কুড়িয়ে পাই জান? সব একটা কৌটোয় জমিয়ে রেখেছি। ঝাঁট দিতে গেলেই পয়সা পাই।

স্মিতমুখে বলাকা বলেন, পয়সা জমিয়ে কী করবি?

তোমাকে একটা জিনিস কিনে দেব।

ওমা! আমাকে আবার কী জিনিস দিবি রে?

পয়সা জমিয়ে তোমাকে একটা মহাভারত কিনে দেব। সেদিন যে বলছিলে তোমার মহাভারতখানা কে যেন নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেয়নি!

ও বাবা! তাও মনে রেখেছিস! দিতে যে চেয়েছিস সেই ঢের। ওতেই তোর দেওয়া হয়েছে।

একটা কৌটোর মধ্যে কিছু খুচরো পয়সা পেলেন বলাকা। কেউ বোধহয় জমাতে শুরু করেছিল, বেশি পারেনি। মোট পাঁচ টাকা চল্লিশ পয়সা। বলাকা পয়সাটা দুখুরির হাতে দিয়ে বললেন, তোর কৌটোয় জমিয়ে রাখিস।

নীচের উঠোনে নিত্যানন্দ বসে আছে। সঙ্গে দুই ছেলে আর পাঁচখানা বস্তা।

দুখুরি বারান্দায় গিয়ে ডাক দিল, এসো গো, কৌটো নেবে যে!

নিত্যানন্দ ওপরে উঠে এল।

বলাকা বললেন, এই নে বাবা, কতগুলো জমেছে দেখ।

নিত্যানন্দ কাঁচুমাচু হয়ে বলে, ওসব পুরনো কৌটো মা, দশ-বিশ পয়সাতেও বিকোবে না।

দুর মুখপোড়া! তোর কাছে পয়সা কে চেয়েছে। এগুলো বিদেয় কর আগে। পয়সা লাগবে না।

নিত্যানন্দ একগাল হাসল। তারপর ছেলেদের ডেকে নিয়ে টপাটপ বস্তায় কৌটো ভরতে লাগল।

কৌটোগুলো বিদেয় হওয়ায় খাটের তলায় এখন হাওয়াবাতাস খেলছে, ঘরটাও হালকা দেখাচ্ছে।

বলাকা ঘরের আলমারি আর আসবাবগুলো দেখছিলেন। তাঁর এত লাগে না। ধীরে ধীরে বাহুল্য জিনিসগুলো বিদেয় করে দেবেন। জিনিস বিক্রি করা খুব অপছন্দ করতেন গৌরহরি। বলাকা বিক্রি করবেন না। বিলিয়ে দেবেন। তবে তার আগে ছেলেমেয়েদের মতামত নিতে হবে। ওরা যদি চায় তো ভাল, নইলে নেওয়ার লোক মেলা পাওয়া যাবে।

তুমি কি বাঁধন কাটতে চাইছ মা?

বলাকা হেসে বললেন, আমাকে নিয়ে তোর এত ভয় কেন বল তো পারুল?

পারুল মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার হাবভাব আমার মোটেই ভাল লাগে না। এবার তোমাকে আমি জামশেদপুর নিয়ে যাবই। চোখের আড়ালে তুমি কী করে বসবে তার ঠিক নেই।

ও কথা বলছিস কেন? আমি তো বেশ আছি।

তুমি যেন কেমন উদাসী হয়ে গেছ।

দুর পাগল! উদাসী হওয়ার কি জো আছে? তোর বাবা চলে যাওয়ার পর দুনিয়াটা কেমন পানসে হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, মনে হত বেশিদিন বাঁচব না।

তুমি বাবার সঙ্গে সহমরণে যেতে চেয়েছিলে মা। আমার সব মনে আছে।

বলাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সে আর তোরা যেতে দিলি কই? গেলেই যে বাঁচতুম। তাকে ছাড়া যে বেঁচে থাকা কী কঠিন তোরা বুঝবি না।

খুব বুঝি মা। আর বুঝি বলেই ভয় পাই। সংসার থেকে তুমি যেন তোমার মন গুটিয়ে নিচ্ছ।

পারুলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলাকা বলেন, তা যদি পারতুম তাহলে তো ভালই হত। মন তুলে নিই সাধ্যি কি? ওই যে দুখুরি— ওটার জন্য নতুন করে মায়ার বাঁধনে পড়লুম, গোরু, কুকুর, বেড়াল, এই বাড়ি, কাজের লোকেরা কার জন্য মায়া না করে পারি বল? মন তুলে নেওয়া কি সোজা কথা? আর তোর বাবার আক্কেল দেখ, এত বড় একখানা বাড়ি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছে। তাও দেওররা, জায়েরা থাকলে একটু জনমনিষ্যি থাকত। সারাদিন এই বিশাল বাড়িটায় থাকা কি সোজা?

তাই তো বলি আমার কাছে চলো।

এ-জায়গা ছেড়ে দুনিয়ার আর কোথাও গিয়ে থাকতে মন চায় না। শীতকালে গিয়ে দু-চারদিন থেকে আসবখন।

বলাকাকে নিয়ে যেতে চায় সবাই। তারা ভাবে, এখানে একা পড়ে থাকা মায়ের পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু সেটা ওদের দিক থেকে ভাবা। বলাকার দিক থেকে ভাবনা অন্যরকম।

এই যে দুধের মতো সাদা গোরু আলো। দুখানা মায়াবি চোখ দিয়ে যখন চেয়ে থাকে বুকটা উথলে ওঠে। গৌরহরির প্রিয় এই গোরুটা এমন ভালবাসত তাকে যে গৌরহরি এসে গায়ে হাত দিয়ে না দাঁড়ালে দুধ ছাড়তে চাইত না। গৌরহরি চলে যাওয়ার পর কী বুঝল কে জানে, খুব ডাকত সারা দিন। দুখানা চোখ যেন টলটল করত। অবোলা জীবের সেই শোক যেন বলাকাকেও আচ্ছন্ন করেছিল। বলাকা গিয়ে রোজ আলোর গলায় মাথায় হাত বোলাতেন। মানুষের ভাষায় কত কথা বলতেন। গোরুর তা বুঝতে পারার কথা নয়। কিন্তু যেন বলাকার মনে হত আলো সব বুঝতে পারছে। ধীরে ধীরে যেন আলোর শোক কমে গেল। বলাকা নতুন মায়ার বন্ধনে পড়লেন। আসলে নতুন নয়, গৌরহরির প্রিয় যা-কিছু সেগুলিকে ভালবেসে যেন গৌরহরির অস্তিত্বই ফের খুঁজে পান বলাকা। আজকাল তাঁর মনে হয়, না, মানুষ অত সহজে মরে না। মরার পরও তার কত কী থেকে যায়। অস্তিত্ব কি শুধু দেহটাতে? তার সত্তাও যে ছড়িয়ে থাকে কত কিছুর মধ্যে!

এসব গূঢ় সত্য সবাই কি বুঝতে পারে? ছেলে-মেয়েরা ভাবে মা বড় একা। ওটা একপেশে দেখা। গৌরহরি যেদিন চলে গেলেন সেদিন তাঁর সঙ্গে বলাকারও চলে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তার পর ধীরে ধীরে তিনি ফের নানা অনুষঙ্গে ফিরে পাচ্ছেন গৌরহরিকে। এখন তাঁর একাকিত্ব তত তীব্র নয়।

ওই যে স্টিলের আলমারিটা, ওটা নিবি পারুল? তোর বাবা বোম্বে থেকে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছিল। সিকিম জিনিস, এত দিনেও একটুও রং চটেনি।

পারুল হেসে বলে, থাক না মা এসব তোমার কাছে। যেখানে যা আছে সব একইরকম থাক। তাহলে বাড়িতে এসে অচেনা ঠেকবে না কিন্তু, ছেলেবেলাটা ফিরে আসবে। না মা, তুমি সব বিলিয়ে দেওয়ার মতলব ছাড়।

কী ভাবি জানিস? আমি পট করে মরে গেলে—

নরম হাতে বলাকার মুখ চাপা দিয়ে পারুল বলে, জানি তুমি মরার জন্য পা বাড়িয়েই আছ। ওসব চিন্তা কর বলেই সারাক্ষণ তোমার জন্য আমার ভাবনা হয়। মরতে চাও কেন মা? বাবা নেই বলে? আর এই যে আমরা আছি আমরা কি বাবার অংশ নই? পিতা তো জায়ার ভিতর দিয়েই ফের জন্মায় সন্তান হয়ে। জান?

মরতে চাই কে বলল? তা নয় মা, আসলে আট-দশটা আলমারি, বাক্স- প্যাঁটরা সবই প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। এগুলো পড়ে থেকে—

থাক মা, পড়েই থাক।

বলাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, নিলে তোদের ভোগে লাগত।

এখনও ভোগেই লাগছে। এই যে বাড়িতে এলে বাক্স-প্যাঁটরা, আলমারি, খাট-পালঙ্ক দেখতে পাই তাতেই মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। সেটা কি উপভোগ নয়? ভোগ মানে কি আলমারিটাতে ঠেসে জিনিসপত্র ভরে রাখা?

বলাকা হার মানলেন।

সারা বাড়িতে এখন আনন্দের হাট। মেয়ে-জামাই, ছেলে-বউমা, নাতি-নাতনি মিলে সারাদিন আড্ডা হচ্ছে, বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে, পিকনিকেরও তোড়জোড় চলছে। বলাকা দূর থেকে এসব খুব উপভোগ করেন। বড় একটা ওদের মধ্যে গিয়ে পড়েন না। তাতে বোধহয় তাল কেটে যায়। ওদের একটা বয়সের বন্ধুত্ব আছে, সেখানে গুরুজনদের গিয়ে হুট করে ঢুকতে নেই। ডাকলে আলাদা কথা।

আজ সকালে দুটো ভাড়া করা গাড়িতে বোঝাই হয়ে ওরা কাটোয়ার দিকে কোথায় যেন পিকনিকে গেল। বলাকাকেও টানাটানি করেছিল, বলাকা যাননি। তবে দুখুরিটাকে পাঠিয়েছেন। বেচারা সারাদিন তো তাঁর কাছেই পড়ে থাকে, যাক আজ একটু আনন্দ করে আসুক।

দুপুরবেলা চুপিসাড়ে মেয়েটা এল। ঠিক চোরের মতো। মুখে একটু ভয় মেশানো হাসি। পরনে সেই ঝ্যালঝ্যাল পোশাক। সাজগোজের বালাই নেই।

বলাকা দুপুরে ঘুমোন না। সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে টুকটাক কাজ করেন। কাজ না পেলে শুধুই ঘুরে বেড়ান বা বই পড়েন। একা থাকা তাঁর অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

দুপুরে আজ বলাকা উঠোনে চাটাই পেতে শীতের লেপ—কম্বল রোদে দিয়েছেন। কাক-টাক যাতে এসে বসতে না পারে তার জন্য হাতে গৌরহরির হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা লাঠিটা নিয়ে বসে আছেন। কাক-শালিক এসে কাছাকাছি হুটোপাটি করলেই বলছেন, হুশ্।

এ-বাড়ির কাক-শালিকগুলোও তাঁর চেনা। রোজই ঘুরে ফিরে আসে। বলাকার হাতে লাঠি হলেও চোখ জুড়ে মায়া। ওরাও তো জন। নিঃসঙ্গে সাথী।

আমি একটু আসতে পারি?

উঠোনে ঢোকার আগলটার বাইরে মেয়েটা দাঁড়িয়ে।

ও মাঃ! এসো ভাই, এসো!

মেয়েটা সসংকোচে ঢুকল।

ওই মোড়াটা টেনে এনে আমার কাছে বোসো।

লক্ষ্মী মেয়ের মতো মেয়েটা বসল।

আজ এলে! আজ যে বাড়ি ফাঁকা! তোমার বান্ধবী পান্নাও গেছে ওদের সঙ্গে পিকনিক করতে।

জানি। আমি তো আপনার কাছে এসেছি, আর কারও কাছে নয়।

কী ভাগ্যি আমার! তোমার বয়সি মেয়েরা আজকাল আর আমার মতো বুড়ির কাছে আসতে চায় না। জেনারেশন গ্যাপ না কী বলে যেন ছাই।

সোহাগ একটু হাসল। তারপর বলল, আপনারা খুব হ্যাপি ফ্যামিলি, তাই না?

বলাকা ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, এটা একটা আশ্চর্য কথা বললে! আমি তেমন করে ভেবে দেখিনি কখনও। কিন্তু সত্যিই বোধহয় আমাদের হ্যাপি ফ্যামিলি। তেমন কোনও সমস্যা নেই। ঝগড়াঝাটি নেই। বউমারা খারাপ নয়, জামাইরাও ভাল। আমার দুঃখ নেই।

মেয়েটা তাঁকে খুব অবাক করে দিয়ে বলল, কিন্তু হ্যাপিনেস কি সবসময়ে ভাল?

ওমা! বলে কী গো মেয়েটা! হ্যাপিনেস ভাল নয় বুঝি?

সোহাগ মলিন মুখ করে বলে, আমি তো একটু পাগল, তাই আমার মাথায় খুব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আসে।

কী কথা?

কেন যেন মনে হয়, খুব হ্যাপি হওয়া ভাল নয়।

কে বল তো!

তাতে মানুষের সার্চ কমে যায়, সে অলস হয়ে পড়ে, তার মন ঘুমিয়ে পড়ে।

বলাকা একটু অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর মৃদু স্বরে বলেন, মানুষ তো সুখী হতেই চায়, আর সেটা চায় বলেই তো সে কত পরিশ্রম করে, কষ্ট করে। তাই না? তোমার কি মনে হয় আমার মন ঘুমিয়ে পড়েছে?

মেয়েটা খুব লজ্জার হাসি হাসল, কিন্তু জবাব দিল না।

বলাকা বললেন, সুখ তো এমনিতে আসেনি। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে তার জন্য। সব সময়ে তো আর সুখে থাকিনি।

মেয়েটা কিছু বলল না, সামনের দিকে চেয়ে বসে রইল।

তুমি কী বল? অসুখী হওয়াই ভাল?

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে, জানি না। আমরা তো ভাল নেই। আমরা খুব আনহ্যাপি।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। আমাদের পরিবারের মধ্যে সবাই সবার অ্যান্টি।

সে কী! তা কেন?

জানি না। ওইরকমই হয়ে গেছে।

এরকম হওয়া তো উচিত নয় ভাই।

আমার খুব মনে হয়, আমি অন্য কোনও ফ্যামিলিতে জন্মালে খুব ভাল হত।

তুমি তোমার মা-বাবাকে ভালবাস না?

কী জানি! ভালবাসা ব্যাপারটাই তো বুঝতে পারি না। শব্দটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগে।

মা বাবাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয় না?

না। একটুও না। আমার তো সব সময়ে কোনও নির্জন জায়গায় পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

বলাকা একটু ভেবে সন্তর্পণে বললেন, অমল কত ভাল চাকরি করে। তোমার মাও তো অনেক পাস—টাস শুনেছি। অমল ছেলেও তো খুব ভাল। তাহলে তোমার এরকম মনে হয় কেন?

বোধহয় আমিই স্বাভাবিক নই।

আমার তো কখনও তা মনে হয়নি! তোমাকে আমার বেশ লাগে। সাজগোজ নেই, নিজের প্রতি বিশেষ নজর নেই, চুলটা অবধি ভাল করে আঁচড়াও না কখনও। বেশ তো সরলসোজা মেয়ে তুমি।

সাজতে আমার ভাল লাগে না। কী হবে সেজে?

এ তো বুড়ো বয়সের প্রশ্ন। তোমার বয়সে কি এরকম কেউ ভাবে?

আমি বোধহয় মনে মনে বুড়োই হয়ে গেছি।

দুর পাগল!

আমি একটা কথা বলতে এসেছি।

কী কথা?

এই গ্রামে কতগুলো ছেলে মাঝে মাঝে আমাকে টিজ করে।

তাই নাকি?

সব জায়গাতেই এসব একটু-আধটু হয়। আমি মাইন্ড করি না। আমি কাউকে ভয়ও পাই না।

কিন্তু টিজ করবে কেন? দাঁড়াও, আমি বিজুকে বলে দেবোখন।

আমি সে কথাটাই বলতে এসেছি।

বিজুকে বলার কথা তো!

না, বিজুকে বারণ করার কথা।

ওমা! কেন?

সেদিন পান্নার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, তখন ওর সামনেই কতগুলো ছেলে আমাকে টিজ করেছিল। পান্না বলেছিল, ওর দাদা বিজুকে বলে ওদের টিট করে দেবে। আমি বারণ করেছিলাম। কিন্তু পান্না শোনেনি। ও ওর বিজুদাকে বলে দিয়েছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আর তার ফলে সেই ছেলেগুলোকে একটা ক্লাবের ছেলেরা এসে খুব মারে। মার দিয়েই হয়নি, ওদের নিয়ে এসে আবার আমার কাছে ক্ষমাও চাইয়েছে। আমার খুব খারাপ লেগেছে।

কেন, এ তো ভালই হয়েছে। ছেলেগুলো আর তোমার পিছনে লাগবে না।

এই ছেলেগুলো হয়তো আর লাগবে না। কিন্তু সেটা তো সলিউশন নয়। আমাকে তো সব জায়গায় কেউ প্রোটেকশন দেবে না। আর প্রোটেকশন আমি তো চাইও না। আমার খুব অপমান লেগেছে।

বলাকা হাসলেন, তুমি আজকালকার মেয়ে তো, তাই পুরুষদের প্রোটেকশন নিতে চাও না বোধহয়। কিন্তু ভাই, চিরকাল যে তাই হয়ে এসেছে।

আপনার কি মনে হয় না, এখন কিছু অন্যরকম হওয়া উচিত?

আমি পুরনো আমলের মানুষ, চিরকাল পুরুষের ছায়ায় বড় হয়েছি, আমি কি আর তোমাদের মতো করে ভাবতে শিখেছি?

সেই জন্যই কি আপনি এত হ্যাপি?

কী বলছ বুঝিয়ে বলল।

চিরকাল পুরুষের প্রোটেকশনে ছিলেন বলেই আপনার গায়ে কোনও আঁচ লাগেনি। এই প্রোটেকশন নেওয়াটাকে আপনার অপমান বলে মনে হয় না?

বলাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, পাগলি, প্রোটেকশন কি পুরুষেরও দরকার হয় না? না হলে এত পুলিশ, মিলিটারি, এত আইনকানুনের তো প্রয়োজনই থাকত না। প্রোটেকশন যে একটা ভীষণ দরকারি জিনিস। না বাপু, পুরুষমানুষের সাহায্য নিতে আমার তো কখনও অপমান লাগেনি।

কিন্তু প্রোটেকশন নেওয়ার অভ্যাস হয়ে গেলে কি মানুষ খুব নাবালক থেকে যায় না? বিপদ হলে একজন এসে বাঁচাবে এরকম ধারণা থাকলে মানুষের ডেভেলপমেন্ট কি ভাল হয়?

ও বাবা! ওসব যে শক্ত শক্ত কথা! তা ভাই, তোমার মতো করে আমি তো ভাবতে শিখিনি। কিন্তু স্বীকার করি, তোমার মতো করে ভাবাও বোধহয় খারাপ নয়। আজকাল তো পুরনো ধ্যানধারণা পালটে যাচ্ছে।

হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলল সোহাগ, বলল, হ্যাপিনেস মানেই কিন্তু সেন্স অফ. সিকিউরিটি। আমার কখনও বিপদ হবে না, কখনও অভাব হবে না, আমার সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে, আমাকে বাঁচানোর জন্য কিছু লোক সবসময়ে প্রস্তুত থাকবে, কেউ আমার নিন্দে করবে না! তাই না?

বলাকা ভারী অবাক হলেন। বললেন, তোমার বয়স কত?

আমি খুব পাকা, না? আমি সতেরো প্লাস।

না ভাই, তুমি মোটেই এঁচোড়ে পাকা নও। তোমার বেশ মাথা আছে।

তা কিন্তু নয়। পড়াশুনোয় আমি ডাব্বা। তবে আবোলতাবোল ভাবতে খুব ভালবাসি।

কিন্তু কথাগুলো তো খারাপ বললে না! সুখ ওটাকেই বলে বটে। হ্যাঁ গো মেয়ে, সুখী মানুষকে তোমার ঘেন্না হয় না তো?

জোরে মাথা নাড়া দিয়ে সোহাগ বলে, না তো! আমার তো আপনাকে ভীষণ ভাল লাগে।

বলাকা হেসে ফেললেন, আমাকে আবার সুখী মানুষের সর্দার ভেবো না। অত কি সুখ আমার! গাঁয়ে পড়ে আছি, শোকাতাপা মানুষ, নিঃসঙ্গ জীবন। যত সুখী ভাবছ ততটা নই। তবে দুঃখও তেমন কিছু খুঁজে পাই না। আসল কথা কী জান, সুখদুঃখের বোধটাই বোধহয় ভোঁতা হয়ে গেছে। সেও একরকম ভালই।

আমি আপনাকে হ্যাপি বলিনি। আমি বলেছি আপনাদের ফ্যামিলিটা খুব হ্যাপি। সবাই কেমন হাসিখুশি ডগোমগো। আপনি তো তা নন।

বলাকা একটু হাসলেন।

সোহাগ বলল, পান্নার কাছে শুনেছি আপনার হাজব্যান্ড মারা যাওয়ায় আপনি খুব ভেঙে পড়েছিলেন। সবাই ধরে নিয়েছিল আপনিও বেশিদিন বাঁচবেন না।

বলাকা স্মিতমুখে বললেন, অনেকে এখনও মনে করে আমি বেশিদিন বাঁচব না।

আপনি আপনার হাজব্যান্ডকে খুব ভালবাসতেন, না?

কী জানি ভাই, তোমার মতোই ভালবাসার তত্ত্ব আমারও জানা নেই। শুধু টের পেতুম, ও মানুষটা আমার শ্বাসবায়ুর মতো, বুকে ধুকপুকুনির মতো। সে ছাড়া নিজেকে ভাবতেই পারতাম না।

সেটা কী করে সম্ভব? ইগো নেই? স্বাধীন মতামত নেই? ব্যক্তিত্ব থাকবে না?

তাই তো! সেসব বোধহয় আমার ছিল না। আমি বোধহয় খুব বোকা ছিলাম। আর তার জন্যেই এতগুলো বছর তো দিব্যি হাসিমুখে কাটিয়ে দিতে পেরেছি। তোমরা কি পারবে?

মাথা নেড়ে সোহাগ বলে, না। আমি কখনও আপনার মতো হতে পারব না। আমি চিরকাল একজন আনহ্যাপি মেয়ে হয়ে থাকব।

পনেরো

যিশু এসে দাঁড়ালেন কদমগাছের তলায়। সন্ধিক্ষণ সমাগত। একটি আর্তনাদ শোনার জন্য অপেক্ষা করছে পৃথিবী। সেই আর্তনাদকে কোলাহলে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য ঢাক বাজছে। ঢাকি নাচছে।

ঈশ্বরপুত্র কখনও সুখী ছিলেন না। তিনি কখনও সুখী হবেনও না। সুখী হতে নেই তাঁর। বুকে দুহাজার বছরের পুরনো দীর্ঘশ্বাস নিয়ে তিনি কদমগাছের গায়ে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ছাগশিশুটি ঘাসপাতা খেতে খেতে মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাঁকে দেখছে।

"মণিরাম... মণিরাম, তুমি যেখানেই থাকো মূল মণ্ডপের সামনে চলে এসো, তোমার পিসিমা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। মণিরাম... আজ রাত নয় ঘটিকার পর সবুজ সংঘ আয়োজিত নাট্যাভিনয় নটীর পূজা — নটীর পূজা... যাঁরা অঞ্জলি দেবেন তাঁরা দয়া করে লাইন দিয়ে আসুন..."

যিশু চেয়ে আছেন। ছাগশিশুটি চেয়ে আছে। চোখে চোখ।

আমার অনন্ত ক্ষুধা প্রভু। ক্ষমা করুন।

ক্ষুধার কথা আমার মতো আর কে জানে বাছা। ক্ষুধা অনন্ত, তার কোনও নিবৃত্তি হল না আজও।

ক্ষুধা, ভয়, বংশবিস্তার ছাড়া আমাদের আর কী আছে প্রভু? বড় সামান্য এ জীবন।

জীবন সামান্য নয়। একটি জীবাণুরও জীবন এক আশ্চর্য ঘটনা, কত বিচিত্র অণু-পরমাণুর সমাহারে ওই শরীর রচিত হয় আর তার প্রকোষ্ঠে দীপাধারের মতো রহস্যময় প্রাণের শিখা। না বাছা, জীবন সামান্য নয়।

আপনার দীর্ঘশ্বাসে মথিত হচ্ছে বাতাস। সন্ধিক্ষণ সমাগত। শিয়রে শমন। আমি আমার শেষ আহার গ্রহণ করছি, যূপকাষ্ঠে একটি আঘাত আমার সব আলো নির্বাপিত করে দেবে। প্রভু, আপনার চোখের জলটুকুই আমার এ সামান্য জীবনকে অসামান্য করে তুলেছে। আপনি আমার জন্য কাঁদছেন ইহজীবনে এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু ঘটেনি কখনও।

আমার চোখের জল কখনও শুকোয় না বৎস। কান্না ছাড়া আমি তোমাকে আর কী-ই বা দিতে পারি।

"মাইক টেস্টিং... হ্যালো, হ্যালো... ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর... ইলেকট্রিশিয়ান কালু, ইলেট্রিশিয়ান কালু, মণ্ডপের বাঁদিকে স্টিক লাইটটা খুলে গেছে, এখনই ঠিক করে দাও, নইলে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে... আজ রাত নয় ঘটিকার পর নাট্যাভিনয় নটীর পূজা... নটীর পূজা... সবুজ সংঘের নটীর পূজা... পরিচালনা করবেন পারুল গাঙ্গুলি... মুখ্য ভূমিকায় পান্না চ্যাটার্জি, অনামিকা রায়... ভলন্টিয়াররা দেখো, অঞ্জলি দেওয়ার জায়গায় বড্ড ভিড় জমে গেছে..."

প্রভু, আপনার ক্ষতচিহ্ন এখনও রক্তমুখ। আপনার মুখ বেদনায় নীল, আপনার ব্যথার অবসান নেই প্রভু?

পৃথিবীর সব আঘাতই আমাকে আহত করে, না বাছা, ঈশ্বরপুত্রের ব্যথার অবসান নেই। কতকাল এই ক্ষতচিহ্ন বহন করেছি। নির্ঝরের মতো আজও রক্ত বয়ে যায়। আজও তোমার সঙ্গে খড়্গাঘাত ভাগ করে নেব

বলে অপেক্ষা করছি।

খাঁড়াটা ওপরে উঠে ঝক্ করে নেমে গেল। একটা শেষ ডাক শুধু শোনা গিয়েছিল, মা!

সুমনের হাতের ভিতরে তার হাতটা শক্ত হয়ে গিয়েছিল। আঁকড়ে ধরেছিল আঁকশির মতো।

ভয় পেলি?

মরণ মুখ তুলে চেয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল। কাহিল হাসি।

আমারও এসব দেখলে মনটা বড্ড খারাপ হয়ে যায়। না দেখলেই হত।

ওই 'মা' ডাকটা কানে লেগে রইল মরণের, সে সাপ-খোপ অনেক মেরেছে। কিন্তু মা জানতে পারলে খুব রেগে যায়, মা মনসার জীবকে মারিস! পাষণ্ড নাকি তুই? খবরদার আর যেন না শুনি।

মায়ের সুবাদে তাদের বাড়িতে দু-দুটো বাস্তুসাপ এখনও বেঁচেবর্তে আছে। সাপ, বিছে, বোলতা, ছারপোকা, মশা বা ক্ষতিকারক জীবাণু কি পৃথিবীর কোনও উপকারে লাগে? কে জানে কী! এক সময়ে সে ফড়িং-টড়িং ধরত, মেরেও ফেলত। আজকাল, যত বড় হচ্ছে, তত কমে যাচ্ছে ওসব।

সুমনের সঙ্গে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরিয়ে এল সে। পায়ে নতুন জুতো টাইট মারছে। সে যে বড় হচ্ছে, পায়ের মাপ বেড়ে যাচ্ছে, এটা বাবা রসিক বাঙালের খেয়াল থাকে না। কলকাতার চিনেবাজার থেকে পুরনো মাপের জুতো এনে দিয়েছে এবারও। দরকার ছিল না। বর্ধমানেই কেনা যেত। কিন্তু রসিক বাঙালকে সে কথা বোঝাবে কে?

তার মাও কেনাকাটার কিছুই বোঝে না। তবু ঝোলাঝুলি করে জিনসের ফুলপ্যান্ট আদায় করেছে মরণ। এই প্রথম ফুলপ্যান্ট হল তার এবং জিনস। লম্বায় একটু বড় হয়, কিন্তু গুটিয়ে পরা যায় বলে ম্যানেজ হয়েছে। কোমরটাও ঢলঢলে ছিল, সেটা বেল্ট দিয়ে সামলানো গেছে। সবচেয়ে মজা হয়েছিল সুমনের জন্য পাঞ্জাবি আর পাজামা কিনতে গিয়ে। বড়সড় একটা ঝিনচাক দোকানে ঢুকেই তার মা দোকানিদের বলল, খুব দামি ভীষণ ভাল পাঞ্জাবি চাই। খুব ভাল হওয়া চাই কিন্তু...

দোকানদার বিনীতভাবেই বলল, মাপ কত?

মাপ! বলে মা ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেল। মরণের দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ রে, তোর দাদার মাপ কত বল তো!

মরণ বলল, তা কি আমি জানি?

দোকানের সেলসম্যান হেসে বলে, কত লম্বা বলুন, মাপ আমি ঠিক করে নিচ্ছি।

মা নিজের মাথার ওপর হাত তুলে 'এই এত বড় হবে' বলে যে মাপটা দেখাল তা বিরাট লম্বা কোনও লোকের।

দোকানদার বলল, ও বাবা, তাহলে তো মিনিমাম চুয়াল্লিশ লাগবে। অত বড় মাপে ভ্যারাইটি হবে না।

মরণ ফিক ফিক করে হাসছিল।

মা রেগে গিয়ে বলে, হাসছিস কেন বোকার মতো?

হাসব না? দাদা বুঝি অত লম্বা?

লম্বা নয়? বেশ লম্বা।

মোটেই না। বাবার চেয়ে দাদা একটু বেঁটে।

না না, লম্বা নেওয়াই ভাল। শেষে যদি ছোট হয়?

তাদের কথাবার্তা থেকে দোকানদার যা বোঝার বুঝে নিয়ে মাঝারি সাইজের পাঞ্জাবি বের করে দেখাতে লাগল। দারুণ দারুণ সব কাজ করা তসর, সিল্ক, র সিল্ক, গরদ।

কিন্তু মা কেবলই বলে, আরও দামি নেই? আরও ভাল?

দেখাচ্ছি বউদি। তবে এগুলোও কিন্তু খুব ভাল, লেটেস্ট ডিজাইন। ভাল করে দেখুন।

সে দোকানের স্টক ফুরিয়ে গেল, মার পছন্দই হল না। মোট চারটে দোকান ঘুরে অবশেষে প্রায় ছশো টাকা দিয়ে যে-পাঞ্জাবিটা কিনল মা সেটা এখন সুমনের গায়ে।

পাঞ্জাবি দেখে সুমন একটু অবাক হয়ে বলেছিল, ইস, এত দাম দিয়ে কিনতে গেলেন কেন? আমি তো এত ডেকোরেটেড জামা পরি না।

তা হোক বাবা, এই তো প্রথম দিচ্ছি। বয়স কম, এ বয়সেই তো একটু জমকালো জিনিস পরতে হয়।

মরণ এটা বুঝতে পারে, দাদাকে নিয়ে মার একটু আদেখলেপনা আছে। আড়ালে বলে, বড্ড ভয় পাই বাবা, আমি তো আর আসল মা নই, সৎ মা। কী চোখে দেখে কে জানে!

সুমনের ভাব দেখে কিছু বোঝা যায় না। দিন দশেক ধরে টানা আছে এ-বাড়িতে। একটু আপন মনে থাকে, বই পড়ে। রাত জেগে পড়ে বলে সকালে উঠতে দেরি করে। কথা কম বলে। যা একটু ভাব তা মরণের সঙ্গেই।

একদিন মরণকে বলেছিল, আমি একটু ইনট্রোভার্ট।

কথাটার মানে মরণের জানা ছিল না। পরে পান্নাদির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনেছে, ইনট্রোভার্ট হল অন্তর্মুখী।

দশদিন ধরে সুমন এ-বাড়িতে আছে, কিন্তু মার সঙ্গে সম্পর্কটা একটুও এগোয়নি। সেই জন্য মা খুব ভাবে।

একদিন মা তাকে বলল, হ্যাঁ রে, সুমন কি আমাকে ঘেন্না করে?

কেন মা? দাদা তো সেরকম নয়। খুব ভাল তো।

কী জানি বাবা, এতদিন এসেছে তেমন কথা-টথা কিছু তো বলে না। বড্ড ভয়-ভয় করে। গেঁয়ো মানুষ আমরা, আদরযত্ন বোধহয় তেমন হচ্ছে না।

আদরযত্ন বলতে ভাল খাওয়া-দাওয়া যদি ধরা যায় তা হলে সেটা খারাপ হচ্ছে না কিছু। ভাল মাছ, মাংস, মুরগি, পায়েস, ক্ষীর এক একদিন মা তো ভোজবাড়ির আয়োজন করে ফেলে। জিজিবুড়ির রান্নার সুখ্যাতি ছিল। সেই জিজিবুড়িও এসে চিংড়ি, মুড়িঘন্ট, চাপড়ঘন্ট রান্নার কায়দা শিখিয়ে দেয় মাকে। আর বলে, এসে তো গেড়ে বসেছে দেখছি। মতলব তো ভাল মনে হচ্ছে না। বড়গিন্নিই সাঁট করে পাঠিয়েছে পেটের খবর বার করতে। সাবধানে থাকিস না।

ও কী কথা মা! ও কি তেমন ছেলে? ভাবের ঘোরে থাকে, কোনও দিকে চেয়েই দেখে না।

ও লো ও হচ্ছে ভড়ং। নজর ঠিকই রাখছে। ওপর-ওপরসা অমন ভাব দেখাচ্ছে। যেমন মা তেমনই তো ছা হবে।

বড়গিন্নি কেমন লোক তা জানি না মা, তাকে চোখেও দেখিনি আজ অবধি। কিন্তু ছেলের নিন্দে করতে পারব না।

তোর বুদ্ধিনাশ হয়েছে, বুঝলি! ছেলে-ছেলে করে হ্যাদাচ্ছিস, বলি কোন পেটে ধরেছিস ওই ধেড়ে ছেলেকে? গাণ্ডেপিণ্ডে গেলাচ্ছিস, গুরুঠাকুর বানিয়ে পারলে পুজো করিস, বলি আজ অবধি পাপমুখে একবারও মা ডাক বেরিয়েছে?

কথাটা ঠিক। মাকে আজও মা বলে ডাকেনি দাদা। এটা একটা কাঁটা হয়ে আছে মরণের মনের মধ্যে।

এত আয়োজন, তবু সুমন তেমন খায় না। খেতে বসে কেবল থাক থাক আর দেবেন না, বলে বাধা দিতে থাকে।

রান্না কি ভাল হয়নি বাবা?

রান্না? না রান্না তো বেশ ভালই। আমি বেশি খেতে পারি না।

এ কথাতেও মা আড়ালে দুশ্চিন্তা করে। মার কেবল ভয়, আদরযত্ন হচ্ছে না। কথাটা মরণও খুব ভাবে। তার এই প্রায়-অচেনা দাদাকে খুশি রাখতে তাদের আর কী কী করা উচিত সেটা বের করার চেষ্টা করে সে। আজও সে দাদাকে 'আপনি' থেকে 'তুমি' বলতে পারেনি।

তার ছোট বোনটার নাম দেওয়া হয়েছে হাম্মি। তার খুব হামা দেওয়ার নেশা। সকালে ঘুম থেকে উঠেই খাট থেকে নেমে পড়ার জন্য হুড়োহুড়ি। সাতসকালে সারা ঘর হামা দিয়ে বেড়ায় সে। দোতলা থেকে পাছে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে সেইজন্য দোতলার সিঁড়ির মুখে কাঠের আগল লাগানো হয়েছে। হাম্মিকে যে একবারও কোলে নেয়নি বা একটুও আদর করেনি সুমন, এটাও লক্ষ করেছে তারা। হয়তো মায়ের ভয়টা মিথ্যে নয়। বাইরে ভদ্রতা বজায় রাখলেও ভিতরে ভিতরে সুমন হয়তো তাদের পছন্দ করে না।

সুমন আসার চার-পাঁচদিনের মাথায় একদিন সকালে হাম্মি হামা দিতে দিতে লম্বা বারান্দা পেরিয়ে সোজা গিয়ে সুমনের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। তারপর কী হয়েছিল কেউ জানে না। হঠাৎ দেখা গেল বারান্দার কোণে সুমন দাঁড়িয়ে আছে, তার কোলে হাম্মি এবং সুমন তাকে কী যেন আঙুল তুলে দেখাচ্ছে আর কথা কইছে আর হাম্মি খুব অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

উঠোন থেকে তার মা আর্তনাদ করে উঠল, ও বাবা হারু, তোমার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল বুঝি! পেচ্ছাপ-টেচ্ছাপ করে দেবে বাবা, ওকে নামিয়ে দাও।

হারু অর্থাৎ সুমন একটু হেসে বলল, তাতে কী? বাচ্চারা তো ওসব করেই। থাক আমার কাছে একটু।

থাকল হাম্মি। সম্পর্কের শীতলতা সে-ই ভাঙল প্রথম। আর তারপর থেকে সে রোজই নিয়মিত সুমনের ঘরে হানা দেয় এবং কোলে-টোলেও উঠে দিব্যি বসে থাকে।

ষষ্ঠীর দিন বিকেলে হইহই করে এসে পড়ল বাঙাল। সঙ্গে মুটে এবং মুটের মাথায় বোঝা। পুজোর জামাকাপড়, রাবড়ি, গলদা চিংড়ি, নতুন ফুলকপি, সোনামুগের ডাল আরও নানা জিনিসপত্র। উঠোনেই জামা খুলে বারান্দায় বসে হাওয়া খেতে খেতে উঁচু গলায় বলল, পূজা কাটাইল্যা দিনে কইলকাতায় পইড়া থাকে কেডা?

মা ঘোমটা দিয়ে চা করে নিয়ে এসে হাসি-হাসি মুখ করে বলে, অত কী এনেছ গো? পয়সা তোমাকে কামড়ায়?

চা খেতে খেতে বাঙাল নিমীলিত নয়নে চেয়ে বলে, তোমার লিগ্যা কিছু আনি নাই। তোমারে দেওনও যা, ভস্মে ঘি ঢালনও তা। বছর বছর যে শাড়িগুলি কিন্যা দেই হেইগুলি কি পাতিলের মইধ্যে গুইজ্যা রাখ নাকি?

পরতে পার না?

মা ভারী লজ্জা পেয়ে বলে, আচ্ছা মানুষ যা হোক, অত দামি শাড়ি পরে কোথায় যাব বলো তো! আমি কি ঘর থেকে বেরোই? সংসার সামলাতে হয় না আমাকে?

বেনারসিখান কই?

সে তোলা আছে। বিয়েবাড়ি-টাড়ি নেমন্তন্ন হলে পরে যাব।

আর পরছ! তোমার পরনে তো হাউল্যা-জাউল্যা কাপড় ছাড়া আর কিছু দ্যাখলাম না!

এক ছড়া সোনার হার বের করে মার হাতে দিয়ে বাঙাল বলল, হেই লিগ্যা এইবার আর কাপড় আনি নাই। এইটা আনছি।

মার চোখ কপালে উঠল, ও মা গো! তাই বলে সোনার হার!কী কাণ্ড বাবা! এত খরচ করার কোনও দরকার ছিল বুঝি! সোনা-দানাই কি আমাকে পরতে দেখ?

রসিক বাঙাল একটু করুণ মুখে চেয়ে থেকে বলল, আইচ্ছা, তুমি কেমন মাইয়ালোক কও দেখি! কাপড় চাও না, সোনা-দানা চাও না, শ্যাষে কি বৈরাগী হইয়া যাইবা নাকি? তাহইলে তো সাড়ে সব্বনাশ! এই যৌবনে যোগিনীরে লইয়া আমি করুম কী?

মা হেসে ফেলল, আচ্ছা বাবা, পরবখন হার। তবে বাপু, বেশি দিও না আমাকে, আমি অত সামলাতে পারি না।

কথাটা শুনে রসিক বাঙালের মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটল। বলল, বুড়া বয়স লইয়া মাইনষের চিন্তা থাকে। কোনখানে পড়ব, কোনখানে মরব, কারে ভোগাইব, গু-মুতে নান্দিভাস্যি করব কিনা। তা বোঝলা, আমি বুড়া বয়সে আইয়া তোমার কাছেই মরুম।

ছিঃ, ষষ্ঠীর দিনটায় ওসব কী কথা! ওসব মুখে আনতে আছে?

রসিক বাঙাল মিটিমিটি হেসে বলে, আ গো, এইটা আহ্লাদের কথাই। তোমার মাথায় তো বুদ্ধি নাই, বলদা মাইয়ালোক, তুমি বোঝলা না।

পড়ার ঘর থেকে দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছিল মরণ। দুজন দুজনের দিকে অপলক চেয়েছিল কিছুক্ষণ। চা জুড়িয়ে যাচ্ছিল।

পৃথিবীর কোনও কোনও প্রাণী সহজেই পোষ মেনে যায়, আবার কোনও কোনও প্রাণী সহজে মানতে চায় না। যেমন কুকুর সহজেই বশংবদ হয়ে যায়, বেজি হতে চায় না।

বিজু কোথা থেকে একটা বাঁদর নিয়ে এসেছে। ছোট বাচ্চা। সরু শেকল পরিয়ে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে খুব। আজ অষ্টমী পুজোর সকালে সেটাকে কাঁধে নিয়ে এসে হাজির।

দেখো বড়মা, কেমন কিউট দেখতে। ভাল না?

বলাকার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না ব্যাপারটা। বললেন, তুই তো নিজেই বাঁদর, আবার একটা বাঁদরের দরকার কী?

আমার অনেক দিনের শখ বড়মা। বাজারে একটা লোক নিয়ে এসেছিল, পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনে ফেললাম।

ছিষ্টি অনাছিষ্টি করবে বাবা। কাঁধে নিয়ে ঘুরছিস, হেগেমুতে দিলে কী হবে?

সে তো মানুষের বাচ্চারাও করে ফেলে। তাতে কী? ট্রেনিং দিয়ে নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

না বাবা, ওসব আমার পছন্দ নয়।

হ্যাঁ বড়মা, তুমি কি শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে গেলে নাকি? আগে তো এরকম ছিলে না। শুদ্ধাচার ভাল, শুচিবায়ু ভাল নয়।

কী জানি বাপু, আজকাল আমার যেন ঘেন্নাপিত্তি বড্ড বেড়ে গেছে। মনটা খুঁতখুঁত করে সবসময়ে। তোর জ্যাঠা চলে যাওয়ার পর থেকেই এরকম।

একটু কোলে নিয়ে দেখো না।

ও মা গো!

বিজু হি হি করে হাসে। বলে, পারলে না তো বড়মা। শুদ্ধাচারে নিজেকে গুটিয়ে রাখলে!

বলাকা মৃদু হাসলেন, বড্ড খিতখিত করে বাবা, ও আমি পারব না। তবে বাঁদরটা দেখতে কিন্তু বেশ। কেমন পিটপিট করে তাকাচ্ছে দেখ।

এদের এক প্রজাতিই তো আমাদের পূর্বপুরুষ ছিল। তাই কাঁধে নিয়ে বেড়াই।

আর একবারও তো একটা বেজি পুষেছিলি। সেটা পালিয়ে গেল জঙ্গলে।

হ্যাঁ। বেজি জাতটা একটু নেমকহারাম আছে।

এটাও না পালায়।

পালালে পালাবে। আমি ঠিক করে রেখেছি, একটু বড়-টড় করে ছেড়ে দেব। ইচ্ছে হলে থাকবে, না হয় চলে যাবে। দুনিয়াতে পার্মানেন্ট বলে তো কিছু নেই।

কত কথাই শিখেছিস। তা হ্যাঁরে বিজু, তুই কি শেষ অবধি ষণ্ডাগুণ্ডা হলি?

কেন বড়মা, হঠাৎ ওকথা কেন?

শুনতে পাই তুই নাকি মারপিট করিস?

ধুর! মারপিট করব কেন? কখনও-সখনও বেয়াদব লোকদের একটু-আধটু শাসন করতে হয়।

সোহাগ বলছিল। কয়েকটা পাজি ছেলে ওর পিছনে লেগেছিল বলে তুই নাকি মেরেছিস ওদের।

সোহাগটা কে? অমলদার মেয়ে নাকি?

হ্যাঁ।

বেশ বাহারি নাম তো!

একটু পাগলিমতো আছে, তবে মেয়েটা ভাল। ওসব আর করতে যাসনি। ছেলেগুলো গিয়ে ক্ষমা চাওয়ায় মেয়েটা লজ্জায় পড়েছে।

ফচকে ছেলেরা টিটকিরি দেয়, সেটা কি ও এনজয় করে নাকি?

কী জানি বাবা! বলছিল, কেউ ওকে প্রোটেকশন দেয় সেটা ওর পছন্দ নয়।

ওকে প্রোটেকশন দেওয়াটা তো বড় কথা নয়। গ্রামেরও তো একটা সমাজ আছে। বাইরে থেকে আসা একটা মেয়েকে টিটকিরি দেবে কেন? গ্রামের বদনাম হয় না!

এটা নারীবাদের যুগ বাপু, মেয়েরা বোধহয় পুরুষের সাহায্য নিতে পছন্দ করে না।

নারীবাদ কি তাই বড়মা যে, মেয়েরা নিজেদের সব সমস্যার সমাধান নিজেরাই করবে? পুরুষের সাহায্য লাগবে না? আমার তো মনে হয় নারীবাদের জন্য পুরুষের সাহায্য বেশিই লাগবে।

বলাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আমিও তো তাই জানি। তোর জ্যাঠার সঙ্গে এতকাল ঘর করে কখনও তো মনে হয়নি যে আমার আরও একটু পাখা মেলার দরকার। বাইরে থেকে তাকে অনেকে অত্যাচারী পুরুষ বলে ভাবত। খামখেয়ালি তো ছিলই একটু, কিন্তু অমন ভালবাসা যে বাসতে পারে তার সঙ্গে কি বিবাদ হয়? সে ঘিরে রেখেছিল বলে কখনও আঁচটুকুও গায়ে লাগেনি। পুরুষমানুষ মেয়েদের প্রোটেকশন দেবে না তো কে দেবে?

সোহাগকে বোলো, আমি ওকে বাঁচাতে কিছু করিনি, যা করেছি তা গ্রামের প্রেস্টিজ বাঁচাতে।

সে বলবখন, তুই আর ওর মধ্যে থাকিস না।

আচ্ছা বড়মা।

মনটা খারাপ হয়ে গেল বিজুর। এই গ্রামটাকে সে বুকের পাঁজরের মতো ভালবাসে। ইদানীং নেশাভাং, চুল্লুর ঠেক, সাট্টা, জুয়া, মদ আর বদমাইশি ঢুকে গেছে প্রচুর। সে তার মতো এই বেনোজল ঠেকাতে চেষ্টা করে।

আজ অনেক ভেবেচিন্তে একটা শাড়িই পরল সোহাগ।

কাল থেকে পিসি টিকির-টিকির করে যাচ্ছে, ও সোহাগ, কাল অষ্টমী পুজো, কাল একটা শাড়ি পরিস।

আমি যে শাড়ি পরতেই জানি না।

আমি পরিয়ে দেবখন।

শাড়ি পরে কী হবে বলো তো?

তোকে কেমন দেখায় একটু দেখব।

শাড়ি তো সবাই পরে, কী আর নতুন জিনিস হবে?

তুই তো পরিস না, তোকে নতুন রকমই দেখাবে। আমার কাছে আসিস চুল আঁচড়ে বিনুনি করে দেব। আমার সঙ্গে অঞ্জলি দিতে যাবি।

সোহাগ সাজতে ভালবাসে না। উলোঝালো থাকতেই তার ভাল লাগে। মায়ের সঙ্গে এই নিয়ে তার কম যুদ্ধ হয়নি।

ভেবেচিন্তে সে আজ সকালে উঠে চান করেছে। পিসির ঘরে গিয়ে বলল, এবার কী করতে হবে বলো তো?

সন্ধ্যা এক গাল হেসে বলল, আয় তোর চুলটা আগে বাঁধি।

পিসি যত্ন করে চুল বেঁধে মুখটা ভোয়ালে দিয়ে মুছে বলল, শাড়ি আছে?

আছে।

নিয়ে আয়।

সোহাগ তার মায়ের একখানা নীল সিল্কের শাড়ি নিয়ে এল।

এটা কেমন?

চমৎকার। ফর্সাদের সব রঙেই মানায়।

শাড়ি পরিয়ে কুঁচি ঠিক করতে করতে সন্ধ্যা বলল, কিছু খাসনি তো?

না।

তাহলে চল অঞ্জলি দিয়ে আসি। আজ অষ্টমীতে খুব ভিড় হবে।

স্টিলের আলমারির গায়ে লাগানো আয়নায় নিজেকে আপদমস্তক দেখে সোহাগ বলল, ওঃ পিসি! আই লুক ঘ্যাস্টলি?

কী বলছিস?

আমাকে যে ভীষণ বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।

সন্ধ্যা হেসে বলল, তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। একদম অন্যরকম।

অন্যরকম কেন হব আমি? আমি তো আমার মতো হতে চাই।

তাই তো আছিস। শুধু বাইরেটাই যা অন্যরকম দেখাচ্ছে, তা বলে কি আর তুই সোহাগ নোস নাকি?

অন্যরকম হতে আমার ভাল লাগে না।

সে জানি। তুমি একটি জিদ্দি মেয়ে। কত খোশামোদ করে শাড়ি পরালাম, দয়া করে এখনই ছেড়ে ফেলো না। অঞ্জলিটা আগে দিয়ে আসি চল।

সোহাগ কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, আমাকে আজ আমার মাও বোধহয় চিনতে পারবে না।

মণ্ডপে এসে ব্যাপারটা খুব ভাল লাগছিল না সোহাগের। ভিড়, গরম, গণ্ডগোল আর অসহ্য ঢাকের বাজনা। কলকাতায় তারা পুজো দেখে বটে, কিন্তু সেটা সন্ধের পর এবং সেটা শুধু মজা দেখা মাত্র। এখানে সে অঞ্জলিও দেবে, যার কোনও মানে নেই।

ওমা! তুমি এসেছ! কী কাণ্ড! আমি তো তোমাকে চিনতেই পারিনি! এ যে একদম মেটামরফসিস!

এই বলে পান্না তাকে জড়িয়ে ধরল।

সোহাগ হেসে বলে, এ যেন ফ্যান্সি ড্রেস বলের পোশাক হয়ে গেল, না?

এ মা, তা কেন? তোমাকে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে। মণ্ডপে যতগুলো মেয়ে আছে তার মধ্যে সেরা।

দিরি-দিরি-দিরি-দিরি করে ঢাকে একটা অদ্ভুত বাজনা শুরু হল।

পান্না বলল, এই রে! এবার বলি হবে। আমি ওসব দেখতে পারি না। চলো, একটু ওধারে যাই।

যেতে গিয়েই হঠাৎ সোহাগ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। শূন্যে উত্তোলিত খঙ্গ, আর তার ওপাশে এক দীর্ঘ সুঠাম পুরুষ দাঁড়িয়ে। তার কাঁধে একটা বাঁদর। কয়েক পলক স্থির চেয়ে রইল সোহাগ।

ষোলো

রাবণরাজা নাকি রামচন্দ্রকে শত্রুভাবে ভজনা করত। শত্রু ভাবলে কি ভজনা হয়? তবে আশ্চর্য ব্যাপার হল, যাকে ঘেন্না করা হয়, যার ওপর প্রবল আক্রোশ, তার কথা কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে। ভালবাসার মানুষকে যত না মনে পড়ে তার চেয়ে ঢের বেশি মনে পড়ে ঘেন্না আর আক্রোশের লোকটাকে। ঘেন্না, আক্রোশ, রাগও কি তাহলে একরকম আকর্ষণ? কেউ কেউ বলে ঘেন্না আর ভালবাসা টাকার এ পিঠ ও পিঠ। কিন্তু তাই কি হয়! রাবণরাজা রামচন্দ্রকে হয়তো সারাক্ষণ ভাবত, কী ভাবে তার সর্বনাশ করবে বলে। সেটা কি ভজনা রে বাপু?

তৃতীয় ফ্রন্ট হল শীতল উদাসীনতা। ওই কুয়োয় নেমে গেলে মানুষ আর উঠে আসতে পারে কমই। ভালবাসলে মনে পড়ে, ঘেন্না বা রাগ থেকেও মনে পড়ে, কিন্তু উদাসীনতা ভেজা ন্যাতার মতো মনের সেলেটখানা মুছে ফেলে। তখন সেখানে আর কোনও আঁকিবুঁকি নেই, কিচ্ছু নেই। কালো সেলেট হাঁ করে চেয়ে থাকে শুধু।

পাশের ঘরে মোনা, সোহাগ আর বুড়ঢা। আর মা—বাবার পরিত্যক্ত ঘরখানায় একা অমল। গত চার পাঁচ দিন সে দাড়ি কামায়নি। শেষ কবে কামিয়েছিল তা ভাল মনেও নেই। গাল গলা কুট কুট করে দাড়িতে। চুলে চিরুনি দিতে মনে থাকে না, ইচ্ছেও হয় না। কোঁকড়া চুল বলে না আঁচড়ালেও চলে।

এ-ঘরে সাবেক মস্ত খাট। তাতে নানা গেঁয়ো কারুকার্য। কাঠ আর স্টিলের গোটা তিনেক আলমারি। গোল মতো টেবিল, ভারী কাঠের চেয়ার, ট্রাঙ্ক বাক্স মিলিয়ে ঘরে গুদোমঘরের মতো অবস্থা। ইঁদুরের উৎপাত আছে, আরশোলা ঘুরছে সারাক্ষণ। জানালা কপাট খুলে রাখলেও বন্ধ বাতাসের গন্ধ যেতে চায় না। অমল টের পায়, কিন্তু গ্রাহ্য করে না।

ওই ঘরে তার পরিবার, তার দুই সন্তান, অনাত্মীয়া স্ত্রী, মাঝখানে এক ঠান্ডা অন্ধকার সমুদ্র। ওই সমুদ্র অতিক্রম করা বোধহয় আর সম্ভব নয়। সেই চেষ্টা আর করে না অমল। পণ্ডশ্রম। দু ঘরের মাঝখানের দরজাটাও খোলা হয়নি। প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ।

পারুলের প্রতি কি খুব অন্যায় করেছিল অমল? খুব? অনেক ভেবে দেখেছে সে, অন্যায় হলেও সেটা ক্ষমার অযোগ্য ছিল না, বিশেষ করে বিয়ে যখন ঠিক হয়েই ছিল। তার একটা অন্যায়ের প্রতিশোধ অনেক বেশি হয়ে গেল নাকি?

এখন মধ্যরাতে উঠে বসে আছে অমল। গ্রামে শীত পড়ে গেছে। হালকা, মনোরম শীত। মায়ের পুরনো একটা কাঁথা চাপা দিয়ে ভারী আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। কিন্তু মধ্যরাতে চটকা ভেঙে গেল। প্রায়ই যায়। ঘুম একবার ভেঙে গেলে সে জেগে শুয়ে থাকতে পারে না। উঠে বসে সে শুনতে পেল, দূরে লাউডস্পিকারে

কোনও যাত্রাপালার সংলাপ। সবুজ সংঘ নবমী পুজোয় কলকাতার একটা নামী দলকে আনিয়েছে। বাড়ি সুদ্ধু লোক গেছে যাত্রা দেখতে। এমন কী মহিমও। শুধু অমলের পরিবারের কেউ যায়নি।

রাত কত হল জানার জন্য ঘড়ির দিকে চাইলেই হয়। কিন্তু সেই ইচ্ছেটাও হল না অমলের। কী হবে জেনে? উঠে সে চুপচাপ ভূতগ্রস্তের মতো চেয়ে থাকে। ঘর অন্ধকার, তবে দূরের প্যান্ডেল থেকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটু আলো এসে লেগে আছে মশারিতে। এইসব নির্জন, নিঃসঙ্গ সময়ে পারুলের কথা ভাবতে চেষ্টা করে সে। আগে খুব মনে পড়ত পারুলকে। আবেগ উথলে উঠতে চাইত। স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের সময়ে পারুলের মুখশ্রী আরোপ করে নিত মমানার মুখে। বেশ কিছুকাল মোনা আর পারুলের এক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নিতে পারত সে। সে এক আশ্চর্য রসায়ন। প্রবল কল্পনাশক্তি বাস্তবের অনেক ঘাটতি পূরণ করে নেয়।

এখন কেন যে পারুলের মুখ আর তেমন স্পষ্ট মনে পড়ে না কে জানে! পারুলের মুখের ওপর আরও নানা মুখের আদল এসে পড়ে। তখন ভীষণ কষ্ট হয় তার। পারুল কি হারিয়ে যাচ্ছে তার স্মৃতি থেকে। অ্যালবাম খুলে সে কতবার মুখটা ফের স্মৃতিতে গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তবু তার স্মৃতিতে বিন্দু বিন্দু অন্ধকার চলে আসে কেন? হাজার মুখের টুকরো এসে কেন যে ভেসে বেড়ায় মনশ্চক্ষে।

একটা শীতল ভয়ও আজকাল ছুরির মতো ঢুকে যায় বুকে। যদি মোনার বদলে পারুল তার বউ হত তা হলেই কি সুখী হত সে? নিজেকে সে বিরহী ভেবে, বঞ্চিত হতাশ প্রেমিক ভেবে একরকম সান্ত্বনা পেয়ে যায়। কিন্তু যদি এরকম হত, পারুলকে বিয়ে করত সে এবং তারপর ধীরে ধীরে প্রেম অবসিত হয়ে ঘৃণা আর আক্রোশ ঘুলিয়ে উঠত দুজনের মধ্যে, তারপর আসত শীতল উদাসীনতা—তা হলে কী হত? না পাওয়া পারুলকে দেবীর আসনে বসানো সোজা, কিন্তু পাওয়া পারুলকে কি পারত সে? পারুলের অপমৃত্যু ঘটে যেত কবেই। এবং আজ এই মধ্যরাতে ও-ঘর আর এ-ঘরের মধ্যে যে অথৈ সমুদ্দুরের ব্যবধান সেই সমুদ্দুর চলে আসত তার আর পারুলের মাঝখানেও।

শ্বাসকষ্টের মতো একটা কষ্ট হচ্ছিল অমলের। শারীরিক নয়, কষ্টটা অন্যরকম। মাথাটা বড্ড গরম। সে কৃতী ছাত্র, সফল মানুষ। কিন্তু এখন যেন তার সব সফলতা ছাড়া জামাকাপড়ের মতো পড়ে আছে কোথায়। অন্ধকারে বড় বিবসন মন হয় নিজেকে। বড় গৌরবহীন!

অমল উঠল। মশারি তুলে বেরিয়ে একটু জল খেল গেলাস থেকে। চেয়ারের ওপর স্তূপাকার হয়ে পড়ে থাকা আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিল সে। ঘুম অসম্ভব। ঘরের মধ্যে সে হাঁফিয়ে উঠছে।

দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল সে। জ্যোৎস্না রাত্রি। ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল উঠোনে। ভুলু কুকুরটা দু বার ভুক ভুক শব্দ করে দৌড়ে এসে ন্যাজ নাড়তে লাগল। একবার মনে হল, দরজায় তালাটা লাগিয়ে আসে। অ্যাটাচি কেসে কয়েক হাজার টাকা আছে। জরুরি কাগজপত্র, দামি কলম, ক্যালকুলেটর, পারসোন্যাল অর্গানাইজার। চোরের আনাগোনা আছে এখানে। দোনোমোনো করেও ভাবল, থাক গে, গেলে যাবে।

বাইরের ঠান্ডায় এসে বেশ ভাল লাগছিল তার। ঘাসে শিশির জমে আছে। হিম পড়ছে। সামান্য কুয়াশায় জড়ানো ভারী ভুতুড়ে রাত। সে হাঁটতে লাগল। গত কয়েকদিন একা একা ঘাটে আঘাটায় অনেক ঘুরে বেড়িয়েছে সে। মনটা সেই থেকে জড়বস্তুর মতো হয়ে আছে। কোনও উত্তেজনা নেই, আবেগ নেই, রাগ নেই, ঘেন্না নেই, শুধু নিথরতা আছে।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর তার মনে হল, এও পণ্ডশ্রম। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তি আসবে মাত্র।

ছেলেবেলায় গাঁয়ে যাত্রা এলে যেন বারুদে আগুন লাগত। বাবা-মাকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করে পালিয়ে গিয়ে কত যাত্রা দেখেছে। সিরাজদ্দৌল্লা, কেদার রাজা, শাজাহান, কঙ্কাবতীর ঘাট, কর্ণার্জুন। সব মনে আছে।

একটু ইচ্ছে, একটু অনিচ্ছের দোটানায় পড়ে খানিকটা সময় গেল। তারপর সে যাত্রার আসরের দিকেই এগোতে লাগল। পকেটে পয়সা নেই। টিকিট কাটতে হলে পারবে না।

না, টিকিট কেটে নয়। খোলা আসরেই যাত্রার আয়োজন হয়েছে। কয়েক হাজার লোকের জমজমাট ভিড়। আশেপাশে বাদাম, তেলেভাজা, ঝালমুড়ির দোকানও বসেছে অনেক। রই—রই কাণ্ড।

এত কাল পরে যাত্রা দেখতে কেমন লাগবে কে জানে। ভিড় ঠেলে এগোনোও কঠিন। অমল একটু ঘুরে ফিরে একটু ফাঁকামতো জায়গায় দাঁড়াল। বড্ড দূরে স্টেজ। কুশীলবকে খুব ভাল করে ঠাহর করা যাচ্ছে না। তবে মাইকের দৌলতে সংলাপ শোনা যাচ্ছে।

জনৈকা কুলসুমের সঙ্গে জনৈক ফিরোজের প্রেমের ডায়ালগ হচ্ছে। ফিরোজ বলছে সে গরিব, পিতৃমাতৃহীন অনাথ, আবদাল্লা নামক জনৈক সওদাগরের অধীনে কাজ করে আর কুলসুম ধনীকন্যা, সুন্দরী, সুতরাং সে বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চায় না। আর কুলসুম বলছে, তার বুকে যে চিরন্তন প্রেমের শিখা জ্বলে উঠেছে তা দিয়ে তারা সব বাধা অতিক্রম করবে।

অমল একটা হাই তুলল। কানের ভিতর দিয়ে বাতাস বেরিয়ে গেল।

কোথা থেকে বুকে ভলান্টিয়ারের ব্যাজ আঁটা একটা ছেলে ছুটে এসে বলল, আরে অমলদা! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন আমার সঙ্গে।

অমল সংকুচিত হয়ে বলল, না না, এই তো বেশ আছি।

পাগল! বাইরে দাঁড়ালে ঠান্ডা লেগে যাবে। আসুন, স্টেজের ওপাশে ভি আই পি-দের এনক্লোজারে চেয়ারের ব্যবস্থা আছে।

আমি তো ভাই বেশিক্ষণ দেখব না। চলে যাবো।

তা হোক না। যতক্ষণ খুশি দেখবেন। বিজুদা আমাকে পাঠাল। চলুন।

অনিচ্ছুক পায়ে এগোতে হল অমলকে। ভিড়ের পিছন দিয়ে ছেলেটা পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। গ্রিনরুমের পাশেই স্টেজ ঘেঁষে একটা বাঁশ দিয়ে ঘেরা জায়গায় সারি সারি চেয়ার পাতা। গাঁয়ের মান্যগণ্য এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা বসে আছে। সামনে জায়গা ছিল না। ছেলেটা কোথা থেকে একটা চেয়ার এনে তাকে সামনের সারির পাশেই বসিয়ে দিয়ে বলল, আমরা আপনাকে ইনভাইট করতে গিয়েছিলাম। চিঠি পাননি?

অমল অস্বস্তি বোধ করে বলল, না তো!

বউদির হাতে কার্ড দিয়ে এসেছিলাম।

ও। তা হবে।

ছেলেটা চলে যাওয়ার পর অমল একবার চারদিকে চেয়ে দেখল। বহু মুখ, বহু মানুষ। সকলেরই স্টেজের দিকে চোখ। নায়িকা স্টেজের ওপর পড়ে ফিরোজ, ফিরোজ চিৎকার করে কাঁদছে। ফিরোজ চলে গেছে। ঝ্যাঁকর ঝ্যাঁকর করে বাদ্যি বাজনা বেজে উঠল। নায়িকা উঠে বসল। তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়াল। তারপর

দিগন্তের দিকে হাত বাড়িয়ে বিরহের গান ধরল। গানের অর্থ অনেকটা এরকম, কত দূরে যাবে তুমি? আমি যে তোমার হৃদয়ের পিঞ্জরে বসে নিরন্তর তোমার নাম ধরে ডাকব...ইত্যাদি।

ঘুম পাচ্ছিল। ফের একটা হাই তুলল সে। ফের কানের ভিতর দিয়ে বাতাস বেরিয়ে গেল। রাত্রে পায়েস খেয়েছিল একবাটি, অম্বলে গলা জ্বলছে। পায়েসে বড় মিষ্টি দেওয়ার ধাত বউদির।

দুটি অপরূপ চোখ ভিড়ের থেকে এক ঝলক তাকে দেখে টপ করে আড়াল হল।

কে?

একটু সচকিত হল অমল। কার চোখে হঠাৎ চোখ পড়ল তার? বারবার লক্ষ করেও বুঝতে পারল না কিছুতেই। অস্বস্তি হচ্ছে। বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে।

বাঁদিক থেকে মেয়ে-পুরুষের একটি দল উঠে চলে যাচ্ছে। রাত হয়েছে। শেষ অবধি অনেকেই থাকে না। হয়তো দূরে যাবে। নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে দলটাকে একটু দেখল অমল।

নায়িকা কুলসুম শাশ্বত প্রেমের জয় ঘোষণা করে যে গান গাইছিল তাতে বাধা পড়ল। কর্কশ এক পুরুষের গলা গর্জন করে উঠল, গান থামাও কুলসুম, তুমি কি আত্মপরিচয় বিস্মৃত হয়েছ? ভুলে গেছ তোমার বংশমর্যাদা?

কয়েকটি মেয়ে এসে কুলসুমকে ধরে নিয়ে গেল। কুলসুমের ঝলমলে পোশাক-পরা বাবা স্টেজ জুড়ে দাপাদাপি করে নিজের বংশপরিচয় দিয়ে যেতে লাগল...

এসব ভাল লাগার জন্য যতখানি মস্তিষ্কহীন হওয়া দরকার ততটা এখনও হতে পারেনি অমল। যখন ভাল লাগত তখন ছিল ভাল লাগারই বয়স। পারিপার্শ্বিকে যাই ঘটুক বুভুক্ষুর মতো গিলে খেত সে। রাজরাজড়াদের গল্প, পৌরাণিক কাহিনী, চাঁদ সদাগর, মনসা মাহাত্ম্য কিছুই খারাপ লাগত না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠতে যাচ্ছিল অমল।

একটা লম্বা ছিপছিপে ছেলে কাছে এসে বলল, উঠছেন?

হ্যাঁ।

মণ্ডপের পিছনে পারুলদি অপেক্ষা করছেন। একটু দেখা করে যাবেন।

হাঁ করে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল অমল। বুকটায় ধকধক হচ্ছে।

আমি বিজু। চিনতে পারছেন না?

অমল হাসল, হ্যাঁ হ্যাঁ। কত বড় হয়ে গেছ!

সেদিনও তো দেখা হল আপনার সঙ্গে!

অমল অপ্রতিভ হয়ে বলে, কিছু মনে থাকে না আজকাল। তুমি কেমন আছ বিজু? কী করছ?

এখনও কিছু করছি না। পাস-টাস করে বসে আছি।

ভিতরে তাড়াহুড়ো অনুভব করছে অমল। বিজু কী পাস করেছে তা আর জানার ইচ্ছে হল না তার। বলল, আচ্ছা আচ্ছা, বেশ ভাল।

আলোয়ানের এক প্রান্ত খসে পড়েছিল মাটিতে। টানতে গিয়ে চেয়ারের সঙ্গে আটকে গিয়ে চেয়ারটাই পড়ে যাচ্ছিল কাত হয়ে। বিজু চেয়ারটা ধরে ফেলে আলোয়ানটা ছাড়িয়ে কাঁধে তুলে দিয়ে বলল, সাবধানে যাবেন।

একটু দিগভ্রান্ত অমল আসর থেকে বেরিয়ে মণ্ডপটা কোনদিকে তা বুঝতে পারছিল না। এত ভিড় চারদিকে। ঠাহর করতে একটু সময় লাগল তার। তাড়াহুড়োয় পড়লে মানুষের কতরকম ঠিক ভুল যে হতে থাকে।

অমলদা!

অন্ধকারে মুখটা প্রথমে দেখাই গেল না। ফিকে অন্ধকারে পারুল দাঁড়িয়ে।

পারুল!

চেহারাটা কী করেছ বলো তো!

কেন, খারাপ দেখছ?

রোগামোটার কথা বলছি না। অমন উলোঝুলো কেন? দাড়ি কামাওনি, চুল আঁচড়াওনি, দোমড়ানো পাজামা, বিচ্ছিরি আলোয়ান—এ কী রকম ভাব তোমার!

অমল হাসল, আসলে ঘুম আসছিল না বলে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে যাত্রা হচ্ছে দেখে ঢুকে পড়েছি।

কতকাল পরে দেখা, কিন্তু এমন পোশাকে আর চেহারা দেখে চমকে গিয়েছিলাম। কই, বাড়িতে এলে না তো! খবর পাঠিয়েছিলাম ধীরেন খুড়োকে দিয়ে, বলেনি?

বলেছে।

তবে?

অমল শ্বাসকষ্ট টের পাচ্ছে। শরীর কাঁপছে এখনও। মৃদু স্বরে বলল, কোন মুখে আসব বলো! খুব লজ্জা হচ্ছিল।

পুরনো কথা ভাবো বুঝি খুব?

ভাবব না?

আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি এখন মস্ত মানুষ হয়েছ, বিরাট চাকরি, অনেক দায়িত্ব, ঘন ঘন দেশ বিদেশ যেতে হয়, তুমি নিশ্চয়ই পুরনো কথা মনে রাখোনি।

অমল একটু চুপ করে থেকে বুকের থরথরানিটা সামলানোর চেষ্টা করতে লাগল। তারপর বলল, সেরকমই তো হওয়ার কথা। কিন্তু আমার আজকাল কী যেন হয়েছে।

কী হয়েছে?

আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে। ইন্ট্রোভার্ট হয়ে যাচ্ছি।

আত্মবিশ্বাস কমছে কেন?

পারুলকে এবার চারদিকের আলোর আভায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল অমল। বলল, সামথিং ইজ রং। কিন্তু এসব কথা থাক। তোমার কথা বলো।

আমি! আমার আর কী কথা বলো। আর পাঁচজন মেয়ের মতোই ঘরসংসার করছি। নতুন কিছু নয়।

ভাল আছ তো পারুল? সব দিক দিয়ে ভাল?

তাই কি হয়? সব দিক দিয়ে কেউ কি ভাল থাকে?

তোমাকে বেশ ভাল দেখাচ্ছে। এখনও বয়সের ছাপ পড়েনি। দেখে মনে হয়, তুমি সুখী হয়েছ। তাই না?

নিজের কথা নিজে কি বলতে পারি? কিন্তু তোমাকে দেখে আমার একটুও ভাল লাগছে না।

অমল মাথা নেড়ে বলে, আমি ভাল নেই। কিংবা আমি যে কেমন আছি তা বুঝতে পারছি না।

কোনও অসুখ-টসুখ করেনি তো!

না, তেমন কিছু অসুখ আছে বলে জানি না। আর থাকলেই বা কী! ওসব নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

বউয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?

ভালই।

জিজ্ঞেস করলাম বলে কিছু মনে করলে না তো! এ প্রশ্নটা আমি তোমাকে করতেই পারি, তাই না?

হ্যাঁ, পারোই তো! মোনাও তোমার কথা জানে।

পারুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, শুধু মোনা নয়, তোমার মেয়ে সোহাগও জানে। আর সেইটেই দুঃখের কথা। তুমি ওদের কাছে সব বলে দিয়েছ। কাজটা ভাল করোনি অমলদা।

অমল অপ্রতিভ হয়ে বলে, কী থেকে যে কী হয়ে যায় তা বলা মুশকিল। আমি আজকাল নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। কিন্তু ভারী আশ্চর্যের কথা, ওরা যেমনই হোক, তোমাকে কেউ অপছন্দ করে না। কী করে যে এটা সম্ভব হয় বুঝতে পারি না।

পারুল একটু হাসল, সোহাগ আমাকে গডেস বলে মনে করে। সেটা আবার আমার পক্ষে অস্বস্তিকর। তোমার বউ কী মনে করে তা অবশ্য জানি না।

অমল মাথা নেড়ে বলে, বললে তুমি বিশ্বাস করবে না।

কেন করব না?

অবিশ্বাস্য। সে তোমার সম্পর্কে কখনও একটিও খারাপ কথা বলে না। একবারের জন্যও না। বরং একবার অ্যালবামে তোমার ছবিটা দেখছিলাম, দেখে বলেছিল, দেখ দেখ, তোমার বিবেক জাগ্রত হোক।

হেসে ফেলল পারুল, যাঃ।

বলোম তো, তোমার বিশ্বাস হবে না।

অ্যালবামে আমার ছবি রাখার কী দরকার ছিল?

আমি তো রাখিনি। ছবিটা আমার পারসোনাল ফোল্ডারে ছিল। সেটা অ্যালবামে রেখেছে মোনা। তোমার বোধহয় একটা হিপনোটিজম আছে পারুল।

ওসব বাজে কথা। আমি খুব সাধারণ একটা মেয়ে। সোহাগ আমাকে কেন গডেস ভাবে বলো তো! আইডিয়াটা কি তুমিই ওর মাথায় ঢুকিয়েছ?

না পারুল। আমি ওদের মাথায় কখনও কোনও আইডিয়া ঢোকাতে পারিনি। ছেলেমেয়েকে সময়ও দিতে পারলাম কই? দিনরাত ভূতের মতো খেটেছি। ওরা তাই ওদের মতোই হয়েছে। কিছু শিখিয়েছে ওদের মা। আর বাকিটা নিজেরাই শিখে নিয়েছে। তুমি কবে, কী ভাবে সোহাগের জীবনে ঢুকে গেছ তা আমি জানি না।

পারুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তির মতো বলল, পাগল।

হ্যাঁ পারুল, সোহাগ প্রবলেম চাইল্ড। স্বাভাবিক নয়। ওর একটা অদ্ভুত মনোজগৎ আছে, যেটাকে আমি বুঝতে পারি না। ও আমাদের বাধ্য নয়। ও আমাকে অনেকবার বলেছে, তোমার ছবিটা দেখলে নাকি ওর মন ভাল হয়ে যায়।

এসব শুনে আমার একটু ভয়-ভয় করছে। এরকম কেন হবে?

শুধু সোহাগ নয়, আমার ছেলে বুডঢার মুখেও শুনেছি। মোনা মুখে অতটা বলেনি বটে, কিন্তু অসম্ভব নয় যে, মোনাও তোমার একজন ভক্ত।

পারুল প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, কী যে সব কাণ্ড তোমাদের কিছু বুঝতে পারি না বাবা! এখন তো ওদের সঙ্গে দেখা করতেই আমার ভীষণ লজ্জা করবে। ভেবে রেখেছিলাম মহিমকাকাকে বিজয়ার প্রণাম করতে গিয়ে ওদের সঙ্গে পরিচয় করে আসব। দেখছি তা আর হবে না।

পালাবে পারুল? তাতেই কি সব উলটে যাবে?

আমার আড়ালে আমাকে নিয়ে যা খুশি হোক, আমাকে তো আর সাক্ষী থাকতে হবে না। না বাপু, এসব মোটেই ভাল কথা নয়।

অমল বিষণ্ণ গলায় খুব ধীরে ধীরে বলল, আমাকে তুমি তোমার জীবন থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলে পারুল। আমার কোনও চিহ্নই রাখোনি। কিন্তু আমরা তোমাকে বুকে তুলে নিয়েছি। যত অদ্ভুতভাবেই হোক, তোমাকে এক ধরনের অ্যাকসেপটেন্স দিয়েছে আমার পরিবার। ব্যাপারটা আমার ভালই লাগে।

কিন্তু আমার ভয় করে, লজ্জা হয়।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। জায়গাটা খুব একটা নির্জন বা শব্দহীন নয়। অদূরে ঝোপঝাড়ে অনেকে এসে পেচ্ছাপ করে যাচ্ছে। যাতায়াত করছে অনেক মানুষ। মাইক বাজছে, কোলাহল শোনা যাচ্ছে।

এবার আমি যাই অমলদা?

যাবে! চলো, একটু এগিয়ে দিই।

তার দরকার নেই। ওই তো বাড়ি দেখা যাচ্ছে। তুমি বরং একবার বাড়িতে এসো। আমার কর্তার সঙ্গে পরিচয় করে যেও।

ম্লান মুখে অমল বলে, কতবার যাব বলে তোমাদের বাড়ির ফটক অবধি গেছি। কেন যে শেষ অবধি ঢুকতে পারিনি তা জানি না। ফটক থেকেই ফিরে এসেছি।

এত লাজুক তো তুমি ছিলে না।

না পারুল, এটা লাজুক বলে নয়। আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে। কেন যেন মনে হয় আমি ভুলভাল কথা বলে ফেলব, অদ্ভুত কিছু করে ফেলব।

ওমা! ওরকম কেন মনে হয় তোমার?

সেইটেই বুঝতে পারি না। আমার আজকাল এমনও মনে হয় যে, লোকে আমাকে নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করে।

উদ্বিগ্ন পারুল বলে, অমলদা, তুমি কি ভুলে গেছ যে, তুমি একজন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলে! তোমার কত ডিগ্রি, কত বড় চাকরি, কত সম্মান!

আমার মেধা, ডিগ্রি বা সম্মানকে কি আজ তুমি মূল্য দাও পারুল? একদিন কিন্তু সব মাড়িয়ে দিয়ে তুমি আমার জীবন থেকে সরে গিয়েছিলে।

সেটা অন্য প্রসঙ্গ অমলদা। অন্য ঘটনা। তোমার গুণের দাম কি তা বলে কমে গেছে।

অমল মাথা নেড়ে বলে, ওসব দিয়ে কিছু হয় না পারুল। ডিগ্রি হল, চাকরি হল, টাকা হল, তবু মনে হয় কী করে জীবনযাপন করতে হয় সেটাই তো এখনও জানা হল না।

এত ফ্রাস্ট্রেশন কেন তোমার? আমার জন্যই কি?

তোমার জন্যই কিছুটা। কিন্তু সবটুকু বোধহয় তুমি নও। ধরো যদি তোমাকে বিয়ে করতে পারতাম তা হলে কি তুমি আমার কাছে ক্রমে পুরনো এক অভ্যাসের মতো হয়ে যেতে না? বরং বিয়ে হয়নি বলেই আজও অ্যালবাম খুলে তোমার ছবি দেখি। বিয়ে করা বউয়ের ছবির দিকে কেউ কি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে? না পারুল, তোমাকে অন্যভাবে তো পেয়েছিই। আরও ভালভাবে।

বেশ বললে! শুনে কান জুড়িয়ে গেল। কিন্তু তোমার এই হতশ্রী দশা তবে কেন হল বলো তো!

বুঝতে পারি না পারুল। যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে, ছাইভস্ম অনেক শিখলুম, কিন্তু তা দিয়ে কিছু হয় না।

একটা কথা সত্যি করে বলবে?

বলব না কেন? তোমাকে তো সবই বলা যায়। যায় না পারুল?

না যায় না। সব আমাকে কেন বলবে অমলদা? বোলো না। আমি শুধু জানতে চাই নিজের বউয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন?

মাথা নেড়ে অমল বলে, ভাল নয়। একটুও ভাল নয়। প্রথম প্রথম একরকম ছিল। বিয়ের পরেই ও তোমার কথা জানতে পারে, কিছু অশান্তিও হয়। আবার একটা আপসরফাও হয়ে গিয়েছিল। তারপর কেমন করে যেন একটা ঘেন্নার সম্পর্ক তৈরি হল। সামান্য ছুতোনাতায় পরস্পরকে অপছন্দের মাত্রা বাড়তে লাগল। আক্রোশে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করত। কিন্তু তবু সে একরকম ছিল, আক্রোশ-ঘেন্নাও একটা সম্পর্ক বজায় রাখে। কিন্তু ভয়াবহ হল ঠান্ডা উদাসীনতা। কী বলব তোমাকে, এখন ওকে সামনে দেখেও ওর কথা মনে পড়ে না।

তুমি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়েছ?

অমল একটু মলিন হেসে বলে, সাইকিয়াট্রিস্টরাই এখন সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত ডাক্তার। সাইকিয়াট্রিস্ট, ম্যারেজ কাউন্সেলর কিছু বাকি নেই।

তা হলে তোমার প্রবলেম তো খুব অ্যাকিউট।

হ্যাঁ। কিন্তু ওসব নিয়ে ভেবো না পারুল। আমার কথা বাদ দিয়ে এবার তোমার কথা বলল।

আমার তো কথা কিছু নেই।

শুনেছি জ্যোতিপ্রকাশ গাঙ্গুলি একজন ভাল মানুষ।

সে তার মতো ভাল।

কথাটার মানে কী পারুল?

তোমার মতো অত কোয়ালিফিকেশন তার নেই। অনেক কষ্ট করে, নিজের চেষ্টায় যা হওয়ার হয়েছে।

অমল একটু হেসে বলে, আমাকে কি একটু খোঁচা দিলে নাকি পারুল? দাও। খোঁচাটা আমার ভালই লাগল।

মোটেই খোঁচা দিইনি। জানতে চাইলে বলে বলোম।

বুঝলে, আগে খুব অহংকার ছিল আমার। ব্রিলিয়ান্ট বা কাজের লোক দেখলে হিংসে হত। মনে হত আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুঝি কেউ নেই। এখন হয়েছে তার উলটো। একটা ন্যালাক্ষ্যাপা লোককেও মনে হয় আমার চেয়ে বড় মানুষ বুঝিবা। অহংকারটা যে কোথায় গেল কে জানে।

অহংকার কি ভাল অমলদা?

অহংকারকে সাধকরা জয় করেন, সে অন্য ব্যাপার। অনেক মহৎ কাজ। আমার তো তা নয়। আমার হল ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স।

ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স বলে কিছু হয় না তা জানো?

মনোবিজ্ঞানে না থাক, কথাটা তো চালু আছে পারুল। যা বোঝার বুঝে নাও।

আজ অনেক দুঃখের কথা বলেছ। আর নয়। রাত দেড়টা বাজে। এবার বাড়ি যাও। ঘাড়ে গলায় জল দিও, চোখে ভাল করে জলের ঝাপটা দিও, জয়েন্টগুলো ভিজিয়ে নিও। তারপর ঘুমোও।

নির্বোধের ঘুমের অভাব হয় না। আমার ঘুম খুব গাঢ়। ইদানীং হঠাৎ হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। ঘুম ভেঙেছিল বলেই হাঁটতে হাঁটতে যাত্রা দেখতে চলে এলাম। ভাগ্য ভাল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ভাগ্য ভাল না খারাপ তা কে বলবে? আমার মনটা আজ তুমি খারাপ করে দিয়েছ।

আচ্ছা আমি কি একটু বেশি কথা বলছি বলে তোমার মনে হয়?

না তো! বেশি বলোনি, তবে যা বলেছ সবই নেগেটিভ কথা।

আমার মনে হয়, আজকাল বোধহয় আমি একা একাও কথা বলি।

ওরকম ভেবো না অমলদা। নিজেকে নিয়ে বেশি ভাবলে শেষে তুমি ক্ষ্যাপাটে হয়ে যাবে।

ক্ষ্যাপাটে কি এখনই নই পারুল?

বলে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে অমল।

মায়াভরা চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে পারুল বলে, একটু ক্ষ্যাপাটে হওয়া পুরুষমানুষদের পক্ষে মন্দ নয়। হিসেবি, কৃপণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষীর চেয়ে বরং একটু ক্ষ্যাপাটে হওয়া ভাল।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব? খুব সংকোচ হচ্ছে।

সংকোচের কী? বলো।

আমাদের সম্পর্কের কথাটা কি জ্যোতিপ্রকাশবাবুকে বলেছ?

বলেছি।

সেই ঘটনাটার কথাও?

পারুল ঠোঁট কামড়াল, চাপা গলায় বলল, হ্যাঁ।

উনি কিছু মনে করেননি!

মনের কথা জানি না। তবে আমাকে গ্রহণ করেছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অমল বলে, উনি তাহলে শক্তিমান পুরুষ। তুমি ঠিক মানুষকেই পেয়েছ পারুল।

হিসেবটা অত সহজ নয়। সুন্দরীদের কিছু প্লাস পয়েন্ট থাকে। তাদের অনেক দোষঘাট রূপের তলায় চাপা পড়ে যায়। পরস্পরের মনের কথা ইহজীবনে কি সবটা বোঝা যায়?

উদাস মুখে অমল বলে, তাই হবে। অত জানার দরকারই বা কী?

একটা কথা বলি। অ্যালবাম থেকে আমার ফটোটা সরিয়ে নষ্ট করে দিও।

অবাক হয়ে অমল বলে, নষ্ট করব? নষ্ট করলে আমি কী নিয়ে থাকব পারুল? আমরা কী নিয়ে থাকব?

সতেরো

মানুষের শরীরের ভিতরে যেসব হাজারো জটিলতা রয়েছে তার খবর পান্নার জানা নেই। কিন্তু কণ্ঠনালির ভিতরে শ্বাস আর খাদ্যের নলের মধ্যে যে একটি ভয়ংকর বিপজ্জনক ফোকর রয়েছে সে খবরটা সে খুব ভাল জানে। যখন ছোট ছিল, অস্পষ্ট স্মৃতির সেই সময়ে কেউ তাকে ভয়টা দেখিয়ে রেখেছিল, খাদ্যনালি থেকে মাঝে মাঝে ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল শ্বাসনালিতে গিয়ে আটকে দম বন্ধ করে দেয়। সেই শৈশবের শেখা ভয় পান্নাকে আজও ছাড়েনি। বরং যত বয়স বাড়ছে তত ভয় বাড়ছে। জ্ঞানবয়সে আজ অবধি ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল গিলে খেতে পারল না পান্না।

এ-বাড়ির বাঁধা ডাক্তার ছিলেন মণিরাম। ধুতি জামা পরা ডাক্তার আজকাল আর দেখা যায় না। মণিরাম সেই বিরলবেশের ডাক্তার। কে জানে ওই পোশাকের জন্যই শেষ দিকটায় মণিরামের পশার কমে গিয়েছিল কিনা। ধুতি পরা ডাক্তার দেখে অকারণেই এ যুগের রুগিরা নাক সিঁটকোয়। ঠিক ঠিক নির্ভর করতে পারে না বোধহয়। কিন্তু মণিরাম বিচক্ষণ ডাক্তারই ছিলেন। বর্ধমান থেকেও তাঁর ডাক পড়ত। ইদানীং জনা দুই ছোকরা প্যান্ট-শার্ট পরা ডাক্তার এসে মণিরামকে অস্তাচলে ঠেলে দিয়েছিল।

মণিরামই পান্নাকে বলেছিলেন, ক্যাপসুল গিলতে পারিস না, কিন্তু অত বড় ভাতের গরাসটা গিলিস কী করে?

ভাতের গ্রাস আর ক্যাপসুল কি এক হল জ্যাঠামশাই?

না, তা হল না। কারণ ক্যাপসুল ভাতের গরাসের চেয়ে অনেক ছোট।

তা হোক, ক্যাপসুল বলে কথা। ও আমি গিলতে পারব না। জলে গুলে খেয়ে নেব।

মণিরাম মাথা নেড়ে বলতেন, সে তো অশৈলী কাণ্ড। সব ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল কি গুলে খাওয়া যায়? খাওয়া উচিতও নয়। খা দেখি আমার সামনে, কেমন না পারিস!

পান্না পারেনি। চেষ্টা করেছিল, কিংবা বলা ভাল চেষ্টা করার ভান করেছিল, তারপর জলসুদ্ধ ক্যাপসুল ফেলে দিয়েছিল মেঝেয়। মা সেই ভেজা ক্যাপসুল কুড়িয়ে শেষে জলে গুলেই খাইয়েছিল। মণিরাম মাথা নেড়ে বলেছিলেন, এভাবে তো সারাজীবন পারবি না। এখন থেকে ছোট ছোট হোমিওপ্যাথিক বা বায়োকেমিক ট্যাবলেট গিলে গিলে প্র্যাকটিস কর। নইলে পরে বিপদে পড়বি।

প্র্যাকটিস আর করা হয়নি। কণ্ঠনালির রহস্যময় জটিলতা তাকে আজও আতঙ্কিত করে।

ডা. মণিরাম বেঁচে নেই। তাঁর পুরনো স্টেথোস্কোপ, প্রেশার মাপার যন্ত্র, গোরু-ছাগল-পুকুর-জমি-বাড়ি সব পড়ে আছে। ছেলেরা কেউ ডাক্তার হয়নি বলে স্টেথো আর প্রেশারের যন্ত্রে ধুলো পড়ছে।

পান্নার জ্বর এল বিজয়া দশমীর শেষ রাতে। জ্বর যে আসবে তা পান্নার জানাই ছিল। বিজয়া দশমীর বিকেলে নিগ্রোর চুলের মতো কোঁকড়া ও কালো একটা মেঘ দিগন্তে আততায়ীর মতো উঠে এল। তখন

প্রতিমা লরির খোলে তোলা হয়ে গেছে আর মেয়েরা সব হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠছে লরিতে। লরিতে ওঠাও যেন এক যুদ্ধ। টুলের ওপর দাঁড়িয়ে শাড়ি সামলে উঠতে গিয়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ল লরির নোংরা পাটাতনে।

মা অবশ্য বারণ করেছিল, যাসনি পান্না। দহে অনেক জল। তুই কিন্তু সাঁতার জানিস না।

মায়ের বারণ তেমন না শুনলেও চলে। মা কিছু নরম মানুষ। আর বাড়ির লোকের তো সবটাতেই বারণ। শুনলে কি চলে? তাদের তিন বাড়ির প্রায় সব মেয়েই যখন যাচ্ছে তখন পান্নাই বা পড়ে থাকবে কেন?

কিন্তু নিগ্রোর মাথার মতো মেঘটা একটু চিন্তায় ফেলেছিল পান্নাকে। মেঘটা ফুঁসে ফুলে উঠেছিল ক্রমে। যেন হঠাৎ এক অদৃশ্য আগ্নেয়গিরি মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে, ওগড়াচ্ছে তার ভিতরের চেপে-রাখা রাগ।

বাদ্যিবাজনাসহ সামনে একটা পদাতিক মিছিল, পেছনে প্রতিমাসহ মেয়েদের লরি, তার পিছনে আরও দুটো লরিতে ক্লাব আর পাড়ার ছেলেমেয়েরা। লরির খোলের মধ্যে পাতা শতরঞ্চিতে ঠাসাঠাসি বসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে এক একবার আততায়ী মেঘটাকে দেখছিল পান্না। দেখেছিল পরমাণু বোমার মতো বিশাল ছত্রাকে আকাশের অর্ধেক ঢেকে ফেলেছে প্রায়, ছত্রাকের নীচে পাঁশুটে এক অতিকায় স্তম্ভ। সত্যিই কি অ্যাটম বোমা ফেলল নাকি কেউ?

দুটো কারণে মেঘটাকে ভয় পাচ্ছিল পান্না। এক তো আজকের ভাসান ভাসিয়ে দেবে। দ্বিতীয়ত, তার সর্দির ধাত। একটু ঠান্ডা লাগলেই ফুচফুচ হাঁচি আর খুকখুক কাশি আর ঘুসঘুসে জ্বর আর টিপটিপ মাথা ধরা। বৃষ্টির জল তার একদম সয় না। আর কেউ তার মতো নয়। আর সবাই বৃষ্টিতে ভিজে ঠিকঠাক থাকবে, পান্না থাকবে না। তবু বিজয়া দশমী বলে কথা। আজ একটু হুল্লোড় না করলে চলে? পান্না চেপে বসে রইল।

বৃষ্টির আগে একটা বাতাস আসবেই। অগ্রদূত। বাতাসে বৃষ্টির মিঠে গন্ধটা থাকে, আর থাকে হিম। ঝোড়ো বাতাসটা ওই ভিড়ের মধ্যেও ঠিক পান্নাকে খুঁজে নিয়ে ছুঁয়ে ফেলল, চোর চোর খেলার চোরের মতো। গায়ে কাঁটা দিল পান্নার।

মেঘ গম্ভীর গলায় সিংহের মতো ডেকে উঠল দূরে। তারপর গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল। এসব ঘটনা কেউ গায়ে মাখল না, কিন্তু পান্না আঁচল তুলে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টায় মাথা ঢাকা দিয়েছিল। বৃথা চেষ্টা।

পান্নাকে লক্ষ করে বরফকুচির মতো প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটি নিক্ষেপ করল মেঘ। পান্না কেঁপে উঠল শীতে। তারপর সরু, ঠান্ডা ভূতের অজস্র আঙুলে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল বৃষ্টি। নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা ছেড়ে অসহায়ভাবে পান্না শুধু বলেছিল, হায় ভগবান!

আর সেই বৃষ্টিতে আনন্দে অনেকেই কোলাহল তুলেছিল। বিশেষ করে বাচ্চারা। তারা যে-কোনও অঘটনই খুব পছন্দ করে। ভিজছে আর আনন্দে হি-হি করে হাসছে। হাত বাড়িয়ে চেটো পেতে ধরার চেষ্টা করছে বৃষ্টির জল।

আনন্দ পান্নাও করেছিল কিছুক্ষণ।

বৃষ্টির মধ্যেই দহের ফুটন্ত জলে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে জলে নেমে দাপাদাপি করেছিল অনেকে। পান্না নামেনি। শরীর জুড়ে জ্বরের ঝংকার টের পাচ্ছিল সে।

পারুলদি বলল, এমা! তোর কী হবে রে পান্না?

কী আবার। জ্বর আসবে।

তুই যে কেন এলি! ছাতা-টাতা কিছু আনিসনি?

পাগল! বিসর্জনে কেউ ছাতা আনে?

শোন, তুই বরং ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বোস। আর ভিজিস না। যা ঠান্ডা জল!

ওখানে বসলে যে আলাদা হয়ে যাব।

কিছু আলাদা হবি না। সবাই তো সঙ্গেই রয়েছে। দাঁড়া, বিজুকে বলছি তোকে সামনে তুলে দিক।

তাই হল শেষ অবধি। ড্রাইভারের পাশে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। আরও জনা দুই বুড়োবুড়ি। তাদের পাশে ঠাস হয়ে বসে ফেরার সময়ে পান্নার শরীর ভেঙে আসছিল। ভেজা শাড়ি শায়া, ভেজা শরীরে বাতাস লেগে শিহরিত হচ্ছিল গা।

যখন বাড়িতে এসে পৌঁছল তখন একশো দুই জ্বর। সকালে উঠল চারে। এবং দুপুরে সাড়ে চারে উঠে গেল। চিন্তিত মা ঘর-বার করছে। মা মানেই বকুনি, মা মানেই শাসন।

কতবার বারণ করলুম যেতে, তবু শুনলি সেই কথা। তোর কি আর পাঁচটা মেয়ের মতো স্বাভাবিক ধাত? পচা শরীর তোর যখন-তখন ঠান্ডা লাগে, টনসিল ফোলে, তার ওপর ওরকম মুষলধারের বৃষ্টিতে অতক্ষণ ভেজা!

আরও চলত কিছুক্ষণ।

হঠাৎ সেই চিরাচরিত ঝ্যালঝ্যালে লম্বা ঝুলের বিচ্ছিরি জামা পরা একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল দরজায়।

মাই গড! তোমার কি জ্বর? চোখ দুটো তো খুব লাল দেখাচ্ছে!

আবছা একটু হাসল পান্না। ক্ষীণ গলায় বলল, ওই চেয়ারটা টেনে বোসো।

কাল খুব ভিজেছ বুঝি?

হ্যাঁ।

শুনেছি তোমরা সব ভাসানে গিয়েছিলে।

তুমিও গেলে না কেন সোহাগ? কতবার বললুম।

অত ভিড় আমার ভাল লাগে না। আর যা শব্দ।

খুব আনন্দ হয়েছিল কিন্তু।

মুখ টিপে হেসে সোহাগ বলে, একটু একটু ইচ্ছেও হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, আমি তো অনেককেই চিনি না।

যাঃ, না চেনার কী আছে! প্রতিমার লরিতে তো আমরাই সব ছিলাম বাবা। সব মেয়েরা। তোমার গডেসও ছিল।

সোহাগ একটু হাসল। তারপর ফের বলল, একটু একটু ইচ্ছে যে হয়নি তা নয়। চুপি চুপি গিয়ে প্যান্ডেলের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু কেউ ডাকল না দেখে আর এগোইনি।

আমি দেখতে পেলে ঠিক তোমাকে তুলে নিতাম।

তোমাকেই খুঁজছিলাম। দেখতেই পেলাম না ভিড়ের মধ্যে। এই জন্যই ভিড় আমার ভাল লাগে না। ভিড়ে আইডেন্টিটি হারিয়ে যায়।

সবুজ সংঘের পুজো অনেকটা বাড়ির পুজোর মতোই। অচেনা তো কেউ নয়।

আমার কাছে সবাই প্রায় অচেনা।

তা অবশ্য ঠিক।

তোমরা চলে যাওয়ার পর আমার একটু মন খারাপ লাগছিল। মনে হল, আমি আর একটু মিশুক হলে ভাল হত।

তুমি কি লাজুক?

ঠিক তা নয়।

তবে কি অহংকারী?

একটু বোধহয় তাই। সবাইকে ইনফিরিয়র ভাবা ভীষণ অন্যায় জানি। কিন্তু আমার ওই এক স্বভাব।

যাঃ, তুমি মোটেই অহংকারী নও। আমার সঙ্গে ভাব হল কী করে বলো?

তুমি বোধহয় অন্যরকম।

একটুও না। তবে আমিও কিন্তু একটু অহংকারী। কীসের অহংকার জানি না বাবা। তবে আছে একটু। বন্ধুরা বলে, তোর ভীষণ দেমাক।

তুমি কথা বলতে গিয়ে হাঁফিয়ে পড়ছ। আর কথা বোলো না। চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে থাকো। আমি কি তোমার জন্য কিছু করতে পারি?

কী করবে?

মাথা টিপে দিতে পারি বা আইসব্যাগ ধরতে পারি।

না, না, তুমি বসে থাকো। আমার এখন একটু ভাল লাগছে। অসুখ হলে বড্ড একা লাগে।

পান্না বাস্তবিক বড্ড ক্লান্ত বোধ করছিল। চোখ বুজতেই কেমন যেন এক আচ্ছন্নতায় তলিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। হিজিবিজি স্বপ্নে ভরে গেল মাথা। তারপর চটকা ভেঙে চেয়ে দেখল, সোহাগ তখনও বসে আছে, চলে যায়নি। একটা হাত রেখেছে তার কপালে।

পান্না ক্ষীণ হেসে বলে, আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর তার মধ্যেই একটু স্বপ্নও দেখে ফেললাম।

তুমি ঘুমোও।

তুমি থাকবে তো?

একটু থাকব। আমার তো কোনও কাজ নেই।

চুপচাপ বসে থেকো না। কথা বলো। নিস্তব্ধতা আমার ভাল লাগে না।

তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

করো না।

একটা লম্বামতো ছেলে, খুব ফর্সা, কাঁধে একটা বাঁদর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ছেলেটা কে বলো তো!

পান্না হি হি করে হেসে ফেলল, ও তো বিজুদা, ওর অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড। কোথা থেকে একটা বাঁদর এনেছে পুষবে বলে। আমাদের গায়ে ছেড়ে দেয় মাঝে মাঝে। ভয় পাই না।

দ্যাট হিরো!

বিজুদা কিন্তু ভীষণ ভাল। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র।

উনি একজন ডু গুডার, তাই না?

হ্যাঁ। কেন বলো তো?

কাল যখন তোমরা ভাসানে যাচ্ছিলে তখন আমাকে একা প্যান্ডেলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উনি এসে বললেন, তুমি যাবে না খুকি?

এই যে তুমি বললে তোমাকে কেউ ডাকেনি? বিজুদা তো ডেকেছিল।

মাথা নেড়ে সোহাগ বলল, মোটেই ডাকেনি।

তা হলে?

উনি কথাটা এমনভাবে বলেছিলেন যাতে আমি খুব অপমান বোধ করেছি।

সে কী? বিজুদা তো সেরকম নয়।

জুতোর পেরেক কোথায় ফোটে তা টের পায় শুধু জুতোটা যে পরে। আর আমি কি খুকি?

ওঃ, খুকি বলায় তুমি রাগ করেছ বুঝি?

সেটাও একটা কারণ। আর বলার ধরনটাও ছিল ঠাট্টার মতো। আমার একটুও ভাল লাগেনি।

তুমি ভুল বুঝেছ সোহাগ। বিজুদা সেরকম ছেলেই নয়।

সেটা তোমার চোখে। আমার চোখে নয়।

তোমাকে বিজুদা অপমান করবে কেন বলো তো! তুমি তো কিছু করোনি।

করেছি। আমি ওঁর সাহায্য রিফিউজ করেছি। যে বাজে ছেলেগুলো আমাকে দেখে কমেন্ট করত উনি তাদের শাসন করতে চেয়েছিলেন। আমি বড়মাকে বলে দিয়েছি ওর সাহায্যের কোনও প্রয়োজন আমার নেই।

ওঃ, তুমি ভীষণ একগুঁয়ে মেয়ে। ছেলেগুলোকে যে একটু ভয় দেখানো দরকার সেটা কেন বোঝে না। প্রশ্রয় দিলে যে বাড়াবাড়ি করতে থাকবে। তোমাকে দেখে যে ভীষণ খারাপ খারাপ কথা বলছিল সেদিন।

সবাই ওকথা বলে। কিন্তু আমার কথা হল, লড়াই যদি করতেই হয় তবে আমিই করব। আমার কোনও বডিগার্ডের দরকার নেই।

পান্না খুব ক্লান্তি বোধ করে চোখ বুজল। সোহাগকে তার মাঝে মাঝে খুব ভাল লাগে, মাঝে মাঝে খুব খারাপ। এখন খারাপ লাগছে।

সন্ধেবেলা একজন ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এল বাবা। নতুন ডাক্তার। জ্বরের ঘোরে খুব আবছা চেহারাটা দেখতে পেল পান্না। লোডশেডিং বলে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। সেই আলোয় বড় বড় ছায়া পড়েছে চারদিকে। ভূত-ভূত আলো-আঁধারিতে সবকিছুই যেন ভাসমান।

মাথার যন্ত্রণায় চোখে জল আসছে। সেই অস্পষ্ট চোখে সে হঠাৎ আবিষ্কার করল, ডাক্তারের মুখটা খুব গম্ভীর। তার কি তবে সাংঘাতিক কিছু হয়েছে? সে কি মরে যাবে?

আমার কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?

স্টেথোস্কোপ বুকে লাগিয়ে ডাক্তার গম্ভীর গলায় বলল, কথা বলবেন না। জোরে শ্বাস নিন।

আমার সারা গায়ে খুব ব্যথা।

জানি। ব্যথা হওয়ারই কথা। জোরে শ্বাস নিন।

বুকে লাগছে যে শ্বাস নিতে।

যতটা জোরে পারেন।

আমি মরে যাচ্ছি না তো!

মরা কি মুখের কথা? দেখি পাশ ফিরে শোন তো একটু।

ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া নয় তো! কিংবা মেনিনজাইটিস!

আজকাল রুগিরা বেশ ভাল ডাক্তারি বুঝে গেছে দেখছি।

একটু আগে আমার মা পাশে বসে কাঁদছিল যে! মায়েরা অল্পেই কাঁদে।

আপনি গম্ভীর কেন? বাবার মুখেও হাসি নেই।

আপনি চোখ বুজে থাকলেই ভাল হয়। আপনার কিছু হয়নি তেমন। পালসটা একটু দেখি।

লেপের তলা থেকে হাতখানা বের করে দিতেই যেন কত পরিশ্রম হল পান্নার।

এবার জিবটা বের করুন।...এবার হাঁ করুন তো, গলাটা একটু দেখব।

প্লিজ চামচ ঢোকাবেন না কিন্তু, আমার বমি হয়ে যাবে।

আচ্ছা আচ্ছা, চামচ ছাড়াই দেখে নিচ্ছি। বড় করে হাঁ করুন।

মণিরাম জ্যাঠাও এইভাবেই দেখতেন। খুব মন দিয়ে। নাড়ি ধরে অনেকক্ষণ চোখ বুজে থাকতেন। স্টেথোস্কোপ বসাতেন চেপে চেপে। নানারকম প্রশ্ন করতেন। পায়খানা, পেচ্ছাপ, খিদে সবকিছুর খতেন নিয়ে তবে প্রেসক্রিপশন লিখতেন। এ ডাক্তার অবশ্য অত সময় নিল না। প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বলল, জ্বর খুব বাড়লে ঠান্ডা জলে গা স্পঞ্জ করে পাখার বাতাস করবেন। জ্বর নেমে যাবে। প্যারাসিটামলটা দুবারের বেশি দেবেন না।

মা অবাক হয়ে বলে, ঠান্ডা জলে?

হ্যাঁ। ভয় নেই, কিছু হবে না।

ডাক্তারটা বোধহয় পাগল। এমনিতেই শীতে মরে যাচ্ছে পান্না, ঠান্ডা জল গায়ে দিলে সে তক্ষুনি হার্টফেল করবে।

পথ্যি কী দেব ডাক্তারবাবু?

কেন, ভাতরুটি যা খেতে চায়?

এই জ্বরে ভাত?

হ্যাঁ, ভাতে কোনও ক্ষতি হবে না।

ডাক্তারটার মাথা খারাপ। মণিরাম জ্যাঠা জ্বর সারবার পরেও আরও দুদিন ভাত পথ্য দিতেন না। স্নান নিষিদ্ধ ছিল বেশ কয়েকদিন। বার্লি ছাড়া পথ্য ছিল না।

কী দিলেন ডাক্তাবাবু? ক্যাপসুল?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো।

আমি ক্যাপসুল গিলতে পারি না।

সে কী? ক্যাপসুল না খেলে অসুখ সারবে কেমন করে?

লিকুইড নেই?

লিকুইড। না, এই হাই পোটেনসিতে লিকুইড পাওয়া যায় না।

আমি যে গিলতে পারি না। ক্যাপসুল গুলে খেতে রয়।

ডাক্তারবাবুটি হাসলেন। কিন্তু উপদেশ দেওয়া বা জবরদস্তির চেষ্টা না করে বললেন, সেভাবেই খাবেন। তবে একটু তেতো লাগবে হয়তো। অরেঞ্জ স্কোয়াশ থাকলে তাতে গুলেও খেতে পারেন।

ক্যাপসুল গিলতে পারি না বলে আপনি কই বকলেন না তো!

ডাক্তারবাবুটি ফের হাসলেন, অনেকের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম থাকে, ওষুধ গিলতে ভয় পায়। বকবার মতো কিছু তো নয়। আমার এক জামাইবাবু আছেন, তিনিও ট্যাবলেট গিলতে পারেন না।

বাঁচল পান্না, শ্বাস ফেলল একটা।

আচ্ছা এনকেফেলাইটিস বলে একটা অসুখ আছে, না! সেটা হলে কী হয়?

খারাপ হয়।

মরে যায়?

মরতেও পারে।

আমার এনকেফেলাইটিস হয়নি তো!

আপনি খুব খারাপ খারাপ অসুখের কথা ভাবতে ভালবাসেন বুঝি?

আমার যে মনে হচ্ছে আমি মরে যাব।

অসুখ হলেই অনেকের ওরকম মনে হয়।

টাইফয়েড হয়নি তো!

সেটা এত আর্লি স্টেজে তো বলা যাবে না। তবে আপনার জ্বর হয়েছে ঠান্ডা লেগে। বুকে সর্দি জমেছে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কয়েক মুহূর্তের জন্য তন্দ্রার ভিতরে চলে গেল পান্না। দেখতে পেল মণিরাম ডাক্তার ঘোড়ায় চেপে রুগি দেখতে যাচ্ছেন, সাদা জামার ওপর ফর্সা রোদ পড়েছে।

কিন্তু মণিরাম জীবনে কখনও ঘোড়ায় চড়েননি। তাঁর ছিল একখানা বশংবদ সাইকেল। তা হলে ঘোড়াটা এল কোথা থেকে?

পান্না যখন চোখ মেলল তখনও ডাক্তার যায়নি। তবে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার যাবে। কারেন্ট আসায় ডাক্তারবাবুটিকে স্পষ্ট দেখতে পেল পান্না। বেশি বয়স নয়। ত্রিশ-বত্রিশ হবে হয়তো। তার দিকে চেয়ে হেসে বলল, দু-একদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবেন। ভয় নেই।

পান্না চোখ বুজল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের মধ্যে চলে গেল। মণিরাম জ্যাঠা পাশে এসে বসেছে। চোখে নিবিষ্ট দৃষ্টি।

দেখি, হাতখানা দে তো!

উঃ জ্যাঠা, আপনার হাত এত ঠান্ডা কেন?

ঠান্ডা! ঠাণ্ডাই তো হওয়ার কথা। তোর গায়ে যে জ্বর।

জ্যাঠা, আপনার কি ঘোড়া আছে?

হ্যাঁ। থাকবে না কেন?

ঘোড়ায় চেপে আপনি রুগি দেখতে যান?

হ্যাঁ। এই তো বিদ্যাধরীপুর থেকে এলুম। সেখানে কলেরা হচ্ছে।

ইস্। তা হলে আমার হাতটা ছাড়ুন। আপনার হাতে যে কলেরার জীবাণু রয়েছে।

তা আছে। খুব আছে।

এখন আমাকে যে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে!

হ্যাঁ, ধোয়া ভাল। হাত ধোয়া খুব ভাল।

কতক্ষণ কে জানে। ফের চোখ মেলল সে। মাথার আইসব্যাগ থেকে সমস্ত শরীরে শীত ছড়িয়ে পড়ছে।

ওঃ মা, আইসব্যাগটা সরিয়ে নাও। ঠান্ডা লাগছে যে!

তোর যে জ্বর।

কত জ্বর?

একশো দুই-টুই হবে।

মোটেই না। আমার এখন একশো ছয় সাত হয়ে গেছে।

না না, অত নয়।

ডাক্তারবাবু কী বলে গেল?

কী আর বলবে?

আমার কী হয়েছে?

কী আবার হবে। জ্বর হয়েছে।

সাধারণ জ্বর নয় মা, আমি জানি।

এতই যদি জানো বাছা, তবে জ্বরটাকে ডেকে আনতে ভাসানে না গেলেই তো পারতে।

একটা দিন ভাসানে আনন্দ করব না?

আনন্দ তো এখন বেরোচ্ছে। এখন চিঁচিঁ না করে আনন্দ করলেই তো হয়।

তুমি একটা বিচ্ছিরি মা। পচা মা। অসুখ হলে কাউকে বকতে হয় বুঝি?

বকব না তো কি আহ্লাদ করব নাকি? পই পই করে বারণ করলুম, শুনলি সে কথা!

শোনো মা, আমি একটু আগে মণিরাম জ্যাঠাকে স্বপ্নে দেখেছি, জ্যাঠা এসে আমার নাড়ি দেখছিল। আমি কিন্তু আর বাঁচব না। মরা মানুষের স্বপ্ন দেখা খারাপ, তা জানো?

দুর্গা দুর্গা। ওসব কথা বলে না। বলতে নেই। বড় ডাক্তার দেখে গেছে। ভয়ের কী আছে মা?

ডাক্তারটি কে বলো তো! কখনও দেখিনি।

বর্ধমানের ডাক্তার। অনেক ডিগ্রি।

বর্ধমানের ডাক্তার যা বলে গেল শুনবে তো! জ্বরের মধ্যে আমাকে ভাত খেতে দেবে?

বড্ড ভয় পাই মা। কোনওকালে এমন অশৈলী কথা তো শুনিনি। আজকালকার তেজালো ওষুধের জোরে ওসব হয়তো চলে। কিন্তু ভাত না হয় জ্বর সারলেই খাস।

তা হলে ডাক্তার দেখিয়ে কী হবে?

পান্না ফের আচমকা স্বপ্নের জগতে চলে গেল। ঝোপের আড়াল থেকে কে একটা পাগলি তাকে ঢিল মেরেই লুকিয়ে পড়ল। ঢিলটা ঠং করে কপালে এসে লাগতেই মাথাটা ঝনঝন করে উঠল ভয়ংকর ব্যথায়।

কে? কে রে তুই?

পাগলিটা হি হি করে হেসে একটা ঝোপের আড়াল থেকে যখন আর একটা ঝোপের আড়ালে ছুটে গেল তখনই পান্না দেখতে পেল তার পরনে ঝ্যালঝ্যালে একটা বিবর্ণ জামা।

তুমি সোহাগ।

হি হি হি।

এমা! তুমি পাগল হলে কী করে?

ওরা যে আমাকে রেপ করল!

কারা রেপ করল তোমাকে?

ওই তো ওরা।

তুমি আমাকে ঢিল মারছ কেন?

ওরা পাজি। ভীষণ পাজি।

তোমাকে তো বলেইছিলাম ওদের একটু ভয় দেখানো দরকার। তুমি শুনলে না। বিজুদাকে কিছু করতেও দিলে না।

তোমার বিজুদা কি ভগবান?

তা কেন? বিজুদা একজন ডু গুডার।

ওকে আমার চাই না, বলে দিও। বেশ করেছে রেপ করেছে।

কাছে এসো সোহাগ। ঢিল মেরো না। আমি তো তোমার বন্ধু।

হি হি হি হি।

ফের চটকা ভেঙে গেল।

ওষুধটা খেয়ে নে!

তেতো বিচ্ছিরি ওষুধটা খেয়ে নিয়ে পান্না বলল, ইস, অরেঞ্জ স্কোয়াশ দাওনি। ডাক্তারবাবু বলে গেল যে!

ভুল হয়ে গেছে মা। এর পর থেকে দেব। আরও ওষুধ আছে। একটা ট্যাবলেট আর একটা ক্যাপসুল।

ভীষণ বেশি ওষুধ দেয় তো লোকটা।

তা দেবে না কেন। অসুখটাও তো ভালই বাধিয়েছ।

স্বপ্ন আর জাগরণের মধ্যে একটা মজার যাতায়াত চলছে তার। মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সে দুর্গা প্রতিমার মুখ দেখতে পাচ্ছিল কিন্তু মুখটা জলে ডুবে আছে। মা দুর্গা যেন চিৎকার করে বলছে, এই! এই! আমি ডুবে যাচ্ছি যে! আমি সাঁতার জানি না, আমাকে তোলো!

এক দঙ্গল ছেলেমেয়ের চেঁচামেচিতে মা দুর্গার চিৎকার চাপা পড়ে গেল। আর তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। পান্না একজনের বুকে দুম দুম কিল মারতে মারতে বলল, কী করছ তোমরা! মা দুর্গাকে তোলো শিগগির! মা দুর্গা ডুবে যাচ্ছে যে!

লোকটা বলল, মা দুর্গাকে তুলতে নেই। আপনি ঘুমোন।

কেন ঘুমোব?

আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। সব দিকে নজর রাখার দরকার কী?

অবাক হয়ে পান্না দেখল, লোকটা নতুন ডাক্তারবাবুটি।

সে লজ্জা পেল। জ্বর নেমে যাচ্ছিল তার। মাথা ধরা কমে যাচ্ছে। গা ঠান্ডা হয়ে আসছে। শীত লাগছে না তেমন। প্যারাসিটামল খেলে এরকম হয় কিছুক্ষণের জন্য। সে জানে। জ্বর কমল বলেই বোধহয় স্বপ্নও আর তেমন দেখল না সে।

মা।

কী রে?

জল দাও।

মা জল দিল।

এখন রাত কত মা?

বারোটা।

আমাকে ওষুধ খাওয়াবে না?

খাওয়াব। তার আগে বার্লি।

ওয়াক।

ওরকম করতে হয় না মা।

ডাক্তারবাবু কি কাল আবার আসবে।

না তো! বড় ডাক্তার কি রোজ আসে?

পান্না একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে যদি বিয়ে করে একজন ডাক্তারকেই করবে।

আঠারো

যেন অতল জল থেকে উঠে আসা। এক ঘোর-ঘোর রূপকথার জগৎ থেকে বাস্তবের চৌকাঠে পা রাখা, কোনটা ভাল তা পান্না বলতে পারবে না। স্বপ্ন আর সত্যের মেলামেশা যে অদ্ভুত জগতে সে ছিল কয়েকদিন—তা তো কই খারাপ লাগছিল না তার। মৃত্যুভয় অবশ্য ছিল, কিন্তু তা তো তার সবসময়েই থাকে। অসুখ হলে একটু বেড়ে যায়, এই যা।

সকালবেলার আলো-ঝলমলে ঘরে দুর্বল শরীরে উঠে বসেছে পান্না। বুক অবধি লেপ টানা দেওয়া ছিল। লেপটা কোলের ওপর খসে পড়েছে। নিজের দুখানা হাত চোখের সামনে তুলে ধরে খুব মন দিয়ে দেখছে সে। একেই সে রোগা। এই অসুখে আরও কি রোগা হয়ে গেছে সে?

জ্বর ছেড়ে গেলে শরীরটা যেন বেশি ঠান্ডা মেরে যায়। খুব শান্ত এক শীতলতায় ভরে আছে শরীর। খুব দুর্বল। মুখে বিস্বাদ।

মা!

হুঁ।

আমি কি আজ চান করব?

পাগল!

গা থেকে বোঁটকা গন্ধ পাচ্ছি যে!

মোটেই কোনও গন্ধ নেই। আমি তো পাশেই শুই, গন্ধ হলে পেতুম না!

আমি পাচ্ছি যে!

গন্ধের নাক একটু কমাও মা। সবতাতেই গন্ধ-গন্ধ বলে নাক সিঁটকোলে তো হবে না। বড্ড গন্ধ বাই তোর।

তাহলে কি নাকটা উকো দিয়ে ঘষে দেব?

আর উকো দিয়ে ঘষতে হবে না, এমনিতেই তো নাকটা একটু চাপা।

কই চাপা? দাও তো আয়নাটা! তুমি তো আমার সবকিছুই খারাপ দেখ।

আয়নায় নিজের নাক মোটেই চাপা বলে মনে হল না তার। একটু ছোট বটে, কিন্তু মোটেই চাপা নয়।

আমি কি খুব কুচ্ছিত মা?

কুচ্ছিত না হলেও ডানাকাটা পরি তো আর নও। জ্বরের আগে তাও যা একটু ছিল, জ্বরের পর তো হাড়গিলে চেহারা হয়েছে।

শুধু বার্লি গিলিয়ে রেখেছ, চেহারা তো খারাপ হবেই। ডাক্তারবাবু ভাত দিতে বলে গেল, তুমি কিছুতেই দিলে না।

আহা, ডাক্তাররা বড় পণ্ডিত কি না। নিদান দিয়ে দক্ষিণা পকেটে গুঁজে পগার পার হল, তারপর যত হ্যাপা সব আমাদের সামলাতে হবে।

ডাক্তারের কথা যদি না-ই শুনবে তবে ডাক্তার ডাকো কেন?

সে ডাকতে হয় বলে ডাকা। ডাক্তার ওষুধ দেবে, পথ্যি আমাদের হাতে।

বাঃ, বেশ মজা তো! ডাক্তারের কথা অর্ধেক শুনবে আর অর্ধেক ফেলে দেবে?

সেটাই রেওয়াজ। ডাক্তারদের কথা পুরো কেউ শোনে না। জন্মে শুনিনি একশো পাঁচ ছয় জ্বরে কেউ ভাত দেয়। মণিরাম ডাক্তার শুনলে মূর্ছা যেতেন। ওসব হালফিলের ডাক্তারের ওপর আমার ভরসা হয় না তেমন।

আজ তো জ্বর নেই, দেবে তো চাট্টি ভাত?

আজকের দিনটা থাক না, কাল খাস।

আমি কিন্তু আর বার্লি গিলতে পারব না। বার্লির বাটি ছুড়ে ফেলে দেব জানালা দিয়ে।

আচ্ছা, দুটো পাতলা রুটি দেব খন, আলু বড়ির ঝোল দিয়ে খাস।

রুটি! আমার যে অম্বল হয়ে যায়।

বাবা রে, বায়নাক্কার শেষ নেই তোর।

মুখটা যে কী বিস্বাদ! একটা লঙ্কা দেবে?

লঙ্কা!

লঙ্কা আর নুন খেলে জিবটা বোধহয় পরিষ্কার হবে।

পাগল নাকি? বরং আদাকুচি আর নুন খা। কাশিরও উপকার হবে।

তাই দাও বাবা। তার আগে এক কাপ চা। দেবে তো?

আবার চায়ের বায়না কেন? একেই তো লিভার ভাল নয়।

ওই এক কথা শিখেছ তুমি। লিভার ভাল নয়। কী করে জানলে যে আমার লিভার ভাল নয়? তুমি কি ডাক্তার? লিভার কাকে বলে তাই তো জানো না।

না জানলেও বুঝতে পারি। ওসব শিখতে হয় না আমাদের। তোর কটা শ্বাস পড়ল তারও হিসেব আমার আছে।

কাঁচকলা আছে। বলো তো সকাল থেকে কটা শ্বাস ফেলেছি? অত সোজা না। মা হয়েছ বলে মাথা কিনে নিয়েছ বুঝি!

তাই নিয়েছি। এই যে বৃষ্টিতে ভিজতে বারণ করলুম, শুনলি সেই কথা? মায়েরা সব আগাম খবর পায়, তা জানিস?

পান্না হেসে ফেলে, দুহাত বাড়িয়ে বলে, এসো তো আমার কাছে! একটু আদর করো।

আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই মা। জড়াজড়ি করলেই বুঝি আদর হয়? রাত জেগে মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকা, মাথায় জলপট্টি বা তালুতে বরফ দেওয়া, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়ানো সেসব বুঝি আদর নয়?

সে তো কেজো আদর। একটু অকাজের আদর করো তো! মুখটা সবসময়ে ওরকম গোঁসাপানা করে রাখো কেন? হাসতে জানো না?

হাসি বুঝি অমনি আসে! কটা দিন তো হাড় ভাজা-ভাজা করে খেলে। একশো পাঁচ ছয় জ্বর উঠে যাচ্ছে, সবাই ভয় দেখাচ্ছে বেশি জ্বরে নাকি মাথায় রক্ত উঠে যায়। ভয়ে মরি। হাসি আমার শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।

জ্বর বুঝি মানুষের আর হয় না! না হয় মরেই যেতাম। তোমার একটা চক্ষুশূল কমত। হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে।

খুব বুঝেছ।

তুমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসো দাদাকে, সেকেন্ড হীরা, আমি লাস্ট। তাই না?

ওই তো বললুম, খুব বুঝেছ।

জ্বরের ঘোরে আমি বারবার কাকে দেখেছি জানো? মণিরাম জ্যাঠাকে। মণিরাম জ্যাঠা এসে পাশে বসে আমার নাড়ি দেখছিল। কী ঠান্ডা হাত!

থাক, ওসব আবার মনে করতে হবে না। অলক্ষুণে সব স্বপ্ন।

মরা মানুষকে স্বপ্ন দেখা ভাল নয়, না?

স্বপ্ন স্বপ্নই। তার কি কোনও মাথামুণ্ডু আছে! জ্বরের ঘোরে কত হাবিজাবি দেখে মানুষ। ওসব নিয়ে ফের ভাবতে বোসো না। একেই তো ভিতুর ডিম!

আমার অত জ্বর দেখে বাবা কেমন করল বলবে?

পুরুষমানুষ বড় নরম হয়। তার ওপর বাপসোহাগী মেয়ে। কেমন আবার করবে। ঘর-বার করেছে, বারবার জ্বর মেপেছে, আর উদ্ভট উদ্ভট সব নিদান দিয়েছে।

কী রকম মা? একটু বলো না!

কোথায় কোন তান্ত্রিকের কাছে যাবে বলে বায়না ধরেছিল। আমি যেতে দিইনি। তান্ত্রিকদের নানা মতলব থাকে। কোন ফকিরবাবার জলপড়ার কথাও যেন বলছিল। তখন কি আর কারও মাথার ঠিক ছিল মা?

আর হীরা?

ও বাবা এমনিতে দু বোনে বনিবনা নেই বটে, কিন্তু যেই দিদির জ্বর হল অমনি হীরা জব্দ, সারাদিন চোখ ছলোছলো, ভাল করে খায় না, ঘুমোয় না। বেশ খেলা দেখিয়েছ।

তাকে নিয়ে যে বাড়িতে একটা ভীষণ টেনশন গেছে এটা জেনে খুব খুশি হচ্ছিল পান্না। এইসব অসুখ-বিসুখ শরীর নিংড়ে নেয় বটে, কিন্তু বিনিময়ে কিছু পুরস্কারও তো দিয়ে যায়। অসুখের ভিতর দিয়ে কি মানুষের একটা নবীকরণও হয়?

কে কে আমাকে দেখতে আসত বলো তো! বড়মা আসেনি?

ওমা! বড়দি, আসবে না? রোজ দুবেলা এসেছে। বকুল, পারুল, জামাইরা সবাই এসে ঘুরেফিরে দেখে গেছে।

আমি কিন্তু টের পাইনি কিছু।

কী করে পাবে? চৈতন্যই তো ছিল না একরকম। মাঝে মাঝে একটু চেতনা এলে দু-চারটে হাবিজাবি কথা বলে ফের ঘোরে ডুবে যেতিস।

ধ্যেৎ! বলে হাসে পান্না, হাবিজাবি বলতাম বুঝি?

বেশিরভাগই অসংলগ্ন কথা। মাথামুণ্ডু নেই।

কেউ শোনেনি তো!

তেমন কেউ নয়। শুধু ওই অমলের মেয়ে সোহাগ। সে সারাক্ষণ তো মুখের ওপরই পড়ে থাকত।

সোহাগ কি কলকাতায় চলে গেছে মা?

জানি না বাপু। কাল থেকে তো আসছে না। আমারও কি পাড়াপ্রতিবেশীর খবর নেওয়ার সময় ছিল?

আজ কি খুব শীত পড়েছে?

তা পড়েছে বাছা। সকালে তো কনকনে হাওয়া দিচ্ছিল।

তা হলে আমাকে উঠোনে একটা চেয়ার পেতে দাও। রোদে একটু বসি। কতকাল বাইরেটা দেখা হয়নি।

আজ থাক না। শরীর দুর্বল, মাথা-টাথা যদি ঘুরে যায়।

কিছু হবে না মা। পেতে দাও।

বাইরে রোদে বসে চারপাশটাকে চোখ নাক ত্বক দিয়ে শুষে নিচ্ছিল পান্না। বাঁ ধারে বড় জ্যাঠাদের তিনতলা বাড়ির ছাদ দেখা যায়, ঘোষবাড়ির মস্ত মস্ত নারকোল গাছে আছাড়ি-পিছাড়ি হাওয়া, পুকুরপাড় থেকে বাসন ধোয়ার শব্দ আসছে, একটা গোরু হাম্বা বলে ডেকে উঠল।

আজ হাওয়ার দিন। বাতাসে লুকোনো ছুরির মতো শীত এসে তার শরীরের আনাচে কানাচে ঢুকে যাচ্ছে। একটা বাটিতে মুড়ি আর আধকাপ চা দিয়ে গেছে মা। মুড়িটা বাতাসের থাবায় অর্ধেক উড়ে গেল। তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে গেল চা। গায়ের আলোয়ানটা উড়ে যাচ্ছে বারবার বাতাসের ঝাপটায়। রোদ তেমন গায়ে লাগছে না।

না, এই শীত বাতাসটা সহ্য করা তার উচিত হচ্ছে না। ফের যদি জ্বর আসে।

হাহাকারের মতো শব্দ উঠছে গাছপালায়। বাতাস বড্ড দামাল। রোদের তাপটুকু লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে। উঠোনে এ সময়ে যেসব পুষি বেড়াল বা ভেলু কুকুরেরা বসে থাকে তারাও কেউ নেই।

একটু বসে থাকার ইচ্ছে হয়েছিল পান্নার। সাহস হল না। উঠে ঘরে চলে এল। বিছানায় বসে কোমর অবধি লেপটা টেনে নিল। গলায় জড়িয়ে নিল মাফলার। কোলে পুবের জানালা দিয়ে ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছে। তাপটুকু বড় ভাল লাগছে তার। বাইরে লুটেরা বাতাসের দাপাদাপি। শীত করছে।

চোখ জ্বালা করে জল আসছে। বুকে ধুকুরপুকুর। গলায় খুশখুশ। জ্বর আসছে নাকি? ও বাবা, তা হলে মরেই যাবে সে। রোদে রোগা দুখানা হাত মেলে দিয়ে সে ফর্সা চামড়ার নীচেনীল শিরা উপশিরা দেখতে পাচ্ছিল। গায়ে জ্বরের গন্ধ। না, তার ভাল লাগছে না। সে চোখ বুজল, ঠিক তার জ্বর আসবে।

চোখ বুজে ভারী মন খারাপ লাগছিল তার। জ্বর এলে আবার তো পড়ে থাকা। কান্না পাচ্ছে যে!

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে যখন এই অলক্ষুণে চিন্তা করছিল পান্না, তখনই ফের মনে হল, জ্বর কি খুব খারাপ? বেশ তো কয়েকটা দিন এক অদ্ভুত আলো-আঁধারের জগতে বাস করে এল সে। স্বপ্নের কত ফুলঝুরি ঝরে পড়ল চোখে। কত কিম্ভুত দৃশ্য দেখল। জ্বর এলে হয়তো সেই ডাক্তারটিও আসবে। তার নাম অনল বাগচী। কী অদ্ভুত নাম। ডাক্তারের মুখটা মনেও পড়ে না তার। কেমন দেখতে কে জানে! ক্যাপসুল-ট্যাবলেট গিলতে পারে না বলে তাকে বকেনি একটুও। আর ভাত খেতে বলেছিল। বেশ ডাক্তার। মণিরাম জ্যাঠার মতো নয়।

মিণরাম জ্যাঠা রুগি দেখতে আসতেন ঠিক ডাক্তারের মতো নয়। অনেকটা আত্মীয়ের মতো। বসে রাজ্যের গল্প ফেঁদে বলতেন। একসময়ে সত্যাগ্রহ করেছেন, জেল খেটেছেন, গান্ধীবাবার কাজ করেছেন—সেসব কথা, বাজারদর, গাঁয়ের পলিটিক্স, তাবিচকবচ, রান্না-বান্না, এমনকী ভূত-প্রেত নিয়েও কথা কইতেন, যার মধ্যে

ডাক্তারির নামগন্ধও থাকত না। বেশ ভালই লাগত জ্যাঠাকে। কিন্তু ডাক্তারির রকমটা ছিল বড্ড সেকেলে। জ্বর হয়েছে তো কী? মণিরাম ডাক্তার কিছুতেই চট করে জ্বর কমানোর ওষুধ দেবেন না। তাঁর বক্তব্য, ওরে বাবা, জ্বর যখন শরীরের দখল নিয়েছে তখন তারও একটা মেয়াদ আছে। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাকে বার করতে গেলে শরীরে তার দাঁত নখের দাগ থেকে যায়। হুড়োহুড়ি করার কিছু নেই। জ্বর ঠিক সময়মতো ছেড়ে যাবে। যাতে খুব জট না পাকায় ডাক্তারের কাজ হচ্ছে তাই দেখা।

মণিরাম দাস্ত বা বমিও চট করে বন্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। পেনিসিলিন পারতপক্ষে দিতেন না। এমনকী পান্নার বাবার যখন টাইফয়েড হয়েছিল তখনও টাইফয়েডের নির্দিষ্ট ওষুধ না দিয়ে বাহান্ন দিন ভুগিয়েছিলেন বাবাকে। আর বাবাও মণিরামের অন্ধ ভক্ত ছিলেন বলে অন্য ডাক্তার ডাকেননি। বার্লি গিলেছিলেন, রোগা হয়ে মুরগির ছানার মতো চেহারা হয়েছিল, এত দুর্বল যে হাঁটাচলা করতে দিন পনেরো সময় লেগেছিল।

এটা নিশ্চিত যে মণিরামের যুগ আর নেই। মণিরাম জ্যাঠার সঙ্গে অনল বাগচীর অনেক তফাত।

অনল বাগচী! কী অদ্ভুত নাম! নামটা গুনগুন করছে মনের মধ্যে। মানুষটার নয়, নামটারই প্রেমে পড়ে গেল নাকি সে? নাকের কাছে হাতটি ফেলে সে শ্বাসের তাপ দেখছিল গরম নয় তো!

তার একটু গন্ধ-বায়ু আছে এ কথা ঠিক। যেখানে কেউ কোনও দুর্গন্ধ পায় না সেখানেও দুর্গন্ধ আবিষ্কার করার আশ্চর্য প্রতিভা আছে তার। গেলবার পিকনিকে যে লোকটা মাংস পরিবেশন করছিল তার জামায় আঁশটে গন্ধ পেয়ে ওয়াক তুলে মরে। মানুষের গায়ের গন্ধ, মুখের গন্ধ, হাসপাতালের গন্ধ, লোহার গন্ধ, বিড়ির গন্ধ, জামাকাপড়ে বাসি গন্ধ—কত গন্ধই যে সারাদিন তাকে তাড়া করে তার ঠিকঠিকানা নেই।

এ-বাড়ির রেওয়াজ হল, জ্বর হলে ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা বন্ধ। সর্ষের তেল আর নুন দিয়ে মাজতে হবে। মাকে কে যে এই নিয়ম শিখিয়েছে কে জানে বাবা! তেল নুন দিয়ে মাজলে দাঁত একটুও পরিষ্কার হয় না, বরং কাঁচা সর্ষের তেল আর নুনে দাঁত ঝিনঝিন করে। নিজের মুখ থেকে যেন বাসি গন্ধ পাচ্ছিল পান্না। আর গা থেকেও বোঁটকা গন্ধ। অপছন্দের গন্ধ সে একদম সইতে পারে না। সে শরীরে ট্যালকম পাউডার ছড়াল। মুখে লবঙ্গ ফেলে চিবোল খানিকক্ষণ। তবু খিতখিত করে তার। কিছু করার নেই বলে উঠে বাসি জামাকাপড় ছেড়ে কাচা শাড়ি পরল। চুল আঁচড়াল। কপালে একটা টিপ সেঁটে নিল। তারপর একখানা গল্পের বই নিয়ে বসল বিছানায়। বিরহের গল্প তার ভীষণ প্রিয়। বিরহের মতো জিনিস আছে! পড়লে চোখে জল আসবে, বুক ভার হয়ে উঠবে, মরে যেতে ইচ্ছে করবে—তবে না গল্প!

এই উপন্যাসটা তার বহুবার পড়া। বামুনের মেয়ে। পড়তে পড়তে উদাস হয়ে মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে পান্না। এত সব বিয়োগান্ত ঘটনা যে, এই সুন্দর ঝকঝকে সকালটা যেন আস্তে আস্তে বিবর্ণ পাঁশুটে হয়ে যেতে থাকে।

সরস্বতী গোবর কুড়োচ্ছে। ময়লা কাপড় পরনে, পিঙ্গল চুল, মুখশ্রীতে কোনও আনন্দ নেই। আজকাল দেখা হলে হাসে একটু, কথা বলতে লজ্জা পায়। সরস্বতী তার সঙ্গে পড়ত। কিন্তু মাথায় পড়া ঢুকত না বলে সিক্স থেকে ফেল করতে শুরু করে। তারপর অনেক পিছিয়ে পড়াই ছেড়ে দিল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল পান্নার। পৃথিবীতে যে কত ট্র্যাজেডি! সরস্বতীর সঙ্গে এখনও তার তুই তোকারির সম্পর্ক। তবু দুজনের যে কত তফাত!

সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে থাকত অমলেন্দু। তাকিয়েই থাকত। শোনা যায় চোখের পলক অবধি পড়ত না। সরস্বতী স্কুলে যাচ্ছে, কদমতলায় ঠিক অমলেন্দু নিষ্ঠার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি চোখ পেতে। সরস্বতী টিফিনের সময় স্কুলের মাঠে খেলছে বা আলুকাবলি খাচ্ছে, উলটোদিকে ঠিক অমলেন্দু দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাচুর মতো।

না, কখনও কথা-টথা বলতে এগিয়ে আসেনি, হাতে চিঠি গুঁজে দেয়নি বা হিন্দি প্রেমের গান গায়নি চেঁচিয়ে। শুধু তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই তেমন করেনি সে।

কিন্তু এতেই ভারী ভয় পেত সরস্বতী। অমলেন্দুকে দেখলেই সে সাদা হয়ে সিঁটিয়ে যেত।

দেখ, দেখ, ছেলেটা আজও দাঁড়িয়ে আছে।

বন্ধুরা বলত, দে না একদিন দু কথা শুনিয়ে।

ও বাবা, সে আমি পারব না, বড্ড ভয় করে।

আহা, ভয়টা কীসের? তুই না পারিস, আমরাই দিচ্ছি শুনিয়ে।

সরস্বতী ভয় খেয়ে বলত, তাতে যদি খেপে গিয়ে আরও কিছু করে?

কী করবে?

কী করবে তা ভেবে পেত না সরস্বতী। মেয়েদের বিরুদ্ধে পুরুষেরা কত কীই তো করতে পারে। অ্যাসিড বালব ছুড়ে মারল, কি কলঙ্ক রটাল বা গুণ্ডা লাগিয়ে টেনে নিয়ে গেল। মেয়েরা কি পারে পুরুষদের সঙ্গে?

বন্ধুরা শেষ অবধি একদিন কদমতলায় ঘিরে ধরল অমলেন্দুকে।

এই যে, আপনি রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন বলুন তো! কী মতলব?

অমলেন্দু ভয়ে লজ্জায় অধোবদন হয়ে, শরীর মুচড়ে সপ্রতিভ হয়ে বলল, এমনি দাঁড়িয়ে আছি। মতলব কিছু নেই।

মতলব নেই বললেই হল! সরস্বতী আপনার ভয়ে স্কুলে যেতে পারছে না। ফের যদি এরকম করেন তা হলে কিন্তু আমরা তোক ডাকব।

অমলেন্দু অপমানিত হয়ে চলে গেল।

প্রকাশ্যে আর সে দেখা দিত না বটে, কিন্তু ঘাপটি মারার সুযোগ তো কম নেই। এই ঘটনার পর সে পুরনো শিবমন্দিরের ভাঙা পাঁচিলের আড়াল থেকে একটা ফুটো দিয়ে সরস্বতীকে রোজ দেখত।

আর কেউ টের না পেলেও সরস্বতী ঠিকই টের পেত অমলেন্দুকে। প্রকাশ্যে একরকম ছিল। তাতে গা-ছমছম করত না। কিন্তু অমলেন্দু যখন আড়াল হল তখন উৎকণ্ঠা আর ভয় বেড়ে গেল সরস্বতীর।

বন্ধুরা এবারও অমলেন্দুকে ধরল। তাদের দেখে সে পালাতে যাচ্ছিল। স্কুলের সাহসী মেয়ে বনলতা দৌড়ে গিয়ে তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেয়।

অতগুলো মেয়ের মারমুখী ভাব দেখে অমলেন্দু ভয়ে কেঁদেই ফেলেছিল।

আমি তো কিছু দোষ করিনি!

দোষ করেননি মানে! আপনি রোজ গা ঢাকা দিয়ে সরস্বতীকে ফলো করেন। আপনার মতলব খারাপ।

বিশ্বাস করুন, আমার খারাপ মতলব ছিল না।

তবে ওরকম করেন কেন?

কী জানি! ওকে না দেখলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়।

বাঃ, বেশ তো কথা! দাঁড়ান, আপনার বাড়িতে বলে দেবো।

না না, বলবেন না। আমি আর আসব না।

অমলেন্দু ভয় পেয়ে কদিন সত্যিই আর সরস্বতীর যাতায়াতের পথে আসত না।

দেখতে সরস্বতী বরাবরই ভাল। সুন্দরী না হলেও মিষ্টি লাবণ্য আছে। ঢলঢলে গোলপানা মুখ, বড় টানা চোখ। কিন্তু ভারী ভিতু। কোনও ছেলের সঙ্গে প্রেম করার কথা ভাবতেই পারত না।

পান্না ওকে বলেছিল, ছেলেটা যখন ওরকম হ্যাংলামি করে তখন একটু-আধটু কথা বললেই তো পারিস। কথাটথা বললে আর ওরকম ছোঁকছোঁক করবে না।

কথা! ও বাবা, ভাবতেই বুক ধড়াস ধড়াস করে। আমি পারব না।

তোর বুক ধড়াস ধড়াস করে কেন? তুই তো আর ওর প্রেমে পড়িসনি।

প্রেম! দুর, কী যে বলিস! বুক ধড়াস ধড়াস করে ভয়ে।

অমলেন্দুরা গাঁয়ের পুরনো লোক হলেও ওরা থাকত বাইরে বাইরে। ওর বাবা শান্তনু ঘোষাল মধ্যপ্রদেশে কলিয়ারিতে চাকরি করতেন। রিটায়ার করে গাঁয়ের পৈতৃক বাড়িতে এসে থিতু হয়েছেন। কাজেই অমলেন্দুর তেমন বন্ধুবান্ধব, দল বা ক্লাব নেই যারা তার পেছনে দাঁড়াবে, শ্যামলা রোগা লাজুক ছেলেটিকে খারাপ বলেও মনে হত না পান্নার।

শান্তনু ঘোষালও নিরীহ সজ্জন মানুষ। রিটায়ার করার পর গাঁয়ে ফিরে সকলের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে পুরনো সম্পর্ক ঝালিয়ে নিতেন। পান্নাদের বাড়িতেও এসেছেন কয়েকবার। তাঁর মেয়ে বড়, ছেলে ছোট। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে অমলেন্দু অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি এসসি পাশ করে বসে আছে। কলিয়ারিতে তার একটা চাকরি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শান্তনু ঘোষাল ছেলেকে মধ্যপ্রদেশে একা ফেলে রাখতে চান না।

পান্না একদিন সরস্বতীকে বলল, হ্যাঁ রে সরস্বতী, অমলেন্দু তো খারাপ ছেলে নয়। তুই ওকে অপছন্দ করিস কেন?

ও এরকম কেন? গাঁয়ে আর মেয়ে নেই?

ওর যে তোকে পছন্দ!

না না বাবা, ওসব আমার ভাল লাগে না।

অমলেন্দু এরপর যেটা করেছিল সেটা একটু বাড়াবাড়ি। স্কুলের পথে দিনের বেলা সরস্বতীকে দেখার যে অসুবিধে আছে সেইটে বুঝতে পেরে সে এরপর রাতের দিকে সরস্বতীর বাড়ির আনাচে কানাচে ঘোরা শুরু করে। সুবিধে হল, সরস্বতীদের বাড়ি একতলা। চারদিকে বাগান আর গাছগাছালি আছে। পাগল প্রেমিক সেইসব গাছপালার মধ্যে সাপ-খোপ উপেক্ষা করে ঘাপটি মারতে পাগল।

একদিন পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে সন্ধেবেলা সরস্বতী লক্ষ করল, জানালার বাইরে পাতিলেবুর গাছটায় হঠাৎ সরসর শব্দ হল।

কে? কে ওখানে? বলে আর্তনাদ করে উঠতেই কে যেন দুড়দাড় দৌড়ে পালায়। লোকটা যে অমলেন্দু তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না সরস্বতীর। বাড়ির লোককে সে ভয় পেয়ে সব বলে দেয়।

বোকা ছেলেটা ধরা পড়ল পরদিনই। বাড়ির লোক ওত পেতে ছিল। লেবু গাছের আড়ালে ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হতেই টর্চ জ্বলল, লাঠিসোঁটা বেরিয়ে এল।

তারপর কী মার! মাথা ফেটে রক্ত পড়ল, ঠোঁট ফুলে গেল, কোমরে চোট হল। উঠোনে দাঁড়িয়ে এই রঙ্গের দৃশ্যটা লোক দেখল। অমলেন্দু মাটিতে পড়ে থর থর করে কাঁপছে। চোখে পশুর মতো বোবা দৃষ্টি।

সেই দৃশ্য দেখতে শান্তনু ঘোষালকে টেনে আনা হল। ভদ্রলোক ছেলের দশা দেখে কেঁপেকেঁপে অস্থির।

অমলেন্দুর বিরুদ্ধে যে সব নালিশ করা হল তার কোনও জবাব দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না শান্তনু ঘোষাল। তিনি শুধু হাতজোড় করে সকলের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। অমলেন্দুর মুখ থেকে কোনও কথাই বেরোয়নি।

ঘটনার দিন দুই বাদেই ছেলেকে নিয়ে শান্তনু ঘোষাল মধ্যপ্রদেশে চলে গেলেন। ফিরলেন প্রায় মাসখানেক পর। নিজের ছেড়ে আসা কলিয়ারিতে ধরে করে অমলেন্দুকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছেন তিনি। ছেলে মুখে চুনকালি মাখিয়েছে বলে গাঁয়েও আর থাকলেন না ভদ্রলোক। শ্বশুরবাড়ি শ্রীরামপুরে বাড়ি কিনে চলে গেলেন।

অমলেন্দু যেদিন মার খায় তার পরদিনও স্কুলে সরস্বতীর সঙ্গে দেখা হল পান্নার। সরস্বতীর মুখচোখ ফুলে আছে কান্নায়। পান্নাকে বলল, জানিস পান্না, আমি কিন্তু সবাইকে বলেছিলাম ওকে মারধর না করতে।

তবে মারল কেন?

বাড়ির লোক সবাই খুব রেগে গিয়েছিল, কেউ কথা শুনল না।

পান্না খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, ভালবাসা জিনিসটা খুব সেনসিটিভ, দু-চারটে ধমক বা অপমান করলেই যথেষ্ট হত। কেন যে তোর বাড়ির লোকেরা বাড়াবাড়ি করল!

আমার বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে।

এখন আর কী করবি! যা হওয়ার হয়ে গেছে।

সরস্বতীর চোখ ফের ছলছল করে উঠল। বলল, আমি ওকে ভয় পেতাম ঠিকই, কিন্তু দেখলাম ও কিছু খারাপ মানুষ তো নয়।

কী করে বুঝলি?

চুপচাপ মার খেয়ে গেল। প্রতিবাদ করেনি।

এখন কি তোর একটু অনুশোচনা হচ্ছে?

ভীষণ। সবসময়ে মনটা খারাপ লাগছে আর কান্না পাচ্ছে।

ক্ষমা চাইবি ওর কাছে?

ইচ্ছে তো করে। কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই এখন আমাকে ভাল চোখে দেখবে না।

তা ঠিক। তাহলে?

তুই একটা কাজ করবি পান্না? আমার হয়ে ওর কাছে যাবি?

গিয়ে?

বলিস আমি ঠিক এরকমটা চাইনি। আমি অত নিষ্ঠুর মেয়ে নই।

বলে কী হবে?

অন্তত জানুক যে, সব দোষ আমার নয়।

তোরই দোষ সরস্বতী। তুই অত ভয় পেতে গেলি কেন? আর কেনই বা বাড়িতে নালিশ করলি? আড়াল থেকে তোকে দেখত। ভাল লাগে বলেই দেখত। সেটা কি খুব বড় অপরাধ?

আর বলিস না। আমার ফের কান্না পাচ্ছে।

পরদিন স্কুলে এসে গোপনে একটা মুখ আঁটা খাম পান্নার হাতে দিয়ে সরস্বতী বলল, তুই এ চিঠিটা ওকে দিস।

কী লিখেছিস চিঠিতে?

যা লেখার লিখেছি।

আমাকে খুলে বল।

লিখেছি আমি ক্ষমা চাই।

আর কিছু?

সরস্বতী মৃদু লাজুক হাসি হেসে বলল, লিখেছি ও যা চায় তাই হবে।

অমলেন্দু কী চায় তা জানিস?

জানব না কেন? আমাকে চায়।

সে তো ঠিক। কিন্তু এখনও চায় কি? এত মারধর অপমানের পরও?

খুব দৃঢ় গলায় সরস্বতী বলেছিল, এখনও চায়।

কী করে বুঝলি?

আমার মন বলছে।

ঠিক আছে, ও যদি তোকে বিয়ে করতে চায়, করবি?

হ্যাঁ। চিঠিতে সে কথাই তো লিখেছি।

তুই তো একদম পালটি খেয়ে গেছিস দেখছি।

হ্যাঁ। ওর জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু মনে রাখিস, ওরা বামুন, আর তোরা কায়েত।

তাতে কী?

বিয়ে করতে চাইলে দু পক্ষেরই আপত্তি হবে।

আমি মাকে রাজি করাব। আর আমার বাবা তো নাস্তিক।

চিঠিটা নিয়ে পান্না সত্যিই গিয়েছিল। ছেলেটার সঙ্গে একান্তে একটু কথা বলারও ইচ্ছে ছিল তার। এরকম লাগামছাড়া প্রেম সে বড় একটা দেখেনি।

গিয়ে দেখে সামনের ঘরে স্যুটকেস বিছানা বাঁধা ছাঁদা হচ্ছে সন্ধেবেলা। শান্তনু ঘোষাল তাকে দেখে বললেন, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না মা। আমার দুর্ভাগ্য। কী যে সব হল?

পান্না বলল, তেমন কিছু তো হয়নি। ওরা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

না মা, ওরা ঠিক কাজই করেছে। উপযুক্ত হয়েছে।

শান্তনু ঘোষাল বলতে বলতে কেঁদেই ফেললেন। অপমানটা বড্ড লেগেছিল ভদ্রলোকের।

অমলেন্দু পাশের ঘরেই শুয়ে ছিল। কপালে, গালে স্টিকার, মাথায় ব্যান্ডেজ। ঘরে ওর মা আর এক পিসি ছিলেন। তাই একান্তে কথা বলার সুযোগ হল না। তাকে দেখে অমলেন্দু এমন লজ্জা আর সংকোচ বোধ করতে লাগল যে, চোখ তুলে তাকাতেই পারল না।

পান্না বলল, ওরকম লজ্জা পাওয়ার মতো কিছু হয়নি আপনার। যারা এ-কাজ করেছে তারাও অনুতপ্ত। হয়তো ক্ষমা চাইতে আসবে।

অমলেন্দু মুখ ঢাকা দিয়েছিল দু হাতে।

ওর মা বলল, প্রাণটা যে বেঁচেছে সে-ই ঢের। গাঁয়ে এসে থাকার সাধ ঘুচেছে মা।

চিঠিটা অনেকবারের চেষ্টায় ওর হাতে গুঁজে দিয়ে চলে এসেছিল সে।

পরদিন সরস্বতী উন্মাদিনীর মতো তাকে ধরল, দিয়েছিলি চিঠি?

হ্যাঁ। কিন্তু ওরা তো শুনলুম মধ্যপ্রদেশে যাচ্ছে।

সে কী! কেন?

ওরা আর এখানে থাকবে না।

যাঃ, হতেই পারে না। থাকবে না কেন?

ওঁরা খুব অপমানিত বোধ করছে। ভয়ও পাচ্ছে।

থম ধরে রইল সরস্বতী। তারপর পান্নার আঁচল চেপে ধরে পাগলের মতো বলতে লাগল, কেন চলে যাবে? কেন চলে যাবে?

পান্না মৃদু স্বরে বলল, অত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? চিঠিটা তো পেয়েছে। ও যদি সত্যিই তোকে চায় তাহলে ঠিক জবাব দেবে।

সেই জবাবের জন্য দুবছর অপেক্ষা করে আছে সরস্বতী। জবাব আসেনি। হয়তো সরস্বতী ওর ঠিকানায় আরও চিঠি পাঠিয়েছে। কে জানে! কিন্তু জবাব আসেনি।

সরস্বতীকে দেখে আজ সকালটায় তার ভারী ভাল লাগল। বিয়ে হল না, কেউ কাউকে পেল না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে টানটা রয়ে গেল। বিরহই ভাল। পান্না উঠে তার প্রেমপত্রের ঝাঁপি নামিয়ে বসল আজ। লেপের তলায় লুকিয়ে পড়তে লাগল।

উনিশ

সুধীর ঘোষের ভূতকে আগে প্রায়ই দেখা যেত এখানে সেখানে। আজকাল আর বিশেষ কেউ দেখে বলে শোনা যায় না। আগেকার লোকেরাও আর নেই। বিজলি বাতি এসে গেছে, গাঁয়ে বসতিও কিছু বেড়েছে, ভূতের এখন জায়গার টান পড়েছে।

সুধীর ঘোষ অল্প বয়সেই দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁর ছিল অঙ্কে ভাল মাথা। নানা দেশে ঘুরে অবশেষে বিলেতে একটা ইস্কুলে মাস্টারির চাকরিতে থিতু হন। শোনা যায়, সেখানে মাস্টারমশাইদের এখানকার মতো দুর্দশার জীবন নয়। সুধীর ঘোষ ভালই ছিলেন। মোটা মাইনে, বাড়ি, গাড়ি সবই হয়েছিল। কিন্তু অঙ্ক কষতে কষতে আর বিয়ে করার ফুরসত হল না। হঠাৎ একদিন দেখলেন, বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। বিলেতের শীত তেমন সহ্য হচ্ছে না। বার দুই নিউমোনিয়ায় ভুগে উঠলেন। বিলেতের ডাক্তাররা বলল, ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে তিনি ভাল থাকবেন। প্রস্তাবটা পছন্দই হল সুধীর ঘোষের। দেশের সঙ্গে বছর পঁয়ত্রিশ সম্পর্ক নেই। অঙ্কে আচ্ছন্ন মাথায় হঠাৎ দেশ-গাঁয়ের চিত্র সব ভেসে ওঠায় মনটা হু-হু করতে লাগল। আপনজন বলতে ভাই, ভাইপো-ভাইঝিরা সব আছে। তারাও চিঠি লিখল দেশে ফিরে আসতে।

অবশেষে সুধীর ঘোষ বিলেতের পাট চুকিয়ে দেশে ফেরার জাহাজ ধরলেন। মনে খুব আশা, শেষ জীবনটা দেশের বাড়িতে নিশ্চিন্তে থাকবেন।

বিস্তর বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে একদিন সুধীর ঘোষ দেশে ফিরলেন। খুব হইচই হল গ্রামে। বিস্তর লোক এসে দেখা করে গেল। সুধীর ঘোষ যখন বিলেতে যান তখন ভাইপো-ভাইঝিদের বেশির ভাগেরই জন্ম হয়নি। দুটি কি তিনটি যারা ছিল তারা তখন খুব ছোট। তিন ভাইয়ের মধ্যে দাদা অধীরের তিন ছেলে, দুই মেয়ে, দাদার পরে সুধীর, তারপর ভাই রণধীরের দুই ছেলে, ছোটো তপোধীরের দুই ছেলে, দুই মেয়ে। পৈতৃক বাড়িতে গিজগিজ করছে লোক। সুধীরের থাকার মতো আলাদা ঘর-টর কিছু নেই। অধীর ভরসা দিয়ে বলল, ঘাবড়ানোর কিছু নেই, দোতলাটা তুলে ফেললেই হবে।

কিন্তু দোতলাটা কে তুলবে সে বিষয়ে কেউ কিছু বলল না। দায় সুধীরের। বিলেত থেকে এসেছেন সঙ্গে মোটা টাকা। সুধীরের অবশ্য আপত্তি হল না। সংসারের প্রতি দায়দায়িত্ব কিছু পালন করেননি। মা-বাবার তেমন সাহায্যে আসেননি। মাঝে মাঝে কিছু টাকাপয়সা পাঠিয়ে দায় সেরেছেন। সুতরাং নিজের পয়সায় দোতলাটা তুলে ফেললেন। বেশ ভাল করেই করলেন। খাট-টাট কিনলেন, চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজালেন।

প্রথম প্রথম আদর যত্নের তেমন অভাব হয়নি। বরং একটু বাড়াবাড়িই হচ্ছিল যেন। সুধীর ঘোষ বেশ খুশি। কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই দাদা অধীর হাজারখানেক টাকা ধার নিল। রণধীরেরও ছেলের পরীক্ষার ফি না কী যেন কম পড়ে গেল। তপোধীর একটা ধানজমি কেনার জন্য খুব চাপাচাপি শুরু করে দিল। বউদি আর বউমারা খুব একটা পিছিয়ে রইল না। নানা না-মেটা শখ আহ্লাদের কথা শোনাতে লাগল।

অধীরের ছেলে শ্যামল ব্যবসা করার জন্য টাকা চাইতে লাগল। ভাইঝিদের মধ্যে দুজনের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা শুনিয়ে গেল বিয়েতে কাকার কাছ থেকে তারা কোনও উপহার পায়নি।

দু মাসের মাথায় সুধীর বুঝতে পারল, এরা তাকে কামধেনু ঠাউরেছে। যার ফলে যে যা নিচ্ছে তার একটি আধলাও শোধ দিচ্ছে না। বরং বাজার হাট, সংসার খরচের টাকা এক রকম চেয়েই নিচ্ছে। এভাবে চললে যে বিলেত থেকে আনা টাকা বেশিদিন থাকবে না, তা অঙ্কবিদ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন।

মহিমের বাবা তখন বেঁচে। উঠোনের উত্তর ধারে সকালে শীতের রোদে সুধীর ঘোষ বাঁদুরে টুপি আর তুষের চাদর জড়িয়ে জাম্বুবান সেজে এসে বসতেন। পায়ে হাঁটু অবধি উলের মোজা। হাতে দস্তানা। ঠান্ডার ভয়ে কাবু।

দুঃখ করে বলতেন, ভাল ভেবে দেশে ফিরলুম, কিন্তু এ যে বড্ড খরচের ধাক্কায় পড়ে যাচ্ছি।

মহিমের বাবা বললেন, তুই একটা আহাম্মক। প্রথম কথা বাড়ি ভাগ বাঁটোয়ারা না করেই পট করে দোতলা তুলে ফেললি। কার ভাগে কী পড়বে তা না জেনেই ওসব করতে আছে! এখন হিস্যা নিয়ে গণ্ডগোল লাগলে মুশকিলে পড়বি। তার ওপর ওরা তোকে যেভাবে দুইয়ে নিচ্ছে তাতে সর্বস্বান্ত হতে দেরি হবে না।

এখন কী করি দাদা, একটা পরামর্শ দিন।

যা গেছে তা তো গেছেই। ও নিয়ে ভাবিস না। যা আছে তা নিয়ে ফের বিলেতে পালিয়ে যা।

তা কি হয়? ও পাট যে চুকিয়ে দিয়ে এসেছি।

ফিরে গেলে কি আর চাকরি-বাকরি জুটবে না তোর?

তা জুটবে। কিন্তু বুড়ো হচ্ছি, একা থাকতে কেমন কেমন লাগে। তার ওপর ঠান্ডাটাও সহ্য হচ্ছে না আজকাল।

তোর বয়স কত হল? ছাপ্পান্ন সাতান্ন হবে?

সাতান্ন পুরে গেছে।

গাঁদেশে এই বয়সে লোকে বিয়ে-টিয়ে করে। করবি?

ও বাবা! বিয়ে! পাগল নাকি?

তাহলে তোকে রক্ষে করবে কে? তোর তো একটা জন চাই।

মায়ের পেটের ভাইরাই যদি জন না হয় তাহলে অনাত্মীয় একটা মেয়ে এসে কি জন হতে পারবে?

দুনিয়ার নিয়মই যে তাই। বউ যেমনই হোক, তোর স্বার্থ দেখবে। এরা দেখবে না। ভাল করে ভেবে দেখ।

উঠোনের ওই কোণটায় রোজই শীতে জবুথবু সুধীরকাকাকে বসে থাকতে দেখা যেত। মুখখানা বড্ড কাহিল।

একদিন বললেন, আমার ক্যামেরাটা পাচ্ছি না। ভাল জাতের লাইকা ক্যামেরা, অনেক দাম।

চুরি হয়েছে নাকি?

মুখখানা চুন করে সুধীরকাকা বললেন, মদনা কয়েকদিন ধরেই চাইছিল। বন্ধুদের সঙ্গে নাকি কোথায় বেড়াতে যাবে, ছবি-টবি তুলবে। আমি বললাম, এ খুব কমপ্লিকেটেড জিনিস, তুই হ্যান্ডেল করতে পারবি না। তাতে বাবুর মুখ ভার হয়েছিল। কাল রাত থেকেই দেখছি ক্যামেরাটা সুটকেসে নেই।

মহিমের বাবা বললেন, ভাল করে খুঁজেছিস?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুধীর বললেন, খুঁজে লাভ নেই দাদা। এর আগেও কয়েকটা জিনিস গেছে। একটা রোলেক্স হাতঘড়ি ছিল, দিন দশেক আগে সেটা হাপিস হয়। জিলেটের রেজার, অডিকোলোন, সাবান, একটা ভাল সোয়েটার, টুকটাক আরও সব জিনিস হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির লোককে জিজ্ঞেস করলে সবাই আকাশ থেকে পড়ে। দাদা তো কালকেই বলছিল, সত্যিকারের গেছে, নাকি বানিয়ে বলছিস!

মহিমের বাবা বললেন, আরও যাবে। তোর সবই যাবে। এখনও পালানোর সময় আছে। টাকাপয়সা কেমন গেছে?

ওটা বর্ধমানের ব্যাঙ্কে আছে। নগদ সামান্যই ঘরে থাকে।

বিলেতে যদি নাও যাস অন্তত আলাদা বাড়ি করে থাক। তাতেও খানিকটা রক্ষে পাবি।

কাঁচুমাচু হয়ে সুধীরকাকা বলেন, একা থাকব বলে কি দেশে ফিরে এলুম দাদা?

কী করবি? বাঁচতে তো হবে!

আর একটু ভেবে দেখি।

একটু শক্ত হওয়ার চেষ্টা কর।

কিন্তু সুধীর ঘোষ লড়াইটা হেরে যাচ্ছিলেন অন্য কারণে। বাড়ির সবাইকে চোর ছ্যাঁচড় বলে প্রকাশ্যেই গালমন্দ করায় গোটা পরিবারটাই তাঁর বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে গেল। "বিলেতের সাহেব" বলে সবাই আওয়াজ দিতে শুরু করল। সুধীর ঘোষ একা হয়ে পড়তে লাগলেন।

সাত আট মাস এভাবেই গেল। একদিন এসে মহিমের বাবাকে বললেন, আপনার পরামর্শই মেনে নিচ্ছি। বিয়ে করব। একজন ঘটক ঠিক করে দিন তো।

মহিমের বাবা সর্বানন্দ ঘটককে খবর দিলেন।

সর্বানন্দ ঘটক মহিমদের বাড়িতে এসেই দেখা করলেন সুধীরের সঙ্গে। বললেন, বয়েসটা তো একটু ঢলেছে, গরিবগুর্বো ঘরের মেয়ে হলে চলবে তো!

চলবে। হাতে আছে?

তা থাকবে না কেন? এদেশে ভিখিরিরও বিয়ে হয়।

তাহলে দেখুন।

সুন্দরী হবে না, তবে কাজের মেয়ে হবে।

সুধীর তাতেও রাজি।

সর্বানন্দ যে সুধীরের জন্য পাত্রী দেখছেন তা চেষ্টা করেও গোপন রাখা যায়নি। একদিন ঘোষ বাড়িতে তুমুল হই-হল্লা হয়ে গেল। সুধীর ঘোষকে প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করারই জোগাড় করে ফেলল ভাইপোরা। ভাই আর ভাইয়ের বউয়েরাও চেঁচামেচি কিছু কম করল না। বুড়ো বয়সে বিয়ে— ভীমরতি ইত্যাদি বলে গাঁয়েও একটা জনমত তৈরি করে ফেলল তারা। গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বররাও রুখে দাঁড়াল সুধীবের বিরুদ্ধে। গাঁয়ের ছেলে হলেও সুধীর বিদেশে ছিলেন, সুতরাং তাঁর দিকে জনমত কম।

মহিমের বাবা বললেন, কী রে, কী করবি এখন?

তাই ভাবছি। দেশে ফিরে যে কী ভুলই করেছি!

মহিমের বাবা বললেন, ভুলটা তোর অন্য জায়গায়। এতকাল বিদেশে পড়ে থেকেছিস বলে দেশ আর আত্মীয়স্বজন সবই তোর পর হয়ে গেছে। প্রবাসী থাকা সেই কারণেই ভাল নয়।

আবার ফিরে যেতে ইচ্ছেও হচ্ছে না। এখন আমার আর বিলেতে থাকতে ইচ্ছে হয় না।

তাহলে কলকাতা বা নিদেন বর্ধমানে গিয়ে থাক। বড় শহরে গাঁয়ের কূটকচালি নেই, আত্মীয়রাও নাগাল পাবে না।

সুধীর ঘোষ থম হয়ে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ বাদে বললেন, ওদের কেউই আমার আপন হল না কেন বলুন তো! একই বংশ এক পরিবার, বাবা মাও এক। তবে গণ্ডগোলটা কোথায়?

সংসার মানেই গণ্ডগোল।

তাই দেখছি।

আরও দেখবি।

অঙ্কবিদ সুধীর শেষ জীবনের অঙ্ক মেলাতে হিমসিম খাচ্ছিলেন। সাহেবদের দেশে একা থেকে একটা জীবন কাটিয়ে এসে যে তাকালের মধ্যে পড়েছেন তা সামলে ওঠার কায়দাই তাঁর জানা ছিল না। গাঁয়ের বিজ্ঞ-বিচক্ষণ কিছু মানুষ উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপনের জন্য মিটিং বসাল। সুধীর ঘোষের ভাইরা সেই মিটিং-এ পরিষ্কার বলল, সুধীর সংসারের জন্য এতকাল কিছুই করেননি, এখন উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। এ-বাড়িতে থাকতে হলে তাঁকে মাথা নিচু করেই থাকতে হবে।

বাইরের লোক এসে যে সুধীর ঘোষের সমস্যা মেটাতে পারবে না সেটা মহিমের বাবা ভালই জানতেন। তিনি বললেন, ওরে, ওভাবে হবে না। তোর এখন তফাত হওয়া দরকার।

সুধীর থম মেরে বসে থাকেন। রা কাড়েন না। হয়তো তাঁর একটা ভুল ধারণা ছিল যে, আত্মীয়তাই আসলে সম্পর্ক। কিন্তু সম্পর্ক যে একটা আলাদা জিনিস, সেটা যে রচনা করতে হয় এ ব্যাপারটা তাঁর জানা ছিল না। এই নবোদিত জ্ঞান তাঁকে ঠিক করে না তুলে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিল। অনেকক্ষণ বাদে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওরা তো আমাকে চায় না, আমার পয়সাকড়িই চায়। ভাবছি টাকাপয়সাগুলো ওদের দিয়েই দেবো, তাতে যদি মন পাওয়া যায়।

মহিমের বাবা বলেছিলেন, সেটা আর একটা আহাম্মকি হবে।

কিছুদিন পর দেখা যেতে লাগল, বিলেত ফেরত সুধীর ঘোষ একা একা গাঁয়ের পথে পথে ঘুরছেন আর আপনমনে বিড়বিড় করছেন। চোখে গোল রোল্ডগোল্ডের ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে অস্থির চোখে চারদিকে তাকান। যথারীতি গাঁয়ের ছেলেরা তাঁর পিছুতে লাগল, ঢিল পাটকেল মারতে লাগল, তাঁকে নিয়ে ছড়া বাঁধতে শুরু করল। পাগলামির প্রথম লক্ষণ দেখা দিলেই এসব প্রতিক্রিয়া হয়েই থাকে। মানুষের ভিতরে করুণা ও নিষ্ঠুরতা দু রকমের বীজই উপ্ত থাকে।

মহিমের বাবা দুঃখ করে বলতেন, এত বড় অঙ্কের মাথা ভূ-ভারতে বিরল। কিন্তু অত প্রতিভাই বোধহয় ওর কাল হল। সাহেবদের দেশে তবু বুঝবার মানুষ ছিল, গাঁয়ে-গঞ্জে ওর দামই বুঝল না কেউ।

ধীরে ধীরে সুধীর ঘোষ রাস্তার পাগলই হয়ে যেতে লাগলেন। চেঁচামেচি করতেন না, কাউকে উলটে তেড়েও যেতেন না। শুধু বিড়বিড় করতেন আর চারদিকে ভিতু চোখে তাকাতেন। বাড়ির লোকেরা তখনও

দুবেলা খাবার-টাবার দিত। শোনা যায়, পাগলামির প্রথম দিকেই বর্ধমানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের টাকাপয়সা তিনি ভাইদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেন। সেইজন্যই বোধহয় ভদ্রতাবশে ভরণপোষণটা বন্ধ করা হয়নি।

ঠান্ডার ধাত ছিল। সুতরাং বিলেত থেকে ফেরার বছর দুয়েকের মাথায় সুধীর ঘোষকে শীতকালে একদিন এক মাঠের ধারে গাছতলায় ভোরবেলা পড়ে থাকতে দেখা গেল। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে, বুকে প্রবল শ্লেষ্মার শব্দ।

দিন দুই বাদে বর্ধমানের হাসপাতালে সুধীর ঘোষ মারা যান।

লোকটা গাঁ থেকেই মুছেই গেলেন এক রকম। তাঁকে মনে রাখার তেমন কোনও কারণ ছিল না। মহিমের বাবা শুধু মাঝে মাঝে বলতেন, পণ্ডিত মানুষ যে এরকম আঁকাড়া বোকা হয় তা এই প্রথম দেখলুম। ঘটনাটা প্রথম ঘটল একদিন নিশুত রাতে। মহিমের বাবা রাতে পেচ্ছাপ করতে উঠে দক্ষিণের জানালার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পান জানালার ওপাশে এক জোড়া গোল গোল চশমার ফ্রেম চিক চিক করছে।

কে রে, কে ওখানে? বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

তখন গাঁয়ে এত লোকবসতি ছিল না। বাড়ির লোকজন উঠে বাতি-টাতি জ্বেলে দেখল, কেউ নেই। জানালার ওপাশে দুর্ভেদ্য কাঁটা গাছের জঙ্গল বলে সেখানে কারও যাওয়ার কথাও নয়।

পরদিন মহিমকে তিনি বললেন, হতভাগাটাই এসেছিল।

কে বাবা?

সুধীর। আত্মাটা কষ্ট পাচ্ছে।

এক রাতে তপোধীরের বউ বাচ্চার মুতের কাঁথা পালটাতে উঠে সলতে কমানো লণ্ঠনের মৃদু আলোয় কাঠের বড় আলমারির পাশে ঝুঁঝকো আঁধারে হঠাৎ দুখানা গোল চশমা দেখতে পেল। ভয়ে চিৎকার দিয়ে মূর্ছা গিয়েছিল সে। দাঁতকপাটি লেগে নীলবর্ণ হয়ে যায় যায় অবস্থা।

এর পর দেখল অধীর ঘোষ। দোতলার ঘর দুখানা সুধীর ঘোষ মারা যাওয়ার পর সে-ই দখল করেছিল। সেই দোতলার জানালায় একদিন মাঝরাতে রোল্ডগোল্ডের চশমা জোড়া দেখা দিল। ভয় খেয়ে অধীর ঘোষ গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করে এল।

কিন্তু তাতেও গোল চশমার আবির্ভাব ঠেকানো যায়নি। মাঝেমধ্যেই এ ও সে মাঝরাতে গোল চশমা দেখতে লাগল। এমনকী রাতচরা মানুষের অনেকেই এমনও নাকি দেখেছে যে, সুধীর ঘোষ ফাঁকা রাস্তায় বিড়বিড় করতে করতে হেঁটে যাচ্ছে। গলা খাঁকারির শব্দ, কাশির আওয়াজ এসবও নাকি শোনা যেত ঘোষ বাড়ির আনাচে কানাচে।

কালক্রমে সবই আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। ভূতপ্রেতরাও পুরনো হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে সুধীর ঘোষের প্রেতাত্মাও বিলীন হয়ে গেল।

কত কালের কথা!

বহু বছর পরে তাই হঠাৎ মাঝরাতে পেচ্ছাপ করতে উঠে উঠোনের দিককার ভেজানো জানালার পাল্লাটা খোলা দেখে হ্যারিকেন উসকে মহিম তাকিয়ে দেখে দুখানা গোল ধাতব ফ্রেমের চশমা অন্ধকারে ভেসে আছে।

মহিমের বুকটা ছলাত করে উঠল। আশির কাছাকাছি বয়সে হৃদযন্ত্র এখন তো আর মজবুত নেই। ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছিল বুকে, সঙ্গে যেন একটা ক্ষীণ ব্যথাও। মরেই যাবে নাকি সে? আর মৃত্যু সন্নিকট বলেই কি

সুধীর ঘোষ এসে হাজির হয়েছে?

কে? কে ওখানে? কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে মহিম।

বাবা! আমি—আমি অমল!

হাঁ করে বাক্যহারা হয়ে কিছুক্ষণ জানালার বাইরে চেয়ে থেকে মহিম বলে, অমল!

হ্যাঁ বাবা।

তুই এত রাতে বাইরে কেন?

একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।

মহিম ঘড়ি দেখল। জাম্বুবান টেবিল ঘড়িটায় রাত আড়াইটে। এই অশৈলী সময়ে তো কেউ প্রাতর্ভ্রমণে বেরোয় না!

তোর কি ঘুম আসছে না?

আজকাল প্রায়ই ঘুম আসে না।

মহিম দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, আয়, ভিতরে আয়।

এই ছেলের সঙ্গে মহিমের সম্পর্ক নেই বহুকাল। যখন স্কুলে ভাল রেজাল্ট করে বেরোল, যখন গ্রামে সবাই পঞ্চমুখে সুখ্যাতি শুরু করল তখন থেকেই। মহিম তখন থেকেই তার এই মেধাবী ছেলেটিকে একটু একটু সমীহ করতে আর মৃদু ভয় পেতে শুরু করে। সে নিজে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজিতে এম এ হওয়া সত্ত্বেও। আসলে নিজের জ্ঞানগম্যি, ডিগ্রির ওপর তার কোনও ভরসাও ছিল না কখনও, যখন থেকে ছেলেকে ভয় খেতে শুরু করল তখন থেকেই রচিত হল এক অনতিক্রম্য দূরত্ব। অমল বাবাকে বিশেষ গ্রাহ্য করত না। ব্যক্তিত্বহীনদের কপালে সবসময়েই উপেক্ষা জোটে। নিজেদের তারা না পারে জানান দিতে, না পারে তুলে ধরতে। দুর্বলচিত্ত মহিম বাড়ির কারও কাছেই তেমন গুরুত্ব পায়নি কখনও।

অমলের সঙ্গে দূরত্ব আরও বাড়ল ওর বিয়ের পর। বিদেশে যাওয়ার পর আরও। পরই হয়ে গেল ছেলেটা।

আজকাল যে মাঝে মাঝে আসে বা বউ বাচ্চাদের গাঁয়ে পাঠিয়েছে এটা ভাল লক্ষণ বটে, কিন্তু মহিমের সঙ্গে সম্পর্কটা আর কাছের হয়নি। কখনও হয়তো খেয়াল হলে একটা দায়সারা প্রণাম করে বা খুব আলগা একটা কুশল প্রশ্ন করেই সরে যায়। মহিম এই আলগোছ আত্মীয়তাটা এক রকম মেনেই নিয়েছে। তার কোনও নালিশ নেই, অভিযোগ বা অভিমান নেই। ওরা ভাল থাকলেই ভাল। ব্যক্তিত্ব জিনিসটা সকলের থাকে না, কেউ কেউ ওটা নিয়েই জন্মায়। জন্মগত না হলে ব্যক্তিত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়, এটা বুঝে গেছে মহিম। গৌরহরি চাটুজ্জেকে দেখে দেখেই ব্যাপারটা সে বুঝেছে। ছেলেপুলেরা যে তার আপন হল না, কাছের হল না এটা তার নিজেরই অযোগ্যতা বলে সে মনে করে। এই বয়সে আর স্রোতের ধারাকে উলটেও দিতে পারে না সে।

পুজোতেই শীত পড়েছিল। দুদিনেই শীত আরও তীব্র হয়েছে। কনকনে উত্তুরে হাওয়ায় হাত-পা জমে যাওয়ার জোগাড়। এই বাঘা শীতেও অমলের গায়ে গরম জামা নেই। গায়ে একটা পাতলা গেঞ্জি, তার ওপর ধুতির খুঁট জড়ানো। পায়ে চটি। সংকোচে সে ঘরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে দেখছিল। চাউনিটা অস্থির, তাতে কোনও পর্যবেক্ষণ নেই!

এই শীতে গায়ে গরম জামা দিসনি কেন?

অমল মহিমের মুখের দিকে গভীর অন্যমনস্কতায় চেয়ে থেকে বলে, এমনিই। আমার তেমন শীত করছে না।

অমলের চোখের চশমাজোড়া অবিকল সুধীর ঘোষের চশমার মতো। দুটি নিখুঁত গোলাকার কাচ রোল্ডগোল্ডের ফ্রেমে বসানো। বহুকাল বাদে যেন সেই সুধীর ঘোষই ফিরে এসেছে। এরকম গোল ফ্রেমের চশমা কি আজকাল কেউ পরে! কে জানে বাবা, পুরনো সব ফ্যাশন ফিরিয়ে আনাটাই বোধ হয় আজকালকার রেওয়াজ।

এখন বড্ড হিম পড়ে। ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ভয় আছে।

মহিম যথেষ্ট জোর বা শাসনের মতো করে কথাটা বলতে পারে না। এমনকী স্নেহেরও যে একটা জোর থাকে সেটাও তার গলায় এল না। অমল এখন বড্ড দূরের মানুষ, একজন জেন্টেলম্যান।

ঠান্ডাটাই আমার দরকার ছিল। মাথাটা গরম লাগছিল খুব।

অকূল পাথারে পড়ে যায় মহিম। জিজ্ঞেস করাটা উচিত হবে কি না, জিজ্ঞেস করলে রেগে যাবে কিনা এসব ভেবে দোনোমোনো করে বলেই ফেলল, মাথা গরম লাগছিল কেন?

ব্যক্তিগত ব্যাপারে বেশি প্রশ্ন করাটা আজকাল কেউ বিশেষ পছন্দ করে না। তাতে তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয়ে যায়।

অমল অবশ্য উদাস মুখে চেয়ে থেকে বলল, নানারকম চিন্তা করে করে এরকম হয় মাঝে মাঝে।

এর পরের স্বাভাবিক প্রশ্ন হতে পারত এই চিন্তা কীসের বা কেন এত চিন্তা করিস গোছের কিছু। মহিম প্রশ্নটা করতে গিয়েও সতর্ক হল। নিজের এই মেধাবী ও উজ্জ্বল ছেলেটির মনোজগৎ তো তার মতো সাদামাটা নয় নিশ্চয়ই! ওর মনের খবর তার মতো গেঁয়ো লোক কীভাবে বুঝতে পারবে? বয়সে ছোট হলেও অমল যে অনেক উঁচু থাকের মানুষ।

মহিম বলল, মানুষের মন সর্বদাই কিছু না কিছু ভাবে। চিন্তা ছাড়া এক মুহূর্ত কাটে না কারও।

আমি একটু বসি বাবা?

শশব্যস্তে মহিম বলে, বোস না, বোস। ওই কাঠের চেয়ারটায় বসবি নাকি বিছানায় লেপ চাপা দিয়ে—?

না না, চেয়ারই ভাল।

অমল বসল। বসার ভঙ্গিতেই বোঝা গেল, খুব ক্লান্ত।

মৃদু একটা অ্যালকোহলের গন্ধ পাচ্ছিল মহিম। দরজাটা বন্ধ করে দিতেই গন্ধটা একটু প্রকট হল। অমল যে একটু আধটু মদ-টদ খায় তা মহিম জানে। খেতেই পারে। আজকাল মদ খাওয়াটাই তো রেওয়াজ। চিন্তার কথা হল মদ খেয়ে ঘুম আসবার কথা, কিন্তু অমলের ঘুম আসছে না।

মহিম বিছানায় অমলের মুখোমুখি বসে ওর দিকে একটু চেয়ে থাকে। ছেলে সিলিং-এর দিকে মুখ করে বসে আছে। চোখ বোজা।

আমি আপনার ঘুম ভাঙাইনি তো!

না। আমি রাতে বার দুই উঠি। এখন উঠতেই যাচ্ছিলাম। আগে টানা ঘুম হত, আজকাল হয় না।

আপনার কত বয়স হল?

আশির কাছাকাছি।

চোখ খুলে সামান্য বিস্ময়ের সঙ্গে অমল বলে, এত!

মহিম সামান্য হাসে, তা হবে না? বয়স কি বসে থাকে!

আমার ধারণা ছিল আপনি সত্তরের কাছাকাছি বোধ হয়।

সত্তর কবে পেরিয়ে এসেছি।

আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করছি না তো!

বিলিতি ভদ্রতা। মহিম মাথা নেড়ে বলে, না, ডিস্টার্বের কী আছে? বললাম না, ঘুম এমনিতেই কমে গেছে।

আজ রাতে যখন ঘুম আসছিল না তখন বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আজ একা একা ঘুরতে ঘুরতে আমার একটু ভয়-ভয় করছিল।

ভয়! ভয় তো হতেই পারে। তোরা শহরে থাকি, সেখানে এত সুনসান হয়ে যায় না। গাঁ নির্জন জায়গা। তার ওপর কুকুর-টুকুর আছে, তাড়া করে।

না, ওসব ভয় নয়।

তবে?

কী জানি, কেবলই মনে হচ্ছিল চারদিক থেকে যেন একটা হাহাকার শুনতে পাচ্ছি।

হাহাকার!

হ্যাঁ, ঠিক বোঝানো যাবে না। এ সেন্স অফ লস। গ্রেট লস।

বহু টাকা মাইনের চাকরি, মাথায় বিদ্যে গিজগিজ করছে, তবে ভয় পায় কেন ছেলেটা? কীসের হাহাকার! ওর তো বগলে চাঁদ!

মহিম গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, তোর মনটা কি খারাপ?

হ্যাঁ, খুব খারাপ।

কেন রে, মন খারাপের কী হল?

মনের ওপর তো কারও হাত নেই।

তা তো ঠিকই।

আমার মনটা রোজই একটু একটু করে খারাপ হয়েই যাচ্ছে। কিছুতেই ভালর দিকে যাচ্ছে না।

তোর শরীর কেমন?

শরীরের খবর জানি না। বোধ হয় খারাপ নয়।

শরীর ভাল আছে বলছিস?

বললাম তো, সমস্যাটা শরীরের নয়। মনের।

মহিম চিন্তিত হল। কিন্তু দিশা পেল না। একটু ভেবে বলল, বউমার সঙ্গে কিছু হয়নি তো!

মাছি তাড়ানোর মতো মুখের সামনে হাতের একটা ঝটকা দিয়ে বিরক্তির সঙ্গে অমল বলে, বউমার কথা ছাড়ুন তো। ও কোনও ফ্যাক্টর নয়।

মহিম সতর্ক হল। বেফাঁস কথা বলা চলবে না। একটু ভেবে বলল, মনটা কি গাঁয়ে এসেই খারাপ হল নাকি?

না বাবা। মনটা ইদানীং আমার সবসময়েই খারাপ। সবচেয়ে ভয়ের কথা আমার যে ফোটোগ্রাফিক মেমরি ছিল সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজকাল অনেক কিছু ভুলে যাই, যা ভুলবার কথা নয়।

মহিম ঘরের কমজোরি বালবের আলোয় নিজের ছেলেটির দিকে চেয়ে খুব অবাক হয়ে ছেলের মুখশ্রীতে আর গোল চশমায় সুধীর ঘোষের ছায়া দেখতে পাচ্ছিল। সর্বনাশ! সুধীর ঘোষই আবার তার ছেলে হয়ে জন্মায়নি তো!

এক মুহূর্তের বিভ্রম কাটিয়ে উঠল মহিম। কী যে সব ছাতামাথা মনে হয় তার। মাথাটাই ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বুড়ো বয়সে। নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মনের দুর্বলতাটা কাটিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা করে সে বলল, তোর টেকনিক্যাল নলেজের মেমারিও কি কমে যাচ্ছে?

মাথা নেড়ে অমল বলে, না, সেসব ঠিক আছে। ভুল হচ্ছে মানুষের মুখ, নাম, ছোটখাটো ঘটনা, ঠিকানা এইসব। কোথাও যেতে যেতে হঠাৎ মাঝপথে মনে হয়, আরে! কোথায় যাচ্ছি আমি! কোথায় যাওয়ার কথা তা মনে পড়তে সময় লাগে।

ওটা বোধ হয় লস অফ মেমারি নয়।

তাহলে কী?

বোধ হয় প্রি-অকুপেশন। একটা কোনও নিবিষ্ট চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলে স্মৃতি একটু ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

আপনি কি সাইকোলজি জানেন?

না বাবা, জানি না। তবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে অভিজ্ঞতা অনেক কিছু শেখায়। তোমরা হয় তো দাম দেবে না তার।

অমল চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ ভাবল।

তার পর বলল, কিছু একটা হবে। সামথিং ইজ রং উইথ মি।

নিজেকে নিয়ে অত ভাবিস না। অন্যদের নিয়ে ভাব।

অমল বোধ হয় কথাটা শুনতে পেল না। ঘরের একটা অনির্দেশ্য জায়গায়, একটু ওপর দিকে অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে থেকে বলল, মাথাটা গরম লাগছিল বলে রাত দেড়টায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। চেনা গ্রাম, চেনা রাস্তা, তবু কিছুক্ষণ হাঁটার পরই মনে হতে লাগল, জায়গাটা আমি একদম চিনতে পারছি না। কোথায় এলাম, কোথায় যাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তার পর হঠাৎ মনে হল আকাশ থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো কী যেন ঝরে পড়ছে চারদিকে। খুব সূক্ষ্ম, পাউডারের চেয়েও মিহি গুঁড়ো। ভয় হচ্ছিল, গ্রহ নক্ষত্র সব কিছুর আয়ু ফুরিয়ে গেছে, সব গুঁড়ো গুড়ো হয়ে পড়ে যাচ্ছে। এত ভয় পেলাম যে, দৌড়োতে শুরু করলাম।

মহিমের হঠাৎ মনে হল, অমল তাকে উদ্দেশ করে নয়, সম্পূর্ণ বে-খেয়ালে আপন মনেই কথা বলে যাচ্ছে। ও কি একা কথা বলে? ও কি সুধীর ঘোষের পুনর্জন্ম?

মহিম নড়েচড়ে বসে। মন থেকে অলক্ষুণে চিন্তাটাকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতে করতে বলে, সব কিছুরই পরিণতি আছে। ধ্বংস হয়, আবার জন্মায়। শাস্ত্রে ওকে কল্পান্ত বলে।

অমল কথাটা কানে তুলল না। শুনতেই পেল না বোধ হয়। তেমনই বিভোর হয়ে বলতে লাগল, একটা হাহাকার শুনতে পাচ্ছিলাম। যেন চারদিকে হায় হায় শব্দ। বিষাদ-সিন্ধুতে যেমন ছিল।

ওসব ভাবতে নেই।

আমি যেন চারদিকে কুলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

তুই বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞান আমাদের কাণ্ডজ্ঞান আর বাস্তববুদ্ধিই তো দেয়। মনটাকে দুর্বল হতে দিস কেন, নির্মোহ বিজ্ঞানের চোখে দুনিয়াটাকে বিচার কর। দেখবি মনটা সহজ হয়ে গেছে।

অমল একথাটাও যেন শুনতে পেল না। শুধু আপনমনে বলল, এত ভ্যাকুয়াম, এত ফাঁকা, এত অর্থহীন কেন যে লাগছে!

মহিম বলল, আয়, এখানেই শুয়ে পড়।

একথাটা শুনতে পেল অমল। বলল, শুয়ে পড়ব।

হ্যাঁ, শুয়ে পড়।

এটা তো আপনার বিছানা।

তাতে কী? তুই শো।

আপনি কোথায় শোবেন?

আমি আর শোব না। ঘুম যেটুকু হওয়ার হয়ে গেছে। রাত সোয়া তিনটে বাজে এখন। আমি তো ভোর চারটেয় উঠে পড়ি।

অমল হঠাৎ লোভাতুর চোখে চেয়ে বলল, শোব?

হ্যাঁ। বলছি তো, শুয়ে থাক।

অমল চটিজোড়া ছেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে মশারির তলায় ঢুকে গায়ে লেপটা টেনে বাচ্চা ছেলের মতো শুয়ে পড়ল। এবং প্রায় দু মিনিটের মাথায় ঘুমিয়ে পড়ল। ছেলের নাকের ডাক শুনতে পেল মহিম।

মদটা কি একটু বেশি মাত্রায় খেয়ে ফেলেছে আজ? তাই হবে বোধহয়। যদিও কথাগুলো ঠিক মাতালের মতো বলছিল না। কিন্তু মদের একটা ঘোর আছে বোধহয়।

মহিম একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। দূরে দূরে ছিল বেশ ছিল। দুশ্চিন্তা করতে হত না। কিন্তু এই যে আজ রাতে কাছে এল, এত কথা বেরোল পেট থেকে এইতেই মনটা খচ খচ করে। আবার এই বুড়ো বয়সে নতুন নতুন দুশ্চিন্তা এসে মাথায় চাপে।

ভোর হল। তারপর বেলাও গড়িয়ে গেল অনেকটা। মহিম পুজোপাঠ সেরে রোদের উঠোনে চেয়ার পেতে বসে সকালটাকে পেকে উঠতে দেখল। মনটা ভাল নেই। ছেলেটা কষ্ট পাচ্ছে।

আজকাল প্রায় প্রতিদিনই সকালে ধীরেন এসে হানা দেয়। বাড়িতে তার আদর নেই। অভাবের সংসার। সকালে চা-টুকু অবধি জুটতে চায় না। তাই একটু চায়ের লোভে এতটা পথ ঠেঙিয়ে আসে। আজও এল।

এ-বাড়ির কেউ ধীরেনকে পছন্দ করে না। একে তার জামাকাপড় নোংরা। তায় সকলের ধারণা ধীরেন লোভী, হ্যাংলা। মাঝে মাঝে ধারকর্জ চায়, শোধ দিতে পারে না বলে বদনামও আছে তার। তবে ধীরেন পাঁচ-দশ টাকার বেশি ধার চায় না কখনও। তাই দিতে গায়ে লাগে না বড় একটা।

আর কেউ পছন্দ না করুক, ধীরেন এলে মহিম খুশি হয়। লোক যেমনই হোক, পুরনো মানুষ তো! কত কালের চেনা। খানিকটা বন্ধুর মতোই ছিল এক সময়ে। আবার ঠিক বন্ধুও নয়। আজ্ঞাবাহী ছিল খুব। ফাই-ফরমাশ খেটে দিত হাসিমুখে। এখন বুড়ো হয়েছে, কিন্তু সেই বশংবদ ভাবটা যায়নি।

আজ সকালের ফর্সা আলোয় কালো ধীরেনকে দেখে মহিম অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশি খুশির গলায় বলল, আয় ধীরেন, বোস।

ধীরেন কষ্টে সসংকোচে মোড়াটা টেনে নিয়ে বসল। মুখে গ্যালগ্যালে হাসি। গায়ে একটা উলোঝুলো পুরনো ঢলঢলে পুলওভার। মাথায় বাঁদুরে টুপি। পরনে ধুতি। বহুরূপীর মতোই দেখাচ্ছে।

পুরনো দিনের কথাই হয় বেশির ভাগ।

হ্যাঁ রে ধীরেন, তোর সুধীর ঘোষের কথা মনে আছে?

খুব। সেই ম্যাথেমেটিশিয়ান তো!

হ্যাঁ।

ওরকম মাথাওলা লোক আর এ-গাঁয়ে হয়নি।

তার কথা সব মনে আছে?

থাকবে না? যত বুড়ো হচ্ছি পুরনো দিনের কথা ততই ফুটে উঠছে। আশ্চর্য ব্যাপার।

তুই কখনও সুধীব ঘোষের ভূতকে দেখেছিস?

খুব দেখেছি।

মহিম হাসল, কোথায় দেখেছিস?

উফ্ সে কথা ভাবলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

বটে!

পাশের গাঁয়ে সেবার যাত্রাপালা এসেছিল নদের নিমাই। কী একটা নামকরা দল এসেছিল। পালা শেষ হতে হতে রাত দুটো। তিনজনে মিলে ফিরছিলাম। সুনসান রাত্তির। সঙ্গের দুজন কুমোরপাড়ার কাছে এসে অন্য দিকে চলে গেল। আমি একা।

হ্যাঁ, তোর যাত্রার খুব নেশা ছিল বটে।

এখনও আছে। হলেই যাই।

তারপর বল।

চৌধুরীদের পুকুরের ধার বরাবর রাস্তা দিয়ে আসছি। ওদিকটায় তখন খুব জঙ্গল ছিল। ফলসা গাছের বন ছিল। মনে আছে?

তা থাকবে না! খুব মনে আছে।

সে জায়গায় দিনমানেও তখন লোক চলাচল ছিল না। আপনমনে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আসছিলাম। হঠাৎ সামনে রশিখানেক তফাতে দেখলুম একটা লোক নিচু হয়ে কী যেন কুড়োচ্ছে।

কুড়োচ্ছে?

হ্যাঁ। সেরকমই ভঙ্গি। তা আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললুম, কে ওখানে? কেউ জবাব দিল না। তখন বললুম, কিছু হারিয়ে থাকলে তো আর এই অন্ধকারে খুঁজে পাবেন না মশাই। এখন বাড়ি যান, কাল সকালে খুঁজবেন এসে। তখন লোকটা হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল।

অন্ধকারে দেখলি কী করে?

খুব জ্যোৎস্না ছিল তখন। ফটফটে পরিষ্কার দুধ-জ্যোৎস্না। স্পষ্টই দেখলুম। সুধীর ঘোষ দাঁড়িয়ে। চোখে গোল চশমা। আমার দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছিল। শরীর এমন ঠান্ডা মেরে গেল ভয়ে যে নড়তে-চড়তে পারি না, গলার স্বর ফুটছে না। হার্টফেল যে হইনি সেই ঢের। তবে বেশিক্ষণ নয়, যেমন হঠাৎ দেখা গিয়েছিল তেমনই হঠাৎ মিলিয়ে গেল বাতাসে। রাম নাম করতে করতে আর ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে আসি।

চশমাটা সবাই দেখত। হ্যাঁ রে, ভূত চশমা পরে কেন?

ধীরেন কাষ্ঠ হেসে ফেলে বলে, তা কে বলবে বলুন! তবে কথাটা ভাবার মতো, ভূতের আবার চশমা লাগে কীসে? তা হঠাৎ সুধীর ঘোষের কথা উঠছে কেন? কিছু দেখেছেন-টেখেছেন নাকি?

না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। আজকাল আলটপকা অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যায়, যেগুলো মনে পড়ার কথাই নয়। একেবারে বিস্মরণ হয়ে যাওয়া কথাও পট করে কেন যে মনে পড়ে। তখন মনে হয় এসব বোধ হয় এ-জন্মের ঘটনাই নয়, আর জন্মে ঘটেছিল। কাল রাতে হঠাৎ সুধীর ঘোষের মুখখানা ভেসে উঠল চোখে। সেই থেকে ভাবছি।

আমিও খুব ভাবি। একাবোকা থাকলে, অন্ধকার ঘরে কি নিরালা রাস্তায় হঠাৎ সেই মিদ্দারের পো যেন কাছাকাছি চলে আসে। যেন ছোঁক ছোঁক করে, গা এঁকে এঁকে পিছু পিছু আসতে থাকে। তার বউটাও যেন ঘুরঘুর করে আশেপাশে। আর তখন সেই বর্ষার রাতটা যেন চোখের সামনে একেবারে জলজিয়ন্ত হয়ে ওঠে। যত বুড়ো হচ্ছি তত যেন মনস্তাপ বাড়ছে।

নাতনি বিন্তি একখানা থালার ওপর দু কাপ চা নিয়ে এল, সঙ্গে শস্তার টোস্ট বিস্কুট। আড়চোখে মহিম দেখল, ধীরেনের জন্য সেই ময়লা হাতলভাঙা কাপেই চা দিয়েছে, ওই কাপটায় বাড়ির কাজের মেয়েটা চা খায়। মনটা খারাপ লাগল। শত হলেও ধীরেন তো আর ওটোলোক ছোটলোক নয়। তাকে এত তাচ্ছিল্য করলে মহিমেরও যেন খানিকটা সম্মানহানি হয়। কিন্তু কাকে কী বলবে মহিম? আর বললেই বা শুনছে কে?

ধীরেনের অবশ্য তাপউত্তাপ নেই। ভারী আহ্লাদের সঙ্গেই সে যত্ন করে মুড়মুড় শব্দে বিস্কুট চিবোয়, সুড়ুত সুড়ুত করে আরামে চা খায়। নিজের বরাদ্দের দুখানা বিস্কুটের একখানা এগিয়ে দেয় মহিম, রোজকার মতোই বলে, নে, খা।

রোজকার মতোই ধীরেন লাজুক গলায় বলে, না, না, থাক। আপনি খান।

রোজের মতোই মহিম বলে, ওরে, আমার যে দাঁতের জোর নেই সেটা কি ভুলে যাস?

ধীরেন এক গাল হেসে বলে, ঠাকুরের দয়ায় আমার দাঁতগুলো এখনও আছে। কোনও গণ্ডগোল নেই দাঁতে। গণ্ডগোল হল, দাঁতের কাজ কমে গেছে।

কেন রে?

বুঝলেন না? চিবোনোর জিনিসই তো জোটে না। মাংস-টাংসর কথা তো ভুলতেই বসেছি, মাছের কাঁটা কি মুড়ো সেসবও তো আর চোখে দেখি না।

মহিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনটা ভাল নেই। ছেলেটা এখনও তার বিছানায় অসাড়ে ঘুমোচ্ছে।

কুড়ি

আকাশে পাখি ফিরিছে গাহি, মরণ নাহি, মরণ নাহি। এই ধ্রুবপদ মাথার ভিতরে বিনবিন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গে। খুব মৃদু, শীতল, গুনগুন সুর। জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর, জুড়িয়ে যাচ্ছে মন। এ যেন গান নয়, মায়ের আঙুল। জ্বরে তপ্ত কপালে ঠান্ডা হাত। বড় ভরসা, বড় আশা, বড় সান্ত্বনা। মরণ নাহি, মরণ নাহি।

পাখি ডাকছে। তাদের প্রবল ডাকাডাকি আর ডানার চঞ্চল শব্দে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে বাতাস। আলো ফুটছে ক্রমে। ঘরে পাঁশুটে একটু ময়লা রং। তার মধ্যেই হঠাৎ জানালার ফাঁক দিয়ে তপ্ত লোহার রডের মতো লাল একটা রেখা এসে পড়ল মশারির গায়ে।

লেপের ওমের ভিতর থেকে মুখ বের করে এইসব নৈমিত্তিক দৃশ্য ও শব্দ ঘুমচোখেই সে লক্ষ করে ফের চোখ বোজে। মনে হয়, বহুকাল পরে একটা সুপ্রভাত এল বুঝি। এত সুন্দর ভোর বহুকাল দেখেনি সে।

এ-ঘরে চড়াই পাখির বাসা হয়েছে। বন্ধ ঘরে তাদের পুরীষ ও গায়ের বোঁটকা গন্ধ। জানালার সামান্য ফাঁক দিয়ে তাদের প্রবল যাতায়াতের শব্দ ও পরস্পরের ডাকাডাকিতে একটুও বিরক্ত হচ্ছিল না সে। কত জীবন, কত রকমের জীবন চারদিকে! পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, সরীসৃপ। আকাশে পাখি ফিরিছে গাহি, মরণ নাহি, মরণ নাহি...

কোথায় কবে শুনেছিল এই লাইন? মনেও ছিল না তো! হঠাৎ কোন গভীর অবচেতনা থেকে উঠে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার দেহ-প্রকোষ্ঠে! মরণ নাহি, মরণ নাহি। এ কি মধুর মিথ্যা! নাকি সত্যিই এ জীবন মৃত্যুহীন?

মৃত্যুহীন কি জীবন হয়? কখনও নয়, কখনও নয়।

আধোঘুমে সে অনুভব করে মাথার নীচে অচেনা বালিশ। নিচু, চ্যাপটা, শক্ত। বালিশের ওপরে শস্তা খসখসে টার্কিস তোয়ালে থেকে তিলতেলের মৃদু গন্ধ আসছে। পাতলা তোশকের জন্য পিঠে ফুটছে তক্তপোশের তক্তা। লেপটার তেমন ওম নেই। পুরনো তুলো জায়গায় জায়গায় দলা পাকিয়ে ফাঁকফোকর তৈরি হয়েছে। তবু এই বিছানায় মধ্যরাত থেকে অঘোরে ঘুমিয়েছে সে। বাচ্চা ছেলের মতো। স্বপ্নও দেখেছে। একটাও দুঃস্বপ্ন নয়। অথচ দুঃস্বপ্ন ছাড়া খুব কম রাতই কাটে তার। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে ভয়ে, আতঙ্কে উঠে বসে সে। বুক ধড়ফড় করে, জিব শুকিয়ে যায়। মৃত্যুর স্বপ্ন যেন বিজবিজ করে তার অস্বস্তিকর ঘুমের মধ্যে।

অনেক দিন বাদে এই অচেনা বিছানায় শুয়ে একটা-দুটো ভাল স্বপ্ন দেখেছে সে।

দেখল, খুব ভোরবেলা সে একটা সাঁকোর ওপর রেলিং-এ ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। নীচে কুয়াশায় আবছা এক নদী। একখানা নৌকো খুব ধীর দোলে চলে যাচ্ছে। নৌকোয় একখানা হলুদ লণ্ঠন জ্বলছে। লণ্ঠন

ঘিরে মুড়িসুড়ি দেওয়া কয়েকজন মানুষ। ধীরে ধীরে নৌকোটা কুয়াশার আবছায়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। সবটাই যেন একখানা ওয়াশ-এর ছবি। বাস্তব পরাবাস্তবে মেশামেশি। খুব রোমান্টিক।

তার পাশে দাঁড়ানো একটি মেয়ে। ঘোমটায় ঢাকা মুখ। কিশোরীর ফিনফিনে চিকন গলায় নরম স্বরে সে বলে, তুমি খুব ভোরে ওঠো বুঝি?

না তো! ভোর কাকে বলে আমি তা জানিই না।

ভোরবেলার মতো এত সুন্দর সময় আর নেই। এ সময়ে ভগবানের সব জানালা দরজা খোলা থাকে। তুমি কেন ভোরে ওঠো না?

আজকাল ঘুম সহজে আসতে চায় না। কখনও মদ খেয়ে বা ওষুধ খেয়ে ঘুমোই। সেই ঘুম খুব বিচ্ছিরি। শরীরটা তখন আমার থাকে না। জড়বস্তুর মতো হয়ে যায়।

কিশোরী মেয়েটি জলে প্রায় স্থির ছবির মতো নৌকোটার দিকে চেয়ে রইল। বলল, তুমি যাবে?

কোথায় যাবো?

ওদের সঙ্গে?

ওরা কোথায় যাচ্ছে?

বড় গাঙে মাছ ধরতে।

যাবো।

পর মুহূর্তেই সে দেখল সেই আশ্চর্য নৌকায় সে লণ্ঠনের ধারে বসে আছে। বাবা আছে, দাদা আছে, কিশোরী মেয়েটিও বসে আছে ঠিক তার উলটো দিকে। আর নিতাই জেলে ছইয়ের ওপর থেকে জলে জাল ফেলতে গিয়েও দোনোমোনো করছে।

বাবা হাঁক দিল, ওরে নিতাই, জাল ফেলছিস না কেন?

জলে বড্ড বেশি মাছ বাবু। বিজবিজ করছে মাছ। রুই-কাতলা-মৃগেল কালবোশ। জাল টেনে তুলতে পারব কি?

দুর বোকা! মাছ ধরতেই তো আসা।

না বাবু। এত মাছ তুললে নৌকো ডুবে যাবে।

মেয়েটি জলের দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে তার দিকে ফিরে বলল, জলে মাছ আছে, ক্ষেতে ধান আছে, চারদিকে কোথাও কোনও অভাব নেই।

অমলের মনটা বড্ড ভাল হয়ে গেল চারদিককার সম্পন্নতার কথা শুনে।

হঠাৎ বাবা বলল, এঃ চারটে টেক্কাই তোর হাতে। কল দে।

অমল দেখল তার হাতে তাস। তারা চারজন লণ্ঠনের আলোয় ব্রিজ খেলছে। নিজের হাতের তাস ভাল দেখতে পাচ্ছিল না সে। কেমন যেন হিজিবিজি তাস। দুটো জোকারের মুখও দেখতে পাচ্ছে সে। কোথায় চারটে টেক্কা?

এতক্ষণ দেখতে পায়নি। ছইয়ের ভিতরে মা রান্না করছিল। ডাক দিয়ে বলল, খোকা, কাঁকড়ার ঝোল হয়ে গেছে। খাবি আয়। ভাত বাড়ছি।

আমার কি খিদে পেয়েছে মা?

হ্যাঁ পেয়েছে। ছেলের খিদে মা ঠিক টের পায়।

তারপর আরও কী কী হল যেন। কী হল তা আর মনে নেই। স্বপ্নটা যেন জঙ্গলের মধ্যে কাঠুরেদের পায়ে-হাঁটা পথের মতো হঠাৎ হারিয়ে গেল।

দ্বিতীয় স্বপ্নটাও কিছু খারাপ নয়। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ একটা পার্টি দিচ্ছেন। বিশাল বড় একটা জায়গা—অনেকটা রোমান কলোশিয়ামের মতো। সেখানে হাজার হাজার মোম জ্বলছে আর অনেক লোক বাজনার তালে তালে হাততালি দিচ্ছে। রানি আসবেন বলে অপেক্ষা করছে সবাই। অনেক সাহেব মেমের সঙ্গে বিস্তর বাঙালিকেও দেখতে পাচ্ছে সে। অনেকে ধুতি পাঞ্জাবি পরা।

পাশে দাঁড়ানো এক সাহেব হঠাৎ তাকে পরিষ্কার বাংলায় বলল, আমার নাম স্টিফেন স্নাইডার। আমি একজন কমোডর। আপনি কে বলুন তো?

আমি অমল রায়। একজন ইঞ্জিনিয়ার।

আরে! আপনিই তো আজ রানির কাছ থেকে নাইটহুড পাবেন। আপনি তো বিখ্যাত লোক!

লোকটার মাথায় টাক, বেশ লম্বা, মুখে অমায়িক হাসি।

অমলের একবার মনে হল, ঠিক এরকম পার্টিতে কাউকে নাইটহুড দেওয়া হয় না। আবার মনে হল, কী জানি বাবা, হতেও পারে। নিয়মকানুন হয়তো বদলে গেছে।

অমল বলল, আচ্ছা, নাইটহুড নেওয়ার সময় কি হাঁটু গেড়ে বসতে হয়?

না না, ওসব নিয়ম আর নেই। তবে রানির গালে চুমু খেতে কোনও বাধা নেই।

নিয়মগুলো আমার ভাল জানা নেই।

লোকটা দুঃখ করে বলল, পুরনো আদবকায়দা উঠে যাচ্ছে। ওসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। নাইটহুড পেলে আপনার খুব বড় একটা প্রোমোশন হবে।

অমল খুশি হলে বলল, ধন্যবাদ।

এ আর এমন কী! আপনি তো এর পর নোবেল প্রাইজও পাবেন!

সে কী?

হ্যাঁ। আমার কাছে গোপন খবর আছে। শর্ট লিস্টে নাম উঠেছে।

অমল খুবই খুশি হল। নিজের সম্পর্কে তার ধারণা কখনও এতটা উঁচু ছিল না।

সমবেত তীব্র করতালির শব্দে অমল চমকে উঠে দেখল, একটা চমৎকার সাদা সিঁড়ি দিয়ে রানি নেমে আসছেন।

ওইখানেই স্বপ্নটা পাশ ফিরল। হারিয়ে গেল। যেমন হাটেবাজারে বাবার হাত-ছুট হয়ে বাচ্চা ছেলে মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়। ছেলে ফেরত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু হারানো স্বপ্নকে ফের ধরা খুব মুশকিল। সে যেন ঝিলের ওপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া কাটা ঘুড়ি। তাকে কি ধরা যায়! কতবার ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে হতাশ চোখে বেহাত ঘুড়ির দিকে চেয়ে থেকেছে অমল।

বাবার বিছানায় পাতলা তোশক, ওমহীন লেপের মধ্যে শুয়েও আজ বেলা পর্যন্ত খুব ঘুমোল সে।

তুমি কি এখনও ঘুমোচ্ছ?

চোখ চেয়ে অমল দেখে, বাইরে রোদের ঝাঁঝ বেড়েছে। ঘর আলোয় আলোময়। বউদি সামনে দাঁড়ানো। হাতে চায়ের কাপ।

এবার ওঠো। বেলা হয়েছে। চা এনেছি।

এই বউদির সঙ্গে তার এক সময়ে খুব খুনসুটির সম্পর্ক ছিল। ঠাট্টা, রঙ্গ রসিকতা খুব হত। আজকাল সবাই নিরাপদ দূরে সরে গেছে। তার অনেক বিদ্যে, অনেক বড় চাকরি, গাম্ভীর্য এইসব কিছুকে সবাই ভয় পায়।

অমল উঠে বসে এক গাল হেসে বলল, ঠাকরোন যে!

বাব্বাঃ! কত কাল পরে ঠাকরোন বলে ডাকলে বলো তো! ডাকটা মনে ছিল তা হলে!

খুব ছিল। বোসো, ওই চেয়ারটায় গ্যাঁট হয়ে বোসো, কথা কই।

চায়ের কাপটা তার হাতে দিয়ে দ্রুত দক্ষ হাতে মশারিটা চালি করে তুলে দিয়ে বউদি বলে, দু দণ্ড যে বসব তার কি উপায় আছে! কিন্তু কী ব্যাপার বলো তো ঠাকুরপো, তুমি বাবার বিছানায় এসে শুয়ে আছ যে!

অমল চায়ে চুমুক দিয়ে একটু লাজুক হেসে বলে, সে একটা কাণ্ড!

কী কাণ্ড?

কাল রাতে আমাকে বোধহয় ভূতে পেয়েছিল।

বড় বড় চোখ করে বউদি বলে, ওমা! বলো কী গো! কোন ভূতটা ধরেছিল তোমাকে?

এখানে কটা ভূত আছে বলো তো!

তা আছে বাপু। সুধীর ঘোষ, ফটিক কাঞ্জিলাল, ইলাবতী, সোমেশ্বর আরও কতজনা।

বাপ রে! এত ভূত! গাঁয়ে তো তা হলে ভূতের মচ্ছব পড়ে গেছে।

ঠাট্টা কোরো না তো, ভাল লাগে না। ভূত-প্রেত নিয়ে ইয়ার্কি নয়।

খুব হাসল অমল। তারপর বলল, বাইরের ভূত নয় গো ঠাকরোন, এ ভূত আমার মাথার মধ্যে ভর করেছে।

হ্যাঁ ঠাকুরপো, তুমি নাকি রাত-বিরেতে বেরিয়ে যাও!

হ্যাঁ তো। ঘুম না এলে বেরিয়ে পড়ি।

ধন্যি তোমার সাহস!

গাঁ-দেশে কি রাত-বিরেতে লোকে বেরোয় না?

তা বেরোয়। ঠাকুর-দেবতার নাম করতে করতে বেরোয়। তুমি তো বাপু আবার নাস্তিক। নাস্তিক হওয়া মোটেই ভাল নয়, জানো?

নাস্তিক হলে কী হয় ঠাকরোন?

নাস্তিকরা যেন কেমনধারা হয় বাপু!

কেমনধারা হয় ঠাকবোন?

বড্ড রুখো-শুখো, কাট কাট কথা কয়, কাউকে মান্যিগন্যি করে না।

আমিও কি ওরকম ঠাকরোন?

বলতে ভয় পাই, তুমিও আছ একটু ওরকম।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল। ছেলেবেলায় ভগবানে ভারী ভক্তি ছিল তার, ভয়ও ছিল। সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দিত কত নিষ্ঠার সঙ্গে। পরে দেখল, যারা সরস্বতীর নামও জানে না সেইসব সাহেবরা বিদ্যাবত্তায় অনেক এগিয়ে আছে। তখন সরস্বতীর ওপর ভরসা উবে গেল।

আমি ঠিক নাস্তিক নই ঠাকরোন। ভগবানকে বিশ্বাস করার চেষ্টা কিছু কম করিনি। কিন্তু দুনিয়ার কোথাও ভগবানের টিকির ডগাটিরও চিহ্ন খুঁজে পাই না যে! তবু নাস্তিকও হতে পারিনি পুরোপুরি। মনে অনেক সংস্কার গেড়ে বসে আছে।

বউদি বড় বড় চোখ করে শুনছিল। গাঁয়ের মেয়ে, গাঁয়ের বউ। লেখাপড়া তেমন নয়। একটু ভালমানুষ গোছেরই ছিল একসময়ে। এখন সংসারের জাঁতাকলে পড়ে কেমন হয়েছে কে জানে! বলল, হ্যাঁ ঠাকুরপো, সোহাগও কিন্তু বড্ড ডাকাবুকো। একদিন মাঝরাতে বেরিয়ে গিয়েছিল, ঠিক তোমার মতো।

চমকে অমল বলে, কোথায় গিয়েছিল?

তা কী জানি! যখন ফিরল তখনও ভোর হয়নি। আমি তো ভয়ে সারা। ভাবলুম, হাওয়া-বাতাস লেগেছে বুঝি!

অমল মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, ও একটু খেয়ালি।

বেশি খেয়ালখুশি ভাল নয় বাপু। দিনকাল খারাপ পড়েছে। এ-গাঁয়ে আগে কোনও উৎপাত ছিল না। আজকাল ফচকে ছোঁড়াদের আড্ডা হয়েছে শুনতে পাই।

অমল নির্বিকারভাবে বলে, হ্যাঁ, তা জানি।

সোহাগের ওপর ওদের নজর পড়েছে। চাটুজ্যেবাড়ির বিজু রুখে না দাঁড়ালে একটা ভালমন্দ কিছু হয়ে যেতে পারত।

অমল খানিকটা শুনেছে। গা করেনি। এরকম তো হতেই পারে। দুনিয়ায় মেয়েরা যত এগোবে ততই পুরুষের প্রতিরোধ বাড়বে, আর তা নানা বিকৃত পথ ধরে প্রকাশ পাবে। এ রকমই হওয়ার কথা।

অমল বলল, শুনেছি।

মেয়েকে একটু সামলে রেখো ঠাকুরপো, অত আলগা দিও না। কখন কোন সর্বনাশ ঘটে তার ঠিক কি!

অত ভয় পাও কেন ঠাকরোন? এখনকার মেয়েরা তোমাদের মতো নয়। তারা ঘর ছেড়ে বেরোতে শুরু করেছে সবে। একটু আধটু ওরকম ঘটনা এখন ঘটবেই। তারপর সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমার মেয়েকে আমি স্বাধীনতা দিয়েই দিয়েছি। দুনিয়াটার ওপর ওর কতখানি অধিকার তা ও নিজেই বুঝে নেবে।

বড় বড় চোখে কথাগুলো শুনল বউদি। তারপর বলল, তোমাদের বড্ড সাহস ভাই। আমি কিন্তু পারতাম না।

না ঠাকরোন, তুমি পারোনি, পারবেও না। তোমার সময় কেটে গেছে। কিন্তু ভয় নিয়ে বেঁচে থাকাটা একটা অভিশাপ। তোমাদের জীবনটা নানা ভয়-ভীতি নিয়েই কেটে যাবে। কিন্তু পরের জেনারেশনের মেয়েরা ভয় নিয়ে বাঁচতে চাইছে না যে!

কী জানি বাপু, অত কথা তো বুঝতে পারি না। মেয়েদেরই যে বিপদ বেশি।

বিপদে না পড়লে কি বিপদ কাটে?

বউদি কথাটা মানল না বোধহয়। তবে তর্কও করল না। বলল, এখন চা খেয়ে ওপরে যাও। মোনা তোমার খোঁজ করছিল।

আমি যে এ ঘরে আছি তা কি জানে?

জানে। বাবা বলেছে। শুনে মোটেই খুশি হয়নি।

অমল একটু হেসে বলল, আমার বউ সহজে খুশি হয় না।

আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি আলাদা ঘরে শোও কেন? বর-বউ এক বিছানায় শোও না কেন?

সেটা কি নিয়ম?

ও মা! বলে কী রে! সেটা নিয়ম নয়?

না শুলে ক্ষতি কী?

শোনো কথা! বর-বউ এক বিছানায় না শুলে কি ভাব-ভালবাসা গাঢ় হয়?

অমল হেসে ফেলে, এক বিছানা ছাড়া ভাব-ভালবাসা হয় না নাকি?

কী জানি বাপু, তোমাদের সব অদ্ভুত কথা! বলি বিছানাটাও তো একটা কাছে-থাকা, তা নয়?

অমল ম্লান হেসে বলল, আমাদের তো সেরকম মনে হয়নি। অনেক সময়ে আমার কাজ থেকে ফিরতে দেরি হত। কখনও কখনও মধ্যরাতে ফিরেছি। তখন কারও ঘুম ভাঙিয়ে ভাব-ভালবাসা করতে গেলে উলটো ফল হতে পারত। তাই আলাদা বিছানায় শোওয়ার অভ্যাস হয়ে গেছে। ব্যাপারটা খুব একটা হাইজিনিকও নয় কিন্তু।

কেন, হাইজিনিক নয় কেন?

পরস্পরের শ্বাস দেওয়া নেওয়া কি ভাল। তা ছাড়া কারও কোনও কন্টেজিয়াস ডিজিজ বা খারাপ অভ্যাস থাকতে পারে।

সে আবার কী?

ধরো কেউ ঘুমের মধ্যে হাত-পা ছোড়ে, কারও হয়তো নাক ডাকে, কিংবা মুখে দুর্গন্ধ বা দাঁত কড়মড় করে...

থাক থাক, আর ফাঁড়া কাটতে হবে না বাপু। কত কথাই যে জানো! বর-বউয়ের মধ্যে আবার ওসব অসুবিধে কোনও বাধা হয় নাকি! তোমার দাদার তো ভীষণ নাক ডাকে, তাতে তো আমার একটুও অসুবিধা হয় না। বরং একদিন নাকের ডাক না শুনলেই দুশ্চিন্তা হয়।

তুমি নমস্যা ঠাকরোন।

ইয়ার্কি হচ্ছে, না?

বহুকাল পর তোমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছি। বড় ভাল লাগছে। আর একটু বোসো। আজকাল তো তোমার সঙ্গে কথাই হয় না।

কী করব ভাই, তোমাদের গোমড়া মুখ দেখে ইদানীং বড্ড ভয় হত। সাহেব মেমদের দেশ থেকে এসেছ, পেটে কত বিদ্যে, আমরা তো কোন অন্ধকারে পড়ে থাকা জীব। তাই সমানে সমানে কথা কওয়ার চেষ্টা করিনি।

ঠাকরোন, আজ আর বিদ্যে-বুদ্ধি-চাকরি আমার কোনও গয়না নয়। মনে হয় ওসব দিয়ে কিছু হয় না।

বল কী গো! কিছু হয় না মানে! তোমার কি কিছু হয়নি! কত নামডাক, কত দায়িত্বের কাজ, যখন তখন বিলেত আমেরিকা চলে যাচ্ছ! তবু বলছ কিছু হয় না? আর কী হবে?

সেটাই তো ভাবছি।

তোমার সব বিদঘুটে কথা! তোমার দাদাও সেদিন বলছিল, অমলটার কী হয়েছে কে জানে, মুখে কখনও হাসি নেই। তুমি আজকাল সত্যিই হাসো না, কেন বল তো!

আজ তো বেশ হাসিখুশিই আছি ঠাকরোন, তাই না?

তা বাপু, সত্যি কথা, বহুকাল পর আজ তোমাকে একটু হাসিখুশি দেখছি। শ্বশুরমশাইয়ের বিছানার তাহলে গুণ আছে।

অমল আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, কথাটা খুব ভুল বলনি তুমি। কাল নিশি-পাওয়ার মতো মাঝরাতে বেরিয়ে পাগলের মতো কোথায় কোথায় ঘুরেছি কে জানে! ফিরে এসে হঠাৎ বাবার কাশির আওয়াজ শুনে জানলাটার কাছে এসে দাড়ালাম। বাবার সঙ্গে বহুকাল সম্পর্কই তো নেই। জন্মদাতা বাপ, তার যে আর কোনও প্রয়োজন আছে জীবনে তাই তো ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাল রাতে হঠাৎ ইচ্ছে হল, আচ্ছা, বাবা কী করছে একটু দেখি।

কেন হঠাৎ ইচ্ছেটা হল?

কোনও কারণ নেই। এমনই হঠাৎ ইচ্ছে হল। বাবা জেগেই ছিল। আমাকে ঘরে ডেকে এনে বসাল। কীসব কথাবার্তা হল তা ভাল মানে নেই। তারপর বাবা নিজেই বলল, আমার বিছানায় শুয়ে থাক। আর সেই কথাটা শুনেই আমার এমন লোভ হল যে আপত্তি না করে সোজা এসে শুয়ে পড়লাম। কী বলব তোমাকে, শুতে না শুতেই ঘুম। বহুকাল এমন নিশ্চিন্তে বাচ্চাছেলের মতো ঘুমোইনি।

বউদি একটু হেসে বলল, হ্যাঁ, খুব ঘুমিয়েছ বাপু। তিন-চারবার ডাকতে হয়েছে ঘুম থেকে তুলতে।

বিছানাটা মোটেই ভাল নয়। তোশক পাতলা, লেপটাও পুরনো বলে ওম নেই, শক্ত বালিশ, তবু আশ্চর্য ঘুম হয়েছে কিন্তু। বিছানার গুণই হবে, কী বল!

শোনো বাপু, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর ওই আলাদা শশাওয়াটা মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না। আজ থেকে দুজনে একসঙ্গে শোও।

তাতেই সমস্যার সমাধান হবে?

সমস্যা আবার কীসের? স্বামী-স্ত্রীর মন কষাকষি হয়ই, আবার মিটেও যায়। শুয়েই দেখো না। অনেক সময়ে শরীর কাছাকাছি হলে মনও কাছাকাছি হয়।

তোমাকে আজ বিছানায় পেয়েছে দেখছি। কিন্তু মোনার আর আমার মধ্যে সমস্যাটার সমাধান শুধু বিছানা দিয়ে যে হওয়ার নয় ঠাকরোন। মাঝখান দিয়ে নদী বইছে।

শুধু হেঁয়ালি কথা!

একটু হেঁয়ালি যে থেকেই যাচ্ছে।

হ্যাঁ গো ঠাকুরপো, চাটুজ্যে বাড়ির মেয়েটার কথা কি তুমি এখনও ভুলতে পারনি?

অমল একটু চুপ করে থেকে বলল, মোনারও ধারণা আমি মনে মনে পারুলের কথাই ভাবি। কিন্তু পারুল কোনও বাধা নয়, পারুল কোনও কারণ নয়।

তোমার আর মোনার মধ্যে তো ঝগড়াও হয় না কখনও। শুধু মিলমিশের একটু অভাব।

ঝগড়া হলে তো বুঝতাম ভাবও আছে। কিন্তু ওই যে বললাম, মাঝখানে নদী বইছে।

আবার হেঁয়ালি! এখন ওঠো, ঘরে যাও। মোনা হয়তো রাগ করে আছে।

ও সবসময়ই রাগ করে থাকে।

আর এক কাপ চা খাবে?

দেবে?

কেন দেব না? ওপরে যাও, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অমল উঠল। হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল।

ধীরে ধীরে দোতলায় উঠে এল অমল। সামনেই প্রথম ঘরটা মোনার। দরজায় মোটা পর্দা ঝুলছে। সন্তর্পণে ঘরটা পেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল অমল।

ঢুকেই থমকে গেল। ঘরে মোনা দাঁড়িয়ে।

তুমি কি বাড়ির লোকের কাছে এটাই প্রমাণ করতে চাও যে, তোমার আর আমার সম্পর্ক ভাল নয়?

অমল অবাক হয়ে বলে, সেটা কীসে প্রমাণ হল?

শুনলাম তুমি মাঝরাতে শ্বশুরমশাইয়ের ঘরে গিয়ে তাঁকে তুলে দিয়ে তাঁর বিছানায় শুয়েছিলে?

হ্যাঁ। অনেকটা তাই।

তোমার কি কাল রাতে খুব নেশা হয়েছিল?

খুব বেশি নয়। কেন, কী হয়েছে?

লোকে কী ভাবল সেটা ভেবে দেখেছ?

কথাটা ম্যান্তামারা না ম্যাদামারা? যা-ই হোক, কথাটার মানে আগে বুঝতে পারত না অমল। আজকাল একটু একটু পারে। ম্যান্তামারা মানে বোধ হয় ঠান্ডা মেরে যাওয়া ফ্রিজ বা ফ্রিজিড হয়ে যাওয়া মানুষ, যার কোনও ব্যাপারেই তেমন কোনও তীব্র বা মৃদু প্রতিক্রিয়াও হয় না। যেমন গাছ বা ইট-কাঠ। সকালের তেরছা তীব্র রোদের মস্ত চৌখুপি বিছানা জুড়ে এবং বিছানা ছাড়িয়ে ঘরের মেঝে অবধি এসে পড়েছে। ঝলমল করছে ঘর। তার আলোয় মধ্যবয়সি, প্রায় যুবতী এবং অসম্ভব ফর্সা মোনালিসাকে খুব তীব্র দেখাচ্ছে। কাটা কাটা মুখ-চোখের মোনাকে সুন্দরীই বলতে হবে। যদিও লাবণ্য জিনিসটার অভাব আছে। সে যাই হোক, মোনা এক তীব্র রূপের নারী এবং এখন তার চোখে অপমান এবং তজ্জনিত রাগ ঝলসাচ্ছে। অমলের এক ব্রিটিশ বন্ধু ভ্যান তাকে প্রায়ই বলত "কিস হার, এ কিস সলভ্স এভরিথিং।' মুষ্টিযোগটা বহুবার প্রয়োগ করে দেখেছে অমল। কখনও কাজ হয়েছে, কখনও হয়নি। প্রেমহীন চুম্বনের বোধহয় কোনও বার্তা নেই।

এখন অবশ্য চুমু খাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। নিজের ভিতরে ভিজে, স্যাঁতা ম্যান্তামারা ভাবটা এমন পাথর হয়ে আছে যে মনে হয়, এত উদ্যোগ নেওয়ার কোনও মানেই হয় না। চুম্বনও যেন শ্রম। কঠোর শ্রম।

উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে কিনা।

কে জিজ্ঞেস করছিল?

শ্বশুরমশাই। কী লজ্জার কথা বলো তো!

লজ্জা! লজ্জার কী আছে? তুমি কি ওদের পরোয়া কর?

করি না। কিন্তু তুমি ওঁর ঘরে গিয়ে শেলটার নিলে কেন?

ব্যাপারটা ওরকম নয়।

কীরকম?

আমার ভাষার জোর কম, এক্সপ্রেশনও হয় না। ভাবছি তোমাকে বোঝাতে পারব কিনা। এসব অদ্ভুত কথা বুঝতে গেলে তোমাকেও অনেকটা এগিয়ে আসতে হবে। তার চেয়ে থাক। ধরে নাও আমাকে একটা পাগলামিতে পেয়ে বসেছিল।

পাগলামি তোমাকে যে পেয়ে বসছে তা বুঝতে পারছি। মাঝরাতে তুমি কোথায় গিয়েছিলে? টু এনি গার্ল ফ্রেন্ড? পারুল নয় তো! শুনেছি ওর হাজব্যান্ড চলে গেছে।

ভারী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে অমল। পারুল! মোন কি এখনও পারুলের সঙ্গে তাকে সন্দেহ করে? তার ধারণা ছিল পারুল সম্পর্কে মোনার কোনও সন্দেহ নেই। পারুল যে একজন দেবী তা মোনা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু আজ সকালে এ কী শুনছে সে?

ব্যথাতুর মুখে অমল বলল, তাই কি হয়! ওরকম ভাবতে নেই।

বাধ্য হয়ে ভাবছি। তুমিই ভাবিয়ে তুলছ।

মাথা নেড়ে ম্যান্তামারা অমল শুধু দিশাহারার মতো বলল, ভাবতে নেই, ওরকম ভাবতে নেই।

তাহলে কী ভাবব তা তুমিই বলে দাও।

বেরিয়ে পড়েছিলাম। অনেকটা হাঁটলাম। ফিরে এলাম। বাবা ডেকে বলল, আমার বিছানায় শুয়ে থাক। আমিও বাচ্চা ছেলের মতো গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঠিক এইরকম ঘটেছিল।

আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আজই কলকাতায় যেতে চাই।

আজই? এখনও কয়েকদিন ছুটি আছে।

ছুটি থাকলেই কি এখানে পড়ে থাকতে হবে নাকি? আমার আর এখানে ভাল লাগছে না। আমি যাব।

কলকাতায় গেলেই কি সব সমাধান হয়ে যাবে!

না, তা হবে না। তোমার সঙ্গে আমার আর রি-কনসিলিয়েশন হওয়ার নয়, জানি। কিন্তু আমার আর এ জায়গাটা ভাল লাগছে না। সোহাগকে নিয়েও প্রবলেম হচ্ছে।

ঠিক আছে।

আমি গোছগাছ করছি কিন্তু।

করো।

মোনা চলে যাওয়ার পর রোদে ভরা বিছানাটায় চুপ করে বসে রইল অমল। না, গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যেতে হচ্ছে বলে তার কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। ম্যান্তামারা অমলের এখন আর তেমন কোনও পছন্দ-অপছন্দ নেই। সবই সমান বলে মনে হয়।

জানালা দিয়ে রোদ আসছে, ঠান্ডা হাড়-কাঁপানো হাওয়াও আসছে। শরীর কেঁপে যাচ্ছে শীতে। তবু গায়ে কোনও চাপা দিল না সে। জানালা দিয়ে বাবার ঘরের পিছন দিককার বাগানটার দিকে চেয়ে রইল সে। বাগানে হলুদের বন্যা বইছে, গাঁদা ফুল ফুটে আছে মেলা। একটা বারোমেসে শিউলি গাছও রয়েছে বেড়ার কাছ ঘেঁষে। শরতে গাছ ভরে ফুল ফুটত, অন্য সময়ে কম হলেও সারা বছরই দু-চারটে করে ফুল হত। পুরনো গাছটা মরে

গেছে। তার বীজ বা কলম করে আবার গাছ বানানো হয়েছে। খুব মন দিয়ে গাছটাকে দেখছিল সে। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে গাছ, তলায় বিছিয়ে আছে সাদা কার্পেটের মতো।

বাবা!

উঃ! বলে গভীর অন্যমনস্ক চোখ ফেরাল অমল।

মা বলছে আমরা নাকি আজ কলকাতায় যাচ্ছি।

সোহাগকে যেন কতদিন পর দেখল অমল। মেয়েটা যেন একটু রোগা আর লম্বা হয়ে গেছে। রুখু চুল, পরনে একটা ধূসর নাইটি।

হ্যাঁ।

ডিসিশনটা কার?

তোমার মায়ের।

আমরা কেন যাচ্ছি?

তা তো জানি না। তোমার মা যেতে চাইছেন।

সেখানে তো আমাদের এখন কোনও কাজ নেই। তোমারও তো ছুটি।

হ্যাঁ।

তাহলে?

তুই কি এখানে থাকতে চাস?

আমার তো এখানটাই ভাল লাগছে।

ওঃ। তাহলে সেটা তোর মাকে বলে দেখ।

মা খুব অ্যাডামেন্ট।

অমল জলে-পড়া মুখ করে অসহায়ের মতো বলে, তাহলে?

আমি তাহলে এখানে একাই থাকব। পারমিশন দেবে?

খুব অবাক হয়ে— যেন পারমিশন কথাটা জীবনে এই প্রথম শুনছে—এমন মুখ করে অমল বলে, পারমিশন!

হ্যাঁ। তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি আরও কয়েকদিন এখানে থাকতে চাই।

ও! তাতে অসুবিধে কী?

তা তো বুঝতে পারছি না। মা আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে।

তাহলে?

তুমি মাকে বলো।

মেয়ের মুখের দিকে খুব নিবিষ্টভাবে চেয়ে থেকে অমল বলে, তোর কি এ-জায়গাটা ভাল লাগছে?

হ্যাঁ। খুব ভাল লাগছে।

তোর মা বলছিল তোর নাকি কীসব প্রবলেম হচ্ছে এখানে।

কোনও প্রবলেম হচ্ছে না তো!

হচ্ছে না?

না।

অ্যান্টিসোশ্যাল ছেলেরা কি ডিস্টার্ব করছিল?

হ্যাঁ। কিন্তু তারা এখন আমার বন্ধু হয়ে গেছে।

বন্ধু?

হ্যাঁ। দাদু, পিসি, জেঠিমা সকলের সঙ্গেই আমার বেশ ভাব। আমার কোনও প্রবলেম হচ্ছে না।

ও। বলে অমল ফের অসহায়ের মতো চেয়ে থাকে। ঘটনার লাগাম তার হাতে নেই। সোহাগ কি তা জানে না? তবু শিখণ্ডীর মতোই তাকে ব্যবহার করতে চাইছে।

তুমি, মা, বুড়ঢা তোমরা চলে যাও। আমি এখানে বেশ থাকতে পারব কয়েক দিন।

একা থাকবি?

একা! একা কোথায়! বাড়ি ভর্তি এত লোক!

হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। কিন্তু ওদের সঙ্গে তো আমাদের ঠিক অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল না।

মার সঙ্গে এখনও নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে হয়ে গেছে।

সামান্য কৌতূহল বোধ করে অমল প্রশ্ন করে, তুই কি সকলের সঙ্গে কথা বলিস?

কেন বলব না?

ঘরে-টরে যাস!

হ্যাঁ তো। সকলের ঘরে যাই। কত গল্প হয়।

অমল অবাক হয়ে বলে, খুব আশ্চর্যের কথা।

কেন, অবাক হওয়ার কী আছে?

না, আমি ভেবেছিলাম আমার লোকজনের সঙ্গে চলতে তোদের খুব অসুবিধে হবে।

আমার অসুবিধে হচ্ছে না। তুমি মাকে একটু বুঝিয়ে বলবে?

বলব। তবে হয়তো আমার কথাটার গুরুত্ব হবে না। আমি কাউকে কিছু বুঝিয়ে বলতে পারি না। কেউ বুঝতে চায়ও না।

মা যদি ফোর্স করে তাহলে কিন্তু আমিও ফোর্স করব।

ঝগড়া করবি?

যদি করতে হয়, করব।

অমল একটু তটস্থ হল। ঝগড়া তার পরিবারে মাঝে মাঝে হয়, তবে বেশি দূর গড়ায় না। ঝগড়ার চেয়েও ভয়াবহ হল শীতল নীরবতা! দিনের পর দিন কেউ কারও সঙ্গে কথা কয় না। খুব সামান্য প্রয়োজনীয় দু-একটা কথা বলেই ঝাঁপ ফেলে দিয়ে যে যার নিজের মনের মধ্যে ঢুকে যায়। কোনও আবেগ, উচ্ছলতা নেই তাদের। অবসরে বসে কথাবার্তা করে সময়যাপনও করে না তারা।

একটা শ্বাস ফেলে অমল বলল, দেখা যাক।

মা কেন চলে যেতে চাইছে জানো?

কেন?

আজ পারুল মার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

একুশ

পাদরি পাপীদের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করছেন। স্বীকারোক্তি করার জন্য পাপীরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। পাদরির কাজটাও সোজা। পাপীর মুখ তাঁকে দেখতে হয় না। পর্দার ওপাশ থেকে শুধু পাপীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ফাদারের কাজ হল ঈশ্বরের নামে পাপীকে ক্ষমা করে দেওয়া। পাদরি একের পর এক পাপীকে ক্ষমা করে যাচ্ছেন। তার মধ্যেই একজনের স্বীকারোক্তি শুনতে শুনতে পাদরি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, ইউ ডিড হোয়াট? সেই চিৎকার শুনে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো অন্য পাপীরা দুদ্দাড় করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তাদের ভয়, না জানি তাদের পাপও কত ভয়ংকর যা শুনে পাদরিও ভিরমি খায়।

মানুষের সব পাপকে একমাত্র ভগবানই বুঝি ক্ষমা করতে পারেন। তাও ভগবান বলে যদি সত্যিই কেউ থেকে থাকে। ভগবান থাক বা না থাক সব মানুষই একজন ক্ষমাশীলকেই খুঁজে বেড়ায়। পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে যে মেরে ফেলেছে তাকে কোন মানুষ ক্ষমা করতে পারে? সেই নরকগামী লোকটা হয়তো একদিন অন্তর্দহনে এক শ্বেতশুভ্র সর্বপাপহারী ক্ষমাশীলকেই খোঁজে। পাক বা না পাক, খোঁজে। পুণ্যবানদের বরং ভগবানকে তেমন প্রয়োজন নেই, পাপীরই প্রয়োজন বেশি।

যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায়, ভালমন্দ মিলায়ে সকলি। এই ভালমন্দ মিলিয়ে আখাম্বা লোকটাকে পক্ষপাতশূন্য চোখে কে দেখতে পারে? ভগবান? ভগবান তা হলে কি ইট, কাঠ, পাথরের মতোই অনুভূতিহীন কেউ? তা হলে তাকে দিয়ে কী লাভ মানুষের?

ভালবাসা না পেলেও চলে যায়, কিন্তু ক্ষমা না পেলে কি মানুষের চলে? এই মধ্যবয়সে আজ সেও এক নাশীলকে খুঁজতে শুরু করেছে বুঝি।

সামনেই রণাঙ্গন। এবং যুদ্ধকে সে ভীষণ ভয় পায়। বরাবরই পেত। কোনও যুদ্ধেই আজ অবধি তার জয় হয়নি। লেখাপড়া বা চাকরি কোনওদিনই তার যুদ্ধ ছিল না। মাথা পরিষ্কার ছিল, স্মৃতি ছিল প্রখর, তাই মশামাছি মারার মতো অনায়াসে সে বেড়াগুলো ডিঙিয়ে গেছে। কিন্তু অন্য দিকে বারবার তাকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছে তার জীবন। মোনালিসা, সোহাগ, বুড়ঢা—তার এইসব আপনজনের সঙ্গে তাকে অবিরল এক অদ্ভুত লড়াই করতে হয়। ধীরে ধীরে সে ওদের ভয় পেতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে মনের ভিতরে সে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ক্রমে একা হয়ে যাচ্ছে। স্বামী হিসেবে, বাবা হিসেবে কতভাবে যে হেরে যাচ্ছে সে তা ভাবতেও ইচ্ছে হয় না।

কত সামান্য ব্যাপার। আজ তার কলকাতা যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মোনা আজই যেতে চায়। এই সামান্য সমস্যা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ক্রমশই গুরুভার হয়ে উঠতে লাগল। মোনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার সাহসটা পর্যন্ত পাচ্ছে না সে। ভয় হচ্ছে, বলতে গেলেই মোনা বিস্ফোরিত হবে। প্রচণ্ড রেগে যাবে। কিংবা হয়তো ঠান্ডা চোখে এমনভাবে তাকাবে যে নিজেকে বে-আব্রু এক আহাম্মক বলে মনে হবে তার।

এইসব দুঃখের মূলে আজও পারুল। পারুলই। প্রজাপতির মতোই ছিল পারুল। নিষ্ঠুর, লোভী অমল একদিন সেই প্রজাপতির দুটি ডানা ছিঁড়ে দিয়েছিল। তখন প্রজাপতির শরীর থেকে জন্ম নিল বিষধর সাপ। একটি প্রত্যাখ্যানের ছোবলে মেরে ফেলল তাকে। ক্ষমা করল না। কিছুতেই আর নিজেকে বাঁচিয়ে তুলতে পারল না অমল। নিজের শরীরকে বহন করা যেন মৃতদেহ বহন করে যাওয়ার মতোই একটি একঘেয়ে কাজ। সামান্য একটু ক্ষমার দরকার ছিল তার। পাওয়া গেল না।

তুমি এখনও বসে আছ যে! গোছগাছ করবে না?

মানুষ যখন রেগে যায় তখন তার চেহারাটা যেন হয়ে ওঠে ক্ষুরধার। এখন যেমন, মোনার ফর্সা রং থেকে যেন হল্‌কা বেরিয়ে আসছে। তার উত্তাপ দূর থেকেও টের পাচ্ছে অমল। দুটো চোখ যেন চাবুকের মতো শিস টেনে ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে। তীক্ষ্ণ নাকটা যেন বল্লমের মতো উদ্যত। আর সমস্ত শরীর যেন ঝংকার তোলার জন্য সরোদের তারের মতো টানটান।

ভয় আর একটু মুগ্ধতা নিয়ে চেয়ে থাকে অমল। এই তো তার রণাঙ্গন। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমাগত যুযুৎসু। তার স্ত্রী। কিন্তু সে অর্জুনের মতোই যুদ্ধবিমুখ। তার জয়স্পৃহা নেই। ক্ষাত্রতেজ নেই। বীরত্ব নেই। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো সে এক হেরো মানুষ।

খুব বিনয়ের সঙ্গে সে বলে, গোছানোর তো কিছু নেই। একটা মাত্র অ্যাটাচি কেস।

তা হলে দেরি না করে তৈরি হয়ে নাও। দুপুরের আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

যুদ্ধ না করেই সে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। দুপুরের এখনও দেরি আছে।

তোমার মেয়ে কিন্তু গোঁজ হয়ে বসে আছে। উঠছেও না, গোছগাছও করছে না। দয়া করে মেয়েকে একটু শাসন করো। নইলে—

নইলে কী সেটা ভাবতেও ভয় করে অমলের। কিছু না ভেবেই সে শুধু আত্মরক্ষার জন্য বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই তো। ওর কি যাওয়ার ইচ্ছে নেই?

না, ইচ্ছে নেই। এই ধ্যাধ্‌ধেরে গোবিন্দপুরে কী মধু পেয়েছে কে জানে। বেশি জেদ করলে কিন্তু আমি চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাব।

শঙ্কিত অমল বলে, থাক, থাক আমি দেখছি।

কিন্তু অমল জানে তার দেখার কিছু নেই। দুই জনের মাঝখানে তার ভূমিকা রেফারিরও নয়। কাউকেই সে কিছু বোঝাতে পারে না। তবু সে উঠল। উঠতে উঠতে মিনমিন করে বলল, কী যেন একটা বলছিল তখন।

কী বলছিল?

বোধহয় শরীর খারাপের কথা।

ওসব ন্যাকামি। আমি আর কিছুতেই এখানে থাকব না।

সে তো ঠিকই। কিন্তু—

কিন্তু আবার কী? কীসের কিন্তু?

ও যেন বলছিল, কয়েকদিন ও এখানে এদের সকলের সঙ্গে থাকতে পারবে। আমি আপত্তি করিনি। যেন অসম্ভব এক প্রস্তাব। শুনে চোখ বড় বড় করে মোনা বলে, একা থাকবে? এখানে?

সেরকমই বলছিল যেন।

তুমিও সে কথা মেনে নিলে?

খুব ভদ্রভাবে বহিরাগত মানুষের মতো সে জিজ্ঞেস করে, সেটা কি উচিত হবে না?

না, হবে না। তোমার মেয়ে এখানে এসে যা-খুশি করছে। পড়াশুনো নেই ওর? যোগ ক্লাস নেই? ড্যান্সিং লেসন নেই? গান নেই? এখানে এসে তো সব চুলোয় গেছে।

কিন্তু ওঁর হাঁপানির ভাবটা নেই, লক্ষ করেছ? ঘন ঘন সর্দিও হচ্ছে না।

সেজন্যই এখানে চিরকাল থাকতে হবে নাকি?

তা বলছি না। ও বলছিল কয়েকটা দিন যদি—

একদিন দুদিন করে প্রায় মাসখানেক হতে চলল। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। তোমারও আক্কেল নেই দেখছি। এখানে গ্যাঁট হয়ে বসে আছ, অথচ তোমার অফিস খোলা। কী ব্যাপার বলো তো?

আক্রমণটা কোন দিক থেকে আসবে তা আঁচ করে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করে সে বলল, কয়েকদিন ছুটি নিয়েছি। ছুটি অনেক জমে গেছে। কতকাল ছুটি নিইনি বলো তো!

ছুটি নিয়ে থাকলে আমরা অন্য কোথাও যেতে পারি। এখানে বসে থেকে সময় নষ্ট করার মানেই হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়ে অমল বলে, সেও হয়।

তোমার এখানে বসে থাকার মতলবটা যে আমি জানি না তা তো নয়। তোমার পুরনো প্রেম নতুন করে উথলে উঠছে। ইউ হ্যাভ টু লিভ দিস প্লেস।

একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে অমল। কত দূরে সরে গেছে পারুল। এত দূর এক নক্ষত্র যার আলো এসে পৃথিবীতে পৌঁছয় না। ও কি পারুলকে হিংসে করছে? ও কি সন্দেহ করে এখনও তার আর পারুলের মধ্যে সম্পর্ক হতে পারে? অসম্ভব সব ব্যাপার ঘটছে যে! শীতল, কঠিন মোনার মধ্যে এখনও কি দখলদার জেগে আছে একজন? সেই দখলদার কি তার পুরুষের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার চায়? কী করে তা সম্ভব?

অমল শুধু বলল, তা হয় না!

কী হয় না?

ওরকম হয় না মোনা। অঙ্ক মেলে না।

আমি সেসব জানি না। আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজি নই। তুমি ওঠো, তোমার মেয়েকে ঘাড়ে ধরে রাজি করাও। আমরা আজ যাচ্ছি।

মোনার গলা সামান্য উঁচুতে উঠেছিল। দু হাত তুলে অমল বলল, ও কে, ও কে। পিস, পিস।

অমলের মনে হচ্ছিল মোনা যেন টাইগার টাইগার বার্নিং ব্রাইট। গনগন করছে সমস্ত শরীর, মুখ।

মোনা বলল, আমি যাচ্ছি গোছগাছ করতে। সব জিনিস নিয়ে যাওয়া যাবে না। কিছু এখানে থাকবে। পরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কোরো।

মোনা চলে গেল।

অমল উঠল। কোনও উপায় তার জানা নেই। সামনে আর এক রণাঙ্গন। কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়ি। সেখানে আপাতশান্ত এক পরিবারের বাস। তারা চারজন। প্রায় কোনও সময়েই কারও সঙ্গে কারও সম্পর্ক রচিত হয় না। একটু রাতের দিকে অমল মদের বোতল খুলে বসে এবং হিসেব না করেই খেয়ে যায়। খেতে খেতে যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা ও আচরণের চৌকাঠ ডিঙিয়ে যায়। তারপর কী হয় তা সে জানে। না। তবে বুড়ঢা তাকে

একদিন বলেছিল, ড্রিংক করলে তুমি খুব প্যাথেটিক হয়ে যাও। আর কিছু বলেনি। প্যাথেটিক বলতে কী বুঝিয়েছিল তাও ভেবে দেখেনি অমল।

মোনার গলা পাওয়া যাচ্ছে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকছে, সোহাগ! সোহাগ! কোথায় গেলে তুমি?

বাগের গলা, চিৎকারের কাছাকাছি।

সোহাগ! সোহাগ!

আমলের গোছানোর মতো কিছু নেই। প্যান্ট শার্ট আর কোটটা পরে নেবে। পাজামা ইত্যাদি সামান্য দু-তিনটে জিনিস গুছিয়ে নিতে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়।

একটা কথা ভেবে হঠাৎ সে আজ ভারী অবাক হল। এতকালের মধ্যে তার কখনও গ্রামের বাড়িতে এসে থাকতে ইচ্ছে হয়নি। এখনও যে এখানে থাকতে তার খুব ভাল লাগছে তা নয়। কিন্তু কলকাতায় ফিরে যেতেও তার তেমন ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু কেন? তার মনের গভীরে কি এখনও পারুল-লোভী কেউ লুকিয়ে আছে? ওপর-মন দিয়ে সে ভিতর-মনকে ধরতে পারছে না?

অমল বুঝতে পারল না। একটু আগে পারুলকে দূরতম নক্ষত্র বলে মনে হয়েছিল। বাস্তবের পারুল হয়তো তাই। কিন্তু পারুলের একটা মূর্তি কি প্রতিষ্ঠিত আছে ভিতরে স্বর্ণসীতার মতো? সে-ই কি তার সব গণ্ডগোলের মূল?

মোনা এবার চেঁচাচ্ছে, সোহাগ! সোহাগ! এই, তোমরা সোহাগকে কেউ দেখেছ?

নীচে থেকে সন্ধ্যা বিরক্তির গলায় বলে, না, দেখিনি।

তুমি তো উঠোনেই ছিলে, তবু দেখনি?

সন্ধ্যা গলা চড়িয়ে বলে, কী করে দেখব? আমি তো কাজ করছিলাম! উঠোন দিয়ে কত লোক তো যাচ্ছে আসছে।

মোনা চড়া গলায় বলল, তোমার ঘরে গিয়ে বসে আছে কি না দয়া করে দেখ। আমরা আজ কলকাতায় যাচ্ছি, তাড়া আছে।

আচ্ছা লোক বাপু, তুমি তো আর ফিসফিস করে ডাকছ না! আমার ঘরে থাকলে তো শুনতেই পেত!

শুনেও হয়তো জবাব দিচ্ছে না।

তা হলে আমি আর কী করব বলো! তুমি এসে ঘরে তল্লাশ নিয়ে যাও।

সেটাই নেওয়া উচিত। মেয়েটা তো দিনরাত তোমার ঘরেই পড়ে থাকে। দিনরাত গুজগুজ, ফুসফুস।

উঠোনে সন্ধ্যার কয়েকজন গাহেক এসে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাগে জিনিস বুঝে নিচ্ছে। তারপর সাইকেলে বিলি করতে বেরোবে। তারা কাজ থামিয়ে হাঁ করে ঘটনাটা বুঝবার চেষ্টা করছে।

সন্ধ্যা হেঁকে বলল, ঘরে যাও তো বউদি, আর লোক হাসিও না। তোমার মেয়ে তার পিসির ঘরেই আসে, ডাইনিবুড়ির কাছে নয়। তোমার যদি পছন্দ না হয় তা হলে নিজের মেয়েকে নিজেই সামলে রাখতে শেখো। পাঁচজনের সঙ্গে ঝগড়া করার দরকার কী? সোহাগ তো সকলের ঘরেই যায়, শুধু আমাকে বলছ কেন?

তুমিই ওর মাথাটা খাচ্ছ বলে বলছি।

কী করে খেলাম বলো তো! কী করেছি ওর আমি?

তা আমি জানি না। আগে ও এত অবাধ্য ছিল না, আজকাল হয়েছে। আজকাল মুখে মুখে কথাও বলছে। পাড়াগাঁর মতো ঝগড়ুটে স্বভাব তো ওর আগে ছিল না!

পাড়াগাঁর লোকেরা না হয় বাংলা ভাষায় ঝগড়া করে, আর তোমরা করো ইংরিজিতে, এটুকু ছাড়া আর কোনও তফাত আছে? লেখাপড়া জেনে, বিলেত ঘুরে এসে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছ নাকি যে, যাকে-তাকে যা খুশি তাই বলবে!

অমল এই রণাঙ্গনে ঢুকতে চায় না। তার কোনও ভূমিকাও নেই, দর্শক ও শ্রোতা হওয়া ছাড়া। কিন্তু আজকাল চেঁচামেচি শুনলে তার মাথা ঝিমঝিম করে, হাত পা কাঁপে, নার্ভাস লাগে।

সে বারান্দার দরজাটা খুলে আর্তস্বরে বলল, প্লিজ! প্লিজ মোনা, ঘরে চলে এসো।

মোনা তার ক্ষুরধার এবং রক্তাভ মুখ ফিরিয়ে গর্জন করল, চুপ করো! আমার ব্যাপার আমাকে বুঝতে দাও। শি হ্যাজ গন ইনটু হাইডিং।

আহা, তা কেন? হয়তো টয়লেটে গেছে, কিংবা...

না, টয়লেট আমি দেখেছি। এ-বাড়িতেই কারও ঘরে লুকিয়ে আছে।

কী করে বুঝলে? হয়তো কিছু কিনতে-টিনতে গেছে।

না, কোথাও যায়নি। আমি জানি। বুড়ঢা আশেপাশে দেখে এসেছে।

অমলকে দেখে সন্ধ্যা মুখ তুলে বলল, দেখেছ মেজদা, বউদি কীসব বলছে! সোহাগ আমার ঘরে আসে সে কি আমার দোষ? আমি নাকি আমার নিজের ভাইঝিকে কানমন্তর দিয়ে নষ্ট করছি।

সে রেফারি নয়, আম্পায়ার নয়, বিচারক নয়। সে অসহায় দুর্বল গলায় শুধু বলল, মোনা, প্লিজ...

সন্ধ্যাকে চেনে অমল। দুঃখী মেয়ে, খেটে খায়। এই বোনটার কথা মনেও থাকে না অমলের। এর স্বামী পরিত্যক্ত জীবনে কেউ কিছু সাহায্যে আসেনি। তাই ওর ভিতরে বিষ জমেছে মেলাই। এই অহেতুক আক্রমণে ও যদি মুখে সেই বিষ উগড়ে আনে তা হলে মোনা বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।

মোনা ধমক দিল, তুমি চুপ করো।

শোনো মোনা, উঠোনে বাইরের লোক রয়েছে, শুনছে।

ইস্, ভারী লোক রে! সব তো ছোটলোক ক্যানভাসার। তোমার বোন তো ওদের সঙ্গে মিশে মিশেই ছোটলোক হয়ে গেছে।

নীচের লোকেরা পরস্পর একটু তাকাতাকি করে নিল। তাদের সম্পর্কেই এসব কথা বলা হচ্ছে, বুঝতে পারছে তারা। কিন্তু তারা রা কাড়ল না। ওদের এই অহেতুক অপমানে কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে অমলের।

চেঁচামেচি শুনে বাড়িসুদ্ধু লোক বেরিয়ে এসেছে উঠোনে। পাড়া প্রতিবেশীরা উঁকিঝুঁকি মারছে আশপাশ থেকে।

নীচে থেকে বউদি হঠাৎ বলল, সোহাগ তো একটু আগে পেছন দিকের পথটা দিয়ে কোথায় যেন গেল।

মোনা ধমকের গলায় বলল, কোথায় গেল?

আমাকে তো বলে যায়নি ভাই। তবে এক ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখেছি।

শি ইজ হাইডিং। আপনারা জানেন, কিন্তু বলবেন না।

অমল ঘরে এসে মাথাটা চেপে ধরে বসে পড়ল বিছানায়। তার শরীর দুর্বল লাগছে। মাথা ঘুরছে। এতক্ষণে খোঁয়াড়ি ভাঙছে নাকি তার?

নীচে হঠাৎ মহিমের গলা পাওয়া গেল, কী হল এত চেঁচামেচি কীসের?

সন্ধ্যা চেঁচিয়ে বলল, সেটা তোমার মেমসাহেব বউমাকে জিজ্ঞেস করো। উনি বিলেত থেকে এসেছেন আমাদের সহবত শেখাতে। ইংরিজি বললেই যদি ভদ্রলোক হত তা হলে তো কথাই ছিল না!

মহিম বলে, কী হয়েছে বউমা, আমাকে বলবে?

সোহাগকে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ আজ আমরা কলকাতা যাব।

কতক্ষণ ধরে পাওয়া যাচ্ছে না?

চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে।

মহিম শান্ত গলায় বলে, দেখ কাণ্ড! এ হল গাঁ দেশ, কোথায় আর যাবে! হারিয়ে যাওয়ার তো জায়গা নেই এখানে। সকালে তো আমার সঙ্গে বাগানে ঘুরছিল। কোথায় আর যাবে।

তার কোথাও যাওয়ার কথা নয়। তার এখন গোছগাছ করার কথা। ইচ্ছে করেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে।

আচ্ছা আচ্ছা, আমিই না হয় খুঁজে আনছি তাকে। তুমি বরং গোছগাছ শুরু করে দাও গে।

আপনাকে বলে রাখছি, সোহাগকে বুদ্ধি পরামর্শ দেওয়ার অনেক লোক কিন্তু এ-বাড়িতে আছে।

শুনছ বাবা! ভাল করে শুনে নাও। আমরাই নাকি ওর মেয়েকে পালানোর পরামর্শ দিয়েছি।

আহা, তুই চুপচাপ নিজের কাজ কর না।

চুপ করে থাকতে দিচ্ছে কোথায়? এখন এই সকালবেলায় খদ্দেরদের ভিড়, হিসেবপত্তর করতে হচ্ছে, এ সময়ে চেঁচিয়ে মাথাটাই গরম করে দিল।

বউমা, তুমি ভেবো না। আমি বেরোচ্ছি খুঁজতে।

খুঁজে পান ভাল, নইলে আমি পুলিশ ডাকব।

মহিম ভয় খেয়ে বলে, না, না, অত কিছু করতে হবে না বউমা ছেলেমানুষ, কোথাও গেছে।

সন্ধ্যা চেঁচিয়ে বলে, ডাকতে দাও না বাবা। ডাকুক পুলিশ। আমাদের কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাক। কিন্তু তাতে তোমার মুখে কালিঝুলি কিছু কম পড়বে না। বুঝেছ? ও মেয়েই তোমার দাঁতের গোড়া ভাঙবে। পুলিশ ডাকবে। এঃ, মুরোদ কত! পুলিশ যেন ওর বাপের চাকর! পায়ে দাসখত দিয়ে বসে আছে, নাচতে বললেই নাচবে! যাও না যাও, পুলিশ ডেকে আনো। এখানকার পুলিশে না কুলোলে বাপের বাড়ির পুলিশ ডেকে আনো গিয়ে।

মোনা তীক্ষ্ণ গলায় বলে, শুনলেন! ওর কথা শুনলেন! কত দূর স্পর্ধা একবার দেখুন। বাপের বাড়ি তুলে কথা বলছে! শ্বশুরবাড়ি থেকে তো লাথি খেয়ে পালিয়ে এসেছ, অত বড় বড় কথা মুখে আসে কী করে?

সন্ধ্যা এবার বিকট একটা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, আমার দাদা যদি পুরুষের মতো পুরুষ হত তাহলে তোমার মতো বজ্জাত মাগীকে অনেক আগেই পাছায় তিন লাথি মেরে তাড়াত। দাদা ভেড়ুয়া বলে বেঁচে গেছ। কোন গুণীন ধরে ওযুধ করিয়েছ কে জানে বাপু, লোকটা তো ওরকম ছিল না। সোনার মেডেল পাওয়া ছাত্র, এক ডাকে দশটা গাঁ চিনত। তার কী অবস্থা করেছ তা কি আমরা দেখতে পাই না!

ঘরের মধ্যে অমল বিছানায় শুয়ে পড়েছে। তার বুকের মধ্যে ব্যথা হচ্ছে। তার বমি পাচ্ছে। মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের অনেক গুণ জানি। সোনার মেডেল পাওয়া ছেলে গাঁয়ের মেয়েদের ধরে ধরে রেপ করে বেড়াত। আর তোমার কাছে যারা আসে তাদের কথাও জানি। স্বামী তাড়িয়েছে, এখন যত ওটোলোক ছোটলোক জুটিয়ে নিয়েছ। তোমরা সবাই তো এক ঝাড়েরই বাঁশ, গুণকীর্তির কথা আর বোলো না।

সন্ধ্যা চিৎকার করতে লাগল, বল মাগী, বল আমার দাদা কাকে রেপ করেছে! বল, পাঁচজনের সামনেই বল দেখি তোর কত বড় বুকের পাটা! তোর মুখে পোকা পড়বে হারামজাদী, বেশ্যা মাগী কোথাকার!

এই সময়ে বুডঢা কোথা থেকে দৌড়ে এসে ভিড়ে ভরা উঠোনে ঢুকল। বুদ্ধিমান ছেলে। তরতর করে দোতলায় উঠে মাকে জাপটে ধরে ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

জ্ঞান হারানোর আগে অমল শুনতে পাচ্ছিল, ঘরের মধ্যে মোনা চিৎকার করছে, বলতে দে, আমাকে বলতে দে। ওর দাদা কাকে রেপ করেছে তা ফাস করে দিচ্ছি—

মা! মা! প্লিজ! ইউ আর আউট অফ ইওর সেনসেস! ওদের সঙ্গে কি তোমার ঝগড়া করা মানায়? চুপ করো, প্লিজ চুপ করো।

তবু ফুঁসছিল মোনা, ছাড়, ছাড় আমাকে। এখনই ওদের ভদ্রলোকের মুখোশ খুলে দিয়ে আসছি।

সেটা ঠিক হবে না মা। এরকম করতে নেই। জাস্ট টেক রেস্ট।

বুড়ঢাকে বোধহয় চটাস করে একটা থাপ্পড় মারল মোনা, কেন ছাড়ছিস না আমায়? ও যে এক তরফা চেঁচিয়ে যাচ্ছে শুনছিস না?

শুনছি মা। লেট দি ডগ বার্ক। তুমি চুপ করো।

তোর বাবাকে শুনতে বল। তোর বাবা বেরিয়ে গিয়ে বলুক কাকে রেপ করেছে।

সন্ধ্যা চিৎকার করছিল, কী রে খানকির মেয়ে, বললি না আমার দাদা কাকে রেপ করেছিল! বললি আমি কার সঙ্গে শোয়াবসা করি! বুকের পাটা থাকে তো আয়, সামনে এসে পাঁচজনকে বল! গুয়ের পোকা, কেলে কুত্তার পায়খানা, ইংরিজি মারাতে আসে!

নীচে যারা জড়ো হয়েছিল তারা সবাই সন্ধ্যাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিল।

ছেড়ে দাও দিদি, বড় মাপের মানুষের কেলেঙ্কারিও বড় মাপেরই হয়। তুমি তোমার মতো থাকো। আমরা তো চিনি তোমাকে।

আরে ওরা সব সাহেব মেম লোক, ওদের ধাত আলাদা।

সন্ধ্যা ফোঁপাচ্ছিল, কী সব বলল শুনলি তো তোরা। শুনি নাকি লেখাপড়া জানা মেয়ে। অমন লেখাপড়ার মুখে আগুন। বাইরের রং ফর্সা হলে কী হবে, ভেতরটা কালো আংরা।

যেভাবে পৃথিবীর সব ঝগড়াই ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে কথা ফুরিয়ে দম শেষ হয়ে স্তিমিত হতে থাকে এ ঝগড়াটাও শেষ অবধি থামল। হাত মুঠো করে, দাঁতে দাঁত চেপে বজ্রাঘাতের অপেক্ষায় ছিল অমল। কখন উত্তেজিত বলগাহীন মোনার মুখ থেকে পারুলের নামটা উচ্চারিত হয়। অল্পের জন্য আজ বেঁচে গেল পারুল। খুব অল্পের জন্য। বুডঢা সময়মতো না এলে সারা গাঁয়ে চাউর হয়ে যেত পারুলের নাম।

তীব্র উত্তেজনা, স্নায়ুর দুর্বলতা এবং অবসাদে অমল কিছুক্ষণের জন্য সত্যিই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। এই ক্ষমাহীন পৃথিবীতে মানুষ কী করে যে বেঁচে থাকে!

কী হয়েছে তোমার ঠাকুরপো! কী হয়েছে?

অমল ফ্যালফ্যাল করে যখন চাইল তখন তার মুখে চোখে ছিটোনো জলের শীতল স্পর্শ। সে প্রতিধ্বনি করল, কী হয়েছে আমার বলো তো!

তাই তো জিজ্ঞেস করছি। ঘরে এসে দেখি দাঁতকপাটি লেগে পড়ে আছ।

অমল এত দুর্বল বোধ করছিল যে চোখের পাতা দুটো পর্যন্ত খুলে রাখতে পারছিল না। বারবার বুজে আসছে চোখ, মানুষের শরীর যে এত শক্তিহীন হয়ে যেতে পারে এমন অভিজ্ঞতা তার আগে হয়নি কখনও।

আমার মেয়েটা কোথায় ঠাকরোন?

কোথায় আবার! পান্নাদের বাড়িতে গিয়েছিল। রোজই তো যায়। কী যে আজ অশান্তি হল তাই নিয়ে।

অমলের কিছু বলার নেই। চুপ করে থাকে।

চিন্তা কোরো না। তোমার মেয়েটা একটু ক্ষ্যাপাটে হলেও খারাপ কিছু নয়। বলতে কি বাপু, ও-ই তো আমাদের সঙ্গে যা একটু মেশে-টেশে। তোমরা আর কেউ বাপু আমাদের পাত্তাও দাও না।

সোহাগও মিশুকে নয়। এখানে এসে মিশুকে হয়েছে। সেটা হয়তো তোমাদের গুণ।

না বাপু, গুণের কথা ওঠে কেন? আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মেলামেশাটাই স্বাভাবিক। আমরা তো পর নই। পর করে রাখলে আর কী করা যাবে।

সোহাগ কোথায়?

এসেছে। দাদুর কাছে বসে আছে। আজ যা কাণ্ড হল তাতে শ্বশুরমশাইয়ের হার্টফেল হতে পারত। ঝগড়া দেখে সোহাগকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে কেঁপেঝেঁপে অস্থির হয়ে শয্যা নিয়েছিলেন। ডাক্তার অবধি ডাকতে হয়েছে। অনল বাগচী এসে ওষুধ ইনজেকশন দেওয়ায় এখন ঘুমোচ্ছেন।

খারাপ কিছু নয়তো?

ডাক্তার তো তেমন কিছু বলল না। শক পেয়ে নাকি হয়েছে। বয়সও তো কম হল না।

সব কিছুর জন্য নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয় ঠাকরোন। আমি যদি একটু ভাল মানুষ হতাম।

যা বাবা, ও আবার কী কথা? তুমি আবার খারাপ কীসে?

আমিই তো খারাপ। বিদ্বান গাধা।

ছিঃ, ওরকম বলতে নেই। তুমি তো এ বংশের গৌরব। আর কেউ তোমার মতো হল না।

আশীর্বাদ করো যেন না হয়।

নিজের ঘাড়ে দোষ নিচ্ছ, কিন্তু তোমার বউটি আজ কী কাণ্ড করল বলো। অমন চেঁচিয়ে পাড়া জানিয়ে কেউ নিজের শ্বশুরবাড়ির কথা বলে? আর ওরকম সব অসভ্য কথা!

শঙ্কিত অমল একবার দু ঘরের মাঝখানের বন্ধ দরজাটার দিকে চাইল। বউদি বেশ জোর গলাতেই কথা কইছে। মোনা যদি শুনতে পায়?

কী দেখছ? মোনা তো কখন চলে গেছে!

কোথায়?

বুড়ো তো ঘণ্টাখানেক আগে মাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে।

ওঃ!

তোমার ঘরে একটা উকিও দিয়ে গেল না দেখলাম।

কলকাতায় চলে গেল?

যেতে পারবে কিনা দেখ।

কেন ঠাকরোন?

শুনছি কোন পার্টি নাকি সড়ক আর রেল অবরোধ করেছে বেলা দশটা থেকে। কিছুই চলছে না। গাঁয়ের অনেকে যেতে না পেরে ফিরে এসেছে।

অমল সিলিং-এর দিকে চেয়ে রইল।

উঠতে পারবে?

শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে।

আগে জানলে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতাম।

না, তার দরকার নেই। হঠাৎ অত চেঁচামেচি শুনে মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল। আজকাল আমার চেঁচামেচি সহ্য হয় না।

সন্ধ্যারও ওরকম সব কথা বলা উচিত হয়নি। তোমার বউ আর হয়তো আসবেইনা। হ্যাঁ ঠাকুরপো, তোমরা কি শেষে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তুলেই দেবে?

তা কেন ঠাকরোন, সম্পর্ক কি ইচ্ছে করলেই তুলে দেওয়া যায়!

যায় না? বলো কী? কত বাপ ছেলেতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

হ্যাঁ, তাও বটে। ভাবছি ওরা যে গেল কোথাও আটকে থাকবে হয়তো। এবাড়িতে ফিরবে না হয়তো।

তোমার দাদা সঙ্গে গেছে, ঠিক ফিরিয়ে আনবে।

দাদা সঙ্গে গেছে?

হ্যাঁ। তার তো ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। বড্ড ভালমানুষ। মান অপমান গায়ে মাখে না। তোমার বউ ফাই-ফরমাশ করে, হাসিমুখে মেনে নেয়। ওই একধরনের মানুষ। মান অভিমান যা-কিছু সব আমার সঙ্গে। আর কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই।

হেসে ফেলে অমল, দাদাকে খুব চিনেছ তো!

না চিনে উপায় কী বলো! কত বলি ভাদ্দর বউয়ের ফাই-ফরমাশ খাটো, লোকে বলবে কী! কিন্তু সে বলে, ওরা গাঁয়ে এসে অচেনা পরিবেশে পড়েছে, আমার তো দেখা উচিত। কথাটা তো মিথ্যেও নয়।

মোনাও দাদার কথা খুব বলে।

তুমি কি এক কাপ চা বা কফি খাবে?

খাব। তারপর ঘুমোব। স্নান-খাওয়ার জন্য ডেকো না। আমার খিদে নেই।

সোহাগকে ডেকে দেব? একটু বসুক এসে তোমার কাছে।

না ঠাকরোন। ওরা অনেক দূরের লোক। দূরেই থাকুক।

কী যে সব বল না, অলক্ষুণে কথা।

তোমার এক বিছানায় শোওয়ার থিওরি সব জায়গায় খাটে না।

দাসীর কথা বাসি হলে বুঝবে।

কফি খেয়ে অমল ঘুমোল। অনেকক্ষণ ঘুমোল। বিকেলে পড়ন্ত বেলায় ঘুম ভাঙল খিদেয়।

মোনা আর বুড়ঢা ফিরে এসেছে। পাশের ঘরে তাদের ইংরিজি ডায়ালগ শুনতে পাচ্ছিল অমল। এ-দেশের সিস্টেমকে গালাগাল দিচ্ছিল মোনা। রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে ফের ফিরে আসার লজ্জা তো কম নয়।

বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে পড়ল, আজ পারুল আসবে। সর্বনাশ! এই আগ্নেয়গিরির লাভামুখে সত্যিই কি আসবে নাকি পারুল? তাকে যে আটকানো দরকার। ভীষণভাবে আটকানো দরকার!

তড়িঘড়ি উঠতে গিয়ে বিবশ হয়ে ফের বসে পড়ল অমল। মাথা ঘুরছে। স্পন্ডেলাইটিস ধরা পড়েছিল বছর খানেক আগে। ডান হাতে ঝিঁঝিঁ। ঘাড় টনটন করছে ব্যথায়।

চুপ করে বসে থাকে অমল। সামনেই চৌকাঠের ওপারেই দাঁড়িয়ে আছে সর্বনাশ। পারুলকে কী করে একটা খবর পাঠানো যায়?

কিছুই করতে পারল না অমল। দাড়াতে গেলেই টলে যাচ্ছে মাথা, পায়ের নীচে মেঝে টলমল করছে। একটু হুইস্কি খাবে কিনা ভাবল। খাওয়াটা বোধহয় বিচক্ষণতা হবে না। একটাই ভরসা, গ্রামে কোনও বাড়িতে ঝগড়া কাজিয়া হলে সেটা রটে যেতে দেরি হয় না। যদি তাদের বাড়ির ঝগড়াটার কথা পারুলের কানে পৌঁছে থাকে তাহলে সে হয়তো নিজে থেকেই আসবে না।

এই ক্ষীণ আশাটুকু নিয়ে গায়ে লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে থাকে সে।

সন্ধের শঙ্খধ্বনি শেষ হতে না-হতেই হঠাৎ চটকা ভাঙল অমলের। নীচের তলায় হঠাৎ হাসি আর কথার শব্দ হচ্ছে। কারা যেন উঠে আসছে ওপরে।

মোনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কাকে যেন বলছে, আসুন, আপনার কথা কত যে শুনেছি ভাই।

কে এল? কে আসতে পারে? পারুল? অসম্ভব। অসম্ভব। তবু বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে তার।

পারুলের গীতধ্বনির মতো কণ্ঠস্বর বলে উঠল, ইস, কী সুন্দর দেখতে ভাই আপনি! অমলদার ভাগ্য খুব ভাল।

আপনার কাছে আমি! কী যে বলছেন। ভিতরে এসে বসুন।

এই ইনিই হলেন আমার স্বামী জ্যোতিপ্রকাশ গাঙ্গুলি।

আপনার কথাও খুব শুনেছি। আপনি তো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।

গম্ভীর এক পুরুষ কণ্ঠ বলে, যা শুনেছেন তার অনেকটাই বাড়াবাড়ি। মিস্টার রায় কোথায়?

বসুন। ডাকছি, ওঁর শরীরটা আজ ভাল নেই।

অমলের ইচ্ছে হল দোতলা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পালিয়ে যায়। কিন্তু শরীর আজ বড্ড বাদ সেধেছে। উপায় নেই।

পারুল উচ্চকণ্ঠে বলে, আমার বান্ধবীটি কোথায়?

ও সোহাগের কথা বলছেন?

হ্যাঁ। ও আমাকে পারুল বলে ডাকে। ঠিক বান্ধবীর মতো।

হ্যাঁ, বিদেশ থেকে শিখে এসেছে। চট করে অচেনা কাউকে মাসি পিসি বলতে পারে না।

মাসি বললে খুশিও হই না। পারুল বলেই ডাকুক। সে গেছে কোথায়?

আর বলবেন না। এখানে এখন তার অনেক বন্ধু হয়েছে। দিনরাত আড্ডা। তবে এসে পড়বে ঠিকই। আপনি আসবেন জানে তো।

খুব ইন্টারেস্টিং মেয়ে।

এমনিতে খুব ভাল, কিন্তু বড্ড খেয়ালি।

কী চমৎকার অভিনয় মোনার। ওকে অস্কার দিতে ইচ্ছে হচ্ছে অমলের। অমল তীব্র শীতে জবুথবু হয়ে জড়বস্তুর মতো বসে রইল অন্ধকার ঘরে। মনে হচ্ছিল, সে আর নড়তে পারবে না। পারুলের মুখোমুখি হওয়াও সম্ভব নয় তার পক্ষে। মোনা বড় বিপজ্জনক জায়গায় চলে গেছে। আজই রাগের মাথায় সে পারুলের কথা বলে ফেলেছিল প্রায়। অমলের কলঙ্কের কোনও ভয় নেই, তার কিছুতেই কিছু যায় আসে না। কিন্তু পারুলের মূর্তিটা ভেঙে পড়ে যেত আর একটু হলেই।

সে শুনতে পেল, পারুল বলছে, অমলদার কি শরীর খারাপ?

হ্যাঁ। স্পন্ডেলাইটিসে কষ্ট পাচ্ছেন। দাঁড়ান, ডেকে আনছি।

থাক না। একটু পরে ডাকলেও হবে। আজ আপনার সঙ্গে আলাপ করতেই তো আসা।

মোনা বলল, আপনার সঙ্গেও আলাপ করার ভীষণ ইচ্ছে ছিল আমার। সোহাগের কাছে তো আপনি একজন গডেস।

খুব করুণ গলায় পারুল বলে, আচ্ছা, দেখুন তো কী কাণ্ড! ও আমাকেও ও কথা বলেছে, শুনে যে আমার কী লজ্জা হয়েছে বলার নয়। আমাকে ওসব ভাবে কেন ও?

মোনা হেসে বলে, ভাবার কারণ আছে বলেই ভাবে।

কারণ! কী কারণ থাকতে পারে?

আপনার মধ্যে একটা অদ্ভুত গ্রেসফুলনেস আছে। এতদিন কেবল আপনার ছবি দেখেছি আর কথা শুনেছি, আজ মুখোমুখি দেখে আমারও যেন মনে হচ্ছে আপনার মধ্যে ডিভাইন কিছু আছে।

যাঃ, আপনিও এসব বলছেন!

আমার ছেলেও বলে।

কী লজ্জার কথা বলুন তো। আমি তো একেবারে সাধারণ একটা মেয়ে।

তাহলে বোধহয় আমাদেরই চোখের ভুল।

জ্যোতিপ্রকাশ চুপ করে ছিল। এবার তার গুরুগম্ভীর গলায় বলল, দেবী হলে কিন্তু এদেশে খুব কদর হয়। দেবী বলে সেই যে গল্পটা—

আহা, ওসব তো গল্প।

সিঁড়িতে দুদ্দাড় পায়ের শব্দ তুলে উঠে এল সোহাগ।

হাই! পারুল পিসি!

এই দুষ্টু মেয়ে আমি আবার পিসি হলুম কবে?

বাইশ

আগে পাড়াপ্রতিবেশীরা ভাবত বাঙালবাড়িতে বুঝি ঝগড়া লেগেছে। ঝগড়া দেখতে চলেও আসত কেউ কেউ। আজকাল সবাই জেনে গেছে, হাঁকডাক আর চেঁচামেচি হল বাঙালের স্বভাব। ভাল কথাটাও উঁচু গলায় না বললে তার সুখ হয় না। বিষয়ী কথাই হোক, আদুরে কথাই হোক পাঁচবাড়ি জানান দেওয়া চাই। হাঁকডাক শুনলেই পাড়া-প্রতিবেশীরা নিজেদের মধ্যে কওয়াকওয়ি করে, ওই বাঙাল এয়েছে, কদিন এখন ভূত-প্রেতও তফাত থাকবে।

ধীরেন কাষ্ঠ কিন্তু খুশিই হয়। বাসন্তীকে একবার বলেছিল, যারা চেঁচিয়ে কথা কয় তাদের মনে ময়লা নেই। তারা সরল মানুষ।

জিজিবুড়ি বলে, ও হচ্ছে মাগী নাচানো গলা। খোঁজ নিয়ে দেখগে, আলকাপ না বউ মাস্টারের দলে যাত্রা থিয়েটার করে বেড়াত। ও কী গলা বাবা, বাঘের অবধি পিলে চমকে যায়। জন্মের পর মা মাগী বোধহয় তেঁতুলগোলা গিলিয়ে দিয়েছিল।

কথাটা ঠিক যে, হাঁকডাকে বাঙাল খুব দড়। সকালবেলা রসিক বাঙাল তার বাজখাঁই গলায় হাঁকডাক করতে করতেই দোতলা থেকে নামছিল, কই রে, হারু কই গেলি? মরইন্যাটা কইরে? আরে তুমি কই গ্যালা...?

বাঙালের বাঁ কোলে হাম্মি, ডান হাতে এক গোছা ভাঁজ করা রুটি। সকাল আটটা সাড়ে আটটায় বাঙাল রোজ কাককে রুটি খাওয়ায়। বাঁধা নিয়ম।

উঠোনের কোণে রান্নাঘর থেকে বাসন্তী হাসিমুখে বেরিয়ে এল।

কী বলছ?

বেহানবেলায় পাকঘরে ঢুইক্যা করটা কী?

জলখাবার করছি তো।

পোলাপানগুলি কই?

একটা তো তোমার কোলে। মরণ পড়তে বসেছে, আর সুমন এখনও ঘুমোচ্ছ।

তাই কও।

আসলে এই ডাকখোঁজ করাটা বাঙালের স্বভাব। আপনজনরা কে কোথায় কী করছে সে খবরটা সবসময়ে চায়। বড্ড মায়া লোকটার। যা করবে তা সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে করবে। জন না হলে যেন বাঙালের এক মুহূর্ত চলে না।

কাউয়া খাওয়াইতে যাইতাছি। আইবা নাকি?

উনুনে যে তরকারি হচ্ছে। পুড়ে যাবে।

আইচ্ছা মাইয়্যালোক, বান্ধন-বান্ধন লইয়াই থাক গিয়া।

দুড়দাড় করে উঠোন পেরিয়ে গেল লোকটা। বাসন্তী হাসিমুখে চেয়ে রইল। বড্ড ছেলেমানুষ তার এই মানুষটা। মানুষটার আধখানামাত্র সে পেয়েছে। তাইতেই ভরে গেছে বাসন্তীর। পুরোটা যদি পেত! না, থাক। ওসব ভাবতে নেই।

উঠোনের পুব-দক্ষিণ কোণে গোয়ালঘরের পিছনে সবজিবাগান ঘেঁষে একটা ফর্সা জায়গা আছে। সেখানে রাজ্যের কাক বাঙালের জন্য ওত পেতে থাকে। বাঙাল রুটির টুকরো ছুড়ে ছুড়ে দেয় আর কাকগুলো নানা কায়দায় শূন্যে পাক খেয়ে খেয়ে এরোপ্লেনের মতো গোঁত্তা মেরে শূন্য থেকেই লুফে নেয় ঠোঁটে। দৃশ্যটা খুব উপভোগ করে বাঙাল। খুব হাসে, খা, খা, ভাল কইরা খা।

বাপের কোল-সই হয়ে হাম্মিও দৃশ্যটা খুব মন দিয়ে দেখে আর নানা শব্দ করে চেঁচায়। দুই শিশুর কাণ্ড।

রান্নাঘরে গা-ঢাকা দিয়ে জিজিবুড়ি বসা। রোজ সকালেই এ সময়ে একবারটি আসে সে। লুকিয়ে বসে এক কাপ দুধ-চা খেয়ে যায়। বাসন্তী মায়া করে তাকে ওটুকু দেয়।

চাপা গলায় জিজিবুড়ি বলে, ওই চললেন কাককে ভোজ খাওয়াতে। ওই করে করেই ঘটিবাটি সব চাঁটি হবে বলে রাখছি বাপু। শেষে কৌপীনসম্বল। বলি কাকের মতো নিঘিন্নে জীব আছে? সারাদিন অখাদ্য সব জিনিস খেয়ে বেড়ায়, পচা-ঘচাবাসি-ত্যাতা কোনটায় অরুচি দেখেছিস? কেলেকুষ্টি, ছিষ্টিছাড়া কাককে কেউ নেমন্তন্ন করে পয়সার জিনিস খাওয়ায় আহাম্মক ছাড়া? আড়াইশো তিনশো আটা জলে গেল। কত দাম হয় হিসেব করেছিস কখনও?

তুমি চুপ করো তো মা। তার ইচ্ছে হয়, তাই খাওয়ায়। ভূতভূজ্যি বলেও তো একটা কথা আছে, নাকি?

তুই আর বাঙালের পোঁ ধরিসনি তো! দশ বারোখানা আটার রুটি কি কম কিছু হল? দুটো মনিষ্যির খোরাক। তোর ভালর জন্যই বলি। নইলে দিক না সব উড়িয়ে পুড়িয়ে, আমার তাতে কী?

দুধ খেতে এসেছ চুপচাপ বসে দুধ খাও। এ-সংসারের ব্যাপারে তোমার অত নাক গলানোর দরকার কী?

ওলো আমার সংসারী লো! দুদিনের বৈরিগী ভাতকে বলে মালসাভোগ। বলি সংসারটার সুসার হয় কীসে তা বুঝি দেখার দরকার নেই?

আমার সংসারে সুসারের অভাব কবে দেখলে? ওসব বোলো না তো! ভাল লাগে না। ও মানুষ সবাইকে খাওয়াতে ভালবাসে।

খেয়ে খেয়েই তো বাঙালগুলো গেল। পেছনের কাপড় তুলে দিনরাত কেবল গিলছে। অমন রাক্ষুসে খাঁই দেখিনি বাপু। আড়াইটি লোকের সংসার, তা বাপু ফি শনিবারে দেখি গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে আসছে। মাছ রে, মাংস রে, ঘি রে, তেল রে...যেন মচ্ছব লেগেছে। এই বলে দিচ্ছি এখন থেকে একটু লাগামে টান দে, নইলে তোর দশাও শেষে আমার মতো হবে। সেই মিনসে আমাকে যে দশায় ফেলে গেছে এখন সামনে পেলে তার মুখে মুড়ো জ্বেলে দিতুম।

বাসন্তী ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, খাওয়া নিয়ে খোঁটা দেবে না তো মা! তোমাদের মতো স্বার্থপর মানুষ তো নয়। খেতে জানে, খাওয়াতেও জানে।

খাওয়াতে জানে ওই কাক-বক শ্যালকুকুরকে। দুটো শালা, শাউড়ি এদের যে পেটে পাটকেল সিদিকে খেয়াল আছে? কত বড় দাতাকর্ণ এলেন রে? আবার বলে খেতে জানে, খাওয়াতেও জানে!

দেখো মা, সোজা বলে দিচ্ছি কাল থেকে আর এসো না। আমি আর তোমার আফিং-এর দুধ জোগাতে পারব না। যারটা খাবে তারই নিন্দে করে বেড়াবে সেটা আমি আর সহ্য করব না।

জিজিবুড়ি একটু মিইয়ে গেল। জুল জুল করে মেয়ের মুখপানে একটু চেয়ে দেখল। হাতের গেলাস থেকে চায়ের লিকার মেশানো দুধ সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে কয়েক চুমুক খেয়ে গলাটা মোলায়েম করে বলল, বাব্বা, কী এমন বললুম যে, তোর আঁতে লাগল। ভালর জন্যই বলা। বাঙাল কি আর মনিষ্যি খাবাপ! হাতটাই যা একটু দরাজ। তাই তো বললুম, নাকি?

যা বলেছ সে আমি বুঝেছি। কাল থেকে তোমার দুধ বন্ধ রইল।

জিজিবুড়ি একটু তোম্বা মুখ করে বসে থেকে বলে, আফিং খাই বলেই আতান্তরে পড়েছি মা, নইলে কি আর মান খোয়াতে আসি। তা সেই আফিংটাই বা জোটে কোথায়? কানাই আফিং-এর খোসা এনে দেয়, তাই জলে সেদ্ধ করে খাওয়া। বাঙালকে বলে পপা টাক আফিং-ও তো আনিয়ে দিতে পারিস। দশ মাস গর্ভে ধরেছিলুম, সে কথা কি ভুলে গেলি যে, খুঁড়ছিস!

গলা উঁচুতে তোলা যাচ্ছে না, তবু তার মধ্যেই যতটা সম্ভব দ্বেষ মিশিয়ে বাসন্তী বলে, তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনি মা। ছেলেরা লাথিঝাটা মারলেও তুমি তাদের দোর ধরে পড়ে থাকবে। তাদের খোঁট ছাড়বে। না। তা এনে দিক না তারা তোমার আফিং। তার বেলা আমার বাঙাল বরকে দরকার হয় কেন? তাও তিন-চার মাস আগে দু ভরি আফিং আনিয়ে দিয়েছিলাম। অত মুখ মুছে ফেল কী করে বলল তো! বেইমান আর কাকে বলে?

জিজিবুড়ি দুধ-লিকারের শেষটুকু গিলে ধপাৎ করে গেলাসটা মেঝেতে রেখে বলল, ইঃ, বড় যে বেউলো হলি। বলি বাঙাল কি তোর আর জন্মের স্বামী নাকি লা? বে বসেছিল লোক দেখাতে। ও মোটে বে-ই নয়। রাঁড়ের মতো আছিস, তাই থাকবি। ও তোকে বউ বলে বড় গেরাহ্যি করে কি না। তুই বোকার বেহদ্দ বলে দুধের বদলে পিটুলিগোলা খেয়ে নাচছিস। চোখ থাকলে সব দেখতে পেতিস। ভারী তো এক পো দুধ খাওয়াস তার জন্য এত কথা!

বাসন্তী জিজিবুড়ির দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ভস্ম করে ফেলবে। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলল, তোমাকে মা বলে ডাকতে আজকাল ঘেন্না হয়। যাও তো, এখন বিদেয় হও। আর এ-মুখো হয়ো না।

তোম্বো মুখ করে জিজিবুড়ি উঠে পড়ল। বলল, আমাকে তাড়ালে কি আর দাগ উঠে যাবে? যা বললুম ভাল করে ভেবে দেখিস। দুটো পয়সার মুখ দেখেছিস বলে বড্ড অহংকার তোর।

জিজিবুড়ি বিদেয় হওয়ার পর বাসন্তী চুপ করে বসে রইল। তার দু চোখের জলের ধারায় ভেসে যাচ্ছিল গাল। কড়াইয়ে তরকারি পোড়া গন্ধ ছাড়তে লাগল। খেয়ালই করল না সে।

তার বুকের মধ্যে ঝুলকালির মতো ভয়টা তো আছেই। সত্যিই সে রসিক সাহার কতখানি বউ? কতখানি অধিকার তার ওই মানুষটার ওপর? টাকাপয়সার অভাব রাখেনি, বাড়িঘর জমি-জমা সব তার নামে। কিন্তু সেটাই তো আর স্বামীত্ব প্রমাণ করে না। লম্পট লোকেরা তাদের রক্ষিতাদের তো কত কিছু দেয়, তাতে তো রক্ষিতা বউ হয়ে যায় না। সে ভাবতে চায় না, তবু মাঝেমাঝে প্রশ্নটা হঠাৎ ছোবল তোলে মনের মধ্যে, আমি ওর কতখানি বউ?

তার মায়ের বুকে গরল, মুখে গরল। ঠিক কথা। কিন্তু কখনও কখনও এমন কথা কয় যে বড্ড চমকে যায় বাসন্তীর ভিতরটা। নিশ্চিন্ত, সুখী মনটা যেন কাচের গেলাসের মতো ঝনঝন করে ভেঙে শতখান হয়ে পড়ে। তখন বড় দিশাহারা লাগে। এখন বড় পাগল-পাগল লাগে। এখন ইচ্ছে হয়, ছুটে কোথাও পালিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে আদর সোহাগের সময় সে রসিকের বুক ঘেঁষে মাথাটা সাপটে দিয়ে বলে, এত সুখে রেখেছ কেন আমায় বলো তো! এত সুখ কিন্তু ভাল নয়।

ক্যান গগো, তোমারে কি সুখে থাকতে ভূতে কিলায়?

হুঁ, কিলোয়। আমার বড় ভয়-ভয় করে যে! ছেলেবেলা থেকে আদর-সোহাগ পাইনি তো কখনও। অভাবের সংসার, নিত্যি খিটিমিটি, কথায় কথায় চড়চাপড়, আধপেটা খাওয়া এইসব নিয়েই বড় হয়েছি। তাই মনে হয় ভগবান আবার সব কেড়ে না নেন। বড্ড ভয় যে!

তুমি একখান আজব মাইয়ালোক। অত ডরাও ক্যান?

ভয় কি সাধে পাই! আমাকে বিয়ে করে তোমারও তো কত ঝঞ্ঝাট গেল। আমার দাদারা তোমার পেছনে গুণ্ডা লাগিয়েছিল, ধান চাল চুরি করত, গাঁয়ের লোককে তোমার পিছনে লাগাত। আমি যে কী ভয় পেতুম!

আরে ওইসব কথা বাদ দেও তো! মাইর আমি অনেক খাইছি।

কিন্তু সবচেয়ে বড় ভয়ের কথাটা সে মুখ ফুটে বলতে পারে না।

সে কি বাঙালের সত্যিকারের বউ, না রক্ষিতা?

হ্যাঁ, তাদের পুরুত ডেকে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সে শুনেছে, আইনে নাকি ও বিয়ে গেরাহ্যি হয় না। তা হলে কি ইহজন্মে সে বাঙালের বউ হবে না?

এই চিন্তাটা ছাইচাপা আগুনের মতো তার বুকের মধ্যে সবসময়ে থাকে। মাঝমাঝে তার মা এসে সেটাকে ফুঁ দিয়ে গনগনে করে দিয়ে যায়। ঝাঁপিতে যেমন সাপ নিশ্চিন্তে ঘুমোয়, সাপুড়ে তাকে খুঁচিয়ে জাগায়।

চোখের জল আজ বড় উথলে পড়েছে। জমি-বাড়ি-গাড়ি-গয়না ছেলেমেয়ে সব মিথ্যে মনে হচ্ছে। পায়ের তলায় বুঝি ধরণী নেই তার। ওই একটা লোককে ঘিরে তার লতিয়ে ওঠা জীবন যে মিথ্যে হয়ে যায় তা হলে। সেই মিথ্যে নিয়ে বাঁচবে কী করে বাসন্তী?

ফুলে ফুলে কাঁদছিল বাসন্তী। কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়ে আকুল কান্নার নদী হয়ে যাচ্ছিল সে। তরকারি পুড়ল, কড়াই পুড়ল, তপ্ত লোহার গন্ধে ঘর ভরে গেল।

ও বউদি! ও কী গো! ঘরে যে অগ্নিকাণ্ড হবে! ইঃ বাবা...

দৌড়ে এসে উনুন থেকে কড়াই নামিয়ে তাতে ফ্যাঁস করে জল ঢেলে দিল হিমি, পাশের বাড়ির অক্ষয়বাবুর মেয়ে। সুমন আসার পর থেকে এ মেয়েটার যাতায়াত বেড়েছে। নানা ছুতোয় এসে হানা দেয়। একদম পছন্দ করে না বাসন্তী।

একটা উলের ডিজাইন দেখাতে এসেছিলাম। এসে দেখি কী কাণ্ড! কী হয়েছে বউদি, কাঁদছ কেন?

বাসন্তীর চেতনা ফিরল। আঁচলে ঢাকা মুখ সহজে তুলল না। মাথা নেড়ে ধরা গলায় বলে, কিছু না।

ঝগড়া হয়েছে বুঝি? তোমাদের তো কখনও ঝগড়া হয় না।

ফোঁপানিটা কিছুতেই লুকোনো যায় না। হেঁচকির মতোই বেসামাল জিনিস।

কড়াইটা ঝামা হয়ে গেছে বউদি। ওঠো তো, মুখেচোখে জল দাও।

লজ্জা করছিল বাসন্তীর। এই কান্না নিয়ে পাঁচটা কথা উঠবে। এমনিতেই সে একজনের দুনম্বর বউ বলে দুটো চারটে উড়ো কথা কানে আসে তার। গাঁ হচ্ছে কূটকচালির এঁদো পুকুর। চোখ মুছে বাসন্তী বলে, তুই এখন যা হিমি। আমার মনটা আজ ভাল নেই।

খুব ভাল মানুষের মতো হিমি রাজি হয়ে বলে, আচ্ছা বউদি, পরে আসবখন ডিজাইনটা দেখিয়ে নিতে।

ডিজাইন না ছাই। এসে নানা ফাঁকে সুমনের দিকে চেয়ে থাকে। ইশারা ইঙ্গিতের চেষ্টা করে। সুমন অবশ্য আনমনা ছেলে। কিন্তু বয়সটা খারাপ, কখন কী হয়ে যায়। বদনাম যা হওয়ার বাসন্তীরই হবে। বড়গিন্নি বলে বেড়াবে, ছেলেটার মাথা খাওয়ার মূলে এই হতভাগী বাসন্তী। তারই ষড়যন্ত্র।

কড়াই বের করে নিয়ে ফের নতুন করে রাঁধতে বসল বাসন্তী। জলখাবার দিতে আজ দেরি হয়ে যাবে একটু।

ধীরেন কাষ্ঠ ওঠে সেই কাকভোরে। ওঠা বলতে শয্যাত্যাগ। নইলে ঘুমও কি আর তেমন হয় আজকাল। মাঝরাত্তিরেই চটকা ভেঙে এপাশ ওপাশ। ঘড়ি ঘড়ি পেচ্ছাপও পায় এই শীতকালটায়। ঘুমের জো কী?

কাকভোরে উঠে লোকে ইষ্টনাম-টাম করে। ধীরেনের ইষ্ট-টিস্ট নেই। যৌবনকাল পেরিয়ে আধবুড়ো বয়স অবধি ধর্মে মতি ছিল না। আর এখন বুড়ো বয়সে মনে হয় ওসব করে আর হবেটা কী? তার যা পাহাড়প্রমাণ পাপ জমা হয়ে আছে তা ক্ষয় হওয়ার নয়। মাথায় তাই ভগবানকে আর ঢোকায়নি কাষ্ঠ, তাতে মনের জ্বালা আরও বাড়বে। পাপ নিয়ে নরক নিয়ে চিন্তা বাড়বে। তার চেয়ে নাস্তিক হওয়া ভাল। তা হলে আর ওসব ল্যাঠা থাকে না।

আলো ফুটি-ফুটি হলেই বেরিয়ে পড়ে ধীরেন। তার গরম জামাকাপড় বিশেষ নেই। যা আছে তাই চাপিয়ে নেয় গায়ে। মোটা গেঞ্জি, জামা, একটা আড়ে বহরে ধুতি, মোজা, চটি। শীতটাও ওখানেই বেশি লাগে।

ঘরে চা জোটে না তা নয়। তবে বেলা হয়। আর সে অখাদ্য চায়ের জন্য বসে থাকার মানে হয় না। যে বাড়িতে হানা দেবে সে বাড়িতেই একটু চা জুটেই যায় সকালবেলাটায়।

এ-গাঁয়ে বাঙালের বাড়িটাই তার সবচেয়ে পছন্দের। বাঙাল থাকলে তো কথাই নেই। দিলদরিয়া লোক। গিয়ে দুদণ্ড বসলে চা জোটে, খাবার-দাবারও জুটে যায়। বাঙাল বলে, খান খুড়া, খান। দুনিয়ায় খাওনের মতো বস্তু নাই।

তা খাওয়ার পরিপাটি আছে বাঙালের। সেজন্য খরচও করে দেদার।

এই সকালবেলায় বাঙাল কাককে রুটি-টুটি খাওয়ায়। ধীরেন প্রথমটায় যায় মহিম রায়ের বাড়ি। মহিমা ওঠে খুব সকালে। পুজোপাঠ সেরে উঠোনের রোদে বসে চা খায়। মহিমদার বাড়ির চা-টি বড় ভাল। ঘন লিকার, ভাল দুধের চা। সঙ্গে বিস্কুট। পুরনো কথা-টথা হয় কিছুক্ষণ।

গৌরহরি চাটুজ্জে বেঁচে থাকতে সেখানেও একটা ঠেক ছিল বটে ধীরেনের। গৌরহরিদা পগারপার হওয়ায় সেখানকার পাট একরকম উঠেছে। ক্রমে ক্রমে ঠেক কমে আসছে।

বেলা একটু গড়ালে ধীরেন কাষ্ঠ এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে নানা ছোটখাটো দৃশ্য দেখে তারপর বাঙালবাড়িতে হানা দেয়।

দৃশ্যটা বড় ভাল। বাগানের এক কোণে বাঙাল জলচৌকিতে সেঁটে বসে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে শূন্যে তুলে ছুড়ে দিচ্ছে আর কাকেরা একটা অন্যকে এড়িয়ে কপাকপ তুলে নিচ্ছে ঠোঁটে।

ভারী আহ্লাদ হয় ধীরেনের। সব দৃশ্যেরই একটা সৌন্দর্য আছে। কাকেদের উড়ে উড়ে উড়ন্ত রুটির টুকরো ছিনতাই করাটার মধ্যেও একটু আর্ট থাকে।

কাক বককে আর কে খাওয়ায় আজকাল!

খুড়া নাকি? আরে আহেন আহেন। বহেন জুইত কইর‍্যা। আরে কে আছস, খুড়ারে একখান চেয়ার দে।

মুনিশ কামলার অভাব নেই। একজন দৌড়ে কেঠো চেয়ারখানা এনে পেতে দেয় আতাগাছের তলায়।

কাক রুটি খাচ্ছে—এই দৃশ্যটা হাসিমুখে খুব মন দিয়ে দেখে ধীরেন।

কাউয়ারা যে কথা কয় তা বোঝেন খুড়া?

ধীরেন হেসে বলে, না হে বাপু, কাকের ভাষা কি কেউ বোঝে? কিন্তু কিছু কয়, নাকি?

কাউয়ারা কথা কয় খুড়া, কান্দে, নালিশ করে।

সে কি তুমি বোঝো?

না খুড়া, তবে বুঝনের চেষ্টা করি। দুই একখানা কথা বুইঝ্যাও ফালাই।

সত্যি? কী বোঝ বলো তো!

ক্ষুধার কথা কয়, আহ্লাদের কথা কয়।

ধীরেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, শুনেছি, আগে নাকি এসব নিয়ে চর্চা হত। আজকাল গাঁজাখুরি বলে সবাই উড়িয়ে দেয়।

উড়াইয়া দিলে সবই উইড়্যা যায়। থাকে কী কন তো!

কাকের ভাষা ধীরেন কাষ্ঠ বুঝতে পারে না ঠিকই। কিন্তু বাঙালের ভাষাটা বুঝতে পারে। শুধু মুখের ভাষা নয়, বাঙালের ওই যে মায়াদয়া, কাক কুকুর খাওয়ানো, দরাজ হাবভাব ওরও একটা ভাষা আছে। ওসব দিয়ে ভিতরের মানুষটাকে দেখা যায়। হাবভাব, আচার-আচরণেরও একটা ভাষা আছে। মুখের বুলি অনেক সময় সত্যি কথা কয় না। কিন্তু হাবভাব আসল মানুষটাকে ঠিক চিনিয়ে দেয়। একখানা মুচকি হাসি কখন যে লক্ষ কথাকে ছাড়িয়ে যায়, একখানা চোখের চাউনি যে কখন শত ছুরিকাঘাতের চেয়েও বেশি মারক হয়ে ওঠে। কী বলে যেন ব্যাপারটাকে আজকাল? বডি ল্যাংগুয়েজ না কী যেন!

বেহানবেলা কী খাইয়া আইছেন খুড়া?

হ-হ-হ করে লজ্জার হাসি হাসে ধীরেন। ভারী অপ্রস্তুত হয়ে বলে, কী আর খাব! সকালে বিশেষ খাই-টাই না। ওই একটু চা-বিস্কুট।

গরম রুটি-ব্যঞ্জন খাইবেন? আহেন, আহেন, আমার বউ রুটিটা বড় ভাল বানায়। পাতলা, নরম লাহান। আহেন।

ঘটনাটা নতুন কিছু নয়। বাঙালের বাড়িতে বাঙাল থাকলে এরকম প্রায়ই ঘটে। তবু ধীরেন আজও খুব লজ্জা পায়। এই লজ্জাবোধটুকুই যা এখনও আছে অবশিষ্ট। লোভ কি আর বশ মানতে চায়?

উঠোনে পা দিয়েই বাঙাল হাঁক মারল, কই গো, তোমার রুটি-মুটি হইছে নাকি? কয়েকখান বেশি কইরো। খুড়া আর আমি খামু।

রান্নাঘর থেকে বাসন্তী বলল, রুটি হচ্ছে। একটু দেরি হবে। বোসো।

ক্যান গো, আইজ দেরি ক্যান?

তরকারিটা পুড়ে গিয়েছিল। আবার চাপিয়েছি নতুন করে।

শোনো কথা! বলে বাঙাল খুব হাসল, শোনলেন খুড়া, ব্যঞ্জন নাকি পুইড়া গেছে। বহেন, জুইত কইরা রৌদ্রে বহেন। হইয়া যাইব। আমার বউ খুব কর্মিষ্ঠা রমণী।

একজন মুনিশ দৌড়ে গিয়ে কাঠের চেয়ারটা এনে উঠোনের রোদে পেতে দিল। রসিক বাঙাল কোলের মেয়েটাকে উঠোনে হামা দিতে ছেড়ে দিয়ে বলল, খেজুরের রস খাইবেন খুড়া?

কিছু খেতেই আপত্তি নেই ধীরেনের। এই বয়সে নাকি খাওয়া-দাওয়ার কাটছাঁট করে লোকে। তারা নমস্য মানুষ। ধীরেনের কাটছাঁট করার কিছু নেই। খিদে সেই যে খাপ পেতে বসে থাকে পেটের মধ্যে, সারাদিন তার নট নড়ন, নট চড়ন। তবু লাজুক মুখে বলে, তা খেতে পারি একটু।

কই রে, খেজুর রসের পাতিলটা লইয়া আয় দেখি। দেইখেন, ঘৎ কইর‍্যা গিল্যা ফালাইয়েন না। সারা রাইত গাছে ঝুইল্যা পাতিল এক্কেবারে ঠান্ডা কাল হইয়া আছে।

এক মুনিশ রসের হাঁড়ি নিয়ে এল।

দু গেলাস চোঁ চোঁ করে মেরে দিল ধীরেন। বুক পেট যেন জুড়িয়ে গেল একেবারে। হ্যাঁ, ঠান্ডা বটে। গলায় আর বুকে যেন চিড়িক মেরে গেল। তা হোক, ধীরেনের এতে কিছু হবে না।

হাম্মি হামা দিয়ে তকতকে উঠোনে খানিক দূর যায়, আবার ফিরে এসে বাঙালের হাঁটু ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। ওই যে ঝুব্বুস চেহারার একটা লোকের সঙ্গে তার বাবা কথা কইছে এটা তার পছন্দ নয়। লোকটা মাঝে মাঝে তাকে একটু আদর করার চেষ্টা করে। হাম্মি তাতে মোটেই খুশি হয় না। ছিটকে সরে যায়।

কাজের মেয়েরা উঠোনে চাটাই পেতে লেপ, কম্বল বালিশ রোদে দিচ্ছে। হাম্মি গিয়ে ছড়ানো একটা লেপের ওপর উঠে বসল।

রান্নাঘর থেকে বাসন্তী চেঁচিয়ে বলল, ওরে, মুতে দেবে লেপের ওপর। হাম্মিকে নামা।

রসিক হাঁ-হাঁ করে ওঠে, আহা, মুতুক, মুতুক। অর মুত তো গঙ্গাজল।

আহা, কীসব কথা। মা গঙ্গার অভক্তি হয় না বুঝি?

বাঙাল দরাজ একখানা হাসি হেসে বলে, তোমাগো গঙ্গার কথা আর কইও না গো, নিত্যি তিরিশদিন মাইনষে গুয়েমুতে গঙ্গারে নান্দিভাস্যি করত্যাছে। হাম্মির মুত আর কী দোষ করল?

ওসব কথা বলতে নেই। পাপ হয়।

দক্ষিণের বারান্দায় চারজন মুনিশ খেতে বসেছে। কোনও দিন ভাত, কোনও দিন মুড়ি। আজ মুড়ি। কাজের মেয়ে শীতলা ধামা ভর্তি মুড়ি নিয়ে এল ভাঁড়ারঘর থেকে। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ঢেলে দিচ্ছে দেদার

পরিমাণে। মুনিশদের পাশে ঘটি ভর্তি জল। মুড়ি পাতে পড়তেই দু মুঠো মুখ-সই করে ঘটির জল হিছে মেরে মুড়ি নরম করে ফেলতে লাগল।

বাসন্তী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আজ তরকারি পুড়ে গেছে গো বাবারা, গরম চপ আনিয়েছি বটতলা থেকে, পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে খেয়ে নাও আজ।

বুড়ো মুনিশ হারাধন একগাল হেসে বলল, চপ কি কিছু খারাপ জিনিস মা? ও মেরে দেবোখন, চিন্তা কোরো না। পোড়া তরকারি থাকলে তাও একটু দিও। আমাদের সব চলে।

না বাবা, সে খাওয়ার জো নেই। পুড়ে ঝামা।

গরম চপ পাতে পড়তেই তা ভেঙে মিয়োনো মুড়ির সঙ্গে মেখে নিতে লাগল মুনিশেরা। সঙ্গে পেঁয়াজ আর লঙ্কা।

এই দৃশ্য চোখ গোল করে মুগ্ধ হয়ে দেখে ধীরেন। মানুষ খাচ্ছে, এর চেয়ে ভাল ঘটনা আর কী হতে পারে তা তার মাথায় আসে না। পরিপাটি করে খাচ্ছে, তৃপ্তি করে খাচ্ছে, ভগবান যেন সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

হঃ হঃ করে খুব হাসে ধীরেন। তার ভিতর থেকে আনন্দ যেন উথলে আসতে থাকে। ছোটখাটো এরকম কত ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে দুনিয়াতে। দেখার লোক নেই, চোখ নেই। এইসব ঘটনার ভিতরেও কত রস, কত সৌন্দর্য। একেবারে টইটম্বুর।

বাবার এই উঠোনে বসে থাকাটা মোটেই ভাল চোখে দেখছে না মরণ। সামনে পড়ার বই খোলা রেখে সে হাঁ করে বসে বাইরেটা দেখছে। ওই বাইরেটা তাকে খুব ডাকাডাকি করে সবসময়ে। কিন্তু উঠোনে জ্যান্ত বাঘ বসা। কী করে বেরোবে সে?

তার পড়ার ঘরের পিছনেই রান্নাঘর। আজ মায়ে আর জিজিবুড়িতে খুব একচোট হয়েছে, তা অবশ্য প্রায়ই হয়। জিজিবুড়িকে কতবার মা বের করে দিয়েছে, আবার জিজিবুড়িও শাপশাপান্ত করতে করতে এ-বাড়িতে কোনওদিন আসবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে চলে গেছে এবং ফের পরদিন এসেছে। সুতরাং সেজন্য চিন্তিত নয় মরণ, যেটা চিন্তার কথা সেটা হল মা আজ খুব কেঁদেছে। সহজে কাঁদে না তো মা!

ওই দাদা নামছে দোতলা থেকে! দাদাকে দেখলেই একটা আশাভরসা হয় মরণের। দাদাকে কেউ শাসন করে না। বাবা অবধি যেন সমঝে চলে। মরণ জানে সে যখন দাদার মতো বড় হবে তখন তাকেও সবাই খাতির করবে। এমনকী বাবাও। সেই দিনটা যে কবে আসবে তারই প্রহর গোনে মরণ।

সুমন দক্ষিণের বারান্দার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মুনিশদের খাওয়া দেখতে দেখতে বলে, তোমরা বুঝি মুড়ি জলে ভিজিয়ে খাও?

বুড়ো মুনিশ একগাল হেসে বলে, হাঁ বাবা, মুড়ি ভিজিয়ে নিলে ও ভাতের সমান।

আরও বড় এক ধামা মুড়ি নিয়ে এল শীতলা। চুড়ো করে ঢেলে দিল পাতে পাতে। সঙ্গে চপ।

সবাই কথা থামিয়ে চারটে লোকের খাওয়া দেখছে।

রসিক ভারী আহ্লাদের গলায় বলল, খাও হে, ভাল কইর‍্যা খাও।

বুড়ো মুনিশ শীতলার দিকে চেয়ে বলে, আরও দুধামা নিয়ে এসো তো। ওরে, তোরা থামিস না। বাবুরা দেখছে।

তা খেলও মুড়ি চারজনে। অবিশ্বাস্য। জল মেরে মেরে মুড়ি ভিজিয়ে চপ দিয়ে এক একজন মুড়ির গন্ধমাদন তুলে ফেলল। বাসন্তীর তরকারিও নেমে গেছে। তাই শেষ পাতে মুলো-পালং-বেগুন-বাড়ির চচ্চড়িও দু হাতা করে জুটে গেল তাদের।

রসিক বাঙাল হেসে বলে, মাল অন্যের হইলে কী হইব, নৌকা তো তোমাগর। এই যে ঠাইস্যা খাইলা, শ্যাষে ক্ষ্যাতের কামে গিয়া গাছতলায় গামছা পাইত্যা ঘুমাইবা না তো!

বুড়ো মুনিশ বলে, না কর্তা, মুড়ি হালকা জিনিস, নেমে যাবে। খোরাকটা একটু দেখিয়ে রাখলাম আর কী।

ভাল ভাল।

চারদিকে সম্পন্নতার চেহারাটা দুচোখ ভরে দেখছিল ধীরেন কাষ্ঠ। চারদিকে লক্ষ্মীর অদৃশ্য পায়ের ছাপ। সম্পদ উথলে উঠছে। ভারী খুশি-খুশি ভাব সকলের মুখে। নাঃ, বাঙালের বাড়িতে মনটা ভাল হয়ে যায়।

দুখানা করে গরম ধোঁয়া ওঠা রুটি আর গরম চচ্চড়ির এক খাবলা। স্টিলের রেকাবে সাজিয়ে নিয়ে এল বাসন্তী।

ধীরেন খুড়ো, এই নিন।

ধীরেন খুশিতে লজ্জায় গলে গিয়ে বলে, দিলি আমাকে?

ওমা! দেবো না কেন? আমরা তো রান্নায় একটু মিষ্টি খাই, কিন্তু ওঁরা পছন্দ করেন না। তাই চচ্চড়ির হয়তো স্বাদ পাবেন না।

হ্যাঁ, ধীরেন শুনেছে বটে, বাঙালরা রান্নায় চিনি বা গুড় দেওয়া পছন্দ করে না। তাতে রান্নাটা একটু তাহা-তাহা লাগে বটে, কিন্তু ধীরেনের বাছাবাছি নেই। আজকাল তার সবই অমৃত বলে মনে হয়। একটু ধনে-পাতা ছড়ানো চচ্চড়িটার দিব্যি বাস বেরিয়েছে।

কী খুড়া, কেমন খান?

আহা, বড় চমৎকার স্বাদ হয়েছে।

সুমন মরণের জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলল, পড়ছিস না হাঁ করে তাকিয়ে আছিস?

মরণ এক গাল হেসে বলে, বাইরে আসব দাদা?

আয়।

বাবা বকবে না তো!

না বোধহয়। মুড ভাল আছে। আয়।

মরণ এক লম্ফে বেরিয়ে এল।

ঠিক তক্ষুনি বাঁশের আগল ঠেলে হিমি এসে ঢুকল। হাতে উলের কাটা। সুমনের দিকে চোখ হেনে মুচকি একটু হেসে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। সুমন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। গাঁয়ের মেয়েগুলো বড্ড বোকা হয়।

তেইশ

গরম ডাইল নাই? গরম ডাইল?

রান্নাঘরের দরজায় এসে বাসন্তী বলে, ডাল ফুটছে। দেব?

আরে আমারে না। খুড়ারে এক বাটি দ্যাও।

এখনও ডাল সেদ্ধ হয়নি যে, ফোড়ন দিতে দেরি হবে।

আরে ফোড়নের কাম কী? এক খাবলা ঘি ঢাইল্যা দিলেই হয়।

ধীরেন কাষ্ঠ আহ্লাদে হাসল। গরম ডালে ঘি হল অমৃত। স্বর্গীয় জিনিস। কিন্তু মুখে ভদ্রতা করতে হয় বলে বলল, না না, এই তো চচ্চড়ি দিয়েই বেশ খাচ্ছি।

রসিক বলে, আরে একটু ডাইলই তো। লজ্জা পান ক্যান? ডাইলটা খুব খাইবেন। ডাইলের মইধ্যে মেলা ভিটামিন আর প্রোটিন।

কথা থামিয়ে রান্নাঘরের দিকে চেয়ে আবার হাঁক মারে রসিক, আগো, আইজ কী ডাইল রানতে আছ?

বাসন্তী বলল, মুসুরি।

তা হইলে তো কথাই নাই। মুসুরি হইল ডাইলের রাজা। ফুটার ডাইল খাইতেও চমৎকার।

ধীরেন কাষ্ঠ খুব হাসে, বাঙাল হল রাজা লোক। এমন দরাজ দিল এ তল্লাটে কখনও দেখেনি ধীরেন। বাঙাল দেশটা কেমন সেটা ভাল জানে না ধীরেন। তবে শুনেছে, সেটা প্রায় মগের মুলুক। বানভাসি, জলকাদার দেশ। সেখানকার লোকগুলো একটু কাটখোট্টা বটে, কিন্তু মনটি খুব সরেস।

বাঙাল দেশে ভাগ্যান্বেষণে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল ধীরেনের। মিদ্দার মরার পর যখন তার আগল-পাগল অবস্থা, ঘরে-বাইরে কোথাও শান্তি নেই, বুকের ভিতর সর্বদা হুহু করে মনস্তাপ তখনকার কথা। কাটোয়ায় কিছুদিন আত্মীয়বাড়িতে গিয়ে পালিয়ে ছিল সে। কিন্তু সেটা তো আর পাকা ব্যবস্থা নয়। একদিন ফিরে আসতে হল দেশে। এসে বুঝল, পুলিশের ঝাট কিছু হয়নি। কেউ তার খোঁজখবর বা তল্লাশেও আসেনি। নোটপব মিদ্দার আর তার বউয়ের সঙ্গে তাকে জড়ায়নি কেউ। বুকটার ধুকুর-পুকুর কমল বটে, কিন্তু মাথাটা কেমন পাগল-পাগল হয়ে রইল। নিজের বাড়ি, নিজের গাঁ ভাল লাগছিল না তখন।

মদন সামন্ত বন্ধু লোক। নানারকম ব্যবসা করতে গিয়ে বারবার মার খাচ্ছে। পুঁজিও বেশি ছিল না। মদন তখন বাঙাল দেশে যাতায়াত করছে। সে বলেছিল, ভাবছি ওদিকেই গেড়ে বসব। কিছু জমি কিনতে পারলে না খেয়ে মরার ভয় নেই।

ধীরেন ধরে পড়ল, আমাকেও নিয়ে চল তাহলে।

তুই গিয়ে কী করবি?

যা হোক কিছু করা যাবে। শুনেছি ওটা অন্যরকম দেশ।

তা বটে। কিন্তু গিয়ে হাজির হলেই তো হবে না। আগে থেকে কিছু একটা ভেবেচিন্তে যাওয়া ভাল।

বাঙাল দেশটা দুধ-ভাতের দেশ বলে একটা আবছা কল্পনা ছিল বটে তার। সেটা যে মিথ্যে স্বপ্ন তাও সে বুঝতে পারত। তবু মন দুর্বল হয়ে পড়েছিল বড়। ভেবেছিল, নতুন জায়গায় গেলে কাজকর্ম জুটে যাবে, মাথার পাগল ভাবটাও ঠান্ডা হবে।

মদনের বাড়িতে তখন খুব যাতায়াত। ঘন ঘন মিটিং হচ্ছে দুজনের। কাজের কথা কিছু হত না, আগডুম বাগড়ম নানা ফন্দি আঁটত দুজনে। কারও মাথায় তেমন ঘি ছিল না তো। শুধু কল্পনা ছিল খুব।

তবে মদন চাষবাস-বোঝা মানুষ। বলত, দিনে চাষবাস করব, রাতে নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে বেরোব। সেখানে জাল ফেললেই মাছ।

কিন্তু কোথায় শেকড় গাড়বি তা কিছু ঠিক করেছিস?

নাঃ। তবে টাঙ্গাইল জায়গাটা আমার বেশ পছন্দ। সেখানে আমার দাদার এক সম্বন্ধী আছে। বিষয়ী লোক। বলেছে, গেলে ব্যবস্থা করে দেবে।

আমার জন্যে করবে না?

গিয়ে দেখতে পারিস।

তখন ধীরেনের উড়ু-উড়ু অবস্থা। যে-কোনও শর্তেই তখন সে এ-দেশ ছাড়তে রাজি। কিছু টাকাপয়সাও জোগাড় করে ফেলল সে। গাড়িভাড়া আর দু-দশ দিনের খরচ তো কিছু আছেই। তারপর মদনকে তাগাদার পর তাগাদা দিতে লাগল।

প্রথম প্রথম মদনের উৎসাহ ছিল খুব। কিন্তু তারপর হঠাৎই একদিন ভারী লাজুক মুখ করে বলল, ওরে একটু অসুবিধে দেখা দিয়েছে।

কী অসুবিধে?

একটু বাধক হচ্ছে। একজন যেতে দিচ্ছে না।

এ কথায় মাথায় বাজ পড়ল ধীরেনের। দেহটা এখানে পড়ে থাকলেও তার মন বাঙাল দেশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। নানা ছবি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। রূপকথার দেশের মতো। সেখানে গিয়ে পড়লেই হয়, সব সমস্যার সমাধান। ভাত-কাপড়, মিদ্দারের ভূত, কপালের ফের, কিছুটি আর নাগাল পাবে না তার।

সে মদনের চোখে চোখ রাখতে গিয়ে দেখল মদনের চোখ পিছলে সরে যাচ্ছে। সেখানে অন্য ব্যাপার।

সে বলল, কে তোকে বারণ করল রে? জ্যোতিষ নাকি?

আরে না। আছে একজন।

খোলসা করে বল। আমাকে এত নাচালি, এখন তুই পিছেলে আমার যে অগাধ জল।

না না, তুই বরং একাই যা। আমি দাদার সম্বন্ধীকে একটা হাতচিঠি লিখে দিচ্ছি।

ভয় পেয়ে ধীরেন বলে, হাতচিঠি দিয়ে কী হবে! ওসবের কোনও দাম নেই। সম্পর্কই বা কী বল। তোর দাদার সম্বন্ধী মানে তো মামার গোয়ালে বিয়োনো গাই। তোর আটকাচ্ছে কোথায়?

মদন ভারি অস্বস্তিতে পড়ে বলে, সে একটা কাণ্ডই হয়েছে।

কী কাণ্ড।

দাদার সম্বন্ধীর ব্যাপারে কয়েকদিন দাদার শ্বশুরবাড়ি মুকুন্দপুরে যাতায়াত করতে হয়েছিল তো!

সে খুব জানি। তুই তো প্রায়ই মুকুন্দপুরে যাস।

হ্যাঁ, সেই কথাই তো। যাতায়াত করতে করতে দাদার ছোট শালি মিনতির সঙ্গে ভারী চেনাজানা হয়ে গেছে। ওই করতে করতে যা হয়। দাদার শাউড়িরও আমাকে ভারী পছন্দ।

তাই বল! আশনাই।

তা একরকম ভাই। মুশকিল কী জানিস, ওদেশে যাব শুনে মিনতি ভারী আপত্তি করছে।

কেন, আপত্তিটা কীসের?

সে এ-জায়গা ছেড়ে যাবে না।

বিয়ে করলেও না?

তাই তো বলছে। মিনতির বাবাও বলছে, আমার ছেলে ওদেশে আছে বটে বাপু, কিন্তু আমি সেটা ভাল বলে মনে করি না। ও না যাওয়াই ভাল।

তুই মেনে নিলি?

কাঁদে যে!

খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিল ধীরেন।

তার চোখের সামনেই কয়েক মাসের মধ্যে মদন মিনতিকে বিয়ে করে দিব্যি মুকুন্দপুরে গিয়ে বসবাস করতে লাগল।

ধীরেন তবু তক্কে তক্কে ছিল। বাঙাল দেশ না হোক, দুনিয়াটা তো আর ছোট জায়গা নয়। কোথাও কোথাও চলে গেলেই হল। চলে যাওয়ার ইচ্ছেটা তখন তাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছে। কাউকে ভাল লাগে না, কিছু ভাল লাগে না।

কয়েকজন বন্ধু মানুষের সঙ্গে পৌষের মেলায় হরিহরপুরে গিয়েছিল সে। মাইল দশেক রাস্তা। মেলায় গিয়ে বন্ধুরা সব তাসের জুয়া খেলতে বসে গেল। হরিহরপুরের মেলায় ওইটের খুব চল। ধীরেনের পয়সা নেই, আগ্রহও ছিল না। সে মেলায় ঘুরে ঘুরে বেড়াল খানিক। বেশ জম্পেশ মেলা। ধীরেন দেখতে আর শুনতে বড্ড ভালবাসে। চোখের খোরাক কিছু কম ছিল না সেখানে। জামাকাপড় থেকে শুরু করে খেলনাপাতি। নাগরদোলা থেকে নিয়ে পাঁপড়ভাজা সবই তার কাছে দেখার বস্তু।

দেখতে দেখতেই সে এক ব্যাপারির দোকানে মোমের পুতুল দেখতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছোট, বড় নানা মাপের নানা গড়নের পুতুল। পুতুলে আবার সলতে লাগানো আছে। ইচ্ছে করলে মোমবাতি হিসেবে জ্বালানোও যায়। কে জানে ধীরেনের ভিতরে হয়তো একটু শিল্পবোধও আছে। শিল্পকর্ম দেখতে সে বেশ ভালবাসে। সে দোকানির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল। সে মা কালীর দিব্যি কেটে বলতে পারে, দোকানির সঙ্গে যে কিশোরী মেয়েটি টালুক-টুলুক চারদিকে চাইছিল আর টোপাকুল খাচ্ছিল টুলে বসে তার দিকে একবারের বেশি দুবার তাকায়নি সে।

এ-কথা সে কথার পর সে জানল, দোকানির বাড়ি নদীয়ার গাঁয়ে। সে ভালমানুষের মতো জিজ্ঞেস করল, ওদিকটায় কিছু সুবিধে-টুবিধে হয়?

কীসের সুবিধে বাপু? এদিকও যেমন ওদিকও তেমন।

তা বটে, তবে ইদিকে আমার সুবিধে হচ্ছে না। বাঙাল দেশে চলে যাব ভেবেছিলাম, তাও হল না। এখন ভাবছি 'জয় মা' বলে যেদিকে দু চোখ যায় রওনা হয়ে পড়ি।

দোকানি হেসে বলে, তা বাপু, অনেক সময় জায়গার গুণেও কিছু হয়ে পড়ে বইকী। আমার বয়স তো এত হল, অভিজ্ঞতাও কম হল না। মনে হয় কোনও কোনও মানুষের কোনও কোনও জায়গা সহ্য হয় না। অন্য জায়গায় গেলে তাদের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়।

ধীরেন আশান্বিত হয়ে বলে, আমারও সেরকমই মনে হয়।

তা নদীয়ায় গিয়েও দেখতে পার। বা অন্য কোথাও। তবে বাপু, তাতে হয়রানি বাড়বে। ঘরের খেয়ে লড়াই করা যায়, অন্য জায়গায় গিয়ে আতান্তরে পড়ে গেলে পারবে কি?

টুকটাক পুতুল বিক্রি হচ্ছিল মন্দ নয়। মেয়েটাই বিক্রিবাটা করে পয়সা গুনে নিচ্ছে। বছর পনেরো-ষোলো বয়স, ফ্রক পরা, গায়ে লাল সোয়েটার, দুই বিনুনি ঝুলছে।

ওটা আমার মেয়ে। খুব বাপ-ক্যাংলা। যেখানে যাই সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। তা বাপু, কী করা হয়-টয়?

অনেক কিছুই করে দেখেছি। কিছু তেমন হচ্ছে না।

চাষবাস আছে?

আছে। সামান্য। পেটের ভাতটুকু জোটে।

কারবারে নামতে চাও নাকি?

সে তো খুব ইচ্ছে যায়। কিন্তু টাকা কোথায়?

সেই তো কথা।

এইভাবে আলাপ বেশ জমে গেল।

সন্ধের পর দোকানি হ্যাজাক জ্বেলে দিল, ধূপ-ধুনো লাগাল, হ্যাজাকের আলোয় মেয়েটা যেন হঠাৎ করে ফুটে উঠল। বিকেলের মরা আলোয় তেমন দেখায়নি, এই আলোতে দিব্যি দেখাচ্ছিল। যেন বহুরূপী।

দেখতে ভালবাসে ধীরেন। আর মেয়েটাও ঘন ঘন তাকাতে লাগল তার দিকে। এইভাবেই সব হয়-টয় আর কী।

দোকানির নাম বৃন্দাবন পাল। বলল, মেলার কয়েকদিন আছি। ইদিকে এলে দেখা করে যেও। গল্প-টল্প করা যাবে।

একদিন ফাঁক দিয়ে গেলও ধীরেন। মেয়েটার হ্যাজাকের আলোয় দেখা মুখখানা দুদিন ভুলতে পারেনি। হ্যাজাক বাতির কী জাদু আছে কে জানে!

গিয়ে দেখল, দোকানি সওদা করতে গেছে। মেয়েটা একা দোকান সামলাচ্ছে। মেলার শেষ দিন ছিল সেটা। দোকানে বেশ ভিড়। রমরম করে মোমের পুতুল বিকিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা সামাল দিতে পারছে না। বয়সের মেয়ে দেখে বখাটে ছেলে-ছোকরাও জুটেছিল কয়েকটা।

তা ধীরেনের তখন বেশ শক্ত জোয়ান চেহারা। গায়ের জোরও ছিল মন্দ নয়। সে গিয়ে মেয়েটার পাশে দাঁড়িয়ে যেতেই ভিড়টা একটু একটু করে পাতলা হল।

মেয়েটা কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, কতগুলো পুতুল চুরি হয়ে গেছে, জান! চোখের সামনেই পটাপট তুলে নিয়ে গেল। যেই বললুম, দাম দিলে না যে, অমনি বলে, দিয়েছি তো! এই তো গুনে নিলে!

ইস্, আমি একটু আগে এলেই হত।

ভাগ্যিস এলে, নইলে এতক্ষণে সব লুটপাট হয়ে যেত।

মেয়েটাকে ভাল করে দেখল ধীরেন। তখনও দিনের আলো আছে, হ্যাজাক জ্বলেনি। তবু বেশ লেগেছিল দেখতে। ডাগর ফর্সা চেহারা, চোখ দুখানা মিঠে তাতে তখনও রাগ-অভিমান-ভয় মেশানো চাউনি। একটু জলও চিকচিক করছিল চোখে।

ধীরেন ভরসা দিয়ে বলল, আর ভয় নেই। আমি আছি কিছু হবে না।

অবলা নারীকে রক্ষা করা চিরকালই সবল পুরুষের কর্তব্য। মেয়েটা তার দিকে চেয়ে বলল, রোজই ছেলেগুলো আসে, বাবা থাকলে বেশি কিছু করে না। আজ আমাকে একা পেয়ে—

ওরা পাজি ছেলে।

ভীষণ পাজি। কী সব অসভ্য অসভ্য কথা বলছিল শুনিয়ে শুনিয়ে।

তুমি বুঝি সব সময়ে বাবার সঙ্গে থাকো?

না। মাঝে মাঝে। আজকাল মা ছাড়তে চায় না। বড় হচ্ছি তো!

ও, তাও তো বটে।

বাবার একজন কর্মচারী আছে। সব জায়গায় সে বাবার সঙ্গে থাকে। এবার অসুখ করেছে বলে আসেনি।

বড্ড সরল মেয়েটা, নিজের থেকেই অনেক কথা বলে যাচ্ছিল। খুব মন দিয়ে শুনছিল ধীরেন।

বাড়িতে তোমার কে কে আছে?

মা বাবা দিদি, ছোট দুই ভাই, দাদু আর ঠাকুমা।

ইস্কুলে পড় না?

হ্যাঁ, পড়ি তো। ক্লাস সিক্স-এ।

বাবা বুঝি শুধুই পুতুল গড়েন?

পুতুল আমরা সবাই গড়ি। খুব সোজা। মোম গলিয়ে ছাঁচে ফেলতে হয়। গাঁয়ে আমাদের মুদির দোকানও আছে একটা।

তাহলে তো তোমাদের অবস্থা ভালই।

ওই একরকম।

জমিজমা নেই?

হ্যাঁ, তাও আছে।

গোরু বাছুর?

দুটো দুধেল গাই।

পাকা ঘর?

হ্যাঁ।

তাহলে তো তোমরা বড়লোক।

মেয়েটা লাজুক হেসে বলে, না, না, তা কেন? আমাদের গাঁয়ে বড়লোক হল রায়বাবুরা, মুখার্জিবাবু আর সরকারবাবুরা। তাদের অনেক কিছু আছে।

কী আছে তাদের?

রায়বাবুরা তো খুব বড়লোক। মেলা জমিজমা।

আচ্ছা তোমাদের তো বেশ ভাল অবস্থা, তাহলে তোমার বাবা পুতুল বিক্রি করে কেন?

ওটা বাবার শখ। আমার দাদুর মোমের পুতুলের ব্যবসা ছিল। দাদু এখনও ছাঁচ তৈরি করে দেয়।

প্রায় সন্ধের মুখে বৃন্দাবন ফিরল।

এই যে ধীরেন, এসেছ? আমার একটু দেরি হল।

সঙ্গের দু ব্যাগ মালপত্র নামিয়ে ক্লান্ত বৃন্দাবন একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, কালই চলে যাচ্ছি।

হ্যাঁ, আজই তো মেলা শেষ।

তা বাপু, তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

বলুন।

কথাটা একটু আবডালে বলতে হবে।

কয়েক পা তফাত হয়ে মেয়ে যাতে শুনতে না পায় এমন দূরত্বে এসে বৃন্দাবন বিনা ভণিতায় বলে ফেলল, বাপু হে, আমার বয়স হচ্ছে, এই মোম দিয়ে পুতুল বানানোর কারবারে আমার আর পোযাচ্ছেও না।

ও। তাহলে কি ব্যবসাটা তুলে দেবেন?

তুলে দিতেও মায়া হয়।

তাহলে?

উপযুক্ত কাউকে পেলে বিদ্যেটা শিখিয়ে ব্যবসা তার হাতে তুলে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম।

সে তো ভাল প্রস্তাব।

তোমাকে আমার খুব পছন্দ।

আমাকে! কিন্তু আমাকে দিয়ে কি হবে?

খুব হবে। ব্যবসাটা খারাপও নয়। খাটাতে পারলে স্বচ্ছন্দে পেট চালাতে পারবে। আমিও সাহায্য করব।

ভেবে দেখি।

ও রে বাপু, ভাবতে বসলে আর কাজ হবে না। আগু-পিছু করতে থাকবে।

বন্দোবস্তটা কী রকম হবে?

বন্দোবস্ত-টস্ত কিছু নেই। সোজাসুজিই বলছি মেয়ে আমার ফ্যালনা নয়।

মেয়ে!

হ্যাঁ। আমার বড় মেয়ে মালতীর কথাই বলছি। এই যে মিনতিকে দেখছ এর চেয়ে দুগুণ সুন্দর দেখতে, আরও ফর্সা। যদি বিয়ে করো তাহলে সব দিক রক্ষে হয়।

বিয়ে! ভ্রূ কুঁচকে খানিক বিয়ে নিয়ে খুব ভাবল ধীরেন। গাঁগঞ্জ জায়গা। লোকে কিছু করার না থাকলে পট করে বিয়ে বসে যায়। ধীরেনের তখনও বিয়ে হয়নি, নানা গণ্ডগোলে মাথায় আসেওনি কথাটা। তবে প্রস্তাবটা পেয়ে তার মনে হল, বিয়ে করলেও হয়তো মনটা অন্য দিকে ঘুরে যেতে পারে। যে কারণে বাঙাল দেশে পালাতে চেয়েছিল সেই একই কারণে বিয়েও করা যেতে পারে। প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

ওহে বাপু, বেশি ভেবো না। ভাবনাচিন্তা বড় কর্মনাশা। তাতে জীবনে ওই আগু-পিছু চলে আসে। ওতে কাজ ভণ্ডুল হয়।

একটু ভাবতে তো দেবেন মশাই। মাথার ওপর মা-বাবাও আছেন।

শোনো বাপু, মোমের কারবারে আমার পাঁচ হাজার টাকা খাটছে। যদি পুরো ব্যবসাটাই তোমাকে দিই তাহলে বড় কম পাচ্ছ না। হিল্লে হয়ে গেল বলেই ধরে নিতে পারো। আর এ যা মোমবাতি দেখছ এগুলোই তো নয়, আমি গির্জায় সাহেবরা যে মোম জ্বালে তাও বানাই। ব্যবসা ধরে রাখতে পারলে লুটেপুটে খেতে পারবে।

দাঁড়ান, মা-বাবাকে আগে গিয়ে বলি।

তুমি রাজি তো!

পট করে কী যে বলি!

মোটপর তোমার অমত নেই। কাল সকালে দোকান গুটিয়ে আমি প্রথম তোমার বাড়িতে যাব। তোমার মা-বাবাকে রাজি করিয়ে তবে দেশে ফিরব।

বৃন্দাবন যে কী দেখে তাকে পছন্দ করেছিল কে জানে! দুনিয়ায় কত আহাম্মকই থাকে। ধীরেনের বাবার অবস্থা যে খুব খারাপ ছিল তা নয়। তবে জমিজমার ওপর নির্ভর। নগদ টাকার বিশেষ টানাটানি। একটা পেট বাড়লে খুব ইতরবিশেষ হবে না বটে, কিন্তু নতুন বউয়ের সুখেরও বিশেষ কারণ ঘটবে না। তার ওপর পয়সাওলা ঘর থেকে আসবে।

ধীরেনের দুশ্চিন্তা একটু হচ্ছিল বইকী।

ওই ভাবনাচিন্তার মধ্যেই প্রস্তাব চালাচালি হয়ে গেল। খারাপ প্রস্তাবও তো নয়। মুষলের মতো একটা ছেলে ঘরে বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করছে, শ্বশুর যদি হিল্লে করে দেয় তো ভালই।

তা হয়েও গেল বিয়ে।

মালতী দেখতে কিছু খারাপ নয়। রং ফর্সার দিকেই। নাকটা একটু থ্যাবড়া না হলে আরও ভাল হত।

বিয়ের রাতেই মালতী জিজ্ঞেস করেছিল, মদগাঁজার নেশা নেই তো!

না, আমার নেশা নেই। থাকলে কি তোমার বাপ বিয়ে দিত আমার সঙ্গে?

বাবা কি সব খবর নিয়েছে?

নেশা থাকলে কী করবে?

নেশারু লোক আমি সইতে পারি না। নেশা দেখলে বাপের বাড়ি চলে যাব।

কথাটা বিয়ের আগে জানতে চাইলে ভাল করতে।

বিয়ের আগে মেয়েদের কিছু জানতে দেওয়া হয় নাকি? পুঁটুলি পাকিয়ে এনে ফেলা হয় ছাঁদনাতলায়।

ও বাবাঃ! তুমি যে বেশ কটর কটর কথা কও।

হ্যাঁ, আমার সব পষ্টাপষ্টি কথা।

জ্বালাবে দেখছি! ফুলশয্যার রাতেই এত স্পষ্ট কথা!

সব জেনেবুঝে নেওয়া ভাল।

আর কী জানতে চাও?

মেয়েমানুষের দোষ নেই তো!

থাকলে?

থাকলে মুশকিল হবে।

ধীরেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বউকে তার ভারী অপছন্দ হতে লাগল প্রথম থেকেই।

সে বলল, দোষঘাট কোন মানুষের না থাকে বলো! মেয়ে পুরুষ সবার থাকে।

তার মানে আছে।

আমি কি তাই বললুম?

তাহলে পষ্ট করে বললে না কেন যে তোমার মেয়েছেলের দোষ নেই?

বললেই তুমি মেনে নেবে?

বলেই দেখ না!

শোনো মালতী, আমার একটা মানসম্মান আছে। পায়ে ধরে সেধে তো বিয়ে করে আনিনি। তুমি যদি অতই সতী তবে বাপকে বললে না কেন বিয়ের আগে খোঁজখবর নিতে!

বলেছি। বাবা পাত্তা দেয়নি। কোন মেলায় তোমাকে দেখেই বাবার পছন্দ হয়ে গিয়েছিল।

সেখানে তোমার বোন মিনতিও ছিল।

মিনতি ছেলেমানুষ, সে কী বুঝবে?

তাহলে এখন আর বোঝার কিছু নেই। আমি মাতাল বা চরিত্রহীন যাই হই, তোমার স্বামী।

ওটাই কি তোমার জোর? স্বামী বলেই মাথা কিনে নিয়েছ?

আমি কিনতে যাইনি। তোমার বাবা গছিয়েছে। তুমি একটি গেছে মেয়েছেলে।

ফুলশয্যার রাত্রিটা ঝগড়া করেই কেটেছিল দুজনের। আদর সোহাগের নামগন্ধ ছিল না।

তবে একথা সত্যি যে মেয়েদের গতিই বা আর কী। সে আমলে স্বামী ছেড়ে চলে যাওয়ার হিম্মৎই বা কটা মেয়ের ছিল?

সুতরাং মালতীর সঙ্গে তার ভাবও হল দু-চারদিন পরে। গৃহত্যাগ করার ইচ্ছেটাও ধামাচাপা পড়ে গেল।

ধীরেন ভাবে বৃন্দাবন হঠাৎ উদয় না হলে তার জীবনটা অন্য খাতে বইতে পারত। গৃহত্যাগ করে সে হয়তো একদিন এক কেষ্টুবিষ্টু হয়েই ফিরে আসত। এরকম তো কতই হয়।

এতকাল নানা ঝড়ঝাপটা সয়েও মালতীও আছে, সেও আছে, ছেলেপুলেও আছে। তবে সব মিলিয়ে ভাল কিছু হয়ে উঠল না।

এক বাটি ধোঁয়া ওঠা গরম ডাল একটা স্টিলের প্লেটে বসিয়ে নিজেই নিয়ে এল বাসন্তী। হলুদ ডালের ওপর অনেকটা ঘিয়ের দলা ভেসে আছে।

হেঃ হেঃ করে হেসে ধীরেন বলে, ওঃ গন্ধটা যা ছেড়েছে।

খান খুড়া, খান। আগো, আরও দুইখান রুটি দাও খুড়ারে। খুড়া খাইতে ভালবাসে।

আরে না না, রুটি তো আছে।

আরে, লজ্জা কীসের? পেট ভইরা খান।

ধীরেনকে আর বলতে হল না।

উঠোনের ওধারে সুমন চাপা স্বরে মরণকে জিজ্ঞেস করে, লোকটা কে রে?

ও হল কাষ্ঠ জ্যাঠামশাই। রাস্তায় ঘাটে আমরা ওকে ক্ষ্যাপাই।

পাগল নাকি?

কী জানি।

তবে ক্ষ্যাপাস কেন?

একটু কেমন যেন। ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পরে ঘোরে। একটু লোভী আছে।

এখানে আসে কেন?

বাড়িতে খেতে পায় না তো। গরিব।

খুব গরিব?

তা জানি না। কাষ্ঠ জ্যাঠামশাইকে কেউ পাত্তা দেয় না।

হ্যাঁ রে, বাবা ওকে কাকা ডাকে, তুই তাহলে জ্যাঠা ডাকিস কেন?

কাঁচুমাচু হয়ে মরণ বলে, সবাই ডাকে বলে আমিও ডাকি। ডাকের খুব গোলমাল এখানে।

হঠাৎ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়া সুমনের একটা স্বভাব। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বেভুল হয়ে। তারপর বলল, চল বেড়িয়ে আসি।

দাঁড়াও, মাকে বলে আসি।

সুমন হঠাৎ একটু গম্ভীর মুখ করে বলে, আমিও কিন্তু তোর একজন গার্জিয়ান। আমার সঙ্গে গেলে তোর মা কিছু বলবে না।

তা ঠিক। সুমন যেন গুরুঠাকুরটি। তার প্রতিটি কথাকেই মা ভীষণ গুরুত্ব দেয়। তবু মুখটা মলিন হল মরণের। দাদা এই মাত্র বলল 'তোর মা'। এটা কানে খট করে বড় লাগল মরণের। দাদা তো শুধু 'মা' বললেই পারত।

আজও দাদা তার মাকে 'মা' বলে ডাকেনি।

রাস্তায় বেরিয়ে মরণ বলল, আজ কোন দিকে যাবে দাদা?

ওই দিকটায়।

বলে যে দিকটায় দেখাল সে দিকটায় তারা রোজই যাচ্ছে আজকাল। ও পথটা পান্নাদিদের বাড়ির কাছ ঘেঁষে গেছে। দাদা আজকাল এই পথটাই বেশি পছন্দ করে।

দিন পাঁচ-সাত আগে পান্নাদি জ্বর থেকে উঠে মলিন মুখে জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল।

দাদা দেখে বলল, কে রে মেয়েটা?

ও তো পান্নাদি।

কী করে?

পান্নাদি! ওঃ পান্নাদি খুব ভাল ছাত্রী। গান গায়, নাচে, নাটকে পার্ট করে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কার মেয়ে বল তো।

রামহরি জ্যাঠার মেয়ে। আলাপ করবে?

না থাক।

আমার সঙ্গে খুব ভাব কিন্তু।

তোর সঙ্গে তো দেখছি বিশ্বসুদ্ধু সকলের ভাব!

হ্যাঁ। আমি তো পান্নাদিদের বাড়ির নারকোল পেড়ে দিই।

অন্যের ফাই-ফরমাশ খাটিস কেন? তুই কি ওদের চাকর?

কথাটা বুঝতে পারল না মরণ। লোকে কিছু বললে সে করে দেয়। এটাই রেওয়াজ। তার সঙ্গে চাকরের কী সম্পর্ক। দাদার রাগের কারণটা বুঝতে না পারলেও মরণ আর একটা জিনিস বুঝতে পারে যেটা তার বোঝার কথা নয়। সে বুঝতে পারে, তার এই শহুরে দাদাটি পান্নাদিদের বাড়ির সামনে দিয়ে আনাগোনা করতে পছন্দ করে।

পান্নাদি একদিন তাকে ডেকে বলেছিল, তুই আজকাল কার সঙ্গে ঘুরে বেড়াস রে? ছেলেটা কে?

ওমা চেনো না! ওই তো আমার দাদা।

পান্না অবাক হয়ে বলে, দাদা! তোর আবার দাদা কোত্থেকে এল?

বাঃ, আমার কলকাতার দাদা!

বুঝতে তবু একটু সময় লেগেছিল পান্নার। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে হঠাৎ হেসে ফেলেছিল, ওঃ তাই তো! ও বোধহয় তোর বড়মার ছেলে, তাই না!

হ্যাঁ তো। দেখতে সুন্দর না?

হ্যাঁ, বেশ দেখতে। দাদাকে পেয়ে খুব আনন্দ বুঝি তোর! তাই আজকাল আর আসিস না।

তা নয় পান্নাদি। আজকাল বাবা প্রায়ই চলে আসে তো, তাই।

তোর দাদা কী করে?

পড়ে। কলেজে।

কী পড়ে?

বি এসসি বোধহয়। ঠিক জানি না। একদিন নিয়ে আসব।

আনিস।

পান্নাদির কথা সে দাদাকে বলেও দিয়েছিল পরে। তখন লক্ষ করল, দাদার মুখে একটু হাসি খেলা। করে গেল আর উজ্জ্বল হল দুটো চোখ।

এসব সে আজকাল বুঝতে পারে, যদিও এসব তার বোঝার কথা নয়। না বোঝার ভান করেই থাকতে হয় তাকে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে সব বুঝতে পারে।

দাদা আজও পান্নাদিদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবে এবং আসবে। কিন্তু পান্নাদি জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে না। দাদা একটু যেন হতাশ হয়। তার ইচ্ছে করে পান্নাদিকে গিয়ে বলতে, আমি যখন দাদাকে নিয়ে তোমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাব তখন তুমি একটু জানালায় দাঁড়িয়ে থেকো।

পান্নাদি তখন হয়তো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করবে, কেন রে?

তখন সে মুচকি হেসে পালিয়ে আসবে।

এসব আগে সে বুঝত না। এখন বুঝতে পারে। তার সামনে একটা নতুন পৃথিবী জেগে উঠছে। তাতে সে খুশি হয় তা নয়। বরং অনেক সময় তার ভিতরে একটা যন্ত্রণা হয়।

একদিন সে তার মা আর বাবাকে মধ্যরাতে দেখে ফেলেছিল। ঘর অন্ধকার ছিল তবু দেখে ফেলেছিল। ভয়ে শ্বাস বন্ধ করে ছিল সে। কী করছে ওসব বাবা আর মা! এঃ মা। ওসব করতে হয়? বাবাকে তার খুন করতে ইচ্ছে হয়েছিল সেদিন।

চব্বিশ

আমি ভেবেছিলুম তুই আর আমার মুখদর্শন করবি না, সম্পর্কও রাখবি না।

তা কেন পিসি?

তোর মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করলুম যে। মাথা গরম হয়ে গেলে আজকাল আমার লঘু-গুরু জ্ঞান থাকে মুখ দিয়ে ছোটলোকী বচন বেরিয়ে যায়। কী যে সব বলে ফেললুম!

মাও তো তোমাকে কম বলেনি।

সে বলুক গে। আমি কি আর তেমন ভারিক্কী লোক! আমার মান-অপমান বলে তো কিছু নেই। হয়েও গেছি ছোটলোক। গতর খাটিয়ে খাই। তোর মা তো তা নয়। মুখ আমার বড় শত্তুর।

তুমি কেঁদো না পিসি। ব্যাপারটা ঠান্ডা হতে দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সে তো হবে। কিন্তু মনটা খারাপ থাকবে। তুইও তো দুঃখ পেলি। পেলি না?

না তো। আমার মা ডিজার্ভস ইট।

মেজদা সম্পর্কে ও কথাটা কেন যে বলল বউদি!

মা তো ওরকমই। যা মুখে আসে বলে।

দ্যাখ, আমাদের বংশের গৌরব হল তোর বাবা। অমল রায়কে এক ডাকে গাঁয়ের সবাই চেনে, সম্মান করে। আজ অবধি ওরকম রত্ন ছেলে এ-গাঁয়ে আর কেউ হয়নি। তার সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলতে আছে? আমরা না হয় খারাপ—

তুমি খারাপ নও পিসি।

হ্যাঁ রে, আমি কি তোকে কানমন্তর দিই, বল না?

কানমন্তর কাকে বলে?

কানমন্তর কাকে বলে জানিস না?

না তো!

কানমন্তর হল—দুর ছাই, ও আমি তোকে বোঝাতে পারব না। মানেটা বোধহয় খারাপ সব পরামর্শ দেওয়া।

তুমি তো শুধু আমার সঙ্গে গল্প করো।

তোর মাকে সে কথা কে বোঝাবে বল। তার ধারণা আমার সঙ্গে মিশে তুই খারাপ হয়ে যাচ্ছিস। লেখাপড়া জানি না বটে, কিন্তু আপন পিসিটা তো! আমি কি তোর খারাপ করতে পারি?

সোহাগ একটু হাসল, আমিই তো খারাপ।

যাঃ, তুই কেন খারাপ হতে যাবি?

আমিই খারাপ পিসি। আমার অনেক দোষ আছে।

দোষঘাট সকলেরই একটু-আধটু থাকে। মানুষ তো আর ভগবান নয়।

আচ্ছা, তুমি তো একজন ওয়ার্কিং উওম্যান, তোমার এত সেন্টিমেন্ট থাকবে কেন?

কথাটা ইংরিজি হলেও বুঝতে পারল সন্ধ্যা। মুখখানা ভার করে বলল, সে তুই বুঝবি না। আমার ভিতরটা তো পুড়ে আংরা।

তার মানে কী?

দুর মুখপুড়ি, তুই যে কেন সব কথা বুঝতে পারিস না!

দুজনেই হেসে ফেলে। তারপর সন্ধ্যা একটু থমথমে গলায় বলে, কত কষ্টে তোদের সঙ্গে অল্পস্বল্প ভাব হচ্ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল সেদিন! আমার মোটেই ঝগড়া করার ইচ্ছে ছিল না। তবু হয়ে গেল। সেদিন থেকে কেবল ভয় হয়েছে, তুই বুঝি আর আমার ঘরে আসবি না, আড়িই করে দিবি বুঝি!

আড়ি মানে বয়কট না?

হ্যাঁ। তার ওপর দুদিন তুই এলি না, কথাও বললি না। তখন ভীষণ মনটা খারাপ লাগতে লাগল। ভাবলুম, সোহাগ বোধহয় আমার ওপর রাগ করেছে। করবেই তো। নিজের মায়ের অপমান কার সহ্য হয় বল। যত ভাবতুম তত কান্না পেত।

একটা চাপা দুষ্টু হাসি হাসছিল সোহাগ। ভারী ভাল দেখায় ওকে ওই হাসিটাতে। বলল, কী করব বলো। দুদিন আমাকে একটু শাসনে রাখা হয়েছিল।

শাসন! হ্যাঁ রে, তোর মা কি তোকে মারধর করেছে নাকি?

সে তো আছেই। প্রায়ই আমাকে মায়ের হাতে মার খেতে হয়।

বলিস কী? সোমত্ত মেয়েকে মারতে আছে?

শি ইজ এ বিচ।

তার মানে কী?

ওটা তোমার জানার দরকার নেই। বাংলায় অনেক কথা খুব খারাপ শোনায়, ইংরিজিতে ততটা নয়।

তবে থাক। ওই জন্যই ইংরিজির ওপর আমার রাগ।

হি হি করে বাচ্চা মেয়ের মতো হাসল সোহাগ।

খুব মেরেছে?

ওসব আমি গায়ে মাখি না। মারুক না; কত আর মারবে?

আমিও মায়ের হাতে অনেক মার খেয়েছি। বোকাহাবা ছিলুম তো, মা তাই খুব মারত। কিন্তু ডাগর হওয়ার পর আর গায়ে হাত তুলত না।

বোকা হাবা ছিলে কেন?

ছিলুম কী রে, এখনও তাই আছি। বোকা বলেই তো গতি হল না। আমার মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই। তাই তো গতরে খেটে পুষিয়ে নিতে হয়।

তুমি কি নিজেকে খুব বোকা ভাব?

বোকাই তো। সবাই তাই ভাবে।

ওটা কিন্তু অটো সাজেশন।

তার মানে কী রে?

মানুষ নিজেকে খারাপ ভাবতে ভাবতে ওরকমই হয়ে যায়। কনফিডেন্স থাকে না।

একটা শ্বাস ফেলে সন্ধ্যা বলল, কী করব বল। ছেলেবেলা থেকেই সকলের মুখে শুনে আসছি, আমি নাকি মাথা-মোটা। গবেট, বোকা, কুচ্ছিত। শুনতে শুনতে সেটাই বিশ্বাস হয়ে গেল। ওই জন্যই বোধহয় কপালে সংসারও টিকল না।

তুমি বোকা নও পিসি।

এখন আর নিজেকে নিয়ে ভাবিই না। সব ভাবনাচিন্তা হামানদিস্তায় ফেলে গুঁড়ো করে দিই। দিলুম তো জীবনটা একরকম কাটিয়ে।

তোমার প্রবলেমগুলো কিন্তু খুব ছোটখাটো।

এক গাল হেসে সন্ধ্যা বলে, সেটাও খুব ভাবি। দুনিয়ায় কত কী হয়ে যাচ্ছে বলে শুনি মাঝে মাঝে। সেসব নিয়ে এক মিনিটও ভাবনা হয় না। আমার সব ভাবনাচিন্তা আচার, কাসুন্দি, মশলাপাতি, পাওনাগণ্ডা, হিসেবনিকেশ নিয়ে। ছোট মাপের মানুষদের সমস্যাও ছোটখাটোই তো হবে।

তা নয় পিসি!

তবে কী?

তুমি যে মনের দরজা বন্ধ করে রাখো। দুনিয়াকে ঢুকতেই দাও না তোমার ভিতরে।

কী সুন্দর যে বলিস তুই! বেশ বলিস তো! একরত্তি মেয়ে হলে কী হবে, তোর খুব বুদ্ধি!

ছাই! বলে খুব হিহি করে হাসে সোহাগ, এ কথাটা তোমার কাছে শিখেছি। আজকাল কথায় কথায় বলি, ছাই!

আহা, কী ভাল কথাই না শিখলেন আমার কাছে থেকে! তবে শেখাবোই বা কী! আমি কি ভাল কথা জানি কিছু! হ্যাঁ রে, বুডঢারও কি তোর মতোই খুব বুদ্ধি?

বুডঢা! বুডঢা মেরিটোরিয়াস। ক্লাসে ভাল গ্রেড পায়। আর পড়াশুনোয় খুব সিরিয়াস। আমার চেয়ে ওর বুদ্ধি অনেক বেশি।

ওর সঙ্গে আলাপই হল না ভাল করে। হয়তো মনে মনে ঘেন্না পায় আমাকে।

না, বুডঢা ইজ নট দ্যাট টাইপ। ও হল গুড়ি গুডি বয়। আমার মায়ের সঙ্গে একমাত্র বুডঢারই যা একটু ভাব।

মায়ের তো ছেলের ওপর টান থাকবেই। আমার মারও দেখেছি, মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের ওপর টান অনেক বেশি। অনেক, অনেক বেশি।

ওটা মায়েদের একটা কমপ্লেক্স। তুমি বুডঢার সঙ্গে আলাপ করতে চাও? তা হলে ডেকে আনতে পারি কিন্তু।

না বাবা থাক, যা গম্ভীর।

মোটেই তা নয় কিন্তু। আসলে খুব ফাজিল। খুব হাসাতে পারে। মুখটা গম্ভীর করে রাখে বটে, কিন্তু সেটা ওর মুখোশ।

না বাবা, ডেকে আনতে হবে না। বড্ড সাজানো ব্যাপার হবে তা হলে। আমার লজ্জা কি জানিস? ঝগড়ার সময় ছেলেটা সামনেই ছিল। সব শুনেছে। কী মনে করল কে জানে। সেই থেকে ওর চোখের দিকে চাইতেই পারি না আমি।

দেয়ার ইজ এ পয়েন্ট। মায়ের ওপর বুড়ঢার সফটনেস আছে। জানো তো, আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ কাউকে পছন্দ করে না। সবাই সবাইকে ঘেন্না করে। শুধু মা আর বুড়ঢার মধ্যেই যা একটু ভাল সম্পর্ক।

তোর বাবা কিন্তু তোকে খুব ভালবাসে।

ছাই বাসে। বাবা কাউকেই ভালবাসে না। হি হেটস আস অল।

তুই বুঝিস না রে।

সোহাগ সামান্য হেসে বলে, আমিই যদি না বুঝতে পারি তা হলে আর কেউ বুঝলে লাভ কী বলো। আমাদের ফ্যামিলিকে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।

কেন রে, তোর ওরকম মনে হয় কেন?

ইট অল স্টার্টেড উইথ পারুল।

পারুলদি?

হ্যাঁ।

সে তো কবেকার কথা।

তা জানি। বাট দি গডেস ইজ দি রুট অব অল মিসচিভস।

আবার ইংরিজি বলছিস?

ভুলে গিয়েছিলাম। সরি।

আমি কিন্তু এই ইংরিজিটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তুই বারবার পারুলদিকে গডেস বলিস কেন? ওতে দেবদেবীর অপমান হয়। একটা জলজ্যান্ত মেয়ে আবার গডেস কী রে?

পারুল গডেস নয়, সে তো ঠিক কথা। কিন্তু খুব কম বয়সে ওর ছবিটা দেখে কেন যে গডেস মনে হত কে জানে।

সুন্দরী বলে বলছিস?

হ্যাঁ তো। গড আর গডেসরা তো সুন্দরীই হয়। কিন্তু তাদের একটা অরাও থাকে।

কী থাকে বললি?

অরা। অরাটা তোমাকে কী করে বোঝাব বলো তো!

তুই নিয়ম করে রোজ আমাকে একটু একটু ইংরিজি শেখা। তা হলে তোর কথা টক করে বুঝতে পারব।

অরা মানে ধরো একটা-একটা—কী বলে ওটাকে বলো তো—

সন্ধ্যা হেসে খুন হয়ে বলে, থাক বাবা, থাক। আর তোকে বোঝাতে হবে না। খুব বুঝেছি।

কী বুঝেছ বলো তো!

ঠাকুর-দেবতাদের গা থেকে জ্যোতি বেরোয় তো! সেটাকেই বোধহয় অরা না কী ছাঁইপাশ বললি, তাই বলে—

মাই গড! তবু তুমি বলবে যে তুমি বোকা?

বোকা নই?

তুমি জলের মতো বুঝতে পেরে গেলে। হ্যাঁ তো, ওই জ্যোতি কথাটা আমার কিছুতেই মনে পড়ছিল না।

কিন্তু পারুলদির মোটেই জ্যোতি-ট্যোতি নেই। গায়ের রংটা অবশ্য ফর্সা। কিন্তু তাকে তো আর জ্যোতি বলে না। তোর মা তো আরও ফর্সা।

ধ্যাত। ফর্সা বলে নয়। সামথিং মোর দ্যান ফর্সা।

আমিও তো তাই বললুম। ফর্সা ছাড়া পারুলদির আর কী আছে বল তো।

মুশকিল কী জানো?

কী বল তো!

ছেলেবেলায় সেই যে মনে হয়েছিল ছবিটা একজন গডেসের সেই হিপনোটিজমটা আজও যায়নি।

আচ্ছা, পারুলদিকে সামনাসামনি দেখেও তোর ভুল ভাঙেনি?

একটু ভেঙেছে বোধহয়। কিন্তু ভাঙুক, তা আমি চাইনি। আমার তো কোনও গডেস নেই, ওই একজন ছাড়া।

কী অদ্ভুত কথা বলিস তুই? এই যে দুর্গামূর্তি দেখলি সেদিন, সে-ই তো গডেস।

ধ্যুত, তুমি যে একটা কী না। দুর্গা হল আইডলাইজড ইমাজিনেশন। ও তো ভীষণ কৃত্রিম।

আহা, দেবদেবীরা সব আমাদের মতো হ্যাতান্যাতা কি না।

তা বলে দুর্গার মূর্তিটা কিন্তু গডেস নয়। বিয়ন্ড মূর্তি গডেস কেউ থাকতেও পারে। কিন্তু মূর্তি দেখলে গডেসের ইমেজ আসে না আমার।

আচ্ছা, তা হলে পারুলদির ছবি দেখেই বা এল কেন বল।

তা জানি না যে!

তা হলে তুই আমার মতোই হাঁদারাম।

সন্ধ্যা আর সোহাগ দুজনেই খুব হাসল।

তুমি খুব ভুল বলোনি পিসি। আমি একটু বোধহয় তোমার মতোই বোকা।

তা হলে আমাকে বোকা বলে স্বীকার করলি?

এখনও করিনি। তবে আমার একটা হ্যাবিট আছে, মাঝে মাঝে কিছু একটা দেখে খুব ইমপ্রেস্‌ড হয়ে যাই। তুমি হও?

হই না? এই যে তোকে দেখে আমি মুগ্ধ!

আমাকে দেখে? যাঃ! আমি তো একটা বাজে মেয়ে।

ও আবার কী কথা! বাজে মেয়ে কেন হবি।

আমাকে দেখে মুগ্ধ হওয়ার কিছু নেই পিসি।

একটু পাগলি সেজে থাকিস বটে, কিন্তু আমি টের পাই, তোর ভিতরটা বড্ড ভাল।

আচ্ছা, আজ কি আমরা দুজন দুজনেই একটু অয়লিং করছি?

সন্ধ্যা হেসে ফেলে বলে, তা নয়। তবে তুই আমার ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। কী করে বুঝলুম জানিস?

কী করে?

যেদিন তুই আমার ঘরে প্রথম এলি, মনে আছে?

হ্যাঁ তো!

সেদিন থেকেই আমার ব্যবসা খুব বেড়ে গেছে।

যাঃ!

সত্যি! কত অর্ডার আসছে ভাবতে পারবি না।

ওই তো তোমাদের রোগ। যাকে তাকে ভগবান বানিয়ে ফেল।

ঠিক তোর মতো, না? পারুলদি যদি ভগবান হতে পারে তো তুই কী দোষ করলি বল তো?

ইউ আর এ গুড ডিবেটার।

এটা কিন্তু বুঝলুম না। বুঝিয়ে দে।

থাক, তোমার বুঝে কাজ নেই। এটা একটা কমপ্লিমেন্ট।

এটা বুঝেছি।

একটু একটু বুঝলেই তোমার চলবে।

তবু আমাকে ইংরেজিটা একটু শেখাস। ইংরেজি জানলে অনেক কাজ হয়।

কী কাজ হবে?

একটা লোন অ্যাপলিকেশন করেছিলুম বাংলায়। দিলই না। কে যেন বলছিল, অফিসারটা সাউথ ইন্ডিয়ান। ইংরেজিতে করলে দিত।

আমি তোমার অ্যাপলিকেশন লিখে দেব।

দিবি? খুব ভাল হয় তাহলে।

এখানে তো কম্পিউটার নেই। তাহলে তোমাকে কম্পিউটারে টাইপ করে দিতাম।

এখানে কিছুই নেই রে। পোড়া জায়গা।

কিন্তু পিওর আলো-বাতাস আছে। গাছপালা আছে। সন্ধের পর আকাশে কত তারা দেখা যায়।

দুর! ওসব দিয়ে কী হয়! আলো-বাতাস তো জন্ম থেকেই পাচ্ছি, কী হয়েছে বল। বরং ভাবি যদি ইংরেজিতে হড়বড় করে কথা কইতে পারতুম, যদি তুখোড় বুদ্ধি থাকত তাহলে হয়তো সেই লোকটা অমন তাড়িয়ে দিতে সাহস পেত না।

কে লোকটা বলো তো! তোমার হাজব্যান্ড?

তার কথাই বলছি।

আর ইউ স্টিল ইন লাভ উইথ হিম?

তা নয় রে! আসলে কী জানিস, কেন যে আমাকে তার পছন্দ হল না তা আজ অবধি ভেবেই পেলাম না। তাই ভাবি কয়েকটা বাড়তি গুণ থাকলে হয়তো ভাল হত।

তুমি এবার একটা বিয়ে করো পিসি। ইট ইজ হাই টাইম।

দুর বোকা! ওসব শুনলে খারাপ লাগে। একবার বাতিল হয়েছি তো, সেই ঘা-ই শুকোয়নি।

ইউ আর ম্যাড উওম্যান। আর সেইজনাই তোমাকে ভাল লাগে। আই লাভ এভরিথিং ম্যাড।

দুর পাগল! তোর যে কী সব অলক্ষুণে কথা! হ্যাঁ রে, তোর মায়ের সঙ্গে আমার ভাব করিয়ে দিবি?

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সোহাগ বলে, ইউ আর ইমপসিবল। কেন ভাব করতে চাও বলো তো!

ইচ্ছে করছে। ঝগড়া হওয়ার পর থেকে মনটা ভাল নেই।

মাথা নেড়ে সোহাগ বলে, নো ডাইস।

মানে কী রে?

মানে চান্স নেই। আমার মা একজন স্টাবোর্ন উওম্যান। বাবার সঙ্গে বা আমার সঙ্গে যখন ঝগড়া হয় তখন দিনের পর দিন আমাদের ভাব হয় না। এখন তো মায়ের সঙ্গে কখনওই আমার ভাব নেই। সব সময়েই আমাদের সম্পর্ক খারাপ।

তবে থাক, ভাবের দরকার নেই।

দরকার নেই পিসি।

তুই তোর মাকে পছন্দ করিস না?

আমরা কেউ কাউকে পছন্দ করি না।

তা হলে কী করে থাকিস?

অভ্যাস হয়ে গেছে। তবে আমি তো থাকব না।

কোথায় যাবি?

পালাব।

চোখ বড় বড় করে সন্ধ্যা বলে কোথায় যাবি?

তা জানি না। শুধু জানি পালাব।

ওরে বাবা, ওসব ভাবতে নেই। মেয়েরা পালালে ভীষণ বদনাম।

হোক না বদনাম!

কোনও ছেলের সঙ্গে?

কোনও পুরুষের সঙ্গে পালানোটা ভীষণ ভ্যাতভ্যাতে ব্যাপার। কাওয়ার্ড মেয়েরাই ওরকম পালায়। না, আমি একাই পালাব।

পালিয়ে কোথায় যাবি?

তা কিছু ঠিক করিনি। একটা জায়গায় তো যাব না, সন্ন্যাসিনী হয়ে একা একা ঘুরে বেড়াব।

যাঃ, এই বয়সে সন্ন্যাসিনী হবি কী রে?

সন্ন্যাসিনীর ব্যাপারটা ক্যামোফ্লেজ। ক্যামোফ্লেজ বোঝো?

না।

ছদ্মবেশ।

ছদ্মবেশ মানে তো ভেক ধরা।

ভেক? তার মানে?

ছদ্মবেশ।

দুজনেই হাসে।

ভেক ধরবি কেন?

কোনও দেশেই একা যুবতী মেয়ে তো নিরাপদ নয়। তাই সন্ন্যাসিনী সাজলে খানিকটা হয়তো সেফ।

ছাই সেফ। কত সন্ন্যাসিনীও রেপ হয়।

ওসব ভাবলে কি হয় পিসি? দুনিয়াটা নিজের চোখে দেখতে হবে না?

দুনিয়াটা তো তুই অনেক দেখেছিস, আর কী দেখার আছে?

আরও কত কী দেখার আছে, জানার আছে। একা একা ঘুরে বেড়ানোর থ্রিলই আলাদা।

তোর বাপু বড় দুর্জয় সাহস!

হ্যাঁ, আমার ভয়-টয় করে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্ধ্যা বলে, আমার কখনও পালানোর ইচ্ছে হয় না। কিন্তু আমারই বোধহয় পালানো উচিত। তাই না?

পালালে না কেন পিসি?

ভয় করে যে! তোর মতো সাহস তো আমার নেই। ছেলেবেলা থেকেই জেনে এসেছি, আমি অবলা মেয়েমানুষ। আর মেয়েদের দুনিয়াটা হল ভয়ভীতিতে ভরা। তোর মতো সাহস থাকলে ঠিক পালাতুম। তুই তবু অনেক কিছু দেখেছিস, আমি তো একটুখানি জায়গায় সারাজীবন কলুর বলদের মতো ঘুরে মরছি।

কলুর বলদ কী?

ওঃ, তোকে আর বোঝাতে পারি না। ঘানিগাছ জানিস?

না তো!

তবে আর তোকে বুঝতে হবে না বাপু। বিয়ে হয়ে দুর্গাপুর গিয়েছিলুম, সেই যা বাইরে যাওয়া। দু-তিনবার কলকাতায় গেছি। আর আমার সর্বতীর্থ সার হল বর্ধমান। মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি। এর বাইরের পৃথিবীটা কেমন তা জানাই হল না।

তুমি আর পারবে না পিসি।

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বলে, না, আর পারব না। বড্ড আটকে পড়েছি। স্বামী নেই, সন্তান নেই, তব পিছুটানও কি কম! নিজেই মায়া সৃষ্টি করে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছি। অথচ সবই তো ফক্কিকারি।

ফক্কিকারি! বাঃ বেশ শব্দটা তো!

মানে জানিস?

আন্দাজ করতে পারি।

কী বল তো!

নাথিংনেস।

ও বাবা, ওটা আবার আমি জানি না।

এখানে এসে আমি অনেক শব্দ শিখে গেছি।

গাঁয়ে কিন্তু লোকে কথায় কথায় অনেক খারাপ খারাপ শব্দ উচ্চারণ করে। সেগুলো শিখিসনি যেন।

হি হি করে হেসে সোহাগ বলে, হ্যাঁ, খুব স্ল্যাং শব্দ। পোঁদের কাপড়, পাছা, মাগী, আরও বলব?

রক্ষে কর বাপু, আর নয়। খবরদার যার-তার সামনে বলিসনি যেন!

আচ্ছা পিসি, চার দিকটা এমন অন্ধকার হয়ে গেল কেন বলো তো!

ও মা! তাই তো! এখন তো মোটে বেলা তিনটে, এত তাড়াতাড়ি তো রোদ মরে যাওয়ার কথা নয়। মেঘ করেছে বোধহয়। দেখ তো জানালার কাছে গিয়ে!

সোহাগ এক ছুটে জানলার কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখে বলল, ওঃ পিসি, শিগগির দেখবে এসো।

কী রে?

কী সাংঘাতিক মেঘ!

দুর বোকা! মেঘ আবার সাংঘাতিক কী রে! শীতকালে তো মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়ই।

আমার মনে হচ্ছে ইটস এ টুইস্টার।

সেটা আবার কী?

টর্নেডো। সাংঘাতিক ঝড়।

না না, এটা ঝড়ের সময় নয়।

তুমি টুইস্টার দেখনি?

সেটা কীরকম বলবি তো।

আমরা যখন ফ্লোরিডায় ছিলাম তখন একবার দেখেছি।

কীরকম বল তো?

ঘূর্ণিঝড়, সব উলটেপালটে দেয়, উড়িয়ে নিয়ে যায়। আমি চোখের সামনে একটা টয়োটা গাড়িকে উড়ে যেতে দেখেছি।

এই মেয়েটা, ভীষণ ঠান্ডা বাতাস ছেড়েছে। গরমজামা গায়ে দিয়ে আয়।

দুর! আমার কুটকুট করে যে!

তাহলে ওই লাল পশমি চাদরটা গায়ে দে। আলনায় আছে। কাচা চাদর, ঘেন্নার কিছু নেই।

ঘেন্না নয়, আমি সব সময়ে যে অ্যাটমোসফিয়ারটাকে ফিল করতে চাই।

তোর মাথা। জানলার কাছ থেকে সরে আয়। ইস্ বাতাসে যেন বরফের কুচি মিশে আছে। বুকে ঠান্ডা লাগলে আর দেখতে হবে না।

এক উন্মাদ ক্ষ্যাপা হাওয়া কোথা থেকে ময়লা ছেঁড়া কাগজের মতো মেঘের টুকরো কুড়িয়ে এনে জড়ো করছিল আকাশের এক কোণে, সকাল থেকে। দুপুরের পর থেকে সেই মেঘ জুড়ে জুড়ে কালো স্লেটের গায়ের মতো মেঘের মহাপর্বত তৈরি হল। ওই থমথমে, কালো, ভয়ংকর মেঘখানাকে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিল সে। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটায় তার কান কনকন করছে, চোখে জল আসছে, গাঁটে গাঁটে ব্যথা। গলায় খুশখুশি তুলছে শীতের সরু সরু আঙুল। আর শরীরের ভিতরে যেন হাঁটু মুড়ে বসে আছে একশো বছরের এক থুরথুরে বুড়ি।

এখান থেকে ফটিক কাঞ্জিলালের ফাঁকা বাস্তুজমিটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে সামান্য একটা ধুলোর ঘূর্ণি উঠল। নেচে নেচে বেড়াল এদিক সেদিক। পান্না জানে, ওইখানে জ্যোৎস্না রাতে পরিরা নেমে আসে। যে গাছটায়

গলায় দড়ি দিয়েছিল লোকটা সেই গাছটার চারপাশে পরিরা খেলা করে আর ফটিক কাঞ্জিলাল দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে দেখে আর খুব হাসে।

বিজুদাই গল্পটা বলেছিল। ফাঁসির দড়িটা দিয়ে নাকি কাঞ্জিলাল একটা দোলনা বানিয়ে নিয়েছে। তাইতেই দোল খায় আর পরিদের খেলা দেখে। মা গো! ভাবলেই বুকটা ভয়ে দুরদুর করে। তবে বিজুদা বড্ড বিচ্ছু। তাকে ভয় দেখানোর জন্যই বানিয়ে বলে কিনা কে জানে।

ফটিকের সঙ্গে তার বউ আশালতার ছিল ভীষণ ঝগড়া। আশালতা কতবার মরতে গেছে। আর ফটিক নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে বলে শাসাত।

মরার দিন সকাল থেকে ঝগড়া লেগেছিল খুব।

শেষে ফটিক বলল, দেখবে? মজা দেখাব?

দেখাও না! তোমার পাল্লায় পড়ে কত মজাই তো দেখলুম। আর কী দেখাবে?

তখন কিন্তু থই পাবে না।

থই আমার এখনও নেই।

সবাই বলে, কাঞ্জিলাল খুব গুছিয়ে মরেছিল। টাকাপয়সা সব আদায়-উশুল করে বউয়ের নামে গচ্ছিত রেখে, কাজকারবার গুটিয়ে একটু বেশি রাতের দিকে নাইলনের দড়িগাছ নিয়ে নিরিবিলিতে গিয়ে—ম্যাগো!

আশালতাকে মজা দেখিয়েছিল বটে কাঞ্জিলাল। সে কী বুকফাটা কান্না মেয়েটার! বয়সও তত বেশি নয়। বাইশ-টাইশ হবে।

কিন্তু মুশকিল হল, দুনিয়াটা বড় নিষ্ঠুর। দুদিন পরেই সবাই সব কিছু ভুলে যায়। সব আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে।

বর-বউয়ের ঝগড়া তার চারদিকে। বর-বউতে যে কেন এত ঝগড়া হয় তা বোঝে না পান্না। সে যদি বিয়ে করে তাহলে সে একদিনও ঝগড়া করবে না তার বরের সঙ্গে। একবারও না।

ওলো পতিসোহাগী লো, দেখা যাবেখন বিয়ের পর। বিয়ের আগে কত কথাই থাকে মেয়েদের। বুঝবি মজা।

ছোট জ্যাঠাইমা বড্ড ঠোঁটকাটা। ভাল কিছু ভাবতেই চায় না।

প্রথমে এক ফোঁটা দু ফোঁটা বৃষ্টি উড়ে এল। তারপর হঠাৎ অ্যাই বড় বড় শিল পড়তে লাগল নষ্টচন্দ্রের ঢিলের মতো। সরে এল পান্না। আর দেখতে পেল একটা মেয়ে ফটিকের জমির পাশ দিয়ে কুঁজো হয়ে দৌড়ে আসছে। গায়ে গরমজামাটা পর্যন্ত নেই। সোহাগ।

পঁচিশ

মন মানুষকে খায় নানাভাবে। কখনও বাঘের মতো হালুম করে এসে লাফিয়ে পড়ে ঘাড় মটকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কখনও অজগরের মতো ধীরে ধীরে গিলে ফেলতে থাকে। কাকে কখন কী ভাবে খাবে তার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম তো নেই। যখন শত্রু তখন ষোলো আনা শত্রু। আবার যখন পোষ মানে তখন মনের মতো বন্ধুই বা কে। তখন তুমি মরুভূমিতে থাকলেও সে অধরা হয়ে নাচ দেখাবে। ঝড়ের দরিয়ায় সে বন্দরের ছবি টাঙিয়ে দেবে। কখনও ঈশ্বর, কখনও শয়তান, কখনও নিয়তি।

অমলকে খাচ্ছে অজগরের মতো। ধীরে ধীরে একটা অমন মানুষ তার ক্ষুরধার বুদ্ধি, ঝকঝকে মেধা নিয়েও অজগরের গরাস হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই আর ছাড়িয়ে নিতে পারছে না নিজেকে।

ভাবতে একটু কষ্ট হয় পারুলের।

মন আজ ভাল নেই। ভোররাতে বাবাকে স্বপ্ন দেখেছে সে। মরা মানুষকে স্বপ্ন দেখা কি ভাল? বার বার? গত সাতদিনে বোধহয় বারতিনেক বাবাকেই স্বপ্নে দেখেছে সে। ভোররাতে আজ দেখল, বিরাট বড় একটা বাড়ি আর তার অফুরান গড়ানে বারান্দা পুবের রোদে ভেসে যাচ্ছে। এই অত বড় বারান্দা ধু ধু করছে জনহীনতায়। কেউ কোথাও নেই। আর আশ্চর্য, সেই বারান্দাটা কোথাও শেষ হয়নি। সে হাঁটছে তো হাঁটছেই। কেন যে শেষ হচ্ছে না ছাই কে জানে। ভীষণ ভয় করছিল তখন। ধ্যাত, এত বড় বারান্দা কে যে বানাল। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বলল, যা না, আরও যা, একসময়ে শেষ হবে ঠিকই।

কে বলল কথাটা? ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে সে দেখল, বাবা। তেমনই ফর্সা টকটকে রং, তেমনই মস্ত গোঁফ, তেমনই সুন্দর।

ও বাবা, তবে যে লোকে বলে তুমি মরে গেছ?

দুর বোকা! মরব কেন? এই একটু বেড়িয়ে এলুম।

এ বাড়িটা কে বানাল বল তো! এত বড় বারান্দা কেন?

তা ঠিক, বারান্দাটা একটু বড়। চল তোকে এগিয়ে দিই।

এর আগেও বারদুয়েক বাবাকে স্বপ্নে দেখেছে সে। স্বপ্ন নিয়ে তার তেমন কোনও কুসংস্কার নেই। আবার এও মনে হয়, কী জানি বাবা, স্বপ্নের মধ্যেও কোনও ইশারা ইঙ্গিত থাকতেও পারে।

সকাল থেকেই আকাশে মেঘলা ভাব। মনের মধ্যেও তাই। জ্যোতিপ্রকাশ আজ ভোরে চলে গেল জামশেদপুর। মন খারাপের সেটাও একটা কারণ। বিয়ের পর যখন বরের সঙ্গে ভাব হল তখন সম্পর্কটা উত্তেজক, মাদক। তখন দুজনেরই দুজনের জন্য আনচান অবস্থা। চোখে হারাই ভাব।

তারপর ধীরে ধীরে সেই আকর্ষণের তীব্রতা কমতে লাগল। কিন্তু অন্যরকম একটা টান জন্মাতে লাগল তা থেকে। এখন বরকে ছেড়ে থাকলে একটা কেমন নিরাপত্তার অভাব টের পায় সে।

অবশ্য সেখানে রান্না আর কাজের লোক আছে। তার বরের কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তবু পারুলের একটু খুঁতখুঁত করে। মনটা সেই কারণেই আজ কেমনধারা হয়ে আছে যেন।

সকালে বিজু এল তার নতুন মোটরবাইক নিয়ে। সবে কিনেছে। ভট ভট করে ফটক দিয়ে ঢুকে সোজা উঠোনে এনে দাঁড় করিয়েই হাঁক মারল, বড়মা! ও বড়মা।

বলাকা ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে বললেন, শয়তানের কলটা শেষ অবধি কিনেই ফেললি?

শিগগির কাপড়টা পালটে এসো।

কেন রে মুখপোড়া, কাপড় পালটাব কেন?

তোমাকে এই শয়তানের কলে চাপিয়ে শীতলাবাড়ি থেকে ঘুরিয়ে আনব।

বলাকা চোখ কপালে তুলে বললেন, ওইটেই বাকি আছে আমার কপালে। রক্ষে কর বাপু, বুড়ো বয়সে পড়ে হাড়গোড় ভেঙে দ হয়ে থাকতে পারব না।

আরে, চলোই না, একবার চড়লেই বুঝতে পারবে জিনিসটা মোটেই ভয়ের নয়।

আমার আর আহ্লাদের দরকার নেই বাবা। ওসব তোরা চড় গে।

দেখ বড়মা, বেশি কথা কইবে তো হাটে হাঁড়ি ভাঙব কিন্তু।

ওমা, চোখ রাঙায় দেখ! কী হাঁড়ি ভাঙবি রে মুখপোড়া?

জ্যাঠামশাই একসময়ে মোটরবাইক চড়ত, আমি জানি। একটা গাবদা-গোবদা বি এস এ মোটরবাইক ছিল তখন। তুমি তাতে চেপে জ্যাঠার সঙ্গে শহরে সিনেমা দেখতে যেতে।

তোর মাথা। তোর জ্যাঠা আমাকে মোটে একদিন চাপাতে পেরেছিল।

মোটে একদিন?

তাও অনেক সাধাসাধির পর। আর সে যা কাণ্ড হয়েছিল। বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজও যায়নি দুড়ুম করে আমি পড়ে গেলুম।

এ মা!

আর বলিসনি। হাঁটু ছড়ে, শাড়ি ছিঁড়ে বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড। ওই একবারই।

তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। ভাবলুম নতুন বাইকটায় তোমাকে চাপিয়ে নিয়ে ঘুরে আসব একটু। আমার মা তো দিব্যি কাল আমার সঙ্গে ঘুরে এল।

আহা, ও ছুঁড়ির আর বয়স কী? আমার চেয়ে বছর দশেকের ছোট।

বয়স নয় বড়মা, এ হল স্মার্টনেসের প্রশ্ন। তুমি একদম স্মার্ট নও। অথচ আমি তোমাকে স্মার্ট বলে ভাবতুম।

আর আমার স্মার্ট হওয়ার দরকার নেই বাবা। কিন্তু দুচাকার জিনিসে বিশ্বাস নেই। কেন যে তোর বাবা মত দিল তাও বুঝি না।

অবশেষে বিজু এসে পারুলকে পাকড়াও করল।

চলো তো পারুলদি, তোমাকে নিয়েই একটা চক্কর দিয়ে আসি।

আজ ভাল লাগছে না রে।

আচ্ছা, তোমরা সবাই নন কো-অপারেশন করলে কেমন করে হয় বল তো! বড়মা রিফিউজ করল, তুমিও।

পারুলের অবশ্য ভয় নেই। গাড়ি কেনার আগে জ্যোতিপ্রকাশের স্কুটার ছিল। বহুবার চেপেছে পারুল। নিজেও চালাতে পারত। আজ অবশ্য মেজাজটা ঠিক নেই। তবু শেষ অবধি রাজি হল সে। ছেলেমেয়ে দুটো আজ ছোট কাকার সঙ্গে বর্ধমানে গেছে ওদের বাবাকে সি অফ করতে। কীসব কেনাকাটা করে দুপুরে ফিরবে। বাড়িটা ফাকা লাগছে বলে বেরিয়ে পড়ল পারুল।

কিন্তু বাইক চলতেই বুঝতে পারল, কাজটা ঠিক হয়নি। বড্ড ঠান্ডা বাতাস লাগছে। কান কনকন করছে, হাত পা সিঁটিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ওই গতি আর খোলা হাওয়া তার মাথা থেকে মনখারাপটাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

একবার মুখ ফিরিয়ে বিজু বলল, বর্ধমান যাবে পারুলদি?

অত দূর যাবি! দরকার কী?

আহা চলোই না। ঘরে বসে থেকে হবেটা কী?

বড্ড ঘিঞ্জি শহর, সাবধানে চালাস।

বর্ধমানে গিয়ে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে বাইক দাঁড় করিয়ে বিজু বলে, চলো পারুলদি কিছু খেয়ে নিই। বড্ড খিদে পেয়েছে।

দুর! আমার তো একটুও খিদে নেই। এই তো একটু আগে মা জোর করে লুচি তরকারি খাওয়াল। গলা অবধি হয়ে আছে বাবা।

ডায়েটিং করার বদ অভ্যাসটা ছাড়ো তো পারুলদি। আমি জানি তুমি একটার বেশি দুটো লুচি খাও না। না হয় হবেই একটু মোটা, তা বলে খাওয়ার আনন্দটাকে ভোগ করবে না? জীবনটা কদিনের শুনি!

হয়েছে, তোকে আর ফিলজফি ঝাড়তে হবে না। তুই খা, আমি বসছি।

যখন গোগ্রাসে টোস্ট আর ওমলেট খাচ্ছিল বিজু তখন এক কাপ দুধ-চিনি ছাড়া চা নিয়ে চুপচাপ বসেছিল পারুল। একটা চুমুকও দেয়নি। দোকান-টোকানে খেতে তার বড় গা ঘিন ঘিন করে।

তোর সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল, না রে?

খুব। তোমার আর আমার মধ্যে তফাত কী জানো? আমি খিদে পেলে খাই, আর তুমি সুটকি মেরে থাক।

আমার আড়াই মন ওজন হলে তুই কি আমাকে তোর মোটরবাইকে তুলতে সাহস পেতি?

কেন, অসুবিধে কী আছে? আমার বাইকটা কীরকম সফিসটিকেটেড জানো?

তুই একটা ক্যাবলা।

কেন বলো তো!

মোটরবাইকের পেছনে চাপাতে হয় গার্লফ্রেন্ডকে। তোর গার্লফ্রন্ড জোটে না কেন বল তো!

দুর দুর, ওসব তোমাদের সেকেলে ধারণা। গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘোরার মধ্যে কোনও গ্ল্যামার নেই আজকাল। গণ্ডায় গণ্ডায় ঘুরছে।

ও বাবা! তুই যে অনেক এগিয়ে গেছিস! গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘোরাটাও সেকেলে হয়ে গেছে বুঝি?

আমার কাছে তাই।

আসল কথাটা বললেই তো হয়।

আসল কথাটা কী?

তোর গার্লফ্রেন্ড নেই।

বিজু এক গাল হাসল, কথাটা মন্দ বললানি। সত্যিই নেই।

কেন নেই রে? চেহারাখানা তো সুন্দর। তোর চেহারায় আমি বাবার আদল পাই। তেমনই লম্বা ফর্সা, তোর কাছে মেয়েরা ঘেঁষে না কেন?

ঘেঁষবে কী করে? পাত্তা দিলে তো!

পাত্তা দিলেই তো হয়।

বিজু মাথা নেড়ে বলে, হয় না পারুলদি। আমাকে ছেলেবেলা থেকে শেখানো হয়েছে মেয়েদের সঙ্গে সম্মানজনক দূরত্ব রাখতে হয়। মাখামাখি করতে নেই। বড় হয়ে আমি গাঁয়ের যুব সমাজের অভিভাবক। স্বনিযুক্ত অভিভাবকই ধরে নাও। আমি কি পারি মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে?

এত বেশি পিউরিটান হলে তুই যে এই বয়সেই বুড়োটে মেরে যাবি!

কী আর করা যাবে বলো। রক্ষক হয়ে তো ভক্ষক হতে পারি না। কোথাও কোনও মেয়ের ওপর কোনও রকম হামলা হলে, অপমানের ঘটনা ঘটলে আমরা গিয়ে তো রুখে দাড়াই। সেই আমিই যদি প্রেম-ট্রেম করে বেড়াই তাহলে লোকে বলবে কী?

দুর পাগলা, দুটোকে গুলিয়ে ফেলছিস কেন? মেয়েদের রক্ষা করিস সে তো ভাল কথা, তাতে প্রেম করা আটকায় কীসে?

আটকায়। ও তুমি বুঝবে না। আর প্রেমের যা-সব ছিরি দেখছি তাতে ও ব্যাপারটার ওপরেই আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পারুল বলে, বুঝেছি। তোর তো দেখছি গভীর বিপদ।

না পারুলদি, বেশ আছি। মেয়েদের নিয়ে ভাবতে হয় না বলে অন্য সব ব্যাপারে মন দিতে পারি। নারীচিন্তা কিন্তু অন্য সব চিন্তাকে খেয়ে নেয়।

পারুল রুমালে মুখ চেপে খুব হাসল। বলল, হ্যাঁ রে তুই ব্রহ্মচর্য-টর্য করছিস না তো! বিবেকানন্দের বই-টই পড়ছিস নাকি?

কেন, পড়া কি খারাপ?

বদহজম হলে খারাপ। নইলে ভালই তো।

না, ওসব নয়। আমি পিউরিটানও নই। আসলে আমি তেমন মেয়ের দেখাও পাইনি যাকে দেখলে দয়ে পড়ে যেতে হয়।।

বড় বড় চোখে চেয়ে পারুল বলে, একটাও নয়?

না পারুলদি, একটাও নয়।

কথাটা কি মিথ্যে বলল বিজু? ভাবের ঘরে চুরি! একথা ঠিক তার জীবনে কোনও মহিলার আবির্ভাব ঘটেনি এতকাল। কিন্তু এখন সে অতটা নিশ্চিত নয়।

এরকম ঘটনা যে ঘটতে পারে তা তার স্বপ্নেও কখনও মনে হয়নি। তার একটা স্পর্ধিত অহং আছে। সেই অহং তাকে পাঁচিলের মতো ঘিরে রেখেছে এতকাল। সুন্দর চেহারা, মেধাবী ছাত্র, রবীন্দ্রসংগীতের দারুণ কণ্ঠ এবং বড় বাড়ির ছেলে— এইসব গুণাবলীর জন্য সে কৈশোরকাল থেকেই চুম্বকের মতো মেয়েদের আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তাকে একটা মন্ত্র সেই অবোধ বয়সেই শিখিয়ে দিয়েছিল তার বাবা, দেখো বাবা, মেয়েদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করো না। মায়ের জাত, তাদের সম্মান রাখতে হয়।

তাদের বংশে এই ধারাটা আছে। পুরুষেরা একটু এইরকম, মহিলাদের এড়িয়ে চলে। যখন সে বর্ধমান কলেজে পড়ে তখন ইউনিয়ন করত। খেলাধুলোয় ভাল ছিল বলেও বেশ নামডাক। সেই সময়ে বুলবুলি নামে ফুটফুটে একটি মেয়ে খুব ঘুরঘুর করত তার কাছে। ছোটখাটো, রোগা, কিন্তু ভারী মিষ্টি দেখতে ছিল সে। নানাভাবেই সে নিত্য নিজেকে নিবেদন করতে চাইত। তাকে দেখে মাঝে মাঝে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ত বিজুও। অনেক সময়ে তাদের দীর্ঘ সংলাপও হয়েছে।

বুলবুলি বলত, আমার চোখে চোখে তাকাও না কেন বলল তো! তোমার কি ভয় আমি তোমাকে হিপনোটাইজ করে ফেলব?

খানিকটা হিপনোটিজম তো মেয়েদের মধ্যে থাকেই। কিন্তু কথাটা উঠছে কেন? চোখে চোখ রাখাটা কি জরুরি?

আমার কাছে জরুরি।

কেন?

একটু বোঝার চেষ্টা করো। তুমি বোকা নও।

না নই। বোকা নই বলেই বোকামিটা করি না।

তুমি কি আমাকে ভয় পাও?

না বুলবুলি, আমি বোধহয় নিজেকেই ভয় পাই।

আমাকে নিয়ে কখনও ভাব? যখন একা থাকো?

না-ভাবার চেষ্টা করি।

আমি সবসময়ে তোমার কথা ভাবি। তুমি কেন ভাব না?

তোমাকে কখনও বলা হয়নি, মানুষের মহার্ঘ্য মস্তিষ্কটা অর্থহীন, প্রয়োজনহীন চিন্তায় ভারাক্রান্ত থাকে বলেই অধিকাংশ মানুষ তার মাথাকে সঠিক ব্যবহার করতে পারে না।

ওসব শক্ত শক্ত কথা বলছ কেন? সহজ করে বলো।

সহজ করে বললে বিচ্ছিরি শোনাবে যে।

অর্থাৎ আমার কথা ভাবলে তোমার সময় নষ্ট হয়?

অনেকটা তাই।

এ কথায় বুলবুলির চোখ ভরে জল এল। ধরা গলায় বলেছিল, এরকম অপমান আমাকে কেউ কখনও করেনি জানো?

ভাল করে ভেবে দেখো বুলবুলি, এটা অপমান নয়। এটা এক ধরনের আত্মরক্ষা। বন্ধুত্ব থেকে অবসেশন জন্ম নিলে সমস্যা হবে।

কেন, সমস্যা কীসের?

ভাল লাগার তো শেষ নেই। একটা ভাল লাগার স্টেজ শেষ হলে আর একটা ভাল লাগার স্টেজ আসতে পারে। জীবন পরিবর্তনশীল।

আবার শক্ত শক্ত কথা বলছ?

তুমি বুঝতে চাইছ না বলে শক্ত মনে হচ্ছে। একটু ভাবো তুমি। একটু গভীরভাবে ভাবো।

বুলবুলির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের সম্ভাবনা সেদিনই শেষ হয়ে যায়।

এরকম হব-হব সম্পর্ক আরও তৈরি হয়েছে তার জীবনে। বারবার। শেষ অবধি বিচিত্র সব বহিরাক্রমণেও অটুট থেকেছে তার দুর্গ। ফটক ভাঙেনি, বিজয়োল্লাসে ঢুকেও পড়েনি কেউ।

লুঠেরা না থাক, তস্কর তো আছে। তারা দেয়াল ভাঙে না, সিঁদ কেটে আসে।

অষ্টমী পুজোর দিন একটা ঘটনা ঘটেছিল। তুচ্ছ সামান্য ঘটনা।

মনে না রাখলেও চলে। তবু কী করে যেন থেকে গেছে মনে। তার প্রিয় বানর বজরংকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। সামনেই বলি হচ্ছে। ঢাক বাজছে দ্রিমি দ্রিমি। রাজ্যের লোকের ভিড় চারদিকে। তার মধ্যেই হঠাৎ এক জোড়া বিহ্বল চোখ তার দিকে অপলক চেয়েছিল। ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে উঠছিল লজ্জায়। তবু চোখ দুটো সরিয়েও নিতে পারেনি মেয়েটা। বজরং এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল, চুল ধরে টানছিল বিবেকের মতো। বিজু খুব অস্বস্তির সঙ্গে সরে এসেছিল ভিড় থেকে।

পুজোর ভাসানের দিন প্যান্ডেলে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল একটু তফাতে। সবাই লরিতে উঠল হুড়মুড় করে। মেয়েটির চোখ চকচক করছিল লোভে। কিন্তু শেষ অবধি সে এসে আর দশজনের মতো উঠল না লরিতে, দাঁড়িয়ে রইল একা, ফাঁকা প্যান্ডেলে। এবং সে নির্ভুল চোখে তাকিয়েছিল বিজুর দিকেই। বিজুই যে এই বাহিনীর সর্দার তা জানত সে। হয়তো সে দূরাকাঙক্ষা করেছিল, বিজু তাকে ডাকবে। ডেকে নেবে। কিন্তু বিজু তাকে ডাকবে কেন? সবাই নিজের ইচ্ছেয় যাচ্ছে, সকলেরই প্রবল উৎসাহ, শুধু ওই অহংকারী মেয়েটাই দেমাক দেখাচ্ছিল। বিজুর কী দায় পড়েছিল ডাকার!

পরে মেয়েটা পান্নাকে দুঃখ করে বলেছিল, আমাকে তো কেউ ডাকেনি।

কার ডাকের অপেক্ষা ছিল মেয়েটার?

বিহ্বলতা জিনিসটা বিজু টের পায়। বারবার ওই করুণ একজোড়া চোখ তার স্মৃতিতে হানা দিয়েছে। আর ওই কথা, আমাকে তো কেউ ডাকেনি।

প্রেমিক না হলেও মেয়েদের কাছে হিরো হওয়ার লোভ কি সংবরণ করতে পেরেছে বিজু? বোধহয় না।

স্পোর্টিং ক্লাবের বদমাশ ছেলেরা যখন সোহাগের পিছনে লেগেছিল তখন কথাটা তার কানে তুলেছিল পান্না। স্বাভাবিক অবস্থায় এসব ঘটনা ঘটলে সে প্রতিকার করে বটে কিন্তু বাড়াবাড়ি কখনও করে না। হঠাৎ ওই ঘটনা শোনার পর সে যে কেন উন্মাদের মতো রেগে গিয়েছিল তা কে বলবে? রেগে গিয়ে সে তার ডু গুডার দলবল নিয়ে নিজেই চড়াও হয়েছিল ওদের ওপর। মাত্রা ছাড়িয়ে মারধর করেছিল। তারপর পাঠিয়েছিল সোহাগের কাছে ক্ষমা চাইতে।

কোথায় বিগলিত কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটবে, হল উলটো। মেয়েটা বড়মাকে আর পান্নাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব কাউকে নিতে হবে না। সুস্পষ্ট অপমান এবং প্রত্যাখ্যান।

তা হলে কি ওই দু চোখের বিহ্বলতা ভুল রিডিং দিয়েছিল বিজুকে? ভুল পাঠ? ভুল ব্যাখ্যা? সব ভুল?

তাই হবে। মেয়েদের মতো এত ভাল ড্রিবল আর কে করতে পারে? অদৃশ্য থাপ্পড় খেয়ে মেয়ে জাতটার ওপরেই কিছুদিন বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল তার।

নতুন বাইকটি হাতে পাওয়ার পর কিছুদিন হল লম্বা লম্বা ড্রাইভে চলে যাচ্ছে বিজু। খোলা রাস্তা, অফুরান পথ, হাওয়া, রোদ, গতি—সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত মুক্তি। বুকটা হা-হা করে আনন্দে। সাইকেল এর কাছে কোথায় লাগে! মোটরগাড়িও না। যৌবন এবং মুক্তির দূত হল মোটরবাইক। হাইওয়েতে সে যখন একের পর এক গাড়ি এবং স্কুটারকে কাটিয়ে দুরন্ত গতিতে ছোটে তখন মনে হয়, এর চেয়ে ভাল কিছু নেই।

পরশু সকালবেলা থেকে একটু একটু মেঘলা করেছিল, হাওয়া দিচ্ছিল খুব। একটা পুলওভার আর তার ওপর উইন্ডচিটার চাপিয়ে হেলমেটে মাথা ঢেকে সাতসকালে বেরিয়ে পড়েছিল বিজু। বর্ধমান থেকে বাইপাস ধরে বাঁকুড়া আরামবাগের রাস্তা ধরে অনেকটা চলে গিয়েছিল সে। তারপর ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল হচ্ছে দেখে ফিরল।

ফেরাটা ছিল পাগলের মতো। বৃষ্টির আগেই গাঁয়ে পৌঁছনোর জন্য সে স্পিড তুলে দিয়েছিল সাংঘাতিক। বাইকটা ক্ষণে ক্ষণে লাফাচ্ছিল রাস্তার খানাখন্দে। শক্ত হাতে হ্যান্ডেল চেপে দাঁতে দাঁত পিষে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল বিজু।

কিন্তু শেষ অবধি বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না। প্রথমেই বড় বড় শিল পড়তে থাকায় একটা গাছতলায় কিছুক্ষণ দাঁড়াল সে। তারপর বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়ল। ভিজে ঝুব্বুস হয়ে গেল মাঝ রাস্তায়। ভিজতে ভিজতেই গাঁয়ে ঢুকে সে বাইকের স্পিড কমিয়ে ধীর গতিতে চালাচ্ছিল।

ফটিক কাঞ্জিলালের জমির কাছ বরাবর এসে সে অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখতে পায়। একটা মেয়ে ওই প্রবল বৃষ্টিতে ফাঁকা জমিটায় দু হাত দুদিকে ছড়িয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ঘুরে ঘুরে নাচছে।

পাগল নাকি মেয়েটা?

বাইক থামিয়ে নেমে এল সে।

এই! তুমি কী করছ এখানে?

মেয়েটা জবাব দিল না। ভ্রূক্ষেপও করল না তার দিকে। যেমন ঘুরে ঘুরে নাচছিল তেমনই নেচে যেতে লাগল।

এই সোহাগ! সোহাগ! বাড়ি যাও।

মেয়েটা সম্পূর্ণ সম্মোহিতের মতো নেচেই যাচ্ছিল। জবাব দিল না, তাকালও না।

নিতান্ত বাধ্য হয়েই এগিয়ে হঠাৎ মেয়েটার পথ জুড়ে দাঁড়াল বিজু।

শুনতে পাচ্ছ? কী হচ্ছে এখানে?

মেয়েটা বেভুলে ঘুরতে ঘুরতে এসে ধাক্কা খেল তার সঙ্গে। তখনই বিজু প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও শুনতে পেয়েছিল মেয়েটা বিড়বিড় করে অস্ফুট উচ্চারণে কিছু বলে যাচ্ছে। মন্ত্রের মতো।

ধাক্কা খেয়ে মেয়েটা হঠাৎ জলকাদার মধ্যে ধড়াস করে পড়ে গেল। এমন অদ্ভুত ছিল পড়াটা। খাড়া অবস্থা থেকে গাছ যেমন পড়ে তেমনই টানটান শরীর নিয়ে পড়ল। চারদিকে খোয়া ইট, পাথরের টুকরো। মাথা কেটে যেতে পারত।

ভয় পেয়ে গেল বিজু। মেয়েটা পড়ে নড়ছিল না।

গাঁয়ে লোকলজ্জার ভয় আছে। মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে তুলতে পারত বিজু। সেটা করার সাহস না পেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ডাকল, এই যে সোহাগ! ওঠো। তোমার কী হয়েছে?

সোহাগ জবাব দিল না। ওই প্রবল বৃষ্টিতে নির্বিকারভাবে পড়ে রইল।

অগত্যা দুটো কাঁধ ধরে তাকে তোলার চেষ্টা করতে লাগল বিজু। মেয়েটার কপালে নিউমোনিয়া লেখা আছে। কিন্তু মূর্ছিত সোহাগকে বসানোও যাচ্ছিল না। তুললেই ফের পড়ে যাচ্ছে। কী যে মুশকিল হয়েছিল বিজুর। একবার ভাবল গিয়ে লোকজন ডেকে আনবে। কিন্তু ওই প্রবল বৃষ্টি এবং ঠান্ডায় লোকজন পাওয়াও মুশকিল।

যখন প্রবল দুশ্চিন্তায় দ্বিধাগ্রস্ত বিজু সোহাগের বৃষ্টিস্নাত মুখের দিকে চেয়ে আছে তখনই হঠাৎ তার দুর্গের প্রাকারে নয়, কোনও অন্ধ রন্ধ্রের পথে চোর ঢুকছিল অবরোধের ভিতর। নিজের হৃদয়কে সে দুর্বল হয়ে যেতে টের পাচ্ছিল।

আর তখনই হঠাৎ খুব ধীরে চোখ খুলছিল সোহাগ। অস্ফুট একটা 'উঃ' শব্দ করে সে বৃষ্টির ঝাপটা থেকে মুখ বাঁচাতে দু হাতে মুখ ঢাকা দিল। স্বপ্নোত্থিতের মতো উঠে বসল।

সোহাগ!

কে আপনি?

আমি বিজু। তুমি এখানে কী করছিলে?

সোহাগ বৃষ্টির ঝরোখার ভিতর দিয়ে তাকে দেখল। চিনতে পারল। তারপর বলল, আমি যা-খুশি করছিলাম। আপনাকে তো আমি ডাকিনি।

ডাকোনি। কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে—

তাতে আপনার কী?

তোমার ঠান্ডা লাগবে ভেবে—

আপনি আমার স্পেলটা ভেঙে দিয়েছেন।

কী ভেঙে দিয়েছি?

আপনি বুঝবেন না। বুঝবার মতো বুদ্ধি আপনার নেই।

রেগে গেলেও নিজেকে সংবরণ করে বিজু বলল, তুমি একটা ঘরের মধ্যে ছিলে, তাই ভাবলাম—

প্লিজ! আপনি আমার অনেক ক্ষতি করেছেন। এখন দয়া করে চলে যান।

যাব?

হ্যাঁ, যাবেন।

বিজু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, তুমি নিজেকে কী ভাব তা তুমিই জানো। আমি তোমাকে পাগলের মতো কাণ্ড করতে দেখেই এসেছিলাম।

আমি একজন পাগলই। আপনি দয়া করে যান।

রেগে গেলে মানুষ অনেক সময়ে বোকার মতো কথা বলে। বিজুও বলল, এইজন্যই মানুষের উপকার করতে নেই।

দু হাতে ভেজা এবং ভিজন্ত চুল গুছি করে একটা খোঁপার মতো বেঁধে নিতে নিতে সোহাগ বলল, আমি আপনার উপকার চাই না তো! কে বলেছে আপনাকে আমার উপকার করতে?

আচ্ছা, ঠিক আছে! এর বেশি আর কথা জোগায়নি বিজুর মুখে। সে বৃষ্টির মধ্যে এসে ফের তার বাইক স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। আর হতভাগা, বিশ্বাসঘাতক মোটরবাইকটা জলে ভিজে কিছুতেই আর স্টার্ট নিল না। বাইকটা ঠেলে নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিজু দেখতে পেল, উন্মাদিনী সোহাগ পান্নাদের বাড়ির দিকে ছুটছে।

কী ভাবছিস বল তো! অনেকক্ষণ চুপচাপ।

লজ্জা পেয়ে বিজু বলে, একটা স্পেল।

তার মানে কী?

কী যেন ভাবছিলাম একটা। ভুলে গেছি।

লুকোচ্ছিস।

না, সত্যিই ভুলে গেছি।

এবার চল একটু কেনাকাটা করি।

কী কিনবে?

কিছু ঠিক করিনি। শহরে যখন এসেই পড়েছি, মার জন্য কিছু নিয়ে যাই।

বড়মা! বড়মার জন্য আবার কী নেবে? জ্যাঠামশাই মারা যাওয়ার পর থেকে তো বড়মা একেবারে বৈরাগী হয়ে গেছে। দু হাতে কত জিনিস বিলিয়ে দিল। আমাকে কী দিয়েছে জানো?

কী রে?

জ্যাঠামশাইয়ের দুটো পার্কার কলম, একটা জেনিথ ঘড়ি, পুরনো একটা প্রিন্স কোট, দশটা রুপোর টাকা।

হ্যাঁ, মা যেন কেমন হয়ে গেছে।

আমি বলেছিলাম, জ্যাঠামশাইয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এগুলো রাখো। কী বলল জাননা?

কী?

বলল স্মৃতির কোনও চিহ্ন লাগে না। আমার বুক জুড়ে, চোখ জুড়েই তো লোকটা আছে। জিনিসগুলো বরং ভোগে লাগুক। এরকম ভালবাসা ভাবাই যায় না, কী বলো?

পারুল একটু হাসল। বলল, এরকম ভালবাসা আর আনুগত্যই তো তোরা পুরুষেরা চাস।

যা বলেছ। তবে চাইলেই তো হবে না। দেনেওয়ালারও তো ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে।

পুরুষেরা সবসময়েই কলোনিয়াল প্রভুদের মতো মেন্টালিটির হয় কেন রে? তারা রাজা, মেয়েরা প্রজা।

মাইরি পারুলদি, সেরকম হলে কিন্তু বেশ হত।

মারব থাপ্পড়। এখন ওঠ। খাবারের দাম আমি দিয়ে দিয়েছি।

আরেব্বাস! কখন দিলে?

তুই যখন হাঁ করে কার কথা ভেবে আনমনা ছিলি তখন।

যাঃ, কার কথা আবার ভাবলাম!

সে কি আর তুই আমাকে বলবি? তবে ঠিক বের করে নেব। গোয়েন্দা লাগাতে হবে।

ছাব্বিশ

চড়াই পাখিটা ছিল ব্যাচেলার। গত বছর দুয়েক ধরে তাকে লক্ষ করছে বিজু। তার দোতলার একটেরে ঘরে জানালার ধারে কাঠের আলমারির ওপর রাখা একটা পটের পিছনে সন্ধেবেলায় এসে আশ্রয় নিত। সকালে উড়ে যেত বিষয়কর্মে। বাসা-টাসা করেনি। কোনও ঝামেলা ছিল না তার।

পাখিটা মরল হারানির দোষে। দোষ কিছুটা মায়েরও। পাখিটা মরতে পারে এই ভয়ে ঘরের সিলিং ফ্যানটা কখনওই চালায় না বিজু। যদিও অভ্যাস ও স্বাভাবিক আত্মরক্ষার তাগিদে চড়াইপাখিরা সিলিং ফ্যান এড়িয়ে ওড়াউড়ি করতে পারে। তবু সাবধানের মার নেই। হারানিকে পই পই করে বলা আছে, ঘর মোছার পর শুকনোর জন্য যেন সিলিং ফ্যান না চালানো হয়। এখন শীতকাল, শুকনো জলীয় বাষ্পহীন বাতাসে চট করে ঘর শুকিয়ে যায়।

দোতলায় এই একটিই ঘর। তা বলে চিলেকোঠা নয়। আসলে একতলা হওয়ার পর দোতলাও তুলে ফেলছিল নরহরি। তিন ভাইয়ের মাথাতেই ছিট আছে। তাদের জীবনে মাপজোখ বা হিসেবনিকেশের বালাই নেই। তিনজনেরই ঝোঁকের ওপর চলা। আবার সঙ্গে চণ্ড মেজাজও আছে, কেউ কিছু তাদের বোঝাবে তার জো নেই। দোতলা যখন তেড়েফুঁড়ে উঠছে তখন বিজুর মা প্রমাদ গুনল। কারণ একতলাটাই পেল্লায়। পাঁচখানা শোওয়ার ঘর, বৈঠকখানা, দর-দালান সব হাঁ-হাঁ করছে। দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, আছে শুধু ছেলেটা। তিনটে প্রাণীর জন্য একতলাটাই তো বড্ড বড়। কিন্তু নরহরিকে সে কথা বোঝাবে কে? অগত্যা বিজুর মা গিয়ে মহিম রায়কে ধরে পড়ল, দাদা, আপনাদের ভাইকে একটু বোঝাবেন আসুন। কী কাণ্ড যে করছে। অত বড় একতলাটাই আমি সামাল দিতে পারছি না, দোতলা তো আমাদের গিলে খাবে। টাকারও শ্রাদ্ধ হচ্ছে।

মহিম রায় শুনে বলেছিল, বংশের ধারা যাবে কোথায় বউমা, সব যে এক ছাঁচে গড়া। ওদের মাথায় যা চাপে তা মানায় কার সাধ্য। গৌরদাকেও তো দেখি, উঠল বাই তো কটক যাই।

তা মহিম রায় এসেছিল।

নরহরি মহা আহ্লাদে নতুন বাড়ি তাকে ঘুরিয়ে দেখাল।

কেমন দেখছেন দাদা?

এ যে তাজমহল বানিয়ে ফেলেছিস!

কী যে বলেন! চিরকাল বড় বাড়িতে থেকে অভ্যেস তো, তাই একটু বড় করেই বানালাম।

তা বেশ। কিন্তু বড়রও তো একটা মাপ থাকবে, না কি?

কেন, একটু বেশি বড় বয়ে গেল নাকি?

ওরে আহাম্মক, বড় বাড়িতে ছিলি, তা সেখানে বড় সংসারও ছিল। জনমনিষ্যি ছিল। কিন্তু তোর জন কোথায়? পাঁচখানা শোওয়ার ঘর তোর কোন কাজে লাগবে? একটাতে স্বামী-স্ত্রী, একটাতে বিজু, আর দুখানা ঘরে দুই মেয়ে-জামাই এলে থাকবে—এ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আরও দুখানা শোওয়ার ঘর দিয়ে কী হবে?

আহা অতিথ-বিতিথও তো আসতে পারে। ও দুটো গেস্টরুম বলেই ধরে নিন।

ধরলুম। তাহলে দোতলাটা কী করবি?

নরহরি থমকাল। ভেবে-টেবে বলল, লেগে যাবেখন কাজে।

ওরে, এত বড় বাড়ি ভরতে গেলে যে তোকে আবার সংসার করতে হয় বাঙালের মতো। সেরকমই ইচ্ছে নাকি?

ছিঃ ছিঃ কী যে বলেন।

তাহলে আর টাকার শ্রাদ্ধ করিসনি। এ হল গ্রামদেশ, বাড়তি ঘরে যে ভাড়া বসাবি তাও হবে না।

গৌরদা তোকে পৈতৃক বাড়ির ক্ষতিপূরণ বাবদ অনেক টাকা দিয়েছে জানি, কিন্তু সব টাকাই যে ঢালতে হবে তার কোনও মানে নেই। টাকাটা হাতে রাখ।

সেটা কি দাদার সঙ্গে বেইমানি হবে না?

দুর পাগল! গৌরদা কি বলে দিয়েছে সব টাকা ঢেলে এত বড় বাড়ি করতে? যা না, গৌরদার সঙ্গেই কথা বলে দেখ।

গৌরহরি অবশ্য মহিমের মতে মত দেননি। নরহরির কাছে সব শুনে-টুনে বলেছিলেন, মহিমটা হল চিটেগুড়ের পিঁপড়ে। হিসেবনিকেশ ছাড়া এক পা চলে না। ঠিক আছে, বাড়ি কেমন হল আমি কাল গিয়ে দেখে আসব।

গৌরহরি সব দেখেশুনে অবশ্য রায় দিলেন, আজকাল কাজের লোকের খুব সমস্যা শুনতে পাই। এতগুলো ঘর ঝাড়পোঁছ করতে বউমার কষ্ট হবে। দোতলাটা বরং থাক।

নরহরি বলল, তোমার দেওয়া টাকার যে অনেকটাই তাহলে থেকে যাবে। ও টাকা তাহলে ফেরত নাও।

গৌরহরি গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, গৌর চাটুজ্জে দেওয়া জিনিস কখনও ফেরত নেয় দেখেছিস? টাকা আছে থাক। ওটা আমার আশীর্বাদ।

দোতলাটা তাই আধখ্যাঁচড়া হয়ে রইল। একখানা বড় ঘর, লাগোয়া বাথরুম। বাকিটা খোলা ছাদ। ছাদের চারদিকে পিলারের মাথা শিকসমেত খাড়া হয়ে আছে। রেলিং নেই।

দোতলার ঘরটা দখল করেছিল বিজু। ভারী নিরিবিলি তার এই ঘর। সারাদিন শব্দহীন এই ঘরে তার সারি সারি বন্ধু হল র‍্যাক ভর্তি বই। গল্পের বই ছাড়াও আছে বিজ্ঞান আর আইনের বই। ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিস শুরু করার পর থেকে সেইসব বইও বিস্তর ঢুকেছে। আর আছে মিউজিক সিস্টেম, কম্পিউটার, অসময়ে চা খাওয়ার জন্য স্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম।

চড়াইপাখিরা বাসা বাঁধবার কম চেষ্টা করেনি এ-ঘরে। কিন্তু একবার বাসা বাঁধলে ঘরদোর নোংরা হতে শুরু করবে বলে বাসা ভেঙে দেওয়া হত। বারবার বাধা পেয়ে চড়াইপাখিরা হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন একতলার ফাকা ঘরগুলোর ঘুলঘুলিতে তারা দিব্যি জাঁকিয়ে আছে।

শুধু এই একটা পাখিই দলছুট হয়ে থেকে গিয়েছিল। এ বাসা-টাসা বানানোর চেষ্টাই করেনি। একা একা থাকত। যখন-তখন আসত যেত। কাঠের আলমারির ওপর একখানা কালীঘাটের পট রয়েছে কতকাল। তারই পিছনে রাত কাটাত। বিজুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হত প্রায়ই। বিজু তার নাম দিয়েছিল ব্রহ্মচারী।

জানালার ধারে নিজের টেবিলচেয়ারে বসে পড়াশুনো করার সময় কতবার ব্রহ্মচারী তার কাঁধের ওপর দিয়ে যাতায়াত করেছে। খুব একটা ভয় পেত না তাকে। পাখিরাও শত্রুমিত্র চেনে, পছন্দ বা বিদ্বেষ বুঝতে পারে। ব্রহ্মচারীকে সে নানাভাবে নির্ভয় করার চেষ্টা করেছে। তবে মাঝে মাঝে হুমকি দিত। একা থাকো, ওয়েলকাম। কিন্তু গার্লফ্রেন্ড জোটালে মুশকিল আছে।

ব্রহ্মচারী মারা পড়ল ভোরবেলা। তখন বিজু বাথরুমে। ওই সময়েই হারানি এল ঘর ঝাড়পোঁছ করতে। পিছনে মা।

শীতকাল বলে জানালা বন্ধ ছিল। সেটা খুলে দেওয়ার কথাটাও মনে ছিল না কারও। ঘর ঝাঁট দিয়ে জল-ন্যাতায় যখন ঘর মুছছিল হারানি তখন মা বলল, ওরে ছেলেটা এখনই বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসবে। ভেজা মেঝেতে পায়ের ছাপ পড়বে। পাখাটা খুলে দে, তাড়াতাড়ি শুকোক।

আর ব্রহ্মচারী তখন ঘরে আগন্তুকের সাড়া পেয়ে বাইরে বেরোবার জন্য পটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চক্কর কাটছিল বাতাসে। ফুল স্পিডে পাখা খুলে দিয়েছিল হারানি। আর বলেছিল, হুশ, হুশ...

বিভ্রান্ত ব্রহ্মচারী ভয় খেয়ে পাখার চক্করে গিয়ে একটিমাত্র টং শব্দ তুলে ছিটকে পড়েছিল মশারির চালিতে। শবদেহ। ওইটুকু পাখি কি পারে অত বড় চোট সহ্য করতে? কতটুকু শরীর তার? কতই বা প্রাণশক্তি?

বাথরুম থেকেই ঘটনাটা আঁচ করতে পেরে বিজু চেঁচিয়ে বলেছিল, পাখা বন্ধ করো! পাখা চালিও না।

সে কথা শুনতেই পায়নি কেউ।

যখন বেরিয়ে এল তখন অপরাধী মুখ করে মা দাঁড়িয়ে। হারানি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে মৃত পাখিটাকে খুঁজছে।

লম্বা বিজু একবার দৃষ্টিক্ষেপেই ব্রহ্মচারীর মৃতদেহটা দেখতে পেয়েছিল। হাত বাড়িয়ে পাখিটাকে করপুটে নিয়ে মায়ের দিকে চেয়ে সে শোকাহত গলায় বলল, কী করলে বল তো মা?

কী করব বল! বোকা পাখিটা যে ওরকম পাগলের মতো ওড়াউড়ি করবে তা কি জানতুম! পাখা তো বন্ধ করেছিলাম, কিন্তু তার আগেই—

হারাণি মুখ নিচু করে ঘর মুছে যাচ্ছিল। সেও জানে, কাজটা ঠিক হয়নি।

বিজু তার দিকে চেয়ে বলল, দুঃখের কথা কী জানিস হারাণি? মানুষ মারলে ফাঁসি বা যাবজ্জীবন হয়, কিন্তু পশু-পাখির বেলায় হয় না। আইনে থাকলে আজ তোরও ওরকম সাজা হতে পারত।

হারানি অতি ছলবলে ও ফিচেল এক কিশোরী। দীপ্ত ডাগর চেহারা। টানা টানা চোখ, মুখের ঢৌলটিও চমৎকার। বিজুর প্রতি তার বয়সোচিত আকর্ষণ যে আছে তা সে প্রায়ই কটাক্ষে প্রকাশ করে। একটু-আধটু ঠাট্টাইয়ার্কি করতেও ছাড়ে না। আজ বুঝল, সে একটা ঘোরতর অন্যায় করে ফেলেছে।

করুণ মুখ তুলে বলল, আমার খুব পাপ হল, না?

খুব পাপ করেছিস। পাখিটা আমার বন্ধু ছিল।

তুমি রাগ করলে দাদা! কিন্তু পাখিটা যে কেন অমন ভয় খেল!

ভয় তো খাবেই। ওরা যে তোদের বিশ্বাস করতে পারে না।

ভারী ছলছলে হয়ে গেল হারানির চোখ। আর একটিও কথা না বলে ঘর মোছা শেষ করে উঠে হাত বাড়িয়ে বলল, দাও।

বিজু তখন চেয়ারে বসে করপুটে ধরা ব্রহ্মচারীর মৃত শরীরের দিকে চেয়ে ছিল। বলল, কী চাস?

পাখিটা দাও।

কী করবি?

দাতাবাবার কাছে নিয়ে যাব।

সে কে?

একজন গুণীন।

অবাক হয়ে বিজু বলে, সে কী করবে?

সে মরা জিনিস বাঁচাতে পারে।

ধুস। এখন যা, আমার মন ভাল লাগছে না।

মা যায়নি। দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। বলল, দে না ওকে। গুণীন-টুনিনরা তো অনেক কিছু পারে।

কী যে সব আনসায়েন্টিফিক কথা বলো তার ঠিক নেই।

চেষ্টা করতে দোষ কী? দুনিয়ায় কত কিছু হয়, আমরা কি তার খোঁজ রাখি!

এসব করে কি আমাকে ভোলাতে পারবে? আমি তো আর বাচ্চা ছেলে নই।

হারানি হাতটা বাড়িয়েই ছিল। বলল, দাও না আমাকে।

বিরক্ত বিজু মৃত পাখিটা ওর হাতে দিয়ে বলল, গুণীনের কাছে যেতে হবে না। মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দিস।

সকাল থেকে মনটা বড় খারাপ বিজুর। তার নির্জন ঘরে পাখিটার আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেল। যতদিন না আর কোনও ব্রহ্মচারীর আগমন ঘটে।

পিছনে বিরাট বাগান করেছে নরহরি। ওটা তার বরাবরের নেশা। বাগানে সবজি ফলাবে। যত না খাবে তার বহুগুণ বেশি বিলোবে। মুলো, পালং, কপি, আলু অবধি। এই সময়টায় বাবা বাগানে বহুক্ষণ কাটায়। সঙ্গে জনা দুই মুনিশ থাকে। ঘরের জানালাগুলো খুলে দিল বিজু। পুবের জানালা দিয়ে শীতের রোদ এসে পড়ল অনেকখানি মেঝে আর বিছানা জুড়ে।

মা মশারি খুলে ভাঁজ করে রেখে বিছানায় বেডকভার ঢাকা দিতে দিতে বলল, অমন মন খারাপ করে বসে আছিস কেন? মানুষ তো মশা-মাছিও মারে। পায়ের তলায় পিঁপড়েও তো মরে। তা বলে কি পাপ হয় নাকি?

বিজু জবাব দিল না। মাকে নিয়েও তার সমস্যা বড় কম নয়। তার মা হল পুত্রগতপ্রাণ। ছেলের প্রতি মার পক্ষপাত দৃষ্টিকটু পর্যায়ের। তার দুই দিদিই বহুবার কথাটা বলেছে। বিয়ের আগে মাঝে মাঝে বিজুকে নিয়ে মার সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি বাধত তাদের। দিদিদের যুক্তি যথেষ্ট জোরালোই ছিল। বিজু মাকে কতদিন বকেছে, তোমার এত পারশিয়ালিটি কেন মা?

আজও, ছেলের প্রতি মার ওই দুরারোগ্য পক্ষপাত বিজুকে বিরক্তই করে। বিজু একটু চুপ করে বসে থাকলে, বাড়ি ফিরতে একটু দেরি করলে বা কোথাও ট্রেকিং কি বেড়াতে গেলে মা অস্থির হয়ে পড়ে। তার মার জন্যই সে আজ অবধি অনেক ইচ্ছেকে চেপে রেখে দিয়েছে।

টান ভালবাসা যে মানুষকে কখনও কখনও কত অপদার্থ করে দেয় তা বিজু ভালই জানে। দশ-বারো বছর বয়স অবধি সে নিজের হাতে খেতে পারত না, পোশাক পরতে পারত না। এই যে সে দোতলার ঘরে একা থাকে তাতে মার স্বস্তি নেই। দিনে শতেকবার নানা ছুতোয় এসে তাকে দেখে যায় মা। সবসময়ে সামনে আসে না, সবসময়ে জানান দেয় না। কিন্তু গোয়েন্দার মতো নজর রাখে। তার এই ঘরের একাকিত্ব আজও নিরঙ্কুশ নয়।

মাঝে মাঝে মার ওপর রেগে যায় বিজু। আবার মায়াও হয়।

সে মার দিকে চেয়ে বলল, এখন আমাকে একটু একা থাকতে দাও তো। আমার ভাল লাগছে না।

মা চলে যাওয়ার পর খোলা ছাদে রোদের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায় বিজু। মন ভাল নেই। মন ভাল নেই। দুদিন ঝড়জলের পর আজ ভারী সুন্দর দিন। তীব্র উত্তরে বাতাস আর রোদ মিলে ঝলমল করছে একটা ধোয়ামোছা সকাল। গাছে গাছে বাতাসের ঝোড়ো শব্দ। চারদিকে পাখির ডাক। মন ভাল নেই।

এই যে এত সহজেই তার মন খারাপ হয়ে যায়, এটা সুলক্ষণ নয়। আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন, ব্যক্তিগত মৃত্যুচিন্তা আমার নেই। কারণ চারদিকে যে প্রাণের লীলা, প্রাণের এত প্রকাশ তার মধ্যেই আমিও একজন মাত্র। আমি এই প্রাণবন্যারই একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

কী বলতে চেয়েছিলেন তিনি? সে কি এই যে, একটাই সত্তার প্রকাশ ঘটছে ঘটে ঘটে, নানা বিভঙ্গে, মূর্তিতে, আকারে, বিশিষ্টতায়? এই যে ব্রহ্মচারী আজ মারা পড়ল এটা কিছু নয়। একটি প্রাণ নিবে গেলেও যৌথ প্রাণ জেগে আছে? কিংবা এরকমই কিছু?

বিজুদা! এই বিজুদা!

কে রে?

আমি। ন্যাড়া ছাদের ধারে এগিয়ে গিয়ে বিজু দেখে, পান্না। ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে চোখের রোদ আটকাচ্ছে।

কী রে?

একটু ওপরে আসব?

আয় না! অনুমতি নেওয়ার কী হল?

কী জানি বাবা। ছোটমা বলল, পাখি মরেছে বলে তোমার নাকি মন খারাপ।

তা খারাপ একটু আছে। মা কি তোকে আসতে বারণ করল নাকি?

না। শুধু বলল, মেজাজ বিগড়ে আছে, বুঝেসুঝে যাস।

আসতে পারিস।

তোমার বাঁদরটা কি ওপরে নাকি?

আরে না। ও তো রাতেরবেলায় গোয়ালে বাঁধা থাকে।

ভারী অসভ্য বাঁদর।

কেন রে?

বাঃ রে, সেদিন তোমার কাঁধ থেকে নেমে আমাকে তাড়া করেছিল না?

তুই ওকে ক্ষ্যাপাচ্ছিলি বলেই তাড়া করেছিল। এমনি নয়।

বাঁদরকে সবাই ক্ষ্যাপায়।

তাহলে তাড়াও খেতে হয়।

আসছি, দাঁড়াও।

পান্না ওপরে উঠে এল।

এই সাতসকালে কী এমন কথা রে তোর?

তোমার তো ইন্টারনেট আছে, তাই না?

ইন্টারনেট! পাগল নাকি? তোর কি ধারণা পশ্চিমবঙ্গে গাঁয়ে গাঁয়ে ইন্টারনেট পৌঁছে গেছে?

এ মা! আমি যে একজনকে বললাম তোমার ইন্টারনেট আছে!

কাকে বললি?

সেটা বলা যাবে না। কারণ আছে। নেই তাহলে?

না। ইন্টারনেট দিয়ে কী হবে?

একটা ওয়েবসাইট ধরতে হবে।

কোন ওয়েবসাইট?

ডিপ্রেশন ডট কম।

ডিপ্রেশনটা কার হল? তোর নাকি?

ডিপ্রেশন কার নেই বলো। আমার, তোমার, সকলেরই আজকাল খুব ডিপ্রেশন। এই যে চড়াইপাখিটা মরে গেল তুমি ডিপ্রেসড।

চড়াইপাখিটা আমার একজন ভাল বন্ধু ছিল, জানিস? আসত, যেত, কোনও ঝামেলা ছিল না। ভদ্র, সভ্য, একা একটা পাখি।

বাব্বাঃ, তোমার যে কাব্য বেরোচ্ছে বিজুদা! ক্রৌঞ্চমিথুনের দুঃখে বাল্মীকির যেমন ধারা হয়েছিল।

তোর মাথা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পান্না বলে, একটা পাখির জন্য তোমার যা দরদ তার একশো ভাগের এক ভাগও যদি আমাদের জন্য থাকত।

কেন রে, তোর আবার আলাদা দরদের দরকার হল কেন? দিব্যি তো আদরে আহ্লাদে বখা হয়ে যাচ্ছিস। কাকা আর কাকিমা আসকারা দিয়ে মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছে।

আহা, আর বোলো না। বাবা মা দেবে আমাকে আসকারা! উঠতে বসতে মা চুলের মুঠি ধরতে আসে, জানো? আর বাবা তো কবেই আমাকে বেড়াল পার করতে চেয়েছিল গৌরীদান করে। সব ভুলে গেছ?

তাই তো! তোর তো তবে বড্ড দুঃখ।

ইয়ার্কি কোরো না, ভাল লাগে না।

তোতার মাথা আরও একজন চিবিয়ে খাচ্ছে।

ওমা! আবার কে চিবিয়ে খাবে গো! আমি কি রুইমাছ নাকি যে সবাই আমার মুড়ো চিবোবে!

রুইমাছ নোস, তুই হচ্ছিস হদ্দ বোকা আর গেঁয়ো একটা মেয়ে।

কেন ওকথা বলছ! আমার যে ভয় লাগছে!

ভয় লাগছে না হাতি! ও মেয়েটার সঙ্গে তোর অত মাখামাখি কীসের?

কোন মেয়ে? কার কথা বলছ?

কার কথা বলছি ভালই জানিস।

বুঝেছি। সোহাগ তো!

ও মেয়েটার নামে নাকি তোর নাল গড়ায়! এই তো সেদিন কাকিমা বলছিল, রাত নেই দি নেই যখন-তখন এসে হামলে পড়ে। তারপর দরজা বন্ধ করে গুজগুজ ফুসফুস।

যাঃ, মোটেই না। মা ওরকমই। তিল থেকে সবসময়ে তাল বের করে।

তার মানে কি সোহাগ তোর কাছে আসে না?

আসবে না কেন? মাঝে মাঝে আসে।

এসে তোর পড়াশুনো নষ্ট করে?

মোটেই না। খুব এটিকেট মেনে চলে। ও আসে দুপুরবেলা, তখন আমি পড়ি না।

কী মন্ত্রে দীক্ষিত করছে তোকে?

যাঃ, কী যে বলো না। সোহাগ খুব ভাল মেয়ে। খুব দুঃখী। একটু পাগলাটে আছে বটে, কিন্তু খারাপ নয় তো! তোমার বাপু, সোহাগের ওপর বড্ড বেশি রাগ।

অকারণে রাগ তো নয়। যেসব ছেলেরা ওর পিছনে লাগত, আজকাল দেখছি তাদের সঙ্গে মাঠেঘাটে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

তাতে কী হয় বিজুদা? ছেলেগুলোর সঙ্গে ভাব করায় ওরা আর তো ওর পিছনে লাগে না।

মাঝখান থেকে ছেলেগুলোকে শাসন করতে গিয়ে আমিই আহাম্মক হলাম। ডিসগাস্টিং।

রাগ করছ কেন? দোষটা ওর নয়।

তবে কার?

একটু ভেবে পান্না বলল, বোধহয় আমার।

তোর দোষ কেন হবে?

ছেলেগুলো একদিন আমার সামনেই ওকে যা-খুশি বলছিল। তাতে আমি ভীষণ রেগে গিয়ে তোমার কাছে নালিশ করে দিই। সোহাগ কিন্তু বারণ করেছিল।

জানি। বড়মার কাছেও বলে গেছে ওর নাকি আমার সাহায্যের দরকার নেই। খুব দেমাক। এখন হয়তো আমার মুখে চুনকালি মাখানোর জন্যই ওই ছেলেগুলোকে জুটিয়ে মক্ষীরানি সেজেছে।

ওর ওপর তোমার খুব রাগ, না?

কথাটা দুবার বললি। রাগ হওয়ার কারণ ঘটলেই রাগ হয়।

কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। সোহাগ বলে, পৃথিবীর সব জায়গায় তো বডিগার্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যাবে না। তাই মেয়েদের নিজেদেরই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আর আত্মরক্ষার সবচেয়ে ভাল উপায় হল শত্রুকে বন্ধু করে নেওয়া।

বেশ কথা। মেয়েদের বন্ধু জোটাতে সময় লাগে না, বিশেষ করে যদি একটু চটক থাকে। ও যেসব ছেলেদের সঙ্গে মেশে তারা কী ধরনের ছেলে তা কি ও জানে? তা ছাড়া এসব বেলেল্লাপনা কি গাঁদেশে চলে?

দিনকাল পালটে গেছে বিজুদা।

কবে পালটাল? আর পালটালে তুই টের পেলি, আমি পেলাম না কেন?

বড্ড রেগে আছ তুমি। আজ পাখিটা মরে যাওয়ায় সত্যিই তোমার মাথা গরম।

হ্যাঁ, গরম। আজ আমার মন ভাল নেই। পাখি, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, গাছপালা এসব নিয়েই পৃথিবীর পরিমণ্ডল। সবাইকেই পৃথিবীর দরকার। নইলে এত সব প্রাণীর বৃথা সৃষ্টি হত না। মানুষ সেটা বুঝতে বড় সময় নিচ্ছে। ওই যে লোকটা—কী নাম যেন— জিম করবেট, তাকে প্রায় মহাপুরুষ বানানো হয়েছে। লোকটার শিকারকাহিনী এখনও রাশি রাশি বিক্রি হয়। লোকটার মস্ত কৃতিত্ব হল বন্দুক দিয়ে বাঘ মারা। এটা কোনও বীরত্বের কাজ? আমি সেসময়ে ক্ষমতায় থাকলে লোকটিকে দেশ থেকে বের করে দিতাম। ওরা হচ্ছে সেই জাত যারা বছরে একবার শেয়াল মারার উৎসব করে।

ওঃ, আজ তুমি বড্ড রেগে আছ বিজুদা।

রাগলে কী হবে? এ হল ফান্টুস রাগ। এ রাগ দিয়ে কাজ হয় না। শুধু হাত কামড়ে মরি। পাখিটা মরল কেন জানিস? মা আর হারানির বুদ্ধির দোষে। পাখাটা চালানোর দরকার ছিল না, জানালাটা খুলে দেওয়া উচিত ছিল। বেরোতে না পেরে পাখিটা ভয় খেয়ে দিশেহারা হয়ে পাখাটায় ধাক্কা খেল। হি ওয়াজ গুড ম্যান।

ম্যান?

আমার কাছে পাখিটা তাই ছিল। এ ম্যান, এ জেন্টেলম্যান।

মেয়ে পাখিও তো হতে পারে।

তা পারে।

মেয়েই হবে।

কী করে বুঝলি?

হি হি করে হেসে পান্না বলে, ওটা ছিল তোমার গার্লফ্রেন্ড।

মারব থাপ্পড়। যা ভাগ এখন।

ওয়েবসাইটটার কী হবে?

কিছু হবে না। তোর বন্ধুকে কলকাতায় যেতে বল।

আচ্ছা, একটা কথা বলবে?

আবার কী কথা?

সেদিন বৃষ্টির মধ্যে তোমাদের ভিতর কী হয়েছিল?

আচমকা বিজুর কান গরম হয়ে গেল। মুখখানা লাল। পান্নার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল সে।

বিজু ভেবেছিল, দৃশ্যটা কেউ দেখেনি। ক্ষীণ আশা ছিল, সোহাগ কাউকে ঘটনাটার কথা বলবে না। তাই ধরা পড়ে গিয়ে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে তার।

বিজু বলল, কেন বল তো! তোকে সোহাগ কিছু বলেছে?

খুব বেশি বলেনি।

কী বলেছে?

বলেছে, তোমাদের মধ্যে একটা বিচ্ছিরি ইনসিডেন্ট হয়েছে।

ওভাবে বললে লোকে অন্য কিছু ধরে নিতে পারে।

তোমরা কি ঝগড়া করেছ?

বরং ঝগড়াই ভাল ছিল। এটা তার চেয়েও খারাপ।

কী হয়েছিল বিজুদা?

মেয়েটা যে পাগল তা জানিস?

আছে একটু। সকলের মতো তো নয়। ও একটু অন্যরকমভাবে চিন্তাভাবনা করে।

পাগলরাও তো তাই। তারা আর পাঁচজনের মতো নয়, তাদের চিন্তার জগৎ আলাদা। তাই তো!

পায়ে পড়ি, বলো না!

মেয়েটা সেদিন ওই ঠান্ডায় আর ভয়ংকর বৃষ্টির মধ্যে কাঞ্জিলালের জমিটায় নেচে বেড়াচ্ছিল।

হ্যাঁ, এরকম সব কাণ্ড ও করে তো।

দোষের মধ্যে আমি গিয়ে ওকে অ্যালার্ট করার চেষ্টা করি।

ভালই তো করেছিলে।

করুণ একটু হেসে বিজু বলল, ভাল আর হল কই? আমি বারবার ডাকছিলাম। সাড়া না পেয়ে গিয়ে হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতেই ও কেমন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারপর উঠে সে কী রাগ! পাগল আর কাকে বলে!

একটু চুপ করে থেকে পান্না বলল, হ্যাঁ, ওর নাকি মাঝে মাঝে একটা ট্রান্সের মতো হয়। সে সময়ে কেউ ওকে ধরলে অজ্ঞান হয়ে যায়।

ও হল মৃগি রোগ, বুঝলি! মৃগির সঙ্গে পাগলামি।

সবাই তো একরকম হয় না বিজুদা। ও ওর মতো।

বন্ধুর হয়ে ওকালতি করতে এসেছিস?

তা নয়। একটু বুঝবার চেষ্টা করো। ও খুব দুঃখী একটা মেয়ে।

দুঃখী!

খুব দুঃখী। তুমি বুঝবে না বিজুদা। মা-বাবার কাছ থেকে ও কোনও প্রশ্রয় পায় না। খুব অশান্তি ওদের সংসারে। সবাই নাকি সবাইকে ঘেন্না করে।

আমার ওসব জেনে কী হবে?

একটু চুপ করে থেকে পান্না বলে, ও তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

নাটক নাকি?

সত্যিই চেয়েছে।

আর নাটকের দরকার নেই। ঘটনাটা আমি ভুলে যাব।

ওকে কী বলব?

কিছু না।

সাতাশ

চোখ চেয়েই জানালার বাইরে একজোড়া চোখ দেখতে পেল সে। চমকে উঠল। জানালার কপাটের আড়ালে লুকোনো মুখ। শুধু দুখানি চোখ নিবিড় দৃষ্টিতে চেয়েছিল। সে তাকাতেই সরে গেল টপ করে। সঙ্গে কাচের চুড়ির একটু ঠিন ঠিন শব্দ।

কে ওখানে?

প্রথমে জবাব নেই।

গায়ের লেপটা সরিয়ে উঠতে উঠতে সে ফের প্রশ্ন করে, কে রে?

ক্ষীণ জবাব এল এবার, আমি।

আমি কে?

আমি হিমি।

বড্ড সাহস হয়েছে তো মেয়েটার! গত কয়েকদিন শুধু বারবার এ-বাড়িতে নানা ছুতোয় হানা দিয়েছে আর সুযোগ পেলেই হাঁ করে দেখেছে তাকে। মুচকি হাসি, চোখের ইশারাও শুরু হয়েছে ইদানীং। কিন্তু এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি!

আজ কেউ বাড়িতে নেই। বাবা গেছে মরণ, হাম্মি আর মরণের মাকে নিয়ে বর্ধমানে কী সব গেরস্থালির জিনিস কেনাকাটা করতে। ফাঁকা বাড়িতে আছে শুধু দুটো কাজের মেয়ে, গোটাকয় মুনিশ আর কুকুর বেড়াল। এই অবস্থায় মেয়েটা কেন এল?

কী চাও?

এমনিই এসেছিলাম। খুড়িমা নেই?

ওরা যখন বর্ধমানে রওনা হচ্ছিল তখন দোতলা থেকে হিমিকে সদর দরজার আগলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সুমন। ন্যাকা! জানে না যেন!

না, নেই।

মেয়েটা চুপ। সুমন টের পেল, এখনও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েদের অভিজ্ঞতা সুমনের কম নেই। নারীসঙ্গ তার প্রিয়। কলকাতায় তার একগাদা মেয়েবন্ধু আছে। বলতে কী, ছেলেবন্ধুর চেয়ে তার মেয়েবন্ধুই বেশি। এখানে এসে অবধি সে নারীসঙ্গের একটু অভাববোধ করছে ঠিক। সে অভাব মেটানোর সাধ্য তো হিমির নেই। একটা সুন্দর চেহারার ছেলে দেখে ঢলে পড়া এবং বিয়ের লাইনে চিন্তা করা ছাড়া ওসব মেয়ের মন আর কোনও চিন্তা করতে পারে না। এইট না নাইনে পড়ে বলে শুনেছিল যেন একবার।

সুমন একটু ভাবল। একটা ধমক দিলেই মেয়েটা চলে যাবে। কিন্তু ধমক না দিয়ে ডেকে একটু কথা বললে কেমন হয়? ঠিক এই ক্লাসের কোনও মেয়ের সঙ্গে তো তার বন্ধুত্ব হয়নি।

ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভিতরে এসো।

মেয়েটা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আসব?

এসো। ডাকলাম তো!

খুব বাধো বাধো পায়ে মেয়েটা এসে দরজার ফ্রেমে দাঁড়াল। পশ্চিমের জানালা দিয়ে শীতের ঢলানি রোদ অনেকটা মেঝে পার হয়ে দরজার কাছে গিয়ে থেমেছে। সেই আলোয় সুমন দেখল, মেয়েটা এই দুপুরেও একটু সেজেছে। জংলা ছাপা শাড়ি, কপালে টিপ, চুল বিনুনিতে বাঁধা। ঠোঁটে একটু লিপস্টিকও কি? এতদিন তাচ্ছিল্যে তাকায়নি সুমন ভাল করে। এখন দেখল, সুন্দরী না হলেও হ্যাক ছিঃ নয় মোটেই। যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা।

চৌকাঠে থমকে গেছে মেয়েটা। আর এগোতে সাহস পাচ্ছে না।

সুমন বলল, আরে এসো, এসো।

মেয়েটা কেমন থতমত খেয়ে একটু হাসল, মাথা নত করল।

হঠাৎ এই দুপুরে এলে যে! কী ব্যাপার?

সুমন ধমকায়নি। কড়া গলাতেও বলেনি। মেয়েটা তবু যেন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আমাকে পাঠাল যে!

সুমন অবাক।

পাঠাল! কে তোমাকে পাঠাল?

দিদিমা।। দিদিমা? কে দিদিমা?

মরণের দিদিমা, জিজিবুড়ি।

সুমন জিজিবুড়িকে দেখেছে। রোগা চেহারার একজন বিধবা মহিলার আনাগোনা আছে এ বাড়িতে। সুট করে আসে, আর ফুট করে চলে যায়। গতিবিধি কিছুটা সন্দেহজনক। মহিলা কে তা বুঝতে না পেরে একদিন সে মরণকে জিজ্ঞেস করেছিল, বুড়িটা কে রে?

ও তো জিজিবুড়ি।

জিজিবুড়ি আবার কে?

আমার দিদিমা। আমি জিজিবুড়ি বলে ডাকি।

ওঃ। বলে আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি সুমন।

মরণ নিজের থেকেই বলল, জানো তো, জিজিবুড়ি রোজ দুধ খেতে আসে আর মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে।

ঝগড়া করে কেন?

ক্যাট ক্যাট করে অনেক কথা শোনায় মাকে। বলে মার সঙ্গে নাকি বাবার মোটে বিয়েই হয়নি। ও বিয়ে নাকি ভড়ং।

বাবার দ্বিতীয় বিয়েটা সম্পর্কে সুমনের তীব্র বিদ্বেষ আছে। যখন তার বাবা বিয়েটা করেছিল তখন সুমনের বয়স কম। ফুঁসে উঠবার মতো ব্যক্তিত্ব তখনও অর্জন করেনি সে। বাড়িতে যে বিশাল গণ্ডগোল হয়েছিল, মা আর বাবার মধ্যে, তার অনেকটারই সাক্ষী ছিল সে। তার মা তার বাবাকে এত গালাগাল করেছিল যে বলার

না। পুলিশ এসে বাবাকে ধরেও নিয়ে গিয়েছিল। রসিক সাহা জামিন না নিয়ে কিছুদিন পুলিশের হেফাজতে থেকেও গিয়েছিল। সেটা বোধ হয় বাড়িতে অশান্তি এড়ানোর জন্যই। তারপর অবশ্য কাজ কারবার লাটে উঠছে দেখে জামিন নিয়ে বেরিয়ে আসে। বাড়িতে টিকতে না পেরে কোনও আত্মীয়বাড়িতে গিয়েও কিছুদিন ছিল। বাড়িতে মায়ের তখন পাগলের মতো অবস্থা। কখনও কাঁদে, কখনও বাসন-কোসন ছুড়ে ভাঙে, কখনও তাদের ভাইবোন দুটোকে অনর্থক পেটায় আর পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে ভ্যাড়ভ্যাড় করে বাবার কীর্তি কাহিনী বলে। প্রথম প্রথম পাড়ার মেয়েরা দল বেঁধে শুনতে আসত। কিছু দিন পরে অবশ্য একই কথা শুনতে শুনতে তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়তে থাকে। এমন দুঃসময় তাদের জীবনে আর আসেনি। শেষ অবধি কালক্রমে ধীরে ধীরে চেঁচামেচি কমতে লাগল। বাবাও বাড়ি ফিরতে পারল একদিন। বাইরের উত্তেজনা কমলেও পরিবারটা আর স্বাভাবিক রইল না। তাদের চারজনের যে পরিবারটি ছিল তার বাইরেও যে আর একটা লজ্জার সম্পর্ক তৈরি হয়ে রইল সেইটে মেনে নিতে বা সয়ে নিতে সময় লাগছিল তাদের। বাবাকে তখন তার খুব অপছন্দ হত।

তার বাবা অনেকদিন মায়ের ভয়ে গাঁয়ে আসেনি। তখন একবার খবর পাওয়া গেল যে, গাঁয়ের বিষয় সম্পত্তিতে লুটমার হচ্ছে। বাবার দ্বিতীয় বউ সামলাতে পারছে না। তার বাবা বিষয়ী, একরোখা লোক। দেশভাগ হয়ে ঠাঁইনাড়া মানুষের দঙ্গলে মিশে এদেশে এসে বহু কষ্ট করেছে। ক্যাম্পে থাকার সময় ভিক্ষে অবধি করেছে পেটের দায়ে। তারপর নিজের রোখে উঠে দাঁড়িয়েছে। এইসব লোকের কাছে বিষয়সম্পত্তি হল প্রাণ। তার বাবা মায়ের রাগের তোয়াক্কা না করে ছুটে এল গাঁয়ে। মারধর খেয়েছিল, শত্রুতাও কম হয়নি। গোটা তিন চার মোকদ্দমাও লড়তে হয়েছে। কিন্তু রসিক সাহা হার মানেনি।

এই যে সুমনের হঠাৎ গাঁয়ে আসা এর পিছনেও তার মায়ের প্ররোচনা আছে। দশ-বারো বছর ধরে রসিক সাহার একটা সিস্টেম তৈরি হয়েছে। সপ্তাহান্তে শনিবার সে গাঁয়ে আসে দ্বিতীয় পক্ষের কাছে। সোমবার ফিরে যায়। এই নিয়েও বাড়িতে প্রথম প্রথম কুরুক্ষেত্র বড় কম হয়নি। শুক্রবার রাত থেকে মায়ের মাথা গরম হত। সে কী চেঁচামেচি আর শাপশাপান্ত। একবার একটা ভারী তালা ছুড়ে মেরে তার বাবার থুতনি ফাটিয়ে দিয়েছিল। তবু রসিক সাহার সিস্টেম ভাঙেনি। এখন সব গা সওয়া হয়ে গেছে। মা তাকে কয়েকদিন ধরেই বলছিল, একবার যা, গিয়ে দেখে আয় সেই বেশ্যাটার তবিলে কত টাকা ঢালছে।

সুমন রাগ করে বলেছিল, আমি যাব কেন? তোমার জানার হলে তুমি যাও।

আমি! আমি গেলে যে ওকে খুন করে আসব।

তা হলে আমাকে পাঠাতে চাইছ কেন?

তোদের ভালর জন্যই চাইছি। শেষ অবধি যদি সবই ওই মাগীর গর্ভে যায় তা হলে তোদের কী হবে?

আমাদের জন্য তো বাবা কম করছে না!

ছাই করছে। আমি জানি, ওই মেয়েমানুষটার পিছনে আরও টাকা ঢালছে।

ঢালুক। আমি যেতে পারব না।

ঢাললেই হল! আমি উকিলের সঙ্গে কথা কয়েছি। দ্বিতীয় বিয়েটা বিয়েই নয়। ওসব বিষয়সম্পত্তিও আমাদেরই। তুই গিয়ে শুধু ওদের মতলবটা বুঝে আয়।

রোজ এইসব কথা শুনতে শুনতে অবশেষে সুমন রাজি হয়েছিল। এখানে এসে অবধি সে এখনও কিছু বুঝতে পারে না। দিব্যি একটা পাড়াগাঁয়ের গেরস্থের সংসার। বাবার দ্বিতীয় বউকে খুব অপছন্দ হবে বলে মনে হয়েছিল সুমনের। কিন্তু কাছে এসে দেখছে মহিলা ভারী ভিতু আর নিরীহ। আজ অবধি উঁচু গলায় কথা কইতে শোনেনি। আর মহিলা সুমনকে সবসময়ে খুশি করতে একটা প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিছু খারাপ লাগছে না সুমনের। মানুষের দুবার বিয়ে করাটা হয়তো খারাপ। কিন্তু সেই খারাপের চিহ্ন বা লক্ষণগুলি খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেও সে পেরে ওঠেনি।

জিজিবুড়ি বা তার মা বিয়েটা স্বীকার না করলেও সুমনের মনে হয়েছে, তার বাবা এখানে এসে বেশ ভালই থাকে। মুখে হাসি-টাসি দেখা যায়। কলকাতার বাড়িতে বাবা ভীষণ গোমড়ামুখো।।

সে মরণকে বলেছিল, তোর দিদিমা ওসব কথা কেন বলে?

জিজিবুড়ি তো ওরইমই। সবসময় মুখে খারাপ খারাপ কথা।

জিজিবুড়ি কেমন লোক তা অবশ্য সুমন ভাল করে জানে না। এখনও আলাপ পরিচয় হয়নি।

সে দিকে চেয়ে বলল, দিদিমা তোমাকে পাঠাল কেন?

হিমি চৌকাঠ থেকে এক পাও এগোয়নি, মুখও তোলেনি। আঙুলে আঁচল জড়াচ্ছে আর খুলছে। ওইভাবে থেকেই বলল, জিজিবুড়ি বলছিল, ছেলেটা একা একা থেকে হাঁপসে পড়ছে, যা না গিয়ে একটু গল্প-টল্প কর। শহরের ছেলে তো, ওদের সঙ্গে কথা কইলেও একটা শিক্ষে হয়।

সুমন হাসল, তাই বুঝি?

জিজিবুড়ি বলছিল।

আর কিছু নয়?

না।

তা হলে ঘরে ঢুকছ না কেন? আমি তো তোমাকে খেয়ে ফেলব না।

মেয়েটা ফিচিক করে একটু হাসল। তারপর লতানে পায়ে একটু এঁকেবেঁকে ঘরে ঢুকল। ইচ্ছে আর লজ্জায় ভাগাভাগি হয়ে।

ওই চেয়ারটা টেনে বোসো।

মেঝেতেই বসি।

দুর! মেঝেতে কেন বসবে? মেঝে ভীষণ ঠান্ডা। চেয়ারে বসতে দোষ কী?

আমরা যে গুরুজনদের সামনে চেয়ারে বসি না।

গুরুজন! বলে সুমন হেসে ফেলে, আমি আবার কোন সম্পর্কে তোমার গুরুজন হলাম?

বাঃ, আপনি বি এ পড়েন না!

বি এ পড়লেই গুরুজন হয় বুঝি? অদ্ভুত যুক্তি তো!

তা হলে দাঁড়িয়েই থাকি।

সুমন মাথা নেড়ে বলে, অত সংকোচের কারণ নেই। আমাকে বন্ধু বলে ধরে নাও।

উরেব্বাস!

ভয় পেলে নাকি?

আপনি কী করে বন্ধু হবেন! আপনি যে বড়!

বড়! সেটা কোনও ফ্যাক্টর নয়। তোমার চেয়ে আমি হয়তো দু-চার বছরের বড়। বুড়োমানুষ তো নই।

মেয়েটা অগত্যা চেয়ারে বসল। মাথা নিচু।

তুমি তো আমাকে সঙ্গ দিতে এসেছ?

হ্যাঁ তো।

সঙ্গ দিতে হলে কথা কইতে হয়।

কী বলব?

সেটাও কি আমি শিখিয়ে দেব? বন্ধুদের সঙ্গে কী করে কথা বলো?

ও সেসব আজেবাজে কথা।

কীরকম আজেবাজে বলো তো!

আমরা কি ভাল কথা জানি!

তুমি অত সেজেছ কেন?

মেয়েটা অবাক হয়ে বলে, সেজেছি!

হ্যাঁ তো!

মেয়েটা লজ্জা পেয়ে বলে, সে তো একটুখানি। এখানে আসব বলে একটা টিপ পরেছি। টিপ না পরলে মা রাগ করে।

লিপস্টিকও দেখতে পাচ্ছি যেন!

মেয়েটা মুখ নিচু করে হি হি করে হাসল।

আজকাল মেয়েরা সাজে না জান তো? কলকাতার মেয়েরা লিপস্টিকও মাখে না বড় একটা।

ওমা! তাই?

কেন জান? তারা এখন ভাবে শরীরে রং মাখার চেয়ে শরীরটাকেই সুন্দর করে তোলা ভাল। তাই তারা যোগব্যায়াম করে, ধ্যান করে আর স্কিনের যত্ন নেয়।

আপনি এত জানেন কী করে?

বাঃ রে, আমার যে অনেক মেয়েবন্ধু আছে।

কজন?

অনেক। দশ-বারোজন তো হবেই।

উরেব্বাস!

অবাক হওয়ার কী আছে? তোমার ছেলেবন্ধু নেই?

মেয়েটা এবার মুখ তুলে বলে, আছে দু-চারজন। ঠিক বন্ধু নয়, চেনাজানা আর কী।

সমান বয়সি?

হ্যাঁ।

তা হলে ওরা তোমার ছেলেবন্ধুই। তাদের সঙ্গে আড্ডা হয় না?

ঘাড় কাত করে হিমি বলে, খুব হয়।

তা হলে তো তুমি স্মার্ট মেয়ে। অত লজ্জা পাচ্ছিলে কেন?

সুমন যে লজ্জার কারণটা জানে না তা নয়। তার আন্দাজ, এ মেয়েটা তার প্রেমে পড়েছে। আর দুর্বলতা থেকে ওই লজ্জা। প্রেমে পড়লেও কাঁচা প্রেম। চোখের আড়াল হলেই কেটে যাবে। এরা বেশ মেয়ে, শতেকবার প্রেমে পড়ে আর ওঠে।

শীতের এই দুপুরে গেঁয়ো মেয়েটার সঙ্গ তার বেশ ভালই লাগছিল। বিপজ্জনক না হলে লঘু এই প্রেম-প্রেম লাজলজ্জার খেলা খারাপ তো কিছু নয়।

আপনি একটা গল্প বলুন।

গল্প! না, আমি গল্প-টল্প বলতে পারি না। গল্প শুনতে চাও কেন?

এমনি।

তুমি আমাকে সঙ্গ দিতে এসেছ, গল্প তো তোমার বলার কথা।

আপনার মেয়েবন্ধুরা কেউ সাজে না?

কেউ কেউ সাজে। তবে বেশির ভাগই সাজে না।

তারা শুধু ব্যায়াম করে?

হ্যাঁ। যোগব্যায়াম কাকে বলে জান?

জানি। আমাদের শিখা দিদিমণি শেখায়।

তুমি শেখ নাকি।

হ্যাঁ। আমি অনেক আসন জানি।

বাঃ, তুমি তো তা হলে প্রোগ্রেসিভ মেয়ে। নাচ গান কিছু জান?

আমার গানের গলা নেই। আর এখানে একজন মাত্র নাচ জানে। তবে শেখায় না।

কে বল তো?

চাটুজ্জেবাড়ির মেয়ে পান্না।

পান্না নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সুমনের বুকটা ধক করে ওঠে। কানটা সামান্য গরম হয়।

তবু সে একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলে, পান্না?

পুজোর ফাংশনে নেচেছিল, দেখেননি?

সুমন একটু উদাস ভাব দেখিয়ে বলে, তা হবে। মনে নেই।

কিন্তু মনে আছে, ভীষণ মনে আছে সুমনের। মনে আছে শুধু নয়, সারাদিন পান্না তার মনে আনাগোনা করে।

পান্না নাচে, তা বলে আনা পাভলোভা নয়। তালজ্ঞান থাকলে যে কোনও মেয়েই অল্পবিস্তর শরীর দোলাতে পারে। বড় পুজোর ফাংশনে যে নৃত্যনাট্যটা হয়েছিল তাতে পান্নাকে যখন ফুলের সাজ আর মেকআপে দেখেছিল সুমন তখনই সে খরচ হয়ে যায়। নাচের ব্যাকরণ সুমন জানে না বটে, কিন্তু দেখেছিল কী বিভোর হয়ে সম্মোহিতের মতো সারা স্টেজ জুড়ে ঢেউ হয়ে বয়ে যাচ্ছে মেয়েটা।

তারপর থেকেই ছুতোনাতায় কতবার যে ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাতায়াত হল।

হ্যাঁ রে মরণ, তুই না আগে চাটুজ্জেবাড়িতে নারকোল আর সুপুরি পাড়তিস!

পাড়তুম তো। কিন্তু তুমিই যে বারণ করে দিয়েছ!

ওঃ হ্যাঁ, তাই তো!

ওদের বাড়ি যাবে?

সুমন লজ্জা পেয়ে বলে, না না, আমি কেন যাব?

পান্নাদিরা খুব ভাল লোক। গেলে খুশি হবে কিন্তু।

যাঃ, খুশি হলেই যেতে হবে নাকি?

আসলে মেয়েদের ব্যাপারে সুমনের কোনওদিন লজ্জা সংকোচ ছিল না। আজও নেই। সে ছেলেবেলা থেকে কো-এডুকেশন আর ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছে। মেয়েদের নিয়ে তার লজ্জা সংকোচ কেটে গেছে কবে! তবু জীবনে এই প্রথম এবং এই একটি জায়গায় সে কেমন আটকে গেছে যেন। একটা বাধা হচ্ছে।

পাকা মরণটা অবশেষে বলে বসল, চলো না, বিজয়া করে আসি!

বিজয়া! বলে বিস্ময় প্রকাশ করে সুমন।

বাঃ, বিজয়া করতে তো আমরা সব বাড়ি যাই।

তোর চেনা বাড়ি, তুই যেতে পারিস। আমি কেন যাব?

তোমাকেও সবাই চিনে গেছে। পান্নাদি তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিল একদিন।

কী জিজ্ঞেস করেছিল?

বলল, ওই সুন্দরমতো ছেলেটা কে রে তোর সঙ্গে ঘোরে?

ওঃ।

আমি তখন বললাম আমার দাদা।

গাঁয়ে এসে কি গেঁয়ো হয়ে যাচ্ছে সুমন? এত সংকোচ, লজ্জা, বুক কাঁপা, দুর! দুর! এরকম মেয়ে তো কতই তার বগলের তলা দিয়ে পার হয়ে গেছে।

কিন্তু নিজের মনে এত দেমাক করেও চৌকাঠটা ডিঙোনো যাচ্ছিল না।

তোমার পান্নাদি নাচে বুঝি?

খুব ভাল নাচে। সবাই বলে কলকাতায় গেলে নাম হবে।

তোমাদের শেখায় না কেন?

বলে দুর, আমিই ভাল করে শিখিনি, তোদের কী শেখাব!

ওঃ।

আচ্ছা, আপনি তো খুব ভাল গাইতে পারেন, তাই না?

ওসব বাথরুম সং।

আমি শুনেছি। ঠিক হেমন্তর মতো গলা।

দুর। কোথায় হেমন্ত, কোথায় আমি!

আমাদের তো বেশ লাগে। কাল সন্ধেবেলায় গাইছিলেন, আমার মা বলল, কী সুন্দর যে গায় ছেলেটা। আমরা টিভি বন্ধ করে দিয়ে আপনার গান শুনছিলাম!

এ মা, ছিঃ ছিঃ। কী কাণ্ড!

আপনার ক্যাসেট নেই?

দুর পাগল! কে আমার ক্যাসেট করবে?

দেখবেন আপনি ঠিক একদিন প্লে ব্যাক করবেন।

ওরে বাবা! মস্ত সার্টিফিকেট দিয়ে ফেললে যে!

দেখবেন।

মেয়েটাকে বেশ লাগল সুমনের। আড় ভেঙে দিল, আর উঁকিঝুঁকি দেবে না, চোখ মটকাবে না। ওসব ভাল লাগে না সুমনের। তার চেয়ে সোজা স্পষ্ট সম্পর্ক অনেক ভাল।

কিন্তু ব্যাপারটা একটু ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল তার বাবা ফেরার পর।

বাসন্তী রাতে তার ঘরে এসে বলল, হ্যাঁ বাবা, এই হিমি মেয়েটা নাকি তোমাকে আজ দুপুরে এসে জ্বালাতন করে গেছে?

জ্বালাতন! বলে হেসে ফেলল সে, না জ্বালাতন করেনি। গল্প করতে এসেছিল।

আমরা বাড়িতে নেই, এ সময়ে আসে কেউ? তোমার কাঁচা ঘুমটা মাটি করে গেছে তো!

আরে না না। আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

মেয়েটার একটু গায়ে পড়া স্বভাব আছে বাবা। কিছু মনে কোরো না।

কিছু মনে করিনি। ও তো আমার বন্ধু হয়ে গেছে।

ভারী অবাক হয়ে বাসন্তী বলে, বন্ধু!

হ্যাঁ। মেয়েটা খারাপ নয় তো! একটু লাজুক।

তা হোক বাবা, ওকে বেশি পাত্তা দিয়ো না। পেয়ে বসবে।

আসে আসুক না। আমারও কথা বলার একটা সঙ্গী হয় তা হলে!

কিন্তু বাবা—বলে বাসন্তী চুপ করে গেল।

কী বলুন না।

ভাবছি, মেয়েটার মতলব তো জানি না।

একটু গম্ভীর হয়ে সুমন বলে, ওকে নাকি আপনার মা আমার কাছে পাঠিয়েছিল।

আমার মা!

হ্যাঁ। তাঁকে অবশ্য আমি ভাল চিনি না।

বিহ্বল মুখে একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল বাসন্তী।

রাত্রিবেলা খাওয়ার টেবিলে যখন বাসন্তী সবাইকে পরিবেশন করছিল তখন সুমন লক্ষ করল, ভদ্রমহিলার মুখে স্পষ্ট কান্নার ছাপ। ঠোঁটে হাসির আভাসটুকুও নেই। কথাও কইছে না। এই প্রথম সুমনের একটু মায়া হল ভদ্রমহিলার জন্য। মানুষটা খুব বুদ্ধিমতী নয়। কিন্তু বোধ হয় মানুষটা ভালই।

মানুষ সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য অনাবিল চোখ দিয়ে কোনও কিছু বিচার করতে পারে না সবসময়। সুমনকে বহুকাল ধরে তার মা বুঝিয়েছে, তার বাবার দ্বিতীয় পক্ষ একজন ঘড়েল ও বদমাশ মহিলা। তার চরিত্রেরও ঠিক নেই। তার বাবাকে হিপনোটাইজ করে, বশীকরণ বা তুকতাক করে দখলে রেখেছে। এই ভদ্রমহিলা নানা ফিকির করে তাদের টাকাপয়সা বিষয়সম্পত্তি গ্রাস করে নিচ্ছে।

সুমন সেইরকম পূর্বধারণা নিয়েই ভদ্রমহিলাকে লক্ষ করত। ওই যে শান্ত, নিরীহ মুখ, নরম কথাবার্তা, ভিতু ভাব ওর আড়ালেই আছে সেই দাঁত নখঅলা ভ্যাম্পটা।

কিন্তু গত কয়েকদিনে ধারণাটা এক জায়গায় বসে থাকেনি। সরে গেছে। ভদ্রমহিলাকে তার ততটা খারাপ ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এর ভালমানুষি কিছুতেই অভিনয় নয়।

সকালে রান্নাঘরে জলখাবার তৈরি করতে যখন বাসন্তী ভীষণ ব্যস্ত তখন হঠাৎ সুমন রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

আপনি খুব ব্যস্ত?

চোখ তুলে এমন অবাক হল বাসন্তী যে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ও বাবা, তুমি রান্নাঘরে যে! কী দরকার বলো বাবা, একটা হাঁক দিলেই তো হত।

সুমন হেসে বলে, এমনিই এলাম। আপনার রান্নাঘরটা তো বিরাট বড়!

হ্যাঁ বাবা, গাঁদেশে রান্নাঘর তো বড়ই হয়। এসো না ভিতরে, জলচৌকি পেতে দিচ্ছি, বোসো।

সুমন বিনা আপত্তিতে বসল।

আপনি সারাদিন খুব কাজ করেন!

বাসন্তীর মুখে একটা স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠল। বলল, সংসার মানেই তো কাজ। কত কী সামলাতে হয়। গোরু, বাছুর, হাঁস-মুরগি, বেড়াল-কুকুর, মানুষজন। কার দিকে নজর না দিলে চলে বলো!

রান্নার লোক পাওয়া যায় না এখানে?

পাওয়া যাবে না কেন? উনি তো আমাকে প্রায়ই রান্নার নোক রাখতে বলেন। আমি রাখতে দিই না।

কেন বলুন তো! কলকাতায় আমাদের বাড়িতে তো রান্নার লোক আছে।

বাসন্তী যেন একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলে, মাইনে করা বাইরের লোকের তো তেমন দায় নেই। কী রাঁধতে কী রাঁধল, বাসি কাপড়ে হাঁড়ি ছুঁল, কি নাকের শিকনি ঝেড়ে সেই হাতেই কাজ করল। তাই আমি নিজেই করি। আমার বড় ঘিনপিত বাবা। শুচিবায়ুও বলতে পার।

সুমন একটু হাসল। কিছু বলল না।

হঠাৎ একটা ছায়া পড়ল দরজায়। সুমন তাকিয়ে দেখল, দরজায় জিজিবুড়ি দাঁড়িয়ে। তাকে হাঁ করে দেখছে। আর চোখ দুটো যেন গিলে খাচ্ছে তাকে।

আটাশ

মানুষ যে কথা কয় সেটা দুনিয়ার এক অত্যাশ্চর্য জিনিস। মনের মধ্যে ভাবের যেসব গ্যাঁজলা ওঠে সেগুলো এই যে দিব্যি ভাষায় ভেসে ওঠে, ভাবলে ভারী অবাক লাগে। কথা জিনিসটা যে কে আবিষ্কার করেছিল কে জানে! ভারী ভাল জিনিস! ধীরেন লক্ষ করেছে, চারপাশে যেসব কথা-টথা হয় সেগুলোর বেশির ভাগই আগড়ম বাগড়ম। তবে তার মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ দু-চারটে কথা যেন খচ করে মনের মধ্যে গেঁথে যায়।

ধীরেন কথা শুনতে ভালবাসে। দোকানপাটে, রাস্তায় ঘাটে, চেনা অচেনা লোকের কথা মনে দিয়ে শোনে সে। বেশির ভাগই ফেলে দিতে হয়, দুটো চারটে থাকে, ভদ্রলোক হোক বা ছোটলোক, লেখাপড়া জানা হোক বা মুখ্যু-সুখ্যুই হোক এক একজন এমন মোক্ষম কথা বলে বসে যে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। ইরেব্বাস! কথা তো নয়, যেন কুড়ুল।

তার ঘোরাফেরার চৌহদ্দি এই গাঁয়ের মধ্যেই। এক মুঠো তো জায়গা। আর লোকজনই বা কী এমন! ঘুরেফিরে সেই যোদো-মোধো-রেমো। তবু এইটুকু চৌহদ্দির মধ্যেই নিত্যনতুন কথা ফুট কাটছে। ভাবে, একখানা খাতা কিনে কথাগুলো লিখে রাখলে হয়। ভাবাই অবশ্য সার, হয়ে ওঠে না।

এই সেদিন বিকেলের দিকটায় গিয়ে পড়েছিল মহিম রায়ের বাড়ি। মহিমদের বাড়ি সেদিন ভারী সুনান। জনমনিষ্যি নেই। শুধু কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে আর ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে একখানা বই পড়ছে অমল। ধীরেনকে দেখে কেউ খুশি হয় না এটা ধীরেন জানে। কিন্তু কী আশ্চর্য— সে যখন মহিমার এই বিদ্বান ছেলেটিকে দেখে সসংকোচে ফিরে আসবে বলে মুখ ঘুরিয়েছে তখন অমল ভারী খাতির করে বলল, আরে ধীরেনকাকা না! বসুন।

বসার জন্য চেয়ার বা মোড়া কিছু ছিল না ধারে কাছে। তাই ইতিউতি চেয়ে ধীরেন যখন দাওয়ার এক ধারে বসতে যাচ্ছিল তখন অমল বলল, করেন কী! দাঁড়ান চেয়ার এনে দিচ্ছি।

বিদ্বান মানুষ অমল, তার বাবার ঘর থেকে চেয়ার এনে বসতে দিল তাকে। বড় সংকোচ হচ্ছিল।

বই পড়ছিলে বাবা, এসে রসভঙ্গ করলুম।

অমল মুখটা তেতো করে বলে, দুর! বই পড়ে কি সময় কাটে! লেখাপড়া করে লোকে মুখ্যুই হয়।

বলে কী ছোকরা! কথাটা ভারী অদ্ভুত শোনাল।

বেশ বাবা, ওকথা বলছ কেন? লেখাপড়া তো ভাল জিনিস!

না কাকা, লেখাপড়া হল ধার করা জিনিস। অন্যের চিন্তাভাবনার জঞ্জাল টেনে এনে নিজের মাথায় বোঝাই করা। লেখাপড়া করে তো দেখলাম, ওতে কিছু হয় না!

এ কথাটা ভারী নতুন শোনাল ধীরেনের কানে। লেখাপড়ার মেলা গুণগানই তো করে লোকে। তা হলে লেখাপড়া জানা এ ছেলেটা উলটো কথা কয় কেন?

ধীরেন ভারী আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করে, লেখাপড়া করে কী হয় না বাবা?

অমল একটা আলস্যের আড়মোড়া ভেঙে বলে, মানুষ তো কত কী জানল বুঝল, কত কেরাদানিই দেখাল, কিন্তু শেষ অবধি নিজের মনের কাছে জব্দ হয়ে রইল। আপনি ভগবান মানেন কাকা?

এ কথায় একটু ফাঁপরে পড়ে গেল ধীরেন। আমতা আমতা করে বলল, তা মানি বইকী বাবা, একটু আধটু মানি। তবে তেমন মাথা ঘামাই না।

ভগবান কাকে বলে জানেন কাকা?

ধীরেন আবার ডুবজলে। এসব কঠিন প্রশ্নের জবাব কি তার জানা থাকার কথা?

অমল অবশ্য তার জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না, বলল, মনই হচ্ছে ভগবান। ওইমনই ভগবান-টগবান বানায়, আবার মনই ভগবানকে নাকচ করে দেয়। মনের মতো বন্ধু হয় না, আবার অমন শত্রু কেউ নেই।

বাঃ, এ যে বেশ কাজের কথা হচ্ছে! ধীরেন ভারী আপ্লুত হয়ে নড়েচড়ে বসল, একেই তো এই মহা বিদ্বান মানুষটি তার সঙ্গে যেচে কথা কইছে বলে সে বর্তে যাচ্ছে। তার ওপর কথাগুলো কইছেও ভারী ভাল। টুকে রাখার মতোই কথা সব।

ধীরেন হেঁ হেঁ করে হেসে বলে, বড্ড ভাল বলেছ বাবা।

ভাল-মন্দ যে ধীরেন বোঝে এমন নয়। তবে সে কথা শুনতে ভালবাসে। যেসব কথা শুনতে ভাল সেগুলোই তার কাছে ভাল কথা।

অমলকে আজ কথায় পেয়েছে। ধীরেন কাষ্ঠ যে একটা মনিষ্যির মতো মনিষ্যিই নয় সে কথা ভুলে গিয়ে কথা কয়ে যাচ্ছে। লক্ষণটা চেনে ধীরেন এক এক সময়ে মানুষ মনের ভার নামাতে দেয়ালের সঙ্গেও কথা কয়। তা ধীরেন দেয়াল ছাড়া আর কী!

বুঝলেন কাকা, একটা লোককে চিনতুম। ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যানসেলর ছিলেন, একগাদা সরকারি কমিশনের চেয়ারম্যান বা মেম্বার ছিলেন, নামের পাশে বিরাট বিলিতি ডিগ্রি। সাউথ ক্যালকাটায় বিরাট বাড়ি, অগাধ টাকা কিছুর অভাব নেই। দেখে মনে হত দুনিয়াটা যেন ওঁর পকেটে। শেষে কী হল জানেন?

ধীরেন বাঁয়া কোলে করে বসে আছে। প্রতিধ্বনি করল, কী হল?

বুড়ো বয়সে তাকে যখন দেখলুম বউ মারা গেছে, ছেলে বিদেশে, চাকরি থেকে রিটায়ার করে লোকটা একরকম নিষ্কর্মা। কিছু লেকচারে ডাকাডাকি হয়, কিছু মিটিং-টিটিং থাকে বটে, কিন্তু বড্ড ফাঁকা হয়ে গেছে মানুষটা। একদিন আমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, আচ্ছা তুমি ভূতের গল্প জানো? বলো তো একটা শুনি। আমার আজকাল বড় ভূতের গল্প শোনার ইচ্ছে হয়।

ভূতের গল্প?

তাই তো বলছি কাকা। এত লেখাপড়া জানা মানুষ, কিন্তু নিজের একা বোকা ভাবটা কাটাতে পারছেন না। শরীরটা আছে, কিন্তু মনটা অথর্ব হয়ে পড়েছে। ভূতের গল্প শুনে ভারী খুশি, আমাকে আর ছাড়তেই চান না। শেষে আমাকে বললেন, ওহে, এত বড় বাড়িটা বড্ড হাঁ হাঁ করে। আমার তো জন নেই। একটা ভাল ফ্যামিলিতে পেয়িংগেস্ট হিসেবে যদি থাকতে চাই ব্যবস্থা করতে পারবে? আর কিছু না হোক, পাঁচ জনের মধ্যে তো থাকা যাবে।

বলো কী?

তাই তো বলছি কাকা, ওসব বইপড়া বিদ্যে দিয়ে জীবনে সত্যিকারের কিছু হয় না। সেই বিরাট মানুষটা শেষ অবধি এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে জুটলেন। সেখানেই মারা যান। ঘটনাটা আমাকে জোর একটা ধাক্কা দিয়েছিল।

তা তো দেবেই।

সেই থেকেই আমার বড় ভাবনা হয়। মানুষ এত শেখে, এত তড়পায়। এত কাজকর্ম করে। কিন্তু শেষ অবধি তাকে তার মনের ভূত ভয় দেখাতে থাকে। মনই তাকে খায়। মনের সঙ্গে আজও পেরে উঠল না মানুষ।

মনের ভূত ধীরেনকেও কি কম খেয়েছে। আজও সেই ভরা বর্ষার ছাইরঙা সকালটার দৃশ্য পট করে চোখের সামনে বায়স্কোপের মতো ভেসে ওঠে। ডবকা সেই যুবতীর শবদেহ কাঁধে নিয়ে এক বুক জল ভেঙে পিছল উঠোন পেরোচ্ছে, গলায় তারের ফাঁস। ফাঁসের প্রান্ত মিদ্দারের হাতে ধরা। এক চুল এদিক ওদিক হলেই তারের ফাঁস গলা কেটে বসে যাবে। উরে বাবা, সে কী একটা সময় যাচ্ছিল তখন!

মিদ্দার তার গুরুই ছিল একরকম। নিরীহ, ঝঞ্ঝাটহীন গুণী এক মানুষ নিজের কাজে মজে থাকত। তাঁতির যেমন এঁড়ে গোরু, মিদ্দারের পোয়ের তেমনি কাল হল যুবতী বউ। আর তা থেকে কত কী পাকিয়ে উঠল। সাদামাটা সম্পর্ক ছড়িয়ে গেল জটিল কুটিল নানা খানাখন্দে।

মিদ্দারকে মেরে ফেলেছিল বটে, কিন্তু সে তো ইচ্ছে করে নয়! না মারলে মরতে হত। গৌরদা তাকে বুঝিয়েছিল, ওতে পাপ নেই, আত্মরক্ষার জন্য নরহত্যা করলে পেনাল কোডে সাজাও হয় না। তবু মন কি মানে! কৃতকর্মের জন্য আজও বুক টনটন করে বড়। একা হলেই যেন মিদ্দারের ভূত কাছেপিঠে চলে আসে। ভয় করে, বড্ড ভয় করে।

তখন, সেই খুনের ঘটনার পর তার ঘুম, খিদে সব ছুট হয়ে দিয়েছিল। সারাদিন পাগল পাগল অবস্থা। এই হাসে, এই কাঁদে। আর তখন চারদিকে যেন ভুতুড়ে এক জাল তাকে ঘিরে থাকত। রাতবিরেতে মিদ্দার এসে হানা দিত। দেখা যেত না, কথাও কইত না, কিন্তু তাকে খুব টের পেত ধীরেন।

অমন নিরীহ, ভাল মানুষটা কী থেকে কী হয়ে গিয়েছিল!

মনের ভূতে খায় বইকী বাবা, খুব খায়। মনের ভূতই তো খাচ্ছে আমাদের।

অমল একটু কেতরে হেলে পড়ে আছে ইজিচেয়ারে। কথা কইল না। চোখ চাওয়া, কিন্তু সে চোখের দৃষ্টি কোথায় চলে গেছে কে জানে!

ধীরেন দু-একবার গলা খাঁকারি দিল। বুঝল অমল আর বাইরের জগৎটায় নেই। নিজের ভিতরে ঢুকে অন্ধি-সন্ধি খুঁজে বেড়াচ্ছে কিছু। ধীরেন এসব বুঝতে পারে।

গৌরদার ছোট মেয়ে পারুলের সঙ্গে ভাব ভালবাসা ছিল ছেলেটার। সেই বৃত্তান্ত সবাই জানে। তা বিশ-বাইশ বছরের পুরনো কথা। তখন সারা গাঁয়ে বেশ মুখরোচক প্রসঙ্গ ছিল সেটা। তবে নিন্দেমেন্দ হয়নি তেমন। কারণ ছেলেটি ছিল রত্ন, আর মেয়েটিও ছিল ডাকের সুন্দরী। তার ওপর গৌরহরি ছিলেন গাঁয়ের মাথা, মহিম রায়ও পণ্ডিত মানুষ। সবাই ধরে নিয়েছিল বিয়েটা হবেই।

সেই বিয়ে যে ফসকাতে পারে সেটাই অষ্টম আশ্চর্য! এমন হওয়ার কথাই নয়। গৌরহরিকে ব্যাপারটা নিয়ে একবার জিজ্ঞেস করেছিল ধীরেন।

দাদা, পারুলের বিয়েটা অন্য জায়গায় দিচ্ছেন যে!

বিয়ে জিনিসটাই যে ওইরকম রে, কার যে কার সঙ্গে ঘাট বাঁধা তা কে বলবে!

তা অবিশ্যি ঠিক। তা পারুল কান্নাকাটি করছে না?

আরে সে কাঁদবে কী! তার ইচ্ছেতেই তো হচ্ছে।

ধীরেন প্রেম ভালবাসার রহস্য যে খুব ভাল বোঝে তা নয়। শুধু বোঝে, ওসব বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়, তারপর থমকে যায়। তার নিজের জীবনে তাও হয়নি। বিয়ের রাত থেকেই ফোঁসফোঁস শুরু করেছিল। কাজেই ভাব ভালবাসা নিয়ে তার উচ্চবাচ্য করার কিছু নেই।

কিন্তু পারুল নিজের ইচ্ছেয় অন্য জায়গায় বিয়ে বসছে এটা যেন তার কাছে একটু কেমনধারা মনে হয়েছিল। এরকম তো হওয়ার কথা নয়।

তা পারুলের বিয়ে বেশ ঘটা করেই হল। গাঁ দেশে এমন বিয়ে দেখা ভাগ্যের কথা। গৌরদা টাকাও ঢেলেছিলেন জলের মতো। সেই বিয়েতে বারো পিস মাছ খেয়েছিল ধীরেন, খুব মনে আছে। না, পারুলের হাসি হাসি মুখখানায় কোনও দুঃখের চিহ্ন খুঁজে পায়নি ধীরেন। হাত বাড়িয়ে ধীরেনের হাত থেকে যখন খবরের কাগজে মোড়া শস্তার তাঁতের শাড়িটা উপহার নিচ্ছিল তখনও পারুলের মুখখানা ভাল করে দেখেছিল ধীরেন। বেশ ঢলঢলে মুখ, তাতে হাসির মিশেল, বিরহের ভাব-টাব নেই।

বছর না ঘুরতেই অমলের বিয়ে। তা তাতেও ধীরেন হাজির ছিল। বরযাত্রী যেতে বলেনি বটে, কিন্তু বউভাতে গাঁ ঝেঁটিয়ে নেমন্তন্ন খেয়েছিল লোকে। অমলকে তখন বেশ ভাল করেই দেখেছিল ধীরেন। গরদের পাঞ্জাবি আর ধাক্কাপাড়ের ধুতি পরে অতিথিদের দেখভাল করছিল। মুখে হাসি ছিল, কিন্তু খুশিটা ছিল না যেন। খুশিটা আজও নেই।

অঙ্কটা মেলেনি ধীরেনের। মেয়ে জাতটাই নিমকহারাম বললে এক রকমের মেলে, কিন্তু কথাটা সত্যি হয় না। কোথাও একটা খিচ থেকে যায়।

ধীরেন দেখল, ইজিচেয়ারে কেতরে শুয়ে অমল ঘুমিয়ে পড়েছে, কোলে উপুড় করা বই, রাজ্যের মশা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে মাথার ওপরে। ধীরেন চোরের মতো উঠে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল। ছোকরা সেই প্রেমের ফেরেই আজও পড়ে আছে কি না কে জানে! বইয়ে কেতাবে ওরকম হয়-টয় বটে, কিন্তু ধীরেনের দুনিয়ায় ওসব এতকাল টিকে থাকতে দেখেনি কিনা। প্রেম একটা ফুসমন্তর বই তো নয়, হুস বলতেই উড়ে যায়। ফঙ্গবেনে জিনিস। খিদে তেষ্টা বাহ্যে পেচ্ছাপের মতোও স্থায়ী জিনিস নয়। একটা জীবনে প্রেম অনেকবার পাশ ফেরে।

দিনের আলো মরে এলে অসুবিধেটা বাড়ে। চোখে এমন ঝাপসা একটা ভাব হয় যে, চলাফেরায় আজকাল মুশকিল হচ্ছে। চোখ কাটানোর পাকা তারিখ এখনও পাওয়া যায়নি। সামনের মাসে হতে পারে বলে খবর একটা পাওয়া গেছে। পরের দয়া, জোর তো নেই। তবু এই দয়াধর্ম, সেবা-টেবা পতিতোদ্ধারে বড় মানুষরা যে একটু আধটু কাজকর্ম করে তাতেই বাঁচোয়া।

সন্ধেবেলাতেই কেন যে মশারা এমন রক্তপাগল হয়ে ওঠে কে জানে বাবা! এটাই কি ওদের ডিনারটাইম? রাতে উৎপাত অনেক কমে যায়। কিন্তু সন্ধেবেলায় ওদের ণত্ব-ষত্ব জ্ঞান থাকে না, তখন প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বউদি ডাকছে, ওঠো! মশায় যে ছেঁকে ধরেছে একেবারে। ঘরে গিয়ে বোসো, ধোঁয়া দিয়ে এসেছি।

অমল একটু হাসল, ওদের জীবনও তো নিষ্কণ্টক নয় ঠাকরোন।

কে? কাদের কথা বলছ?

মশাদের কথা। প্রাণ হাতে করেই তো খায়।

আহা, মশাদের জন্য যে দরদ উথলে উঠছে দেখছি! গান্ধীবাবা হলে নাকি?

আচ্ছা, আজ বাড়িটা এত ফাঁকা কেন বলো তো! কোথায় গেল সবাই। তুমিও তো বাড়ি ছিলে না!

আমি গিয়েছিলুম একটু শীতলাবাড়িতে। বিষ্ণুর মায়ের দয়া হয়েছিল সেই কবে। পুজোটা আর দেওয়া হয়নি এতদিন। দিয়ে এলুম।

বেশ করেছ। জলবসন্তের চিকিৎসা নেই, তা জানো? পুজো দিলেও একুশ দিনে সারে, না দিলেও তাই।

আচ্ছা, আর নাস্তিকপানা করতে হবে না। ঘরে যাও, চা আনছি।

তুমিই সবসময়ে চা দাও, খাবার দাও। কেন বলো তো? আর সবাই কোথায় থাকে?

কেন গো, বউয়ের হাতে ছাড়া চা খাবার পছন্দ নয় বুঝি!

আহা, তা নয়। এটা একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি, সকলেরই তো কিছু না কিছু করা উচিত।

বউদি একটা শ্বাস ফেলে বলে, কী করব বলো! আমি তো বাড়ির বড়বউ। বড়বউ হলে দায়িত্বও যে বড়।

ওটা কথা নয় ঠাকরোন, তোমাকে আমি সারাদিন কাজ করতেই দেখি, একজন এত পরিশ্রম করবে কেন?

একটু হেসে বউদি বলে, আমি খাটিয়ে পিটিয়ে মেয়ে হিসেবেই তৈরি হয়েছি যে! বিবিয়ানি করার জন্যে তো নয়। পেটে বিদ্যে বা অন্য গুণ না থাকলে যে গতর দিয়ে পুষিয়ে দিতেই হয় ভাই। মেয়ে হয়ে না জন্মালে বুঝবে না।

তা নয় ঠাকরোন। লজিকটা ভুলে ভরা। তুমি যদি দশভুজা হয়ে সব কাজে ঝাঁপিয়ে না-পড়ার অভ্যাস করো, তা হলে দেখবে সবাই যে যার নিজের কাজ করে নিতে শুরু করবে। তুমি করো বলেই অন্যেরা গা বাঁচিয়ে চলে।

সে গুড়ে বালি। উঠোনের কোণে যদি ঘটিটা পড়ে থাকে, বাড়ির সবাই ওর আশপাশ দিয়ে শতেকবার হেঁটে যাবে, কেউ তুলে রাখবে না। আমি না তুললে বাইরের লোক এসে নিয়ে চলে যাবে।

অভ্যাস তুমিই খারাপ করেছ।

দাসী হয়ে জন্মেছি যে ভাই, দাসত্ব না করে উপায় আছে? তবে সবাইকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

মোনাও তো কিছু করতে পারে।

সে দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে, তাকে কেন ঘানিগাছে জুড়তে যাব বলো! তা ছাড়া সব সংসারেরই কাজকর্মের আলাদা রকম ধাঁচ থাকে। সে অত বুঝবে না। ছোঁয়াছুঁয়ি, পয়পরিষ্কার ওসব কি ওর অভ্যাস আছে, বলো! আর সন্ধ্যাকে তো দেখছ, বেচারা দিনরাত ব্যবসার পেছনে খেটে মুখে রক্ত তুলছে। তাই ওকে আমি সংসারে জড়াই না, দুঃখী মেয়ে তো!

ব্যস, সব জল করে বুঝিয়ে দিলে! এগুলো কোনও যুক্তি নয় ঠাকরোন, এসব হল অজুহাত।

বেশ, না হয় তাই হল। কিন্তু এই বাঘা শীতে তুমি খোলা উঠোনটার মধ্যে বসে আছ কী করে বলো তো! তোমার বউ বাড়ি থাকলে বকুনি দিত।

অমল ম্লান হেসে বলে, তা হলে তো বর্তে যেতুম। সে আমাকে ততটা লক্ষ করে না ঠাকরোন।

আর বউয়ের নিন্দে করতে হবে না। ঘরে গিয়ে ঢাকাচাপা দিয়ে বোসো। ঘরের জানালা দরজা হুট করে খুলো না, এ সময়ে মশা ঢোকে।

মোনা কোথায় গেছে? এখানে তো তার যাওয়ার জায়গা নেই! কারও সঙ্গে মেশেও তো না।

রতনের সঙ্গে মোটরবাইকে চেপে বর্ধমানে গেছে।

মোটরবাইকে! রতনের সঙ্গে!

অত অবাক হওয়ার কী আছে?

এ তো জলে ভাসে শিলা! রতনের সঙ্গে তার ভাব হল কবে?

বউদি মুখ টিপে হেসে বলে, থাকতে থাকতে হয়েছে। ভাব না হওয়ার কথা নাকি!

কিছু বললেই তো বলবে বউয়ের নিন্দে করছি। আমার মুখে মোনার নিন্দে তো তুমি মোটেই পছন্দ করো না।

তাই কী হয় ভাই? গাঁয়ের মেয়েরা তো নিন্দে দিয়ে মেখেই ভাত খায়, জানো না? নিন্দেমন্দ হল আমাদের থিয়েটার বায়স্কোপের মতো। তবে কি না তুমি তো আর পাঁচটা মানুষের মতো নও। তুমি ওসব হ্যাতান্যাতা জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?

একটু হেসে অমল বলে, আমি কিন্তু আমার নিজেরও নিন্দে করি।

খুব খারাপ করো। ওরকম করা ভাল নয়।

তোমরা যেরকম ভাবো আমাকে, সেরকম আর হতে পারলাম কই?

অনেক হয়েছ ঠাকুরপো, অনেক হয়েছ। কটা লোক তোমার মতো হয়েছে বলো তো!

গাছে তুলো না, ঠাকরোন, গাছে তুলো না। একগাদা লেখাপড়া করে লম্বা মাইনের চাকরি করছি— এই তো! এটা কিন্তু অনেক হওয়া নয়।

আমাকে আর বোঝাতে হবে না। এখন কি তোমার চশমা পরে নিয়ে তোমাকে বিচার করতে হবে নাকি? আমারও তো একটা বিচার আছে!

বরাবর তুমি আমাকে একটু অন্য চোখে দেখ, আমি জানি। দেখাটা কিন্তু ভুলও হতে পারে।

সেটা আমি বুঝব। অনেক ঠান্ডা লাগিয়েছ কিন্তু, এর পর জ্বরজারি বাধিয়ে বসবে। ঘরে যাও। এসে দেখি, অকাতরে ঠান্ডার মধ্যে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছ, মশা ছেঁকে ধরেছে। এমন মায়া হল। যেন কেউ নেই তোমার।

কেউ নেই-ই তো!

ফের ওসব কথা?

অমল হাসল। বলল, ফাঁকা বাড়িতে চুপচাপ একা বসেছিলাম। বসে বসে ঢুলুনি পেয়ে গেল।

হ্যাঁ, আজ তোমাকে একটু ফাঁকাতেই থাকতে হয়েছে বটে। সন্ধ্যা গেছে আদায় উশুল করতে। বাবা আজ বড়শুলে গেছেন নিমাইকাকার বাড়ি। রাতে হয়তো ফিরবেন না। সোহাগ দুপুরে খেয়েই বেরিয়েছে পান্নার বাড়ি যাবে বলে। দুজনের তো কথার শেষ নেই। আর তোমার দাদাকে তো জানোই। ঘরের খেয়ে কোন বনের মোষ তাড়াতে বেরিয়েছেন কে জানে!

অমল উঠতে উঠতে বলল, তোমার বাজারহাট বা দোকানপাটের জিনিস লাগবে কি না দেখো তো। লাগলে বোলো, একটা পাক দিয়ে গিয়ে নিয়ে আসবখন।

তোমাকে আর কাজ দেখাতে হবে না। ঘরে গিয়ে লেপচাপা দিয়ে বসে থাকো। যা ঠান্ডা পড়েছে আজ!

এই ঠান্ডায় তুমিও আর বসে থাকবে না।

বউদি হিহি করে হেসে বলল, মেয়েমানুষের দুঃখু অত দেখতে নেই গো পুরুষমানুষের। ওতে যে পাপ হয়।

কেন, পাপ হয় কেন?

হবে না? মেয়েমানুষের দুঃখ বুঝলে পুরুষমানুষের পুরুষত্ব থাকে নাকি?

ঠাট্টা করছ?

না গো, সত্যি কথাই বললুম। ভেবে দেখলেই বুঝবে।

তুমি একটু নারীবাদী আছ কিন্তু ঠাকরোন!

আমি নারীবাদী হলে এ-বাড়ির কারও আর খাওয়াপরা জুটত না, বুঝলে!

নারীবাদীদের দোষ কী জান?

কী?

তারা খোঁটা দেবে, আবার সেবা-টেবাও করবে। দুরকম চলে না ঠাকরোন। একরকম হও।

উরেব্বাস! তা হলে তো সংসার ভেসে যাবে গো।

ওইজন্যই তোমরা ঠিকঠাক নারীবাদী হতে পারলে না।

অমল ধীর পদক্ষেপে দোতলায় উঠল। তারপর নিজের ঘরটিতে এসে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে হাঁটু অবধি লেপটা টেনে আধশোয়া হল। জানালা দরজা বন্ধ থাকায় ঘরটা বেশ গরম। যেন রুম হিটার চলছে।

কিছুক্ষণ পর দরজায় টক টক শব্দ হল।

এসো ঠাকরোন, তোমাকে আর ভদ্রতা করে নক করতে হবে না।

বউদি একগাল হেসে ঘরে ঢুকে বলল, ছোটদের কাছেও কত কী শেখার আছে আমাদের।

কে আবার তোমাকে কী শেখাল?

এই যে দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢোকা এটা আমাকে সোহাগ শিখিয়েছে। বলেছে, এটা অভ্যাস করে নিলে কোথাও অপ্রস্তুত হতে হবে না।

তা বিলিতি কায়দা রপ্ত করছ?

তা বাপু, শিক্ষাটা খারাপ নয় কিন্তু। আজকাল তোমার দাদা ঘরে থাকলেও আমি দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকি। প্রথম প্রথম কায়দা দেখে হাসত। আজকাল দেখি নিজেও তাই করছে।

হাঃ হাঃ করে হাসল অমল, এইসব হচ্ছে তা হলে আজকাল?

তাই ভাই, ভাল জিনিসকে ভাল বলতেই হয়।

হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে বউদি চেয়ার বসে বলল, সাঁজাল দিতে একটু দেরি হল, নইলে আরও আগে তোমাকে চা দিতে পারতাম।

সন্ধের পর চা খাওয়া তো ভুলেই গেছি। প্রায়ই পার্টি বা বন্ধু বা কলিগের বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকে। সেখানে তো আর চা দেয় না।

জানি বাপু, জানি। মদ খাও তো!

হ্যাঁ ঠাকরোন।

তাই মাঝে মাঝে মদের গন্ধ পাই। এখানেও তো খাও, তাই না?

খাই ঠাকরোন। বাজে অভ্যাস।

তা বাপু, তোমার দাদাও কখনও-সখনও খায়। আমি তার জন্য বকাঝকা করি না। শুধু চোখ পাকিয়ে তাকাই।

তাতেই ঠান্ডা হয়ে যায় দাদা?

হয় ভাই। জানে তো, বউ ছাড়া গতি নেই। বউ বিগড়োলে তার দুনিয়া অন্ধকার।

বেশ আছ তোমরা।

সে তো আছি। কিন্তু তুমি বেশ নেই কেন? তোমার বউটা খারাপ নয়, মেয়েটা ভাল, ছেলেটা ভাল, তবে তোমাদের পট খায় না কেন বলো তো!

ঠিক বুঝতে পারি না ঠাকরোন।

ভাল করে ভাবো তো একটু। তোমার মতো এমন ভাল একজন মানুষের সংসারে অশান্তি থাকার কথা নয়।

ভালমানুষ কথাটা শুনেই কেমন যেন বিকল হয়ে গেল অমলের মনটা। চায়ে চুমুক দিয়ে তেতো মুখ করে বলল, ঠাকরোন, আমার মধ্যে যেটুকু ভাল বলে তোমার মনে হয় তা হল মেধা। আমি ছাত্র ভাল ছিলাম, ঠিক কথা। কিন্তু মেধা আর চরিত্র এক নয়।

এখন নিজের চরিত্র নিয়ে কথা তুলবে নাকি?

নিজের চরিত্র সম্পর্কে যে আমার কোনও বিশ্বাস নেই। যখন ছোট ছিলাম তখন বেশ ভালমানুষ ছিলাম। দুষ্টুমি নষ্টামি করতাম না, মিথ্যে কথা বলতাম না, মা বাবার বাধ্য ছেলে ছিলাম। কিন্তু সমস্যা কখন দেখা দিল জানো?

কখন?

যখন ক্লাসে ফার্স্ট হতে শুরু করলাম। অনেক নম্বর পেতাম, মাস্টারমশাইরা প্রকাশ্যে প্রশংসা শুরু করলেন, পাঁচজন ধন্য ধন্য করতে লাগল, তখনই একদিন অহংকার চলে এল। খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার, বুঝলে? বাইরের লোক ততটা টের পেত না। কিন্তু মনে মনে আমি ক্লাসমেটদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা করুণা করতে শুরু করি। কোনও মাস্টারমশাই কখনও কিছু ভুল করলে মনে মনে অনুকম্পা বোধ করতাম, অশ্রদ্ধার ভাব আসত। আমার বাবা যে ইংরিজিতে এম এ পাশ তা জানো?

জানব না কেন?

আমি বাবাকেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শুরু করি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, যত বড় মূর্খ ছেলে তত বড় লেকচার। আমারও ঠিক তাই হয়েছিল। বাবা, মা, দাদা এদের কাউকে তেমন পাত্তা না দেওয়ার মনোভাব এসে গেল।

তাতে কী? ওরকম তো হতেই পারে। এখন তো আর তুমি অহংকারী নও!

অনেক ঠেকে শিখতে হয়েছে যে, অহংকার করার মতো আমার কিছুই নেই। অধীত বিদ্যা আমাকে জীবনে শান্তি বা স্বস্তি কিছুই দেয়নি। এমন কী যৌবন বয়সে আমার পদস্খলনও ঠেকাতে পারেনি। আমি কীসের ভাল ছেলে ঠাকরোন?

দেখ কাণ্ড! নিজের নিন্দে শুরু করে দিলে যে!

সব তো জানো না ঠাকরোন। জানলে আমাকে ঘেন্না করতে।

কী জানি না বলো তো?

সেটা তো তোমাকে বলা যায় না। আমার অধঃপতন যে কবে, কীভাবে শুরু হয়েছিল তা আমিই শুধু জানি।

আচ্ছা ভাই, যে নিজের সম্পর্কে এ কথা বলতে পারে তাকে কি খারাপ বলা যায়?

অমল হাসল, তোমার চোখে খারাপ না হলেই কি আর আমি ভাল?

অত মনস্তাপের দরকার নেই। আমি সব জানি। জেনেও বলছি, তুমি মোটেই খারাপ নও।

একটু অবাক হয়ে অমল বলে, জানো?

হ্যাঁ জানি। কিন্তু তোমাকে বলি বাপু, সব কথা কি সকলের কাছে বলতে হয়? পাত্রভেদ নেই? কাক তো এঁটো ছড়ায়।

তুমি কী জানো ঠাকরোন?

সব জানি। পারুলের সঙ্গে তোমার শরীরের সম্পর্ক হয়েছিল। অবাক হয়ো না। অবাক হওয়ার কিছু নেই।

উনত্রিশ

চা জুড়িয়ে গেল যে! খাও।

চুপচাপ চা শেষ করল অমল। তারপর বউদির দিকে চেয়ে একটু মলিন হেসে বলল, এখন আমাকে কী চোখে দেখছ ঠাকরোন? ঘেন্না হচ্ছে?

না বাপু, পুরুষমানুষের ওরকম একটু আধটু দোষঘাট হতেই পারে। ঘেন্না হবে কেন? বিয়েই তো হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। পারুল দেমাক দেখিয়ে বিয়ে করল না। না হলে কি এটা নিয়ে কথা উঠত, বল?

অমল মাথা নেড়ে বলে, না, উঠত না। পারুল না হয়ে অন্য কোনও মেয়ে হলে বিয়েও করত। পারুল কেন করল না বল তো!

দেমাক বাপু, বড্ড দেমাক।

না বউদি। এটা দেমাকের ব্যাপার নয়, তবে কাছাকাছি। পারুল আমাকে যে অপমানটা করল সেটা করার জন্য বুকের পাটা চাই। খুব বুকের পাটা চাই। সেদিন পারুলের ওপর রাগ হয়েছিল বটে আমার। কিন্তু এখন ওই জন্যই পারুলের ওপর আমার শ্রদ্ধা হয়। পুরুষের গায়ের জোর বেশি, জোর খাটাতেও সে পিছপা হয় না। চিরকাল মেয়েরা এই প্রবল পুরুষের ইচ্ছের কাছে নত হয়ে আসছে। ওইটাই রেওয়াজ। পারুল সেটা হতে দিল না। ঝগড়া-তর্ক করেনি, ভাষণ দেয়নি, নারীমুক্তির বুলি কপচায়নি, শুধু নীরবে আমাকে নাকচ করে দিয়েছে। ঠাকরোন, ভেবে দেখো, পারুলের মতো এমন কঠিন প্রতিবাদ কটা মেয়ে করতে পারে?

ও বাবা, তুমি যে পারুলের গুণকীর্তন শুরু করলে! আমার বাপু, ওসব মনে হয় না। মেয়েদের অত অহংকার তো ভাল নয়। যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েই আছে সে যদি একটু বাড়াবাড়ি করেই ফেলে তাহলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয় নাকি?

বললাম তো, বেশির ভাগ মেয়েই এসব ক্ষেত্রে মেনে নেয়, আসকারাও দেয়। পারুল যে দেয়নি তাতে প্রমাণ হয় যে সে বেশির ভাগ মেয়ের মতো নয়। তার জাত আলাদা।

অবাক কাণ্ড বাপু। তোমার বউও এরকমই কী যেন বলছিল।

কী বলছিল?

আমার মাথায় বাপু, এত সব ব্যাপার ঢুকতে চায় না। গেঁয়ো মানুষ তো। মোনারও দেখলুম, পারুলের ওপর একটুও রাগ নেই। বরং বলছিল তোমরা সবাই নাকি পারুলের মধ্যে একটা দেবী-দেবী ভাব দেখতে পাও। হ্যাঁ ঠাকুরপো, তোমাদের সবারই কি একসঙ্গে একটু মাথার দোষ হল?

তা নয় ঠাকরোন। পারুলকে আমি ভোগ্যবস্তুর মতো ব্যবহার করে যে মস্ত ভুল করেছিলাম তা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি। মেয়েরা তো শুধু ভোগ্যবস্তু নয়, যদিও বেশির ভাগ পুরুষই তাই মনে করে। পারুল আমাকে

গ্রহণ না করে সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছিল। আর মোনার কথা বলব? আমার মনে হয় পারুলের মধ্যে মোনা সেই মেয়েটাকেই দেখতে পায় যে রকমটা সব মেয়েই হতে চায়।

উঃ বাপরে! এবার তুমি আমার মাথাটাই খারাপ করে দেবে। যা ভেবে নিয়েছ তোমরা তা সব মনগড়া। পারুলকে টং-এ চড়িয়ে কেন যে পুজো করতে লেগেছ জানিনে বাপু। যত সব পাগুলে কাণ্ড। একটু মর্ত্যে নেমে এসো তো এখন।

মৃদু হেসে অমল বলে, আচ্ছা, নামলাম। এবার বলো।

আমি বলি কী, মোনা যখন গাঁয়ে আর থাকতে চাইছে না তখন ওকে নিয়ে কলকাতায় যাও না কেন? এখানে বেচারার একঘেয়ে লাগছে।

যেতে তো হবেই। ছুটি ফুরিয়ে এল।

দু-একদিনের মধ্যেই চলে যাও।

মোনা তোমাকে জপিয়েছে বুঝি? তোমাদের এত ভাব হল কী করে বল তো! আগে তো ও তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাত না।

ভাব হয়েছে বটে, তবে ভালবাসাটা এখনও হয়নি।

কী করে হল?

হয়ে গেল। কারও কাধে মাথা রেখে কাদতে হবে তো!

ও, তাও তো বটে। মোনা তোমার কাঁধটাই বেছে নিয়েছে তাহলে?

ওরকমই ধরে নাও না কেন?

পারুল আর আমার ঘটনাটা তোমাকে মোনা বলল কেন ঠাকরোন? ও কি চাইছে ব্যাপারটা চাউর হোক?

দুঃখে দুঃখে বলে ফেলেছিল। ভয় নেই, কথাটা পাঁচকান হবে না।

হলেই বা আমার কী বল! আমার কিছু আর যায় আসে না। কিন্তু পারুলের সম্পর্কে রটনা হলে আমার খারাপ লাগবে। ওর তো দোষ ছিল না!

একেবারেই ছিল না?

না ঠাকরোন।

আমি বিশ্বাস করি না।

কেন করো না?

আমিও মেয়েমানুষ বলেই।

অমল হাসছিল। বলল, দুনিয়ার সব ঘটনাই মানুষ নিজের নিজের মতো ব্যাখ্যা করে নেয়।

তুমি তোমার মতো বুঝেছ, আমি আমার মতো করে বুঝে নিয়েছি।

ঠাকরোন, আলোচনাটা আজ থাক। ঘটনাটা তো সুখের স্মৃতি নয়। যত ঘাঁটব তত মনটা খারাপ হবে।

তোমার বাপু, সবটাতেই বড় বাড়াবাড়ি। কবে কী হয়েছে তাই নিয়ে একেবারে দুঃখদাস হয়ে বসে আছ, বউকে ভালবাসতে পারলে না, সংসার মন দিলে না। নিজের দোষ ভেবে মনমরা হয়ে থাক। এমন কী ঘটনা যে আউল-বাউল হয়ে যাচ্ছ?

মাথা নেড়ে অমল বলে, আউল-বাউল নই, দুঃখদাসও নই।

তাহলে আবার কী! ওই যে বলেছিলাম, মনে আছে?

কী বলেছিলে?

বর-বউ এক বিছানায় শোও এখন থেকে।

তাতেই হবে?

শুয়েই দেখো না। আর কলকাতায় যাও।

অমল হেসে ফেলে বলে, তোমার প্রেসক্রিপশন বড্ড সহজ-সরল। আমাদের সমস্যাটাও যদি তাই হত।

আচ্ছা মশাই, বউকে ভালবাসা কি এতই কঠিন কাজ?

ভালবাসা কখন কঠিন হয় জান?

কখন?

যখন ভালবাসা জিনিসটাই বুকের ভিতর থেকে উবে যায়। তুমি বউকে ভালবাসার কথা বলছ, আমার যে কোনও কিছুর প্রতিই আর ভালবাসা নেই। বেঁচে থাকাটাও আর ভাল লাগে না।

বলে কী গো! শুধুই পারুল! আর কিছু নয়?

মৃদু হেসে অমল বলে, না ঠাকরোন, পারুলও নয়।

তবে তোমাকে খেলো কে?

সেইটেই তো ভাবি।

আর ভাবনা-কাজী হয়ে বসে থেকো না। মোনাকে নিয়ে কলকাতায় যাও।

কেন যে কলকাতায় যাওয়ার জন্য হুড়ো দিচ্ছ! কলকাতাতেই কি আমি ভাল থাকি?

সে জন্য নয়।

তাহলে?

পারুল এখন গাঁয়ে আছে। পুজোর পর চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শুনছি তার নাকি আবার ছেলেপুলে হবে। সবে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। কিছুদিন থাকবে এখন। ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিচ্ছে জামশেদপুরে। ব্যাপারটা বুঝেছ?

না তো! পারুল গায়ে থাকবে বলেই কি আমাকে কলকাতায় তাড়াতে চাইছ?

এই তো বুঝেছ!

তার মানে কি পারুল আর আমার এক গাঁয়ে থাকাতেও তোমাদের আপত্তি?

আমার আপত্তি নয় ভাই। মনে হয় মোনা এটাকে ভাল চোখে দেখছে না।

তোমাকে তাই বলেছে বুঝি?

বলা নয়, তবে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে।

সন্দেহটা অমূলক ঠাকরোন, তবু তোমার কথা আমি মানব।

কবে যাবে?

কাল সকালেই।

যেও। তোমাকে যেতে বলছি বলে রাগ করলে না তো ভাই?

না। তুমি তো ভাল ভেবেই বলেছ. রাগ করব কেন?

আর যা বললাম তা মনে রেখো। চল্লিশের ওপর বয়স হল তোমার। এই বয়স থেকেই কিন্তু পুরুষদের বউকে খুব দরকার হয়।

তাই নাকি?

নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি ভাই। যত বয়স বাড়ে ততই বউকে বেশি বেশি দরকার হয়। পুরুষদের উড়নচণ্ডী, বারমুখো ভাবটা তো বয়স হলে কমে যেতে থাকে। তখন একটু আসকারা চায় বউয়ের কাছে। তুমি টের পাও না?

না তো!

ও কেমন কথা!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অমল বলে, এখন আমার কাউকেই দরকার হয় না তেমন। অফিস থেকে ফিরে নেশা করি। তার পর ঘুমোই।

ওটা কি একটা কথা হল? নেশা করে পড়ে থাকলে কি সমস্যার সমাধান হয়?

তুমি মোনার উকিল হয়েছ, ভাল কথা। কিন্তু আমি যে মোকদ্দমায় হেরেই বসে আছি ঠাকরোন, আমার জন্য আর কারও কিছু করার নেই।

তুমি যে কেমন হয়ে গেলে ভাই। বড্ড কষ্ট হয় তোমার জন্য। কত রোখাচোখা চালাক-চতুর ছিলে! এখন কেমন ভ্যাবলার মতো চুপচাপ বসে থাক! কী হয়েছে তোমার? একটু ডাক্তার দেখাও না।

ঠিক আছে, তাই না হয় দেখাব।

তুমি হাসছ! তার মানে ডাক্তারও দেখাবে না।

তুমি তো একটা প্রেসক্রিপশন দিয়েছ। সেটাই ফলো করে দেখি।

দেখো গো দেখো। তাতে ভালই হবে।

প্রেসক্রিপশন কাজে লাগানোর কোনও ইচ্ছেই ছিল না অমলের। বউদি চলে যাওয়ার পর সে তার ডায়েরি টেনে নিয়ে বসল। কিছু একটা লিখতে ইচ্ছে করছে। আজকাল নানা উদ্ভট কথা বা আইডিয়া তার মাথায় আসে। এগুলো কারও কোনও কাজে লাগার কথা নয়। অমল তবু লিখে রাখে, নিজের মনের একটা চিত্র রেকর্ড হয়ে থাকে। সে যদি অনেকদিন বেঁচে থাকে— যদি তাকে বেঁচে থাকতেই হয়— তাহলে বুড়ো বয়সে সে ডায়েরির পাতা উলটে এই অচেনা অমলকে খুঁজে বের করবে, বিচার করবে, বিশ্লেষণ করবে। সিরিয়াস কিছু নয়, একটা খেলা বলেই ধরে নেওয়া যাক। লিখতে লিখতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

রাতে খেয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ফের লিখছিল সে। একটু বেশি রাতের দিকে দরজায় মৃদু টোকার শব্দ হল।

চমকে উঠে অমল বলল, কে?

আমি। দরজাটা খোলো।

মোনা কাছাকাছি এলেই আজকাল সে ভয় পায়। মনে মনে নানা ব্যারিকেড রচনা করতে থাকে। কোন কথার কোন জবাব দেবে বা কতটা নীরব থাকবে। শেষ অবধি ব্যারিকেড কাজে লাগে না। আজকাল নীরবতাই তার একমাত্র ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সে দরজা খুলে দেখল, মোনা এই শীতেও একটা হলুদ রঙের নাইটি পরে দাঁড়িয়ে।

কিছু বলবে?

মোনা তার গা ঘেঁষে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর মুখোমুখি হয়ে বলল, শুনলাম কাল কলকাতায় ফিরতে রাজি হয়েছ!

হ্যাঁ, আরও দুদিন ছুটি ছিল। ভাবছি ফিরেই যাই।

হঠাৎ সুমতি হল কেন?

সুমতি কুমতি নয় মোনা। ফিরে গেলেও হয়।

জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেলেছ?

বিস্মিত অমল বলে, তুমি তো জানোই আমার জিনিসপত্র বলতে ওই অ্যাটাচিকেসটা। এ-ঘরে তো আর কিছু নেই।

কী করছিলে? ডায়েরি লেখা?

হ্যাঁ।

কী লিখছ ডায়েরিতে? আমার সম্পর্কে কিছু?

হঠাৎ অমল বুঝতে পারল, মোনা যুদ্ধ করতে আসেনি। এসেছে সন্ধি করতে। সম্ভবত বউদি ওকেও তাব গ্রাম্য প্রেসক্রিপশনটা গিলতে বাধ্য করেছে।

ডায়েরি আর কলম রেখে দিল অমল। বলল, না, তোমার সম্পর্কে বা কারও সম্পর্কেই কিছু নয়। মাথায় অনেক কথা আসে। লিখে রাখি।

মোনা দু হাতে তার এলোচুল গোছ করছিল। মুখাবয়বে একটু ভ্রূকুটি। ঠোঁট দুটো চেপে বসে আছে। দেহ মিলনের প্রস্তাবটা দিতে লজ্জা বা সংকোচ বোধ করছে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মাঝে মাঝে এত দুস্তর ব্যবধান রচিত হয় যে, কিছুতেই সহজ হওয়া যায় না।

বোসো মোনা।

বসব?

যদি আপত্তি না থাকে।

মোনা বসল।

কথাটা বউদিকে না বললেও পারতে।

কোন কথাটা?

আমার আর পারুলের।

মোনা মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ বসে রইল। জবাব দিল না।

ধীর স্বরে শান্তভাবে অমল বলে, বউদি গাঁয়ের মেয়ে তো। কথা ছড়ানো ওদের স্বভাব।

মোনা তার চুলের একটা গুছি সামনে এনে নীরবে পাক খাওয়াতে লাগল।

তোমার ইচ্ছে হলে অবশ্য পাঁচজনকে বলতে পার। আমার আর তাতে কোনও লজ্জা বা ভয় নেই। কিন্তু স্ক্যান্ডালটা হয়তো দুটো পরিবারের ক্ষতি করবে। যদিও অনেকদিন আগেকার ঘটনা তবু তারও কিছু প্রতিক্রিয়া তো আছেই। পাড়াগাঁয়ের নিষ্কর্মা মানুষ এসব কেচ্ছা নিয়ে খুব কথা চালাচালি করে।

দিদি বলবে না। কথা দিয়েছে।

অমল ম্লান একটু হেসে বলে, তুমিই তো সিক্রেটটা রাখতে পারলে না, অন্যে রাখবে সেটা কি আশা করা যায়?

আই অ্যাম সরি।

দোষ আমার বড় কম নয় মোনা। তবে আমি এখন এমন একটা মেন্টাল স্টেটে আছি যে এসব আমাকে তেমন স্পর্শ করে না। তোমাকে সত্যিই বলছি, পারুল ভাল মেয়ে। তার দোষ ছিল না। সে আমাকে বিয়ে না করে তার প্রতিবাদও জানিয়েছে। আমি যেমনই হই, পারুলকে খারাপ বলতে পারি না।

মোনা কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, আজ আমি তোমার কাছে অন্য কিছুর জন্য এসেছিলাম। পারুলের কথাটা না তুললেই হত না?

অমল ম্লান হেসে বলে, কেন এসেছ মোনা?

মোনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আজ থাক। কাল সকালে তাহলে আমরা কলকাতা যাচ্ছি?

হ্যাঁ যাচ্ছি। পাক্কা।

তোমার মেয়েও কি যাবে?

তা তো জানি না। ও কি থাকতে চাইছে?

আমার সঙ্গে কথা হয়নি।

তুমি কী বলো? ওকে রেখে যাবে?

না। এখানে ওর পড়াশুনো হবে না। ব্যায়াম হবে না। মিউজিক ক্লাস বা কম্পিউটার তেমন কিছুই হবে না। ও কেন থাকতে চাইছে এখানে জানো?

না।

ও বাজে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারবে। যেমন খুশি চলবে, যা খুশি করবে। এ বাড়ির লোকদেরও তো দেখছি। ভীষণ আনকালচার্ড।

তাহলে জোর করে নিয়ে চলো।

বিস্মিত মোনা বলে, তুমি জোর করতে বলছ?

বলছি। আর কি কোনও উপায় আছে?

জোর করারই বা উপায় কী? চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে?

অমল নিভে গিয়ে বলল, ভায়োলেন্সের কথা বলিনি।

ও যেতে চাইবে না, আমি জানি। বকে ঝকে বুঝিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কোনওভাবেই রাজি করাতে পারিনি। ও তো আমাকে শত্রু বলে ভাবে।

অমল দুর্বল গলায় বলে, তাহলে কী উপায়?

আমি বুঝতে পারছি না।

অমল চুপ করে বসে রইল। তার বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, যেতে যখন চাইছে না তখন থাক। কিন্তু এর আগে একবার কথাটা বলে ফল ভাল হয়নি। তাই বলল না।

তুমিই জোর করার কথা বলছিলে। জোর কীভাবে করবে?

যদি বুঝিয়ে বলা যায়?

বুঝিয়ে বলা আর জোর করা এক ব্যাপার নয়। বুঝিয়ে বললে ও রাজি হবে না। তখন কী করবে?

অমলের মাথা কাজ করে না আজকাল। তবু হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। সে বলল, কয়েকদিন আগে বুড়ঢা আমাকে বলছিল, দিদির ই-মেল-এ অদ্ভুত অদ্ভুত মেসেজ আসছে। তার কোনও কোনওটা নাকি খুব অশ্লীল জাঙ্ক মেল।

আমাকে বলেনি তো বুড়ঢা ।

বুড়ঢাকে জিজ্ঞেস করলেই বলবে। ওর কথা শুনে আমিও সোহাগের ই-মেল চেক করেছি। কথাটা মিথ্যে নয়।

কোথা থেকে আসছে? আমেরিকা?

মোস্টলি।

খুব খারাপ কথা?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অমল বলে, খুব খারাপ। লেসবিয়ান সম্পর্কের কথাও আছে। সেগুলো আমি ডেস্ট্রয় করে দিয়েছি। কিন্তু মনে হয় এরকম আসতেই থাকবে।

জাঙ্ক মেল তো আমারও আসে, তোমারও আসে।

হ্যাঁ, সেগুলো কারা পাঠায় তা আমরা জানি না। কিন্তু সোহাগের কাছে যারা পাঠায় তারা সবাই ওর অচেনা নাও হতে পারে।

ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবল মোনা। তারপর বলল, কিন্তু জাঙ্ক মেল-কে ভয় পেলে তো আমাদের চলবে না। ওটা কোনও বড় ফ্যাক্টরও নয়। তার চেয়ে ওর কলকাতায় যাওয়াটা অনেক জরুরি।

হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলছি।

তাহলে এখন কী করব?

তৈরি হও।

আমি তৈরিই আছি। তোমার মেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওকে ঘুম থেকে তুলে কাল কলকাতায় যাওয়ার কথা বলা ঠিক হবে কি?

তা কেন? ঘুমোচ্ছ ঘুমোক। কাল সকালেই বলে দেখো।

রাজি না হলে?

তখন ভাবা যাবে।

ভাবার সময় হবে কি?

আমরা কাল সকালে না গিয়ে দুপুরে বা আফটারনুনেও যেতে পারি। সময় পাওয়া যাবে।

সকালে একটা ভাল ট্রেন ছিল।

বর্ধমান থেকে কলকাতায় যাওয়ার কি ট্রেনের অভাব মোনা? দুপুরে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসও তো আছে।

মেয়েকে কী বলবে তা তৈরি করে রেখো।

আচ্ছা।

আমি যাচ্ছি।

অমল একটু দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলে, যাবে?

উঠে দাঁড়িয়েও বসে পড়ল মোনা, থাকতে বলছ?

ভাগ্যক্রমে দেহমিলনের জন্য ভালবাসার দরকার হয় না এবং কাম প্রেমের দাস নয়। এবং বেশির ভাগ দম্পতিই বিয়ের বহু বহু বছর পরে প্রেমহীন চুম্বন, ভালবাসাহীন মিলনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

গভীর রাতে ক্লান্ত দুই নরনারী বিভিন্ন হল।

আমি ও-ঘরে যাচ্ছি।

যাও।

উঠে দরজাটা বন্ধ করে দাও।

ভেজিয়ে রেখে যাও, কিছু হবে না।

সামনে সমস্যাসংকুল এক সকাল আসছে। কী হবে কে জানে। মনে দুশ্চিন্তা নিয়েও ঘুমিয়ে পড়ল অমল।

একটা রোগা সাদা ছোট্ট ঘোড়া এসে নীচের উঠোনে চুপ করে দাড়িয়ে আছে। একেবারে চুপ। নড়ছে না, চড়ছে না। মাঝে মাঝে শুধু ঝামরে উঠছে লেজ।

ওপর থেকে দেখছিল সোহাগ। এত রোগা যে দেখলে মায়া হয়। হাড় জিরজিরে শরীর, বড্ড ছোটোখাটো।

একটা কালোমতো ফ্রক-পরা মেয়ে কোথা থেকে খানিকটা ঘাস ছিঁড়ে এনে মুখের কাছে ধরল। ঘোড়াটা খেল না। মুখ ফিরিয়ে নিল। সেই মেয়েটাই গিয়ে ঝপাং করে কুয়ো থেকে এক বালতি জল এনে ধরল মুখের সামনে। ঘোড়াটা জলও খেল না।

মেয়েটা ওপর দিকে চেয়ে বলল, ও সোহাগদিদি!

কী রে?

ঘোড়াটা কিছু খাচ্ছে না যে!

ওর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে।

ও বাবা, যদি কামড়ে দেয়?

ঘোড়া কি বাঘ যে কামড়াবে?

কামড়ায় গো। আমার মামাকে কামড়েছিল যে!

দে না একটু হাত বুলিয়ে।

তার চেয়ে বরং তাড়িয়ে দিই।

আহা, তাড়াস না। বড্ড রোগা যে!

মেয়েটা খুব ভয়ে ভয়ে ঘোড়ার মাথায় একটু হাত দিতেই ঘোড়াটা হঠাৎ সামনের দু পা তুলে প্রবল গর্জন করে উঠল, চিঁ হিঁ হিঁ...

মেয়েটা লাফ দিয়ে সরে এসে হিহি করে হাসল।

হাসছিস কেন?

কী বলল শুনলে না?

কী বলল?

বলল, আমি সোহাগের জন্য এসেছি।

যাঃ। ও তো শুধু চি হিঁ হিঁ করে ডাকল!

তুমি কিচ্ছু জান না। আমি ঘোড়ার কথা বুঝতে পারি।

আমাকে ওর কী দরকার?

তা কী জানি! তোমার ঘোড়া তুমি এসে দেখো।

এ কথা শুনে সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েই সোহাগ দেখল সে উঠোনে ঘোড়াটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ঘোড়াটা পরিষ্কার মানুষের গলায় বলল, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। সময় নেই...

সোহাগ কখন উঠল কে জানে, হঠাৎ দেখল সে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে আর ঘোড়াটা টগবগ টগবগ করে চলেছে।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে বল তো!

ঘোড়াটা জবাব দিল না। চলল আর চলল। টগবগ টগবগ।

সামনেই একটা গভীর সবুজ জঙ্গল। এত সবুজ যে মনে হয় সদ্য কেউ সবুজ রঙে চারদিককে চুবিয়ে গেছে। আর এরকম অদ্ভুত গাছপালা সে কখনও দেখেছে কি? দেখেছে, তবে ছবিতে। গাছপালা একটাও তার চেনা নয়। বিশাল বড় বড় পাতা, খুব বড় বড় সব গোল ফল চারদিকে ফলে আছে। আর দেখল মস্ত আকাশের আধখানা জুড়ে কী বিশাল চাঁদ উঠছে। চাঁদ কি এত বড় হয়? কে জানে বাবা, হয়তো হয়।

চারদিকে আলো আর আলো। আর গাছপালা। আর তার ফাঁকে ফাঁকে ফর্সা আলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে খরগোশ, হরিণ, ময়ূর, টিয়ার ঝাঁক, জেব্রা, ন্যু, নীল গাই।

বড্ড ভাল তো জায়গাটা। এখানে একটা চড়ুইভাতি করলে কেমন হয়?

ঝুমঝুম করে একটা ঝুমঝুমির শব্দ হচ্ছিল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা লোক দৌড়পায়ে আসছে। তার কাছাকাছি এসে লোকটা হাত তুলে বলল, এই যে! আপনার একটা চিঠি আছে।

লোকটার পোশাক দেখে ভারী মজা পেল সোহাগ। পরনে একটা খাকি হাফ প্যান্ট আর গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি।

আপনি বুঝি ডাক হরকরা?

হ্যাঁ। অনেক চিঠি বিলোতে হবে। যাই।

খামের চিঠিটা হাতে নিয়ে সে দেখল খামের মুখটা খোলা। চিঠিটা বের করে দেখল নীল কাগলে কে যেন অনেক অসভ্য কথা লিখেছে ভুল ইংরিজিতে। সে রেগে গিয়ে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিল।

ও মা! পান্না!

পান্না অভিমানভরে বলে, সেই কখন থেকে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। এত দেরি করলে যে!

কী করব, ঘোড়াটাই যে দেরি করে গেল আমাকে আনতে।

এবার নামো। দেখছ কেমন সুন্দর জায়গা।

এই জায়গায় আমরা পিকনিক করব, তাই না পান্না?

হ্যাঁ। এখন চলো, কাজ আছে।

জঙ্গলে আবার কী কাজ?

বাঃ, মনে নেই? সেই যে—

কী বল তো!

এসো আমার সঙ্গে, দেখবে।

পান্নার পিছু পিছু হেঁটে সোহাগ গভীর জঙ্গলের মধ্যে পৌঁছে দেখতে পেল, ঘাসের ওপর একটা কম্পিউটার। তার সামনে একজন লোক বসে আছে। সে কাছে যেতেই লোকটা মুখ ফেরাল। আর বড্ড চমকে উঠল সোহাগ। বুকটা ধকধক করছে। লোকটা হেসে বলল, তুমি ইন্টারনেট খুঁজছিলে খুকি? এই তো ইন্টারনেট। অ্যান্ড ইউ হ্যাভ এ মেসেজ।

লোকটা বিজু।

ত্রিশ

একটা চারকোনা কাগজের মধ্যে থেমে আছে সময়, থেমে আছে ইতিহাস। গৌরহরি দাঁড়িয়ে আছে একটা মৃত বাঘের পেটের ওপর এক পা রেখে। হাতে বন্দুক। মাথায় শোলার হ্যাট। পরনে খাকি প্যান্ট আর সাদা হাফশার্ট। দুখানা চোখ ছবিতেও জ্বলজ্বল করছে। পিছনে জঙ্গলের সিনারি।

হেসে কুটিপাটি হচ্ছিল পারুল, আচ্ছা, বাবা আবার কবে বাঘ মারল বলো তো! জীবনে কখনও শিকার-টিকার করেছে বলে তো শুনিনি!

বলাকা মুগ্ধ চোখে চেয়ে ছিল। ছবিটা মিথ্যে এবং সাজানো। গৌরহরি কখনও বাঘ মারেনি। মনোরঞ্জন সাহা ছিল গৌরহরির মক্কেল। তার স্টুডিওতে শখ করে ছবিটা তুলে দিয়েছিল। হোক মিথ্যে, তবু কী পৌরুষদীপ্ত দেখাচ্ছে মানুষটাকে! বাঘ মারতে চাইলে গৌরহরি কি মারতে পারত না? পারত। তার স্বামীর পক্ষে অসম্ভব কিছুই ছিল বলে বলাকার কখনও মনে হয় না।

বলাকা মৃদু হেসে বলে, এ ছবিটা তুই দেখিসনি, না?

না তো!

এক মক্কেল তুলে দিয়েছিল। তার স্টুডিওতে ট্যাক্সিডার্মি করা বাঘ-ভালুক ছিল বলে শুনেছি। ছবিটা অনেকদিন খুঁজে পাইনি। এই সেদিন আলমারি হাঁটকাতে গিয়ে কাগজপত্রের মধ্যে পেলুম। সুন্দর না?

সুন্দর। আমার বাবা তো সুন্দরই ছিল। কিন্তু ছবিটা বড্ড নাটুকে। বাঘশিকারি বীর সাজার কী দরকার ছিল বাবার?

দরকারটা তোর বাবার ছিল না, ছিল মক্কেলের। শুনেছি, ছবিটা সে স্টুডিওর শো-কেসে সাজিয়ে রেখেছিল। লোকে ভাবত কোনও সাহেবের ছবি।

তাই বলো! তার মানে এটা হল মডেল হিসেবে বাবার পোজ দেওয়া।

তাই হবে বোধহয়। ছবিটা আমার বেশ লাগে। বাঘ না মারলেও ডাকাবুকো তো ছিল।

তা সত্যি। আমার বাবার মতো সাহসী মানুষ আমি অন্তত দেখিনি। সেই ডাকাতের গল্পটা বলো না মা! সেই যে হরিপুরের দাদুর বাড়িতে—

বলাকার শরীর এতকাল পরেও শিউরে উঠল। কতকাল আগেকার কথা, তবু যেন মনে হয় এই সেদিন—না, কত নয়—মনে হয়, গতকালকের কথা। না, আরও টাটকা। যেন আজকের ঘটনা, যেন এখনই ঘটছে।

হরিপুরের খুড়শ্বশুর ছিলেন দিলদরিয়া মানুষ। বাগানের শখ ছিল খুব। বাগানের শাকসবজি, আম কাঁঠাল নিয়ে মাঝে মাঝে চলে আসতেন। জমিয়ে গল্প করতেন। খাওয়া-দাওয়ারও খুব শখ ছিল। সেই মানুষটার সেবার এখন তখন অবস্থা। মরার সময় ঘনিয়ে এলে মানুষ সূক্ষ্মভাবে ঠিক টের পায়, আর তখন

আত্মীয়স্বজনকে দেখার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি হতে থাকে। হরিপুর থেকে খবর এল, খুড়শ্বশুর তাদের দেখতে চান।

একটু বৈষয়িক দরকারও ছিল। খুড়শ্বশুরের বড় ছেলে নিজের পছন্দে বিয়ে করেছিল বলে তাকে আগেই ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেছিলেন। এখন উইল করে সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করার জন্য পাকা ব্যবস্থা করতেও গৌরহরিকে ডাকা।

সেটা মাঘ মাস ছিল, মনে আছে বলাকার। দুপুরে তারা বাসে চেপেছিল। ঘরের বার বেশি হত না বলেই সেই সামান্য সামান্য ভ্রমণগুলোই অসামান্য লাগত বলাকার কাছে। জানলার ধারে বসে ঠান্ডা বাতাস উপেক্ষা করে বাইরের জগতটা দেখছিল সে।

তখন এক গা গয়না পরে থাকতে হত বলাকাকে। শ্বশুরমশাই এবং শাশুড়ি ঠাকরুন দুজনেই পছন্দ করতেন তাঁদের বড়বউ সবসময়ে গয়না পরে থাকুক। পথেঘাটে তখন এত বিপদ-আপদ ছিল না বলেই গয়নাগুলো খুলেও রেখে যায়নি বলাকা। যোলো-সতেরো বছর বয়সে অত হিসেবনিকেশ করে চলার বুদ্ধিও তো হয়নি।

বাসে একটা লোক গৌরহরির সঙ্গে বেশ গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়ে ফেলল। কোথায় যাচ্ছেন, কী করা হয়, কোথা থেকে আগমন—এইসব অকারণ কৌতূহল।

তারা যেখানে নামল লোকটাও সেখানেই নামল। বাসরাস্তা থেকে হরিপুর মাইল দুই হাঁটা পথ। গোরুর গাড়ি যায় বটে, কিন্তু রাস্তা খারাপ বলে সময় বেশি লাগে। তাই তারা হেঁটেই যাচ্ছিল। লোকটাও তাদের সঙ্গে কিছু দূর এল। তারপর, "এবার আমি গাঁয়ের রাস্তায় যাব" বলে হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেল।

বলাকা দেখল, গৌরহরির মুখটা একটু গম্ভীর। তখন স্বামীর মুখ গম্ভীর দেখলেই বলাকার মন খারাপ হত।

সে বলল, কী ভাবছ গো! কাকার জন্য মনখারাপ?

গৌরহরি বলল, হুঁ।

কয়েক কদম গিয়ে গৌরহরি দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে দেখে নিল একটু। দেখার অবশ্য কিছু ছিল না। নির্জন মাঠঘাট, ঝোপঝাড়, বাঁশবন।

কী হল গো?

গৌরহরি মৃদু হেসে বলল, গয়নাগুলো পরে এসে ভুল করেছ বলাই। কিন্তু কী আর করা যাবে।

বলাকা ভয় পেয়ে বলে, হঠাৎ গয়নার কথা বলছ কেন?

এমনি বললাম। ভয় পেও না।

না, তুমি মোটেই এমনি বলোনি। কিছু হবে নাকি গো?

আরে না। আর হলেই বা কী! চলো।

খানাখন্দে ভরা রাস্তায় চলতে চলতেই শীতের বেলা ফুরিয়ে আসছিল। কে যেন আলোর বিছানো চাদরটা টেনে নিচ্ছে দ্রুত। চারদিকে ঝুঁঝকো আঁধারের জাল নেমে আসছিল। বলাকার বুক ঢিপঢিপ করছিল।

হ্যাঁ গো, ওই লোকটা তোমাকে কিছু বলেছে?

না তো!

তাহলে তুমি চিন্তা করছ কেন?

গৌরহরি মৃদু হেসে বলল, লোকটা মুখে কিছু বলেনি। তবে চোখ দিয়ে বলেছে।

তার মানে কী গো! চোখ দিয়ে কী বলল?

উকিল মানুষ তো, ক্রিমিন্যাল চিনতে পারি।

কিন্তু লোকটা তো চলে গেল।

হ্যাঁ।

বলাকা রাগ করে বলল, তুমি কিছু খুলে বলছ না।

ভয়ের কী! আমি তো সঙ্গে আছি।

আমার ভয়-ভয় করছে যে!

ভয় পেও না। ভয় পেলে বুদ্ধিনাশ হয়। আর বুদ্ধিনাশ হলেই বিপদ।

আমাদের কি কোনও বিপদ হবে?

মনে হয় না। তবু ভালর জন্য যে কটা গয়না পার খুলে ফেল গা থেকে।

গয়না খুলব?

হ্যাঁ। সব খোলার দরকার নেই। যেগুলো সহজে খোলা যায় শুধু সেগুলো খুলে আমার হাতে দাও।

বলাকা খুব তাড়াতাড়ি নেকলেস, বালা, দুল, আংটি খুলে ফেলতে পেরেছিল। গৌরহরি সেগুলো রুমালে জড়িয়ে পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে দিল। ডান হাতে চামড়ার স্যুটকেস আর বাঁ হাতে বলাকার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিরুদ্বেগ গলায় বলল, ছুটছাট ঝামেলা বিপদ তো জীবনে ঘটেই থাকে। শুধু বলে রাখি বিপদ ঘটলে দৌড়ে পালাতে যেও না। মাটিতে উবু হয়ে বসে পোড়া।

কথা শুনে বলাকার বুকে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল গৌরহরির হাত।

তখনও আলো সম্পূর্ণ মরে যায়নি। হরিপুরের গাছপালা দেখা যাচ্ছিল দূর থেকে। দু-চারটে আলোও জ্বলে উঠছিল। হঠাৎ বাঁ ধারের মাঠ বরাবর সাত-আটজন লোককে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। হাতে লাঠি, সড়কি, দা।

ও ওরা কারা আসছে গো? অ্যাঁ! ওরা কারা?

আমার পিছনে আড়াল হও বলাই।

ওরা কি ডাকাত?

শান্ত স্বরে গৌরহরি বলেছিল, এরা ছ্যাঁচড়া ডাকাত। ভয় নেই।

গৌরহরি লোকগুলোকে দেখে ঘাবড়াল না, পালাল না। বলাকাকে উবু হয়ে বসতে বলে শান্তভাবে তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইল। বলবান শরীরটা ছাড়া তার কোনও অস্ত্র ছিল না। না ছিল, চরিত্র ছিল, দুর্জয় সাহস ছিল। সেগুলোও কি মানুষের অস্ত্র নয়?

লোকগুলো এত তাড়াতাড়ি চলে এল কাছে যে, বলাকা কিছু ভাববারও সময় পেল না। চোখের পলকে ঘিরে ধরল তাদের। লম্বা চওড়া একটা লোক গৌরহরির বুকে বল্লম ঠেকিয়ে বলল, দিয়ে দে, দিয়ে দে। প্রাণে মারব না। দিয়ে দে।

কী চাও?

গয়নাগুলো দে। তাড়াতাড়ি...তাড়াতাড়ি...অ্যাই, ওই যে মেয়েটা ঘাপটি মেরে বসে আছে, খুলে নে তো গা থেকে...

একটা লোক এগিয়ে এসে বলাকাকে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল।

বোধহয় এইটেই ভুল করেছিল ডাকাতেরা। বলাকার গায়ে হাত না দিলে গৌরহরি হয়তো গয়নাগুলো দিয়ে দিত, ঝামেলা করত না।

হাতের স্যুটকেসটা একবার দুলিয়ে গৌরহরি প্রথম মারল সর্দার লোকটাকে। সে ছিটকে যেতেই কার হাত থেকে একটা লাঠি হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিয়ে গৌরহরি যেন দশটা গৌরহরি হয়ে গেল।

কাঁপতে কাঁপতে কাঁদতে কাঁদতে দৃশ্যটা দেখছিল বলাকা। আবার ওই ভয় উত্তেজনা উদ্বেগে ভাল করে দেখেওনি কিছু। শুধু দেখল, লোকগুলো কেমন দিশেহারা হয়ে গেল। দু-চারজন মার খেয়ে এবং বাকিরা ভড়কে গিয়ে তফাত হচ্ছিল যেন। বলাকা চোখ বুজে ফেলেছিল এরপর।

লোকগুলো তেমন উঁচুদরের ডাকাত নয়। হয়তো চাষি-বাসি। মাঝেমধ্যে শৌখিন ডাকাতি করে। গৌরহরির রুদ্রমূর্তি আর রাগ দেখে তারা পালিয়ে গেল। দুটো লোক পড়েছিল মাঠে।

টর্চ জ্বেলে গৌরহরি দুজনের মুখ দেখে নিল। তারপর বলল, চলো বলাই, আর ভয় নেই।

গৌরহরি অক্ষত ছিল না। সড়কি লেগেছিল হাতে। লাঠির ঘায়ে কান ছেঁচে গিয়েছিল। বেশ রক্তপাত হয়েছিল। বলাকা যখন তাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদছিল তখন গৌরহরি বলল, কাঁদো বলেই তো লোকে পেয়ে বসে।

তোমাকে যদি মেরে ফেলত?

আচ্ছা বলাই, আমাকে মেরে ফেলত বলেই তুমি শুধু ভয় পেয়ে কাঠ হয়ে থাকবে? বরং এক আধটা ঢ্যালা তুলে ছুড়ে মারতেও তো পারতে। পুজোর সময় মা দুর্গাকে তো খুব প্রণাম করো, অঞ্জলি দাও, মা দুর্গার লড়াইটা নিতে পারো না?

বলাকা কথাটা আজও ভুলতে পারে না। খুব শিক্ষা দিয়েছিল তাকে গৌরহরি। উপদেশ দিলে মানুষ শেখে না, কিন্তু পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যখন উপদেশ উঠে আসে তখন মানুষ সহজেই শেখে।

খুড়শ্বশুরের বাড়িতে ঢুকবার আগে গৌরহরি বলেছিল, ঘটনাটা কাউকে বলার দরকার নেই। হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম বলে চোট হয়েছে, এটা বলাই ভাল।

আশ্চর্যের বিষয় নিজের এই বীরত্বের কাহিনী কখনও গৌরহরিকে কারও কাছে বলতে শোনেনি বলাকা। যেন কিছুই ঘটেনি, এমনই নির্লিপ্ত থেকেছে মানুষটা।

গল্পটা পারুলের কাছে বলতে বলতে সেই সন্ধেটা যেন ঘিরে ধরল চারিদিকে। যেন পাশেই রয়েছে গৌরহরি। বাঘের মতো চোখ জ্বলছে, দুই সবল হাতে লাঠি চালাচ্ছে প্রবল বিক্রমে।

শুনতে শুনতে চোখ ছলছল করছিল পারুলের।

আচ্ছা মা, সেদিন যদি বাবা ডাকাতের হাতে মারা যেত তা হলে আমাদের তো জন্মই হত না, তাই না?

তাই তো মা।

আর তুমি বোধহয় পাগল হয়ে যেতে।

না মা, আমি মরেই যেতাম। হার্টফেল হত।

খুব হাসল পারুল, সবাই বলে বাবার প্রতি তোমার যেমন ভালবাসা তেমনটা আর দেখা যায় না। নিঃশব্দে নীরবে তুমি বাবার জন্য সব কর্তব্য করেছ।

তারা ভুল বলে মা।

ভুল বলে?

বলাকা হাসলেন, একদম ভুল। কর্তব্য হিসেবে আমি তার জন্য কখনও কিছু করিনি।

কী যে বলো মা! আমরা তো জানি বাবা কেমন মেজাজি আর খেয়ালি ছিল। সময়-অসময়ে কত অন্যায় বায়না করত, তুমি কখনও রাগ করোনি। সব বায়না সামলেছ, তোমার জন্য আমাদের কষ্ট হত, বাবার ওপর রাগও হত, ভয়ে কিছু বলতাম না। সময় অসময়ে বাবা কতদিন অতিথি এনে হাজির করেছে, মনে নেই? অসময়ে তোমাকে ফের উনুন ধরিয়ে রাঁধতে হত। রান্নার তোক তো রাখা হয়েছে অনেক পরে।

সব মনে আছে মা। মনই তো এখন আমার বন্ধু। মন খুলে বসে সেসব দিনকে ফের কাছে নিয়ে আসি, চোখ ভরে সব দেখি। কিন্তু তুই যা বললি তা তোর নিজের মতো করে বিচার। আমি তো ওভাবে দেখি না। আমার কখনও কোনও কষ্ট হয়নি যে!

হয়নি?

না, কখনও হয়নি। যদি কর্তব্য হিসেবে করতাম তা হলে হত। আমি যা করেছি তা ওই মানুষটাকে ভালবেসে করেছি। কর্তব্যের মধ্যে কষ্ট থাকে, অনিচ্ছে থাকে, নিজের ওপর জোর খাটাতে হয়, শ্রদ্ধা থাকে না। ভালবাসায় ওসব নেই। ভালবাসলে সব করা যায়।

তোমার মতো ভালবাসা কিন্তু এ যুগে অচল। আরও পঞ্চাশ বছর পর জন্মালে তুমি পারতে না।

আরও দুশো বছর পরে জন্মেও যদি তোর বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় তাহলেও ঠিক একই রকম আমাকে দেখবি তোরা। ভালবাসা তো মুখের কথা নয় মা, ভসভসে আবেগও নয়, ভালবাসার মধ্যে তার জন্য করাটাও আছে। খুব ভালবাসি, কিন্তু তার জন্য কিছু করতে ইচ্ছেও করে না, সে ভালবাসা হচ্ছে সোনার পাথরবাটি।

পারুল হাসছিল, ইউ আর ইমপসিবল। বাবার ব্যাপারে তোমাকে কখনও টলতে দেখলাম না। হ্যাঁ, মা, একটা কথা বলবে?

বড্ড পেছনে লাগছিস আজ। আবার কী কথা?

বলছি ধরো বাবা যদি এত হ্যান্ডসাম না হত, এত পারসোনালিটি বা সাকসেস না থাকত তা হলে কি এত ভালবাসতে পারতে?

তা তো জানি না। তাকে যেমনটি পেয়েছি তেমনটিই পেয়েছি। আমার তো নালিশ নেই। রূপের আকর্ষণ তো বেশি দিন থাকে না। থাকে অন্য কিছু।

যাই বলো, আমার বাবা ওরকম না হলে কিন্তু তুমি কিছুতেই—

দুর পাগলি! এই যে বললি তোর বাবা খামখেয়ালি ছিল, আমার ওপর অন্যায় অত্যাচার করত। আরও অনেকে অনেক কথা বলে। আমার শাশুড়ি তো বুড়ো বয়সে আমাকে প্রায়ই বলত, ও বউমা, ওকে অত আসকারা দাও কেন বলো তো! তোমাকে ভাজা ভাজা করে খেল যে! কখনও-সখনও একটু মুখনাড়া দিও মা, নইলে পুরুষমানুষ নৃসিংহ অবতার হয়ে ওঠে কি না।

বলত বুঝি?

শাশুড়ি বলত, দেওর ননদরা বলত।

তুমি মানতে না?

মানব কি, শুনে তো আমার ওর জন্য কষ্টই হত। মনে হত বেচারার আমি ছাড়া তো বন্ধু নেই।

ওঃ, এ যে দারুণ ডায়ালগ।

পেছনে লাগছিস তো!

না মা, বাবার গল্প শুনতে আমার ভাল লাগে। এক গল্প কতবার শুনি, তবু পুরনো হয় না। তুমি বলো।

হৈমর গল্প তো শুনেছিস?

শুনিনি আবার! মুখস্থ। তবু বলো।

রায়বাড়ির হৈমর কথা ভাবলে আজও বলাকার মনটা মেদুর হয়ে যায়। ফর্সা টুকটুকে পুতুল-পুতুল চেহারা ছিল হৈমর। হাত পায়ের ডৌল কী সুন্দর। রক্তমাংসের মানুষ বলে মনেই হয় না। রায়েদের ছিল বংশানুক্রমিক বন্ধকী কারবার। বিস্তর পয়সা। হৈমর বাবা মাধবানন্দ রায়ের আমলে ব্যবসা যেন আরও ঠেলে উঠেছিল। তখনও বিয়ে হয়নি গৌরহরির। এম এ পাশ করে ল পড়ছে। ছুটিছাটায় বাড়ি এলে হৈম গিয়ে গৌরহরিকে বলত, তোমার আমার তো সামাজিক বিয়ে হওয়ার নয়, চলো পালিয়ে যাই। হৈমর রাখঢাক ছিল না, স্পষ্টাস্পষ্টি কথা।

গৌরহরি তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করত। সমস্যা হল হৈমরা বৈদ্য। আরও সমস্যা হল হৈম বালবিধবা।

গৌরহরি যদি হৈমকে মন থেকে অপছন্দ করত তা হলে সমস্যা হত না। কিন্তু মেয়েটির প্রতি গৌরহরিরও একটু আকর্ষণ ছিল। শুধু চেহারাই নয়, হৈমর একটা ভারী সুন্দর, সরল স্বভাব ছিল। কোনও উগ্রতা ছিল না। বয়সে গৌরহরির কাছাকাছি। খুব অল্প বয়স থেকেই তাদের মধ্যে একটা মনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তখন তো হুট করে কেউ সামাজিক সম্পর্ক ভেঙে ফেলত না।

হৈম বলত, আমি সেই কোন ছেলেবেলা থেকে তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে মনে করেই এতকাল শিবের মাথায় জল ঢেলেছি। আমার কী অপরাধ বলো।

গৌরহরি বলত, শুধু ভালবাসা সম্বল করে যদি পালিয়ে যাই তা হলে দেখবে ভবিষ্যতে কষ্টে পড়লে ভালবাসাটাও থাকবে না।

তাই কি হয়? আমি চিরকাল তোমাকে ভালবাসব।

ভালবাসাবাসিতে যেরকম সব কথা হয় তেমনই হত তাদের মধ্যেও। গৌরহরির বিয়ের জন্য যখন পাত্রী দেখা হচ্ছে তখন একদিন হৈম এসে কেঁদে পড়ল, তা হলে আমার কী হবে? আমি কী করে বাঁচব?

গৌরহরি বলল, হৈম, তোমাকে যদি বিয়ে করি তা হলে এমন একটা বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যে শেষে আমাদের পরিণতি ভাল হবে না।

গৌরহরির হাত ধরে অনেক সাধাসাধি করেছিল হৈম, অনেক কেঁদেছিল, শেষে এরকম অসম্ভব প্রস্তাবও করে বসেছিল, তা হলে আমাকে অন্তত একটা সন্তান দাও, তাকে নিয়ে বেঁচে থাকব।

গৌরহরি বলেছিল, দুনিয়ায় কি পাপের অভাব আছে হৈম? আমরা সেটা আর বাড়াব কেন?

বলাকা তখন নিতান্তই বালিকা। কানাঘুষো কিছু কানে এলেও ব্যাপারটা ভেবে দেখার মতো মনই তৈরি হয়নি তার। বিয়ের পর হৈম তার কাছে আসত প্রায়ই। হাঁ করে তাকে দেখত, কাছ ঘেঁষে বসে তার মুখে হাত

বুলিয়ে দিত। বড় অস্বস্তি হত বলাকার। তারপর একদিন তাকে বলল, হ্যাঁরে, ভাগ করে নিবি?

কী ভাগ করে নেব?

কেন, তোর বরকে?

বলাকা ভারী অবাক হয়ে যেত। বালিকা হলেও এবং কথাটার নিহিত অর্থ না বুঝলেও তার প্রস্তাবটা মোটেই ভাল লাগত না। সে আড়ালে কেঁদে ফেলেছিল। এবং রাতে গৌরহরিকে বলেও দিয়েছিল।

গৌরহরি তাকে বলল, ভয় পেয়ো না। ও দুঃখী মেয়ে। এর জন্য আমাদের কিছু করার নেই।

ও আবার এলে আমি কী করব?

আমার মায়ের কাছে গিয়ে বসে থেকো।

ধীরে ধীরে হৈমর ভিতরে একটা পরিবর্তন আসছিল। ছোট হলেও বলাকা সেটা বুঝতে পারত। বিধবা হলেও হৈম চওড়া পাড়ের শাড়ি পরত, মুখে পাউডার দিত, কপালে টিপ পরত। গাঁয়ে নিন্দে হলেও গ্রাহ্য করত না। কিন্তু ধীরে ধীরে সাজগোজ কমে যেতে লাগল। চুল আঁচড়াত না। আর বলাকার কাছে এসে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথা, আয় না রে, ভাগ করে নিই। আমি অর্ধেক, তুই অর্ধেক!

বলাকা সবসময়ে শাশুড়ির ঘরে পালিয়ে যেতে পারত না। শাশুড়িরও কাজকর্ম, পুজো-আচ্চা সংসার আছে। খুব মন খারাপ হত তার। বলত, ওসব কথা বলতে নেই।

কেন রে। তুই তো একটুখানি এক ফোঁটা মেয়ে। বরের কথা তুই কী বুঝিস?

নানা অসভ্য কথাও জিজ্ঞেস করত হৈম। বলাকার খুব রাগ হত। কিন্তু রাগ করে তো কিছু করার ছিল না। তার চেয়ে অন্তত তেরো চোদ্দো বছরের বড় ছিল হৈম, কাজেই বকেও দিতে পারত না।

তবে এটাও ঠিক, বরের মহিমা সে নিজেও বুঝত না তখন। শুধু বুঝত, এ লোকটা আমার সম্পত্তি। তার বেশি কিছু নয়।

আমাকে কি তোর হিংসে হয়?

হিংসে হবে কেন?

জানিস, তোর বরকে আমি নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম!

কেন?

ও তো আমারই ছিল। তুই কেড়ে নিলি।

বাঃ রে, কেড়ে নেব কেন? আমাদের তো বিয়ে হয়েছে!

ওঃ ভারী তো বিয়ে! ও বিয়ে আমি মানিই না।

কান্না আসত বলাকার।

একদিন হৈম বলল, তোর বরকে বলবি আমাকে একটা ছেলে দিতে!

বলাকা হ্যাঁ।

বল না রে। আমি বললে শোনে না। তুই বললে ঠিক শুনবে। এটুকু তো পারে। বল না রে।

একথাটাও গৌরহরিকে বলে দিয়েছিল বলাকা।

গৌরহরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পাগলামির লক্ষণ।

ও তোমাকে কেড়ে নিতে চায় কেন?

একটু বড় হলে সব বুঝিয়ে দেব। মন খারাপ কোরো না।

আমার ওকে ভীষণ ভয় করে।

করারই কথা।

সন্তানের ইচ্ছেটাই বোধহয় শেষ অবধি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল হৈমর। সেইসময়ে এসে আর স্বামীর ভাগ চাইত না। শুধু বলত, একটা ছেলে হলেই আমার হয়, আর কিছু চাই না। বল না একটু ওকে।

কথাটার মধ্যে অসভ্যতা আছে তা বোঝার মতো মনের অবস্থা বলাকার তখন হচ্ছিল। সে রাগ করত।

হৈম শেষ অবধি যে পন্থা নিয়েছিল তা পাগল না হলে নেওয়া যায় না। বলাকার বিয়ের এক বছরের মাথায় সে গর্ভবতী হয়ে পড়ল। সে যুগে গাঁয়ের চূড়ান্ত কেলেঙ্কারি। তবু এরকম ঘটনা ঘটতও অনেক। হৈম কার সঙ্গে মিশেছিল, কার কাছে নষ্ট করেছিল নিজেকে তা প্রকাশ পায়নি। ভোগী, লোভী পুরুষের অভাব তো নেই।

বলাকার বিয়ের দেড় বছরের মাথায় গর্ভপাত করাতে গিয়ে হৈম মারা যায়। অনেকে বলে, মাধবানন্দ রায়ই নাকি তাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিল। রহস্যের মীমাংসা হয়নি।

কিন্তু এই ঘটনা থেকে গৌরহরির যে ছবিটা ভেসে ওঠে তা এক অমলিন পুরুষের ছবি। হৃদয় দৌর্বল্যকে সে প্রশ্রয় দেয় না। অধিকার সীমাবদ্ধ রাখে। চৌকাঠ ডিঙোয় না। বলাকার মতো আর কে তাকে জানবে?

বাবা এক অদ্ভুত মানুষ, না মা?

হ্যাঁ মা, লোকটার থই পেলাম না।

ছবির পর ছবি দেখে যাচ্ছে তারা। নির্জন দুপুর। বাইরে ঘুঘু ডাকছে।

হ্যাঁ রে, সময় বলে কি কিছু সত্যিই আছে?

পারুল অবাক হয়ে বলে, কেন থাকবে না মা? সময় তো একটা সত্যিকারের জিনিস।

কী জানি। আমার মনের মধ্যে সময় বলে কিছু যেন কাজ করে না। পুরনো কথা ভাবতে গেলে সব যেন সাঁই সাঁই করে কাছে চলে আসে। যেন মনে হয় এই তো সেদিনের কথা!

ও তো স্মৃতি মা।

জানি বাবা, জানি। কিন্তু সময় জিনিসটা তো মানুষের কল্পনা।

পারুল একটু ভেবে বলে, তা ঠিক। কল্পনা মানে তো মিথ্যে নয়।

মিথ্যেই।

কেন বলছ?

মনে হয় বলে বলছি।

সূর্য উঠছে, সূর্য ডুবছে, দিন যাচ্ছে, মাস যাচ্ছে, বছর ঘুরছে, আমরা বুড়ো হচ্ছি, এটাই তো সময়।

এমন কিছু নেই যেখানে সব থেমে আছে, বাড়ছে না, বুড়ো হচ্ছে না, ওই ছবিগুলোর মতো!

পারুল হেসে ফেলে, ছবির তো প্রাণ নেই মা।

কথার মাঝখানে কখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে মেঝেতে বলাকার কাছ ঘেঁষে বসেছিল দুখুরি। চাপা গলায় বলল, ওই আবার এসেছে গো!

কে আবার এল।

কে আবার! বাবা। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল।

তা গেলি না একটু বাবার কাছে?

ইস্‌। গায়ে যা ঘেমো গন্ধ, তার ওপর খইনির ঝাঁঝ। মুখ ভেঙিয়ে পালিয়ে এসেছি।

ছিঃ, বাবাকে মুখ ভেঙাতে হয়?

একত্রিশ

কথা ছিল না। তবু হয়ে গেল। পারুলের শরীর জুড়ে তৃতীয় সন্তানের আগমনবার্তা ছড়িয়ে পড়ছে। শরীরের মধ্যে আর একটা শরীর ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে। গর্ভের অঙ্কুর। পারুলের শরীরে নানা অসোয়াস্তির সঞ্চার ঘটছে। মধ্যরাতে উঠে বেসিনে বমি করার পর হাঁফ ধরা গলায় সে তার পেটে হাত রেখে মায়াভরে বলে, দুষ্টু ছেলে, মাকে বুঝি এরকম কষ্ট দিতে হয়?

ছেলে! মেয়েদের অন্ধ সংস্কারবশে সেও ছেলেই চায় নাকি? না বাবা, না। মেয়ে হোক, পারুলের একটুও আপত্তি নেই। পেটে হাত রেখে সে ফিস ফিস করে বলে, মেয়ে নাকি তুই! লক্ষ্মী হয়ে থাক।

এখনও আকার নেয়নি, চোখ মুখ কিছু তৈরি হয়নি, গর্ভের অন্ধকারে একটি রক্তাক্ত পিণ্ড মাত্র, তবু কত মায়ায় যে ভরে ওঠে বুক!

কথা ছিল না, তবু হল। কিন্তু তৃতীয় সন্তান মোটেই অ্যাকসিডেন্ট নয়। বললে লোকের অদ্ভুত লাগবে, এই সন্তান চেয়েছিল পারুল নিজেই। চল্লিশের কাছাকাছি বিপজ্জনক এই বয়সে কেউ কি মা হতে চায়? ডাক্তারও ভ্রূ কুঁচকেছিল। কিন্তু পারুল চেয়েছিল ঠিকই। চিন্তিত জ্যোতিপ্রকাশ বলেছিল, পারুল, ব্যাপারটা সেফ হবে কি? এক ছেলে এক মেয়ে তো আছেই আমাদের, আর কী দরকার?

দরকার কথাটার নানারকম ব্যাখ্যা হতে পারে। হিসেবি মানুষের দরকার একরকম, বেহিসেবির অন্যরকম। পারুল হেসে বলেছিল, সেই পুতুলখেলার বয়স থেকে আমার শখ ঘরভরা ছেলেপুলের।

জ্যোতিপ্রকাশ শান্ত হেসে বলেছিল, আশ্চর্য! আজকাল কেউ ওরকম ভাবে না।

আমার শখ যে! কী করব বলো!

সমস্যা কী জানো? এ বয়সে মেয়েদের শরীরে স্টিফনেস দেখা দেয়। কোনও কমপ্লিকেশন হলে কী হবে?

কিছু হবে না। অত ভেবো না।

তাদের ছেলেমেয়ে দুটিই খুব ভাল। তারা কেউ দুষ্টু নয়, দুজনেই মেধাবী, শান্ত, বাধ্য। দুজনের চোখের দৃষ্টিই স্নিগ্ধ। দেখতেও তারা সুন্দর। বিয়ের পর তারা দীর্ঘ দিন সন্তানের কথা ভাবেনি। তখন জ্যোতিপ্রকাশ আর পারুল লড়াই করছে ব্যবসা নিয়ে। ব্যবসা তখনও অস্থিরতায় ভুগছে। পারুলের বয়স তখন নিতান্তই কম। আঠেরো পূর্ণ হয়নি। বিয়ের ছয় বছর বাদে তাদের সময় হয়েছিল। ছক কষেই তারা এনেছিল প্রথম সন্তান। ঠিক তিন বছর বাদে দ্বিতীয় এল। সব কিছুই প্ল্যানমাফিক করা উচিত— এটা তারা দুজনেই বিশ্বাস করত। আত্রেয়ীর বয়স এখন পনেরো, শুভমের বারো।

সবই ঠিকঠাক ছিল। সংসার বেঁধে নিয়েছিল নিজেদের ছকে। গত বছরই ঘটল একটা ঘটনা। সেটাও শীতেরই এক রাত। জামশেদপুরে সাংঘাতিক শীত পড়েছিল সেই রাতে। একটা বা দেড়টা হবে বোধহয়।

পারুল লেপের গরমের ভিতরে গভীর ঘুমের মধ্যে হঠাৎ চমকে জেগে উঠল। কে 'মা' বলে ডাকল হঠাৎ? খুব কচি গলার ডাক। কিন্তু তার ঘুমের মধ্যে সেই ডাক যেন তার শরীরে ঝংকার দিয়ে গেল।

দুরুদুরু বুকে লেপ সরিয়ে উঠে বসল সে। আত্রেয়ী বা শুভম ডাকছে না তো! কিন্তু ওরা তো অত ছোট নয়! তবু আলো জ্বেলে সে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে দেখল, দুটো সিংগল খাটে ভাইবোন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তবে ডাকল কে?

শব্দটা বাইরে থেকেও আসার কথা নয়। কাছাকাছি বাড়ি নেই এবং এই নির্জন পাড়ায় নিশুত রাতে মা ডাকার মতো কেউ থাকবে—এটাও ভাবা যায় না। তবু নিঃশব্দে টর্চ জ্বেলে জ্বেলে বাড়ির ভিতরটা ভাল করে দেখে নিল পারুল। তারপর চুপচাপ বসে খানিকক্ষণ ভাবল। ভেবে ভেবে তার মনে হল, বাইরে থেকে নয়, এ ডাক এসেছে তার ভিতর থেকে। ভিতর থেকেই।

কিন্তু তাও কি হয়? তার ভিতর থেকে কে তাকে মা বলে ডাকবে?

নিশ্চিত হওয়ার জন্য সকালে সে তার ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করল, রাতে ভয়ের স্বপ্ন দেখে তারা কেউ মাকে ডেকেছিল কিনা।

তারা দুজনেই অবাক হয়ে বলল, না তো!

অথচ পারুল শুনেছে, স্পষ্ট শুনেছে, খুব কচি গলায় কে যেন আর্তরবে ডেকেছিল মা! সেই ডাক তার সমস্ত শরীরে ঝংকার দিয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যে সে শিউরে কেঁপে উঠেছিল।

পারুল ভাবের মানুষ নয়। স্বামীর ব্যবসায় তাকে মাথা খাটাতে হয়, সংসার সামলাতে হয়, ছেলেমেয়ের দিকে নজর দিতে হয়। অলস সময় বলতে তার কিছু নেই। তবু ওই নিশুত রাতের একটা ডাক তাকে নিশির মতো পেয়ে বসল। প্রতিদিন ঘুমোবার আগে তার মনে হত, আজও যদি ডাকে! ইস্, আর একবার যদি ডাকে!

আর ডাকল না বটে, কিন্তু সারাদিন নানা কাজকর্ম ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে ওই স্মৃতি এসে বারবার হানা দেয়। আর কোমল এক আলোয় ভরে যায় পারুলের অভ্যন্তর। নরম হয়ে আসে মন, শরীর। কেউ কি তার শরীরে ভর করে কোল জুড়ে আসতে চায়? কোনও নিরাশ্রয় অনিকেত আত্মা?।

ওই চিন্তা ভূতের মতো পেয়ে বসল তাকে। বারবার নিজের বয়সের হিসেব করল। শরীরের কথা ভাবল। রিস্ক ফ্যাকটরের কথা ভাবল। তার দুটি ছেলেমেয়েই নরমাল ডেলিভারি। শরীরে কাঁটাছেঁড়া হয়নি কখনও। গড়ানে বয়সে যদি একটু কাটাকুটি হয় তো হোক না।

দ্বিধা ছিল, বাধা ছিল, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ছিল। তবু সব যেন ভেসে যেতে লাগল। একটা অচেনা কচি গলার একটা মাত্র ডাক তাকে উন্মনা করে দিল বড়। পাগল করল। বেহিসেবি করে দিল।

ওই ডাকটার কথা সে কাউকেই বলেনি। শুনলে সবাই হাসবে। জ্যোতিপ্রকাশ গম্ভীর কাজের মানুষ, সব ব্যাপারটাকেই খুব সিরিয়াসলি নেয়, কিছুই উড়িয়ে দেয় না। তবু তাকেও বলল না পারুল। তার মনে হয়েছিল, তার ভাবী সন্তান শুধু তাকেই ডেকেছে, আর কাউকে তো নয়। ওই গোপন তীব্র আকাঙ্ক্ষার ডাকটিকে সে পাঁচ কানে ছড়াবে কেন?

তবু বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করার পর অবশেষে সে তার স্বামীকে বলল। লজ্জা, দ্বিধা তো ছিলই, ভয়ও কি ছিল না একটু? এই বয়সে সন্তান হতে গিয়ে সে যদি মরেটরে যায় তাহলে তার বাচ্চা দুটোর কী হবে? জ্যোতিপ্রকাশও কি ভেঙে পড়বে না!

কিন্তু যে আসতে চায় তার পথ অবারিত না করেও যে পারুলের উপায় ছিল না! কী করবে পারুল তাকে না এনে? পাপ হবে না? অপরাধ হবে না?

আজকাল বলাকার রাতে ভাল ঘুম হয় না। শরীরে ঘুমের প্রয়োজনটাই তৈরি হয় না বোধহয়। একটু আধটু চটকামতো আসে, বিনা কারণেই ভেঙে যায়। তখন কেবল এপাশ ওপাশ। ঘুম ছিল কম বয়সে। কী ঘুম বাবা! বিছানা যেন চুম্বকের মতো টানত। বিছানা না হলেও চলত তখন। বিয়ের পর সেই বালিকা বয়সে স্বামীর গায়ে পা তুলে কি কম দিয়েছে ঘুমের ঘোরে? সকালে উঠে অবশ্য প্রণাম করত রোজ।

আজ রাতে পাতলা ঘুমের মধ্যে দরদালানে বমি করার শব্দ পেয়ে চটকাটা ভাঙল বলাকার। দিন দুই হল লক্ষণটা শুরু হয়েছে। এ বয়সে কেন যে আবার ছেলেপুলে হচ্ছে তা বুঝতে পারে না বলাকা। এ যুগের রেওয়াজ তো এটা নয়। আজকাল তো একটা করেই হয় বেশির ভাগ।

বলাকা উঠে মশারি তুলে বাইরে এল। রাতে প্রায় কিছুই খায়নি মেয়েটা। এক পিস মাছ আর একখানা রুটি। একটু দুধ সাধাসাধি করেছিল বলাকা, খায়নি। ওই সামান্য খাবারটাও পেটে থাকল না। তাহলে প্রসবের ধাক্কা সামলাবে কী করে? রক্ত হবে না শরীরে। আগের দুবারও একই অবস্থা হয়েছিল। বলাকা ভেবে মরে। তবু যা হোক, বয়স কম ছিল তখন, কিন্তু এখন তো তা নয়।

দরদালানে পা দিয়ে বলাকা দেখল, বেসিনের কাছে তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে পারুল।

কী রে? আরও হবে?

না মা। ঠিক আছে।

চোখে মুখে একটু জল দে।

দিয়েছি।

পেট তো খালি হয়ে গেল, রাত কাটবে কী করে তোর? একটু দুধ গরম করে দিই, খা।

না মা, গা গুলোচ্ছে এখনও।

কী যে করি তোকে নিয়ে! আয়, আমার খাটে এসে শুয়ে থাক।

না মা, তোমার যেটুকু ঘুম হয় আমি শুলে সেটুকুও হবে না। তুমি শুয়ে পড় গে, আমি এখন ঠিক আছি।।

তোর ঠিক আমার ধাত! চারটে ছেলেমেয়ের প্রত্যেকটা হতে গিয়ে আমি অর্ধেক হয়ে গেছি। মনে আছে গাঁদাল পাতা খুব ভাল লাগত। তোকেও কাল গ্যাঁদালের ঝোল করে দেবোখন।

মৃদু লাজুক হাসি হেসে ঘাড় নাড়ল পারুল, দিও।

আজকাল একটু লজ্জা হয়েছে পারুলের। তার যে আবার ছেলেপুলে হবে এটা বোধহয় কারও কাছেই প্রত্যাশিত ছিল না। সব চেয়ে বড় লজ্জা ছেলেমেয়ের কাছে। আতু অর্থাৎ তার মেয়ে কালও জিজ্ঞেস করেছিল, মা, তোমার কী হয়েছে?

পারুল বলেছিল, অম্বল।

কিন্তু রোজ তো আর অম্বল বললে হবে না। তবু যা হোক মেয়ের কাছে ব্যাপারটা কবুল করা যাবে। কিন্তু শুভ? তার কাছে যে ভারী লজ্জায় পড়তে হবে পারুলকে। বড্ড অবাক হবে যে ছেলেটা। ভারী অস্বস্তি তাই পারুলের।

পারুল আর জ্যোতিপ্রকাশ কারওরই তেমন অবসর নেই বলে আতু আর শুভ বড় হয়েছে আয়া আর ঝি-এর হেফাজতে। ভালই থাকত তারা, কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু অন্য সমস্যা না হলেও মা-বাবার সঙ্গে খুব সামান্য একটু দূরত্ব তৈরি হয়েছে তাদের—এটা খুব টের পায় পারুল। সে বা জ্যোতিপ্রকাশ কখনও হামলে দামলে ওদের আদর করেনি, বুকে নিয়ে শোয়ওনি বড় একটা। নজর রেখেছে, রক্ষণাবেক্ষণ করেছে, কিন্তু সময় দিতে পারেনি। সময়ের ওই টানাটানিই তাদের একটু তফাতে রেখেছে আজও। এই ফাঁকটুকু অতিক্রম করা আজ বড় কঠিন।

তিন নম্বরের বেলায় সেটা পুষিয়ে নেবে পারুল। কক্ষনো ঝি বা আয়ার হাতে ছেড়ে দেবে না। বুকে বেঁধে নিজের হাতে সেটাকে নাওয়াবে খাওয়াবে ছোঁচাবে। এর সঙ্গে দূরত্ব থাকবে না তার।

বলাকা বলে, এখন রাত দুটো। সারা রাত খালি পেটে কাটাবি কী করে? খালি পেটে আবার বায়ু অম্বল হবে।

কিছু খেতে পারব না মা। মুখে রুচি নেই।

শুকনো আমলকী খাবি? সন্ধ্যা বেশ বানায়। নানারকম নুন-টুন দিয়ে। খুব সোয়াদ। এক প্যাকেট দিয়ে গিয়েছিল। আয়, দুটো মুখে দিয়ে দেখ দেখি।

সন্ধ্যার আমলকী মুখে দিয়ে পারুল নিজের ঘরে এল। পাশের ঘরে আতু আর শুভ ঘুমে ঢলাঢল। একা কিছুক্ষণ বসে থাকে পারুল। শরীরটা ঝিমঝিম করছে বটে, কিন্তু তার ভিতরটা আলোয় ভরে আছে। সে যেন মৃদু গোলাপি একটা আলো। মায়ায়, ভালবাসায় ভরে আছে মন। খুব মৃদু একটা আঙুলে কে যেন তার শরীরে সেতারের ঝংকার তুলছে।

খুব দুষ্টু হবি নাকি তুই? দামাল, দস্যি, পাজি? দুষ্টু দুষ্টু চোখে তাকাবি, মিষ্টি মিষ্টি হাসবি আর দৌড়ে বেড়াবি বাড়িময়? আর আমি তোকে ধরতে ছুটে ছুটে হয়রান হব?

হোক, তার তিন নম্বরটা একটু দুষ্টু হোক, দামাল হোক, ডাকাবুকো হোক। বড় দুজন শান্ত, সভ্য, সুন্দর। তাদের নিয়ে কোনও ঝামেলা পোয়াতে হয়নি তাকে। তিন নম্বরটা হোক অন্যরকম।

মধ্যরাতে নিজের নিভাঁজ পেটে হাত রেখে মৃদু মৃদু হাসছিল পারুল। এখনও অনেক দেরি। অত দেরি যেন সইছে না পারুলের।

কী সুন্দর যে ভোর হল আজ! আকাশে একটা অন্যরকম ময়ূরকণ্ঠী আলো পেখম মেলে দিল। কুয়াশা মাখানো সেই আলো-আঁধারিতে পারুল খুব ধীর পায়ে বাগানে পায়চারি করছিল। ভাল ঘুম হয়নি রাতে। শরীর দুর্বল, মাথায় ঝিমঝিম। কিন্তু মনটা বড্ড ভাল লাগছে তার।

একা নই, আর আমি একা নই। এখন নয় মাস তুই আর আমি সবসময়ে একসঙ্গে। সবসময়।

পারুল!

পারুল একটু চমকে উঠল।

কে?

ফটকের পাশেই শিউলি গাছ। তার আড়াল থেকে আবছা আলোয় মেয়েটা এগিয়ে এল।

আমি সোহাগ।

হঠাৎ এই সুন্দর ভোরবেলার ময়ূরকণ্ঠী অপরূপ আবছায়া যেন ছাইবর্ণ হয়ে গেল পারুলের কাছে। বিস্বাদে ভরে গেল মন। শরীরে যেন অশুচিতার স্পর্শ। যেন গু মাড়িয়েছে এমনভাবে থমকে গেল পারুল।

কণ্ঠস্বর আপনা থেকেই কঠিন হয়ে গেল, তুমি! কী চাও বলো তো!

সোহাগ ভারী অবাক হয়ে বলে, কিছু চাই না তো!

মুখ ফিরিয়ে নিল পারুল, বিরাগে। বলল, ও, এত সকালে—?

মাঝে মাঝে আমি খুব ভোরে উঠে পড়ি, তখন ঘরে থাকতে একটুও ভাল লাগে না। বেরিয়ে পড়ি।

সোহাগকে যে কেন এত অপছন্দ করে? একটাই কারণ। এ মেয়েটা জানে, আজ থেকে কুড়ি বছর আগে ওর বাবার সঙ্গে তার দেহগত সম্পর্ক হয়েছিল। হতে পারে সেটা জবরদস্তি, হতে পারে অবলার ওপর প্রবলের অত্যাচার, তবু হয়েছিল। আর সে কথা মনে পড়লেই সমস্ত শরীরে যেন এক অপবিত্রতার স্পর্শদোষ ঘটে যায়। যতই সোহাগ তাকে গডেস বলুক, ওকে দেখলেই তার ভিতরটা কুঁকড়ে যেতে চায়। মেয়েটা জানে, সব জানে বলেই পারুলের বড় ছোট মনে হয় নিজেকে।

অথচ সে জানে, সোহাগ ভাল মেয়ে। বলাকা ওর প্রশংসা করে, পান্না করে। মেয়েটা একটু পাগলাটে হলেও ব্যক্তিত্ব আছে, খারাপ নয়। তবু ওর একটাই অপরাধ, ও জানে। ও পারুলের গোপন পাপস্পর্শের কথা জানে।।

ময়ূরকণ্ঠী থেকে ছাইরঙা হয়ে যাওয়া এই ভোরে আচমকা পারুলের বড্ড ভয় হল। কুড়ি বছর আগের শরীরী অপবিত্রতা কি তার আতু বা শুভকেও স্পর্শ করবে? স্পর্শ করবে তার পেটে সদ্য অঙ্কুরিত দুষ্টুটাকে?

আমি যদি এখন একটু একা থাকতে চাই, তাহলে কি তুমি কিছু মনে করবে?

গালে থাপ্পড় মারার মতোই অপমান। কিন্তু সোহাগ মৃদু হেসে বলল, না না, কিছু মনে করব না। আই অ্যাম লিভিং।

ফটকের দিকে যখন পা বাড়িয়েছে মেয়েটা তখন হঠাৎ পারুলের একটু মায়া হল। মেয়েটার মুখ এই ভোরের আবছা আলোতেও বড় করুণ দেখাচ্ছিল।

সোহাগ।

বলুন।

আসলে কী জানো, কাল রাত থেকে আমার শরীরটা ভাল নেই। তাই কিছু ভাল লাগছে না। কিছু মনে করনি তো!

মেয়েটা একটুও রাগ প্রকাশ করল না। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে খুব নরম গলায় বলল, কী হয়েছে আপনার?

তেমন কিছু নয়। হয়তো বদহজম।

বদহজম মানে স্টমাক আপসেট?

অনেকটা তাই।

কিন্তু আপনাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।

তাই?

নট সিক্‌ল।

কিছু বলবে আমাকে?

না তো! আমি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আপনাকে দেখে এত ভাল লাগল।

আমাকে দেখে কেন যে তোমার এত ভাল লাগে, বুঝি না বাবা।

আমি তো তা জানি না। আপনাকে দেখেই আমার মন ভাল হয়ে গেল। ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটুক্ষণ থাকি। কিন্তু আপনি তো আমাকে পছন্দ করেন না।

লজ্জা পেয়ে পারুল হেসে ফেলে, কে বলল পছন্দ করি না?

আমি জানি।

তুমি ভুল জান। তোমাকে অপছন্দ করব কেন? তুমি তো একটা ভাল মেয়ে।

মাথা নেড়ে সোহাগ বলে, সবাই কেবল ভাল আর খারাপ নিয়ে কথা বলে। ভাল না খারাপ তা যে কা করে বোঝা যায় সেটাই আমি বুঝতে পারি না। আমাকে আমার মা বলে খারাপ, বাবা বলে খারাপ। আমি খুব ভাবি আমি কেন খারাপ। কিন্তু কিছু বুঝতে পারি না।

তুমি খারাপ নও তো।

তাহলে আমাকে অপছন্দ করেন কেন? অথচ আমি আপনাকে কী ভীষণ অ্যাডোর করি! ভাবি আমি পারুলের মেয়ে হয়ে কেন যে জন্মাইনি!

কথাটা সে আগেও শুনেছে। শুনে আহ্লাদিত হয়নি একটুও। কিন্তু এখন একটু মায়া হল। বলল, এসো, দুজনে পায়চারি করি একটু।

আপনার খারাপ লাগবে না তো! একা থাকতে চাইছিলেন।

না, খারাপ লাগবে না।

আজ আমার মন ভাল নেই।

কেন বল তো!

আজই মা বাবা কলকাতায় ফিরে যাবে। আমাকেও যাওয়ার জন্য ইনসিস্ট করছে।

তুমি কলকাতায় যেতে চাও না?

না।

ওমা! কেন? এই গাঁ-গঞ্জে ভাল লাগে বুঝি তোমার? ওঃ, তোমার তো বোধহয় একটা পলিউশন অ্যালার্জি আছে, তাই না?

হ্যাঁ আছে। এমনিতেও শহর আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু পড়াশুনো?

সেটাই প্রবলেম। কলকাতায় ফিরে গিয়েই আমাকে ক্লাসে যেতে হবে, মিউজিক লেসন নিতে হবে, কম্পিউটার, ব্যায়াম এসব নিয়ে এনগেজড থাকতে হবে। কোয়াইট সাফোকেটিং। আমি কি একটু বেশি কথা বলছি?

না তো!

আপনি একা থাকতে চাইছিলেন। এসব কথায় হয়তো আপনি বিরক্ত হচ্ছেন।

না। বিরক্ত হচ্ছি না।

দুজনে নীরবে পাশাপাশি ধীর পায়ে খানিকক্ষণ হাঁটল।

আপনাদের এই জায়গাটা বেশ।

তোমার ভাল লাগে আমাদের গ্রাম?

শুনেছি এটা আমারও গ্রাম। আমাদের রুটস এইখানে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো। শুধু আমাদের নয়, এটা তোমাদেরও গ্রাম।

সেটা আমি আগে ফিল করতাম না।

এখন কর?

একটু একটু।

পারুল মৃদু হাসল। কিছু বলল না।

আচ্ছা পারুল, আমি যদি আপনার কাছে থাকি?

অবাক পারুল চোখ বড় বড় করে বলল, আমার কাছে? ও মা? কেন বল তো!

আমার মায়ের সঙ্গে তো আপনার ভাব আছে!

পারুল এই ছেলেমানুষি প্রস্তাবে হেসে ফেলে বলে, তা একটু আছে। দু দিনের তো আলাপ।

আপনি মাকে বলুন না, সোহাগ আমার কাছে কয়েকদিন থাক।

যাঃ। তোমার মা সে কথা শুনবেন কেন?

আপনি বললে হয়তো শুনবে।

কেন, আমার কথা উনি কেন শুনবেন?

আমি জানি মা আপনাকে অন্য চোখে দেখে।

কী চোখে বল তো!

শি ওলসো অ্যাডোরস ইউ।

ওসব তোমার ভুল ধারণা। আমার মধ্যে কিছু নেই সোহাগ। আমি খুব সাধারণ একটা মেয়ে।

বলুন না একবার মাকে।

সেটা খুব খারাপ দেখাবে সোহাগ। তা কি হয়? আর আমার কাছেই কেন থাকবে তুমি?

আমি জানি আপনি আমাকে একটুও পছন্দ করেন না। কিন্তু আপনাকে যে আমার কী ভাল লাগে।

শুধু চেহারাটা ছাড়া আমার কী আছে বল তো!

ইউ আর এ গডেস। আমার মনে হয়, আপনি হঠাৎ একদিন আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে ঝুপ করে এখানে নেমে পড়েছেন।

পারুল প্রমাদ গুণে বলল, সাধে কি তোমাকে লোকে পাগল বলে? আমার কি পাখা আছে যে উড়র।

মাথা ঠান্ডা করো, মা-বাবার সঙ্গে কলকাতায় যাও।

ইজ ইট এ সারমন?

না সোহাগ, আমার সম্পর্কে ওটা তোমার ভুল ধারণা। ধারণাটা এবার পালটে ফেল।

আমার আপনাকে আরও কাছে থেকে দেখতে ইচ্ছে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

যাঃ।

ইফ ইউ আর নট এ গডেস, আই শ্যাল ক্রিয়েট ওয়ান ইন ইউ।

তাই কি হয়? কাছ থেকে দেখলে তোমার ধারণা দু দিনেই ভেঙে যাবে।

মানুষ তো চিরকাল এভাবেই তার ভাগবানকে তৈরি করে নিয়েছে তাই না?

তাই বুঝি?

আমার তো তাই মনে হয়। আজ ভোরবেলা আমি কোথায় যাচ্ছিলাম জানেন?

কোথায়?

পালিয়ে যাচ্ছিলাম।

সে কী?

আপনাকে হঠাৎ দেখে দাঁড়িয়ে না পড়লে এখন আমি কোথায় যে চলে যেতাম তার ঠিক নেই।

কেন সোহাগ, পালিয়ে যাচ্ছিলে কেন?

আমি মা-বাবার সঙ্গে কলকাতায় যেতে চাই না যে!

পারুল ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবল। তারপর হঠাৎ ভোরের মতো একটু হেসে বলল, তুমি আমাকে গডেস বলে মনে কর তো?

করিই তো।

গডেসের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় জান?

জানি না।

গডেস যা বলে তা শুনতে হয়।

সোহাগ একটু হেসে বলল, আমি জানি আপনি আমাকে কলকাতায় যেতে বলবেন, তাই না?

শুনবে না তো!

শুনব।

শুনবে?

হ্যাঁ।

তাহলে চলো আমরা রাস্তায় গিয়ে একটু হাঁটি। তারপর আলো ভাল করে ফুটলে তোমাকে আমি নিজে গিয়ে তোমাদের বাড়িতে রেখে আসব।

সোহাগ খুব সরলভাবে হেসে বলল, ইন এক্সচেঞ্জ অফ হোয়াট?

পাকা মেয়ে, গড়েদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চাও বুঝি?

তাহলে বলুন, আমাকে আর অপছন্দ করবেন না?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পারুল বলে, তোমাকে আমার অপছন্দ হচ্ছে না তো! শুধু একটা জিনিস একটু অপছন্দ।

কী সেটা?

আমাকে তুমি নাম ধরে পারুল বলে ডাক কেন?

তাহলে কী বলে ডাকব?

পিসি মাসি যাই হোক।

এঃমা, তাহলে যে আমার গডেস পিসি মাসিই হয়ে যাবে। গডেস আর গডেস থাকবে না।

পারুল হেসে ফেলল। তারপর বলল, আচ্ছা থাক বাবা। পারুল বলেই ডেকো। আমার বোধহয় আর খারাপ লাগবে না।

বত্রিশ

টাইম শ্যাফ্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বৈজ্ঞানিক। ভ্রূ কুঞ্চিত, দুশ্চিন্তার বলিরেখা কপালে, পিছনে জড়ো করা দুটি হাত বারবার মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে এবং খুলে যাচ্ছে। কাচতন্তুর সুড়ঙ্গপথটির দিকে চেয়ে আছেন তিনি। চোখে অনিশ্চয়তা, ভয়, সম্ভাব্য ব্যর্থতার গ্লানি। গত কয়েক বছর চুল কাটেননি, দাড়ি কাটেননি। তাঁর চেহারা হয়েছে পাগলের মতো। নিয়মিত আহার করেননি বলে শরীর রুগ্‌ণ ও দুর্বল। তাঁর গবেষণা শেষ হয়েছে, শুধু ফলাফলের অপেক্ষা। দিনের পর দিন তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন। সময়ের সরণি বেয়ে আজ অবধি কেউ আসেনি অতীত বা ভবিষ্যৎ থেকে। হয়তো আর আসবেও না। হয়তো টাইম-ট্র্যাভেল বাস্তবিকই অলীক কল্পনা। সময়কে কি অতিক্রম করা যায়?

বৈজ্ঞানিক অবশ্য মনে করেন সময় এক অবাস্তব ধারণা। সময় বলেই কিছু নেই। আছে গতি, আছে অবস্থানগত পরিবর্তন, আর মানুষ তাই থেকেই সময়কে কল্পনা করে নিয়েছে। যেখানে পরিবর্তন নেই, গতি নেই বা বস্তু নেই, বস্তুর জন্ম ও বিনাশ নেই সেখানে সময়ের ধারণাও অসম্ভব। গতি এবং পরিবর্তনই সময় নামক তৃতীয় ধারণার জন্ম দিয়েছে। একটি শিশু জন্মাল, বড় হল, বুড়ো হল, মরে গেল, এ সবই হল সেই শিশুটির গতি ও পরিবর্তন মাত্র। শরীরের হ্রাস, বৃদ্ধি, ক্ষয়। বৈজ্ঞানিকের দৃঢ় বিশ্বাস অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আসলে একই সঙ্গে বিরাজমান। চলন্ত ট্রেন থেকে যেমন বাইরের দৃশ্য প্রতীয়মান হয় তেমনই। বাইরের দৃশ্যগুলি ফলিত হয়েই আছে, চলন্ত ট্রেন থেকে শুধু পর্যায়ক্রমে তাদের দেখা যায়। সুতরাং ভবিষ্যৎও বর্তমান, অতীতও বর্তমান শুধু একটু টিউনিং-এর প্রয়োজন। তা হলেই ভবিষ্যৎও বর্তমানের মতোই প্রতীয়মান হবে। অতীতও তাই।

কিন্তু সময়-সুড়ঙ্গে এখনও কেউ আবির্ভূত হল না। অতীত বা ভবিষ্যতের কোনও কল্পনা না, কোনও সাড়া না।

হতাশায় বৈজ্ঞানিক মাথা নাড়লেন। নিজের লম্বা চুল হাত দিয়ে সটান করলেন, দাড়ি আঁচড়ালেন আঙুল দিয়ে। তারপর ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর অস্থির চটিজুতোর শব্দ চারদিকে প্রতিধ্বনি তুলছিল।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে উদাস চক্ষে বৈজ্ঞানিক কিছুক্ষণ তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। ওই যে নক্ষত্রমণ্ডলী, ওইসব বস্তুপুঞ্জ যদি সরিয়ে নেওয়া যায় তা হলে এই অসীম অন্ধকার শূন্যতায় সময় বলে কিছু কল্পনা করা যায় কি? না, সেটা অসম্ভব। ওই স্থির পরিবর্তনশীল অন্ধকার পরিসরের কাছে সব ধারণাই মিথ্যে হয়ে যায়। দূরত্ব, সময়, গতি, বিবর্তন সব কিছু।

একটা শব্দ শুনে বৈজ্ঞানিক ফিরে দাঁড়ালেন। ঘরের মাঝখানে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধ মানুষ, তার খালি গা, গলায় শুভ্র উপবীত, পরনে পরিষ্কার এক থান ধুতি, মস্তক মুণ্ডিত।

অবাক বৈজ্ঞানিক বললেন, আপনি কে? কী করে এ-ঘরে ঢুকলেন?

লোকটি সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বললেন, পিতা, আমার এবং আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন।

বৈজ্ঞানিক অপ্রস্তুত। প্রণাম-টনাম নেওয়ার অভ্যাস নেই তাঁর। তার ওপর লোকটি যথেষ্ট বৃদ্ধ। তাঁর চেয়েও অন্তত বিশ-পঁচিশ বছরের বড়। বাবার বয়সি মানুষের প্রণাম অস্বস্তিকর বইকী!

বৈজ্ঞানিক বললেন, প্রণাম করছেন কেন? আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আমারই তো আপনাকে প্রণাম করার কথা। তবে আমি প্রণামে বিশ্বাস করি না।

লোকটি শশব্যস্তে বলল, ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন! আপনি আমাদের পরম প্রণম্য। পরম শ্রদ্ধার পাত্র। পিতা, আপনার দর্শনলাভে আমি ধন্য।

বৈজ্ঞানিক বিরক্ত ও বিস্মিত। বললেন, আপনি আমাকে পিতা সম্বোধন করেছেন! আশ্চর্য! আপনিই তো আমার বাবার বয়সি!

লোকটি জিভ কেটে বলে, হিসাবমতো আপনি আমার চেয়ে একশো আশি বছরের বড়।

বৈজ্ঞানিকের বিস্ময়ে কথা সরল না। অনেকক্ষণ বাদে বললেন, একশো আশি বছর! আপনি কি পাগল?

লোকটি মাথা নেড়ে বলে, না পিতা, আমি পাগল নই। আমি আপনার অধস্তন সপ্তম পুরুষ।

বৈজ্ঞানিক হাঁ করে চেয়ে রইলেন। ব্যাপারটা তাঁর বোধগম্য হচ্ছিল না। কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিকের মন সর্বদাই যুক্তিযুক্ত পথ ধরে চলে। তাঁর মস্তিষ্কে হঠাৎ একটা উদ্ভাস ঘটল। তবে কি লোকটা তাঁর আবিষ্কৃত ওই সময়-সুড়ঙ্গ ধরে এসে হাজির হয়েছে? তিনি কি তা হলে গবেষণায় সাফল্য লাভ করেছেন? আনন্দে বৈজ্ঞানিক নিজের লম্বা চুল মুঠোয় চেপে ধরে বললেন, তা হলে কি আপনি আমার যন্ত্রের ভিতর দিয়ে এলেন?

পিতা, আমাকে আপনি-আজ্ঞে করে বলবেন না। আমি আপনার প্রপৌত্রের পৌত্র।

ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই বাছা, তুমি তো দুধের শিশু আমার কাছে। আমার গবেষণা তা হলে সফল।

লোকটির মুখ একটু ম্লান হল। হাতজোড় করে বলল, আপনার গবেষণা শতকরা একশো ভাগ সফল বলতে পারলে আমি খুশিই হতাম। কিন্তু পিতা, ঘটনাটা তা নয়।

নয়?

না পিতা। আপনার গবেষণা সম্পূর্ণ সফল না হলেও ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা বলা যায় না।

তার মানে কী বাছা?

আপনার গবেষণা সফল না হলেও চেষ্টা বৃথা যায়নি। অতীত বা ভবিষ্যৎকে বর্তমানে ফলিত করতে পারলেও আপনার বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

সেটা কী রকম?

আমাদের গবেষণাগারে সময় পাড়ি দেওয়ার যন্ত্রে আপনার নিরলস চেষ্টার একটা সংকেত পৌঁছেছে। আমরা বুঝতে পেরেছি অতীতের কেউ আমাদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে।

তারপর?

আমরা—অর্থাৎ ভবিষ্যতের বিজ্ঞানকর্মীরা সময় নামক বাধা বা প্রাচীর অতিক্রম করার কৌশল জানতে পেরেছি। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে—অর্থাৎ অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে আমরা কখনওই সময়কে অতিক্রম করার

চেষ্টা করি না।

কেন করো না?

কাজটা বিপজ্জনক পিতা। তাতীত বিপজ্জনক। পৃথিবীব অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একটি অতি সূক্ষ্ম ভারসাম্যের ওপর পরিকল্পিত হয়ে আছে। তার সামান্য একটুখানি বিচ্যুতি ঘটালেই পুরো ছকটা ভীষণভাবে ওলটপালট হয়ে যাবে। সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে লহমায়। ইতিহাস মুছে যাবে।

বলো কী হে?

পিতা, আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই গতি ও পরিবর্তন মাত্র। গীতার শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করুণ। মুখ ব্যাদান করে অর্জুনকে শ্রীভগবান বিশ্বরূপ প্রদর্শন করে বলেছিলেন, যা ঘটার তা ঘটেই আছে, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের মুখের গহ্বরে ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অর্থাৎ ভবিষ্যৎও বর্তমানই, ঠিক তো? বর্তমান না হলে অর্জুন তা প্রত্যক্ষ করতে পারতেন না!

হ্যাঁ, বোধহয় ঠিক।

আপনার প্রজ্ঞা আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপনার এই গবেষণা সম্পূর্ণ সফল না হলেও তা আমাদের গবেষণায় বিশেষ ইন্ধন সরবরাহ করেছে। বলতে গেলে এ ব্যাপারে আপনি আমাদের পথিকৃৎ।

বাপু হে, আদত কথাটা বলো। আমার টাইম মেশিন যদি সফল না হয়ে থাকে তা হলে তুমি এলে কী করে?

পিতা, ক্রুদ্ধ হবেন না। আপনার মৃদু সংকেত আমাদের যন্ত্রে ধরা পড়ার পর আমরা অনেক পরামর্শ করে অবশেষে আমাদের যন্ত্রের সাহায্যে আপনার কাছে একজন প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিই। আমি আপনার বংশধর বলে বিশেষজ্ঞরা আমাকেই আপনার কাছে পাঠিয়েছে।

ভ্রূ কুঁচকে বৈজ্ঞানিক ঘৃণাভরে বললেন, বংশধর! আমার বংশধর! কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? আমি তো বিয়েই করিনি! এবং করার কোনও ইচ্ছেও নেই। চিন্তাশীল এবং কর্মব্যস্ত ললাকের পক্ষে মেয়েমানুষ এক মস্ত ঝঞ্ঝাট।

কাঁচুমাচু হয়ে বৃদ্ধ লোকটি বলল, আপনি বিবাহ না করলে আমার জন্ম সম্ভব হত না।

বৈজ্ঞানিক খিঁচিয়ে উঠে বললেন, সম্ভব না হলে হবে না। তাতে আমার কী যায় আসে বাপু? মেয়েমানুষ হল ঝগড়ুটে, হিংসুটে, ন্যাকা, মিথ্যেবাদী, লোভী, চিন্তাশক্তিশূন্য, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক এবং সর্বনাশা। মেয়েমানুষের ছায়া মাড়ানোও পাপ। সুতরাং আমার বিয়ে করার কোনও সম্ভাবনা নেই এবং বংশধরও কেউ হবে না।

বৃদ্ধ মানুষটি বিবর্ণ মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর স্খলিত কণ্ঠে বলল, পিতা, ঠিক এই কারণেই আমরা সময়-ভ্রমণ পারতপক্ষে করি না। যা কিছু ঘটে আছে, ঘটনার যেসব নকশা তৈরি হয়ে আছে তা এই সর্বনাশা সময়-ভ্রমণের ফলে যদি সামান্যতম বিচ্যুত হয় তা হলেই প্রলয় কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। সমস্ত সৃষ্টির ভারসাম্যই কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়বে। সেই পরিণতির কথা ভাবলেও শরীর শিহরিত হয়। আপনি বিবাহ না করলে—

ক্রুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তীব্র স্বরে বললেন, তাই বলে কি অস্পৃশ্য মেয়েমানুষকে ঘরে তুলে আনব? নিমকহারাম, বেইমান, পাপিষ্ঠা মেয়েমানুষের কাছে আত্মবিক্রয় করব? সুন্দর মুখের ছলনায় তারা পৃথিবীকে কতবার ছারখার

করেছে তুমি জানো? ইতিহাস, পুরাণ, মহাকাব্যাদি পড়নি? মেয়েমানুষের ইতিহাস মানুষের জীবনে কল্পনাস্বরূপ। তারা স্বভাবতই বিশ্বাসঘাতক এবং অকৃতজ্ঞ। ছলাকলা এবং চাতুর্যে পুরুষকে বশীভূত করে তার জীবনীশক্তি শোষণ করে নেয়। মেয়েমানুষ হল পরগাছা এবং মস্ত জঞ্জাল। মেয়েমানুষ না থাকলে পৃথিবী অনেক বেশি বাসযোগ্য হত।

বৃদ্ধ মানুষটি ভয়ে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে করজোড়ে বলল, হে শ্রদ্ধাস্পদ মহাবোধ, হে জ্যেষ্ঠ পিতা, আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। আপনি ক্রুদ্ধ হলে সৃষ্টির অঙ্ক মিলবে না।

তাতে আমার বয়েই গেল। মেয়েমানুষের কথা শুনলেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে যায়।

লোকটি বিনীত কণ্ঠে বলল, জানি প্রভু।

বৈজ্ঞানিক হুংকার দিয়ে বললেন, কী জানো?

আপনার বয়স তখন আঠেরো বছর দুই মাস। সদ্য শ্মশ্রুগুম্ফের উদগম ঘটেছে। আপনি ক্ষীণকায়, গৌরবর্ণ ও অতীব সুপুরুষ ছিলেন। তখনও আপনি ছিলেন চিন্তাশীল, অন্যমনস্ক, বাস্তববোধ বর্জিত, মেধাবী ও প্রজ্ঞাবান। আপনার চিন্তার বিষয় ছিল মহাশূন্য, সময় সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি। বয়সোচিত চিত্তচাঞ্চল্য আপনার ছিল না, নারীর রূপ সম্পর্কে আপনি তখনও সচেতন ছিলেন না। আপনার বিচরণ ছিল মহান এক চিন্তারাজ্যে।

তুমি এই কথা জানলে কী করে?

আমরা সময়-ভ্রমণ করি না বটে, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা যন্ত্রদূত পাঠাই। এই যন্ত্রদূতগুলি কখনও কবুতর, কখনও বেড়াল, কখনও বা নেড়ি কুকুরের রূপ ধরে আসে। এদের নিজস্ব ইচ্ছা বা চিন্তাশক্তি না থাকায় এরা ঘটনার ওপর কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। শুধু তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। আপনার পক্ষে এদের চিহ্নিত বা শনাক্ত করা অসম্ভব।

তোমরা তো বেশ সেয়ানা দেখছি। আমার পিছনে কাকে লেলিয়েছিলে? কুকুর না বেড়াল?

একটি নেড়ি কুকুর। আপনার আঠেরো বছর বয়সে একটি নেড়ি কুকুর আপনাকে সর্বদাই অনুসরণ করত।

বৈজ্ঞানিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হ্যাঁ, তার নাম ছিল ভুলু। আমি ভাবতাম কোনও রহস্যময় কারণে সে আমার প্রতি আসক্ত। তাই সর্বদাই পিছু পিছু ঘুরত। রাতে আমাদের বাইরের বাবান্দায় শুয়েও থাকত। তবে তাকে কিছু খেতে দিলে খেত না।

সেই ভুলুই আমাদের যন্ত্রদূত।

বৈজ্ঞানিক হঠাৎ একটু লাল হলেন। যেন হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ক্রোধের বদলে তাঁর একটু একটু লজ্জা করতে লাগল।

বৃদ্ধ মানুষটি করজোড়েই দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করতে করতে বললেন, পিতঃ, দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা বিস্তারিত বিবরণে যাব না। আপনি একজন মহান বৈজ্ঞানিক ও মহৎ মানুষ। তবু রক্তমাংসের মানুষ তো, প্রকৃতির নিয়মে, বয়োধর্মে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটতেই পারে।

থামো, ডেঁপো ছোকরা। আমার মোটেই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেনি। ঘটেছিল বেতসীরই।

বৃদ্ধ মানুষটি বিনীতভাবে চুপ করে রইল।

বৈজ্ঞানিক ফের সলজ্জ মুখে বললেন, কথাটা বিশ্বাস হল না বুঝি?

আপনার সম্পর্কে আমাদের তথ্য অনুমাননির্ভর নয় পিতঃ, তথ্যনির্ভর।

বৈজ্ঞানিক খিচিয়ে উঠে বললেন, একটা নেড়ি কুকুরের সাক্ষ্যেই বুঝি কিছু প্রমাণ হয়?

পিতঃ, ক্রুদ্ধ হবেন না। আপনি আদেশ করলে আমি রসনা সংযত করব।

ওহে বাপু, তোমরা হলে হাড়বজ্জাত, বাইরে ভিজেবেড়ালটি সেজে আছ, আর মনে মনে হাসছ সে আমি জানি।

জিব কেটে লোকটা বলে, না না পিতঃ, আমি হাসছি না।

লজ্জিত মুখে বৈজ্ঞানিক বললেন, ওই একবারই আমার পদস্খলন হয়েছিল।

ব্যথিত মুখে বৃদ্ধ লোকটি বলল, পদস্খলন বলছেন কেন পিতঃ?

বৈজ্ঞানিক দৃপ্ত স্বরে বললেন, পদস্খলন নয়। আমার মতো একজন চিন্তাশীল মানুষ কী করে যে মস্তিষ্কহীন নির্বোধ একটি কিশোরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল আজও তা ভেবে পাই না।

মহাশয়, আমার স্পর্ধা ক্ষমা করবেন। বেতসী রায় অসহনীয় রূপসী ছিলেন। সেই রূপ অপ্সরাদের থাকে, দেবীদের থাকে। ওই রূপ অনেক বর্ম বেদ করতে পারে, নিরস্ত্র করতে পারে দুর্ধর্ষ বীরকে, তপোভঙ্গ করতে পারে ঋষিরও।

থামো, থামো, অকালপক্ক ছোকরা। রূপ! রূপের গভীরতা তো গাত্রচর্মের চেয়ে গভীর নয়। রূপের স্তাবকতা করে মূর্খেরা। সেই বয়সে আমি যে কেন রূপের ফাঁদে পড়লাম কে জানে। আজও ভাবলে মনে বৃশ্চিক দংশন হয়।।

প্রভু, রাগ করবেন না। আত্মগ্লানির কোনও কারণ ঘটেনি।

ঘটেনি! বলো কী! সেই আত্মগ্লানি যে আজও আমাকে তাড়া করে।

জানি প্রভু। তাই আজও আপনার কানন কুসুমহীন।

কাব্য কোরো না, ওসব আমার ভাল লাগে না। মেয়েদের সঙ্গে ফুলের তুলনা করা ফুলের পক্ষে অপমান।

বৃদ্ধ পিতা, বেতসী রায় কিন্তু নির্দোষ।

বৈজ্ঞানিক হুংকার দিলেন, নির্দোষ!

চোদ্দো বছরের সেই কিশোরী আপনার বাড়ির সামনে দিয়েই রোজ স্কুলে যেত। আপনি তখন আপনার সামনের বারান্দায় গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে থাকতেন। আপনি ভুলে যাবেন না যে, আপনিও তখন ছিলেন অতি সুদর্শন যুবা। বেতসী তাই প্রতিদিন আপনাকে লক্ষ করত। আপনি করতেন না। চিন্তায় কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল আপনার চোখ, মগ্নতায় আবিষ্ট ছিল আপনার মস্তিষ্ক, সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য আপনাকে বাস্তব থেকে সুদূর করে রেখেছিল। সব ঠিক, কিন্তু বেতসীর অসহনীয় রূপ প্রতিদিন আপনার হৃদয়ের বন্ধ দরজায় মৃদু ও ভীরু করাঘাত করে যেত।

ফের কাব্য?

মহাশয়, কাব্যোচিত ঘটনার বিবরণে একটু কাব্যের স্পর্শ না থাকলে গ্রহণযোগ্য হয় না।

বাড়াবাড়ি মানেই বুঝি কাব্য?

যথার্থই বলেছেন। কাব্য মানেই বাহুল্য, কাব্য মানেই হল অতিশয়োক্তি, কাব্য মানেই উপচে পড়া হৃদয়াবেগ।

তাই হবে। সেই জন্যই কাব্য আমি পছন্দ করি না।

প্রভু, কঠিন গবেষণা, জটিল অঙ্ক এবং প্রবল বিদ্যা আপনার অন্তরকে খানিকটা শুষ্ক করে তুলেছে বটে, কিন্তু একদা আপনা হৃদয়ের অর্গল ভগ্ন হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, হ্যাঁ

দিনের পর দিন বেতসীর দুই অপরূপ চক্ষু আপনাকে লেহন করে যেত, তার রূপের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ত আপনার দুর্গের পরিখায়, তার হৃদয় নীরবে নিবেদিত হত আপনার চরণে। হতে হতে একদিন আপনার বর্ম ভেদ হল।

বৈজ্ঞানিক বিরক্ত হয়ে বলেন, ওরে বাপু, অত কাব্য করে বলার কিছু নেই। সোজা কথায় বলে ফেল, পচা শামুকে আমার পা কেটেছিল।

না পিতা, ওরকমভাবে বলবেন না। বেতসী রায়ের রূপ তো দোষের ছিল না, সেও তো ঈশ্বরের দান।

ঈশ্বর! ওহে, তোমরা ঈশ্বর-টিশ্বর মানো নাকি? আমি কিন্তু মানি না।

যারা নিজেদের ঈশ্বরের সমতুল ভাবে তারা ঈশ্বরকে মানতে চায় না। যেখানে অহং প্রবল সেখানে ঈশ্বর বাস করেন না।

ভাল জ্বালা হল রে বাপু! তোমরা ঈশ্বর মাননা কেন?

তার কারণ আমরা জ্ঞানমার্গে আপনাদের চেয়ে অনেকটা অগ্রসর জাতি। বিজ্ঞানও এখন অগ্রসর। যতই মানুষ জ্ঞানার্জন করবে ততই অহং বিলীন হবে, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ততই অনুভূত হবে।

তোমরাও তা হলে ওই হাওয়ার নাড়ু খেয়ে বসে আছ? তাই তো তোমার গলায় পৈতে দেখছি।

আমি তো পৈতে-টৈতে কবে ফেলে দিয়েছি। যত সব কুসংস্কার।

আপনি ফেলে দিয়েছেন বলেই আপনার উত্তরপুরুষদের তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। এমন কাজ করা আমাদের উচিত নয় যার জন্য উত্তরপুরুষদের দায়ভাগ বহন করতে হয়।

বামুনদের ইতিহাস জানো? সমাজের শোষক, চতুর প্রতারক, অত্যাচারী, হৃদয়হীন, খল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং ঘৃণ্য একটা শ্রেণী।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ তো তা নয়।

আমি ওসব জানতে চাই না। আমি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে কখনও বোধ করিনি।

বিতর্ক থাক প্রভু। আমরা বেতসীর কথায় ফিরে আসি। অবশেষে একদিন আপনি বেতসীকে অকস্মাৎ লক্ষ করলেন। আপনার কাননে হঠাৎ মর্মরধ্বনি উঠল, পরভৃৎ শিষ দিতে লাগল। আপনি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন।

হ্যাঁ মনে হয়েছিল আমার মাথায় বাজ পড়েছে।

পিতা, উপমাটি অযথার্থ নয়। বজ্রাঘাতের সঙ্গে এই মুগ্ধতার কিছু সাদৃশ্য আছে।

বড় ধানাই-পানাই করছ হে। সোজা কথাটা বললেই তো হয়।

যে আজ্ঞে। আপনার সমস্যা হল প্রেম কাকে বলে আপনি তা জানতেন না। আপনি যে প্রেমে পড়েছেন তাও আপনি বুঝতে পারছিলেন না। শুধু অস্থির, উচাটন, উদ্বেগ আপনাকে গ্রাস করেছিল। সঙ্গে ভয়ও। কারণ নিজের ভিতরকার পরিবর্তনগুলিকে আপনি অনুধাবন করতে পারছিলেন না।

বাঃ, বেশ বলছ তো। ওরকমই হয়েছিল বটে। আমার চিন্তারাজ্যে যেন বাজপাখির ছায়া।

প্রভু, ওরকম কঠিন বাক্য বলবেন না। বিষয়টি পেলব।

ছাই পেলব।

আপনাদের চক্ষু রোজ মিলিত হতে লাগল। আপনি আরও উন্মন হলেন, আরও চঞ্চল, আরও উদ্বিগ্ন, আরও ভীত। আপনার হৃৎপিণ্ড দামামা বাজাত।

বেঁধে! বেঁধে! অতটা বলার দরকার নেই।

যে আজ্ঞে! রেখেঢেকেই বলছি তা হলে। আদত কথাটা হল আপনারা দুজনেই দুজনকে ভালবেসে ফেলেছিলেন।

মূর্খ! ওকে ভালবাসা বলে না। রূপতৃষ্ণা কি ভালবাসা? কামনা কি ভালবাসা?

তা নয় পিতা, তবে ভালবাসার মধ্যে ওসবও একটু-আধটু থাকে।

ওসবই থাকে। নারীপ্রেম আসলে কাম আর রূপতৃষ্ণা।

আপনি বড় কঠোর সমালোচক।

আমি মধুর মিথ্যেবাদী নই তোমার মতো।

আপনাদের ওই প্রেম আপনাকে এতটাই চঞ্চল করেছিল যে, আপনি একদিন সোজা রাস্তায় নেমে মেয়েটির পথ আটকে দাঁড়ান।

হ্যাঁ। ভ্যানতারা আমি পছন্দ করি না।

কিন্তু প্রভু, প্রেমেরও একটা রচনা আছে। প্রথম দৃষ্টি বিনিময়, তারপর কটাক্ষ, তারপর মৃদু হাস্য, তারপর সন্তর্পণ বাক্যালাপ, তারপর প্রস্তাবনা।

তাই বুঝি! প্রেম করতে সময়ের এত অপব্যবহার এবং শক্তিক্ষয়।

নইলে যে ব্যাপারটা মোহমুদগরের মতো হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক যেমনটি আপনার ক্ষেত্রে হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক লজ্জিত হয়ে বললেন, কাজটা যে ঠিক হয়নি তা অবশ্য স্বীকার করতে হবে।

না প্রভু, কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি। আপনি দুহাতে বেতসীর দুই কাঁধ চেপে ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছিলেন, তোমাকে আমার দরকার... তোমাকে আমার দরকার... তোমাকে আমার দরকার...

কুণ্ঠিত বৈজ্ঞানিক বললেন, অ্যাপ্রোচটা একটু রাফ ছিল বটে, কিন্তু সোজা কথাটা তো ওটাই।

হ্যাঁ প্রভু। তবু মোদ্দা কথাটা এসব ক্ষেত্রে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে হয়। বেতসী ঝাঁকুনি খেয়ে ভয়ে আর ব্যথায় কেঁদে ফেলেছিল এবং দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না যে, আপনার প্রস্তাবটায় খারাপ কী ছিল।

বাস্তবিক তাই।

এরপর ওই মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য আপনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং সম্ভব অসম্ভব নানা পন্থা নিতে শুরু করেন। আপনি মেয়েটির বাড়িতে হানা দিয়ে তার বাবার কাছে বেতসীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। আপনার দুর্বিনীত কথাবার্তায় বেতসীর বাবা চটে যান এবং প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর আপনি লোক লাগিয়ে বেতসীকে চুরি করার মতলব আঁটেন। অথচ সামান্য কূটকৌশল ও একটু ধৈর্য অবলম্বন করলে ব্যাপারটা কত সহজেই ঘটে যেত।

ওসব নিষ্কর্মারা পারে। আমার অত ধৈর্য নেই।

তবু আপনি কিন্তু তখন বেতসী-পাগল। যত প্রত্যাখ্যান আসে তত আপনি ক্ষিপ্ত থেকে ক্ষিপ্ততর হয়ে ওঠেন। বেতসীকে সর্বত্র আপনি অনুসরণ করতেন। এক বিয়েবাড়িতে ভিড়ের মধ্যে আপনি তার হাতও চেপে ধরেছিলেন।

আহা, আবার অত ডিটেলসে যাচ্ছ কেন?

আচ্ছা প্রভু, এটুকুই থাক।

বৈজ্ঞানিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মেয়েরা নির্বোধ। তাই ওই মেয়েটি আমার হৃদয়ের বার্তা বুঝতেই পারল না।

যথার্থই প্রভু। হৃদয়ের বার্তা বোঝার সাধ্য কজনেরই বা থাকে, তাই মেয়েটি আপনার কাছ থেকে পালাতে থাকে। এবং বোধহয় রাহুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই মাত্র পনেরো বছর বয়সেই মেয়েটি পাত্রস্থ হতে রাজি হয়ে যায়। আপনি উন্মাদের মতো সেই বিয়ের আসর ভাঙচুর করতে গিয়ে প্রহৃত হন। আপনার কিছুদিন হাজতবাসও হয়েছিল।

ইয়ে, ওসব পুরনো কথা থাক। বিয়ে-টিয়ে আমি আর করছি না বাপু।

তাই কি হয় প্রভু? আপনি বিয়ে না করেন তা হলে সৃষ্টি স্থিতি লোপ পাবে। তাই আমার ওপর হুকুম হয়েছে আপনি রাজি না হলে আপনাকে কালের সরণি বেয়ে সেই আঠারো বছর বয়সে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

বলো কী?

আপনি রাজি হবেন?

বৈজ্ঞানিক হঠাৎ মৃদু একটু হাসলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, না। একবার ঘটে-যাওয়া ঘটনার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

তা হলে কী বার্তা নিয়ে ফিরে যাব প্রভু?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৈজ্ঞানিক বললেন, কী একটা কথা আছে যেন, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, না?

হ্যাঁ প্রভু।

তাই হবে বাপু। ঘিনপিত ঝেড়ে ফেলে, তোমাদের মুখ চেয়ে বরং বরণমালায় ফাঁসিই হোক আমার।

প্রণাম, প্রভু, প্রণাম।

রাতে ঘুম হয়নি। ভোররাত অবধি ডায়েরিতে কাহিনীটা লিখে অমল কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবল। কী লিখছে সে এসব? কেন লিখছে?

ভোরের আলো ভাল করে ফোটার আগেই সে রাপার মুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আজ কলকাতায় ফিরে যাবে তারা। একটু ঘুরেফিরে গ্রামটা দেখে নিলে হয়। কলকাতায় এমন অঢেল সময় আর পরিসর নেই। কলকাতা তার ভালও লাগে না আর। প্রচুর টাকা মাইনের চাকরিও তাকে আকর্ষণ করে না। কেন যে এসব হচ্ছে!

অনেকটা হাঁটল অমল। হেঁটে হেঁটে বাসরাস্তা অবধি চলে গেল। দোকানে বসে ভাঁড়ে চা খেল দুবার। লোকজনের যাতায়াত দেখল। অর্থহীন সময় বয়ে যাচ্ছে। কর্মহীন সময়। আসলে সময় বলে তো কিছু নেই।

আছে গতি ও অবস্থান। আছে অবস্থানগত পরিবর্তন। সব ঘটে আছে, পর্যায়ক্রমে সেগুলি সামনে আসে বা পিছনে সরে যায়।

সে যখন পারুলকে ভালবাসত, কিংবা পারুল তাকে, সেটা কি অতীত? নাকি সেটাও বর্তমান, কিন্তু পরিদৃশ্যমান নয়। ঘটনাটা এখনও ঘটছে, শুধু তা দৃশ্যমান নয়। পৃথিবীর জন্ম ও মৃত্যু, মহাজগতের জন্ম ও মৃত্যু সবই একই সঙ্গে ঘটে আছে। শুধু তা খণ্ড খণ্ড করে দেখা যাচ্ছে—এই যা।

গভীর অন্যমনস্কতায় ফিরে আসছিল অমল। চেনা রাস্তায় পা তাকে নিয়ে যাচ্ছে মাত্র, সে কিছু দেখছে না। চলছে।

অমলদা।

চোখ তুলে অমল হঠাৎ দেখল কুড়ি বছর আগে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনে পারুল।

তেত্রিশ

পারুল! বলে থমকে গেল অমল। শুধু পা নয়, থমকাল তার হৃৎপিণ্ড, তার সত্তা, তার স্মৃতি, তার সময়।

না, পৃথিবীর বহুবার আবর্তন, বহু সূর্য প্রদক্ষিণ, ঘড়ির কাঁটায় ঘুরে যাওয়া বা ক্যালেন্ডার পালটে গেলেও সেই বিশ বছর আগেকার জায়গাতেই থেমে আছে তারা। সময় বলে তো কিছু নেই, তাই বয়স বলেও কিছু হয় না।

পারুল একটু হেসে বলল, এত সকালে কোথায় বেরিয়েছ?

অমলের বিভ্রম কাটেনি এখনও। সে এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বিশ বছর আগেকার সেইসব দিনকে প্রত্যক্ষ করছে। সামনে কিশোরী পারুল।

খুব থতমত খাওয়া মুখে অমল চারদিকে চেয়ে একবার দেখে নিল। তারপর বলল, এই একটু বেরিয়েছিলাম।

মর্নিং ওয়াক?

তাই হবে বোধহয়।

আমি তো তোমাদের বাড়ি থেকেই আসছি।

অবাক অমল বলে, আমাদের বাড়ি থেকে?

হ্যাঁ।

ও।

পারুল ফের একটু হেসে বলে, জিজ্ঞেস করলে না কেন?

অমল এখনও প্রকৃতিস্থ নয়। কিছু বলতে পারছে না যেন। বলল, কেন?

তোমার পাগল মেয়েটাকে পৌঁছে দিয়ে এলাম।

সোহাগ! সোহাগের কী হয়েছে?

পারুল মাথা নেড়ে বলল, কিছু হয়নি। ও আসলে কলকাতা যেতে চাইছে না।

হ্যাঁ জানি।

কেন যেতে চায় না বলো তো?

ও কলকাতা পছন্দ করে না।

শুধু তাই?

ও আমাদেরও পছন্দ করে না। সোহাগ ইজ এ প্রবলেম চাইল্ড।

তোমরা ওকে বুঝতে পারো না, না?

না।

সেটা শুধু তোমাদের প্রবলেম বলে ভাবছ কেন? এটা তো আজকাল সব বাবা-মা আর তাদের সন্তানের প্রবলেম।

জেনারেশন গ্যাপের কথা বলছ?

তা ছাড়া আর কী?

সোহাগের বোধহয় আরও কিছু জটিলতা আছে যেটা আমি বুঝতে পারি না।

ওকে একটু ছেড়ে দাও, দড়ি আলগা করো, দেখবে প্রবলেম হবে না।

আমি তো সংসারের মালিক নই পারুল। আমার কথায় সব তো হয় না। সংসার মানেই নিরন্তর বোঝাপড়া, কনফ্রনটেশন, আপসরফা, বিতর্ক, মতান্তর, সম্পর্কের নানা সরল ও জটিল অঙ্ক কষে যাওয়া। সিদ্ধান্ত নেওয়া তো সোজা নয়!

অত শক্ত কথা বুঝতে পারি না।

সুখী মানুষের বুঝবার কথাও নয়।

আমি সুখী কি না কী করে বুঝলে?

তোমার সুখী হওয়ারই তো কথা পারুল!

তাই বা কেন?

তোমার মুখশ্রী দেখলেই বোঝা যায় তোমাকে দিনরাত খারাপ খারাপ চিন্তা করতে হয় না।

তুমি বুঝি খারাপ চিন্তা করো?

হ্যাঁ পারুল। মাথাটা আজকাল আমার বশে নেই। খারাপ চিন্তা, বিটকেল চিন্তা, অদ্ভুত চিন্তা, পাগলাটে চিন্তায় মাথা সবসময়ে গরম হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয়, পাগল হয়ে যাব।

যাঃ, ও সব ভাবতে নেই, এসো, আমাদের বাড়িতে এক কাপ চা খেয়ে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে অমল বলে, চলো।

পারুল আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে বলল, তোমার কি পুরনো দিনের কথা মনে করে খারাপ লাগে অমলদা?

অমল একটু ভেবে বলে, পুরনো দিন! মানে সেইসব দিনের কথা যখন তুমি আর আমি—?

হ্যাঁ।

খুব মনে পড়ে।

সেইজন্যই কি ওরকম হয়?

তা তো জানি না।

আমি তোমাকে বিয়ে করিনি বলে তোমার ইগোতে খুব লেগেছিল নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ পারুল, লেগেছিল।

তুমি আমাকে ভুলতে তাড়াহুড়ো করে বিয়েও করেছিলে?

হ্যাঁ পারুল।

আমিই কি তোমার অশান্তির কারণ অমলদা?

না পারুল, আমার তা মনে হয় না।।

আমার ওই একটা ভয় আছে। তোমাদের সম্পর্কের মধ্যে যদি আমি কাঁটা হয়ে থাকি তা হলে দুঃখের ব্যাপার হবে।

তোমাকে মোনা কিছু বলেনি তো পারুল?

পারুল মাথা নেড়ে বলল, না।

আশ্চর্যের বিষয় পারুল মোনর ভিতরে কোনও বিদ্বেষ বা ঘেন্না লক্ষ করেনি আজ অবধি। পরিচয় অবশ্য বেশি দিনের নয়। মেলামেশাও যৎসামান্য। তবু তার মধ্যেও কি কিছু বোঝা যেত না?

একটু আগেই সোহাগকে নিয়ে মোনার ঘরে পৌঁছে দিচ্ছিল পারুল।

দরজা খুলে তাকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে মোনা বলল, আরে! আসুন, আসুন। এত ভোরে যে!

এসে অসুবিধে করলাম না তো!

না, না কী যে বলেন! ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম।

কথার মধ্যে একটুও কৃত্রিমতা নেই, চোখে ছুরিছোরা ঝলসে উঠল না, গলায় কোনও কাঠিন্য প্রকাশ পেল না। অথচ মহিলা জানেন, পারুলের সঙ্গে তার স্বামীর অ্যাফেয়ার ছিল।

তাকে চেয়ারে বসিয়ে নিজের মেয়ের দিকে একবার চেয়ে মোনা বলল, ও আপনাকে ধরে এনেছে বুঝি?

পারুল মৃদু হেসে বলল, কে কাকে ধরে এনেছে তা বলা যাবে না। দুজনেই দুজনকে ধরে এনেছি।

এসে ভাল করেছেন। আজ আমরা কলকাতা ফিরে যাচ্ছি।

শুনেছি।

কবে যে আপনার সঙ্গে ফের দেখা হবে কে জানে। আপনি কি এখন এখানে থাকবেন?

পাগল? জামশেদপুরে আমার অনেক কাজ। খুব বেশি হলে আর হয়তো দিন পনেরো। মা বড্ড একা, হয়ে পড়েছেন, তাই থাকা। ছেলেমেয়েদের স্কুল খুলে যাবে, আমার স্বামীও একা রয়েছেন।

সকলেরই এক সমস্যা। সোহাগ তো কিছুতেই কলকাতায় যেতে রাজি নয়। এ জায়গাটা ওর ভাল লাগে। শহরের পলিউশনে ওর প্রবলেমও হয়। কিন্তু তা বলে তো আর অনন্তকাল এখানে পড়ে থাকতে পারে না।

পারুল মৃদু একটু হেসে বলল, সোহাগ একটু অন্য ধরনের।

মোনা মেয়ের দিকে ফের তাকাল একবার। বলল, শুধু অন্যরকম বললে কিছুই বলা হয় না। একদম পাগল একটা। সব সময়ে ওকে নিয়ে চিন্তা হয় আমার।

সকলের কি একরকম হওয়া ভাল? আমরা সবাই এক এক রকমের পাগলই তো!

একটু-আধটু হলে চিন্তা ছিল না। কিন্তু ও বড্ড ডাকাবুকো। ভয়ডরও কম। আর আনপ্রেডিক্টেবল।

সেটা কয়েকদিনে টের পেয়েছি।

একটু চা করে আনি?

চায়ের কথায় নাক কোঁচকাল পারুল। চায়ের গন্ধ তার আজকাল সহ্য হয় না। মাথা নেড়ে বলে, চা থাক।

আপনার কি শরীরটা খারাপ? খুব রুখু দেখাচ্ছে আপনাকে। অ্যান্ড স্টিল ইউ আর বিউটিফুল।

আপনারা আমাকে যে কী চোখে দেখেন কে জানে। আমি তত সুন্দরী নই কিন্তু।

মোনা তার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একটু চেয়ে থেকে বলল, আমার ছেলে মেয়ে সবাই আপনার ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমিও, কী জানি কেন, আমাদের ওপর হয়তো আপনার একটা হিপনোটিক স্পেল কাজ

করে।

সেটাই তো আমার পক্ষে লজ্জার ব্যাপার।

তা কেন? এতে লজ্জা পাওয়ার তো কিছু নেই। সোহাগ, তুমি একটু বাইরে যাবে?

যাচ্ছি। বলে সোহাগ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

মোনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি সব জানি, জেনেও আপনাকে কখনও হিংসে করতে পারিনি, আপনার ওপর রাগও হয়নি কখনও।

পারুল লজ্জায় একটু লাল হল। তারপর বলল, সেটা এত অস্বাভাবিক যে বিশ্বাস হতে চায় না। আপনি বড্ড ভাল।

আমাকে কেউ ভাল বলে না।

কেন বলে না?

তা তো জানি না। অন্যের চোখে ভাল হতে গেলে নিজেকে যতটা বদলাতে হয় ততটা কি বদলাতে পারি, বলুন? আর নিজেকে বদলাবই বা কেন? সোহাগের বাবাকে তো দেখছেন! কী মনে হয় আপনার?

মাথা নাড়ে পারুল, কিছু খারাপ তো দেখছি না।

বাইরে থেকে বুঝবেন না। ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড, ডিপ্রেসড। হয়তো মনে মনে ওর সব কিছুর জন্য আমাকেই দায়ি করে। কারও কারও কপাল থাকে ওরকম, ভিকটিম অফ সারকামস্ট্যান্সেস। আমি হলাম তাই। অনেক কথা বলে ফেললাম আপনাকে। কিছু মনে করবেন না।

পারুলের একটা অপরাধবোধ হচ্ছিল। এদের অশান্তির জন্য কোনও না কোনওভাবে সে দায়ি নয় তো!

মোনা বিষন্ন গলায় বলে, আমাদের কোনও প্রবলেম নেই, অথচ কত প্রবলেম যে রোজ অকারণে তৈরি হয় কে জানে। পারুল একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে উঠল। বলল, সোহাগ সকালে আমার কাছে গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল জানেন?

না তো!

সেটা খুব মজার ব্যাপার। ওর খুব ইচ্ছে দিনকতক আমার কাছে থাকবে। শুনে আমার খুব মায়া হয়েছিল। কেন যে আমাকে ওর এত পছন্দ কে জানে! যাই হোক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কলকাতায় যেতে রাজি করিয়েছি।

থ্যাংক ইউ। ওকে কলকাতায় ফেরত নিয়ে যেতে আমরা হিমসিম খাচ্ছি। কিছুতেই যেতে চায় না। আজও ভাবছিলাম অনেক বকাঝকা করতে হবে বোধহয়।

না, বকবার দরকার নেই। ও যাবে।

কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব।

সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল মোনার চোখে।

ফিরে আসতে আসতে সে ভাবছিল, মোনা সব জানে। তাদের প্রেম, দেহগত সম্পর্ক—এত সব জেনেও কী করে তাকে অপছন্দ না করে পারে? খুব সূক্ষ্মভাবে হয়তো আরও একটা ব্যাপার মোনার মধ্যে কাজ করে। সে যে এক কামুক পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তার ভিতরে হয়তো মেয়ে হিসেবে মোনা একটা জয়ের আনন্দ খুঁজে পায়। কিংবা এসব নাও হতে পারে। হয়তো অন্য কিছু, যার মাথামুন্ডু পারুল জানে না। তবে ভারী অসহায় লাগে তার।

পারুলদের বাড়ি এখন ফাঁকা। তার বাবা জেদ করে ভাইয়েদের অংশ কিনে নিয়ে যে বিশাল বাড়িতে তার মাকে অধিষ্ঠিত রেখে গেছে তাতে থাকার মতো যথেষ্ট লোক কখনওই ছিল না। এখন তো আরও নেই। মা কীভাবে যে এবাড়িতে একা দিনের পর দিন কাটায় তা ভাবতেই পারে না পারুল।

মাঝের দালানের মস্ত বৈঠকখানায় এনে অমলকে বসাল সে। এ ঘরে খুব দামি মোটা গদির সোফা সেট সাজিয়ে রাখা। আগেকার দিনের সব বাঘ আর হরিণের মুন্ডু দেয়ালে মাউন্ট করা। কাশ্মীরি জালি কাজের কাঠের পার্টিশন। খুব আধুনিক রুচিসম্মত ছিমছাম ব্যাপার নয়, একটু যেন লোক-দেখানো জাদুঘর-জাদুঘর ভাব। তা হোক, এ-ঘরটায় তার বাবার গন্ধ আর স্পর্শ আছে।

এক ধরনের বিষন্ন উদাসীন চাউনি নিয়ে বসে আছে অমল। কথা নেই, কৌতূহল নেই, পারুলের দিকেও চাইছে না।

কিছু খাবে অমলদা?

অমল ঘোর অন্যমনস্ক চোখ তুলে বলে, উঁ?

কিছু খাবে? সকালে তো জলখাবার খাওনি!

অমল হঠাৎ একটু হেসে বলল, খাব! হ্যাঁ, আমার তো খুব খিদে পেয়েছে। টের পাইনি এতক্ষণ!

সে কী! খিদে টের পায় না নাকি মানুষ?

মানে, একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কী একটা যেন খুব দরকার। কী যেন ভাবছিলাম বলে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

আচ্ছা মানুষ যা হোক, বোসো একটু। সকালে আমাদের বাড়িতে লুচি-টুচি হয়। বলে আসি।

অমল ঘাড় কাত করে বলে হ্যাঁ। লুচি আর বেগুনভাজা। তাই হবে।

পারুল বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সেই কৈশোরকালে সে এ লোকটিকে ভালবেসেছিল। আজ যেন সেটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কী করে যে ভালবেসেছিল সেটাই আজ বুঝতে কষ্ট হয়।

আসলে মানুষ কখনওই আর একটা মানুষের সবটুকু ভালবাসতে পারে না। অমলের মেধা, স্মার্টনেস ইত্যাদিই হয়তো সম্মোহনের কাজ করেছিল তার কাঁচা মনে। আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। শুধু একটু অনুকম্পা আছে, করুণা আছে, মায়াও থাকতে পারে।

তোর সঙ্গে ও কে এল রে, অমল নাকি?

রান্নাঘরের বারান্দায় মা।

হ্যাঁ।

অমন ঝড়ো কাকের মতো চেহারা কেন ওর? কী হয়েছে? মাথার চুল তো কাকের বাসা।

অমলদা আজকাল ওরকমই হয়ে গেছে। কী যেন ভাবে বসে সবসময়ে।

বউয়ের সঙ্গে নাকি বনিবনা নেই! সেদিন সন্ধ্যা এসে অনেক কথা বলে গেল। বউটা কেমন, জানিস?

ভালই তো মা। বেশ ভাল। বুদ্ধি বিবেচনা আছে। খারাপ নয়।

ও মা! তা হলে বনে না কেন? আজকাল বউগুলোই এসে যত ঘোঁট পাকায়। বউ যদি ভাল হয় তাহলে আর ভাবনা কী?

বাঃ, বেশ ভাল কথা তো মা? মেয়েরা ঘোঁট পাকায় আর পুরুষরা বুঝি সব লক্ষ্মীছেলে!

তাই তো। পুরুষদের আবার দোষঘাট কী? পুরুষেরা সংসারের কূটকচালি বোঝেও না, ঘোঁটও পাকায় না। মেয়েরাই তো নষ্টের মূল।

বেশ মা, বেশ পক্ষপাতিত্ব তোমার!

বলাকা হাসেন। বলেন, আচ্ছা আর ঝগড়া করতে হবে না তোকে। কী হয়েছে ছেলেটার বলবি তো!

সে তো জানি না। তবে কেমন যেন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, খুব অন্যমনস্ক, ওর বউ বলে খুব নাকি ডিপ্রেশনে ভোগে।

বেচারা! কত মেডেল-টেডেল পেয়ে শেষে এই দুর্দশা!

বামুনদিকে দিয়ে লুচি বেগুনভাজা আর এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও তো ও-ঘরে।

দিচ্ছি। কিন্তু তোর কি খিদে পায় না নাকি? রাতে যা খেয়েছিলি সব তো উগরে দিয়েছিস।

ও বাবা, খাওয়ার কথা বোলো না তো! শুনলেই গা বিড়োয়।

ওরে, নিজের কথা ভেবে নয় না-ই খেলি। পেটেরটার কথা ভাব। তুই শুঁটকি মেরে থাকলে ওটাও যে শুকিয়ে যাবে। মায়ের খাওয়াই তো ওদের খাওয়া।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পারুল বলল, তা হলে ঝাল-টাল দিয়ে কিছু একটা করে দাও।

বেশি ঝাল খাওয়াই কি ভাল এ সময়ে?

কেন, ঝালে কী দোষ করল? মুখে রুচি নেই যে!

ঝাল খেলে পেটেরটারও যে ঝাল লাগবে!

উঃ, কত কথাই যে জানো! তাহলে নতুন রকমের কিছু করে দাও। চেনা খাবার মুখে তুলতে ইচ্ছে। করে না।

বামুন মেয়ে কি আর নতুন রান্না কিছু জানে? আচ্ছা দেখছি, আমার মাথা থেকেই যদি কিছু বেরোয়। তোর বাবা তো নানারকম খেতে ভালবাসত, তারই কোনও একটা ভেবেচিন্তে বের করি। বাঙাল রান্না খুব ভালবাসত। দেখি একটা বাঙাল দেশের পদই রেঁধে, উতরোয় কি না। এখন বরং দুটো শুকনো মুড়ি খা।

সে আর একা নয়। একা নয়। তার গর্ভে অনাগত সন্তান তাকে ডাকে, তার শরীর শুষে খায়, তার অন্ধকার গর্ভে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। ভাবলেই রোমাঞ্চ হয়।

ঘরে ঢুকে পারুল দেখে, ঠিক যেভাবে অমলকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল সেই একইভাবে বসে আছে সে। নড়েনি, চোখের পলকও ফেলেনি বোধহয়। যেন পাথরের মূর্তি।

অমলদা।

উঁ!

কী এত ভাবছ?

অমল হাসল। বলল, কী যে ভাবি বলতে পারি না পারুল। ভাবনার কোনও মাথামুন্ডু নেই।

এত ভাবো কেন?

বললাম তো মাথাটা আমার বশে নেই।

মা বলছিল তোমার চেহারাটা ঝড়ো কাকের মতো হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, সেটা আমিও টের পাই।

অনেকদিন চুল কাটোনি, দাড়িও কামাওনি বোধহয় দিন দুয়েক।

হ্যাঁ। ওসব ভালই লাগে না।

তা হলে কী ভাল লাগে?

কিচ্ছু না। বাঁচতেও ভাল লাগে না।

ওসব বলতে নেই অমলদা। ইচ্ছে করলেই মরা যায়। সহজেই। কিন্তু বাঁচাটাই শক্ত।

হ্যাঁ, আমারও বড় কঠিন মনে হয় বেঁচে থাকাটাকে। বড্ড কঠিন।

চৌত্রিশ

মরণের লেখাপড়া নিয়ে বাসন্তী বা রসিক বাঙাল কারওই তেমন কোনও মাথাব্যথা ছিল না এতদিন। বাসন্তী লেখাপড়ার মর্ম তেমন বোঝে না। তবু তাড়না করতে হয় বলে তাড়না করে। আর রসিকের বক্তব্য একটু অন্যরকম। একদিন দুঃখ করে বলেছিল, আমার বড় পোলাখান হইল গুড বয়। হ্যায় লেখাপড়া শিখ্যা বিলাত আমেরিকায় যাইব। আমার ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া তার কোনও মাথাব্যাথা নাই। তাই ভাবতাছি দোকানখান মরণন্যারেই দিয়া যামু। বুইঝ্যা চলতে পারলে খাইয়াপইর‍্যা থাকতে পারব।

বাসন্তীরও অমত ছিল না। তার বাপের বাড়িতেও লেখাপড়ার চর্চা নেই, সে নিজেও বেশি দূর পড়েনি। কাজেই মরণকে নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না তার।

কিন্তু সুমন এসে হিসেবের একটু ওলটপালট ঘটিয়ে দিল। এক রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে সে তার বাবাকে বলল, মরণের জন্য একজন টিউটর রাখা দরকার।

বাঙাল ইলিশমাছের ঝোল দিয়ে সাপুটে ভাত মাখছিল। মুখ তুলে বলল, নাকি?

হ্যাঁ। আমি ওর বইখাতা সব নেড়েচেড়ে দেখলাম, ওর প্রগ্রেস বেশ খারাপ। টিউটর ছাড়া ও কিন্তু ভাল করতে পারবে না। অঙ্কে ইংরিজিতে বেশ কাঁচা।

রসিক সাহা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলল, আরে বান্দরটা তো লেখাপড়াই করে না। আমিও থাকি না এইখানে। বান্দরটা তো ধরাবে সরা পাইছে। তারাপদ নামে এক ছ্যামড়া তো ইংরাজি পড়াইত। হ্যায় নাকি অখন সময় পায় না।

সেইজন্যই বলছি, ওকে ভাল দেখে একজন টিউটর রেখে দাও।

রসিক সাহা সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠে বলে, ঠিকই তো কইছস! আমার মাথায় তো কথাটা আসে নাই! কাইলই মাস্টার ঠিক করতে হইবো। যত টাকা লাগে, বেস্ট মাস্টার চাই।

টেবিলের অন্য ধারে সিঁটিয়ে বসে ছিল মরণ। গেল তার সব সুখ আর আনন্দ। গেল তার টো টো করে ঘুরে বেড়ানো। পড়াশুনোর চেয়ে কষ্ট আর কীসে আছে! তার গলায় ভাতের গ্রাস আটকে রইল কিছুক্ষণ।

রসিক সাহা বাসন্তীর দিকে চেয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত গলায় হেঁকে বলল, কও তো এইখানকার বেস্ট মাস্টার কে আছে। কাইলই খবর দিয়া আনাইতে হইবো।

বাসন্তী ভয় খেয়ে বলে, ভাল মাস্টারের খবর কি আর আমি জানি! কাল সকালে খবর নেবোখন।

আহা, সব ব্যাপারেই তোমরা বড় ঢিলা। আইজ রাইতেই খবর পাঠাইয়া দাও। কাইল সক্কালেই য্যান মাস্টার আইয়া হাজির হয়।

বাসন্তী শুকনো মুখে বলে, রাত দশটা যে বেজে গেছে। এখন কাউকে খবর পাঠালেই কি আসবে? কাল রবিবার আছে, কাল সকালেই খবর নেবোখন।

কার কাছে খবর নিবা?

সে অনেক লোক আছে। তুমি চিন্তা কোরো না।

রসিক দমিত না হয়ে মরণের দিকে কটমট করে চেয়ে বলে, এই বান্দর, তর ইস্কুলে ইংরাজি পড়ায় কে?

মরণ ভয়ে ভয়ে বলে, ক্ষেত্রমোহনবাবু।

ক্ষ্যাত্রমোহন! কাইল সকালেই গিয়া ডাইক্যা আনবি। আর অঙ্ক করায় কে?

কালীবাবু।

তারেও ধইরা আনবি।

আচ্ছা।

বাঙাল অত্যন্ত উত্তেজিত গলায় বলতে লাগল, কথাটা যে ক্যান আমার আগে মনে হয় নাই! ঠিকই তো, মাস্টার না হইলে কি আইজকাইল চলে? বান্দরটা তো হেই লাইগ্যাই দুই তিন সাবজেক্টে ফেল মাইরা মাইরা ক্লাসে ওঠে।

পর দিন সকালেই খোঁজখবর হতে লাগল। উত্তেজিত রসিক সাহা যার কথা শোনে তাকেই রেখে ফেলে আর কি।

সুমন বাপকে শান্ত করে বলল, এখনই বেশি টিউটর রাখার দরকার নেই। মোটে তো ক্লাস সিক্স। একজন হলেই চলবে। উঁচু ক্লাসে উঠলে সাবজেক্টওয়াইজ টিউটর রাখলেই হবে।

ধীরেন কাষ্ঠ সকালে এসেই ফেরে পড়ে গেল।

খুড়া, এইখানে ভাল মাস্টার কে আছে কন তো! একটু কড়া ধাতের শক্ত মাস্টার। আমার ছোট পোলাটা তো জাহান্নামে যাইত্যাছে।।

তটস্থ ধীরেন কাষ্ঠ বলে, তার আর ভাবনা কী! পূর্ণশশী স্কুলের নরেন মাস্টারকে রাখো। অঙ্ক ইংরিজিতে তুখোড়, কত গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করছে।

তারেই লইয়া আহেন।

ধীরেন কাষ্ঠ হেসে বলে, দাঁড়াও বাঙাল, নরেন স্যারের যে অনেক টিউশনি। ব্যাচ ধরে পড়ায়। সে বাড়িতে আসবে না। খাঁইও খুব বেশি। বাড়িতে যদি চাও তাহলে সনাতন মাস্টারকে ধরতে পারো।

বিস্তর আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে বদরাগী, কেঠো চেহারার রসকষহীন পবিত্রবাবুকে রাখা সাব্যস্ত হল। কাছেই বাড়ি, মানুষটাও রসিক বাঙালের চেনা। বাইরের ঘরখানা তুলতে গিয়ে একবার রসিকের কাছে হাজার খানেক টাকা হাওলাত করেছিলেন।

পবিত্রবাবু এলেন বেলা এগারোটা নাগাদ। এসেই বললেন, ওর তো ভিতই কাঁচা রয়ে গেছে, খাটতে হবে।

বাঙাল সঙ্গে সঙ্গে বলে, আরে খাটবেন খাটাইবেন তবে না কাম আউগ্যাইব। কত টাকা চান কন।

পবিত্রবাবু গরজ দেখে একটু বেশিই হাঁকলেন। রসিক সঙ্গে সঙ্গে রাজি, আইজই লাইগ্যা পড়েন।

আজ রোববার। রোববারে পড়াই না। কাল থেকে আসব। স্কুলের পর, বিকেল পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটায়।

মরণ প্রমাদ গুনল। গেল তার ফুটবল, ব্যাটবল, দৌড় ঝাঁপ। ইস্কুলের পরই এসে পড়তে বসতে হবে। চোখে জল আসছিল তার।

রান্নাঘরে গিয়ে ছলোছলো চোখে মাকে বলল, বিকেলে পড়তে হয় বুঝি! আমি কিছুতেই বিকেলে পড়ব না।

ওরে চুপ! চুপ! তোর বাবার কানে গেলে কুরুক্ষেত্র হবে।

জিজিবুড়ি উনুনের ধারে শীতে জড়সড় হয়ে বসা। হাতে দুধে গোলা চায়ের গ্লাস। বিষ চোখে নাতির দিকে চেয়ে বলে, মাস্টার এসে তো সগ্গে তুলবে। বাপের টাকা তো গাছে ফলেছে কি না, চোখে ভেলভেট দেখছে।

বাসন্তী চাপা গলায় বলে, আঃ, চুপ করো তো মা! ওর বাবা শুনতে পেলে রক্ষে রাখবে না।

বলি ম্যাস্টার কি বইখাতা জলে গুলে খাইয়ে দেবে? বাপেরই বা বিদ্যে কত?

ওর বাপের বিদ্যের খতেন নিচ্ছ কেন? বাবা কি ফ্যালনা?

ফ্যালনা কি না জানি না বাপু। তবে বিদ্যেধর বলেও শুনিনি। বড়বাজারের গদিতে বসে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামায়, এইটুকুই জানি।

তাতে কী হল? সেটা করতেও মুরোদ লাগে।

তা সেই বিদ্যেতে লাগিয়ে দিলেই তো পারে ছেলেকে। লেখাপড়া শিখে তো হচ্ছে লবডঙ্কা। বি এ, এম এ পাস ছোঁড়াগুলো ভেরেন্ডা ভাজছে দেখছিস না চারদিকে? আর পবিত্র মাস্টারেরই বা কী ছিরি! কালও তো দেখলুম দুখনের গোয়ালঘর থেকে গামলাভর্তি গোবর নিয়ে যাচ্ছে। ওই কি আবার একটা মাস্টার হল বাপু? নিত্যি আমাশায় ভুগছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘটি নিয়ে দৌড়োচ্ছে পায়খানায়। ও আবার কী পড়াবে শুনি! গাঁয়ে আব ম্যাস্টার পেলি না!

বাসন্তী একটু দমে গিয়ে বলে, তা মাস্টারের মর্ম আমরা কী জানি বলো! ধীরেনখুড়ো বলল, তাই—

আহা, ওই জুটেছে এক ধীরেন ছুঁচো। সারাদিন এ-বাড়ি ও-বাড়ি ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে আর কার মাথায় কাঁঠাল ভাঙবে সেই মতলব কষছে। বাঙালের সঙ্গে অত গলাগলি কীসের লা ছুঁচোটার? ইনিয়ে বিনিয়ে অভাবের কথা গেয়ে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে কি না খবর রাখিস? অত আনাগোনা তো ভাল নয় বাপু!

আহা, ওরকম বোলো না তো! ধীরেন খুড়ো তো দুঃখী লোক।

ভেজা বেড়াল। বাঙাল যেমন হদ্দ বোকা, তেমনি তুই। ধীরেনের ছেলেগুলোর খবর রাখিস? একটা জুয়ো খেলে বেড়ায়, অন্যটার ছ্যাঁচড়ামি করে চলে। সাধ করে আবার ছেলের বিয়ে দিয়েছে ধীরেনের বউ মাগী। এখন শাউড়ি-বউতে চুলোচুলি হচ্ছে রোজ। অভাবী লোক হলেই কি আর ভাল লোক হয়? ঝেটিয়ে বিদেয় করে দিবি এর পর আবার এলে।

বাসন্তী কড়াইতে ফোড়ন ছাড়তে ছাড়তে বলে, ওসব আমি পারব না। ধীরেনখুড়োকে মরণের বাবা ভারী পছন্দ করে।

ওই তো বললুম, শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর। যেদিন গাঁটগচ্চা যাবে সেদিন বুঝবি। টাকার দেমাকে বাঙালের কি আর মাথার ঠিক আছে! আর ওই খ্যাঁকশেয়ালটাও টাকার গন্ধে গন্ধে রোজ এসে টুঁ মারছে। সেদিন এক গোছা রুটি খেল, একদিন আবার ডিম ভাজা দিয়ে চিড়ের পোলাও। রোজই তো এসে সেঁটে যাচ্ছে দেখছি। অন্নসত্র তো আর খুলে বসিসনি! মুখের ওপর সে কথাটা একদিন শুনিয়ে দিবি।

মরণ এসব শুনে-টুনে খুব আশায় আশায় বলে, পবিত্র মাস্টারমশাই ভীষণ রাগী লোক, খুব মারে।

জিজিবুড়ি বলে, তা মারবে না কেন? পরের ছেলের পিঠ তো। হাতের সুখ করলেই হল!

ও মা, বাবাকে বলে দাও না, আজ থেকে আমি নিজে নিজেই পড়ব। খুব ভাল করে পড়ব।

বাসন্তী ছেলের দিকে চেয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, দাদা কী বলল কাল রাতে, শুনিসনি? লেখাপড়া কিচ্ছু হচ্ছে না। দুটো তিনটে বিষয়ে ডাব্বা খেয়ে উঠছ। সেটা কি ভাল দেখাচ্ছে? দাদা কত ভাল ছাত্র। তার ভাই হয়ে—

জিজিবুড়ি চাপা গলায় বলে, আহা, ভাই বড় এক মায়ের পেটের কিনা। সৎ ভাই আবার ভাই! কলকাত্তাই চাল মারতে এয়েছে। তা ওইটুকুন ছোঁড়া এখন তোদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবে নাকি? সে বলেছে বলেই মাথা কিনে নিয়েছে?

বাসন্তী বলে, আচ্ছা, খারাপ কথা কি বলেছে কিছু? ভাইয়ের লেখাপড়া নিয়ে ডাকখোঁজ করা কি খারাপ? তোমার কেন গায়ে জ্বালা ধরছে!

বলি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচা করে ছেলেকে বিদ্যেসাগর বানিয়ে তোর হবে কোন অষ্টরম্ভা? একটা দুটো বিষয়ে ফেল করে তা করুক না। ক্লাসে তো উঠছে ফি বছর! ওর বেশি বিদ্যের দরকারটাই বা কী? আর ও ছোঁড়াই বা এসে গেড়ে বসে আছে কেন কিছু আঁচ করতে পারলি?

তোমার যেমন কথা! গাঁয়ে বেড়াতে এসেছে তাতে দোষের কী হল বলো তো! এটাও তো ওর বাবারই বাড়ি।

সেই কথাই তো বলছি লা! এটা যে ওর বাবার বাড়ি সেটা বুঝে নেওয়ার জন্যই তো এসেছে। বিষয়সম্পত্তির খোঁজখবর নিচ্ছে। যদি ভাল চাস তো দলিলপত্র একজন ভাল উকিলকে দেখিয়ে রাখ। দলিলে কোন ফাঁকফোকর আছে কে জানে বাবা। কোন দিন থাবা মেরে সব নিয়ে নেবে, তোর তখন হাতে হ্যারিকেন।

বাসন্তী ডাল ফোড়নে ছেড়ে বিরক্তির গলায় বলল, তোমার মাথায় সেই যে পোকা ঢুকেছে আজও তা গেল না।

তোর ভালর জন্যই বলি। বেড়াতে এসে কেউ সৎ মায়ের বাড়িতে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে? এর পিছনে মতলব নেই বলছিস! তুই আহাম্মক বলেই বিশ্বাস করিস ও কথা। খোঁজ নিলে দেখবি, বড়বউ যুক্তি করে পাঠিয়েছে। ছেলে এসে সব দেখে গেল, এর পর একদিন বড়বউ এসে তোকে উৎখাত করবে।

অত সোজা নয় মা। দেশে আইন আছে।

আইন আছে না হাতি। এই তো মহেশের বিধবা বউয়ের জমি তার ভাসুর গাপ করে নিল। পারল কিছু করতে?

কপালে যা আছে তাই তো হবে! আগে-ভাগে ভেবে কী করব বললা! তা বলে আমি তো ছেলেকে তাড়াতে পারি না। এ-বাড়িতে ওর জোর আছে।

সে তুই হাঁদারাম বলে পারিস না। তোর জায়গায় চালাক মেয়েছেলে হলে ও ছেলে পালাতে পথ পেত না। বলি বাছা, বাঙালকেই বা বিশ্বাস কী? সাঁট হয়তো সেও করেছে। তোকে তো আর বউ বলে ভাবে না। তার মতলবও খারাপ হতে পারে।

এবার দয়া করে যাও মা, বসে বসে আমার মাথাটা আর চিবিয়ে খেও না। তোমার এমন সব কথা যে বুক কাঁপে।

আমারও বুক কাঁপে মা, ছেলেপুলে নিয়ে না তুই পথে বসিস। আমি বলি কী, গোপনে গোপনে কিছু কিছু করে জমি বেচে দে। দিয়ে নগদ টাকা হাতে রাখ। তোর ছোড়দা বলছিল, খালধারের জমিটা পরাণ দাস

কিনতে চাইছে। পাঁচ হাজার করে বিঘে। চার বিঘে বেচলে নগদ বিশ হাজার টাকা আসবে হাতে।

টাকাটা হাতে রাখ। অভাবে পড়লে কাজে দেবে।

আর সে বুঝি টের পাবে না? অনেক কুচুটেপনা করেছ, এবার যাও। প্রত্যেক দিন সকালবেলাটায় এসে তুমি আমার মেজাজটা খারাপ করে দিয়ে যাও। বয়স তো হয়েছে, এবার একটু ঠাকুরদেবতার নাম করতে পার না ঘরে বসে?

জিজিবুড়ি সঙ্গে সঙ্গে ভারী ভালমানুষের মতো বলল, কী ডাল রাঁধলি আজ? সোনামুগ মনে হচ্ছে! ডালের মাথায় একটু কাঁচা ঘি ঢেলে দে তো একবাটি, নিয়ে যাই। দুপুরে ভাতের সঙ্গে খাবোখন।

এখন পারব না মা। পরের দিকে এসে নিয়ে যেও, আর বাটিও এনো। গেল হপ্তায় দু দুটো কাঁসার বাটি নিয়ে গেছ, ফেরত দাওনি।

কে বলল দিইনি?

আমার সব হিসেব আছে।

বুড়ো বয়সে ভুলভাল হতে পারে। দেখবখন খুঁজে।

আর খুঁজেছ। ও বাটি আমার গেছে, এখন থেকে কিছু নিতে হলে নিজের বাসন এনো, এই বলে দিলাম।

এ আর খুঁড়িস না বাপু, অভাবে পড়লে লোকে কত কী ভাবে। পেটের মেয়ে হয়ে শেষে আমাকে চোরও বলতে লেগেছিস!

মোটেই চোর বলিনি, বাটি দুটো ফেরত দিতে বলেছি, ভারী খাগড়াই বাটি, এ-তল্লাটে অমন জিনিস পাওয়া যাবে না।

আচ্ছা বাপু, খুঁজে দেখবখন।

মরণের মনে হচ্ছে ভগবান বলে কেউ নেই। তিন দিন হয়ে গেল, বিকেলের নরম রোদে যখন বাইরের মাঠঘাট তার বয়সি ছেলেদের আয়-আয় করে ডাকে, তখন পবিত্র স্যারের রাগী আর চোয়াড়ে মুখের দিকে বেচারার মতো চেয়ে তাকে বসে থাকতে হয়। তিন দিনে তেমন শাসন না হলেও গোটা দুই গাঁট্টা খেতে হয়েছে তাকে।

আজকাল দাদাকে তার বিশেষ ভাল লাগছে না। তার এই সর্বনাশটা দাদা না করলেও পারত।

কদমগাছটার তলায় গিয়ে ছুটির দুপুরে সে শিবঠাকুরকে কম ডাকাডাকি করেনি দুদিন। কিন্তু শিবঠাকুর বোধহয় নেশাভাঙ করে পড়ে আছেন, কান দেননি তার কথায়।

চিকু বলে, আরে শিবঠাকুর বর দিলেও ভুলে যায়। তার চেয়ে কালীকে বল। কালী হচ্ছে জাগ্রত ঠাকুর। দেখসনা জিবটা কেমন লকলক করে!

কালীও তার কথা শুনবে বলে আর ভরসা হয় না মরণের। সে বলে, ধুর, ভগবান-টগবান নেই।

ভগবানের দোষ কী জানিস? ছোটদের কথা একদম শুনতে চায় না।

তাই হবে বোধহয়। মুশকিল হল, ছোটদের কথা কেউই তেমন শুনতে চায় না।

চিকু বলে, ভগবানদের ঘুষ-টুসও দিতে হয়।

কীরকম ঘুষ?

যার যেমন ক্ষমতা। সোয়া পাঁচ আনা বা পাঁচ সিকে।

সোয়া পাঁচ আনা কত পয়সায় হয়? তা বলতে পারব না, আনা-ফানা তো এখন পাওয়া যায় না। মার কাছে শুনেছি তাই বললাম।

আমিও শুনেছি।

স্কুলে এখন পুজোর লম্বা ছুটি চলছে। তাই দিনমানে কিছু সময় পাওয়া যায়। তাও কমে এসেছে।

পবিত্র স্যার মেলা হোম টাস্ক দিয়ে যান রোজ। সকালে আর দুপুরে সেগুলো করতে হয়। এত দিন এসবের বালাই ছিল না।

গত তিন দিন দাদার সঙ্গে প্রায় কথাই বলেনি মরণ। তিন দিন পর দাদা দুপুরে ডাকল।

আয়, রোজ দুপুরে আমার ঘুমোতে ভাল লাগে না। কলকাতায় তো কখনও দুপুরে ঘুমোই না।

দুপুরে তাহলে কী করো?

বাড়িতেই থাকি না। হয় কলেজ থাকে, নয়তো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিট করি, সিনেমা-থিয়েটার-এগজিবিশন কত কী থাকে। বাড়িতে আর কতক্ষণ থাকি? এখানে তো সময়ই কাটতে চায় না।

আমার কিন্তু এখানেই বেশ ভাল লাগে। কত কী করার আছে।

সুমন হাসে, তোর করা তো জানি। এ বাড়ির নারকোল পেড়ে দিস, ও-বাড়ির সুপুরিগাছে উঠিস।

লজ্জা পেয়ে হাসে মরণ, কী করব, সবাই আমাকে ডাকে যে।

এখন থেকে ওসব কাজ করার জন্য পয়সা নিবি।

মরণ অবাক হয়ে বলে, পয়সা?

কেন নয়? বলবি সুপুরি পাড়তে পাঁচ টাকা, নারকোল দশ।।

এ মাঃ, তাহলে আমাকে ডাকবে কেন? কুমোরপাড়ার ছেলেরাই তো আছে। ওরা পয়সা পেলে পেড়ে দেয়।

তোকে পয়সা চাইতে বলেছি অন্য কারণে, চাইলে আর ডাকবে না।

কিন্তু আমার যে খুব ভাল লাগে।

তোর মা জানে যে তুই অত উঁচু উঁচু গাছে উঠিস?

"তোর মা" কথাটা খট করে কানে লাগল মরণের। মৃদুস্বরে বলল, একটু একটু জানে। আগে বকত, আজকাল কিছু বলে না।

বাবা জানে?

উরে বাবা।

বাবাকে ভয় খাস খুব?

খুব।

সুমন বলল, গাছে ওঠা খুব সেফ ব্যাপার নয়।

আমি খুব ভাল গাছ বাইতে পারি। বেলগাছের মগডালে উঠে যাই, কিছু হয় না।

লেখাপড়া করতে ইচ্ছে করে না?

পড়ি তো।

সুমন হাসল, কেমন পড়িস তা জানি।

মরণ লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইল।

লেখাপড়া করাটা শক্ত কিছু নয়। তোর তো মাথা আছে।

মাস্টারমশাইরা বলে আমার মাথায় গোবর।

গোবর ভাবলে গোবরই হয়।

আমার খুব কলকাতার ইস্কুলে পড়তে ইচ্ছে করে।

কলকাতা! সেখানে গিয়ে কি থাকতে পারবি? কলকাতায় তো গাছ-টাছ নেই।

মরণ লজ্জার হাসি হাসে।

কলকাতায় যাওয়ার শখ হল কেন?

বাঃ, কলকাতায় বড়মা আছে, দিদি আছে। আমার খুব দেখতে ইচ্ছে যায়।

কথাটা বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল সুমন। তারপর বলল, তারা কারা?

বাঃ, বড়মা আর দিদি আছে না সেখানে।

বুঝতে একটু সময় লাগল সুমনের। মুখটা মলিন হয়ে গেল তার। ধীর গলায় বলল, আমাদের বাড়ির কথা বলছিস!

হ্যাঁ তো।

খুব নিস্পৃহ গলায় সুমন শুধু বলল, ও।

একটু দমে গেল মরণ। কই, দাদা খুশি হল না তো! বলল না তো, বেশ তো, যাবি আমাদের বাড়ি!

মরণ ভয়ে ভয়ে বলল, কলকাতার স্কুলও তো কত ভাল।

সুমন একটু চুপ করে থেকে বলে, নিজে যদি পড়িস তাহলে স্কুল নিয়ে ভাবতে হবে না।

বাঙাল না থাকলে সকালবেলাটায় এবাড়িতে মোটা জলখাবারটা জোটে না। তবে চা-বিস্কুটটা দেয় বাসন্তী। ধীরেনের খাঁই বেশি নয়, জোটে ভাল, না জুটলেও ক্ষতি নেই।

আজও সকালবেলাটায় এসে পড়েছে ধীরেন। অন্য সব বাড়িও আছে, কিন্তু সব বাড়িতে সবসময় জুত হয় না। এই তো সেদিন মহিমদার বাড়িতে গিয়ে ভারী বিপদ হল, সকালবেলায় সেখানে তুমুল কাণ্ড। ওপরতলা থেকে অমলের বিলেতফেরত বউ চেঁচিয়ে সন্ধ্যাকে গালমন্দ করছিল আর সন্ধ্যাও সপাটে চোপা করছিল। দূর থেকে কাণ্ড দেখে সটকে পড়েছিল ধীরেন। এসব তার বাড়িতেও নিত্যি হচ্ছে। আকথা কুকথা শুনে শুনে কানেও সয়ে গেছে সব। তবে অশান্তির বাড়িতে গেলে দু-দণ্ড বসার উপায় থাকে না!

সেদিক দিয়ে বাঙালবাড়ি ভাল। এবাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি হয় না। আসলে জনও তো নেই তেমন। তবে দু বউ একত্র হলে সে একটা কাণ্ডই হবে বোধহয়।

বারান্দায় বসে গলাখাঁকারি দিয়ে নিজেকে একটু জানান দিল ধীরেন।

কেউ কোনও সাড়া দিল না। দুটো কাজের মেয়ে উঠোন ঝাঁটপাট দিচ্ছে। ভারী ব্যস্ত। তা ধীরেনেরও তাড়া নেই। কাজই বা কী তার? বসে বসে সে উঠোনের রোদ, পেয়ারাগাছের শালিখ, বাঁশের ডগায় কাক, বারান্দার নীচে কুণ্ডলী পাকানো নেড়ি কুকুর—এইসব দেখছিল।

রান্নাঘরের দিক থেকে একটা ঝনঝনে গলার আওয়াজ এল হঠাৎ, ওই যে এয়েছে বাঙালের ধর্মবাপ। এবার যা গিয়ে পিণ্ডি গিলিয়ে আয়।

গলাটা খুব চেনা ধীরেনের। বাসন্তীর মা। গণেশ দাস যখন বিয়ে করতে আতাপুর গিয়েছিল তখন বরযাত্রীদের দলে ধীরেনও ছিল। ঘটাপটার বিয়ে নয়, নমো নমো বিয়ে, মাছটা খাইয়েছিল খুব। সব মনে আছে ধীরেনের। আঠেরো টুকরো মাছ খেয়ে যা একখানা ঢেঁকুর তুলেছিল তার গন্ধ যেন আজও নাকে ভেসে আসে। গণেশদার বউ কিন্তু গাঁয়ের মেয়ে আন্দাজে ভারী লক্ষ্মীমন্ত সুন্দর ছিল দেখতে। হাত পায়ের গড়ন পেটন, মুখের ছাঁচ সবই ভারী ভাল। বলতে নেই, বউ দেখে ধীরেনের এমন কথাও মনে হয়েছিল, আহা, আমার যদি এমন একখানা বউ হত!

সেই তারই গলা। গণেশদা পটল তুলেছে সেই কবে, দুটো ছেলে আর এই মেয়ে বাসন্তীকে নিয়ে বিধবা হল মনোরমা। ক্রমে ক্রমে মানুষ যে কী থেকে কী হয়ে যায় তা দেখলে ভারী ভয় হয় ধীরেনের।

মনোরমা তাকে শুনিয়েই বলল, ভাগাড়ের শকুন সব এসে জোটেও বাপু। গুচ্ছের গিলবে, ছোঁক ছোঁক করবে, মাথায় হাত বুলিয়ে তোতাই পাতাই করে টাকাপয়সা ঝাঁকবে, হাড়ে হাড়ে চিনি বাপু।

আহা, চুপ করো না মা, শুনবে যে।

শোনানোর জন্যই তো বলছি। সক্কালবেলাটায় কাকে গু খাওয়ার আগেই মড়া কেন মরতে আসে ভেবে দেখেছিস? কোন পিরিতের মানুষ রে! আবার জামাই-আদর করে চা-বিস্কুট সাজিয়ে দেওয়া! চা- পাতা, চিনি, দুধ— এসবের দাম জানে না!

পায়ে পড়ি মা, চুপ করো, ওরকম বলতে নেই।

দুদিন চারদিন আসে না হয় কিছু বলতুম না। তা বলে রোজ সকালে এসে থানা গেড়ে বসে কোন আক্কেলে?

ধীরেন কাষ্ঠ বুঝল, শব্দভেদী বাণ তার উদ্দেশ্যেই ছোড়া হচ্ছে।

ধীরেন উঠে পড়ল।

মরণের বাবা শুনলে ভারী দুঃখ পাবে।

তা পায় পাক বাছা, তা বলে স্পষ্ট কথা বলতে আমি ছাড়ব না, তোর বাপ বেঁচে থাকতে কম জ্বালিয়েছে আমাকে? গিয়ে দাঁত বের করে হাত কচলে ধানাইপানাই কথা। তারপর এটা দাও, সেটা দাও।

কথাটা মিথ্যে, গণেশদার অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ধীরেনও বিশেষ যেত-টেত না। কিন্তু প্রতিবাদ করে হবেটাই বা কী? লোকে যা ভাবে তাই বলে। যা ঘটে তা তো বলে না সবসময়।

রান্নাঘরের দরজায় এসে দাড়িয়েছে বাসন্তী।

ধীরেনখুড়ো কোথায় যাচ্ছেন? বসুন না।

ইয়ে, আজ বড্ড রোদ উঠে গেছে মা। আজ বরং যাই।

চা হচ্ছে তো। বসুন।

ঘরের ভিতর থেকে ঝনঝনে গলাটা বলে উঠল, যেতে চাইছে দে না যেতে। তোর আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি না।

ধীরেন একটু দাড়িয়ে থেকে ফের বসে পড়ল। গাঁয়ে তার বসবার জায়গা কমে আসছে। লক্ষণটা ভাল নয়, কথাগুলো গায়ে মাখলে তার চলবে না।

পঁয়ত্রিশ

গাড়িটা ঠিক করে দিয়েছে কমল। সে সব সুলুকসন্ধান জানে। সুবিধেজনক গাড়ি নয়। বহু পুরনো অ্যাম্বাসাডর ল্যান্ডমাস্টার। সিটে বসলেই বোঝা যায়, ফোম রবার চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে গেছে, স্প্রিং ঠেলে উঠছে ওপরে। নানারকম ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তো আছেই। মফস্বলের ভাড়ার গাড়ি এরকমই হয়ে থাকে।

সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে কমল, ধারে বুড়ঢ়া। পিছনে একধারে সোহাগ, মাঝখানে মোনা, বাঁ ধারে অমল। সবাই চুপচাপ। শুধু কমলই যা কথা বলছে। সে বোকাসোকা সরল মানুষ, কথা একটু বেশিই বলে ফেলে।

বুঝলি বুড়ঢা, এ-গাড়িতে চোদ্দজন লোক উঠতে আমিই দেখেছি। কী মদন, চোদ্দজন করে নিস না?

মদন একটু খোটকামুখো অল্পবয়সি ছেলে। তেমন হাসে না, কথাও কয় না। দুবার জিজ্ঞেস করার পর বলল, না নিলে পাবলিক ছাড়বে কেন?

কমল বলল, শুনলি তো! এ-গাড়িতে চোদ্দজন, ভাবা যায়?

বুড়ঢা বলল, পুলিশে ধরে না?

হাটবার বা মেলা-টেলার দিন কোথায় পুলিশ, কোথায় কে? এখানে ওসব আইনকানুনের বালাই নেই। পুলিশ ধরতে এলে পাবলিকই ঠেঙিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে। কী বলিস মদন?

মদন জবাব দেয় না।

বুড়ঢা বলল, ওঃ হাঁটুতে যা গরম লাগছে না!

কমল বলে, লাগবেই তো! ইঞ্জিন থেকে ভাপ আসছে না? পুরনো গাড়ি হলে যা হয়। আজকের গাড়ি নাকি? যখন নিশিবাবু কিনেছিল তখন থেকে জানি। হেসেখেলে পঁচিশ বছর হবে। দিব্যি সাদা রং ছিল গাড়িটার। তখন শুনতুম মরিস গাড়ির পার্টস দিয়ে তৈরি। তাই হবে বোধহয়। দিশি মাল হলে এতদিন চলত না। কী বলিস রে মদন! তুই তো গাড়ির একজন এক্সপার্ট!

মদন জবাব দেয় না।

কমল ওরকমই, ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। সকলকেই খাতির মহব্বৎ করে বেড়ায়। আর সেই জন্যই কেউ পাত্তা দেয় না তাকে। তবে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না কমল। ভাল মানুষদের যে বাজারদর কম সেটা বুঝবার মতো মস্তিষ্ক তার নেই।

খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা চোয়াড়ে চেহারার ছোকরা ড্রাইভারটাকে মোটেই ভাল লাগছিল না অমলের। দাদার ওপরেও বিরক্ত হচ্ছিল সে। কী কাজ গায়ে পড়ে আলাপ জমানোর? ট্রিপ দিয়ে পয়সা নেবে—এর চেয়ে বেশি সম্পর্ক তো আর নয়।

কমল বেশ বড়াই করে বলল, তোর পচা গাড়িতে যাচ্ছে বলে এদের হেঁজি-পেঁজি লোক ভাবিস না। আমার ভাই মস্ত চাকরি করে। বুঝলি?

মদন বুঝল কিনা কে জানে, তবে উচ্চবাচ্য করল না। দাদাকে একটা ধমক দেওয়ার ইচ্ছে অতি কষ্টে সংবরণ করল অমল।

কমল বলে যাচ্ছিল, ওদের নিজেদেরই তো কত দামি গাড়ি আছে। এস্টিম না কী যেন রে বুডঢা?

এস্টিম।

এস্টিম, বুঝলি? এয়ারকন্ডিশন গাড়ি, গাঁয়ে আমাদের রাস্তাঘাট খারাপ, শরৎকাল পেরিয়েও জলকাদা জমে থাকে, তাই গাড়ি আনে না। নইলে কি আর তোর গাড়িতে চড়ে?

এবার মদন বোধহয় একটু প্রভাবিত হল। বলল, এস্টিম ভাল গাড়ি। দুর্গাবাবুর আছে, চালিয়েছি।

পঞ্চায়েত এবার রাস্তাঘাট সারাবে শুনছি, তখন আনবে, দেখিস।

কমলের কথাটা মিথ্যে নয়। বড় রাস্তা ছেড়ে গাঁয়ের পথে পড়লেই খানাখন্দ, জল কাদা। মোনা তাই কিছুতেই গাড়ি নিয়ে গ্রামে আসতে রাজি হয়নি। বলেছে, ও বাবা! ও রাস্তায় গাড়ির বারোটা বেজে যাবে।

গাড়ি নিয়ে এলে ঝামেলা অনেক কম হত। দুর্গাপুর রোড ধরলে কলকাতা থেকে বর্ধমান ঘণ্টা দুয়েকের পথ।

তারা কেউ কথা কইছে না। শুধু কমল একা কথা বলে যাচ্ছে। এবার মদনের কাছে সে ভাইয়ের বিলেতে থাকার কথা ফেঁদে বসল। অমলের ভারী লজ্জা করে, রাগও হয়। না শোনার জন্য সে চোখ বুজে একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। আজকাল তার যখন-তখন ঘুম এসে যায়। একটু চেষ্টা করলেই এসে যায়। এটা সম্ভবত শুভ লক্ষণ নয়। মস্তিষ্কবিহীন মানুষদেরই চটপট যখন-তখন ঘুম আসে। কলকাতায় রাস্তায় ঘাটে, পার্কে, রকে দিনের বেলায় সে এরকম সব নিষ্কর্মা, নির্বোধ বহু লোককে ঘুমোতে দেখেছে।

আজও অমলের ঘুম চলে এল।

চটকাটা ভাঙল বর্ধমানে গাড়ি ঢোকার পর। হাজারো রিকশা আর গাড়ির হর্ন, ধুলো, গরম, চেঁচামেচি। গ্রামের চেয়ে শহরে গরম বেশ কয়েক ডিগ্রি বেশি। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে এসে ঢুকলেই সেটা টের পাওয়া যায়। কলকাতায় গরমটা আরও একটু বাড়বে।

দু-তিনটে জ্যাম পেরিয়ে স্টেশন চত্বরে যখন পৌঁছল তারা তখন ডাউন শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস আসতে মিনিট কুড়ি বাকি। কমল ছুটল টিকিট কাটতে। বলে গেল, মালপত্র আমি এসে নামাচ্ছি। তোরা দাঁড়া।

অমল নেমে ড্রাইভারকে দিয়ে লাগেজ বুটটা খোলাল। বিশাল বড় দুটো ফাইবারের স্যুটকেস ছাড়াও রয়েছে গোটা তিনেক ব্যাগ। মাল বড় কম নয়।

মোনা বলল, উনি তো বলেই গেলেন উনি এসে মাল নামাবেন, তুমি টানাটানি করছ কেন?

অমলের একটু রাগ হল। সামান্যই। মোনার দিকে চেয়ে রুক্ষ গলায় বলে, উনি কিন্তু কুলি নন, আমার দাদা। কথাটা মনে রেখো।

আহা, খারাপ কিছু বললাম নাকি? উনি হয়তো একটা ব্যবস্থা করার কথা ভেবে রেখেছেন।

অমল খুব শক্তিশালী লোক নয়। বড় সুটকেস দুটো নামাতে তাকে রীতিমতো কসরত করতে হচ্ছিল।

মদন তাকে 'আপনি সরুন, আমি দেখছি' বলে এক ঝটকায় স্যুটকেস দুটো নামিয়ে দু হাতে নিয়ে বলল, চলুন, প্ল্যাটফর্মে দিয়ে আসছি।'

এই লোকটা তার চেয়ে বলবান, একথা ভেবে অমল হঠাৎ একটু ঈর্ষা বোধ করল। তার মস্তিষ্ক প্রখর, সোনার মেডেল-টেডেল পেয়েছে, তবু কত লোকের কাছে কতভাবে সে একজন হেরো।

টিকিটঘরের সামনে সুটকেস দুটো নামিয়ে মদন ভাড়া নিয়ে চলে গেল। স্টেশনটায় গিজগিজ করছে ভিড়। ট্রেনে জায়গা পাওয়া নিয়ে সমস্যা হতে পারে।

অমল একটা স্বগতোক্তির মতো বলল, একটা কুলি নিলে হয়।

বুড়ঢা কাঁধ ঝাকিয়ে বলে, কুলি! কুলির কী দরকার? আমি একাই পারব।

অমল মৃদু হতাশার গলায় বলে, পারবি না। ওভারব্রিজ পার হতে হবে।

জানি। ঠিক পারব।

কমল টিকিট কেটে এনে বলল, সেকেন্ড ক্লাসই কাটলাম, বুঝলি?

অমল বিরক্ত হয়ে বলে, কেন, সেকেন্ড ক্লাস কাটলে কেন? তোমাকে যে বললাম, এ সি চেয়ারকার কাটতে।

মুশকিল কী জানিস, এ সি মোটে একটা কামরা। সিট না পেলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। আর সেকেন্ড ক্লাস হলে অনেক সুবিধে। করিডোর ট্রেন, একটা কামরায় সিট না পেলে আর একটায় চলে যেতে পারবি।

কিন্তু ভিড় থাকলে মালপত্র নিয়ে ওঠা প্রবলেম হবে না?

কোনও অসুবিধে নেই। এ সি-তেও উঠতে পারিস। টিকিট কনভার্ট করে নিলেই হবে।

এ-দেশে এই যে যাতায়াতজনিত নানা অসুবিধে এসব অমলের ঠিক ধাতে সয় না। লড়াকু লোকেরা এসব ঝঞ্ঝাট হাসিমুখে সয়ে বয়ে নিতে পারে। কিন্তু সে লড়াকু লোক নয়। সামান্য সমস্যাই তার কাছে বিরাট হয়ে দাড়ায়। টেনশন বাড়তে থাকে।

এখানে ট্রেনটা কতক্ষণ দাঁড়ায় বলতে পারো?

দু মিনিট।

মাত্র?

দু মিনিট কি কম সময়?

আবার একটা টেনশন তৈরি হল অমলের। মাত্র দু মিনিটে কি তারা চারজন, দুটো বড় স্যুটকেস, ব্যাগ-ট্যাগ সমেত ভিড়ের ট্রেনে উঠতে পারবে? ধাক্কাধাক্কি হবে না?

স্যুটকেস দুটো কমল আর বুড়ঢা ভাগাভাগি করে নিল।

কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম?

কমল মাথা নেড়ে বলে, এখনও অ্যানাউন্স করেনি। এখন ওভারব্রিজে উঠে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তিন বা চার নম্বরে দেয়। দুটোই আলাদা প্ল্যাটফর্ম তো!

ঈর্ষাকাতর চোখে অমল দেখল, কমল আর বুড়ঢা ভারী সুটকেস দুটো নিয়ে দিব্যি ওভারব্রিজে উঠে যাচ্ছে। না, সে পারবে না। তার গায়ে অত জোর নেই।

ওভারব্রিজের ওপরে এসে মাঝামাঝি জায়গায় তাদের দাঁড় করিয়ে কমল বলল, এখানেই দাঁড়াও সবাই।

অমল দেখল ওভারব্রিজের ওপর বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে আছে, কোন প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দেবে সেই অপেক্ষায়।

ডিসগাস্টিং! কোন প্ল্যাটফর্ম সেটা পর্যন্ত আগে জানানো যায় না! এটা কি একটা সিস্টেম? দেশটা যে কী ভাবে চলে কে জানে!

বিড়বিড় করে বললেও অমলের কথা কমলের কানে গেল। সে ভাইকে খুশি করার জন্য বলল, ঠিকই তো! এদেশের কি আর সাধে অত অবনতি! তবে তুই ভাবিস না, ঠিক তুলে দেব। লোকাল ট্রেনে গেলে একটু সময় লাগে বটে, কিন্তু কোনও টেনশন থাকে না। দিব্বি হেসে খেলে হাত-পা ছড়িয়ে যাওয়া যায়।

অমল ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, তোমাদের লোকাল ট্রেনকেও জানি। হকারের চেঁচানিতে মাথা ধরে যায়। তার ওপর চারদিকে নোংরা, ভিখিরির উৎপাত। তিনজনের সিটে ঠেলে চারজন বসবে, বিড়ি ফুঁকবে, বারবার টাইম জিজ্ঞেস করবে।

কমল দেঁতো হাসি হেসে বলে, হ্যাঁ, খুবই বিচ্ছিরি।

মাইকে কী একটা ঘোষণা হচ্ছিল, গমগমে শব্দের দরুন তার এক বর্ণ বুঝতে পারল না অমল। কিন্তু কমল সোল্লাসে বলে উঠল, চার নম্বরে দিয়েছে! চল, চল, ট্রেন ঢুকল বলে।

ফের টেনশন শুরু হয় অমলের। মালপত্র ওঠানো, নিজেরা ওঠা, জায়গা পাওয়া ইত্যাদি কত যে অনিশ্চয়তা তার ঠিক নেই। এ সময়ে খানিকটা হুইস্কি খেয়ে নিলে হত। কিন্তু সেটা বোধহয় শোভন হবে না।

দুদ্দার করে সিঁড়ি ভেঙে লোক নামছে। তার মানে এরা বেশির ভাগই ওই ট্রেনেই উঠবে। তার মানে ফের টেনশন। এত সব বলবান, তৎপর, উদ্যোগী, রগচটা, ঠেলেঠেলিতে ওস্তাদ মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে তারা পেরে উঠবে কি?

লোকের ভিড়ে পিছিয়ে পড়ছিল অমল। সবার আগে স্যুটকেস নিয়ে কমল, তার পিছনে আর একটা স্যুটকেস সহ বুডঢা, একটু পিছিয়ে সোহাগ আর মোনা, সবার শেষে অমল। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে নেমে দুরন্ত লোকজনের ভিতরে কাউকেই দেখতে পেল না অমল। আগের দিকে গেল না পিছনে তাও জানে না সে। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে তোকজনের দিশাহীন ধাক্কায় টাল খেয়ে চোখ থেকে চশমাজোড়াই, খসে পড়ছিল তার। অতি কষ্টে সামলে নিল।

প্ল্যাটফর্মে নামতে না-নামতেই সে দূরে গাড়ির মুখ দেখতে পেল। ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে।

তার ডান কাঁধে একটা চামড়ার বড়সড় ব্যাগ, বাঁ হাতে অ্যাটাচি কেস। কোন দিকে যাবে তা বুঝতে না পেরে অমল কিছুক্ষণ হতভম্ব মাথায় দাঁড়িয়ে থাকল। ছেলেবেলায় একবার রথের মেলায় বাবার হাত ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল অমল। কী কান্না তার। অবিকল সেরকমই একটা অনুভূতি হচ্ছে এখন। সে কি হারিয়ে গেল!

সামনে চলন্ত দেয়ালের মতো ট্রেনটা ঢুকে পড়ছে। চাকার গম্ভীর শব্দে যেন বিপদের পূর্বাভাস। লোকজন জান কবুল করে হামলে পড়ছে দরজায় দরজায়। নামা-ওঠার মর্মান্তিক ঠেলাঠেলি। এই বিপুল উদ্যম তার নেই।।

মাত্র দু মিনিট সময়। ট্রেন ছেড়ে দেবে। এত অল্প সময়ের মধ্যে ওদের খুঁজে বের করা অসম্ভব। তাহলে কি ট্রেনটা ছেড়ে দেবে সে? নাকি উঠবে পড়বে? সিদ্ধান্ত নেওয়া যে কী কঠিন। আচমকা মনে পড়ল, দাদা টিকিট

কেটেছিল বটে কিন্তু সেটা তার হাতে দেয়নি। সম্ভবত মোনাকে দিয়েছে। কিন্তু মোনাকে যদি খুঁজে না পায় সে এবং যদি ট্রেনে উঠে পড়ে তাহলে নিশ্চয়ই টিকিট চেকার তাকে ধরবে।

কী যে করবে অমল তা বুঝতে পারছিল না। এর চেয়ে বিদেশে থাকাই তার ভাল। তার মতো বৌদ্ধিক লোকদের পক্ষে এ-দেশ মোটেই উপযুক্ত নয়। আমেরিকার ইস্ট কোস্ট থেকে রুট এইট্টি ধরে সাড়ে তিন হাজার মাইল গাড়ি চালিয়ে যেতে তার কোনও অসুবিধেই হয়নি। আর এখানে বর্ধমান থেকে কলকাতা যাওয়া যেন মঙ্গলগ্রহ যাওয়ার মতোই কঠিন হয়ে উঠেছে তার কাছে।

লোকে তো যাচ্ছে। তবে সে পেরে উঠছেনা কেন? বর্ধমান থেকে কলকাতা কত লোক তো ডেইলি প্যাসেঞ্জারিও করে। ব্যাপারটা তাদের কাছে জলভাত।

সামনের কম্পার্টমেন্টের কাছে একটু এগিয়ে গিয়ে ভিতরটা দেখল অমল। সাংঘাতিক চাপ ভিড় নয়, তবে বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বসার জায়গা নেই।

পিছিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল অমল।

হঠাৎ পিছন থেকে কে এসে তার ডান কনুইটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, আয়, আয়, জায়গা পাওয়া গেছে।

দাদা কমলকে দেখে নিশ্চিন্ত হল অমল। দাদাকে কখনও জীবনে পাত্তা দেয়নি সে। পালে পার্বণে প্রণামও করে না। কথা হয় কালেভদ্রে। কিন্তু এখন মনে হল, দাদা যেন পারের কাণ্ডারী।

জায়গা পাওয়া গেছে?

হ্যাঁ রে হ্যাঁ, পিছন দিকটায় ফাঁকা থাকে।

কত দূর? গাড়ি ছেড়ে দেবে না তো!

আরে না। এখনও এক মিনিট বাকি।

বাস্তবিকই একটা কামরা ছেড়ে পরের কামরাতেই ভিড় বেশ পাতলা।

উঠে পড়।

অমল উঠে পড়ল। পাশাপাশি না হলেও কাছাকাছিই তিনটে সিটে মোনা, সোহাগ আর বুড়ঢা বসার জায়গা পেয়েছে। বুড়ঢার পাশের সিটটা ব্যাগ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে তার জন্য। সিটের পাশে দাঁড় করানো স্যুটকেস।

বাবা, বোসো। কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে?

একটু লজ্জা পেয়ে অমল বলল, হারাইনি। আসলে এত ভিড়!

আমি তো ভাবলাম, তুমি পড়েই রইলে বর্ধমানে।

কমল সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে বলল, মালপত্র সব গুনে নিয়েছিস তো বুড়ঢা?

হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।

নামবার সময় কিছু ফেলে নামিস না!

না তুমি নামো জেঠু, গাড়ি ছেড়ে দেবে।

আমি ঠিক নেমে যাব। ভাবিস না।

গাড়ি নড়ে ওঠার পর কমল দরজার দিকে গেল এবং চলন্ত গাড়ি থেকে টুক করে নেমে পড়ল।

জেঠু তোমার চেয়ে কত বছরের বড় বলো তো বাবা?

একটু অবাক হয়ে অমল বলে, চার বছরের। কেন বল তো!

জেঠু এখনও তোমার চেয়ে অনেক ফিট আছে। তুমি একটু ম্যান্তামারা হয়ে গেছ কিন্তু।

এতগুলো বাংলা কথা একসঙ্গে বুড়ঢার মুখে কখনও শোনেনি অমল। বিশেষ করে ম্যান্তামারা-র মতো শব্দ। সম্ভবত বেশ কয়েকদিন গ্রামে বসবাসের ফলে ওদের ভোকাবুলারিতে গ্রামীণ বাংলার সঞ্চার ঘটেছে। আজকাল সোহাগকেও বেশ বাংলা বলতে শোনো অমল। তার মধ্যে গেঁয়ো শব্দও থাকে। ভাতের পাতে উচ্ছে সেদ্ধ দেওয়ায় রাগ করে একদিন বলেছিল, উচ্ছের নিকুচি করেছে।

মোনা বলে এখানে থেকে ওর কালচার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এরপর গেঁয়ো মেয়েদের মতো ঝগড়া করতে শিখবে।

একটু দেরি করে বুড়ঢার কথার জবাব দিল অমল। হ্যাঁ, আমি যেন এখন কেমন হয়ে গেছি। সামথিং ইজ রং।

পাছে আশেপাশের লোক শুনতে পায় সেইজন্য বুড়ঢা খুব চাপা গলায় বলে, নাথিং ইজ রং। তোমার একটু ফিটনেস প্রবলেম আছে, আর কিছু নয়। আমাদের যোগ ক্লাসে ভর্তি হয়ে যাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বলছিস?

হ্যাঁ। যোগে মিরাকল হচ্ছে আজকাল।

অমল গভীর অবসাদ বোধ করছিল। সে তেমন কিছু পরিশ্রম করেনি, দৌড়ঝাঁপ করতে হয়নি, মাল টানেনি, সুতরাং এ অবসাদ শরীরের নয় নিশ্চয়ই। এই অবসাদের উৎস রয়েছে তার মনের মধ্যে। কোথায় কোন অতলগহীন মনোরাজ্যে এই অবসাদের শিকড় তা কে বলবে? যোগ ক্লাস কি তার মনকে সারাতে পারবে? না, এসব নিদানকে সে আজ আর বিশ্বাস করতে পারে না।

বাইরে বেলা তিনটের রোদে ক্ষেত-খামারের চিত্র ফুটে উঠছে। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে তা বলার নয়। উদাস চোখে চেয়েছিল অমল। আজকাল তার মনে হয়, এত লেখাপড়া না শিখলেই হত। দরকার ছিল না যান্ত্রিক জগতে ঢুকে পড়ারপ্রয়োজন ছিল না মোটা মাইনের চাকরি বা সুন্দরী স্ত্রী বা কলকাতার ফ্ল্যাট বা স্ট্যাটাস সিম্বলসমূহের। অনেক সহজ জীবনযাপন করতে পারত সে।।

সোহাগ আড়াআড়ি ওপাশের সারিতে বসে একটা মেয়ের সঙ্গে গল্প করছিল। এটাও নতুন ব্যাপার পথেঘাটে যার তার সঙ্গে ভাব জমানোর অভ্যাস ওর নেই। এবং দিব্যি বাংলাতেই কথা বলে যাচ্ছিল। একটু একটু কানে আসছিল অমলের। ধীরে ধীরে পুরোপুরি বাঙালি হয়ে যাচ্ছে নাকি ওরা? ভাবতে ভাবতে চোখে তন্দ্রা জড়িয়ে এল অমলের। এ সেই মস্তিষ্কহীনের ঘুম। নির্বোধের ঘুম। অনুভূতিহীন মানুষের ঘুম। এই ঘুমটাকে খুব ভয় পায় অমল। আবার ঘুমোয়ও। ভারতের অর্থমন্ত্রীর নামটা তার আজও মনে পড়েনি।

সোহাগ ডাকল, বাবা!

চটকা ভেঙে যায় অমলের।

তার ঘুম মানেই স্বপ্ন। সে দেখছিল একটা কাক তিরবেগে উড়তে উড়তে একটা ইলেকট্রিক তার ভেদ করে চলে যেতে গিয়ে দু আধখানা হয়ে গেল। দুভাগ হওয়া কাকটা তারপর দুটো কাক হয়ে উড়ে যেতে লাগল। তারপরেই দেখল টিকিট নেই বলে টিকিট চেকার তাকে একটা অন্ধকার নির্জন স্টেশনে ট্রেন থেকে ঠেলে

নামিয়ে দিয়ে বলল, এটাই শেষ ট্রেন। এবার অন্ধকারে বসে থাকুন, আর কোনওদিন কোনও ট্রেন এখানে আসবে না।

দুঃস্বপ্নই। চটকা ভেঙে যেন বাঁচল অমল। বলল, কী বলছিস?

চা খাবে? লেবু চা?

চা! বলে কিছুক্ষণ শব্দটার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করল সে।

আমরা সবাই খাচ্ছি। বেশ ভাল চা।

প্লাস্টিকের কাপে এক কাপ চা এগিয়ে আসে। প্রচণ্ড গরম লাগছিল আঙুলে। একটু হলেই পড়ে যেত। বুডঢা তার রুমালটা এগিয়ে দিয়ে বলে, এটা দিয়ে ধরো। তোমার অভ্যাস নেই, প্লাস্টিকের কাপের কানায় ধরতে হয়।

মুগ্ধ হয়ে শুনল অমল। কতটা বাংলা বলে গেল বুডঢা।

সোহাগ বলে, ঝালমুড়ি খাবে?

ঝালমুড়ি!

খাও না!

একটু অবাক হচ্ছে অমল। তার ছেলেমেয়েরা আজকাল তো এত সহজ নয় তার কাছে। কলকাতার ফ্ল্যাটে তাদের মধ্যে বাক্যবিনিময়ই হয় না বড় একটা। মাঝে মাঝে মায়ে মেয়েতে তুমুল ঝগড়া হয়, ধুন্ধুমার লেগে যায় স্বামী-স্ত্রীতে। যখন কথা হয় না তখন ফ্ল্যাটে শ্মশানের শান্তি বিরাজ করে।

ঝালমুড়ির ঠোঙা এগিয়ে আসে। ক্ষুধার্তের মতোই খায় অমল। এটাও একটা খারাপ লক্ষণ। তার আজকাল বিচ্ছিরি খিদে পায় এবং হামলে খায়। ফলে তার শরীরে চর্বি জমছে, ওজন বাড়ছে।

বাঁ পাশের লোকটা একটা বাংলা খবরের কাগজ পড়ছে। খবরের কাগজ জিনিসটাকে ভুলেই গিয়েছিল অমল। একটু উঁকি মেরে দেখতে ইচ্ছে করছিল তার, ভারতের শিল্পমন্ত্রীর নামটা চোখে পড়ে কিনা। তারপর ভাবল, কী লাভ জেনে?

টিকিট কার কাছে রে?

বুডঢা বলল, ট্রেনের টিকিট! আমার কাছে। কেন?

না, ভাবছিলাম দাদা তাড়াহুড়োয় আবার দিতে ভুলে যায়নি তো!

না না। জেঠু খুব হুঁশিয়ার লোক। টিকিট কেটে ফেরত পয়সা গুনে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

শিডিউলের চেয়ে আধঘণ্টা দেরিতে হাওড়া স্টেশনে যখন ট্রেন ঢুকছে তখন অমলের ফের টেনশন হতে থাকে। দুটো ভারী স্যুটকেস যা টানতে পারার মতো শক্তি তার নেই, একা বুডঢা পারবে কি?

প্রসঙ্গ উঠতেই বুডঢা বলল, ইজি। দু হাতে দুটো ঝুলিয়ে তো নেওয়াই যায়। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন যে দুটো স্যুটকেসেই চাকা লাগানো আছে।

তাই তো! একদম খেয়াল ছিল না অমলের। এসব সহজ ব্যাপার তার মাথায় থাকে না কেন কে জানে!

বুডঢাই বলল, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। ভিড় একটু পাতলা হলেই আমরা নামব।

ঠিক কথা। তবু অমলের ভিতরটায় একটা উচাটন ভাব। যেন সে পিছিয়ে পড়ছে, হেরে যাচ্ছে, পৌঁছতে পারবে না, অনিশ্চয়তা। কেন এরকম হয় আজকাল কে জানে।

বেশি দেরি করলে ট্যাক্সি পাব না।

বুড়ো অবাক হয়ে বলে, হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সির অভাব! কী যে বলো!

এর পরের ঘটনাগুলো তার কাছে পারম্পর্যহীন হিজিবিজি। তারা ভিড় ঠেলে এসে ট্যাক্সির লাইনে দাঁড়াল। হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে গাড়ি ঢুকল কলকাতায়। তারপর কেয়াতলা লেনের ফ্ল্যাটে একসময়ে পৌছে গেল তারা। কিন্তু এই গোটা ব্যাপারটা তার কাছে কেমন যেন স্বপ্নদৃশ্যের মতো। রিয়াল নয়। পরাবাস্তব?

বাড়ির কাজের লোক বাসুদেবের ওপর ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল তারা। না দিয়ে গেলে উপায়ও নেই। বাসুদেব বাড়িতে ছিল না। কোথাও বেরিয়েছে। মোনা এই ফাঁকে দামি জিনিসপত্রগুলো ঠিক আছে কিনা দেখে নিচ্ছিল। টি ভি, কম্পিউটার, ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি জিনিস ছাড়া গয়নাগাটি বা টাকাপয়সা বাড়িতে রেখে যায়নি তারা। কিছু বাসনপত্র তো থাকেই।

ঘরে ঢুকেই কম্পিউটার নিয়ে বসে গেছে সোহাগ। ই-মেইল চেক করছে একমনে। বুড়ো বাথরুমে।

ব্যালকনিতে এসে দাড়াল অমল। সামনে কেয়াতলার নির্জন পথ। বিকেলের আলো পড়ে আসছে দ্রুত। কিছুই দেখার নেই নীচে। ওপরে আবহমানকালের স্থির আকাশ। কয়েক কুচি মেঘ ভেসে আছে।

আজ কী বার তা হঠাৎ জানতে ইচ্ছে করল অমলের। কী বার আজ। হাতঘড়িটার দিকে তাকালেই জানা যাবে। কিন্তু ইচ্ছে করেই তাকাল না সে।

শুক্র? শনি? এমন কী রবি? না, মনে পড়ছে না। সোমবার নয় তো আজ? হতেও পারে। আজ যে কোনও বার হতে পারে।

পিছনে হঠাৎ মোনার গলা পাওয়া গেল। তীব্র, জরুরি গলা, শোনো!

ধীরে মুখ ফেরায় অমল, কী বলছ?

ঘরে এসো, কথা আছে।

অমল এগিয়ে গিয়ে বলে, কী?

বা হাতের মুঠো খুলে একটা জিনিস দেখিয়ে মোনা জিজ্ঞেস করে, এটা কী?

অমল কিছুক্ষণ জিনিসটা চিনতে পারে না। তারপর চিনতে পেরে বলে, কন্ডোম। কেন?

এটা আমাদের বিছানায় এল কী করে?

অমল অবাক হয়ে বলে, তা কী করে বলব!

তুমি জাননা না?

অমল মাথা নেড়ে বলে, না।

চাপা হিংস্র গলায় মোনা বলে, আউট উইথ দি ট্রুথ!

ছত্রিশ

কিছু বুঝতে না পেরে মোনার মুখের দিকে চেয়ে থেকে অমল বলল, বিছানায় কন্ডোম কী করে এল তা আমি কী করে জানব?

মোনা ফুঁসছিল, চাপা হিংস্র গলায় বলল, তুমি ছাড়া কে জানবে? হোয়েন উই ওয়্যার অ্যাওয়ে, তখন তুমি এই ফ্ল্যাটে একা ছিলে। জবাব তো তোমারই দেওয়ার কথা।

অমল অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, আমি জানি না।

এত নীচে তুমি নামতে পারলে? তোমার যদি মেয়েমানুষের দরকার ছিল তাহলে তুমি তো তাদের কাছেই যেতে পারতে! আমার বেডরুমে, আমাদের বিছানায় বাইরের মেয়ে নিয়ে আসতে তোমার ঘেন্না হল না?

অমলের ঘোলা মাথায় যেন জল ঢুকে আছে। বোধবুদ্ধি কাজ করছে না। সে শুধু অবাক হয়ে বলতে পারল, আমি! আমি! তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ মোনা?

সেটা কি অন্যায়? সবাই জানে তুমি লম্পট, কিন্তু তা বলে বেডরুমের স্যাংটিটিটাও বজায় রাখবে না এটা কীরকম?

লম্পট কথাটা তার মাথার মধ্যে দুম দুম করে দেয়ালে দেয়ালে হাতুড়ি মারছে। চরিত্র নিয়ে তার তো বড়াই করার কিছুই নেই। এই আক্রমণের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবেই বা কী করে সে? অমল তাই গুটিয়ে যেতে লাগল নিজের মধ্যে। মানুষ পুরোপুরি গুটিপোকা হতে পারে না কখনও। দুর্গ নেই, প্রাকার নেই, পরিখা নেই তার। অনায়াসে আক্রান্ত আর পর্যুদস্ত হওয়া ছাড়া তার কীই বা করার আছে! অমল তবু মাথা নেড়ে মৃদু স্বরে বলে, আমি কিছু করিনি মোনা। আমি কিছুই করিনি...

তা হলে কে ঢুকেছিল বেডরুমে? আর কারও তো অ্যাকসেস নেই। বেডরুমে চাবি দেওয়া থাকত। চাবি ছিল শুধু তোমার কাছে। এই জিনিসটা কি তাহলে উড়ে এল বিছানায়?

বেডরুমের খবর আমার জানা নেই। আমি ও-ঘরে একদিনও ঢুকিনি। চাবিটা খুঁজে পেতাম না। বাইরের ঘরে ডিভানটায় পড়ে থাকতাম।

অ্যান্ড দ্যাটস এ লাই। তোমার চোখ বলছে তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

তার জীবনের স্থির ও নির্দিষ্ট মহিলাটির চোখে চোখ রাখতে পারছিল না অমল। আজকাল তার এই একটা রোগ হয়েছে, কারও চোখের দিকেই স্পষ্ট তাকাতে পারে না। অস্বস্তি হয়, ভয়-ভয় করে। চোখ নামিয়ে নিয়ে সে মৃদুস্বরে বলল, তোমার সন্দেহ হলে তুমি বাসুদেবকে জিজ্ঞেস করতে পার।

বাসুদেব বাড়ির চাকর। টাকা দিলেই তাকে ম্যানেজ করা যায় বা একবেলা ছুটি দেওয়া যায়। বুঝেছ? তা ছাড়া ওকে জিজ্ঞেস করাটা বিলো মাই ডিগনিটি।

যুক্তিটা অকাট্য। বাড়ির চাকরকে বাবুর চরিত্র নিয়ে জেরা করা যায় না।

অমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চরিত্র জিনিসটার কোনও মূল্য আছে বলে তার কখনও মনে হয়নি। আজকাল কেউ বড় একটা মূল্য দেয়ও না। তবে লুকোছাপা যখন আছে তখন ধরে নিতে হবে চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন এখনও লোপাট হয়ে যায়নি।

ও-ঘরে সোহাগ কম্পিউটার নিয়ে বসে তার ই-মেল চেক করছে। কম্পিউটারে বসলে তার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। দরজাটাও ভেজানো। তবু হয়তো একটা দুটো কথা কানে চলে গেছে। তার চেয়েও ভয়াবহ হল, ঘটনাটা মোনা হয়তো ছেলেমেয়ের কাছে বলেই দেবে। আজকাল তার প্রতিশোধস্পৃহা বেড়েছে।

একটু বাথরুমে যাওয়া দরকার। এক কাপ চা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল। দু-একটা টেলিফোন করলে ভাল হয়। অমল এসব মৃদু প্রয়োজনগুলিকে আমল না দিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে অনির্দিষ্টভাবে যেন পঞ্চভূতকে বলল, আমি একটু বেরোচ্ছি।

চাপা গলায় মোনা বলল, হ্যা যাও। আর ওসব ব্যাপার বাইরেই মিটিয়ে এসো।

একটু দাড়িয়ে অমল ফের এগোতে যাচ্ছিল।

মোনা মৃদু স্বরে বলল, মিথ্যেবাদী কোথাকার! বেডরুমে ঢোকেনি। তাহলে জামাপ্যান্ট কোথায় পেলে? ওয়ার্ডরোব তো আমাদের বেডরুমে।

অমল দরজার কাছ থেকে ফিরে বলল, তুমি ভুলে যাচ্ছ, বুড়ঢার ওয়ার্ডরোবেও আমার কয়েকটা জামাপ্যান্ট রাখা আছে।

তুমি বেডরুমে ঢুকতে না কেন?

চাবিটা কোথায় রাখতাম মনে পড়ত না। মাঝেমধ্যে এমনিতেই তো আমি ডিভানে শুই। আফটার এ ফিট ড্রিংকস।

তুমি মিথ্যেবাদী। ইউ আর লায়িং।

শোওয়ার ঘরে কন্ডোম, এ রহস্যকাহিনীর ভিলেন বানিয়ে এখন তাকে আরও কয়েকদিন ছিবড়ে করে ছাড়বে মোনা। তার কিছুই করার নেই। নানা প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত সময়ে শব্দভেদী বাণে বিদ্ধ হতে হবে তাকে। আজকাল তার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, মান অপমানের বোধও কমে গেছে অনেক। তবু মোনা যখন তাকে আক্রমণ করে তখন তার বুকের মধ্যে দমাস দমাস শব্দ হয়। মনে হয়, দুম করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।

কান মাথা দুটোই এখন ঝাঁ ঝাঁ করছে। গরম আর অস্থির লাগছে ভীষণ। বুকের মধ্যে সেই অদ্ভুত শব্দ। মাথা নিচু করে সে হলঘরে বেরিয়ে এল।

বাইরের হলঘরটা খুব বড়। ইংরেজি এল অক্ষরের মতো। খাঁজের অংশটায় কম্পিউটারের সামনে ঝুঁকে বসে আছে সোহাগ। মগ্ন। এ সময়ে ওর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। ইন্টারনেট এক সাংঘাতিক নেশা। হেরোইনের চেয়ে কম মারাত্মক নয়। ওরা ভাইবোন রাতের পর রাত জেগে সার্ফিং আর চ্যাট করে। টেলিফোনের বিল বেড়ে যায়।

অমল নিঃশব্দে গাড়ির চাবিটা নিয়ে বেরোতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সোহাগ মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমরা কি এতক্ষণ ঝগড়া করছিলে?

থতমত খেয়ে অমল বলে, না তো।

বিরক্তির গলায় সোহাগ বলল, ওখান থেকে ফিরে আমার মনটা এখনও ভাল আছে। দয়া করে আমার মনটা আবার চটকে দিয়ো না। তোমরা যত ঝগড়া পাকাবে তত আমার মনটা বিগড়ে যাবে। আজকাল তোমাদের ঝগড়া আমি সহ্য করতে পারি না।

অমল আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো কোনও কথাই খুঁজে পাচ্ছিল না। একবার গলাখাঁকারি দিল। মুখ একবার খুলে ফের বন্ধ করে ফেলল। না, কথা দিয়ে শুধু কথা দিয়ে আজকাল সে কাউকেই কিছু বোঝাতে পারে না। বোঝানোর কিছু নেই তার।

তোমাদের মধ্যে কেন যে এত আকচাআকচি হয় বুঝি না বাবা। বাচ্চাদের মতো ঝগড়া করো কেন? কী হয় তোমাদের? ইগো প্রবলেম?

সোহাগ যদি মোনার কথাগুলো শুনে থাকে তবে ভারী লজ্জার কথা। অমলের ভিতরে একটা হিজিবিজি অনুভূতি পাকিয়ে উঠছে। মাথার ভিতরে অদ্ভুত সব পাগলাটে ভাব আসছে। আজকাল তার সন্দেহ হয়, পাগল হয়ে যাচ্ছে কিনা।

সে আর দাঁড়াল না। বেরিয়ে লিফট ধরে নেমে এল নীচে।

চমৎকার সিলভার গ্রে রঙের দামি গাড়ি তার। গায়ে ধুলোর আস্তরণ পড়ে আছে।

গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে ঝুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে মাথাটা স্বাভাবিক হওয়ার জন্য অপেক্ষা করল সে। মাথার ভিতরে ঘূর্ণিঝড়ে যেন নানা কুটোকাটা, ধুলোবালি, আবর্জনা পাক খাচ্ছে। পূর্বাপর কিছু মনে পড়ছে না তার। কান গরম, মাথা গরম, ঘাড়ে তীব্র ব্যথা। সে কি অজ্ঞান হয়ে যাবে! ভীষণ ঘাম হচ্ছে যে তার!

কোনওরকমে কাঁপা হাতে চাবি ঢুকিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে সে এ-সি মেশিনটা চালু করে দিল। কিন্তু তেলের কাটা নেমে এসেছে প্রায় 'ই'-এর ঘরে। তার মানে তেল ফুরিয়ে এসেছে। অথচ যাওয়ার আগের দিন সন্ধেবেলা সে দশ লিটার তেল নিয়েছিল গাড়িতে। ভ্রূ কুঁচকে সে চেয়ে রইল ড্যাশবোর্ডের দিকে। এ-সি বন্ধ হয়ে যাবে। তেলের কাঁটা নেমে যাচ্ছে।

স্টার্ট বন্ধ করে জানালার কাচটা নামানোর জন্য হাত বাড়িয়েছিল সে। না, থাক। বাইরের শব্দ আসবে। গায়ের সোয়েটারটা ছেড়ে জামার কয়েকটা বোতাম খুলে দিল এবং এটুকু করতেই যেন ভীষণ পরিশ্রম হল তার। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে চোখ বুজে বসে রইল অমল। ঘাম হচ্ছে, বড্ড ঘাম হচ্ছে তার। অল্প অল্প শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ঘাড়ে পিন ফোটার মতো যন্ত্রণা। মাথায় ঘূর্ণিঝড়। বুকে হাতুড়ির ঘা।

মরে যাচ্ছে নাকি? মরে যাওয়ার কথা মনে হতেই সে হাত বাড়িয়ে দরজায় হাতলটা ঘোরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু দরজার হাতলটা অবশ হাতে খুঁজেই পেল না। কাচ নামানোর একটা ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে তার অসহায় ভারী হাতটা ঝুলে পড়ে গেল। এভাবেই মরে যায় মানুষ? এত আচমকা! এত তুচ্ছভাবে? একটা অন্ধকার নেমে এল চোখে, চেতনায়। সব মুছে গেল।

ঘরদোর সারতে সারতে অনেক রাত হয়ে গেল মোনার। বাড়িতে না থাকলে যে কত অগোছালো হয়ে যায় সব কিছু! বিছানার চাদর, বেডকভার, বালিশের ওয়াড় সব বদলাতে হল। কী ঘেন্না!কী ঘেন্না! এই বিছানায় রাতে শুতে হবে ভাবতেও তার বমি আসছিল। বাড়িতে গঙ্গাজল নেই। থাকলে তাও একটু ছিটিয়ে দিত মোনা।

কাজকর্ম শেষ করে যখন ঘড়ি দেখল মোনা তখন রাত সাড়ে দশটা বাজে। কম্পিউটারের সামনে এখনও ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে সোহাগ। বুড়ঢা বেরিয়েছিল, ফিরে এসে তার ঘরে বসে কার সঙ্গে যেন আধঘণ্টা ধরে টেলিফোনে কথা বলে যাচ্ছে। বাসুদেব রান্না শেষ করে ডাইনিং টেবিলে সব সাজিয়ে রাখছে। অমল এখনও ফেরেনি।

ঘড়ির দিকে চেয়ে একটু ভ্রূ কোঁচকাল মোনা। অমল এত রাত অবধি বাইরে থাকেনা। পার্টি বা কাজ থাকলে অন্য কথা। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে নয়। আজ অবশ্য রাগ করে গেছে। রাগ! না, ভুল হল। আজকাল অমল বিশেষ রাগ-টাগ করে না। কেমন নেতিয়ে যায়।

এবার যন্ত্রটা বন্ধ করো সোহাগ। খিদেতেষ্টাও নেই নাকি? বিকেলে তো কিছুই খেলে না।

সোহাগ তার গভীর অন্যমনস্ক মুখটা একবার তার মায়ের দিকে ফিরিয়ে বলল, খাব।

ব্যস! খাব বললেই হবে? হাত মুখ ধোও। আজ আমার একটু বিশ্রাম দরকার। ওঠো।

উঠছি মা। পাঁচ মিনিট।

বুড়ঢার ঘরে পর্দা সরিয়ে উকি দিল মোনা।

আর কতক্ষণ কথা বলবে? খেতে দিয়েছে। এসো।

হাত তুলে মাকে চুপ করতে বলে টেলিফোনে কথা কইতেই থাকে বুড়ঢা।

বাথরুমে ঢোকার আগে ফের ঘড়িটার দিকে তাকাল মোনা। পৌনে এগারোটা। সামান্য ভ্রূ কোঁচকাল সে। পৌনে এগারোটা! অমল ফেরেনি এখনও!

বাথরুমে মোনার একটু সময় লাগে। গিজারের গরম জলে ভাল করে স্নান করল আজ। যখন বেরোল তখন ফের ঘড়ির দিকে চোখ গেল তার। সোয়া এগারোটা।

ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেছে বুড়ঢা আর সোহাগ।

বুড়ঢা বলল, বাবা কোথায় মা?

কী জানি। সন্ধেবেলা তো বেরোল। বুঝতে পারছি না।

এগারোটা তো বেজে গেছে মা।

মোনা একথাটার কোনও জবাব দিল না। সামান্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে তার। এত রাত করার কথা তো নয়!

সোহাগ হঠাৎ বলল, এখনই টেনশন করার দরকার নেই। আরও দশ পনেরো মিনিট দেখা যাক।

বুড়ঢা বলল, তারপরও যদি না ফেরে?

ফিরবে না কেন? নিশ্চয়ই ফিরবে। তোমরা খাও। কথাটা বলল বটে মোনা, কিন্তু গলায় কোনও জোর পেল না।

সোহাগ সামান্য বিরক্ত গলায় বলল, তোমরা কী নিয়ে আজ ঝগড়া করছিলে বলো তো।

মোনা ফুঁসে উঠে বলে, তা দিয়ে তোর কী দরকার?

তোমাদের মধ্যে যে কেন এত ঝগড়া হয় তা বুঝতে পারি না।

তোর বুঝে দরকার নেই। যখন আমার মতো অবস্থায় পড়বি তখন বুঝবি।

শোওয়ার ঘরে এসে মোনা বিছানায় বসে একটু হাঁফ ছাড়ল। উদ্বেগ বাড়ছে। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে এগারোটা পেরিয়ে যাচ্ছে। অমল ফিরছে না।

বাসুদেব এসে দরজায় দাঁড়াল, খাবেন না বউদি?

খাব। তোমার বাবু কোথায় গেলেন বলো তো!

আমি তো সাতটায় ফিরেছি। বাবু তো তার আগেই বেরিয়ে গেছেন।

নীচে গাড়ি আছে?

হ্যাঁ। গাড়ি নেননি তো।

আচ্ছা, ঠিক আছে, একবার দরোয়ানদের জিজ্ঞেস করে এসো তো বাবুকে তারা কোন দিকে যেতে দেখেছে।

ঠিক আছে। বলে চলে যাচ্ছিল বাসুদেব।

মোনা তাকে ডেকে বলল, থাক, ওদের জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। আমার খাবারটা একটু পরে দিও।

আচ্ছা।

রাত বারোটায় বুড়ঢা এসে দরজায় দাঁড়াল।

মা।

ডিমলাইটটা জ্বেলে চোখে হাতচাপা দিয়ে একটু শুয়েছিল মোনা। শরীর পরিশ্রান্ত বলে একটু তন্দ্রার মতোও এসে গিয়েছিল।

চমকে উঠে বলল, এসেছে?

না মা, বাবা এখনও আসেনি। উই মাস্ট ডু সামথিং।

কী করা যায়?

কোথায় যেতে পারে বলে মনে হয় বলো তো! টেলিফোন করে দেখতে পারি।

মোনা একটু চিন্তা করে বলল, সেটা একটা বিশ্রী ব্যাপার হবে না? লোকে কী ভাববে? তোর বাবার

তো কলকাতায় তেমন বন্ধু বা আত্মীয়ও কেউ নেই।

চুপ করে তো বসে থাকা যায় না। হাসপাতাল বা লালবাজারে খোজ নেব?

রাত বারোটা বাজে, না?

হ্যাঁ মা।

মোনা উঠে ড্রয়িংরুমে এসে এ-ঘরের ঘড়িটাও দেখল।

সোহাগ এখনও কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। তবে কম্পিউটার অন্ধকার।

লেক-এর ধারটা দেখে আসব না?

মোনা অন্যমনস্ক চোখে ছেলের দিকে চেয়ে বলে, লেক! এত রাতে কি আর সে লেক-এর ধারে বসে। থাকবে? এই ঠান্ডায়!

কিছু তো করা উচিত। বারোটা বেজে দশ মিনিট।

ভাবছি কোথাও গিয়ে ড্রিংক করে পড়ে আছে কি না।

বুড়ঢা মাথা নেড়ে বলে, বাবা তো বাইরে ড্রিংক করে না কখনও!

আজ রাগ করে গেছে।

রাগ করে কেন?

সামান্য একটু রাগারাগি করেছিলাম।

সোহাগ চুপ করে বসেছিল এতক্ষণ। এবার মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমার গলা আমি এখান থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। ও-ঘরের দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও।

মোনা গম্ভীর হয়ে বলল, রাগ করার যথেষ্ট কারণ ছিল বলেই করেছি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ওরকম হতেই পারে। আমাকে উপদেশ দিয়ো না।

স্বামী-স্ত্রী হলেই বুঝি ঝগড়া হবে। জেঠিমা আর জেঠুর মধ্যে তো হয় না! এতদিন থেকে এলাম সেখানে একদিনও তো তাদের ঝগড়া শুনিনি।

ওদের সঙ্গে আমার তুলনা করছ? তোমার লজ্জা করে না?

কেন, লজ্জা কীসের? তুলনা করলে কি তোমার প্রেস্টিজে লাগে নাকি?

তোমার জেঠুর ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। হি ইজ ডোমিনেটেড বাই হিজ ওয়াইফ। ওদের স্ত্রৈণ বলে।

বাঃ, বেশ কথা তো! ব্যক্তিত্ব থাকা মানেই বুঝি ঝগড়ুটে হওয়া! ব্রাভো!

শোনো সোহাগ, তুমি যদি আর বাড়াবাড়ি করো তাহলে কিন্তু আমি তোমার চুলের মুঠি ধরে গালে চটাস চটাস করে থাপ্পড় মারব। একেই টেনশন হচ্ছে, তার ওপর...

বুডঢা তাড়াতাড়ি এসে মাকে ধরল, হোয়াই সো অ্যাগ্রেসিভ মা? কাম ডাউন!

শুনছিস না কী বলছে!

শুনছি। কিন্তু এটা হেস্টি হওয়ার সময় নয়। ইট ইজ অলরেডি টুয়েন্টি পাস্ট টুয়েলভ। এবার আমাদের কিছু করা উচিত।

কী করবি তোরা ঠিক কর। আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

তুমি বরং একটু ঠান্ডা জল বা কোল্ড ড্রিংস খাও। মাথা ঠান্ডা করো।

শোওয়ার ঘরে যেতে যেতে মোনা চাপা গলায় বলছিল, একটা লম্পট, চরিত্রহীন লুম্পেন আমাকে ভাজাভাজা করে খেল। ডিসগাস্টিং!

সোহাগ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

কোথায় যাচ্ছিস দিদি?

ছাদে।

এত রাতে ছাদে?

মাথা গরম লাগছে।

তুই ছাদে! মা বেডরুমে! আমি একা কী করব বল তো! বাবার যে কী হল।

পারহ্যাপস হি হ্যাজ কমিটেড সুইসাইড। এবাড়িতে এরকমই একটা কিছু হওয়ার কথা।

যাঃ, কী যা তা বলছিস!

লিভিং টুগেদার ইজ অ্যান আর্ট বুডঢা। আর আমরা সেটাই শিখিনি।

রেগে যাচ্ছিস কেন? লেট আস টক অ্যান্ড সর্ট আউট দি থিংস। বাবা কটার সময় বেরিয়েছে?

ঠিক জানি না। ঘড়ি দেখিনি। পাঁচটার পর।

কিছু বলে যায়নি?

না। হি জাস্ট লেফট।

পোশাক?

যেটা পরনে ছিল। পোশাক ছাড়ার আগেই দে হ্যাড দি ফাইট।

খুব ভায়োলেন্ট কিছু?

দে আর অলওয়েজ ভায়োলেন্ট।

কী নিয়ে ঝগড়া শুনেছিস?

সোহাগ একটু ভেবে মাথা নেড়ে বলল, না। বেডরুম কথাটা কানে এসেছিল। দে পিকাপ এভরিথিং অ্যান্ড এনিথিং ফর এ ফাইট।

বুড়ঢার বয়স এখনও যোলো পূর্ণ হয়নি। তার মুখশ্রীতে এখনও নাবালকত্বের ছাপ। চোখ দুটো একটু ছলছল করছে। অসহায়ভাবে বলল, ইট ইজ টুয়েলভ থার্টি অলরেডি। কী করব বল তো!

সোহাগ গোঁজ মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বাবাকে আমার খুব সিক মনে হয়েছিল।

শোওয়ার ঘরের দরজা খুলে হঠাৎ মোনা বেরিয়ে এসে বলল, ডোরবেলের শব্দ শুনলাম না?

বুড়ঢা মাথা নাড়ল, না মা। অন্য কোনও ফ্ল্যাটের আওয়াজ।

ডাইনিং টেবিলেই একটা চেয়ার টেনে ক্লান্ত মোনা বসে পড়ল, ফের বর্ধমানে ফিরে যায়নি তো।

বুড়ঢা বলে, দুর! কী যে বলো! দিদি বলছে বাবাকে সিক দেখাচ্ছিল। আমি ভাবছি রাস্তায় অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল কি না।

কপালটা ডান হাতের দু আঙুলে চেপে ধরে মোনা বলে, আমার মাথা ছিঁড়ে পড়ছে যন্ত্রণায়।

তুমি শুয়ে থাকো না!

তোরা কী করবি?

বাসুদেব টেবিল পরিষ্কার করছিল। বলল, কিছু ভাববেন না বউদি, আমি নীচে নেমে আশেপাশে খোঁজ নিয়ে আসছি।

বুড়ঢা বলল, আমিও যাচ্ছি। চলো। দিদি, তুই যাবি?

হ্যাঁ।

মোনা বলল, বাসুদেব, থাক এখন থাক। তাড়াতাড়ি যাও।

তিনজন বেরিয়ে যাওয়ার পর মোনা বেডরুমে এল। লকার থেকে কন্ডোমের প্যাকেটটা বের করল। খুবই শস্তা, দিশি ব্র্যান্ড। এ-জিনিস নিশ্চয়ই কোনও অভিজাত বা রুচিশীল মানুষ ব্যবহার করবে না।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে সে ভাবতে লাগল।

বিলিয়ার্ড টেবিলে একটা বলের সঙ্গে আর একটা বলের ধাক্কা লাগল। মৃদু টক করে একটা শব্দ। একটা বল গড়িয়ে গিয়ে আরও দুটো বলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল দু ধারে। টক টক। দুটো বল গড়িয়ে গিয়ে ধাক্কা মারল আরও দুটো করে বলে। টক টক টক টক। তারপর বলগুলো ছোটাছুটি করতে লাগল চারধারে। এ ওকে ধাক্কা মারছে। ও তাকে। সে একে। টকাটক শব্দে জ্বালাতন হয়ে গেল অমল। টেবিল জুড়ে বলের বিশৃঙ্খলা আর টক টক শব্দ। পাগল হয়ে যাওয়ার জোগাড়। কান চাপা দিতে হাত তুলেছিল অমল। কিন্তু হাতটা আটকে যাচ্ছে কোথায় যেন তুলতে পারছে না।

কিন্তু হাতটা তুলবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে গিয়েই গভীর আচ্ছন্নতা থেকে চোখ মেলে জেগে উঠল অমল। টের পেল, অসাবধানে সে তার ডান হাতের ওপরেই চেপে বসে আছে।

কোথায় বসে আছে তা বুঝতে একটু সময় লাগল তার। না, সে ঠিক বসেও নেই। একটু কাত হয়ে আছে ডানদিকে। সিটের পাশে তার ঘুমন্ত মাথা গড়িয়ে খাজটায় আটকে রয়েছে। আর তার কানের পাশেই জানালার কাচে শব্দ হচ্ছে টক টক।

খুব ক্ষীণ একটা ডাকও শুনতে পেল সে, বাবা! বাবা!

অমল সোজা হয়ে বসল। গাড়ির ভিতরটা ভ্যাপস, দম বন্ধ করা অবস্থা। সে দরজার লকটা খুলে দিল।

এক ঝটকায় বাইরে থেকে দরজাটা খুলে বুডঢা আর্তস্বরে ডাকল, বাবা! কী হয়েছে তোমার?

কী হয়েছে তা অমলের মনে পড়ল না প্রথমে। কিছুই মনে পড়ল না। বাইরের এক ঝলক ঠান্ডা বাতাসে শ্বাস টানল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, কিছু হয়নি।

কিছু হয়নি?

না তো। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বোধহয়।

বাইরে বুডঢার পিছনে সোহাগ, বাসুদেব, তিন-চারজন দারোয়ানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লজ্জা পেয়ে অমল বলল, কটা বাজে এখন?

বুডঢা বলল, রাত দুটো।

মাই গড!

আর ইউ অলরাইট?

মাথা নেড়ে অমল বলল, হ্যা, আই ফিল ফাইন।

কী করে গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে তুমি?

জানি না। বুঝতে পারছি না। শরীরটা খারাপ লাগছিল খুব। তারপর আর মনে নেই।

নামতে যাচ্ছিল অমল, বুডঢা ডান হাতটা চেপে ধরে বলল, এসো, ধরছি। আর ইউ রিয়েলি ও কে?

না, অমল ও কে নয়। তার হাত পা ঠিক বশে নেই। দুর্বল লাগছে। মাথা ঘুরছে। তবু সে নামতে পারল।

আমাকে ধরতে হবে না। পারব।

অমল ধীরে ধীরে হেঁটে লিফটে এসে উঠল। কী হয়েছিল তা সে খুব আবছা মনে করতে পারছিল মাত্র। এখনও মাথায় পারম্পর্য নেই। নট ইন অর্ডার।

ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা। ভিতরে সব কটা আলো জ্বলছে। দরজায় দাঁড়িয়েই সে মুখোমুখি মোনাকে দেখতে পেল। ডাইনিং টেবিলে বসে আছে। ও কি বাঘিনীর মতো ডিনারের জন্য বসে আছে। ওর ডিনার কি সে নিজে? তাকেই খাবে বলে ওত পেতে আছে নাকি?

সাঁইত্রিশ

ডি এন এ, জিন, শুক্রকীট—এসব নিয়ে মাথাটা মাঝে মাঝে বড্ড ভোম্বল হয়ে যায়। কী অশৈলী কাণ্ডকারখানা বাপু! জীবাণুর মতো ছোট এক চিজ, তার মধ্যে প্রাণ। শুধু প্রাণই বা কেন! তার মধ্যে স্বভাব, চরিত্র, মেধা, সব প্রোগ্রাম করা আছে। মাতৃগর্ভের ভ্রূণ থেকে কত বড় মানুষটা হয়ে দাঁড়ায় একদিন।

কোথায় পড়েছিল মহিম যে, অত মানে চলা, অর্থাৎ গতি। ওই অত থেকে আত্মা। যে কেবলই চলে। বাপের বীজ থেকে মাতৃগর্ভ হয়ে তার দুর্বার গতি। বেড়ে চলে, বেড়েই চলে। বংশগতির এই প্রবহমানতার কথা যত ভাবে মহিম তত এই বুড়ো বয়সে নতুন করে অবাক হয়। কত কাল, কত যুগ আগে সৃষ্টি হয়েছিল মানুষ, তখন থেকে তার চলা, অলিম্পিক মশালের মতো প্রাণ চলেছে, প্রাণ থেকে প্রাণ, ফের প্রাণ থেকে প্রাণে।

এই যে সে, মহিম রায়, সে কি একজন আলাদা আলটপকা মানুষ? তা তো নয়। কোন হাজার হাজার বছর আগে ছিল তার পূর্বপুরুষ, হয়তো বর্বর, ন্যাংটো, ভাষাহীন, সভ্যতাহীন। কেউ তার নামও জানে না। নামই ছিল না হয়তো। তার থেকে ধারা বয়ে এত দূর এল! তার পরও চলল কমল হয়ে, অমল হয়ে তাদের ছেলেপুলে হয়ে। বিচার করলে, জগতের সব মানুষেরই টিকি বাঁধা কোনও অজানা অন্ধকার যুগের এক অনামা মানুষ আর অজানা নারীর কাছে। আদম বা ঈভ হতে পারে তারা। বা অন্য কেউ।

মহিম ভাবতে ভাবতে থই পায় না। কী করে যে হচ্ছে ব্যাপারটা! কে চালাচ্ছে এই অদ্ভুত সৃষ্টির লীলা! যত বয়স হচ্ছে ততই যেন সব বেড়ে যাচ্ছে মায়া।

কাল ওরা চলে গেছে। আজ সকালে মহিম টুক টুক করে দোতলায় উঠে মুখোমুখি ঘরটায় তালা খুলে ঢুকল। বড্ড অগোছালো রেখে গেছে ঘরখানা। বেডকভার কুঁচকে আছে, মেঝেময় পড়ে আছে নানা বর্জিত জিনিস। দেয়ালে মাথার টিপ সাঁটা। টেবিলের দেরাজ টেনে দেখল, তাতেও মাথার ক্লিপ, রিবন, সেফটিপিন, ফুরিয়ে যাওয়া লিপস্টিক পড়ে আছে। এখনও ঝাঁটপাট হয়নি ঘরটা। সেন্ট পাউডারের গন্ধ বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মাঝখানের দরজাটা এখনও ছিটকিনি দেওয়া। দেখে একটু অবাক হয় মহিম। পাশের ঘরটায় অমল থাকত। কিন্তু মাঝখানের দরজাটা ছিটকিনি এবং বাটাম দেওয়া কেন? কে কাকে আটকাতে চেয়েছিল? স্বামী-স্ত্রী মধ্যে ছিটকিনি-দেওয়া দরজা থাকার তো কথা নয়। তার ওপর অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য আবার বাটামটাও আটকানো! দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকতেই ক্ষীণ অ্যালকোহলের গন্ধ পেল মহিম।

অমল মদ খায় তা মহিম জানে। যেদিন মধ্যরাতে মহিমের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়েছিল অমল সেদিনও গন্ধ পেয়েছে। মদ-টদ খাবে সে আর বেশি কথা কি? তবে টেবিলের নীচে পিছনের পায়ার কাছে সাত-আটটা মদের খালি বোতল দেখে মহিম ভ্রূ কোঁচকায়। এত মদের বোতল নিয়ে তো অমল কলকাতা থেকে আসেনি!

বিছানায় একটা ক্যালকুলেটর গোছের জিনিস পেয়ে মহিম হাতে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে দেখল। এসব জিনিস মহিম চেনে বটে কিন্তু ব্যবহার জানে না। ঢাকনা খুলে দেখে, ছোট ছোট অনেক বোতাম। শুধু ক্যালকুলেটর ছাড়াও অন্য সব ব্যবহারও আছে নিশ্চয়ই। একবার ইচ্ছে হল বোতামগুলো এক-আধটা টিপে দেখে কী ঘটনাটা ঘটে।

কিন্তু সাহস হল না। কে জানে বাবা আনাড়ির হাতের টেপাটেপিতে খারাপ-টারাপ না হয়ে যায়। কাজের জিনিসটা ফেলে গেছে, হয়তো অসুবিধেয় পড়বে। রতনকে দিয়ে একটা ফোন করিয়ে দিতে পারলে হয়।

রতনকে ডেকে লাভ নেই। এখন সে ঘুমোচ্ছে। আগে গাঁয়ের ছেলেপুলেরাও ভোর-ভোর উঠে পড়ত। আজকাল রাত জেগে সব টি ভি-তে সিনেমা দেখে মাঝরাত অবধি। দু-একদিন মহিমকেও জোর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে হিন্দি, বাংলা সিনেমা দেখানোর চেষ্টা করেছিল। মহিমের বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। সিনেমা-টিনেমা একটা বিশেষ বয়সের পক্ষেই বোধহয় ভাল। বয়স গড়িয়ে গেলে ধৈর্যও কমে যায় কিনা।

নিচু হয়ে টেবিলের তলা থেকে বোতলগুলো টেনে আনল মহিম। সব কটায় একই লেবেল আঁটা। ঢাকনা খুলে একটু গন্ধও শুকল মহিম। গন্ধ কিন্তু বিকটেল নয়, একটু ঝাঁঝালো, এই যা। একটা বোতলে দেখল, একটু তলানি পড়ে আছে এখনও। সন্ধ্যাকে ডেকে বোতলগুলো দিয়ে দিলে হয়। ধুয়ে কাসুন্দি-টাসুন্দি রাখতে পারবে। এমনিতে অ্যালকোহল বিশুদ্ধ জিনিস, তাতে জীবাণু বাঁচে না।

খাটের ওপর বসে মহিম অমলের কথাই ভাবছিল। ছেলেপুলে বড় হলে ঘাটের সঙ্গে মাঝদরিয়ার নৌকোর মতো তফাত হয়ে যায়। তবু সেই হামাটানা অমল, সেই পৈতের দিন ন্যাড়ামাথা অমলের চুলের জন্য কান্না, সাঁতার শিখতে গিয়ে হাবুডুবু অমলের সেই বাপের গলা জড়িয়ে ধরা, সব মনে পড়ে যাচ্ছিল আজ। মায়া কি ছাড়তে চায়! অমলের কথা থেকেই আরও কথা এল মনে। জিন, ডি এন এ, বংশগতি। কী সাংঘাতিক সব ব্যাপার-স্যাপার! যতদিন যাচ্ছে ততই যেন দুনিয়াটা বুঝ-সমঝের বাইরে চলে যাচ্ছে। ততই মনে হচ্ছে, জীবনটাকে ওপরসা ওপরসা দেখে তেমন কিছু বোঝা যায় না বটে, কিন্তু তার পরতে পরতে কত যে রহস্য লুকিয়ে আছে!

মদের খালি বোতলগুলো টেবিলের ওপর সাজাল মহিম। তারপর চেয়ে রইল। সে শুনেছে এক এক বোতল বিলিতি মদের দাম অনেক। এই আট বোতল মদের দাম কত তা ভাবতেও ভয় করে। এত পয়সা খরচ করে এত মদ কেন খায় কে জানে! এত মাথা ছেলেটার, অত ভাল রেজাল্ট করা, তারপর মোটা বেতনের চাকরি, তবু মুখখানায় কোনও সুখের ছাপ নেই। লেখাপড়া শিখে তা হলে কী হয় মানুষের? এত শিখে, এত জেনে মদের বোতলে এসে ঢুকতে হয় কেন?

বিছানায় বসে অনেকক্ষণ ছেলেকে অনুভব করল মহিম। না, ছেলেটা বোধহয় সুখী হল না। কেন হল না তার কারণ খুঁজে বের করা হয়তো মহিমের সাধ্য নয়। তার চিন্তা ক্রমে অমলকে ছেড়ে মোনা, বুডঢা, তারপর সোহাগে এসে থামল। কোনও প্যাটার্ন নেই ওদের মধ্যে। এক এক জন এক এক রকম। কিন্তু প্যাটার্নটা নেই কেন? কোথায় গণ্ডগোলটা হচ্ছে?

জানালা দিয়ে নীচের উঠোনে সন্ধ্যাকে দেখতে পাচ্ছিল মহিম। ভাল করে আলো ফোটার আগেই উঠে পড়ে মেয়েটা। তারপর সারাদিন মোষের মতো খাটে। রূপ নেই, গানের গলা নেই, বিয়ে টিকল না—এইসব অভাব

শরীর খাটিয়ে পুষিয়ে নিতে চায়। ভাল, ভাল, কিছু নিয়ে মেতে থাক। মনের ক্ষতচিহ্নগুলো নিয়ে বেশি নাড়াচাড়ার সময় না পাওয়াই ভাল।

এই সাত-সকালেই দু-চারজন মাল নিতে চলে এসেছে। বেলা হলে আরও আসবে। সন্ধ্যার জিনিসপত্র আজকাল খুব বিক্রি হচ্ছে। একদিক দিয়ে ভগবান বঞ্চিত করেছেন বটে, তাই কি অন্য দিক দিয়ে পুষিয়ে দিচ্ছেন? বছর খানেক আগেই সন্ধ্যা একদিন মহিমকে কথায় কথায় বলে ফেলেছিল, তার নাকি সত্তর হাজার টাকার ওপর জমে গেছে। গ্রামদেশে একটা মেয়ের পক্ষে ঘরে বসে এত টাকা রোজগার বড় কম কথা তো নয়। এখন হয়তো ওর হাতে লাখ টাকার ওপরেই আছে, মাঝে একদিন বলেছিল, পেষাই মেশিন কিনে গুঁড়ো মশলার ব্যবসা শুরু করবে।

এই টাকার লোভেই কিনা কে জানে, একটা ছোকরা ওর সঙ্গে বোধহয় খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

মহিম কানাঘুষো শুনেছে, বিয়েও নাকি করতে চায়। মহিম তাই উদ্বেগ বোধ করে।

এ বিষয়ে সন্ধ্যাকে কিছু জিজ্ঞেস করাটা অনুচিত হবে ভেবে চুপ করেই ছিল মহিম। উদয়াস্ত খাটে মেয়েটা, প্রেম-ট্রেম করার সময়ও তো পায় না। হয়তো রটনাই হবে ভেবে নিয়েছিল মহিম।

সন্ধ্যার ঘর মহিমের ঘর থেকে দু কদম। তবু সন্ধ্যা বাপের সঙ্গে দেখা করার সময় পায় না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখাচোখি হয় হয়তো, কিন্তু কথা বলার ফুরসত কই ওর? এখন কয়েকটা মেয়েকে মজুরি দিয়ে রেখেছে, তাদের কাজকর্ম তদারক করা, আদায়-উশুল, হিসেব-নিকেশ সবই তো একা সামলায়।

দিন কয়েক আগে একটু ফাক পেয়ে সন্ধেবেলা এল মহিমের কাছে।

বাবা, তোমার শরীর নাকি খারাপ?

কে বলল তোকে?

সোহাগ বলছিল, দাদুর জ্বর হয়েছে।

মহিম প্রসন্ন হেসে বলল, সেরকম কিছু নয়। ঠান্ডা লেগে সর্দি মতো হয়েছে একটু। সেরে যাবে।

সোহাগ তোমার কাছে খুব আসে, না?

আসে মাঝে মাঝে। গল্প-টল্প করে।

খুব অদ্ভুত মেয়ে, তাই না? আমার ভারী ভাল লাগে ওকে। আমার যদি ওরকম একটা মেয়ে থাকত বেশ হত।

মহিম চুপ করে থাকে। সন্ধ্যার যে ঘর-সংসার-সন্তান হল না তার জন্য নিজেকেই দায়ি বলে মনে হয় মহিমের। পাত্র পছন্দ করেছিল সে নিজেই। এমনিতে পাত্র কিছু খারাপও মনে হয়নি। কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা-বিচার কত যে ওলট-পালট হয়ে যায়।

কালোজিরে ন্যাকড়ায় বেঁধে ছোট একটা পুঁটুলি করে এনেছিল সন্ধ্যা। আর এক প্যাকেট শুকনো আদাকুচি বাবার হাতে দিয়ে বলল, রাত্রে একটা কাথ তৈরি করে নিয়ে আসব। মা করত, মনে নেই?

মহিম হাসল। সবই মনে আছে। চেয়ার টেনে বাপের বিছানার কাছে বসে সন্ধ্যা বলল, সারাদিন এত ঝামেলা যায় যে তোমার সেবা-টেবা কিছু করতে পারি না। তোমার তো চিরকালের চাপা স্বভাব, মরে গেলেও নিজের অসুবিধের কথা কাউকে বলবে না।

ভাবছিস কেন? অসুবিধে হলে তো বলব! সামান্য সর্দিজ্বর, তা জ্বরটাও এখন নেই।

এ-বাড়িতে তোমার দিকে তাকানোরও কারও সময় নেই দেখছি। মা মরে যাওয়ার পর থেকেই তোমার বড় অযত্ন হচ্ছে।

মহিম একটু হাসল। কথাটা একেবারেই ঠিক নয়। সন্ধ্যার মা কোনওদিনই মহিমকে মূল্য দেয়নি, আমলও দিত না। মহিমের নালিশ ছিল না বটে, কিন্তু অবহেলাটা সে খুব টের পেত। আর সেই অবহেলার মনোভাব মহিমের ছেলেমেয়ের মধ্যেও চারিয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী যদি স্বামীকে সম্মান বা শ্রদ্ধা না করে তা হলে ছেলেপুলেরাও বাবাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে না। মহিমের যত্ন কেউ কখনও করেনি। তার জন্য তার বিশেষ দুঃখও নেই।

তবে সন্ধ্যার কথাটার প্রতিবাদও করল না মহিম। প্রিয় মানুষরা স্মৃতিতে মহান হয়ে যায়। প্রতিবাদ করবেই বা কেন মহিম! করে লাভ কী?

সে মৃদুস্বরে বলল, আমার তো অসুবিধে হচ্ছে না। তোরা সব কাজকর্ম নিয়ে আছিস। যদি অচল হয়ে পড়ি তখন দেখা যাবে।

তবু মায়ের মতো যত্ন কি আর কেউ করতে পারবে?

মহিম হেসে বলল, আমাকে নিয়ে কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়লে বরাবরই আমার অস্বস্তি হয়। মানুষের উৎপাতের কারণ যত না হওয়া যায় ততই ভাল।

না বাবা, তোমার কথা ভেবে মাঝে মাঝে আমার কিন্তু কষ্ট হয়। মুখ ফুটে কিছু বল না বটে, কিন্তু অসুবিধে কি আর না হচ্ছে!

দুর পাগল, অসুবিধে আবার কী? বেশ আছি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ সন্ধ্যা বলল, বাবা, একটা কথা বলব? আমার বাকি জীবনটা কীভাবে কাটবে বলো দেখি!

মহিমের বুকে যেন শক্তিশেল এসে পড়ল। এটা সন্ধ্যার অনুযোগ নয়, নালিশ নয়। বাপের বিরুদ্ধে অভিমান বা রাগও নয়। খুব স্বাভাবিক গলায় নিরাবরণ একটা প্রশ্ন। তাই বোধহয় সেটা রাখঢাক না করেই সোজা এসে পড়ল হাতুড়ির ঘায়ের মতো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহিম বলল, সেটাই তো ভেবে ভেবে সারা হই।

আমিও ভাবি বাবা। টাকা কিছু কম তো রোজগার করি না। ব্যবসা বাড়বে, কাজকর্ম বাড়বে, রোজগারও বাড়বে। কিন্তু শুধু টাকা দিয়ে কী হবে বল তো!

মহিম এ কথার কী জবাব দেবে? টাকার উপযোগিতা এক এক বয়সে হয়তো এক এক রকম। আশি বছর বয়সে মহিমের এখন টাকা জিনিসটার প্রতি কোনও মোহ নেই। হয়তো অভাবি, উপোসি হলে মোহ থাকত। ঠেকায় না পড়লে টাকার চিন্তা এখন কদাচিৎ মাথায় আসে।

সে মৃদু স্বরে বলল, সেটা তো মস্ত প্রশ্ন মা। টাকা দিয়ে সব সমস্যার তো সমাধান হয় না।

হ্যাঁ বাবা, আমার কত বয়স হল বল তো! এখনও কতদিন বাঁচতে হবে! ভাবলে কেমন মাথাটা পাগল পাগল লাগে। কাজকর্মে নিজেকে ডুবিয়ে রাখি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে বুকটা মুচড়ে ওঠে।

মহিম মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারল না। অপরাধী চোখ নেমে এল নীচে।

সন্ধ্যা বলল, সেই মানুষটাকে সামনে পেলে একবার জিজ্ঞেস করতাম, আমার দোষটা কী ছিল। কুচ্ছিত! কত কুচ্ছিত হ্যাক-ছিঃ মেয়েও কেমন দিব্যি সুখে ঘর করছে বল তো! আমি কুচ্ছিত হলেও তাকে ভরিয়ে দিতে পারতাম, কোথাও খুঁত থাকত না একটুও।

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে মহিম বলে, কতবার ভেবেছি একবার ওর কাছে যাব। গিয়ে কী দেখব কে জানে, হয়তো দ্বিতীয় বিয়েটা সুখের হয়নি। হয়তো তোর কথা মনে করে ওর অনুশোচনা হয়।

সন্ধ্যা বোকা হলেও ব্যবসা-ট্যাবসা করে বাস্তব বুদ্ধি হয়েছে খানিকটা। মুখখানা ভার করে বলল, ও কথা আমারও মনে হত বাবা, পৃথিবীতে কত কিছুই তো ঘটে। কিন্তু আমার কপালে ওরকম হবে না বাবা।

মহিম চুপ করে থাকে।

সন্ধ্যা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আজকাল তাই বড্ড একাও লাগে। তাই ভাবছি—

কী ভাবছিস রে মা?

সে তোমাকে আর একদিন বলবখন। আগে ভাল করে ভেবে নিই, তারপর বলব। একদিন তো বলতেই হবে।

সেই একদিনটা আজও আসেনি। না আসাই ভাল। সন্ধ্যা যা-ই বলুক সেটা মহিমের খুব পছন্দসই হওয়ার কথা নয়। যে ছোকরাটি আসে সেও আর পাঁচজনের মতোই সন্ধ্যার তৈরি আচার, কাসুন্দি, আমলকী নিয়ে গাঁয়েগঞ্জে দোকানে দোকানে সাপ্লাই দেয়। পরিশ্রমী, কেজো চেহারা। একদিন সোহাগ মহিমের ঘরে বসেছিল দুপুরবেলা। গল্প করতে করতে জানালা দিয়ে কী দেখে থেমে গেল।

তারপর বলল, দাদু, দেখো।

কী দেখব রে?

দেখো না ওই লোকটাকে।

মহিম দেখল। কালো, বৈশিষ্ট্যহীন চেহারার বছর ত্রিশ বয়সি একটা ছেলে।

ও কে রে দিদিভাই?

ভাল করে দেখেছ?

দেখলাম তো!

পিসিকে ওর সঙ্গে মানাবে?

মহিম চমকে উঠে বলে, তার মানে কী রে?

মুখটা খুব করুণ হয়ে গিয়েছিল সোহাগের। বলল, পিসিটা না ভীষণ লোনলি।

তা তো জানি। কিন্তু মানানোর কথা কী বললি দিদিভাই?

ও কিছু না।

কথাটা ওখানেই থেমে গিয়েছিল।

কয়েকদিন পর সোহাগ আর একদিন মহিমের সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ বলেছিল, পিসির একজন বয়ফ্রেন্ড হলে ভাল হয়, না দাদু?

মহিম অবাক হয়ে বলেছিল, সে কী! বয়ফ্রেন্ড কেন?

সোহাগ বলল, কোনও কোনও মহিলা আছে যারা সিংগল থাকতেই পছন্দ করে। বিয়ে-টিয়ে পছন্দ করে না, করলেও অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারে না। আবার কোনও কোনও মহিলা আছে যাদের কাছে ম্যারেজ ইজ এভরিথিং। বিয়ে না করে থাকার কথা তারা ভাবতেই পারে না। জান? পিসি হল এই সেকেন্ড টাইপের।

সেটা যে মহিম জানে না তা নয়। সন্ধ্যা ছেলেবেলা থেকেই ঘর-গোছানো মেয়ে। কাজেকর্মে পরিপাটি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কখনও আলসেমি বলে তার কিছু দেখেনি মহিম। ওর মাও বলত মুখখানা সুন্দর নয় বটে, কিন্তু যার ঘরে যাবে তার ঘরে লক্ষ্মীশ্রী ফুটে উঠবে।

মহিম বলল, তুই পিসিকে নিয়ে খুব ভাবিস বুঝি?

ভাবব না? শি ইজ এ ডেজার্টেড উওম্যান!

আমিও খুব ভাবি। হ্যাঁ রে দিদিভাই, তোর পিসি কি আবার বিয়ে করার কথা ভাবে?

একটু দ্বিধায় পড়ে সোহাগ বলেছিল, নট একজ্যাক্টলি।

তা হলে?

আমার মনে হয়, পিসি ওয়ান্টস এ ফ্যামিলি অ্যারাউন্ড হার।

এটাও তো একটা পরিবার, তাই না?

না না এরকম নয়। পিসি ওয়ান্টস হার ওন ফ্যামিলি। ক্রিয়েটেড বাই হার।

মহিম চুপ করে গিয়েছিল। সতেরো বছর বয়সি নাতনির সঙ্গে এ বিষয়ে আর অধিক কথা বলাটা শোভন হত না।

কিন্তু হঠাৎ স্বগতোক্তির মতো একটা কথা বলেছিল সোহাগ, জান দাদু, লোকটা কিন্তু পিসিকে দিদি ডাকে।

কে লোকটা?

ওই যে সেই লোকটা।

দিদি ডাকলে ক্ষতি কী? অনেকেই তো ডাকে!

সোহাগ খিলখিল করে হেসে ফেলেছিল। তারপর বলল, তুমি কিছু বোঝো না!

মহিমকে ভাবনার সমুদ্রে ফেলে রেখে উধাও হয়েছিল সোহাগ।

মহিম সেই থেকে ভেবে যাচ্ছে। ভেবেই যাচ্ছে।

বেলা সাতটায় উঠোনে রতনকে দেখতে পেয়ে ডাকল মহিম। রতন ওপরে এলে মহিম বলল, এগুলো তোর পিসিকে দিয়ে আয়। কাসুন্দি-টাসুন্দি রাখতে তো বোতল লাগেই।

রতন হাসল, পিসি ও বোতল নেবে নাকি?

কেন নেবে না?

ও তো মদের বোতল!

মহিম চিন্তিত হয়ে বলে, নেবে না বুঝি? তা হলে থাক।

পিসি নেবে না। আমি তো কালই ওদের মালপত্র নামাতে গিয়ে বোতলগুলো দেখে পিসিকে বলেছিলাম। পিসি যা রেগে গেল!

রেগে গেল কেন?

বলল মদের বোতলে আমি কাসুন্দি বিক্রি করব? ছিঃ ছিঃ! খবরদার ও কথা আর মুখে আনবি না।

আমি ভয়ে আর কিছু বলিনি বাবা! মা বলেছে শিশিবোতলওয়ালা এলে বেচে দেবে। ওরা নাকি মদের বোতলের দাম বেশি দেয়।

মহিম রতনের দিকে চেয়ে থেকে বলল, ওকে এত মদ কে এনে দিত বল তো! তুই?

না, কাকা নিজেই কিনত। তবে আমিই মোটরবাইকে করে কাকাকে বর্ধমান নিয়ে গেছি দুদিন। মদ কিনতে। তুমি মদ নিয়ে এত ভাবছ কেন দাদু? ওসব আজকাল জলভাত, সবাই খায়।

তাই দেখছি।

দুনিয়ায় যে মদ্যপায়ীর সংখ্যা বাড়ছে সে খবর একটু জানে মহিম। যৌবন বয়সে সেও খেয়েছে কখনও-সখনও। তবে শখ করে। কথাটা হল, মদ্যপায়ীর সংখ্যা বাড়ছে কেন?

এমন নয় যে, মদের বিরুদ্ধে মহিমের কোনও জেহাদ আছে। বহু বহু যুগ আগে থেকেই সুরার প্রচলন রয়েছে মানুষের সভ্যতায়। দেবতারাও নাকি খেতেন-টেতেন। তবু যে ক্রমে ব্যাপারটা খুব চারিয়ে যাচ্ছে তার মানে কী, আলাদা একটা পিপাসা তৈরি হয়েছে? নাকি মানুষের নানা ব্যর্থতা আর হতাশা থেকেই বাড়ছে মদের আসক্তি!

প্রশ্নটার সমাধান সহজ নয়।

বেলা দশটায় মহিম গৌরহরির বাড়ির উঠোনের রোদে মোড়া পেতে বসা। সামনে একটা জলচৌকিতে বউঠান।

অনেকদিন পরে এলেন ঠাকুরপো! অমলরা ছিল বলে বোধহয় আসার সময় পাননি।

মহিম মাথা নেড়ে বলে, তা নয় বউঠান। ওরা ওদের মতো ছিল, আমি আমার মতো। আসলে গৌরদাই তো নেই, তাই আসতে একটু কেমন কেমন লাগত! বুকটা ছ্যাঁত করে উঠবে হয়তো, সেই ভয়েই আসতাম না।

বলাকার মুখখানা ভারী করুণ হয়ে গেল।

তবেই বুঝুন তাকে ছাড়া আমি কী করে আছি। আমার বুক তো ছ্যাঁত করে ওঠে না, সব সময়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

এত বড় বাড়িটায় একা কী করে থাকবেন বউঠান? গৌরদা ভাইয়েদের অংশ কিনে নিলেন, আমি তখন বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে, এত বড় বাড়ি তাঁর কোনও কাজে লাগবে না। তা অন্যের কথা শুনে চলবেন তেমন মানুষ তো ছিলেন না।

সে তো সত্যি কথা। বাড়িটা তো সারাদিন আমাকে গিলে খাচ্ছে। তবু পড়ে আছি। আমার তো অন্য গতি নেই।

কলকাতা বা নেহাত বর্ধমান শহর হলেও না হয় প্রোমোটারকে দিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ি বানিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু গ্রামদেশে তো তা হওয়ার জো নেই।।

না ঠাকুরপো, কলকাতা হলেও এ-বাড়ি আমি কক্ষনও প্রোমোটারকে দিতাম না। যার বাড়ি সে এখনও এ-বাড়ির সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। আমি তো সব সময়ে তাকে টের পাই। ওই যেখানে আপনি বসে আছেন ওখানে বসেই এই শীতকালে তেল মাখত। সেই দৃশ্য যে এখনও দেখতে পাই।

আপনি নমস্যা বউঠান। লোকেও বলে, এমন সতীলক্ষ্মী আজকাল আর দেখা যায় না।

বলাকা মিষ্টি করে হেসে বলে, সেসব কিছু বুঝি না, শুধু জানি, সে ছাড়া আমি নেই। সত্যি কথা বলতে কী, এখন আমি নেই-এর দলেই পড়ে গেছি। বেঁচে আছি, আবার নেইও।

এইসব কথা শুনলে কান, মন সব পবিত্র হয়। ভালবাসা নিয়ে আজকাল যত বড় বড় লেকচার দেয় লোকে, কিন্তু ভালবাসা কি সোজা জিনিস! তার পিছনে কত ত্যাগ, ধৈর্য, অধ্যবসায় থাকে, কত সেবা, কত স্বার্থহীনতা। এ যুগে হালকা মনের বেলুন-মানুষেরা তা কী করে বুঝবে! এই বলাকা বউঠানকে সেই কিশোরীবেলা থেকেই তো দেখছে মহিম। এক ফোঁটা একটা রোগাটে গড়নের মেয়ে। মুখখানা তিরতির করত। খুব ফর্সা রং আর মেঘের মতো এক ঢল চুল ছিল। গৌরহরি তখন মধ্যযৌবনের রাঙা এক যুবাপুরুষ। মহিমের চোখের সামনেই সম্পর্কটা গড়ে উঠল। একদিকে একজন নাবালিকা, অন্য দিকে একজন শক্তসমর্থ পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। বয়সের তফাত শুনলে এ যুগের ফচকে ছেলেমেয়েরা আঁতকে উঠবে। হয়তো বলবে বাপের বয়সি। তা কথাটা মিথ্যেও তো নয়। পতি আর পিতা একই ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ। পাতি নেকটা পিতার মতোই। এখনকার দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে অনেক ফিচেলপনা ঢুকে গেছে, আকচা-আকচি ঢুকে গেছে, ইয়ারবন্ধুর মতো হাবভাব, ওতে স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারটাই ফুটে ওঠে না মোটেই। যেন সেক্স পার্টনার। সম্পর্কের দফার ওখানেই গয়াপ্রাপ্তি ঘটে যায়।

নাবালিকা বউকে নিয়ে গৌরহরির ঘর করা স্বচক্ষে দেখেছে মহিম। কী স্নেহ আর নরম কথা দিয়ে বাপের বাড়ির বিরহে কাতর বলাকাকে ভুলিয়ে রাখতেন গৌরহরি। বাড়ির লোকের চোখের আড়ালে গোপনে তাকে পড়াতেন, গল্প বলতেন। একবার বাড়ির সবাই তীর্থভ্রমণে গেল, তখন বলাকার হল টাইফয়েড। অন্য কেউ হলে ঝামেলা এড়াতে বউকে ঠিক বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিত বা শাশুড়ি-শ্বশুরকে ডেকে আনত। গৌরহরি তা করেননি। গু-মুত পরিষ্কার করা থেকে পথ্য পর্যন্ত সবকিছু সামলেছেন। একটুও বিরক্ত নেই, ঘিনপিত নেই।

একদিন মহিম বলেই ফেলল, গৌরদা এ যে দেখি বানরে সংগীত গায়, পিংলা জলে ভাসি যায়, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়। জীবনে আপনি কখনও এক গ্লাস জল অবধি গড়িয়ে খেয়েছেন বলে তো শুনিনি। তা এত সব শিখলেন কোত্থেকে?

গৌরহরি একটু লজ্জা পেলেন বটে, কিন্তু নরম গলায় বললেন, মেয়েটার আমি ছাড়া কে আছে বল। আমার মুখ চেয়েই তো সব আপনজনকে ছেড়ে এসে আছে। ওর যদি এখন মনে হয় যে, মা বাবা কাছে নেই বলে ওর যত্ন হল না, তা হলে সেটা তো খুব লজ্জার ব্যাপার হবে। তাই ওকে বুঝতেই দিইনা।

একটু সময় লেগেছিল বলাকার মানুষটাকে বুঝতে। যখন বুঝল তখন তার মনোজগৎ জুড়ে গৌরহরি ভাস্বর হলেন। সেই মুগ্ধতা আজও বলাকার চোখে-মুখে ছড়িয়ে আছে। মারা গিয়েও গৌরদা যে কী ভীষণভাবে বেঁচে আছেন তা মহিম রায়ের মতো আর কে জানে! অথচ পরবর্তীকালে খামখেয়ালি গৌরহরি অন্যায্য অত্যাচারও তো কিছু কম করেননি। যখন তখন এটা সেটার ফরমাশ, বায়না, হঠাৎ অতিথি নিয়ে এসে চড়াও হওয়া। কোনওদিন এতটুকু কথা কাটাকাটি অবধি হয়নি দুজনের।

এইসব শিক্ষা নিতেই তো মহিম আসে এবাড়িতে। দেখতে আসে গৌরহরি নিজের আয়ুষ্কাল পেরিয়ে কত দূর পর্যন্ত নিজের ছায়াকে প্রলম্বিত করে রেখেছেন। এইভাবেই মানুষ বাঁচে।

দেবিকাকে যখন বিয়ে করে আনে মহিম তখন মহিমের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। দেবিকার কুড়ি-একুশ। পয়সাওলা ঘরের মেয়ে। মেলা দানসামগ্রী, নগদ পেয়েছিল মহিম। ওই অত সব পেয়েই বোধহয় একটু অধমর্ণ

ভাব ছিল তার।

না, সম্পর্ক তাদের ভালই ছিল। ভাব ভালবাসার কিন্তু খামতি ছিল না। যেটার অভাব ক্রমশ প্রকট হল তা হল শ্রদ্ধা। আর ওই শ্রদ্ধার অভাব ঘটলে বোধহয় ভালবাসাটাও নিবু নিবু হয়ে আসে। ক্রমে ক্রমে, খুব ধীরে ধীরে সংসারের একজন গুরুত্বহীন সদস্যে পরিণত হচ্ছিল মহিম। তার মতামতের দাম নেই, তার পরামর্শ কেউ চায় না, তার অনুমতিরও প্রয়োজন হয় না কারও।

শীতের রোদে সাদা থান পরা দেবীমূর্তির মতো বসে আছে বলাকা। দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। তবে যৌবন বয়সে মহিমের মনোভাব মাঝে মাঝে পঙ্কিল পথে ধাবিত হত না যে তা নয়।

মনে আছে বলাকা যখন ষোলো বা সতেরো বছরেরটি হল তখন তার রূপ যেন পেখম মেলে দিল। সেই সৌন্দর্যের যেন লেখাজোখা নেই। ওই আশ্চর্য রূপ দেখতে পিপাসার্তের মতো, দুখানি কাঙাল চোখ নিয়ে রোজ ছুটে আসত মহিম। এ-বাড়িতে তার বরাবরই অবারিত দ্বার। কারও কিছু মনে করার ছিল না। বউঠানের সঙ্গে খুনসুটিরও বাধা ছিল না কোনও।

মনের কথা কে টের পাবে! মনে এক নরকখানায় নিত্য কত পাপের জন্ম হয়, কত পঙ্কিলতা বাসা বেঁধে থাকে সেইখানে। মানুষের ভাগ্য ভাল যে তারা অন্তর্যামী নয়। হলে মানুষের দুঃখ শতগুণে বাড়ত।

কিন্তু মেয়েরা ঠিক টের পায়। কিছু না-কিছু তারা বুঝতেই পারে পুরুষের চোখ দেখে। ও-ব্যাপারে তাদের মেয়েলি মনে ঠিক সংকেত বেজে ওঠে।

বলাকাও কি টের পেয়েছিল?

একদিন, দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে বাগানে আম কুড়োচ্ছিল বলাকা।

মহিম হাজির হয়ে বলল, কী হচ্ছে বউঠান?

আম কুড়োতে নিচু হয়েছিল বলাকা, হঠাৎ যখন সোজা হয়ে দাড়াল, তখন তার ফর্সা কপালে কুচো চুল ঘামে আটকে আছে, মুখখানায় যেন নেমে এসেছে স্বর্গের আলো। মহিমের স্বীকার করতে বাধা নেই, ওই একটি মুহূর্তে সে এমন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল সে যা খুশি করে ফেলতে পারত। হঠাৎ যেন বাঁধ ভাঙার জন্য তার ভিতরে প্রলয়ংকর বন্যার জল ফুঁসে উঠেছিল।

কিছু কি টের পেয়েছিল বলাকা? নির্জন আমবাগানে তখন জনপ্রাণী নেই। খর গ্রীষ্মের বিকেলে রৌদ্র-ছায়ার তীব্র নাচানাচি। পাখি ডাকছিল, হাওয়া দিচ্ছিল। বলাকা হঠাৎ তার দিকে চেয়ে হঠাৎ দু পা পিছিয়ে গেল কেন যে!

কম্পিত গলায় মহিম বলল, বউঠান!

বলাকা হঠাৎ পিছু ফিরে লঘু পায়ে দৌড়ে বাগান পেরিয়ে উঠোনে গিয়ে উঠল।

বোকার মতো দাড়িয়ে রইল মহিম। বড্ড গ্লানি হল। ভাগ্যিস সে কিছু করে বসেনি!

দুদিন পর এক সন্ধেবেলা গৌরহরির বৈঠকখানায় যখন বসে আছে মহিম, তখন বলাকা তাকে চা দিতে এসে হঠাৎ মুখ টিপে একটু হেসে বলেছিল, ঠাকুরপো, এবার আপনি একটা বিয়ে করে ফেলুন।

বলাকার কি সেই আমবাগানের কথা মনে আছে? সেই দুপুর গড়িয়ে বিকেলের তীব্র স্মৃতি!

হয়তো আছে। হয়তো নেই। আয়ুর মোহনায় পৌঁছে গেছে মহিম। সেই জল এত দূর গড়িয়ে আসবে না।

আটত্রিশ

সে কেন দেখা দিল রে, না দেখা ছিল যে ভাল। অন্তত আবছায়া দেখাটুকু না হয় থাকত তার!

মায়ের কখনও প্রেশার ছিল না। অন্তত টের পাওয়া যায়নি এতদিন। আশ্বিনের শেষে যখন বেশ শীত শীত ভাব পড়ছিল তখনই হঠাৎ শিলাবৃষ্টি হয়ে একদিন বেশ হু হু হাওয়া দিল। তখন শীতের ঠকঠকানি উঠে গেল। তার বীর বাবা রামহরি পর্যন্ত মোটা খদ্দরের হলুদ রঙের চাদরটা বের করে গায়ে জড়িয়ে ফেলল সকালবেলা। তাকে চা দিতে এসেছিল মা। রামহরি স্ত্রীর দিকে চেয়ে যা কখনও করে না তাই করে ফেলল হঠাৎ। বলল, তোমার কপালে ঘাম দেখছি যেন! ঘেমেছ নাকি?

মেয়েদের শরীর-টরীরের খোজখবর নেওয়া পুরুষদের রেওয়াজ নয়। যেন মেয়েমানুষের শরীর খারাপ হতে নেই। আর হলেও সেসবের খোঁজখবর নেওয়া পুরুষের পক্ষে আত্মাবমাননাকর। রামহরিও কদাচিৎ তার স্ত্রীর শরীরের খবর নিয়েছে।

আর মহিলাও সেরকমই। শরীর খারাপকে কোনওদিনই খারাপ বলে মানে না, কাউকে বলে না ও কিছু কখনও। স্বামীর প্রশ্ন শুনে ভারী অবাক হয়ে বলল, ওমা! ঘামব না। যা গরম!

রামহরিও অবাক হয়ে বলে, গরম! সত্যি বলছ?

গরম না তো কী! আমার তো বাপু হাঁসফাঁস লাগছে।

রামহরি চিন্তিতভাবে বলে, তাহলে কি আমারই শরীর খারাপ হল নাকি! আমার যে বেশ শীত করছে! জ্বর-টর আসছে নাকি? দেখো তো গাটা।

মাধুবী স্বামীর কপালে হাত দিয়ে বলল, না! গা তো ঠান্ডা!

তাহলে! তোমার গরম লাগছে, কিন্তু আমার শীত করছে কেন?

শীত! শীত কোথায়! তা বাপু, রাতে ভাল ঘুম হয় না বলে বোধহয় আমার মাথাটা একটু গরম হয়েছে।

রামহরি হা করে চেয়েছিল! মাধুরীর ঘুম হয় না এ একটা আশ্চর্য কথা বটে। বরাবর মাধুরীর ঘুম ছিল বিখ্যাত। বেশি রাতে তাদের বিয়ের লগ্ন ছিল। আর কেউ টের না পাক, পাশেই বরের পিঁড়িতে বসা বামহরি বউয়ের হাতে হাত রেখে যখন অং বং মন্ত্র পড়ে যাচ্ছিল তখন সে পরিষ্কার টের পেয়েছিল বউ ঘুমে তার গায়ে ঢলে পড়ছে। কী লজ্জা! সবাই জানে বালিশে মাথাটা রাখলেই মাধুরী নেই। সেই মাধরীর ঘুম হচ্ছে না শুনে রামহরি তো রামহরি, গোয়ালের গোরুটা পর্যন্ত জাবর ভুলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে।

সংসারের পাচটা কাজ এসে কথা ভণ্ডুল করে দেয়। তাই স্বামী-স্ত্রীর কথা ওই পর্যন্তই হয়ে রইল।

পরদিনই দুপুরে রান্নাঘরে গ্যাস উনুনের বদলে কয়লার আঁচে ময়লা জামাকাপড় সেদ্ধ বসিয়েছিল মাধুরী। গোলা সাবানের কুচি জলে দিয়ে, জামাকাপড় খুন্তি দিয়ে উলটে-পালটে দিতে গিয়ে এমন শরীর অস্থির করল

যে, উঠে এসে পান্নাকে কোনওক্রমে 'একটু যা তো মা, জামাকাপড়গুলো একটু দেখ, শরীরটা কেমন করছে যেন' বলেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। বড় বড় শ্বাস ফেলছে, হাঁফ ধরা ভাব।

পান্নার সঙ্গে এমনিতে মাধুরীর একটু আড়াআড়ি আছে। পান্নার ধারণা, মা সবচেয়ে বেশি দাদাকে আর তার পরেই হীরাকে ভালবাসে। সে হল মায়ের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ের মতো। অসুখ-বিসুখ হলে একটু-আধটু আদিখ্যেতা করে বটে, অন্য সময়ে নয়। মাধুরীর মুখে জীবনে কখনও শরীর খারাপের কথা শোনেনি পান্না। ওই এক ধরনের মহিলা যারা মরে গেলেও নিজের শরীরের কথা কয় না। তাই পান্না গিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের মুখের ওপর, কী হয়েছে মা! কেমন লাগছে?

কিছু নয় তেমন! বোধহয় পেটে একটু বায়ু হয়েছে। সেদ্ধটা গিয়ে দেখ মা।

মাধুরীর মুখটা টকটক করছে লাল। সারা গা ঘামে ভিজে জবজব করছে।

চুলোয় যাক সেদ্ধ, পান্না ছুটে গিয়ে তার বাবাকে দুপুরের ভাত-ঘুম থেকে টেনে তুলে আনল।

রামহরি যথেষ্ট ভ্যাবাচ্যাকা। সত্যি বটে, স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিষয়ে ভাবনার অবকাশ তার হয় না। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটা গত হলে এই গড়ানে বয়সে যে তার অঙ্গহানির মতো একটা কিছু ঘটনা ঘটবে এটা বুঝতে তার লহমাও লাগল না।

কী হয়েছে? অ্যাঁ! কী হয়েছে! বলতে বলতে কী করতে হবে বুঝতে না পেরে রামহরি তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে হিমঠান্ডা জল গেলাসে গড়িয়ে এনে মাধুরীর চোখে-মুখে ঝাপটা দিতে লাগল।

মাধুরী চমকে উঠে বলল, উঃ, কী করছ কী! আমি কি মুর্ছো গেছি নাকি? কিছু হয়নি আমার। একটু চোখ বুজে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে। অবেলায় খেয়েছি তো, তাই বোধহয় কেমন করছে।

অবেলায় তো তুমি রোজই খাও।

মাধুরী আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বলল, ওরে বাবা, আর তোমাকে আমার সেবা করতে হবে না গো। একটু জিরোতে দাও দয়া করে, তাহলেই হবে।

রামহরিরও তাই মনে হল। রোদে-জলে, কাজে-কর্মে পোক্ত শরীর, মরার বয়সও কিছু হয়নি। তার একাত্তর চলছে, মাধুরীর মেরেকেটে বাষট্টি। তত ভয়ের কিছু নেই।

একটু নার্ভাস হেসে শিয়রের কাছে বসা পান্নার দিকে চেয়ে বলল, পেটে গ্যাস হয়েছে, বুঝলি!

আজকাল মানুষের একটা গ্যাস-বাতিক হয়েছে খুব। ভাল-মন্দ কিছু হলেই বলে পেটে গ্যাস। এই গ্যাসের থিয়োরিটা পান্নার ভাল লাগে না মোটেই। সে বলল, বাবা, তুমি বরং ডাক্তারকে খবর দাও।

ডাক্তার! বলে রামহরি যেন আকাশ-পাতাল ভাবল খানিক। তারপর বলল, আজ অনল বাগচীর আসার দিন। তবে সন্ধের আগে তো নয়। কুঞ্জ ফার্মেসিতে একজন ডাক্তার বসেন বটে, তবে সবাই বলে হাতুড়ে।

মাধুরী বলল, ডাক্তার লাগবে না। আমার কিছু হয়নি। পান্না একটু হাতপাখা দিয়ে মাথায় বাতাস করুক, তাহলেই হবে। বড্ড হাঁসফাঁস লাগছে। চোখে মাঝে মাঝে অন্ধকার দেখছি যেন। জামাকাপড় সেদ্ধ বসিয়ে এসেছি, ও পান্না, হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে আয় মা। নইলে সব পুড়ে ঝামা হয়ে যাবে। সাবানজল আছে, সাবধানে ধরে নামাস, নইলে হাত পিছলে পড়ে গেলে পুড়ে মরবি।

সংসারের আসল খুঁটিটা নাড়া খেলে কী হয় তা কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবাইকে বুঝিয়ে ছাড়ল মাধুরী। মা দুর্গার দশটা হাত আছে, কিন্তু তার মায়েরও যে বড় কম নেই, তা বুঝতেও পান্নার দেরি হল না বড় একটা।

দুপুরটা এপাশ ওপাশ করে কাটাল মাধুরী। স্বাসকষ্টের ভাব, মাথা অস্থির, গরম, ঘাড়ে অসহ্য ব্যথা।

সন্ধেবেলা রামহরি গেল ডাক্তার অনল বাগচীকে ডেকে আনতে।

মায়ের কাছে স্কুলফেরত হীরাকে বসিয়ে ঠাকুরের আসনে ফুলজল দিয়ে ঘরে ঘরে জলছড়া আর ধুপধুনো দিতে দিতে ভারী লজ্জা-লজ্জা করছিল পান্নার। জ্বরের ঘোরে রাজপুত্রের মতো একজন মানুষকে দেখতে পেয়েছিল সে। যেন ডাক্তার নয়, রাক্ষসপুরীতে বন্দি রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে এসেছে।

পান্না টুক করে এক ফাঁকে একটু সেজেও নিয়েছে। একখানা ভাল শাড়ি, মুখে একটু প্রসাধন, কপালে টিপ, চুলে এলো খোঁপাটি সাবধানে রচিত, চোখে একটু কাজল আর ঠোঁটে ন্যাচারাল লিপস্টিকও। এইটুকুতে দোষ নেই। রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সুমুখপথে...

জীবনে এই প্রথম মাধুরী বিছানা নিয়েছে। জ্ঞানবয়স থেকে সে কখনও মায়ের শরীর খারাপ দেখেনি, এখন এই প্রথম মা শয্যা নেওয়াতে পান্না মায়ের জায়গা নিতে হাড়েহাড়ে বুঝছে এই মহিলা কী পরিমাণ ওয়ার্কলোড নিজের ঘাড়ে নিয়ে এ-বাড়ির অন্য সব মানুষকে নিষ্কর্মা সময় কাটাতে দিয়েছে। রান্নাঘর থেকে গোয়ালের সাঁজাল, ঝি-এর কাজ তদারকি থেকে মুনিশদের সামাল দেওয়া, ঘরদোর সারা থেকে বাড়ির লোকের বায়নাক্কা সামলানো—অফুরন্ত কাজ। পান্না হাঁফিয়ে উঠেছে এক দিনেই। এ ছাড়াও আছে সংসারের আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখা, বাজারের ফর্দ করা, ধোপার হিসেব, মুদির হিসেব, ধান-চাল বিক্রির হিসেব। ভাগ্যিস সেগুলো করতে হচ্ছে না এখনও। বিয়ের পর সংসার হলে যদি তাকে তার মায়ের মতোই জীবনযাপন করতে হয় তাহলে সে তো মরেই যাবে! বাবার চায়ের চিনি বেশি হয়েছিল। মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু অর্ধেকের ওপর চা ফেলে দিয়েছিল। স্কুল থেকে ফিরে ভাত পাতে মাছ-ভাজা হয়নি বলে মুখ গোঁজ করে ছিল হীরা। রোজ নাকি তাকে মা গরম মাছ-ভাজা দেয় পাতে। কে জানবে বাবা অত।

শুয়ে শুয়ে অসুস্থ শরীরেও মা মাঝে মাঝে বকুনি দিচ্ছিল তাকে, ধিঙ্গি মেয়ে একটা কাজ যদি ঠিকমতো করতে শিখেছে। পটের বিবি সেজে ঘুরে বেড়ালেই হবে! একদিন শুয়ে থাকার জো নেই। অমনি সব বেসামাল করে ফেলল। আমি মরলে কী যে হবে তোদের! সংসার উড়ে পুড়ে যাবে।

বাঁধা গৎ। কানে না তুললেও চলে। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। সে যে এক স্বপ্নের পুরুষের অপেক্ষায় আছে সেও কি আসলে ওই বাপ-জ্যাঠাদের মতোই নিতান্তই স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, গদ্যময় পুরুষ মাত্র? আর কিছু নয়? অন্য কিছু নয়? ধুস, তাহলে স্বপ্ন দেখাটার মানে কী? আর স্বপ্ন ছাড়া পান্না কি বাঁচে?

তবু অনল বাগচী আসবে আজ। জ্বরের ঘোরে স্বপ্নের মিশেল দেওয়া চোখে দেখা এক পুরুষ। কতটা লম্বা? খুব ফর্সা? স্বপ্ন-স্বপ্ন মেদুর চোখ না? আর গলার স্বরটা কী গম্ভীর গমগমে!

একটু সেজেছে তাই পান্না। একজন ডাক্তারকে বিয়ে করার খুব শখ হয়েছে আজকাল তার। ডাক্তারই ভাল। কারণ ডাক্তারদের সে একটু ভয় পায়। সেই ভয় ভাঙানোর জন্যই একজন ডাক্তারকে কাছে পেলে তার ভাল হয়।

সন্ধের পর একখানা ছোট্ট মিষ্টি মারুতি গাড়ি এসে যখন বাড়ির সামনে থামল তখন পানার বুকের মধ্যে স্পষ্ট ধুকুর-পুকুর। দরজার আড়াল থেকে সে দেখল, একজন নামছে। হাতে ডাক্তারি ব্যাগ, গলায় স্টেথোস্কোপ। বাইরে তত আলো নেই। অস্পষ্টতার মধ্যে মনে হল, লম্বা, বেশ লম্বা।

রামহরি ভারী আপ্যায়িত ভঙ্গিতে, 'আসুন আসুন' বলে ঘরে নিয়ে এল তাকে।

জুতো ছাড়তে হবে নাকি?

রামহরি তাড়াতাড়ি বলল, আরে না, না, জুতো থাক। আপনি আসুন।

একটু বিরক্ত হল পান্না। এ বাড়িতে জুতো ছেড়েই শোওয়ার ঘরে ঢোকার নিয়ম। বাবা যে কেন জুতো ছাড়তে বারণ করল। তার মানে ডাক্তার চলে গেলে শোওয়ার ঘর থেকে বৈঠকখানা অবধি তাকে জল-ন্যাকড়া দিয়ে মেঝে মুছতে হবে।

স্পষ্ট আলোয় যখন অনল বাগচী ঘরে এসে দাঁড়াল তখনই যেন তার স্বপ্নের গোটা ইমারতটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল। সেই ভাঙচুরের শব্দও যেন শুনতে পেল পান্না।

অনল বাগচীর বয়স চল্লিশের ওপর।

শুধু তা-ই নয়। তেমন সুপুরুষই বা কোথায়? ফর্সা নয় না-ই হল, মুখশ্রীও কি তেমন ভাল কিছু? মাথার চুল উঠে গিয়ে কপালটা বড্ড চওড়া দেখাচ্ছে। হাসলে দাঁতের সেটিং বিশ্রী দেখায়। ধুস।

গোমড়ামুখো ডাক্তার মাধুরীকে পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ মুখ তুলে বলল, আগে ডাক্তার দেখেননি?

রামহরি মাথা নেড়ে বলে, না তো। দরকার পড়েনি।

রোগটা তো আজকের নয়, বেশ পুরনো।

রোগটা কী ডাক্তারবাবু?

গম্ভীর ডাক্তার বলল, প্রেশার একশো নব্বইয়ের ওপর, নীচেরটা একশো কুড়ি। যে কোনও সময়ে একটা স্ট্রোক হয়ে যেতে পারত। হার্টেরও প্রবলেম আছে মনে হচ্ছে। ওযুধগুলো এখুনি এনে শুরু করে দিন। আর পারলে কালকেই ই সি জি আর ব্লাড টেস্ট করিয়ে নিন।

অবস্থা কি সিরিয়াস?

চিকিৎসা না করালে সিরিয়াস তো বটেই। অনেক আগেই ডাক্তার দেখানো উচিত ছিল।

উনি ডাক্তার দেখাতেই চান না যে!

তা বললে তো হবে না। সময়মতো ডাক্তার না দেখালে অবস্থা জটিল হয়ে দাঁড়াতে পারে!

মাধুরী ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমার তো তেমন কিছু হয়নি ডাক্তারবাবু, শুধু একটু বায়ু হয়ে কেমন যেন লাগছিল।

ডাক্তার একটু হেসে বলল, আপনার কী হয়েছে তা যদি আপনিই বুঝবেন তাহলে তো আমাকে ডাকার দরকারই ছিল না। আপনি এখন চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকবেন কয়েকদিন। ফুল রেস্ট।

তাই কি হয়। ওই তো এক ফোঁটা রোগা মেয়েটা আমার। ও কি পারে সংসার সামলাতে?

কিন্তু আপনি যদি একেবারে বেড রিডন হয়ে পড়েন তাহলে তো ওর ওপর আরও প্রেশার পড়বে। সংসারের কথা যে এখন কিছুদিন আপনার ভাবা চলবে না!

কতদিন শুয়ে থাকতে হবে?

পাঁচ-সাত দিন তো বটেই।

অসহায় গলায় মাধুরী বলে, কী যে হবে!

দুশো টাকা ভিজিট নিয়ে ডাক্তার চলে গেল। পান্নার দিকে ফিরেও তাকাল না।

পান্না খোঁপা খুলে ফেলল, টিপ তুলে ফেলল, মুখটায় জল দিয়ে পরিষ্কার করল। দুস!

রাত্রিবেলা তার রান্না মাছের ঝোল খেয়ে বাবা খুব প্রশংসা করল। বাবারা যেমন করেই থাকে।

হীরা মুখ বেঁকিয়ে বলল, নুন কম হয়েছে। পানসে স্বাদ।

ভাতটা একটু বেশি সেদ্ধ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু কেউ সে নিয়ে উচ্চবাচ্য করল না। তবে এসব যে থ্যাঙ্কলেস জব সে বিষয়ে পান্নার কোনও সন্দেহ নেই। বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন শত খণ্ড হয়ে এখন তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

সকালে খবর পেয়ে এল পারুল।

ছোটমা, তুমি আবার কী বাধিয়ে বসেছ!

আর বসিস না মা, ডাক্তারগুলো পয়সা লোটার জন্য কত কী যে বলে যায়। ডাক্তারি না শিখলে কী হবে, আমাদের বয়স কি আর কম হল, অভিজ্ঞতা বলে একটা জিনিসও তো আছে। আমার শরীর আমি বুঝলুম না, বুঝল কিনা বাইরের ডাক্তার! তাও পাঁচ মিনিটে!

তাই তো! এ যে ভারী অন্যায়। তোমার শরীর নিয়ে ডাক্তারের অত মাথাব্যথা কীসের? সংসারের মুষলপর্বের মধ্যেই যে তুমি ভাল থাক তা কি আর ডাক্তাররা জানে! যাও না, উঠে গিয়ে একটু ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে এস, না হয় পাহাড়প্রমাণ খার কাচতে বসে যাও।

মাধুরী হেসে ফেলে বলে, আর ঠাট্টা করতে হবে না। ওই তো পান্নার ছিরি। কাজকর্ম কোনওদিন করেছে! শুনলুম তো ভাত গলিয়ে ফেলেছে, কাঁচা তেলে ডাল ফোড়ন দিয়েছে, আরও কত কী। ও কেন পারবে বল! শেখেওনি তো কিছু।

যা পারে করবে, সবাইকে ওই গলা ভাত আর এই কাচা তেলের ডালই খেতে হবে। এখন তো আর বায়নাক্কা চলবে না।

আজ সকালে শরীরটা তো বেশ ঝরঝরেই লাগছে রে! কিন্তু উঠতেই সবাই এমন খা-খা করে তেড়ে এল যে ভয়ে আবার শয্যা নিতে হল। যাই বলিস বাপু, পাঁচ-সাত দিন বিছানায় পড়ে থাকা আমার পোষাবে না। কর্তার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে না। হীরারও পেট ভরছে না।

পারুল হাসছিল। বলল, আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও ওদের। কদিন না হলে ওখানেই খেয়ে আসুক। মা সেটাই বলে পাঠিয়েছে।

তেমন আতান্তরে পড়লে না হয় যাবে। কিন্তু তা বলে মেয়েরা সংসার সামাল দিতে শিখবে না, এটাই বা কেমন কথা বল! দুদিন পরে যখন বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে তখন কী হবে বল তো!

শ্বশুরবাড়ি যাওয়া মানেই বুঝি উদয়াস্ত সংসারের ঘানি টানা তোমার মতো?

ও মা! ঘানি না টানলে সংসারে কি লক্ষ্মীশ্রী থাকে? কোনটা না দেখলে চলে বল তো! পঁয়তাল্লিশ বছরের ওপর সংসার করছি। আজও মনে হয়, সংসারের কত কিছুই এখনও শিখিনি।

একটা শ্বাস ফেলল পারুল। ছোটমাকে বুঝিয়ে কিছু লাভ নেই। যেমন বুঝিয়ে লাভ হয় না তার মাকেও। পৃথিবী দ্রুত পালটে যাচ্ছে বাইরের দুনিয়ায়। তার ঢেউ এখনও এসে পৌঁছায়নি এখানে। সেদিন কেবল টিভি-তে একটা হিন্দি সিরিয়াল চলছিল। তাতে একটা মেয়ে বোধহয় তার মাকে বলছিল, তোমাদের যুগ চলে গেছে। আমার জীবন নিয়ে আমি কী করব তা আমাকেই ভাবতে দাও। বা ওরকমই কিছু কথা। তার মা বিরক্ত হয়ে বলল, বন্ধ কর তো। ও আর ভাল লাগে না। মেয়েটা একটা স্বামী ছেড়ে আর একটার সঙ্গে লটরপটর

করছে। মা ভাল কথা বলতে এসেছে। অমনি লেকচার দিচ্ছে দেখ। টিভিগুলোও হয়েছে আজকাল, উলটো-পালটা শেখাচ্ছে লোককে।

রামহরি গাড়ি ভাড়া করে এনেছে। বর্ধমান নিয়ে যাবে স্ত্রীকে। মুখখানা গম্ভীর। বউ নামক বস্তুটি নিয়েও যে এরকম মাথা ঘামাতে হবে, অপচয় করতে হবে এত টাকা, সময় ও শ্রমের, এটা যেন তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

দেখ তো, কী ঝামেলাই বাধাল তোর ছোটমা!

পারুল হাসল, ঝামেলা বলছ কেন? শরীর থাকলে খারাপও তো হবেই।

ডাক্তার তো স্ট্রোকেরও ভয় দেখিয়ে গেল।

অত ভয় পেয়ো না ছোটকাকা, প্রেশার তো মায়েরও আছে। রেগুলার ওষুধ খেলে কিছু হবে না। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সঙ্গে কে যাচ্ছে?

বিজু, তার সব চেনাজানা আছে বর্ধমানে।

দঙ্গলটা বর্ধমানে রওনা হওয়ার পর পারুল পান্নার দিকে ফিরে বলল, কী রে মুখপুড়ি, খুব নাকি কাজকর্ম করছিস?

আর বোলো না পারুলদি। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সংসার যে এরকম বিচ্ছিরি তা তো জানা ছিল না!

দুর পাগল, সংসার বিচ্ছিরি হবে কেন? তুই আসলে ঘাবড়ে গেছিস।

পান্নার চোখ ছলছল করছিল। বলল, হ্যাঁ পারুলদি, ভীষণ ঘাবড়ে গেছি। খুব মন দিয়ে রান্না করলাম, তবু ভাত গলে গেল, ডালে কাঁচা তেলে ফোড়ন দিয়ে ফেললাম। এত করছি তবু মা বকুনি দিচ্ছে।

আচ্ছা, এবেলাটা চালিয়ে নে। রাত থেকে আমাদের ওখানে সবাই খাস। আমাদের তো রান্নার বামুন আছে, প্রবলেম হবে না।

তাহলেই কি মা কথা শোনাতে ছাড়বে? বলবে ধেড়ে মেয়ে বাড়িতে থাকতে ও-বাড়িতে সবাই খাচ্ছে, পাঁচ জনে বলবে কী?

যা খুশি বলুক, কান না দিলেই হয়। ছোটমাকে আমি বুঝিয়ে বলবখন। আয়, গল্প করি।

এক গাল হেসে পান্না বলল, তুমি এসে বাঁচালে আমাকে। কাল থেকে এত মন খারাপ লাগছিল! একে মায়ের অসুখ তার ওপর ডাক্তারটা বেরোল বুড়ো।

কে ডাক্তার রে? অনল বাগচী?

হ্যাঁ তো!

ও মা সে বুড়ো হবে কেন? চল্লিশের বেশি তো নয়! তা তার বয়স দিয়ে তোর কী হবে রে মুখপুড়ি?

কঁদো কাঁদো হয়ে পান্না বলল, বলব তোমাকে? কাউকে বলে দেবে না তো!

পারুল হাসছিল, প্রেমে পড়েছিলি নাকি?

দেখ না কাণ্ড! পুজোর ভাসানে গিয়ে ঠান্ডা লেগে আমার কীরকম জ্বর হয়েছিল মনে আছে? তা থাকবে না কেন?

তখন তো ওই অনল বাগচীই দেখতে এল আমাকে।

হ্যাঁ, তা জানি। খুব নামকরা ডাক্তার। বর্ধমান মেডিকেল কলেজে পড়ায়।

হ্যাঁ তো। জ্বরের ঘোরে আমি দেখেছিলাম ভারী সুন্দর দেখতে একটা ছেলে যেন। খুব লম্বা, ছিপছিপে, ফর্সা, গম্ভীর আর কী গমগমে গলা। খুব পারসোনালিটি, দেখে এত ভাল লাগল যে অসুখের মধ্যেও গা সিরসির করছিল।

পারুল হেসে গড়িয়ে পড়ছিল, এত কাণ্ড?

আর বোলো না। আমার তো মনে হয়েছিল যাকে এতকাল মনে মনে খুঁজছি এ-ই সে। একজন ডাক্তারকেই তো আমার বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল, তাই বোধহয় ভগবান ঠিক লোকটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ও মা! কোথায় যাব রে! কী পাগল তুই?

তাই তো বলি। তারপর অনল বাগচী নামটা শুনলেই কেমন যেন শিহরন হতে লাগল। নামটাও কী সুন্দর বলো!

তারপর কী হল?

তারপর আর কী! অসুখ-টসুখও করছে না যে অনল বাগচি আবার আসবে। ভিতরে ভিতরে চাইছি একটা অসুখ-টসুখ কিছু করুক আমার। তাহলে আসবে।

তোর বদলে শেষে অসুখ হল কিনা ছোটমা-র!

হ্যাঁ। বিশ্বাস করবে না কাল বাবা ডাক্তারকে ডাকতে গেলে আমি একটু সেজেগুজেও গিয়েছিলাম। তারপর যখন ডাক্তার এল তখন এক গাল মাছি। ধুস!

পারুল মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খানিকক্ষণ হেসে নিয়ে বলল, আজ কতদিন পর এত হাসলাম।

পান্না কান্না-হাসি মেশানো মুখে বলল, তুমি তো হাসছ! আমার অবস্থাটা ভাব তো! কত রোমান্টিক চিন্তা করে রেখেছিলাম। মাথায় ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়ে গেল এক ঘটি। এত রাগ হচ্ছে লোকটার ওপর।

ওমা! লোকটার দোষ কী বল! সে তো কিছু করেনি!

আহা, করেনি আবার! অত বয়স হওয়ার কী দরকার ছিল লোকটার! আর একটু সুন্দর হলেই বা কী ক্ষতি ছিল বলো! বারেন্দ্র হওয়ারও কোনও দরকার ছিল না।

শুধু বারেন্দ্র? শুধু বয়স? আর কিছু নয় বুঝি রে মুখপুড়ি?

আরও কিছু আছে বুঝি?

নেই! ওর যে মেম বউ!

জিব কেটে পান্না বলে, ওই যাঃ, বিয়ের কথাটা তত একদম ভুলে গিয়েছিলাম! তাই তো! বিয়ে তো হতেই পারে। জ্বরের ঘোরে সেসব কি আর খেয়াল ছিল? পরেও আর মনে হয়নি কথাটা।

কেন মনে হয়নি?

মনে হয়েছিল ওকে ভগবান আমার জন্যই পাঠিয়েছে।

আহা রে! তাহলে বুক ভেঙে গেছে বল!

না সেরকম কিছু তো হচ্ছে না। শুধু রাগ হচ্ছে। লোকটা একদম যাচ্ছেতাই।

তুইও একটা যাচ্ছেতাই। পছন্দ করতেও সময় লাগে না, নাকচ করতেও না।

আসলে কী জান! বলব?

বল না।

আমার বড্ড নাক-উঁচু তো। কোনও পুরুষকেই তেমন পছন্দ হয় না। মনটা কেবল খুঁতখুঁত করে। ওর দাত উঁচু, এ বেঁটে, সে কেমন ম্যাদামারা, কেউ হয়তো একটু বেশি পুতুল-পুতুল। ঠিক মনের মতো কেউ নয়।

তাই তো রে! তাহলে তো মুশকিল!

ভীষণ মুশকিল। আমার বন্ধুরা তো বলে, তুই যেমন খুঁতখুঁতে, হয় তোর বরই জুটবে না, না হয় তো একটা কালো মোটা ঘেমো জাম্বুবান জুটবে।

ইস! তা কেন? তোর বর আমি খুঁজে দেব।

ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে পান্না বলে, পাবে না। আমি যাকে চাই তাকে আমিই ভাল বুঝতে পারি না। রোজ তার চেহারা পালটে যায়।

এই রে, তাহলে কী হবে?

কাঁচুমাচু হয়ে পান্না বলে, সেটাই তো হয়েছে মুশকিল। আজ একরকম ভাবি কালই যে অন্যরকম হয়ে যায়। চেহারা পালটায়, স্বভাব, চরিত্র, গুণ তাও কি আর এক রকম থাকে? আমার এক সময়ে মনে হত আমার পুরুষটা খুব ভাল রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারবে। তারপর হল কী একদিন বিজুদা বলছিল, পুরুষমানুষ হারমোনিয়াম নিয়ে বসে প্যানপ্যানে রবীন্দ্রসংগীত গায় ও আমার একদম সহ্য হয় না। ব্যস, পরদিন থেকেই আমি রবীন্দ্রসংগীত জানা পুরুষ বাতিল করে দিলাম।

আচ্ছা পাগলি যা হোক। যাকে পাবি তার দোষগুণ নিয়েই তো সেই মানুষটা, একদম মনের মতো কি হয়?

আমার হবে না পারুলদি। আমি বড্ড ন্যাকা।

ভ্যাট, তুই একটুও ন্যাকা নোস। ন্যাকা হলে কখনও অনল বাগচির কথা আমাকে অত সরলভাবে বলতে পারতিস না।

তোমাকে যে আমার সব বলতে ইচ্ছে করে। তোমার যা বুদ্ধি। কী করব বলল তো! মা একটা দিন শুয়েছিল, আমাকে একটু সংসারের কাজ করতে হয়েছে, অমনি আমার মন বিগড়ে বসে আছে। কাল রাত থেকে কেবল ভাবছি বিয়ে করলে আমাকে তো মায়ের মতোই জীবন যাপন করতে হবে! সে আমি পারব না। থাক বাবা দরকার নেই আমার বিয়ের। স্বপ্নের পুরুষ স্বপ্নেই থাক।

বিয়ে করলে একটু স্বপ্নভঙ্গ তো হয়ই। কিন্তু তোর যে বিয়ের আগেই হয়ে বসে আছে।

হবে না! এত কিছু করলুম, তার কারও মন উঠল কি? সংসারটা ভারী অকৃতজ্ঞ। মাও কথাটা বলে।

সে তো বটেই। কিন্তু ছোটমা সেরে উঠলে জিজ্ঞেস করিস তো এই সংসার ছেড়ে যদি তাকে অন্য একটা সুখের জীবন দেওয়া যায়, যেখানে কাজকর্ম করতে হয় না, কারও দায় ঘাড়ে নিতে হয় না, চারদিকে চোখ রাখতে হয় না তাহলে ছোটমার কেমন লাগবে।

কেন পারুলদি, ভালই তো লাগবে।

জিজ্ঞেস করে দেখিস না। এইসব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট দায়িত্ব এসব নিয়ে যতই চেঁচামেচি করুক না এই খোঁট ছাড়া ছোটমা এক মুহূর্ত থাকতেও পারবে না। নিজেকে দিয়ে তো বুঝি।

কী বোঝো বলো না পারুলদি, বলো।

বিয়ের পর মেয়েদের একটা স্বপ্নভঙ্গ হয়। সে তুই এখন ঠিক বুঝবি না। ভীষণ প্রেম-ট্রেম করে বিয়ে করলেও হয়। জীবনটা তো স্বপ্নের মতো নয়। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের পরও দেখবি দিব্যি বেশ আছিস দুজনে। বয়সে ভারভাত্তিক হলে দেখবি কিছু খারাপ লাগছে না। নতুন একটা ইমপেটাস পাওয়া যায়।

কিন্তু আমার কী হবে পারুলদি?

তুই কি আলাদা? ওরকম মনে হয়। তারপর দেখিস তুইও যা আমিও তা।

কিন্তু পারুলদি।

বল।

একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না?

না রে, বল না, এখন বড় হয়ে গেছিস, লজ্জা কীসের?

অমলদার কথাই বলছি, তোমার প্রেমে পড়েছিল তো?

হদ্দমুদ্দ। বলে হেসে ফেলল পারুল, শুধু অমলদা নয়, আমিও তো।

কীরকম প্রেম ছিল তোমাদের?

গাঁ-দেশে তো আর হাত ধরাধরি করে ঘুরিনি। একটু ভাব হয়েছিল, দুপক্ষের মা বাবারা বিয়েও ঠিক করে ফেলেছিল। অমলদা আমাদের বাড়ি আসত, আমি ওদের বাড়ি যেতাম।

তারপর কী হল?

অমলদা যদি ভালবাসাটাকে গলা টিপে মেরে না ফেলত তাহলে বিয়ে হত। তারপর কী হত জানি না।

তোমার কথা শুনে কী মনে হয় জানো?

কী?

মনে হয় তোমার সেই ভালবাসার স্মৃতিও আর নেই।

একটা শ্বাস ফেলে পারুল বলল, থাকার কথা নাকি?

কিন্তু অমলদার অবস্থা দেখেছ?

কী অবস্থা?

তোমার জন্যই কিন্তু বেচারা একদম সুখী হতে পারল না।

কে বলল তোকে?

তাই তো মনে হয়। মদ খায়, কেমন ভ্যাবলার মতো চেয়ে থাকে, বউয়ের সঙ্গে নাকি সবসময়ে খিটিমিটি। সোহাগ বলে সব তোমার জন্যই।

বাজে কথা।

তোমার জন্য নয়?

আমি তা জানি না। আমার মনে হয় আমি ওকে বিয়ে করলেও অমলদা এরকমই হত যেমনটা এখন আছে। যা হয়েছে ভালই হয়েছে।

একটু হেসে পান্না বলল, আমারও বিরহটাই ভাল লাগে।

তার মানে?

আই লাইক ট্র্যাজিক এন্ডিং। প্রেম-ট্রেম হয় তোক বাবা, কিন্তু তারপর যেন শরৎচন্দ্রের মতো একটা বেশ সেন্টিমেন্টাল ট্র্যাজেডিও ঘটে যায়। নইলে প্রেমটা একদম আলুসেদ্ধ হয়ে যাবে।

ঊনচল্লিশ

জলের পাম্পটা খারাপ হয়েছে কাল থেকে। ছাদের ট্যাংকে জল উঠছে না। বাসন্তীর আজকাল অল্পেই ভারী উদ্বেগ হয়। পাম্প খারাপ হওয়া মানে সুমনের বাথরুমে জল আসবে না। তাহলে কী হবে?

জিজিবুড়ি রোজকার মতোই সকালে তার বরাদ্দ চা খেতে এসে রান্নাঘরে ঘাপটি মেরে বসা, বলল, মরণ! পাম্প খারাপ হয়েছে তো কী হয়েছে রে বাপু? গাঁ-গঞ্জের কটা লোকের ঘরে আবার পাম্পের জল ওঠে লা? ওই ধেড়ে ছেলে নীচে নেমে তো টিপকলেই কাজ সারতে পারে। গতরে তো আর শুঁয়োপোকা ধরেনি বাছা। তুই হেদিয়ে মরছিস কেন?

আহা, ওদের শহরে থেকে অভ্যেস। কিছু যদি মনে করে?

তাহলে আর কী, গলবস্ত্র হয়ে গিয়ে পায়ে পড়। যা আদিখ্যেতা করলি অ্যাদ্দিন সতীন পোকে নিয়ে! বলি কারো পাকা ধানে মই তো দিসনি, অমন চোর-চোর হয়ে থাকিস কেন? সতীন পো তো গতরখানাও নাড়ে না। দিন-রাত ফুলবাবুটি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কত বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবি? পুজোর ছুটি শেষ হয়ে এল, এখনও নড়ার নাম নেই। বলি মতলবখানা কী ওর?

আচ্ছা মা, তোমার মনে এত বিষ কেন বলো তো! এসে আছে দুদিন আমার কাছে, তোমার সহ্য হচ্ছে না কেন? এখানটায় ভাল লাগছে বলেই তো আছে! নাকি! যত্নআত্তি করি যাতে বড়গিন্নির কাছে গিয়ে কুচ্ছো না গায়। একেই তো আমি চক্ষুশূল, সৎ, অযত্ন করলে রক্ষে আছে?

ওরে ভালমানুষের ঝি, তোর বুদ্ধির বলিহারি যাই। গ্যাঁট হয়ে বসে আছে কি এমনি? হিসেব-নিকেশ কষছে, বুঝলি? বাঙাল কত টাকা ঢালছে এখানে, সম্পত্তি কত, জমিজমা কত, সব গিয়ে লাগাবে। আমি তোর জায়গায় হলে তেরাত্তির কাটবার আগেই ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতুম। রোখাচোখা না হলে বিষয়সম্পত্তি কেউ রাখতে পারে? বাঙালেরও সাঁট আছে এই বলে দিলুম। একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছে।

বাসন্তী রাগ করে বলল, তোমার অত কু গাইতে হবে না মা। সুমন কাল বাদে পরশুই চলে যাবে। আজ ওর বাবা আসবে। মাঝখানে শুধু কালকের দিনটা। কটা দিন ছিল, বড্ড মায়া পড়ে গেছে। কাল যাবে বলে মনটা খারাপও লাগছে। আর তুমি এসে সকালবেলাটায় আমার কানে বিষ ঢালছ। দুনিয়ায় কি ভাল জিনিস কিছু তোমার চোখেও পড়ে না!

ভাল হলে ঠিকই চোখে পড়ত। যাক বাবা, বিদেয় হচ্ছে তাহলে? বাঁচলুম।

কিন্তু বাসন্তীর মনটা খচ খচ করছে। শেষে দুটো দিন পাম্পটা খারাপ না হলেই তো পারত। বর্ধমান থেকে মিস্তিরি আনিয়ে পাম্প সারাতে এখনও তিন-চার দিন লাগবে। মুনিশ দিয়ে ওপরের বাথরুমে জল দেওয়ানো হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে বাসন্তী খুশি হচ্ছে না। পাম্পটা যে কেন খারাপ হল!

সুড়ুক সুড়ুক চা খেতে খেতে জিজিবুড়ি যেন তার মনের কথা টের পেয়ে বলল, তা পাম্প সারানো এমনকী হাতিঘোড়া কাজ। ওই শকুনটা তো রোজ এসে চা বিস্কুট খেয়ে যায়। ওকে বলিস না কেন!

কোন শকুনটা! কার কথা বলছ?

কেন, ধীরেন কাষ্ঠ।

ধীরেন খুড়ো! সে কী করবে?

ওই তো একসময়ে কলকবজা সব সারাত। গাঁয়ে কারও কিছু খারাপ হলে সবাই তো ওকেই ডাকত। সেলাই মেশিন রে, টিপকল রে, সাইকেল রে, ধীরেন না সারাত কী? ওকে বল, ঠিক সারিয়ে দেবে। রোজ এসে গুচ্ছের গিলে যাচ্ছে। ঘাড়ে ধরে কাজ করিয়ে নে। তাতে যদি কিছু শোধবোধ হয়।

বাসন্তী অবাক হয়ে বলে, তাই তো? ছেলেবেলায় ধীরেন খুড়োকে যন্ত্রপাতির থলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখতুম বটে! কিন্তু তুমি সেদিন এমন গালমন্দ করলে যে ধীরেন খুড়ো সেই থেকে আর আসে না। লজ্জা পেয়েছে বোধহয়।

আহা, দু-কান-কাটার আবার লজ্জা! ওর যেদিন লজ্জা হবে সেদিন কাকেরও কোরগু হবে, ধুলায় লুটায়ে যাবে।

কী যে সব বলো না মা।

মরণটাকে পাঠা না ওর কাছে, ধরে নিয়ে আসুক। ছুঁকছুঁকুনি স্বভাব বটে, কিন্তু ধীরেন মিস্তিরি ভাল।

বেলা আটটার মধ্যেই চলে এল ধীরেন কাষ্ঠ।

একগাল হেসে বলল, ডেকে পাঠিয়েছ মা?

বাসন্তী বলল, হ্যাঁ খুড়ো। বড্ড বিপদে পড়েছি। আমাদের পাম্প মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছে। দোতলায় জল না উঠলে কী বিপদ বলুন। আজ আবার মরণের বাবাও আসবে।

ধীরেন কাষ্ঠ হাসিটা ধরে রেখেই বলল, পার্টস পুড়ে বা ভেঙে গিয়ে থাকলে নতুন পার্টস লাগবে মা। আর তা না হয়ে থাকলে সারানো কঠিন হবে না।

আপনি বসুন। আগে দুখানা গরম রুটি খেয়ে নিন, তারপর মেশিন দেখবেন।

ধীরেন শশব্যস্তে বলে, তার দরকার নেই মা। সকালে চাট্টি চালভাজা খেয়েছি।

আহা, ভারী তো চালভাজা! রোদে মোড়া পেতে বসুন একটু। ওরে ও মরণ, দাদুকে মোড়াটা পেতে দে বাবা।

আজ রুটিতে বেশ জবজবে ঘি পড়েছে, ঘি গড়াচ্ছে একেবারে। আর মুখে দুখানা বললেও আদতে পাঁচখানা রুটি বেড়ে দিয়েছে বাসন্তী। সঙ্গে ধোঁয়া-ওঠা ফুলকপি আর আলুর তরকারি এক বাটি। কয়েকটা ডুমো ডুমো আলু ভাজা আর কাঁচা লঙ্কা।

একটু ডাল দিই খুড়ো? ফুটন্ত ডাল?

লজ্জা পেয়ে ধীরেন বলে, আবার ডালও দিবি? তা দে একটু। এ যে বেশ গুরুভোজন হয়ে যাচ্ছে রে মা।

খান খুড়ো, আপনাকে খাওয়ালে পুণ্যি হয়। পেট ভরে খান।

তোর মনটা মা, বাঙালের মতোই। বাঙালটাও বড় দিলদরিয়া মানুষ। তোদের দুটিতে মিলেছিস বড় ভাল, তা দে মা, ডালও একটু দে, ডালে ভিজলে রুটি নরম হয়।

ডালও নিয়ে এল বাসন্তী। ঘন সোনা মুগের ডাল। বাটিখানা বেশ বড়ই। ডালেও ঘি ভাসছে।

আরও রুটি লাগলে চাইবেন। লজ্জা করবেন না যেন। আর খুড়ো।

হ্যাঁ মা।

আমার মায়ের কথায় কিছু মনে করবেন না যেন। বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে। তার ওপর আফিং খেয়ে খেয়ে মাথাটাই গেছে একেবারে।

ধীরেন একটু করুণ হেসে বলে, কী জানিস মা, তোর মায়ের মতো অমন লক্ষ্মীমন্ত বউ তখন এ-গাঁয়ে আর একজনও ছিল না। কী চুলের ঢল, প্রতিমার মতো মুখ, কী হাত পায়ের গড়ন! গেলে যত্নআত্তিও করতেন খুব। সেসব দিন কোথায় চলে গেল বল তো! না মা, তোর মায়ের কথায় কিছু মনে করিনি।

আপনি যেমন রোজ আসতেন তেমন আসবেন। বাড়িতে অতিথি-বিথিতি না এলে কি সে বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী থাকে? মরণের বাবাও আপনাকে ভারী পছন্দ করে।

সে আর জানি না! আচ্ছা মা, আসব।

আপনার কথা তো মা-ই বলল আমাকে। বলল, ধীরেন ঠাকুরপোকে খবর দে। ঠাকুরপো সব রকম কল-টল সারাতে পারে।

ধীরেন ভারী আপ্যায়িত হয়ে বলে, তা পারতুম মা, এককালে। বাদ্যযন্ত্র থেকে শুরু করে সব রকম কাজই শিখেছিলুম। চর্চার অভাবে এখন ভুলেও গেছি অনেক। তখন তো আর কেউ পয়সা দিত না, বেগার খেটে খেটে মরতে হত।

না খুড়ো, আমি কিন্তু আপনাকে মজুরি দেব। যা লাগবে বলবেন।

মজুরি? তোর কাছ থেকে কি নিতে পারি মা? কত যত্নআত্তি করিস! ও তোকে ভাবতে হবে না।

ধীরেন যত্ন করে খেল। কাঁচালঙ্কাটা বড্ড ঝাল। খেয়ে হেঁচকি উঠে গেল। তবু সেটাও শেষ করল ধীরেন। কিছু ফেলল না।

দেখা গেল, এই বুড়ো বয়সেও ধীরেন কাষ্ঠ কাজ জানে বটে। মাত্র আধঘন্টা কী যেন খুটখাট করল পাম্পঘরে বসে। পাশে বসে খাপ পেতে দেখছিল মরণ। আধঘন্টা বাদে সুইচ দিতেই পাম্প চলতে শুরু করল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বাসন্তী। পাম্প নিয়ে যে কী উদ্বেগ হচ্ছিল তার বলার নয়।

কুড়িটা টাকা ধীরেন কাষ্ঠর হাতে দিয়ে বলল, এটা রাখুন খুড়ো। আপনার তো হাতখরচও লাগে।

না, না, তোর কাজ করে কি টাকা নিতে পারি মা? ও তুই রেখে দে।

না খুড়ো, পরিশ্রমের দাম দিতে হয়। নইলে ভগবান খুশি হন না। এটা আপনি রাখুন। আমার দরকার পড়লে তো আপনাকেই ডাকতে হবে।

খুব কুণ্ঠার সঙ্গে টাকাটা নিল ধীরেন। বলল, আমার এক গুরু ছিল। তার নাম অনন্ত হালদার। তার কাছে ট্র্যাক্টর মেশিনের কাজ শিখতুম। সে আমাকে বলত, তুই সব রকম কাজ শিখতে চাস বলে তোর কিছু হয় না। একটা কাজ যদি মন দিয়ে শিখতিস তাহলে কিছু করতে পারতিস। আজ ভাবি, হালদারের পো কিছু খারাপ কথা বলেনি। সব কাজের কাজী হতে গিয়ে আমার সবই ফসকে গেল। তা হ্যাঁ মা, পাম্পসেটটা কিন্তু এবার

একটু ওভারহলিং করিয়ে নিস। সার্ভিসিং না হলে মেশিন বসে যাবে। আপাতত চলছে বটে, কিন্তু ভাল করে মাজাঘষা দরকার। বেল্টটাও ঢিলে হয়ে গেছে।

আপনিই করে দিন না খুড়ো! অন্য লোক ডাকব কেন?

বুড়ো শরীরে অতটা কি পারব মা? পরিশ্রমের কাজ।

না খুড়ো, আপনিই করবেন, যা টাকা লাগে দেব।

পার্টস লাগবে কয়েকটা, বাঙাল এলে বর্ধমান থেকে পার্টসও যেন আনিয়ে নিস।

আপনিই করবেন তো!

দেবোখন করে, তুই যখন ছাড়বিই না।

আমি চাই, আমাদের কাজটাও হোক, আপনারও দুটো পয়সা হোক। বাইরের লোক এসে পয়সা নিয়ে যাবে কেন বলুন।

ধীরেন কাষ্ঠ বিদেয় নেওয়ার পর মরণ দোতলায় উঠে দুটো ঘরেই উঁকি দিল। তাদের ঘরে খাটের ওপর ছোট্ট ফোল্ডিং মশারির নীচে বোনটা ঘুমোচ্ছ। বেচারা খুব ঘুমোয়। বাচ্চাদের নাকি ওই স্বভাব, বোনটা আজকাল তাকে দেখলে হাসে। কোলে আসার জন্য হাতও বাড়ায়। কিন্তু কোলে নিতে ভরসা হয় না মরণের। বড্ড নরম-সরম শরীর। ভয় হয় হাত ফসকে পড়ে যাবে। তবে বোনটিকে ইদানীং বেশ ভালবাসে মরণ। ঘরের মেঝেয় বসে বোনকে পাহারা দিতে দিতে চাল বাচছে মুক্তাদি। আজ রাতে পোলাও হবে বলে শুনেছে মরণ। পোলাও তার খুবই প্রিয় জিনিস।

দ্বিতীয় ঘরটার খোলা জানালা দিয়ে উকি মেরে মরণ দেখল, দাদা এখনও ঘুমোচ্ছ। গায়ে লেপ, মশারি ফেলা। সুমন একটু দেরি করে ওঠে বটে, কিন্তু এত দেরি করে নয় তা বলে, এখন নটা বাজে।

চুপি চুপি চলে আসছিল মরণ, হঠাৎ শুনতে পেল, সুমন খুব কাতর গলায় বলে উঠল, উঃ মা গো!

মরণ ফিরে গেল জানালার কাছে।

দাদা, ও দাদা, তোমার কী হয়েছে?

সুমন ফের একটা অস্ফুট যন্ত্রণার শব্দ করল।

ও দাদা!

উঃ।

তোমার কী হয়েছে?

লেপের ভিতর থেকে মুখটা বের করে সুমন বলল, ভীষণ শীত করছে। আর বড্ড মাথার যন্ত্রণা।

মাকে ডাকব?

না না, তার দরকার নেই। ঠিক হয়ে যাবে।

দরজাটা খুলতে পারবে?

হ্যাঁ, দাঁড়া উঠছি।

বেশ কষ্ট করেই উঠল সুমন, বোঝা যাচ্ছিল, সে টলছে। কোনওক্রমে এসে দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, আমি একটু শুয়ে থাকি।

তোমার গা দেখি।

কপালে হাত রাখতেই মরণের হাতে যেন ছ্যাঁকা লাগল, এত গরম।

তোমার তো খুব জ্বর।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। শেষ রাত থেকে শীত, মাথা ধরা আর আড়মোড়া হচ্ছিল। বাড়িতে প্যারাসিটামল আছে, জানিস?

কী বললে?

প্যারাসিটামল, জ্বর কমানোর ওষুধ।

দাঁড়াও, মাকে জিজ্ঞেস করে আসছি।

এক দৌড়ে নেমে এসে সোজা মায়ের কাছে গিয়ে মরণ বলল, মা, দাদার ভীষণ জ্বর, গা পুড়ে যাচ্ছে।

ও মা! সে কী! বাসন্তী তাড়াতাড়ি উনুন থেকে ফোড়নের কড়াই নামিয়ে রেখে একটা গরম জলের হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে বলল, চল তো দেখি!

কপালে হাত দিয়েই মুখ শুকোল বাসন্তীর।

ও বাবা! তোমার তো ভীষণ জ্বর বাবা।

হ্যাঁ। ভাববেন না, বোধহয় ঠান্ডা লেগে হয়েছে। গতকাল মরণের সঙ্গে পুকুরে স্নান করেছিলাম তো।

দাঁড়াও, থার্মোমিটার নিয়ে আসি।

জ্বরের কোনও ওষুধ নেই বাড়িতে?

তোমার বাবা কিছু ওষুধপত্র সবসময়েই কিনে রেখে যায় বাড়িতে। কোনটা কীসের তা তো জানি না।, বাক্সটা এনে দিচ্ছি, দেখ। কিন্তু আমার মনে হয় ডাক্তার দেখিয়েই ওষুধ খাওয়া ভাল।

ডাক্তার লাগবে না, ঠান্ডা লেগে জ্বর দু-চার দিন ভোগায়।

বাসন্তী মশারিটা খুলে নিল। পুবের জানালা খুলে দিতেই রোদ এল ঘরে।

থার্মোমিটারে জ্বর উঠল একশো চারের কাছাকাছি।

দাঁড়াও বাবা, তোমার মাথা ধোয়াতে হবে। আমি ব্যবস্থা করছি।

আরে না না, অত ঝামেলা করতে হবে না, প্যারাসিটামল খেলাম তো, জ্বর নেমে যাবে।

ওই ওষুধে জ্বর নামবে, কিন্তু আবার তেড়ে উঠবে। ও মরণ, যা তো, ফার্মাসিতে খবর দিয়ে আয়। ডাক্তার অনল বাগচী এলেই যেন আমাদের বাড়িতে আসে। তোর বাবার নাম লিখিয়ে দিয়ে আসিস। তাহলে গরজ হবে।

মরণ সঙ্গে সঙ্গে ছুটল।

সুমন একটু হেসে বলল, ডাক্তার ডাকার কোনও দরকার ছিল না। সামান্য জ্বর, ঠিক হয়ে যেত।

না বাবা, আজকাল বড্ড তেড়াবাঁকা অসুখ হয়। আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল।

এখানকার ডাক্তার কী রকম? গাঁয়ে তো ভাল ডাক্তার পাওয়া যায় না শুনেছি।

আগে তাই ছিল বাবা। হাতুড়েরা চিকিৎসা করত। আজকাল বর্ধমান থেকে ডাক্তাররা আসে। অনল বাগচী শুনেছি ভাল ডাক্তার। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে পড়ায়। বিলেত ফেরত।

ওঃ, তাহলে তো ভালই হবে।

হ্যাঁ বাবা। ডাক্তারের খুব নাম। এবার মাথাটা একটু ধুইয়ে দিই? তোমার কোনও কষ্ট হবে না, টেরও পাবে না।

আগে আমি একটু বাথরুম থেকে ঘুরে আসি। তারপর দেখা যাবে।

যাও বাবা। ততক্ষণে বিছানাটা ঝেড়ে দিই।

আপনি কেন করবেন? মুক্তা বা পুটু কাউকে বলুন না।

আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, বাড়িতে কারও অসুখ করলে সেই ঘরে বাড়ির কাজের লোককে ঢুকতে দেওয়া হয় না। একে তো ওরা অত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না। তার ওপর যদি ছোঁয়া লেগে ওদেরও অসুখ করে তবে হয়তো মনে মনে শাপশাপান্ত করবে।

কিন্তু আপনারও তো ইনফেকশন হতে পারে।

আমি তো মা। মায়েদের কিছু হয় না।

কী জানি কেন কথাটা শুনে সুমনের মুখটায় একটা ভারী স্নিগ্ধ হাসি ফুটল। আর কিছু না বলে সে ধীরে ধীরে উঠল। বাথরুমে গেল।

বাসন্তী বিছানা ঝেড়ে, ঘর ঝাঁটপাট দিয়ে, চোখের পলকে সব ফিটফাট করে ফেলল। এক বালতি জলে জোরালো ফিনাইল ফেলে ঘরটা মুছেও দিল তাড়াতাড়ি। গরিব ঘরের মেয়ে বলেই সে এসব কাজ যে কোনও কাজের লোকের চেয়ে অনেক বেশি পাকা।

বাথরুম থেকে অনেকক্ষণ বাদে যখন বেরোল সুমন তখন সে টলছে, হাঁফাচ্ছে। চোখ দুটোও লাল। বাসন্তী তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিল। গায়ে লেপ চাপা দিয়ে বলল, দাঁড়াও, হট ওয়াটার ব্যাগ এনে দিচ্ছি।

না না, অত কিছু লাগবে না।

ঠান্ডা জলে মাথা ধোয়ানোর সময় তোমার শীত করবে। তখন হট ওয়াটার ব্যাগটা থাকলে আরাম লাগবে। কোনও ঝামেলা হবে না বাবা, জল আমি উনুনে চাপিয়েই এসেছি।

তার কপালে একটা অডিকোলোন মাখানো জলপট্টি লাগিয়ে বাসন্তী নীচে গেল।

সুমন চেয়ে দেখল খুব কৌশল করে উত্তরের জানালা বন্ধ রেখে পুবের জানালা খুলে দিয়েছে মরণের মা। ঘরটা ঝলমল করছে আলোয়।

প্যারাসিটামল তার ক্রিয়া শুরু করেছে। টের পেল সুমন। শরীরটা গরম হচ্ছে। জ্বরের ঘোর ভাবটা পাতলা হচ্ছে।

বাসন্তী এক কাপ চা নিয়ে এল। বলল, শোনো বাবা, এখন ওষুধ খেয়ে তোমার জ্বর নামছে। এখন তোমার মাথাটা তাহলে ধোয়াব না। দুপুরে ফের যখন জ্বর আসবে তখন আর ওষুধটা খেও না। ওই ওষুধ নাকি বেশি খেতে নেই। দুপুরে মাথা ধুইয়ে গা স্পঞ্জ করে দেব।

আপনাকে ভীষণ মুশকিলে ফেললাম।

ছিঃ বাবা। ওরকম কথা বলতে নেই। আমি তোমাকে কখনও দূরের মানুষ ভাবিনি। তুমি কেন ভাববে?

না, আসলে, হঠাৎ কেন জ্বরটা যে হল!

জ্বর হয়েছে তো কী হয়েছে? এটা তোমার নিজেরই বাড়ি।

চা-টা মুখে দিয়ে দেখল সুমন। বিটনুন লেবু চিনি দিয়ে করা। চমৎকার স্বাদ। সবটুকু নিঃশেষে খেয়ে নিল।

গরম রুটি আর তরকারি নিয়ে আসছি।

আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না যে!

বেশি খেও না। একটা বা দুটো, আমার রান্না তোমার পছন্দ হয় তো।

সুমন হেসে ঘাড় কাত করল, হ্যাঁ খুব ভাল।

শুনেছি তুমি ধনেপাতা ভালবাসো। আজ ফুলকপিতে ধনেপাতা আর কড়াইশুটি দিয়েছি। কলকাতায় সারা বছর সব কিছু পাওয়া যায়। গাঁয়ে তো তা নয়। ধনেপাতা এখন বাজারে ওঠে না। তোমার বাবা ভালবাসেন বলে আমি বাগানে ধনেপাতা লাগাই।

আমার কলকাতায় যাওয়ার খুব দরকার।

যাবে, জ্বরটা কমলেই যাবে।

হাঁফাতে হাঁফাতে মরণ এসে বলল, খবর দিয়ে এসেছি মা। ডাক্তার আজ তাড়াতাড়ি আসবে। এলেই পাঠিয়ে দেবে পানুকাকু।

আচ্ছা, এখন দাদার কাছে বসে থাক। বেশি বকবক করবি না। জলপট্টিটা মাঝে মাঝে পালটে দিস। বাটিতে অডিকোলন মেশানো জল আছে। আমার উনুন জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, আপনি আসুন।

এখন তোমার কেমন লাগছে দাদা?

একটু ভাল, প্যারাসিটামল খেয়েছি তো, জ্বর কমে যাচ্ছে। এফেক্ট কেটে গেলে আবার জ্বর আসবে।

সুমনের বালিশের নীচে একটা চিঠি আছে। কালকেই কেউ চিঠিটা তার বিছানায় ফেলে গেছে। যে চিঠি দিয়েছে তাকে চেনে না সুমন। নাম শুভশ্রী। আজকাল গাঁয়ের মেয়েদেরও বেশ সুন্দর সুন্দর নাম রাখার রেওয়াজ হয়েছে। চিঠিটা সংক্ষেপে এরকম : আপনাকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। খুব আলাপ করতে ইচ্ছে হয়, আবার ভয়ও করে। যদি কিছু মনে করেন। আমার বয়স সতেরো। মাধ্যমিক পাস করেছি। একটু গাইতেও পারি। আমার সঙ্গে ভাব করতে রাজি? যদি রাজি থাকেন তাহলে আপনার পুব দিকের জানালায় একটা সাদা রুমাল বেঁধে রাখবেন কাল বিকেলে। প্লিজ, বাঁধবেন কিন্তু।

হ্যাঁ রে, শুভশ্রী বলে কোনও মেয়েকে চিনিস?

শুভশ্রী?

হ্যাঁ।

না তো! মনে পড়ছে না।

ভাল করে ভেবে দেখ।

মরণ ভাবল। মাথা নেড়ে বলল, নামটা শুনিনি তো, কেন দাদা?

এমনিই।

পদবি কী বলো তো!

জানি না।

তাহলে বলতে পারছি না। কেমন দেখতে?

তা কে জানে! শাকচুন্নির মতোই হবে হয় তো।

যাঃ! বলে হেসে ফেলে মরণ, শাকচুন্নি কি দেখতে খারাপ?

না হলে শাকচুন্নি বলবে কেন?

হ্যাঁ দাদা, শাকচুন্নি কাদের বলে? যারা শাক তোলে তাদের?

তাও হতে পারে। এ গাঁয়ের তুই সবাইকে চিনিস?

বাঃ, চিনব না?

এই তো শুভশ্রীকে চিনতে পারলি না!

হয়তো ভাল নামটা জানি না, ডাকনামে ঠিক চিনব।

হুঁ, সেটা একটা কথা বটে।

মাকে জিজ্ঞেস করে আসব?

ভ্যাট। ওসব জিজ্ঞেস করার দরকার নেই।

আচ্ছা।

চল্লিশ

সারা রাত কেউ তার শিয়রের কাছে বসে আছে, মাথায় সুগন্ধী জলপট্টি দিচ্ছে এবং ডেকে তুলে ক্যাপসুল খাওয়াচ্ছে ঘড়ি ধরে, এ জিনিস সুমন কখনও ভাবতে পারে না। তার নিজের মা অন্তত করে না। মাকে দোষ দেওয়া যায় না। মা নানা রকম অসুখ-বিসুখে বারো মাস ভোগে। সুমনেরও তেমন অসুখ-বিসুখ করে না কখনও। কয়েক বছর আগে জলবসন্ত হয়েছিল। তখন একজন আয়া রাখা হয়েছিল তার জন্য।

সুমন অস্বস্তি বোধ করে বলল, আপনি কেন এভাবে আমার কাছে বসে আছেন? আমি তো বেশ আছি।

বাসন্তী বলে, একটু আগেও তোমার জ্বর একশো চারের ওপর ছিল, তা জানো বাবা? আগে রুগি ঘুমোলে ওষুধ খাওয়ানো বারণ ছিল। ঘুমন্ত রুগিকে নাকি ডাকতে নেই। কিন্তু এখনকার ডাক্তাররা তো অন্যরকম। অনল বাগচী বলে গেছে ঠিক ছয় ঘণ্টা পর পর ক্যাপসুল খাওয়াতে। একবারও নাকি বাদ দেওয়া যাবে না।

আচ্ছা, সে না হয় আমিই খেয়ে নেব। আমার তো তেমন ঘুম হচ্ছে না। মাঝে মাঝেই জেগে যাচ্ছি।

তা হয় না বাবা। ও-ঘরে গিয়ে বিছানায় শুলেই কি আর আমার ঘুম হবে? দুশ্চিন্তা রয়েছেনা মাথায়! তোমার মা কাছে থাকলে আরও কত করত! আমি কি আর অত পারি?

সুমন হাল ছেড়ে দিল। এই মহিলার সঙ্গে সে পেরে উঠবে না।

রাত আড়াইটের সময় একবার রসিক উঠে এসেছিল।

ক্যামন বুঝত্যাছ? জ্বরটা কি কমের দিকে?

না। জ্বর তো বাড়ছে দেখছি। জলপট্টি দিয়ে দিয়ে একটু যেন কমছে মনে হচ্ছে। মাথাটা একবার ধুইয়ে দিলে হত।

এই শীতের মইধ্যে? কাল ঠান্ডা পড়ছে, মাথা ধোয়াইলে যদি হিতে বিপরীত হয়?

হবে না। মাথা ধোয়ালে জ্বরটা নামবে।

প্রবল আপত্তি তুলেছিল সুমন, না না, এত রাতে মাথা বোয়ানোর দরকার নেই।

বাসন্তী বারণ শুনল না। বরং সুমনকে এই প্রথম একটা ছোট্ট ধমক দিয়ে বলল, এই ছেলে, একদম চুপ করে থাকবে। লক্ষ্মী ছেলের মতো যা বলছি সব শুনতে হবে। বুঝেছ? তোমার ভালমন্দের দায় এখন আমার।

অগত্যা রসিক বালতি করে জল নিয়ে এল। বাসন্তী অনেকক্ষণ ধরে হিম-ঠান্ডা জলে মাথা ধুইয়ে দিতে লাগল তার। আরামে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সুমন খেয়ালই নেই। মাথা বোয়ানোর সময় হাতপাখা দিয়ে হাপুর-হুপুর মাথায় বাতাস করছিল তার বাবা। যে-বাবাকে কখনও সে ছেলেপুলের সেবা-টেবা করতে দেখেনি।

সুমন ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, হাতপাখার বাতাস কেন? সিলিং পাখা চালিয়ে নিলেই তো হয়।

বাসন্তী মাথা নেড়ে বলল, হয় না। সিলিং পাখার বাতাস বুকে লাগবে। এ সময়ে শুধু মাথায় বাতাস দেওয়ার নিয়ম। চুপ করে শুয়ে থাকো।

মাথা বোয়ানোর পর শুকনো তোয়ালে দিয়ে মাথা মুখ মুছিয়ে বালিশে শুইয়ে থার্মোমিটার দেখে বাসন্তী বলল, তিন ডিগ্রি নেমে গেছে।

মুর্গির স্টু, শিং-মাগুরের সুরুয়া, ফলের রস কোনও আয়োজনই বাকি রাখেনি বাসন্তী।

রসিক একবার ভয় খেয়ে বলল, আরে, তুমি শুরু করছ কী? এত খাইলে পেট ছাইড়া দিব না?

কিচ্ছু হবে না। ডাক্তার বলে গেছে জোর করে খাওয়াতে। নইলে দুর্বল হয়ে পড়বে। আগেকার দিনে খেতে দিত না বলেই রুগি দুর্বল হয়ে পড়ত।

প্রথমে টাইফয়েড বলে সন্দেহ করলেও ব্লাড রিপোর্ট দেখে ডাক্তার অনল বাগচী বলল, ভয়ের কিছু নেই। ভাইরাল ফিবার।

চার দিনের দিন সকালে জ্বর নেমে গেল।

জ্বর যখন নেমে যাচ্ছিল, তখন সুমন খুব অস্থির বোধ করে ঘুম ভেঙে শিয়রে বাসন্তীকে খুঁজেছিল। সে সময়ে বাসন্তী ছিল না। ভারী অসহায় লেগেছিল সুমনের। জলতেষ্টা পাচ্ছিল, মাথাটা কেমন করছিল আর শরীরে যেন হাজার মাইল দৌড়ের পর নিঝুম ক্লান্তি। তার মনে হচ্ছিল সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। চোখ যখন সত্যিই অন্ধকার হয়ে আসছে সে তখন বাচ্চা ছেলের মতো ক্ষীণ কণ্ঠে ডেকে উঠেছিল, মা! মা! কোথায় আপনি?

অত ক্ষীণ কণ্ঠ পাশের ঘর থেকে শোনার কথা নয় বাসন্তীর। তবু শুনতে পেল ঠিকই।

এক ছুটে চলে এল সুমনের কাছে, বাসন্তীর কোলে হাম্মি।

কী হয়েছে বাবা? কী হয়েছে?

শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে! আমি অজ্ঞান হয়ে যাব।

বাসন্তী গায়ে হাত দিয়েই বলল, জ্বর নেমে গেছে যে! ইস্, অত হাই টেম্পারেচার এক লাফে নেমে যাওয়ায় এরকম হচ্ছে। দাঁড়াও বাবা, হট ওয়াটার ব্যাগ দিচ্ছি।

আপনি একটু কাছে থাকুন। আমার ভীষণ অস্থির করছে।

হ্যাঁ বাবা, আমি তো কাছেই আছি।

হট ওয়াটার ব্যাগ, পাখার বাতাস আরও কীসব করল বাসন্তী কে জানে। কয়েক মিনিট বাদে অস্থিরতা কমে গেল সুমনের। শরীর এত দুর্বল যে চোখ খুলতে পর্যন্ত পরিশ্রম হচ্ছে। সে শুনেছে খুব বেশি টেম্পারেচার হঠাৎ নেমে এলে রুগি হার্টফেলও করে অনেক সময়ে। অন্তত আগের দিনে করত।

বাসন্তীর দিকে কৃতজ্ঞ চোখে একবার চেয়ে সে গভীর ক্লান্তিতে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে চোখ চেয়ে দেখল, পুবের রোদে ভেসে যাচ্ছে ঘর। চারদিক আলোয় ঝলমল করছে। তার চেয়ে বেশি ঝলমল করছে তার শিয়রে বসে থাকা বাসন্তীর মুখ।

কেমন লাগছে বাবা?

আমার জ্বর বোধহয় রেমিশন হয়ে গেছে, না?

হ্যাঁ বাবা। জ্বর নেই, গা একদম ঠান্ডা।

সুমন লজ্জার হাসি হেসে বলল, আপনাকে খুব জ্বালিয়েছি।

ওটুকু যে দরকার ছিল বাবা। না জ্বালালে কি মাকে চেনা যায়?

সুমন চুপ করে রইল। নিজের মাকে সে ভীষণ ভালবাসে। তেমন সে আর কাউকেই কখনও ভালবাসতে পারবে না। ঠিক কথা। তবু এই অদ্ভুত ভদ্রমহিলা সেই ভালবাসায় অনেকটা ভাগ বসিয়েছেন। একে তার মা বলেই ভাবতে ইচ্ছে করছে। এমনকী তার কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে একটু যেন কষ্টই হচ্ছে।

আমি একটু রোদে বসব!

বসবে বইকী বাবা, দাঁড়াও, জানালার ধারে ইজিচেয়ার পেতে দিচ্ছি।

না না, ঘরে নয়। উঠোনে গিয়ে বসব।

ওমা! এই দুর্বল শরীরে সিঁড়ি ভাঙতে পারবে নাকি? মাথাটাথা ঘুরে যায় যদি?

পারব। ধরে ধরে নামলেই হবে।

আচ্ছা, তোমার বাবা বরং ধরে ধরে নামিয়ে নেবে।

শরীর যে কতটা দুর্বল তা সিঁড়ি ভেঙে নামবার সময় টের পাচ্ছিল সুমন। তার বাবা শক্তিমান মানুষ। শক্ত কেঠো হাতে ধরে সাবধানে নামাতে নামাতে বলছিল, পাতলা হইয়া গেছস, এক্কেরে পাতলা হইয়া গেছস!

উঠোনে খাটিয়া পেতে, তোশক বালিশ দিয়ে একেবারে রাজশয্যা রচনা করে রেখেছে বাসন্তী। শরীরটা রোদে আর মাথাটা যাতে ছায়ায় থাকে তারও ব্যবস্থা করেছে। সে শুতেই গলা পর্যন্ত একটা পাতলা কম্বলে ঢেকে দিয়ে বাসন্তী বলল, উত্তুরে বাতাস দিচ্ছে, হুট করে দুর্বল শরীরে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। কিছুক্ষণ গায়ে ঢাকাটা থাক। শরীর গরম হলে ঢাকাটা সরিয়ে দিও।

চার দিন পর ঘর থেকে বেরিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল সুমন। উলটো দিকেই উঠোনের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড ঝুপসি নিমগাছ। তাতে সকালে রাজ্যের পাখিদের ডাকাডাকি। এখনও ফটকের পাশে শিউলি গাছটায় ঝেঁপে ফুল আসে। তলাকার ঘাসজমিতে সাদা-কমলা ফুলের যেন একখানা কার্পেট বিছানো রয়েছে। গোটা কুড়ি-পঁচিশ নারকোল গাছ উত্তুরে হাওয়ার ঝাপটা লেগে সাঁই সাঁই শব্দ তুলছে। মুনিশরা খাচ্ছে বারান্দায় বসে। পান্তা আর বাসি তরকারি, তেঁতুল আর লঙ্কা দিয়ে। উঠোনে নেচে বেড়াচ্ছে চড়ুই, শালিক। এই সামান্য দৃশ্যই যেন চোখ ভরিয়ে দিল সুমনের।

সোয়েটার আর কানঢাকা টুপিতে ঝুব্বুস হাম্মিকে উঠোনে ছেড়ে দিল মুক্তা। হাম্মি হামা দিয়ে সোজা এসে সুমনের খাটিয়া ধরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুমনের দিকে। তারপর হাত বাড়িয়ে 'যা যা যা যা' করে কী যেন বলার চেষ্টা করতে লাগল।

দুহাতে হাম্মির মুখটা ধরে আদর করল সুমন। কদিনেই বোনটা তার ভারী ন্যাওটা হয়েছে। ইদানীং মায়ের কোল থেকেও ঝাঁপ খেয়ে তার কোলে চলে আসে। ওর গায়ে মুখে আশ্চর্য শৈশবের স্বর্গীয় গন্ধ! কী নরম তুলতুলে শরীর। তারা দুই ভাইবোন কাছাকাছি বয়সের বলে বড় হয়ে সুমন চটকানোর মতো কোনও শিশুকে পায়নি। এখন হাম্মির জন্য আর একটা মায়া তৈরি হয়ে রইল এখানে।

মায়া আর একটাও আছে। সে হল পান্না। জ্বরের ঘোরের মধ্যেও পান্নার মুখ বারবার হানা দিয়েছে মনের মধ্যে। এই সকালের বাতাসেও তো তার দেহস্পর্শ! ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

রান্নাঘরে খদ্দরের চাদরে মুড়িসুড়ি দিয়ে উনুনের ধারে বসে দুধ-চা খাচ্ছিল জিজিবুড়ি।

গজগজ করতে করতে বলল, আদিখ্যেতা দেখালি বটে বাবা! বলি গু মুতও কাচলি নাকি ওই ধেড়ে ছেলের।

বাসন্তীর মনটা বড় ভাল আছে কদিন। কান ভরে সুমনের গালভরা মা ডাক শুনেছে। বুক ঠান্ডা। বলল, দরকার হলে কাচতাম। দরকার পড়েনি তাই।

ওঃ, একেবারে নবদ্বীপের গোঁসাই এয়েছেন যেন। একটু গা গরম হয়েছে কি হয়নি অমনই একেবারে অনল ডাক্তার এসে হাজির। অমন ভালুক জ্বর তো আমাদেরও কতই হয় বাপু, কোথায় ডাক্তার, কোথায় বদ্যি! কাঁথামুড়ি দিয়ে পড়ে থাকলেই হয়।

খর চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বাসন্তী বলল, থলিতে বিষ জমেছে, না মা? রোজ এসে এই সকালবেলাটায় তুমি আমার মেজাজ বিগড়ে দিয়ে যাও।

তা বাছা, ভাল কথা বললে বাঁকা করে ধরিস কেন? সংসারের তো একটা রীতি আছে, নাকি? সতীনপো হল সতীনপো, সাপের বাচ্চা, যতই দুধ কলা দিয়ে পুষিস না কেন, ছোবল দিতে ছাড়বে ভেবেছিস?

সে যদি দেয় তো দেবে। কপালে যা আছে তা কি খণ্ডানো যায়? গাল ভরে মা বলে তো ডেকেছে। সে-ই আমার ঢের।

তবে আর কী, পিটুলিগোলা খেয়ে দুধ খেয়েছি বলে নেত্য করগে। বলি দিনরাত অত লোক-দেখানো সেবা দেওয়ার কী দরকারটা ছিল? ঠান্ডা লেগে একটু গা গরম হয়েছে বৈ তো নয়। তোর মতো হ্যাবাকান্ত দেখিনি বাপু। অমন ভালমানুষি করলে দুনিয়ার সবাই তোর মাথায় হাত বুলিয়ে নেবে। এখন থেকে শক্ত হ।

তোমাকে আর হিতোপদেশ দিতে হবে না মা। আমি যা ভাল বুঝেছি করেছি।

গেলাসটা বাড়িয়ে জিজিবুড়ি বলল, দে তো গরম দুধে একটু লিকার ফেলে। যা ঠান্ডা পড়েছে, তেমন জুত হচ্ছে না যেন।

গরম দুধের হাঁড়ি থেকে হাতা দিয়ে গেলাসে দুধ দিতে দিতে বাসন্তী বলে, আফিং-এর মাত্রা বাড়িয়েছ নাকি?

না বাড়িয়ে উপায় আছে? পেটটা ছেড়ে দিচ্ছে যে মাঝে মাঝে। এত আফিমের জোগানই বা আসবে কোত্থেকে।

তোমাকে আফিং ধরিয়েছিল কে?

কে আবার ধরাবে। নন্দ কোবরেজই ধরিয়েছিল। একটা সময়ে পেটের এমন ব্যামো হয়েছিল যে ওষুধে ধরে না। বোতল বোতল পাঁচন খেয়ে নলি-খলি পায়খানা। তা নন্দ কোবরেজ তখন আফিং ঠুসে দিয়ে বলল, এ হল মোক্ষম দাওয়াই। তখন কি আর জানতুম শেষে একটু আফিং-এর জন্য এমন হেদিয়ে মরতে হবে! সে আমলে কি আর চিকিৎসা ছিল মা?

দুধটুকু খেয়ে জিজিবুড়ি উঠল। বলল, ছেলে এসে সব দেখে-টেখে গেল। এবার মেয়ে আসবে। তারপর বড়বউ এসে হাজির হবে। তখন কী করবি ভেবে রেখেছিস?

অবাক হয়ে বাসন্তী বলল, ভাবাভাবির কী আছে? এলে আসবে। তারা তো আর ফ্যালনা নয়।

তারা ফ্যালনা নয় সে জানি। কিন্তু ফ্যালনা যে তুই।

তার মানে?

ভগবান তো তোকে বুদ্ধি-সুদ্ধি দেননি, তাই বোকার মতো বলিস। বলি বড়বউ যদি এসে গেড়ে বসে আর তোকে দাসীবাঁদীর মতো খাটায় তাহলে তোর দশা কী হবে জানিস?

দাসীবাঁদীর মতো খাটাবে!

তুই তো দাসীবাঁদী হওয়ার জন্য মুখিয়ে আছিস। ছেলের জন্য যা করলি তা তো দেখলুম। বড়গিন্নি এলে তো তোর আঁচলে পা মুছবে। এখন থেকে একটু মাথা খাটিয়ে চল। ওরা সব বাঙাল দেশের মানুষ, তুই ডালে ডালে চলিস তো ওরা চলে পাতায় পাতায়। তোর অত আদিখ্যেতার দরকার কী? নিজেরটা নিয়ে থাকবি। পারিস তো জমিজমা কিছু আমার বা ভাইদের নামে বেনামী করে দে। তাহলে আর গাপ করতে পারবে না।

বেনামী করব? কেন বলো তো!

তুই যা বোকা, কোথায় কোন কাগজে সইসাবুদ করিয়ে নেবে তার ঠিক কী? আমাদের নামে থাকলে তোরই থাকল, ওরাও দাঁত বসাতে পারবে না।

বাসন্তী গম্ভীর হয়ে বলল, তাই বুঝি তোমাদের নামে লিখে দিতে হবে! বেশ বললে তো মা, পালিশ করা কথা।

ভাল কথা তো আজকাল তোর সয় না। তোকে যে গুণ করে রেখেছে। যখন সব যাবে তখন এ কথার মর্ম বুঝবি।

মর্ম বুঝে আর কাজ নেই মা। তোমার ছেলেরা যে সাঁট করে তোমাকে পাঠায় সে আমি জানি। বলি আমার ভালটা তোমার কাছে এমন বিষ হয়ে গেল কেন বলো তো! আমাকে কি পেটে ধরোনি, নাকি?

খারাপ বলেছি কিছু? সবটা তো আর দিতে বলিনি। বললুম, অদিনের জন্য কিছু জমিজমা বেনামী করে রাখ, বিষয়ী লোকেরা তো তাই করে।

আমার আর বিষয়ী হয়ে কাজ নেই। তুমি এবার এসো গিয়ে।

যাচ্ছি বাছা যাচ্ছি, তাড়াতে পারলে যেন বাঁচিস। একটু উঁকি মেরে দেখ, বাঙাল আবার এধারে আছে কিনা, দেখলে তো তার আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়বে।

সে এখন কাককে রুটি খাওয়াচ্ছে।

জিজিবুড়ি বিদেয় হওয়ার পর বাসন্তী হাঁফ ছাড়ল। রোজ সকালে মা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ যেন একটা ভয় ঘিরে থাকে তাকে। পৃথিবীকে সে যখন নিজের মতো করে বুঝে নিতে চায় তখনই জিজিবুড়ি এসে তাকে উলটো কথা শেখায়।

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে এক চিলতে একটা গলি। কচুপাতার আড়াল দিয়ে জিজিবুড়ি বেরিয়ে এসে পিছন দিয়ে মরণের পড়ার ঘরে উঁকি দিল।

মরণ এক রাগী মাস্টারের কাছে পড়ে আজকাল।

ও মরণ।

মরণ অঙ্ক কষতে কষতে মুখ তুলে বলল, কী বলছ?

বলি সব ঠিক আছে তো!

হ্যাঁ।

কখন দিবি দাদা?

তুমি যাও না, আমি ঠিক দিয়ে আসব।

বাঁচালি দাদা। জিনিসটা এসেছে তো!

তা জানি না। খুঁজে দেখবখন।

কেউ যেন টের না পায়।

তুমি যাও না, কেউ টের পাবে না।

জিজিবুড়ি জানালা থেকে অদৃশ্য হল।

বুড়ো-বুড়িদের প্রতি এক ধরনের মায়া আছে মরণের। বুড়ো-বুড়িদের কাছে গল্পের ঝুলি থাকে। কাছে বসলেই কত কথা শোনা যায়। জিজিবুড়িকে সবাই হ্যাক-ছিঃ করে বটে, কিন্তু মানুষটাকে মরণ তেমন অপছন্দ করতে পারে না। তার অসুখ-বিসুখ হলে জিজিবুড়ি হামলে এসে পড়ে। মায়ের সঙ্গে যখন ঝগড়া করে দু-চারদিন আর এমুখো হয় না তখনও মাঠেঘাটে যেখানে তোক জিজিবুড়ি গিয়ে তার খোঁজখবর নেয়।

কয়েকদিন আগে জিজিবুড়ি ভারী কাঁচুমাচু হয়ে এসে তাকে ধরে পড়েছিল। ও দাদা মরণ, আমাকে বাঁচাবি ভাই?

কেন, তোমার আবার কী হল?

আফিং ছাড়া যে আর বাঁচি না দাদা। আর দু-চারদিন হয়তো চলবে। তারপর আফিং না জুটলে যে পেট ছেড়ে দেবে দাদা। আর বাঁচার উপায় নেই।

আফিং! কিন্তু আমি আফিং কোথায় পাব?

সে কথাই তো বলতে আসা। তোর মা তোর বাপকে কলকাতা যাওয়ার সময় একটা ফর্দ ধরিয়ে দেয় ফি হপ্তায়। তাতে একটু লিখে দিবি আফিং-এর কথা?

মাকে বলো না লিখে দিতে।

সে লিখবে না দাদা, আমাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। তুই একটু চুরি করে লিখে দে।

বাবা টের পেলে পিঠের ছাল তুলে ফেলবে।

তোর মাকে আমি বুঝিয়ে বলে রাখবখন। সে যদি বলে সে-ই লিখেছে তাহলে বাঙাল মোটেই রাগ করবে না। লিখবি ভাই? প্রাণটা তাহলে আমার বাঁচে।

না জিজিবুড়ি, মা ভীষণ বকবে।

বকলে আমাকে বকবে, তোকে তো আর নয়। আমি তোর মাকে বুঝিয়ে বলবখন।

কাজটা খুব কঠিন ছিল না। মা ফর্দ করে টেবিলের ওপর পাউডারের কৌটো চাপা দিয়ে রাখে। ফর্দের শেষে মায়ের হাতের লেখা নকল করে মরণ লিখে দিয়েছিল, আফিং—দুই ভরি।

বাবা ফর্দমতো জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। শোয়ার ঘরে ব্যাগ ভর্তি জিনিস রাখা আছে। কিন্তু সেই গন্ধমাদন হাঁটকানোর সময় বা ইচ্ছে হয়নি মরণের। মা ঠিক বের করে দেবে।

মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার পর বইপত্র গুছিয়ে রাখছিল মরণ। বাবা যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ সে লক্ষ্মী ছেলে। নইলে এতক্ষণে দুই লম্ফে কাঁহা কাঁহা মুলুক চলে যেত!

বইপত্র গুছিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়েই থমকে গেল মরণ। তার বাবা কাককে রুটি খাইয়ে ফিরছে। ঠিক সেই সময়ে দাদাকে ফলের রস দিতে উঠোনে বেরিয়ে এসেছে মা।

বাবা হঠাৎ তার মায়ের দিকে চেয়ে বলল, আগো, আফিং কার লিগ্যা আনতে দিছিলা? ঠাইরেনের লিগ্যা নাকি?

মরণ শিউরে উঠে ঘরের মধ্যে ফের সেঁদিয়ে এল।

বাসন্তী অবাক হয়ে বলে, আফিং! আফিং-এর কথা আবার তোমাকে কখন বললাম?

মনে নাই? তাজ্জব মাইয়ালোক! ফর্দের মইধ্যেই তো লেখা আছিল, আফিং দুই ভরি।

ও মা গো! দেখি ফর্দটা!

ব্যাগের মইধ্যেই আছে। ক্যান, তুমি লেখ নাই?

হঠাৎ বোধহয় বাসন্তীর কাণ্ডজ্ঞান মাথাচাড়া দিল। সুমনের হাতে রসের গেলাসটা দিয়ে বলল, দাঁড়াও ভেবে দেখি। এই ছেলের অসুখ নিয়ে আমার মাথা এত গরম যে কিছু মনে থাকছে না।

তাই কও। আমি তো ভাবলাম ভূতে লেখল নাকি। যাউক গা, আফিং আনছি। ঠাইরেনরে পাঠাইয়া দিও।

ঠিক আছে।

মরণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঠিক সময়ে মা ব্রেক না কষলে তার কপালে বিস্তর দুঃখ ছিল। জিজিবুড়িটা মহা পাজি। মাকে বলে রাখার কথা ছিল, কিন্তু রাখেনি।

মায়ের বকাঝকা বা মারধর তেমন গ্রাহ্য করে না মরণ। মায়ের হাতে মোটেই জোর নেই, মারলে লাগেও না। আর বকুনি তো অহরহ হচ্ছে, নতুন কিছু নয়।

সে গিয়ে চুপ করে দাদার কাছটিতে বসল।

সুমন মুখটা করুণ করে বলল, খুব রোগা হয়ে গেছি, না রে?

না তো! একটু ফর্সা দেখাচ্ছে।

ফর্সা নয়, ফ্যাকাশে। খুব দুর্বল।

আমারও খুব জ্বর হয়। আর পেট ছাড়ে।

বলে হি-হি করে হাসল মরণ।

একচল্লিশ

ন্যাড়ামাথা ব্রাহ্মণটি ধীরে ধীরে উঠে আসছেন। সর্ব অঙ্গে ব্রহ্মচর্যের দীপ্তি। অঙ্গজ্যোতিতে চারদিক রাঙা হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। চারদিকে তার অভ্যর্থনা। পাখি ডাকে, গাছপালাতেও নীরব কোলাহল ওঠে যেন। মাটি থেকে আকাশের মধ্যবর্তী যা-কিছু সকলকেই যেন স্পর্শ করে সেই আলোর শিহরন।

সূর্যকে কেন ব্রাহ্মণ বলে মনে হয় বলাকার কে জানে। রোজ সকালে সে গৌরহরির পাশে দাঁড়িয়ে সূর্যকে প্রণাম করত। আজও করে। এক দীপ্ত ব্রাহ্মণকেই যেন নিবেদিত হয় সেই প্রণাম। পুবের জানালায় দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ সম্মোহিত চোখে চেয়ে থাকে মুণ্ডিত মস্তকটির দিকে। এই সময়টায় বড় পবিত্র মনে হয় নিজেকে। তারও হয়তো তেমন কোনও কারণ নেই। হয়তো সবই কল্পনা করে নেওয়া, ধরে নেওয়া। তা হোক, তবু এইটুকুই তার লাভ।

আজকাল বলাকার নানা প্রশ্ন ওঠে মনের মধ্যে। তার মধ্যে একটা হল ভগবান। ভগবান বলে কেউ কি আছে? থাকলে কেমন দেখতে? ভগবানকে দিয়ে কী হয় মানুষের? কত মানুষ তো ভগবান-টগবান না মেনেও দিব্যি হেসেখেলে বেড়াচ্ছে। তাহলে কি সকলের ভগবান দরকার হয় না? না মানলেও চলে?

গৌরহরি সন্ধ্যাআহ্নিক নিয়মিত করত। কখনও ভুল হত না। প্রায় সময়েই গীতা খুলে বসত। গুরুগম্ভীর গলা আর চমৎকার উচ্চারণে একটু সুরের ওপর যখন পাঠ করত তখন যেন বাড়িটায় একটা ঢেউ খেলে যেত।

একবার এক ঘোর নাস্তিক মক্কেল গৌরহরিকে প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা চাটুজ্জেমশাই, আপনি তো একজন শক্ত মনের মানুষ, প্রবল আপনার পারসোনালিটি, টাকাপয়সা, স্বাস্থ্য, সম্পদ সব আপনার আছে। তার ওপর আবার ঈশ্বরবিশ্বাসের দরকার কী? ঈশ্বরবিশ্বাস তো ধান্দাবাজি। ভগবানকে পটিয়ে-পাটিয়ে নিজেরটা গুছিয়ে নেওয়ার জন্য মতলববাজরা ওসব করে।

গৌরহরি বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে মিটিমিটি হেসে বলেছিল, ওরে বাবা, নাস্তিক হওয়া যে খুব কঠিন কাজ।

কেন মশাই, কঠিনটা কীসের? বিশ্বাস না করলেই হয়।

সে তোমার মতো মুখ্যুর হয়। ভাল নাস্তিক হতে গেলে মহাজ্ঞানী হওয়া লাগে। বিজ্ঞান, দর্শন, শাস্ত্র, তপস্যা সব গুলে না খেলে কি নাস্তিক্য দাঁড়ায়? সবটা জেনে বুঝে তবে বুক ফুলিয়ে বলতে পারা যায়, ওহে বাপু, আমি সাধনা-টাধনা সব করে দেখেছি, কিচ্ছু নেই। বুঝলে মক্কেল, নাস্তিক হওয়া বিস্তর ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। তার চেয়ে আস্তিক হওয়া সোজা।

আপনি কি সেই জন্যই আস্তিক?

সেই মিটিমিটি হাসি হেসেই গৌরহরি বলল, আমি কেন আস্তিক তা আমি জানি। কিন্তু বাপু, তুমি কেন নাস্তিক তা কি তুমি জানো? ভগবান আছে, এ বিশ্বাস যদি হাইপথেটিক্যাল হয় তাহলে ভগবান নেই, এই বিশ্বাসও হাইপথেটিক্যাল। সুতরাং লড়াই ছেড়ে মামলার কথায় এসো, তাতে সময় কম নষ্ট হবে।

মক্কেল চুপসে গিয়েছিল।

কিন্তু আজকাল বলাকারও ওরকম সব বিপজ্জনক কথা মাথায় আসে। গৌরহরি কাছে থাকতে এসব প্রশ্ন মনে উদয় হত না। আজকাল হয়। একদিন তো স্বপ্ন দেখল, গৌরহরি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হাতে দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

হ্যাঁ গা তুমি নাকি নারায়ণ! ও মা! টের পাইনি তো কোনওদিন।

গৌরহরি মিটিমিটি হেসে বলল, টের পাবে কী করে? কাছে পেলে কি আর টের পাওয়া যায়? যদি পাওয়ার জন্য কষ্ট করতে হত তাহলে ঠিক টের পেতে!

তা এখন কী করব তোমাকে? পুজো করব?

ভালবেসো, তাতেই হবে।

ভালবাসার কথা আর বোলো না। ভালবেসেই তো মরেছি। তুমিও গেলে আর আমারও যেন অর্ধেক প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। আরও ভাল কী করে বাসা যায় বল তো?

তা বটে। তোমার আমার ভালবাসার কথা সবাই বলে। কত কষ্ট দিয়েছি তোমাকে, কোনওদিন রাগ করলে না আমার ওপর।

কষ্ট! কষ্ট বলে বুঝতেই পারলুম না তো কখনও। তোমার মুখখানা খুশি দেখলেই বুক ভরে যেত। আর তুমিও কি কম কষ্ট করেছ আমার জন্য? সেই টাইফয়েডের কথা মনে নেই? তখন আমার এগারো-বারো বছর বয়স। শ্বশুর-শাশুড়ি দেওর-ননদ সব দল বেঁধে তীর্থ করতে গেছে। ফাঁকা বাড়িতে রুগি আগলে শুধু তুমি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাস্ত হচ্ছে, এলিয়ে পড়ছি, তখন কম করেছ তুমি? কোলে করে পায়খানায় নিয়ে গেছ। পথ্যি বেঁধে খাইয়েছ। মাথার কাছে ঠিক বাবার মতো বসে থেকেছ দিন রাত।

ও কিছু নয়। আমি ছাড়া তোমাকে দেখার তো কেউ ছিল না।

অন্য কেউ হলে বউকে তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিত, নইলে শাশুড়িকে এনে সেবার কাজে বহাল করত। তাই তো নিয়ম। পুরুষেরা তো ওরকমই হয়। তুমি তো তা করোনি। হ্যাঁ গা, কেন করেছিলে আমার জন্য অত কষ্ট?

দুর! আমার তো কষ্ট বলে মনেই হয়নি।

আমার খুব ইচ্ছে হয় ফের সেই সময়টায় ফিরে যাই। ফের আমার টাইফয়েড হোক আর শিয়রে তোমার মুখখানা জ্বলজ্বল করুক। জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে চেয়ে তখন তোমাকে দেখতুম, আর ভারী নিশ্চিন্ত লাগত। তখন তো আমার একটুখানি বয়স, গা থেকে বাপের বাড়ির গন্ধ যায়নি, তবু মা নয়, বাবা নয়, তখন দিনরাত শুধু তোমাকেই চাইতুম।

মিটিমিটি হাসছিল গৌরহরি, বলাই, তুমি নাকি সহমরণে যেতে চেয়েছিলে আমার সঙ্গে!

চেয়েছিলুম তো। মনেপ্রাণে চেয়েছিলুম।

কেন বলাই, আমার সঙ্গে মরতে চেয়েছিলে কেন?

এখনই কি বেঁচে আছি! কবে মরব, কবে তোমার কাছে যাব শুধু সে কথাই ভাবি।

মরার কথা ভাবতে নেই বলাই। ভগবানের দেওয়া জীবন, তাঁর কাজ করতেই তো আমরা আসি।

আমার ভগবানও যেন তোমার সঙ্গেই ছেড়ে গেছে আমাকে। মাঝে মাঝে ভাবি, বোধহয় আমার ভগবান তোমার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল। তাই কি আজ অমন নারায়ণের মতো দেখছি তোমাকে! হ্যাঁ গা, সত্যি তুমি ভগবান?

এক হিসেবে আমরা সবাই ভগবান। কম বেশি। তুমি তো দেখতে পাও না, তোমার মধ্যে আমি কতবার ভগবতীকে দেখেছি।

যাঃ, কী যে বলো। আমি পাপিষ্ঠা মেয়েমানুষ।

যার অত স্বামীর ওপর টান, পাপ তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না যে। বলাই, তুমি জানো না, বেঁচে থাকতে তোমাকে আমার কতবার প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়েছে।

ও মা গো! ওসব কথা বলতে আছে? আমার পাপ হয় না ওতে?

তখন আমার মক্কেল জুটত না। কোর্টে যাই আসি, দু-চার টাকার বেশি আয় হত না দিনে। আমার বোন পুঁটির বিয়ে ঠিক হল। বাবা আমার কাছে দশ হাজার টাকা চেয়েছিল। মনে আছে?

থাকবে না কেন?

মুখ শুকনো করে বসেছিলুম একদিন, তুমি তোমার সব গয়না বের করে দিয়েছিলে। সিনেমায় ওসব দেখা যায় বা শরৎচন্দ্রের নবেলে। বাস্তবে তো হয় না। সেদিন তোমাকে আমার প্রথম প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়েছিল।

আহা, ভারী তো গয়না। তার দশগুণ তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছ। সেই গয়নাই বা কোন কাজে লাগল বলো! দু হাতে বিলিয়ে দিলুম তো। ওসব বলে আর আমার পাপের বোঝা বাড়িও না।

শুধু গয়নাই তো নয় বলাই, সে সময়ে তোমার মুখে যে অহংকার দেখেছি তার দাম দিই কী করে? স্বামীর গর্বে তোমার বুকখানা তখন ঝকঝক করছে, মুখে উপচে পড়ছে খুশি। অবাক হয়ে ভেবেছি সব গয়না দিয়ে দিচ্ছে, তবু ও এত খুশি কেন? এত আনন্দ কেন ওর চোখে মুখে? ভেবে কূল পাইনি। তখন কী করেছিলুম মনে আছে?

উঃ মা গো! ফের লজ্জা দিচ্ছ আমায়।

মনে নেই?

কেন থাকবে না? ভাবলে আজও শরীর শিউরে ওঠে। বুকে জড়িয়ে ধরে—ইস—

কতক্ষণ ধরে যে আদর করেছিলুম তোমায়। আদর যেন আর ফুরোয় না। আর সেই আদরের ভিতর দিয়েই বুঝি পারুল এল তোমার পেটে। তাই ভারী সুন্দর হল মেয়েটা।

হ্যাঁ গো, ঠিক তাই।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সূর্য প্রণামের পর নিঝুম হয়ে বলাকা প্রত্যক্ষ করছিল এইসব দৃশ্য। গায়ে শীতের কাঁটার মতো রোমাঞ্চ। মানুষটা নেই, না থেকেও কী ভীষণ জীবন্ত হয়ে আছে।

মা!

বলাকা ফিরে তাকায়।

ও মা, তোমার চোখে জল কেন? কাঁদছিলে নাকি?

লজ্জা পেয়ে বলাকা আঁচলে চোখ মুছে একটু হেসে বলে, দুঃখের কান্না নয় রে, পুরনো কথা মাঝে মাঝে বড্ড মনে পড়ে যায় তো।

পারুল হেসে বলে, মাঝে মাঝে নয় মা, তুমি এখনও পুরনো কালেই রয়েছ যে! তোমাকে আর আমাদের এই সময়ে টেনে আনতে পারলাম কই!

পুরনো নতুন কোনওটাকে বাদ দিয়ে কি এই বেঁচে থাকা! জীবনটা তো কোনওটাকে বাদ দিয়ে নয়। যে ভুলে যায় সে অভাগা। হ্যাঁ রে, কাল রাত থেকে তো তোর উপোস চলছে। এভাবে কি চলে?

কী করব বলো! খাওয়ার কথা ভাবতেই যে অরুচি। খাবারের গন্ধে পা গুলোয়।

এ সময়টায় অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে ইচ্ছে যায়। তা অখাদ্যই বা কী দি-ই তোকে। চালভাজা খাবি?

ম্যা গো।

রোজ রাতে বমি হচ্ছে, এসব তো ভাল নয়। চেহারাটা তো সিঁটকে মেরে গেছে। অমন রূপ যেন কালিঢালা।

জামশেদপুরে গেলে হয়তো এটা কেটে যাবে। তোমার জামাই তো কাল আসছে নিয়ে যেতে। তোমার মন খারাপ হচ্ছে না মা?

ওমা! তা আর হবে না। কটা দিন কাছে ছিলি, ভরে ছিলুম।

মোটেই তোমার মন খারাপ হচ্ছে না।

তাই বুঝি?

একাই তুমি ভাল থাকো, আমি জানি।

খুব বুঝেছ মা! একা যেন তোকে থাকতে না হয়, থাকলে বুঝতিস।

তাহলে চলো না আমাদের সঙ্গে। তোমার জামাই ভাল গাড়ি নিয়ে আসছে। দামি এ সি গাড়ি। ঝাঁকুনি-টাকুনি লাগবে না। বাড়ির দরজায় চাপবে, একদম জামশেদপুরের বাড়িতে গিয়ে নামবে।

প্রস্তাব তো আর খারাপ নয়। কিন্তু তোর বাবা যে-গন্ধমাদন আমার মাথায় চাপিয়ে গেছে তা কি আর ঝেড়ে ফেলে যেতে পারি। বিষয়- আশয় দিয়ে বেঁধে রেখে গেছে। কিন্তু এসব খেলনাপাতি কি আর ভাল লাগে বল!

পারুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মাকে আর নড়ানো যাবে না এখান থেকে, সে জানে। বিষয়-আশয় নয়, এখানে তার বাবার স্পর্শ আর গন্ধ আজও পায় তার মা। লোকটা বেঁচে নেই, তবু কী ভীষণ বেঁচে আছে।

শাঁকালু নেই মা?

বাগানে আছে বোধহয়। কেন, খাবি?

চেষ্টা করে দেখতে পারি।

দাঁড়া, দুখুরিকে বলি, এনে দেবে।

বেলার দিকে ভটভটি চেপে বিজু যখন এল, তখন নীচের বড় ঘরের চওড়া বারান্দায় রোদে বসে শাঁকালু চিবোচ্ছে পারুল। মুখ বেঁকিয়ে বলল, কী খাচ্ছ? শাঁকালু! দুর, ও কি মানুষে খায়?

পারুল হেসে বলল, তবে কি গোরুতে খায়?

তোমার কী হয়েছে বলো তো, ফের ডায়েটিং করছ নাকি? অমন ডিহাইড্রেটেড চেহারা করেছ কেন?

ছোট ভাই, তাকে তো আর বলা যায় না কিছু। পারুল বলল, রোগা হওয়া কি খারাপ?

তা বলে এত রোগা! বাঁশপাতার মতো হয়ে যাচ্ছ যে!

মোটরবাইকটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে সিঁড়িতে এসে বসল বিজু।

তোর প্র্যাকটিস এখন কেমন রে?

খারাপ নয়। তবে সেটা আমার গুণে তো নয়।

তবে কার গুণে?

জ্যাঠামশাই আমাকে ল পড়তে বলেছিলেন। পাস করার পর জুনিয়র করে নেন। তাঁর মক্কেলগুলোই পেয়ে গেছি। বেশি কষ্ট করতে হয়নি।

তোকে দেখে তো ফচ্‌কে ছোঁড়া মনে হয়। মক্কেলরা তোকে বিশ্বাস করে?

যখন উকিলের ধরাচুড়ো পরে বেরোই তখন তো দেখনি। রীতিমতো গুরুগম্ভীর চেহারা তখন। জজরা পর্যন্ত সমীহ করে।

ইস রে! একদিন দেখাস তো পোশাক পরে। দেখব কেমন গুরুগম্ভীর।

এখন তো কোর্ট বন্ধ। পুজোর ছুটি ফুরোয়নি। না হলে দেখাতাম।

বিটনুনের টাকনা দিয়ে একটা-দুটো শাঁকালুর টুকরো খেতেও যেন কত পরিশ্রম হচ্ছে পারুলের। পেটের নতুন অতিথির সঙ্গে মনে মনে অনেক ঝগড়া করে পারুল। কেন রে দুষ্টু, মাকে এত কষ্ট দিস? লক্ষ্মী ছেলের মতো থাক না চুপটি করে।

আবার ভাবে, এই কষ্টটুকুর মধ্যেও তো সুখ আছে। একটা শরীরের মধ্যে আর একটা শরীর জন্মাচ্ছে, বাড়ছে, সোজা কথা? এই আশ্চর্য ঘটনা তো সাদামাটাভাবে ঘটা উচিত নয়। যে আসছে সে জানান দিচ্ছে, করাঘাত করছে দরজায়।

কাল রাতে অমলদাকে দেখলাম, বুঝলে পারুলদি?

অবাক হয়ে পারুল বলে, অমলদা! আবার এসেছে বুঝি?

হ্যাঁ। বেশ রোগা হয়ে গেছে। মাধবের ওষুধের দোকানে দেখা। প্রথমটায় আমাকে চিনতেই পারল না, কেমন ভ্যাবলার মতো চেয়ে রইল। কী যে হয়েছে লোকটার কে জানে!

পারুল বলল, বোধহয় বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া।

তাই হবে হয়তো। আমার কী মনে হয় জানো?

কী?

লোকটা দুম করে মরে-টরে না যায়। সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি বলেই কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

চমকে উঠে পারুল বলে, ওমা! সে কী রে?

কাল কথা বলতে বলতে অনেকক্ষণ হাঁটলাম একসঙ্গে। কী বলছিল জানো?

কী?

বলল, আমি কেন এসেছি জানো? নিজেকে খুঁজতে। এই যে এইসব মাঠঘাট, এই যে গাছপালা, এর মধ্যেই আমি যেন ছড়িয়ে রয়েছি। বুঝলে, সময় বলে কিছু নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছু ঘটে আছে। একদিন

ঠিক আমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে। শুনে তো আমি হাঁ। লোকটা কি শেষে পেগলে গেল নাকি পারুলদি?

পারুল স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, এরকম অবস্থা হয়েছে বুঝি? জানতাম না তো?

আমাকে পেয়ে আর ছাড়তেই চায় না। হেঁটে হেঁটে আমার বাড়ি অবধি গেল। চা খেল। মায়ের সঙ্গে গল্প করল।

তখন পাগলামির লক্ষণ কিছু দেখলি?

না। মাঝে মাঝে নরমাল, কিন্তু মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক চোখে কেমন যেন উদাস ভাব, যেন কাউকেই চিনতে পারছে না। পরনে একটা আধময়লা পায়জামা, গায়ে হলদে রঙের একটা দোমড়ানো পাঞ্জাবি, তার ওপর খয়েরি সোয়েটার। শীতে জড়সড়। বললাম, গ্রামে বড্ড শীত, গায়ে চাদর দেননি কেন? জবাবে বলল, চাদর! ও হ্যাঁ একটা চাদরও তো গায়ে দেওয়া যেত। খেয়ালই হয়নি।

মুখে মদের গন্ধ পাসনি?

না।

একটা শ্বাস ফেলে পারুল বলল, পাগলামি নয়। অনেক রকমের অবসেশনে ভুগছে।

ওরকম একটা ব্রাইট লোক কেমন হয়ে গেল বল তো!

পারুলের জিভে শাঁকালু আরও বিস্বাদ ঠেকছিল। দুর্বল গলায় সে বলল, সেটাই তো ভাবছি, বোধহয় অত ব্রাইট হওয়ার দরকার ছিল না ওর। সাদামাটা হলে বেঁচে যেত।

অনেকে বলে, তোমার জন্যই নাকি অমলদা ওরকম হয়ে গেছে। সত্যি পারুলদি? এ আমলে তো ওরকম প্রেম দেখি না আমরা।

পারুল লজ্জা পেয়ে বলে, দুর পাগলা! সেসব কত দিনের কথা! এতদিন কেউ এসব মনে পুষে রাখতে পারে নাকি? কত মৃত্যুশোকও ভুলতে হয় মানুষকে, আর এ তো প্রেমশোক!

প্রেমশোক! এটা কি বানালে নাকি?

মনে হল, তাই বললাম। না রে, আমার জন্য নয়। অমলদার অনেক গার্লফ্রেন্ড ছিল শহরে গঞ্জে। পারুলকে ভুলতে ওর সময় লাগেনি। অমলদার প্রবলেম প্রেম-ট্রেম থেকে নয়। হয়তো ফ্যামিলি বা ক্যারিয়ারে কিছু গণ্ডগোল আছে।

কিংবা জিন! এসব তো জেনেটিক ব্যাপারও হতে পারে।

ওসব আমি জানি না বাপু।

লোকটার জন্য ভারী কষ্ট হল। একসময়ে লোকটাকে খুব ডাঁটে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। এখন একদম জবুথবু। এই লোকটাই যে সেই লোকটা তা মনে হয় না। অমলদা যে নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেটা বোধহয় সত্যি। সেই অমলদা তো এ নয়।

অত ভাবিস না। যে যেরকম কপাল করে আসে তার তো তাই হবে।

কপাল! তাই হবে। আমি তো কপাল মানি না। লোকটার সব থেকেও কিছু নেই কেন সেটাই ভাবছি।

তুই কমিউনিস্ট, না?

এক সময় ছিলাম।

এখন নোস?

দুর। সাচ্চা কমিউনিস্ট হওয়া কি সোজা কথা? যখন দেখলাম আমাকে ক্যারিয়ার-ট্যারিয়ারের পিছনে ছুটতে হবে, টাকা কামাতে হবে, সংসার প্রতিপালন করতে হবে তখনই কমিউনিজমকে নমস্কার করে পাশ কাটিয়ে এসেছি। পিছুটান থাকলে ওসব হয় না। সব ছেড়ে আদাজল খেয়ে লাগতে হয়। হাফ কমিউনিস্ট হয়ে লাভ নেই।

দুপুরে মা আজ নিজে রাঁধল। গোলমরিচ আর মাখন দিয়ে আলুমরিচ, সঙ্গে কলাইয়ের ডাল আর এক বাঙাল বাড়ি থেকে রাঁধিয়ে আনা শুঁটকি মাছ।

খেতে বসিয়ে বলল, আজ অখাদ্যই দিয়েছি মা। মুখে দিয়ে দেখ, দুটি খেতে পার কি না। নইলে অনল ডাক্তারকে ডাকতে হবে।

পারুল আজ খেতে পারল। এবং খাওয়ার পর বমিও পেল না। বলাকা ছাঁচি পান সেজে রেখেছিল, বমি পেলে দেবে। তার দরকার হয়নি। দুপুরে লেপমুড়ি দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়েও নিল পারুল।

বিকেলে শরীর ঝরঝরে লাগছিল যেন। দুর্বল, তবে সাংঘাতিক কিছু নয়।

সন্ধেবেলা শরীরটা ভাল থাকায় ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে পড়াতে বসেছিল পারুল।

হঠাৎ কেমন একটা সূক্ষ্ম অস্বস্তি বোধ করছিল পারুল। স্পষ্ট কিছু নয়, কেমন একটা ভয়-ভয়, ছমছম অনুভূতি। শীত পড়লেও বাগানের দিকটায় পুবের জানালার একটা পাল্লা খুলে রাখে পারুল। সব বন্ধ থাকলে তার মাথা ঝিমঝিম করে। খোলা পাল্লার ওপাশে অন্ধকার বাগান। সেই দিকে চেয়ে পারুল কিছুক্ষণ আনমনা রইল। অস্বস্তিটা কীসের তা বুঝতে পারল না। পেটে বাচ্চা আসায় যে নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন হয়েছে তার শরীরে এটাও কি তাই?

তার ছেলেমেয়ে দুটিই লক্ষ্মী। মাথাও পরিষ্কার। ওরা নিজেরাই পড়ে, নিজেরাই বোঝে। মা কাছে থাকলে একটু খুশি হয় ঠিকই, কিন্তু পারুল ওদের পড়ায় না। পড়ানোর দরকার হয় না বলে। সময় পেলে শুধু কাছে বসে থাকে। এ দুজন লক্ষ্মী ঠিকই, কিন্তু পেটে যেটা এসেছে সেটা যে দস্যি হবে তাতে পারুলের সন্দেহ নেই। খুব দস্যি হবে, এই বয়সে পারুলকে ছুটিয়ে মারবে, হয়রান করে দেবে। ভেবে গায়ে কাঁটা দেয় পারুলের। ভয়ও পেটেরটাকে নিয়েই। এ সময়ে খারাপ হাওয়া-বাতাস লাগাতে নেই। গাঁয়ে খারাপ হাওয়া-বাতাসের কথা খুব শোনা যায়। খারাপ আত্মা তো কম নেই। তারাই খারাপ নজর দেয়। এসব এমনিতে বিশ্বাস করে না পারুল। কিন্তু এখন এক অপার্থিব মায়ায় আচ্ছন্ন মন বড্ড নরম আর দুর্বল। এখন কেবলই ভয়, কেবলই অমঙ্গলের ছায়া।

উঠে গিয়ে জানালার খোলা কপাটটা বন্ধ করে দিল পারুল। জানালার ওপাশের গাঢ় অন্ধকারটাকে ভাল লাগছে না তার।

জানালা বন্ধ হল, তবু অস্বস্তিটা গেল না পারুলের। অনেকদিন আগে কুমারী অবস্থায় তার এরকম অনুভূতি কখনও কখনও হত। তখন ঠিক বুঝতে পারত, আড়াল থেকে কেউ তাকে দেখছে।

রোজ স্কুলে যাওয়ার পথে বসাক-বাড়ির ধার দিয়ে যাওয়ার সময় এরকম হত। পরে ধরা পড়েছিল সুধীর বসাকের ছোট ছেলে পল্টু রোজ জানালার আড়াল থেকে দেখত তাকে।

কিন্তু এখন তাকে কে দেখবে? সে দুই ছেলেমেয়ের মা, পেটে আরও একটা। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। তবু এরকম হচ্ছে কেন?

লোডশেডিং-এর জ্বালায় এখানে সন্ধের পরই হাতের কাছে টর্চ রাখে পারুল। এ-বাড়িতে উঁচু উঁচু চৌকাঠ, জিনিসপত্রে আর ভারী ভারী আসবাবে ঠাসা সব ঘর। অন্ধকারে কোথায় হোঁচট খায়, কোথায় ধাক্কা লাগে সেই ভয়ে মা বলেছে সঙ্গে সবসময় টর্চ রাখতে।

টর্চটা নিয়ে উঠল পারুল।

মেয়ে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ মা?

বারান্দায়। এখনই আসছি।

একতলার অন্ধকার বারান্দায় পারুল চুপ করে টর্চ না জ্বেলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। না, ভুল নেই। অস্বস্তিটা হচ্ছে। খুব সূক্ষ্ম, খুব মৃদু, কিন্তু বিভ্রম নয়।

বারান্দার ধারে এসে পট করে টর্চটা জ্বেলে বাগানের দিকে ফেলল পারুল। শীতে গাছপালা মরে এসেছে একটু। এখন আর নিবিড় নয় গাছপালা। আলোটা অবধি দেখা যায়।

কাউকে দেখা গেল না অবশ্য।

পারুল ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইল। তারপর টর্চের আলো ফেলল চারদিকে। কাউকে দেখা গেল না।

ঘরের দিকে ফিরে পা বাড়াতেই হঠাৎ মৃদু একটা কাশির শব্দ পেয়ে দাঁড়াল পারুল।

কে? কে ওখানে?

আমি পারুল।

টর্চটা জ্বেলে পারুল দেখল বাগানের বেড়ার ধারে ঝুপসি বাবলা গাছটার পাশে একজন দাঁড়িয়ে।

কে?

আমি অমল।

পারুল ভারী অবাক হয়ে বলে, অমলদা! তুমি ওখানে কী করছ?

অমল খুব ধীর পায়ে এগিয়ে এল। ভারী করুণ মুখে বলল, কিছু করছি না পারুল। এমনি ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখছি।

ঘুরে দেখছ! আচ্ছা মানুষ যা হোক! এই শীতে, অন্ধকার রাতে কেউ ঘুরতে বেরোয় বুঝি?

আমাকে দেখে ভয় পাওনি তো!

ভয় পাওয়ার দোষ কী? ওখানে দাঁড়িয়েছিলে কেন? ঘরে আসতে পারতে তো!

অমল উঠোনে বারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল। মুখে ম্লান একটু হাসি। বলল, আজকাল আমার কেমন মনে হয়, আমাকে কেউ পছন্দ করে না। কারও কাছে গেলে সে বিরক্ত হয়।

যাঃ, ওসব তোমার মনের ভুল। এসো, ঘরে এসো।

আসব?

আসতে বাধা কীসের? এসো, গরম কফি খাও এক কাপ। চেহারার অমন ছিরি হয়েছে কেন?

অমলের গালে কয়েকদিনের দাড়ি, চুল বড় হয়েছে এবং ঝাঁকড়া হয়ে আছে। পরনে পাজামা, পাঞ্জাবি আর একটা হাতকাটা সোয়েটার। বিজু যেমন বলেছিল ঠিক তেমনি। টর্চের আলোয় তেমন বোঝা গেল না, তবে

মনে হল চোখের দৃষ্টিও কেমন ঘোলাটে।

এই লোকটাকে একদিন ভালবাসত পারুল। সেই ভালবাসা এখন আর নেই। কিন্তু মায়া তো আছে। কষ্ট তো আছে।

এই ভীষণ শীতে এ কী পোশাক তোমার অমলদা? শীত করছে না?

শীত! হ্যাঁ, শীত করে খুব। আমার রক্তের জোরও তো কমে আসছে।

তাহলে গরম চাদর বা ফুলহাতা সোয়েটার পরোনি কেন?

খেয়াল থাকে না।

ইস! আবার পায়ে চটি! পায়েই সবচেয়ে বেশি শীত লাগে, জানো না?

বললাম তো, ওসব খেয়ালই থাকে না।

খেয়াল কর না কেন? এত অন্যমনস্কতা কীসের?

অমল লাজুক ভঙ্গিতে মাথা নামিয়ে একটু হাসল।

এসো, ঘরে এসো।

পড়ার ঘরের পাশের ঘরটিতে এনে অমলকে বসাল পারুল।

কী হয়েছে তোমার বল তো। এই তো দশ-বারো দিন আগে কলকাতায় গেলে, আবার আসতে হল কেন?

অমল মাথা নেড়ে বলে, ভাল লাগছে না। কিছু ভাল লাগছে না।

বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আসনি তো? পুরুষদের বীরত্ব দেখানোর তো ওই একটাই জায়গা।

ঝগড়া! না পারুল, আমি ঝগড়া করতে পারি না। ইচ্ছেও হয় না।

তাহলে কী হল?

মন ভাল লাগছিল না। কেবল মনে হচ্ছে, সব ভুলভাল কাজ করছি। কিছু মনে থাকছে না, সবসময়ে আবোলতাবোল কী যেন সব ভাবছি। আজকাল ভীষণ ভীষণ ভয়ের স্বপ্ন দেখি।

ডাক্তার দেখাও না কেন?

সাইকিয়াট্রিস্ট?

তাই দেখাও।

অমল একটু চুপ করে থেকে বলল, এক সময়ে তাও দেখিয়েছি। ওষুধ খেয়েছি, তাতে ফল ভাল হয়নি। আমার সমস্যাটা বোধহয় মনোরোগ বা পাগলামি নয়। তা হলে কাজ হত।

লোকে কী বলে জান?

কী বলে?

আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না। কিন্তু কারও কারও ধারণা আমার জন্যই তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ। শুনলে আমি কষ্ট পাই, তা জানো?

এ কথাটা আগেও বলেছ পারুল। কিন্তু একজন মানুষের কাছে নশ্বর এক নারীই তো সর্বস্ব হতে পারে না। পারে কি?

কোনও কোনও মানুষের কাছে হতেও পারে।

অমল মাথা নেড়ে বলে, তুমি আমার কাছে অন্য রকম। হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকা তো তুমি নও।

ওটা তোমার আর একটা পাগলামি। আমাকে দেবী বানিয়ে কী মজা পাও বল তো!

তোমার কথা থাক পারুল। তোমাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করার অর্থই হয় না।

বেশ তো! তোমার এ দশা কেন সেইটেই বলো।

আমার মনে হয় এতকাল যে অমল বেঁচে আছে সে ভুল অমল। ভুল তার মেধা, তার লেখাপড়া, তার চাকরি, তার বিয়ে। সব ভুল, ওটা আসল আমি নয়।

ওমা! সে কী কথা?

আমি আমার আসল আমিকে খুঁজে বেড়াই পারুল। তোমার কাছে পাগলামি মনে হবে হয়তো। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার ভিতরে একটা বিস্ফোরণ হবে একদিন। তারপর আসল আমির জন্ম হবে।

বিয়াল্লিশ

রান্নার বামুনঠাকুর আছে। সম্প্রতি একজন বামুনদিকেও রাখা হয়েছে। বলাকার একার জন্য এত কাজের লোকের দরকার নেই। তবু রাখা হয়েছে এই নিরিবিলি বাড়ির জনহীনতার ভাবটা কমানোর জন্য। ছেলে আর মেয়েরা চায় মাকে ঘিরে একটা নিরাপত্তার বলয় রচনা করে দিতে। বলাকার তাতে ঘোর আপত্তি। প্রথম কথা হল খরচ। মাইনে এবং খাইখরচ মিলে এই মাগ্‌গিগণ্ডার দিনে বড় কম দাঁড়ায় না খরচের বহরটা। তা ছাড়া মুনিশ আছে, মালি আছে, পুষ্যি আছে। খরচ অবশ্য ছেলে-মেয়েরাই দেয়, কিন্তু বলাকার সেটা গায়ে লাগে। তার তো এত মানুষের দরকার নেই। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

বামুনঠাকুর বা বামুনদিকে বললেই এক কাপ কফি করে দিতে পারত। কিন্তু কফি করতে উঠে এল পারুল নিজেই। আসলে অমলকে কী বলবে, কীভাবে বলবে তা ভাবতেও একটু ফাঁক দরকার ছিল তার। রান্নাঘরে অসময়ে পারুলকে দেখে তটস্থ বামুন রাঁধুনি হরনাথ বলল, কী দিদিমনি, কিছু লাগবে?

না হরদা, আমি একটু কফি করতে এসেছি।

আপনি করবেন কেন? আপনার শরীর খারাপ, আমি করে দিচ্ছি।

আমিই করব। গ্যাস খালি আছে?

খালি করে দিচ্ছি।

জল গরম করতে করতে ভাবছিল পারুল। তাদের বাল্যপ্রেম কবেই উবে গেছে। ভাঁটিয়ে গেছে বয়স। সময়ের অনেক পলিমাটির আস্তরণ পড়েছে ক্ষতচিহ্নের ওপর। বেড়েছে তাদের প্রিয়জন। পৃথিবীর কোনও ট্র্যাজিক ঘটনাই বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না। তার ব্যথা-বেদনার উপশম করে দিয়ে যায় সময়। অমলের এই ভাঙচুরের জন্য পারুল কি দায়ি হতে পারে? সে কোনও অপরাধ করেনি। তার বাবার কাছ থেকে সে একটা জিনিস পেয়েছিল। সেটা হল মনের দুর্জয় শক্তি। নৈতিক সবলতা। তাই ওই বয়ঃসন্ধি পেরোনো বয়সে জীবনের প্রথম উজ্জ্বল পুরুষটিকে সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রেমিকই যদি হও তবে শরীরের ওপর লোভ করবে কেন? কেন রচনা করলে না প্রেমটাকে? শেষ অবধি সম্পর্কটা হয় তো বায়োলজিই, তবু কি মানুষ তার মধ্যেও সুন্দরের সঞ্চার ঘটায় না। পারুলকে কুমারী বয়সে ধ্বংস করে দিয়েছিলে তুমি, তারপর এখন দেবী বলে স্তবগান করো, এ কেমন ভড়ং।

অমলের কফি করা সোজা। চিনি নয়, দুধ নয়, শুধু কালো কফি।

হরনাথ বলল, দিদিমনি, আমি দিয়ে আসছি। ভরা গরম কাপ নিতে গিয়ে যদি পড়ে-টড়ে যান।

কিছু হবে না হরদা। পারব।

সাবধানী হরনাথ তবু বারান্দার বাতিটা জ্বেলে রান্নাঘরের সিঁড়ি পর্যন্ত সঙ্গে রইল। লোকটা বেশ বিনয়ী, কাজের লোক। তবে বলাকা বলে, হরনাথ কাজের হলে হবে কী, হাতটান আছে বাপু। জিনিসপত্র পাচার

করে।

তা অবশ্য করতেই পারে। বলাকা একা কত দিকে নজর রাখবে! মাইনে-করা লোকের ওপর নির্ভর করতে গেলে কিছু ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতেই হয়। বস্তুবাদী বলাকা তাই বেশি ঘাঁটায় না।

উঠোনটা সাবধানে পেরুল পারুল। পেটে বাচ্চাটা আসার পর আজকাল সে ভীষণ সাবধানী হয়ে গেছে। খুব হিসেব করে পা ফেলে, খুব সাবধানে চারদিকে নজর রেখে চলে।

চুপ করে বসে আছে অমল। চোখে ভারী সুদূরে-হারিয়ে-যাওয়া দৃষ্টি।

তোমার কফি!

অমল সাড়া দিল না।

দুবার বলতে হল।

ওঃ হ্যাঁ। বলে তটস্থ অমল অপ্রতিভ একটু হাসল।

গরম কফিটা যেন গো-গ্রাসে খাওয়ার চেষ্টা করছিল অমল। পারছিল না। হাত কাঁপছে, কফি চলকে যাচ্ছে, ঠোঁটে ছ্যাঁকা লাগছে। একবার বিষমও খেল।

তাড়াহুড়ো করছ কেন বল তো! আস্তে খাও।

অমল থমকে গেল। তারপর ম্লান মুখে বলল, আমার আজকাল হাত কাঁপে কেন বল তো পারুল! এ কি নিউরোলজিক্যাল কিছু?

ডাক্তার দেখাও। এই বয়সে হাত কাঁপার কথা তো নয়!

তাই ভাবছি। কনস্ট্যান্ট হাত কাঁপে। আজকাল লিখতে বা ড্রয়িং করতে রীতিমতো কষ্ট হয়।

সবসময়ে কাঁপে?

হাতটা কোথাও রাখলে বা জোরে চেপে ধরে থাকলে কাঁপে না। কিন্তু যখনই চায়ের কাপ বা জলের গেলাস বা কলম কিছু একটা ধরতে হয় তখন এত কাঁপে যে অবাক হয়ে যাই। এটা যে আমারই হাত তা যেন বিশ্বাস হয় না। এই হাত দুটো নিয়ে যে এরকম সমস্যা হবে তা তো কখনও ভাবিনি। তাই ভারী অবাক হয়ে যাই।

কাঁপা-কাঁপা হাতেই প্লেটসুদ্ধু কফির কাপটা মুখের কাছে তুলে চুমুক দিচ্ছিল অমল। কাপে আর প্লেটে মৃদু ঠকাঠক শব্দ হচ্ছে। মলিন মুখ করে বলল, ডাক্তার দেখিয়ে কিছু হবে না পারুল। একে একে নিভিছে দেউটি।

তার মানে কী?

হাত যাবে, পা যাবে, চোখ যাবে, মাথা যাবে। সব নিবে যাবে। একদিন আমিও নিবে যাব, কিছুই থাকবে না আমার।

মরার কথা ভাব বুঝি খুব?

মাথা নেড়ে অমল বলে, আরে না। রোমান্টিক মৃত্যুচিন্তা আমার হয় না। কেন জানো? মরার রোমান্টিক চিন্তা তখনই হয় যখন তার জন্য কাঁদার বা হাহাকার করার বা অনুতপ্ত হওয়ার মতো কেউ থাকে। ভালবাসার লোক, আপনার লোক।

পারুল ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী বলতে চাও তুমি বলো তো? তোমার জন্য ভাববার বা কাঁদবার কেউ নেই নাকি! পুরুষমানুষগুলো কি সবাই ন্যাকা আর বোকা? আজ না হয় তোমার সঙ্গে তোমার বউয়ের একটু

খটাখটি আছে, তাই বলেই কি ধরে নিতে হবে যে সে তোমাকে ভালবাসে না? ছেলেমেয়ে দুটোকেই বা তুমি কতটা চেনো? ওসব ধরে নেওয়া সেন্টিমেন্টাল কথা বোলো না তো! ওসব শুনলে আমার ভারী রাগ হয়।

অমল এ কথায় যেন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, না, সেরকম ভেবে কিছু বলিনি।

পুরুষমানুষের দোষ কী জানো? তারা বউ বা ছেলেমেয়ের কাছে হান্ড্রেড পারসেন্ট চায়। আর চাওয়াটা সে নিজেই ঠিক করে নেয়। বউ যে একটা আলাদা সত্তা, আলাদা পারসোনালিটি, ছেলেমেয়েদেরও যে নিজের মতো করে ভালবাসার রকম থাকতে পারে, সেটাই তারা বুঝতে চায় না।

মৃদু মাথা নেড়ে অমল হাসিমুখে বলে, আরে না। আমি ওসব ভাবি না।

তাই ভাব। ভাল করে নিজের মনের ভিতরটা খুঁজে দেখ। বুঝতে পারবে।

অমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুব মৃদু স্বরে বলে, মরার কথা ভাবতে আমি যে ভয় পাই পারুল। ভীষণ ভয় পাই।

তবে বলছ কেন?

বলিনি। আসলে মনে হচ্ছে, আমি খুব বুড়ো হয়ে গেছি। জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসছে। খুব দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। হাত কাঁপে, স্মৃতিশক্তি কমে যাচ্ছে, কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি।

কারণটা খুঁজে দেখেছ?

খুঁজি তো! খুব খুঁজি। খুঁজে কিছু পাই না। আমার কি আলঝাইমারস ডিজিজ হল! কে জানে?

কিছু হয়নি তোমার। একটা ঝাঁকি মেরে সোজা হয়ে যাও।

একটু অবাক হয়ে অমল বলল, কথাটা কার বল তো! কে যেন কথাটা খুব বলত। মনে পড়ছে।

পারুল হেসে ফেলে বলল, আমার বাবা। বাবার খুব প্রিয় স্লোগান ছিল এটা। সবসময় সবাইকে বলত একটা ঝাঁকি মেরে সোজা হয়ে যাও।

অমল ফের গরম কফিতে হাঘরের মতো চুমুক দিয়ে বলল, কৃতকর্ম ভুলে, অতীত ভুলে যারা ফের সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে তারা নমস্য। আমার মনে আছে জ্যাঠামশাই কথাটা আমাকেও কয়েকবার বলেছেন। টেস্টে খারাপ রেজাল্ট করেছিলাম, তখন একবার বলেছিলেন। মনে আছে, তাতে কাজ হয়েছিল। তখন কাজ হত। এখন আর হয় না।

বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছ নাকি? সত্যি কথাটা বল তো!

মাথা নেড়ে অমল বলে, না। ঝগড়া করে বিবাগী হওয়ার মতো অবস্থাটা আর নেই। আমি এমনই এসেছি। কিছু ভাল লাগছিল না। ফ্ল্যাটবাড়ির মধ্যে আজকাল আমার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

কেন, ফ্ল্যাটবাড়ি আবার কী দোষ করল! তোমারটা তো শুনেছি দক্ষিণ খোলা সুন্দর বড় ফ্ল্যাট।

ফ্ল্যাটবাড়ির দোষ নয় পারুল। দোষ আমার। কেবলই মনে হয়, যে-জায়গায় আছি সেটা আমার সহ্য হচ্ছে না।

তোমার কি এ জায়গাটা ভাল লাগছে আজকাল?

মাথা নেড়ে অমল বলে, তাও নয়। তবে এখানটায় ওরা নেই বলে আর চারদিকটা খোলামেলা বলে একটু হাঁফ ছাড়তে পারি।

চাকরিটার কী অবস্থা?

চাকরি! বলে খুব চিন্তিতভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল অমল। তারপর হাত দুটো উলটে অসহায় ভঙ্গি করে বলল, কী জানি! চাকরির কথা তো ভাবিনি।

অফিসে না জানিয়ে চলে এসেছ?

হ্যাঁ।

এবার বোধহয় চাকরিটা যাবে তোমার। শুধু মুখ দেখে তো আর মাসের শেষে মোটা মাইনে দেবে না তারা।

অমল একটু হাসল, মৃদুস্বরে বলল, ওসব ভাবতেও আমার আর ভাল লাগে না। যদি তাড়িয়ে দেয় দিক। ক্রীতদাস তো নই।

বাড়িতেও কি কিছু জানিয়ে আসোনি?

আবার চিন্তিত হয় অমল। বলে, জানানোর কী আছে? রাতে আমার ঘুম হচ্ছিল না। একটু তন্দ্রা এলেই ভীষণ সব দুঃস্বপ্ন দেখে চটকা ভেঙে যাচ্ছিল। মদ খাওয়ার চেষ্টা করলাম, বমি হয়ে গেল। ঝিম মেরে পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল, এভাবে পড়ে থাকার মানেই হয় না। খুব ভোরবেলা উঠে বেরিয়ে পড়লাম। ট্রেন ধরে সোজা বর্ধমান।

আচ্ছা মানুষ যা হোক। বাড়ির লোক ভাবছে না! একটা টেলিফোন তো করা উচিত ছিল, করেছ সেটা?

আমি করিনি। তবে মনে হয় দাদা খবর দিয়েছে।

ঠিক জানো যে খবর দিয়েছে।

জানি না। তবে বউদিও তোমার মতোই চোখ পাকিয়ে আমাকে অনেক বকেছে। তাতেই মনে হচ্ছে কলকাতায় খবর দেবার দায়িত্ব ওরাই নিয়েছে।

পারুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কেন যে তুমি এরকম হয়ে যাচ্ছ কে জানে!

সবাই সংসারী হবে, হিসেবি হবে, সাবধানী হবে, স্বাভাবিক হবে বলে আশা কর কেন? এক আধজন অন্যরকম হলে ক্ষতি কী? সবাই একরকম হলে কি ভাল হত?

পারুল হেসে ফেলে বলল, তুমি কি পৃথিবীর বৈচিত্র্য আনার জন্য হিসেব কষে অন্যরকম হতে চাইছ?

মৃদু হেসে অমল বলে, তাহলে তো অভিনয় করতে হত! কিন্তু আমি ভাল অভিনেতা নই। পারুল, আমি মনে বড় কষ্ট পাচ্ছি। বড্ড কষ্ট।

কীসের কষ্ট তাও তো এতদিনে বুঝিয়ে বলতে পারলে না।

সে কি বোঝানো যায়? আমার ভিতরে যেন এক রুক্ষ ঊষর প্রান্তর। আর সেখানে কেবল হাহাকারে ভরা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। ভীষণ ভয় করে। পারুল, আমি কি পাগল হয়ে যাব একদিন?

শঙ্কিত অমলের মুখের দিকে চেয়ে বুকটা টনটন করে উঠল পারুলের। নরম গলায় বলল, ওসব ভেবো না। পাগল হবে কেন? একটা কথা বলব?

বলো।

তুমি কি নাস্তিক?

হঠাৎ ও প্রশ্ন কেন?

বলোই না।

মাথা নেড়ে অমল বলে, সেটাও তো ভেবে দেখিনি। ভগবান নিয়ে মাথাই ঘামাইনি কখনও। ওকথা জিজ্ঞেস করলে কেন?

তোমাকে বলতে ভয় করে। তুমি মস্ত লেখাপড়া জানা মানুষ, ভগবানের কথা বললে হয়তো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। নাস্তিকরা ভীষণ তার্কিক হয়।

অমল হাসল। বলল, নাস্তিক আস্তিক আমি কিছুই নই। নাস্তিক হলেও ভাল ছিল। নাস্তিকদেরও একটা ভগবান আছে বোধহয়।

সে আবার কী?

নাস্তিকদেরও একজন নেগেটিভ ভগবান থাকে।

কী যে বলো অমলদা, কিছু বুঝতে পারি না!

অমল কফিটা শেষ করে বলল, ওসব থাক পারুল। ভগবান আমাকে ভাল চোখে দেখবেন, এমন চান্স খুবই কম। তাঁকে ডেকে আমার লাভ হবে না।

আমি বলি বউয়ের কাছে ফিরে যাও। শান্তভাবে দুজনে মুখোমুখি বসে কথা বল। মিটিয়ে নাও।

তোমার কি ধারণা, আমার মানসিক সব অশান্তির মূলে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া?

তা ছাড়া আবার কী?

সমস্যা অত সরল হলে তো কথাই ছিল না পারুল।

দুজনেই স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল।

পারুল বলল, ঠান্ডা বাড়ছে, রাত হচ্ছে। বাড়ি যাও অমলদা।

তটস্থ অমল উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। বলল, হ্যাঁ পারুল, যাচ্ছি। একটা কথা বলব?

বল।

আমার মাথায় তো এখন স্থিরতা নেই। আমি ভূতের মতো রাতবিরেতে বেরিয়ে পড়ি! অন্ধকারে আঘাটায় ঘুরে বেড়াই। আমাকে হঠাৎ তোমার জানালার ধারে বা বাগানের কোণে কোথাও দেখতে পেলে ভয় পেয়ো না। কিংবা মায়া করে ডেকে এনে ঘরেও বসিয়ো না। ওইভাবে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে হয়ে হয়তো একদিন আমি নিজেকে ফিরে পাব।

পারুল চুপ করে রইল। অমল ধীরে ধীরে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে আবছায়া উঠোন ডিঙিয়ে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল। মদ খায়নি, তবু কেমন যেন অনিয়ন্ত্রিত ছোটবড় পদক্ষেপ। গায়ে তেমন শীতবস্ত্র নেই। শীত-গ্রীষ্মের বোধও নেই বোধহয়।

মা, কে এসেছিল বল তো! অমলমামা?

পারুল মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক ভাবে বলল, হ্যাঁ।

অমলমামার কী হয়েছে মা?

মনে নানা অশান্তি।

কাল আমি অমলমামাকে দুপুরবেলায় দেখেছি। কাঞ্জিলালদের জমিতে রোদে বসে আছে। আমি তিতলিদের বাড়ি থেকে ফিরছিলাম। দেখি বসে আপনমনে বকবক করছে। আমাকে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি কিন্তু যাইনি, দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।

আজকাল ওকে দেখলে বোধহয় সবাই ভয় পায়। অথচ অমলদা কত ব্রাইট ছিল।

গোঁসাইবাড়ির মানুদি বলছিল। তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়নি বলেই নাকি অমলমামা পাগল হয়ে গেছে!

বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকাল পারুল। দুধের মেয়েটার কানে ওসব কথা না ঢোকালেই কি নয়! গাঁয়ের মেয়েগুলোর স্বভাবই হল লোকের কানে বিষ ঢালা। কাজকর্ম তো নেই। গম্ভীর হয়ে পারুল বলে, ওসব কথায় কান দিও না।

আমাকে ডাকছিল কেন বল তো মা! অমলমামা তো আমাকে ভাল করে চেনেই না।

হয়তো চিনেছিল।

না মা, অমলমামা আমাকে চেনে না। মানুদি বলছিল, অমলমামা নাকি বাচ্চা মেয়েদের দেখলেই ডাকে।

ওঃ গড!

আমি কি পালিয়ে এসে অন্যায় করেছি?

না না। ঠিকই করেছ। অমলদার এখন মাথার ঠিক নেই।

পারুল খুব চিন্তিতভাবে দোতলায় উঠল। খুব ধীরে ধীরে।

কে এসেছিল রে পারুল? কার যেন কথা শুনতে পেলাম।

অমলদা।

বলাকা একটা পুরনো বালাপোশে নতুন ওয়াড় পরাচ্ছিল। সঙ্গে দুখুরি।

দুখুরি খিকখিক করে হেসে বলল, পাগলাটা?

চিন্তিত পারুল তার মায়ের দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ মা, অমলদা কি শেষ অবধি পাগলই হয়ে যাচ্ছে?

বলাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কার কী কর্মফল বাছা, তা কি জানি? ওদের বংশে তো কেউ পাগল ছিল না। ওর যে কী হল কে জানে। কী বলছিল তোকে?

কথাবার্তা তেমন অস্বাভাবিক বলছিল না। তবে কষ্টের কথা বলছিল। কীসের কষ্ট তা বুঝিয়ে বলতে পারল না।

বউটা কেমন রে?

কিছু খারাপ বলে তো মনে হয়নি।

বাইরে থেকে আর কতটুকু বুঝবি?

হ্যাঁ মা, পুরুষমানুষদের কিছু হলেই বুঝি বউকে দায়ি করতে হবে! এ তোমাদের ভীষণ একপেশে ধারণা।

তা নয় মা। আজকাল যে মেয়েগুলো স্বামীদের বড্ড জ্বালিয়ে মারে।

তাই বুঝি? পুরুষেরা কি ধোয়া তুলসীপাতা? তুমিও তো একজন মেয়ে, কেমন করে বল ওসব কথা?

আমি মেয়ে হলেও তোমাদের আমলের মেয়ে তো নই!

তাতে কী মা? সেই আমলের মেয়ে বলে এই আমলের মেয়েদের বুঝতে চেষ্টা করবে না।

বলাকা ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বুঝতে পারলে কি আর বলতাম? তবে জানি সংসারের বেশির ভাগ অশান্তির মুলেই থাকে মেয়েরা।

বেশ কথা! তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

পারুলের শরীর ভাল লাগছিল না। মাথাটা একটু গরম। সে গিয়ে শোওয়ার ঘরে অন্ধকারে লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে রইল। আজকাল মন খারাপ লাগলে সে তার পেটের দুষ্টুটার কথা ভাবে। ভাবতে ভাবতে মন ভাল হয়ে যায়। এখন তার ইচ্ছে হয় আরও কয়েকটা ছেলেপুলের মা হতে। শরীর দেবে না বলে, নইলে সে বহুপ্রসবিনী হত।

বে-খেয়ালে বাসরাস্তার কাছে চলে এসেছিল অমল। এখানে আলো-টালো আছে, দোকান পাটে লোকজন। একটা বাস থেকে হুড়মুড় করে লোক নামছে।

হঠাৎ তার ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, এ কিস উইল কিওর ইউ। এ কিস... এ কিস... বাই দ্যাট উওম্যান...

হঠাৎ বহুকালের ছাইচাপা একটা ক্ষুধা যেন সর্বাঙ্গে জেগে উঠল তার। বহুকাল আগে পারুলদের দোতলার নির্জন ঘরে এক দুরন্ত দুপুরে সে এক সুন্দরীর দেহের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন, অন্ধ, দেহগত কামনা ফুঁসে উঠল হঠাৎ।

দৈববাণীর মতো তার ভিতরে কে যেন ক্রমাগত বলে যাচ্ছে এ কিস উইল কিওর ইউ...এ কিস উইল কিওর ইউ... এ কিস...

মাথা টলছে তার। ...দেবীদুর্লভ পারুলের কাছেই কি রয়েছে তার অমেয় আরোগ্য? ...সে যাবে পারুলের কাছে, হাঁটু গেড়ে বসে ভিক্ষা চাইবে। একবার, মাত্র একবার চুম্বন করো আমাকে। হরণ করো আমার বিষাদ, আমার অন্ধকার।

অমল পারুলের কাছে যাবে বলে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ডান কাধে একখানা ভারী হাত এসে পড়ল।

আরে মশয়, আপনে অমলবাবু না? মহিম রায়ের পোলা?

বিরক্ত অমল মুখ ঘুরিয়ে রসিক সাহাকে দেখতে পেল। বলল, হ্যাঁ।

রসিক বিস্ময়ের চোখে তার দিকে চেয়েছিল। বলল, আপনারে তো চিননই যায় না মশয়। শরীর খারাপ নাকি?

না না, ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।

এই কাল ঠান্ডার মইধ্যে গরম জামা গায়ে নাই, দাড়িদুড়ি ফালান নাই! কী হইছে কন তো!

লজ্জা পেয়ে অমল বলল, কিছু হয়নি তো!

দূর মশয়, কিছু হয় নাই মানে? শীতে তো কাপতে আছেন। আহেন আমার লগে।

কোথায় যাবো?

লন আমার বাড়িত। এক কাপ গরম চা খাইয়া যান। ভাল চা আছে।

অমল মাথা নেড়ে বলল, না না, আজ থাক।

আরে লজ্জা পান ক্যান? আপনে তো ফালাইন্যা মানুষ না। ব্রাহ্মণ সন্তান, তার উপর প্যাটে বিদ্যা গিজগিজ করতে আছে। বিলাত আমেরিকা ঘুইরা আইছেন। আপনের শ্বাসেপ্রশ্বাসে বাতাস পবিত্র হয়। লন, গরিবের বাড়িতে একটু পায়ের ধুলা দিয়া আইবেন।

হঠাৎ শীতটা খুব টের পাচ্ছে অমল। তার হাত পা ঠকঠক করে কাঁপছে। নাকে জল আসছে, চোখে জল আসছে, গলা কেঁপে যাচ্ছে।

কইলকাতা থিক্যা আইলেন বুঝি অখন!

অমল ভুল ভাঙার চেষ্টা না করে বলল, হুঁ।

ডান হাতে একটা মেটে হাঁড়ি সেইটে উঁচু করে দেখিয়ে রসিক বলল, গঙ্গার ইলিশ আনলাম। চলেন, কয়েকখান গরম গরম মাছভাজা খাইয়া যাইবেন। খুব ভাল জাতের ইলিশ পাইছি। ত্যালে এক্কেবারে পিছলাইয়া যাইতাছে।

অমল মৃদু একটু হাসল। হ্যাঁ তার খিদে পেয়েছে, তার শীত করছে, সে ভারী ক্লান্ত। রসিক বাঙালকে তার মোটেই খারাপ লাগছে না।

রসিক পিছন ফিরে হঠাৎ হাঁক মারল, কী রে পুঁটি, তর কিননকাটন হইল? আয় তাড়াতাড়ি।

ফ্যান্সি স্টোর নামে নতুন একটা দোকান খুলেছে সম্প্রতি। ঝাঁ চকচকে দোকান। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা ছিপছিপে চেহারার মেয়ে কেনা-কাটা করছিল। বলল, যাচ্ছি বাবা।

রসিক অমলকে বলল, আমার মাইয়া। গ্রামেগঞ্জে আইতে চায় না। অগো জান গাড়া আছে কইলকাতায়। তুয়াইয়া-বুয়াইয়াও আনতে পারি না। এইবার কী খেয়াল হইছে কে জানে, হঠাৎ দেখি জিনিসপত্র গুছাইয়া লগ লইছে।

এসব কথার কী উত্তর দেবে তা ভেবে পাচ্ছিল না অমল।

রসিক হাঁক মারল, আমরা আউগাইলাম রে পুঁটি। তুই তাড়াতাড়ি আয়।

হ্যাঁ বাবা, যাচ্ছি, তুমি এগোও।

তাকে দেখে আকাশ থেকে পড়ল বাসন্তী, ওমা! এ কাকে এনেছ তুমি! কী ভাগ্যি আমার! এসো, এসো অমলদা, এসো!

রসিক যেন দৌড় প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছে এমন মুখ করে বলল, আগো, তাড়াতাড়ি আগুনের পাতিলটা লইয়া আহ। আর পাঞ্জাবের আলোয়ানটা দিয়া ভদ্রলোকরে একটু ঢাকাচাপা দাও। দেখতাছ না, ঠান্ডায় এক্কেবারে কাপ উইঠ্যা গেছে।

এই দিই! ও মা এই বুঝি পুঁটি! কই, আগে জানাওনি তো!

জানামু ক্যামনে? হুট কইরা রওনা হইয়া পড়ল।

এসো মা, এসো। বলে মেয়ের দুহাত ধরে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল বাসন্তী।

কাঠকয়লার আগুনে ভরা একটা হাঁড়ি এনে রাখা হল অমলের পায়ের কাছে। একটা মোটা কুটকুটে আলোয়ানে তার গা ঢেকে দিল বাসন্তী। বলল, বোসো অমলদা, চা করে আনছি। চা না কফি?

চা-ই কর।

রসিক মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল, জুইৎ কইরা বহেন। আর কী খাইবেন কন।

অমল মৃদু হেসে বলল, আপনি একটি বেশ লোক, তাই না!

না মশয়, বাজারে আমার খুব বদনাম। দুইটা বিয়া করছি, মাইনষের জমিজমা সব গাপ করত্যাছি। আরও কত কী কয় লোকে! তবে মশয় আমি ওইসব গায়ে মাখি না। খাইট্যা পিট্যা খাই, অসুরের মতো কাম করি।

কুটকচালি কইরা তো সময় কাটাই না! গ্রামের মানুষগুলা অলস, বইয়া বইয়া কার মাগ্গে কত গু তা হুইঙ্গা বেড়ায়। বোঝলেননি?

অমল আগুনের তাপ আর আলোয়ানের ওমে ভারী আরাম পেয়ে চোখ বুজল। রসিক বাঙাল একজন তেজি লোক। ভোগীও বটে। কিন্তু কী সুন্দর ঘরদোরের ছিরিছাঁদ! বাসন্তীর সঙ্গে সম্পর্কও ভারী ভাল। এদের কোনও ইগো প্রবলেম নেই। অকারণ চিন্তা নেই, পাপবোধে কষ্ট পায় না।

হাফসাইয়া পড়ছেন নাকি অমলবাবু? একটু শুইবেন?

আরে না। একটু ক্লান্তি লাগছে।

একটু ব্রান্ডি আছে, খাইবেন? মরণের মায়ের লিগ্যা কিন্যা রাখছিলাম। হ্যায় তো একবার চুমুক দিয়াই থু থু কইরা ফালাইয়া দিল। বোতলটা পইড়াই আছে।

অমল মাথা নেড়ে বলল, না, না, থাক। আজ ওসব নয়।

না ক্যান? শরীর একটু গরম হইব।

এই বেশ লাগছে।

শুধু মাছভাজা নয়, সেই সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা পরোটা, আলুর দম, বেগুনভাজা সাজিয়ে দিল সামনে বাসন্তী।

এ কী কাণ্ড রে! এত কে খাবে!

খাও অমলদা। রাতে না হয় একটু কম খেও বাড়িতে। আজ প্রথম এলে তো! দাঁড়াও, হাত ধোয়ার জন্য উঠতে হবে না। আমি গামলায় গরম জল আনিয়ে দিচ্ছি, এখানে বসেই হাত ধুয়ে নাও।

কৃতজ্ঞতায়, কুণ্ঠায় এতটুকু হয়ে যাচ্ছিল অমল। এই বাসন্তী, এই রসিক বাঙাল—এইসব তুচ্ছ লোকজনের কোনও খোঁজখবরই তো এতকাল রাখত না অমল। তবে এরা তাকে এত যত্ন করছে কেন!

তুই খুব ভাল আছিস, না রে বাসন্তী?

বাসন্তী ভারী লজ্জা পেয়ে বলে, ভাল থাকার কথা আর বোলো না। সংসারের ঝামেলা কি কম! উনি তো বড়বাজারের দোকান নিয়ে ব্যস্ত। সব বিষয় সম্পত্তি আমার ঘাড়ে।

বাসন্তীর মুখে চাপা অহংকার আর খুশির উজ্জ্বলতা গোপন থাকল না। অমল দেখল। দেখে মুগ্ধ হল। একটু হিংসেও কি হল তার?

তেতাল্লিশ

শিবঠাকুর একটু ভোলেভালা আদমি, কিন্তু একটু পাগলাটেও বটে। বর যখন দিতে শুরু করেন তখন দিতেই থাকেন। আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। পরশু দিনও মরণ ভাবছিল, দাদা তো হল, এবার দিদিটা আর বড়মাটা হলেই হয়। তার বোন আছে বটে, কিন্তু দিদি থেকেও ছিল না। আর মা থাকলেও, বড়মা অন্য জিনিস। দিদি আর বড়মা সম্পর্কে কত কী ভেবে রেখেছে মরণ। দিদিটা হবে ঠিক পান্নাদির মতো। আরও সুন্দর হলে তো কথাই নেই। আর বড়মা হবে ঠিক যেমন জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা।

আগে থেকে খবর দেওয়াও ছিল না। কাল একটু রাতের দিকে বাবা এসে হাজির। সঙ্গে পাগলা অমলকাকু আর দিদি। মরণ তখন পড়তে বসেছিল। উঠোনে মায়ের গলা পেয়ে বুঝল একটা কিছু হয়েছে। নতুন কেউ এসেছে বাড়িতে। এক লাফে উঠোনে নেমে এসে লণ্ঠনের আলোয় দিদিকে দেখে তার যেমন আনন্দ, তেমনই লজ্জা।

ছোট ছেলেদের অনেক সমস্যা। তার মধ্যে একটা হল কেউ সহজে পাত্তা দিতে চায় না। ভাবে, ওর সঙ্গে আর কীই বা কথা বলার আছে! শুধু ফাই-ফরমাশ করার জন্য তাদের ডাক-খোঁজ করা হয়। মরণ তার এই ভবিতব্য মেনেও নিয়েছে। তার কোনও গুরুত্ব নেই, তার তেমন আদরও নেই। পড়াশুনোয় ভাল হলেও না হয় হত! কিন্তু তাও সে নয়। এই অনাদরের জীবনটার জন্যই তার যা কিছু দুঃখ। সে ভাল বল খেলে, গাছ বায়, খুব জোরে দৌড়তে পারে, কিন্তু সেসব গুণকে কে আর পোঁছে!

সে ধরেই নিয়েছে তার কলকাতার দিদিও তাকে মোটেই পাত্তা দেবে না।

পড়াশুনো শেষ হল রাত নটায়। দোতলার শোওয়ার ঘর থেকে খুব হাসি আর কথার শব্দ আসছিল। কিন্তু ইচ্ছে হলেও ওপরে যেতে লজ্জা করছিল তার। দিদি তাকে দেখে হয়তো ভারী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলবে, ওঃ, এই বুঝি মরণ!

তাই মরণ মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ার ঘরে বসে রইল।

বসে বসে ভাবছিল মরণ। এই যে বড়মা, দিদি, দাদা এরা নাকি তার খুব আপন কেউ নয়। অন্তত জিজিবুড়ি তাই বলে। জিজিবুড়ির জিভে নাকি বিষ আছে। তার কথা হল, ও আবার আপনার জন কবে থেকে হল রে! বাঙালের প্রথম পক্ষই হল তার আসল। তোরা তো সব দুয়োরানির ছা। কে-ই বা তোদের পোঁছে, কে-ই বা তোদের দাম দেয়। আমার মেয়েটা তো হদ্দ বোকা, পিটুলিগোলা খেয়ে দুধ বলে নাচছে। দলিল-দস্তাবেজে কত ফাঁকফোকর থাকে, উকিল মুহুরিদের হাত করে সব বানিয়ে রেখেছে। যখন কেড়েকুড়ে নেবে তখন আক্কেল হবে মেয়েটার।

জিজিবুড়ি বাড়িয়ে বলে ঠিকই, কিন্তু সমস্যা যে একটা আছে তা মরণও বুঝতে পারে। যদি সমস্যা না থাকত তাহলে কি তার বাবা কখনও মরণ বা তার মাকে কলকাতার বাড়িতে নিয়ে যেত না? আর তার মাও

যেন বড়মার নামে ভীষণ ভয় পায়। এইসব থেকে আজকাল মরণ বুঝতে পারে তারা ঠিক আর পাঁচটা পরিবারের মতো নয়। তাদের কিছু গোলমাল আছে। আর সেজন্য দায়ি তার বাবা।

বাবাকে কি খুব অপছন্দ করে মরণ! অনেক ভেবে দেখে তার মনে হয়েছে, যত নষ্টের গোড়া ওই লোকটাই। যেমন কেঠো চেহারা, তেমনই কেঠো স্বভাব। দুটো বিয়ে করার কী দরকার ছিল লোকটার! না, বাবাকে তার একদম পছন্দ নয়।

তার মাও টের পায় মরণ তার বাবাকে পছন্দ করে না। তাই মা মাঝে মাঝে তাকে বলে, মানুষটার বাইরেটা অমন হলে কী হবে, ওর মনটার কথা তো জানিস না! বড় হলে বুঝবি ওরকম মানুষ খুব কম হয়।

মা যে বাবাকে কেন অতটা ভালবাসে, তাও বুঝতে পারে না মরণ। মা কখনও বাবার কোনও দোষ দেখে না, কোনও অন্যায় দেখতে পায় না। বাবার ছেড়ে রাখা চটিজুতোয় পা লাগলে পর্যন্ত প্রণাম করে। অথচ জিজিবুড়ি বলে, বাঙালের নাকি জাতজন্মেরই ঠিক নেই। মায়ের সঙ্গে তার নাকি মোটে বিয়েই হয়নি।

এইসব নিয়েই সমস্যা মরণের। পড়ার ঘরে বসে সে তাই গভীরভাবে ভাবছিল।

আচমকাই জানালায় খুটখুট করে শব্দ হল একটা। ভারী চমকে গিয়েছিল মরণ।

কে রে!

জিজিবুড়ি চাপা গলায় বলল, ও মরণ, জানালাটা একটু ফাঁক কর দিকি ভাই।

মরণ গিয়ে জানালার ছিটকিনি খুলে বলল, কী জিজিবুড়ি?

বলি, কে এল রে তোদের বাড়িতে! অত হাসি-মস্করা কীসের?

দিদি এসেছে যে!

জিজিবুড়ি চোখ বড় বড় করে বলে, দিদি মানে! বাঙালের মেয়েটা নাকি? ও বাবা, এ যে একে একে সবাইকে এনে জোটাচ্ছে! তোদের ভিটেছাড়া করবে নাকি!

তুমি এখন যাও জিজিবুড়ি, কে দেখে ফেলবে।

বলি ছেলেটাও তো এখনও বিদেয় হয়নি। জ্বরের বাহানা করে চারদিন না পাঁচ দিন পড়ে আছে। ও আর যাবেও না। আর বাসন্তীরও বলিহারি যাই, পারলে পাদোদক খায়। তা মেয়েটা এয়েছে কী করতে জানিস?

বেড়াতে এসেছে।

বেড়ানোর কি আর জায়গা নেই বাপু! হিমালয় আছে, মথুরা-বৃন্দাবন আছে, দিল্লি-বোম্বাই আছে, সব ফেলে এখানে এসে আবার গুঁতোগুতি কেন?

তা আমি জানি না। তুমি এখন যাও।

যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। এ পথ দিয়েই যাচ্ছিলুম, নতুন গলা পেয়ে খোঁজ নিয়ে গেলুম। ছেলে-মেয়েকে এনে তো দখল কায়েম করলে, এবার বড়গিন্নিকে এনে বসালেই চিত্তির। তোর মাকে বলিস গয়নাগাঁটি সোনা-দানা সব সামলে রাখতে। মেয়েমানুষের চোখ খুব খারাপ। ঝাঁত করে সব জিনিসের তল্লাশি নিয়ে নেবে। আমি বাপু লক্ষণ মোটেই ভাল বুঝছি না।

এসব শুনলে মন আরও খারাপ হয়ে যায় মরণের।

ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে কারা নামছে শুনে মরণ বলল, তুমি এখন যাও জিজিবুড়ি। কে যেন আসছে।

বলেই পাল্লাটা বন্ধ করে দিল মরণ।

পাশেই রান্নাঘর। সেখান থেকে মায়ের গলা পাওয়া গেল, ও মুক্তা, মশলাটা তাড়াতাড়ি বেটে ফেল, আজ একটু মুড়িঘণ্ট করব।

মশলা কখন হয়ে গেছে!

তাহলে শিলটা ভাল করে ধুয়ে একটু পোস্ত বেটে ফেল দেখি।

এইসব শুনতে শুনতে আরও গভীর ভাবনায় ডুবে যাচ্ছিল মরণ। যত বড় হচ্ছে তত তার ভাবনা বাড়ছে। এইজন্যই আজকাল বড় হওয়াটাকে তেমন পছন্দ হয় না মরণের।

ভাবতে ভাবতেই কখন টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

রাত সাড়ে দশটা না এগারোটায় মা এসে ডেকে তুলল তাকে।

ও মা! তাই তো বলি ছেলেটার সাড়াশব্দ নেই কেন! আয় আয় শিগগির, দিদি এসেছে তো। কতবার করে জিজ্ঞেস করছে তোর কথা!

আমার কথা! বলে মরণ অবাক। তার কথা কেন জিজ্ঞেস করবে। তাকে তো কেউ একটুও দাম দেয় না!

আয় বাবা, উঠে পড়।

ঘুম-চোখেই দেখা হল দিদির সঙ্গে। খাওয়ার টেবিলে।

দেখা হতেই হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়ে পাশের চেয়ারে বসাল।

এ বাবা, তোমার তো ভীষণ দুষ্টু-দুষ্টু চোখ! খুব দুষ্টু বুঝি তুমি?

মরণ হেসে ফেলল।

রসিক সাহা বলল, আরে একেবারে ল্যাজকাটা বান্দর। পড়া নাই, শুনা নাই, সারাদিন পাড়া টহল দিতাছে। খ্যালনের কথা ক’ গাছ বাওনের কথা ক’, ফাল দিয়া উঠব।

দাদা মৃদু-মৃদু হাসছিল। বলল, না, না, ওর ব্রেন আছে। একটু দুষ্টু হলেও পাজি নয়। হি ইজ গুড। আই লাইক হিম।

রাতে বেশি কথা হয়নি আর।

সকালে তার পড়ার ঘরে এসে হামলে পড়ল দিদি।

অ্যাই তোর এত বিচ্ছিরি নাম কেন রে? তোর পোশাকি নাম নেই?

না তো! আমার ইস্কুলের নাম তো মরণকুমার।

এ মা! তোর এ-নামটা ভাল লাগে?

নাঃ, একটুও না।

দাঁড়া, বাবাকে বলে তোর নামটা পালটে দিচ্ছি। কে এ-নাম রাখল বল তো!

বাবাই রেখেছিল। আমার একটা দিদি হয়ে মরে গিয়েছিল বলে নাকি এ-নাম রাখা হয়।

ধ্যেৎ, যত সব কুসংস্কার। তোর একটা ভাল নাম নিতে ইচ্ছে করে না?

এক গাল হেসে মরণ বলে, হ্যাঁ তো। আমার একটা নাম খুব পছন্দ।

কী নাম?

বিশ্বজিৎ।

ধুর! বিশ্বজিৎ একটা নাম হল! এ তো পঞ্চাশ বছর আগের যুগের নাম।

কাঁচুমাচু হয়ে মরণ বলে, তাহলে?

পুঁটি একটু ভাবল। ভেবে বলল, অবিশ্যি মরণকুমার নামটা বেশ নতুন ধরনের কিন্তু। ইট হ্যাজ শার্প এজেস। বেশ ধারালো নাম। কোথায় শুনেছি বল তো এ-নামটা!

মরণ হেসে বলল, বাবা খুব ঢাকার মরণচাঁদের মিষ্টির দোকানের কথা বলে।

ওঃ ইয়েস! না, আফটার এ সেকেন্ড থট নামটা আমার খারাপ লাগছে না।

করুণ মুখে মরণ বলে, তাহলে নামটা বদলাতে বলবে না?

না। নামটার একটা অ্যাপিল আছে। তোর বিশ্বজিতের চেয়ে অনেক ভাল। অন্তত ভ্যাতভ্যাতে নাম নয়।

মরণ একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছিল। আলোটা পট করে নিবে গেল।

কী পড়ছিস?

ইংরেজি।

আজ আর পড়তে হবে না। ওঠ।

কোথায় যাবে?

চল না। দোতলার বারান্দা থেকে দেখলাম, বাগানে একটা কুল গাছ রয়েছে। ঝেঁপে কুল এসেছে তাতে।

কুল! হ্যাঁ, কুল গাছ আরও আছে।

কুল খাস না?

মা খেতে দেয় না যে। কাঁচা কুলে নাকি অসুখ হয়। পাকলে খাই।

এ মা, ডাঁশা কুলের মতো জিনিস আছে!

অবাক হয়ে মরণ বলে, এই সকালে কুল খাবে? ভীষণ টক যে!

টক বলেই তো খাবো। তবে এখন নয়। দুপুরে ঝালনুন দিয়ে। গাছে শুঁয়োপোকা নেই তো!

খুব আছে। তবে আমার তাতে কিছু হয় না। কচু পাতার রস লাগিয়ে দিলেই কমে যায়।

চল তো, ঘুরে ঘুরে চারদিকটা দেখি।

মরণ সেটাই চায়। সে বই বন্ধ করে টপ করে উঠে পড়ল।

কোথায় যাবে দিদি?

আগে বেরোই তো, তারপর দেখা যাবে।

দিদিটা যে দেখতে খুব সুন্দর, তা নয়। রাতে ঘুমচোখে আর লজ্জায় ভাল করে দেখেনি। দিদিটা রোগা, মুখখানা ভাঙাচোরা, দাঁতগুলোও ভাল নয়। তা হোক, বেশ হাসিখুশি আছে। শিবঠাকুরের কাছে তো সে সুন্দর দিদি চায়নি। চেয়েছিল, যেন দাদা, দিদি আর বড়মা তাকে খুব ভালবাসে। সেটা হলেই হল।

মুখবাঁধা মস্ত মেটে কলসি নিয়ে বিপিন এসে বসেছে উঠোনের রোদে।

খেজুর রস খাবে না দিদি?

পুঁটি নাক কুঁচকে বলল, খেজুর রস? কেমন খেতে?

খুব ভাল। আমরা তো সবাই খাই।

পুঁটি বিপিনের দিকে সন্দিহান চোখে চেয়ে বলল, খাবো? লোকটার জামাকাপড় যা ময়লা!

মরণ হেসে বলল, ও তো মাঠে কাজ করে। জামাকাপড়ে মাটি লেগে যায়।

পুঁটি খুঁতখুঁত করে বলল, কলসির মুখের ন্যাকড়াটার অবস্থা দেখেছিস? হাকুচ কালো।

ও তো রসের দাগ। খাও না, কিছু হবে না। আমরা তো রোজ খাই।

ওপর থেকে রসিক সাহা হাঁক মেরে বলল, আরে খা, খা। খেজুর রসে মেলা ভিটামিন।

উঠোনে নেমে হাম্মিকে রোদে হামা দিতে ছেড়ে দিয়ে রসিকও বসে গেল রস খেতে।

এক চুমুক খেয়ে পুঁটি স্বাদটা বুঝবার চেষ্টা করল একটু। তারপর বলল, দুর, ভ্যাতভ্যাতে স্বাদ। কোনও কিক নেই। এর চেয়ে কোক ভাল।

মরণ হি হি করে হেসে বলল, ভ্যাতভ্যাতে মানে কী দিদি?

ভ্যাতভ্যাতে! ভ্যাতভ্যাতে মানে ভ্যাতভ্যাতে। তার মানে হচ্ছে ভাতের মতো। তাও তো বিস্বাদ।

কিন্তু ভাত তো আমরা রোজ খাই।

হুঁ, সে কথা ঠিক। কিন্তু শুধু ভাত হল ভ্যাতভ্যাতে। বুঝলি?

হুঁ, সে কথা ঠিক। কিন্তু শুধু ভাত হল ভ্যাতভ্যাতে। বুঝলি?

হেসে ঘাড় নাড়ল মরণ।

পুঁটি চারদিকে চেয়ে বলল, তোদের সবকিছুই ভ্যাতভ্যাতে, না রে?

মরণ ফের হি হি করে হাসল। বেশ দিদি। ভাল দিদি।

রান্নাঘরে উনুনের কাছটি ঘেঁষে জিজিবুড়ি বসা। একটা খয়েরি রঙের ময়লা, ছেঁড়া পুরনো আলোয়ানে মাথা-টাথা ঢেকে জবুথবু। হাতে নিত্যনৈমিত্তিক দুধ-চায়ের গ্লাস। মুখখানা গম্ভীর। তোম্বাপানা। ভিতরে বিষ জমেছে ঢের। বাসন্তী মায়ের চোখ দেখলেই টের পায়, এবার বিষ ওগরাবে। তবে বিষ ওগরানো ছাড়া তার মায়ের আর কিছু করারও নেই।

ছেঁড়া আলোয়ানটা দেখে কষ্টই হয় বাসন্তীর। সেই ছেলেবেলা থেকে শীতকালে মায়ের গায়ে ওই আলোয়ানটাই দেখে আসছে। গরম জিনিস বড় পুরনো হয়ে গেলে ওম কমে যায়। গাঁয়ের এই চাষাড়ে শীত মানতে চায় না। তার মায়ের দ্বিতীয় কোনও শীতবস্ত্র যে নেই, তা বাসন্তী ভালই জানে। রাতে গায়ে দেয় একখানা পুরনো লেপ। তুলো-টুলো সরে গিয়ে সেই লেপেরও জায়গায় জায়গায় জ্যালজ্যালে অবস্থা।

বাসন্তী ইচ্ছে করলে মাকে একখানা আলোয়ান কিনে দিতে পারে, বানিয়ে দিতে পারে নতুন লেপ। কিন্তু না-দেওয়ার কারণ আছে। কারণটা হল, সেই আলোয়ান বা লেপ কোনওটাই মায়ের ভোগে লাগবে না। তার দুই অসুর ছেলে ভোগা দিয়ে হাতিয়ে নেবেই নেবে।

অকালকুষ্মাণ্ড দুটো ছেলের জন্য মায়ের অনেক পোড়ানি আছে বুকের মধ্যে।

বাসন্তী মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ মা, আমাকে কি পেটে ধরোনি তুমি! সত্যি করে বলল তো। তোমার ভাবগতিক দেখে মনে হয় আমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলে! তোমার ছেলেরাই তোমার সর্বস্ব।

এসব ভাবের কথা অবশ্য জিজিবুড়ি গায়ে মাখে না। তাকে দোষ দিয়ে লাভও নেই। সারাটা জীবন ভাত-কাপড়ের কষ্ট, উঞ্ছবৃত্তি করে করে মানুষটা আর সেই মানুষও তো নেই। মনটা দড়কচা মেরে গেছে।

কাল রাতে রসিক মেয়েকে নিয়ে এসেছে। আসতেই পারে। বাসন্তী খুশিও হয়েছে খুব। দুই পরিবারের মন কষাকষি আর দূর হয়ে, পর হয়ে থাকা যদি একটু কম হতে থাকে তো বাসন্তী তার মধ্যে মন্দ কিছু দেখে না।

কিন্তু সংসার হল আঁস্তাকুড়। এখানে ভালকে ভাল বলে দেখা, সোজাকে সোজা বলে ধরার তো রেওয়াজ নেই! এই যে মেয়ে এসেছে এ নিয়েও কথা হয় এবং হবে।

সকালে আঁশটে মুখ করে ওই যে মা এসে বসেছে, তার মানে পেটে জিলিপির প্যাঁচ চলছে। বাসন্তী নিজে যে একটু ভালমানুষ গোছের, তার যে পাঁচালো বুদ্ধি নেই, সে যে ঝগড়ুটে নয়, দজ্জাল নয়, সে যে মুখ খারাপ করতে পারে না এটা সে নিজেও জানে। কিন্তু মা তার এই ভালমানুষি একদম পছন্দ করে না। হয়তো তার মা চায় বাসন্তী তার মায়ের মতোই হোক। সংসারের আঁস্তাকুড় হাঁটকে জীবনটা কাটাক।

তাই অবশ্য হওয়ার কথা ছিল বাসন্তীর। ছেলেবেলা থেকে এক অশান্তির সংসারে সে বড় হয়েছে। মায়ে-বাবায় বনিবনা হত না। তার দুই দাদা ডাগর হয়ে নানা বদমাইশিতে ঢুকে পড়ল। বাসন্তীর তো ভাল হওয়ার কথাই নয়। ভিতু স্বভাবের বাসন্তী বরাবর একটু বাপ-ঘেঁষা ছিল। বাবা কৃতী পুরুষ ছিল না বটে, কিন্তু লোক খারাপ ছিল না। বাসন্তীকে ভালও বাসত খুব। বোধহয় বাবা-ঘেঁষা হওয়াতেই তার স্বভাবে বাপের ছাপ পড়েছে বেশি। আর কপালগুণে বর পেল বাঙালকে। ভগবান সবটা দেন না, দিতে দিতেও খানিক কেড়ে রেখে দেন। তাই বাঙালের মতো বর পেলেও সবটা পেল না সে। বড়বউ খানিক দখল করে রাখল।

তা হোক। এতটাই কি আশা করেছিল সে! চারদিকে ফলন্ত, ভরাট সংসার, মা লক্ষ্মী উপচে পড়ছে চারদিকে। এতটাই কি হওয়ার কথা? নিষ্কন্টক নয় বটে, কিন্তু কাটা গাছের ফুলও কি কম ভাল!

বাসন্তী কচুরির পুর তৈরি করতে করতে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করছিল, কখন মা বিষ ওগরাবে।

গেলাসটা খালি করে রেখে দিয়ে জিজিবুড়ি বলল, তা বড়বউ কবে আসছে? এখন সুয়োরানি এসে পাটে বসলেই তো হয়।

বাসন্তীর বুক কেঁপে উঠল। তবে সে কিছু বলল না।

জিজিবুড়ি হঠাৎ ডুকরে উঠল, হরিবোল বাবা, হরিবোল। চুষিকাঠি ধরিয়ে এতকাল ভুলিয়ে ভালিয়ে রেখে এবার লাথি ঝাঁটা মারার সময় হয়ে এল।

বাসন্তী চোখ পাকিয়ে বলল, দুধ তো গিলেছ। এবার এসো গিয়ে।

যাচ্ছি মা যাচ্ছি। শুধু বলে যাই ওই হাড়গিলে চেহারার মেয়েটা কিন্তু মনিষ্যির চেহারায় শকুন। ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে। একে একে আসছে সব সুয়োরানির দূত। মনে রাখিস।

বাসন্তী অখণ্ড মনোযোগে পুর মেখে উনুনে কড়াই চাপাল।

হঠাৎ সুর পালটে জিজিবুড়ি বলল, হাজার দুই টাকা দিবি?

অবাক হয়ে বাসন্তী বলে, দু হাজার টাকা! কেন?

ধার বলেই দে। দু মাস বাদে ফেরত দেবো।

দু মাস বাদে কি লটারি পাবে নাকি?

মায়ের পেটের দুটো ভাইয়ের জন্য তো আর কিছু করে দিলি না। কত করে বললুম, বাঙালকে ধরে বাজারের দোকানঘরটা করে দে। দুজনে মিলে করে কর্মে খেতে পারত। বাঙালের টাকাও শোধ হয়ে যেত এতদিনে। তা আর যখন হল না তখন আর কী করা! কানু বাড়িতেই ব্যবসা ফেঁদেছে একটা। ধূপকাঠি আর মাজন তৈরি করে বেচবে।

দাদারা আজকাল বাসন্তীর কাছে বিশেষ আসতে সাহস পায় না। একসময়ে যথেষ্ট লুটপাট করে বাসন্তীকে প্রায় পথে বসিয়ে দিয়েছিল। এখন পাত্তা না পেয়ে পেয়ে আর বিশেষ আসে না। তবু তার মধ্যেও মাঝে মাঝে নির্লজ্জের মতো এসে টাকা ধার চায়। বাসন্তী ধার দেয় না বটে, তবে দু-দশ টাকা দিয়ে বিদেয় করে দেয়। মিথ্যে করেই বলে, টাকাপয়সা আমার কাছে থাকে না, সব তোমাদের ভগ্নীপতির হেফাজতে। কথাটা ওরা বিশ্বাস করে না বটে, কিন্তু বেশি কিছু বলতেও পারে না। বলার মুখও নেই কিনা!

বাসন্তী বলল, টাকা নেই।

জিজিবুড়ি বিরস মুখে বলে, ধান-বেচা টাকাগুলো তো সদ্য হাতে পেলি।

সেটা হিসেবের টাকা। তোমার জামাই ব্যবসা করে খায়। সে হিসেব বুঝে নেয়। বেহিসেবি চলে না।

আজকালকার বাজারে দুটো হাজার টাকা কি একটা টাকা! নাহয় একটু বানিয়ে-ছানিয়ে যাহোক বলে দিবি। কানু বলেছে এ-টাকা সে ফেরত দেবে।

সে তো খুব ভাল কথা মা। ফেরত পেতে তো আমার হাড়ে দুব্বো গজাল। আর গিল্টি করা কথাগুলো বোলো না তো!

এরপর ভাই দুটো যদি চুরি-ডাকাতি করে খায় তাতে কি তোর মান বাড়বে নাকি!

আমার মান নিয়ে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। চুরি ডাকাতির কমটাই বা কী করেছে তারা শুনি?

জিজিবুড়ি একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার ভয় কী জানিস? গলায় দড়ি-টড়ি না দিয়ে বসে।

তোমার ছেলে দেবে গলায় দড়ি! হাসালে মা। সে দড়ি এখনও তৈরি হয়নি।

জিজিবুড়ি আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে গেলে সে কি আর এমন মানুষ থাকবে? শত হলেও ভদ্রলোকের ছেলে তো। অভাবে পড়ে নাহয় অকাজ কুকাজ করে ফেলেছে। তা বলে এটা তো আর খারাপ নয়।

আমি অত তত্ত্বকথা জানি না মা। তোমার ছেলেদের আমার বিশ্বাস হয় না, জেনে রাখো। বহুবার বহু ছুতোয় টাকা নিয়ে মদ-গাঁজা খেয়েছে না হয় পেট পুজোয় গেছে।

তা কী করবে বল! অভাবের সংসার, এণ্ডি-গেণ্ডি ছেলেপুলে, সেগুলোকে তো আর ফেলে দিতে পারে না।

ছেলেপুলেই বা গণ্ডায় গণ্ডায় হয় কেন? অভাবের সংসার, এক পয়সা আয় নেই, অথচ দুই ছেলে দুই বউ জুটিয়ে আনল। জাত দেখলে না, বংশ দেখলে না, কোত্থেকে কাকে ধরে আনল খোঁজ নিলে না। তারপর বছর বছর বংশ বিস্তার করে যাচ্ছে। বেশ যা হোক।।

না হয় আমাকেই দিলি টাকাটা, গরিব মাকেও তো লোকে দেয় খেতে নাকি?

তেমন মা তো তুমি নও! এতদিন বলিনি, জামাইয়ের হাতে দেবে বলে একটা ফর্দ লিখেছিলাম, তার মধ্যে আফিং-এর কথাটা কে লিখিয়েছে বলতে পারো? নাতিকে তুতিয়ে পাতিয়ে তুমিই লিখিয়েছ। এ কি ভাল?

তোম্বা মুখ করে জিজিবুড়ি বলে, তোকেই বলতুম। তা তখন তুই শীতলাবাড়িতে গিয়েছিলি বলে—

আর মিথ্যে কথা বলে পাপের বোঝা বাড়িও না। টাকাপয়সা আমি আর দিতে পারব না, বলেই দিচ্ছি।

টাকাপয়সা কি তোরই থাকবে ভেবেছিস? ভাগাড়ে তো শকুনের নজর পড়েছে দেখতেই পাচ্ছি। বুদ্ধি থাকলে সাঁট করে দশ বিশ হাজার টাকা সরিয়ে আমার কাছে গচ্ছিত রাখলেও পারতিস। আখেরে কাজ হত।

তোমার কাছে টাকা রাখা মানে তো সাপের কাছে ব্যাঙ রাখা। আমার তো আর মতিচ্ছন্ন হয়নি। আমার টাকা আমার কাছেই থাকবে। আমার ভালর জন্য ভেবে আর চোখের জল ফেলো না তো।

রান্নাঘরটা মস্ত বড়। তার এক কোণে বসে মুক্তা মশলা বাটছিল। সে সাতে পাঁচে থাকে না। আজ হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল, কেন বাপু রোজ এসে ঘ্যানঘ্যান করো। বাবা কি তেমন লোক?

জিজিবুড়ি ভস্ম-করা চোখে মুক্তার দিকে চেয়ে বলল, এঃ, বড় আমার বাবা-উলি এলেন রে। বাঙাল আবার কবে তোর বাবাকেলে বাবা হল শুনি! বাঙাল হল মগেদের দেশের লোক, সাপ ব্যাঙ সব খায়, ওদের বামুন-কায়েত নেই। ছিষ্টিছাড়া জীব। কোন সুবাদে তাকে বাপ ডাকতে যাস শুনি। দেখছিস তো কেমন একে একে ছেলে মেয়ে আমদানি করে ঘট-প্রতিষ্ঠা করে রাখছে। এরপর আমার মেয়েটাকে কাঁত করে লাথি মেরে যদি না তাড়ায় তো দেখিস! কপাল খারাপ না হলে, মরতে ওই লোকের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিই! এখন বরাতে কী আছে কে জানে বাবা! আর মেয়েটাও আমার বোকার হদ্দ। নইলে বাঙালের সঙ্গে নাচে! গাল ভরে বাবা ডাকছিস। কোন সঙ্গে তুলবে তোকে ওই ম্লেচ্ছটা শুনি!

মুক্তা তার নিজের মতো করে একটা সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছে। রসিক সাহা তাদের বন্ধকী জমি উদ্ধার করে দিয়েছে, তাদের ভাঙা ঘর ছেয়ে দিয়েছে। মুক্তার মা-বাবা এই বুড়ো বয়সে বাঙালের জন্যই একটু সুখে আছে। তার ওপর মুক্তার জন্য পাত্রেরও খোঁজ করছে বাঙাল। বলে রেখেছে বিয়ের সব খরচ তার। কৃতজ্ঞতায় আপনা থেকেই বাবা বলে ডাকে মুক্তা, কেউ শিখিয়ে দেয়নি। আর বাবার প্রতি তার অসম্ভব পক্ষপাত।

জিজিবুড়ির দিকে চেয়ে সে বলল, বাবার মতো মানুষের কুচ্ছো গাইছ, কলিকাল বলে তোমার মুখে পোকা পড়ছে না! বাবার মতো মানুষ বলেই বাবা ডাকি। তাকে ডাকব না তো কি তোমাকে বাবা বলে ডাকব? রোজ এসে এ-বাড়িতে শেয়ালের মতো ঢুকে মেয়ের সংসার ভাঙার চেষ্টা করো, তুমি কেমনধারা মা? নিজের সংসারে তো আগুন লাগিয়ে বসে আছ, সেখানে সুন্দ উপসুন্দের লড়াই হচ্ছে রোজ। সব খবর রাখি।

দ্যাখ মুক্তা, তোর বড় আস্পদ্ধা হয়েছে কিন্তু! চিরটা কাল পরের বাড়ির এঁটো পাত কুড়িয়ে বড় হয়েছিস। তোর এত গুমোর কীসের রে! বলি বাঙালের খুঁটোর জোরে সাপের পাঁচ পা দেখলি নাকি? কার সঙ্গে কইছিস সে খেয়াল আছে?

তা থাকবে না কেন? খুব আছে। তুমি হলে তো বাবুর শাউড়ি। কিন্তু শাউড়ির যা ছিরি দেখছি তাতে ঘেন্না হয় বাপু। মান চাইলে মানী হতে হয়। এ বাড়ির দুধটুকু, সরটুকু, এ বাড়ির নারকোল, সুপুরি কোনটা না হলে তোমার চলে বলো তো! আমরা এটো পাত কুড়িয়ে বড় হয়েছি, আর তুমি?

আমাকে খুঁড়ছিস? এ আমার মেয়ের বাড়ি, তা জানিস? আমার হক আছে।

তা আমারই বা হক থাকবে না কেন! আমরা গতরপাত করে খেটে খাই, বুঝলে! তোমার মতো মাগুনে বেওয়া নই। হাতটি তো পেতেই আছ। আবার যারটা খাচ্ছ তার মুণ্ডুও পাত করছ।

লহর তুলে হেসে কুটিপাটি হয়ে জিজিবুড়ি বলল, ওলো গতরওয়ালি লো! দেখিস আবার বেশি গতরের গুমোর করিসনি। পেট-টেট বাধিয়ে না বসিস। সোহাগ করে বাপ ডাকছিস ডাক, কিন্তু গতর সামলে!

মুক্তা এই অশ্লীল ইঙ্গিতে খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে বসে রইল। তারপর বাসন্তীর দিকে চেয়ে বলল, শুনলে বউদি, শুনলে! এখন যদি মুখ ছোটাই তাহলে তোমরা আমার দোষ দেখবে। ও তোমার মা, নইলে জিজ্ঞেস করতুম, ওই মুখ দিয়ে খায় না হাগে, এমন লোকের মুখ দেখলে গঙ্গায় নাইতে হয়।

বাসন্তী মায়ের দিকে চেয়ে বলল, দিন দিন তুমি কী হয়ে যাচ্ছো বলো তো! ভদ্রলোকের সমাজে মুখ দেখাও কী করে?

জিজিবুড়ি দমল না। মুখে বিষাক্ত হাসিটা ধরে রেখেই বলল, ও মা! খারাপ কথা কী আবার বললুম! সোমত্থ বয়সের মেয়ে, রূপযৌবন আছে, তাই সাবধান করে দেওয়া। বাঙাল মনিষ্যিদের কি চরিত্তির থাকে রে বাপু!

মুক্তা ফুঁসে উঠে বলল, তোমার চরিত্তির ঠিক রাখ গিয়ে। শ্মশানে বাড়িয়ে বসে আছ, তবু মুখে একটা ভাল কথা শুনলুম না। জন্মে কখনও শুনিনি বাপু কেউ নিজের মেয়ের সর্বনাশ করার জন্য আদাজল খেয়ে লাগে। বলি, ও ভালমানুষের মেয়ে, তোমার মতো গুয়ের পোকারা যদি ওই বাঙালের পাদোদক খায় তবে উদ্ধার হয়ে যায়। বুঝলে! এখন এ বাড়ি থেকে বিদেয় হও, নইলে আমি বাবাকে ডেকে এনে দেখাব তার শাউড়ি রোজ চোরের মতো এসে এ বাড়িতে কেন ঢোকে! তোমার লজ্জা হয় না এবাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে?

কথাগুলো গায়ে না মেখে জিজিবুড়ি উঠে পড়ল। খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, মা-মেয়ের কথার মধ্যে তুই আসিস কেন লা? ঝি-গিরি করছিস তাই কর। আর তোরও বলিহারি যাই বাসন্তী, কাজের লোককে মাথায় তুলছিস একদিন বুঝবি। কথায় বলে গোলামের ওষুধ হল পয়জার। মেনি বেড়ালের মতো মিউ মিউ করলে কি চলে? এসব নিকৃষ্ট মেয়েছেলেদের পায়ের তলায় দেবে রাখতে হয়।

এখন যাও তো মা, আর অশান্তি কোরো না।

যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। পেটে ধরেছিলুম বলে সেই মায়ায় আসা। নইলে কে বাড়ি বয়ে জুতো খেতে আসে!

কেউ তোমাকে জুতো মারেনি মা, নিজের দোষে তুমিই জল ঘোলা কর।

খুব ভালমানুষের মতো, সব রাগ-টাগ ভুলে জিজিবুড়ি বলল, টাকাটার কথা একটু মনে রাখিস মা। কানু বলেছে না হয় সুদই দেবে। দু হাজার দিবি, দু মাস বাদে আড়াই হাজার ফেরত পাবি। টাকাটাও খাটল, ভাইটারও আয়-পয় হল।

কোণ থেকে ইঁ...ইঁ...ইঁ... বলে একটা দীর্ঘ শব্দ করল মুক্তা। তারপর বলল, পুলি পিঠের ন্যাজ বেরোবে গো! উনি দেবেন সুদ। খানেকা ঠিকানা নেহি, নও বাজে চান।

জিজিবুড়ি দরজার কাছ থেকে ফিরে বলল, তাতে তোর কী রে বেশ্যে মেয়ে কোথাকার!

শুনলে বউদি! আমি বেশ্যে হলে ও কী?

বাসন্তী তাড়াতাড়ি দুজনের মাঝখানে পড়ে বলল, ওসব কানে তুলিসনি মুক্তা। কাজ করে যা। তুমি এবার বিদেয় হও তো মা।

জিজিবুড়ি চলে যাওয়ার পর বাসন্তী তাড়াতাড়ি উঠে রান্নাঘরের পাশের গলিটাতে এসে দাঁড়াল। তার চোখ ফেটে জল আসছে। তার মা ওইরকম বটে, কিন্তু একটু কষ্টও তো হয় বাসন্তীর। মা তো লাথি- ঝাঁটা খেয়েই ছেলেদের সংসারে পড়ে আছে। জ্বলেপুড়ে খাক হচ্ছে।

চুয়াল্লিশ

এসব কী এনেছ?

ফলমূল বুড়িমা। সন্দেশও আছে।

অ্যাঁ! ফলমূল! আবার সন্দেশ!

হ্যাঁ গো বুড়িমা, এই যে আপেল, কমলালেবু, আঙুর, সবেদা, বেদানা, কলা। আর এই বাক্সে সন্দেশও আছে।

তা ভাল বাছা। দিয়েছ, দাও। কিন্তু দাম চাইবে না তো! আমার কিন্তু বাপু পয়সা-টয়সা নেই।

আরে না বুড়িমা, পয়সা লাগবে না। এমনিই দিচ্ছি, আজ স্বাধীনতা দিবস তো, তাই।

অ, তাই বলো! আজই তাহলে সেই অনামুখো, সৃষ্টিছাড়া দিন!

আহা, ওরকম করে কি বলতে আছে? আজকের দিনটায় আমাদের দেশ যে স্বাধীন হয়েছিল।

অতশত জানি না বাপু। এক দিন দুপুরে যতুর বাপ এসে ধপ করে দাওয়ায় বসে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লেগেছিল। অত বড় মানুষটা, জীবনে তার চোখে জল দেখিনি। সেদিন কী হাউ হাউ করে কান্না! তারপর বলল, দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে গো, এবার পোঁটলা পুঁটলি বাঁধো। দেশ ছাড়তে হবে। ঘরে ঘরে নিশানও তুলেছিল বটে লোকে, বাজি পটকা কম ফাটেনি। কিন্তু আমাদের তাতে কী বলো। স্বাধান-টাধিন তো বুঝিনি বাবা, শুধু বুঝেছি, কিছু একটা হয়েছে। আমাদের এখন পাততাড়ি গোটাতে হবে।

ওসব অতীতের কথা বলে কী লাভ বুড়িমা? কিছু লোকের কষ্ট হয়েছিল একথা সত্যি। দেশ ভাগ হওয়ায় আমরাও কি দুঃখ পাইনি?

দুঃখের কপাল তো ভগবানের কাছ থেকেই নিয়ে এসেছি, সেজন্য কি আর কাঁদুনি গাইছি? শুধু বলছি, এই দিনটায় কারও ছিল পৌষমাস, কারও সব্বোনাশ। জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করতে করতেই কিছু লুটপাট হল, কারা যেন এসে চোটপাট করে শাসিয়ে গেল, খবর্দার ভিটে ছাড়বি না, কিন্তু বাপু, আমরা তো কথা-টথা জানি না, আমাদের শুধু প্রাণের ভয়। শুধু প্রাণটুকুরই তো মায়া, কী বলো!

আজকের দিনে ওসব কথা থাক না বুড়িমা।

কেন বাছা, আজকে কি আমাদের মৌনীব্রত? কথা কইতে নেই বুঝি?

না না, তা নয়।

তাহলে একটু বলিই না হয় বাপু। প্রাণটা যে কেমন জিনিস তা কি জানো?

প্রাণের মায়া কার নেই বলো বুড়িমা?

সে বটে। আমাদেরও খুব ছিল। ডাকাতে, গুণ্ডায় ধরলে শুধু হাতে পায়ে ধরে বলেছি, প্রাণে মেরো না বাপু। তা মারেনি বলেই তো বেঁচে আছি। বয়সের মেয়েকে টেনে নিয়ে যায়, জোয়ান ছেলেকে বল্লম দিয়ে খোঁচায়,

চোখ রাঙিয়ে কতবার টিপছাপ নিয়ে যায়, আমরা কিছু বলিনি বাপু, রুখেও উঠিনি, শুধু ওই প্রাণের ভয়। শেষে সার বুঝেছি কী জানো?

কী বুড়িমা?

যদ্দুর বাপ যেদিন গলায় দড়ি দিল সেদিন হঠাৎ বুঝলুম যা নেই তার আবার মায়া কীসের বলো! আমাদের মোটে প্রাণই নেই, শুধু দেহটা অভ্যাসের বশে চলে। প্রাণ থাকলে সেটা কি এত সহ্য করতে পারত? নাড়ি ধরে যদি দেখ বাছা, দেখবে নাড়ি আমার চলছে না।

না বুড়িমা, তুমি তো দিব্যি বেঁচে আছ!

কী জানি বাপু, দিনকে দিন, রাতকে রাত বলে চিনতেই পারি না। তা বাপু, এই যে এত সুন্দর সুন্দর সব ফল-টল দিলে এসব কি আসল জিনিস?

আসল নয় তো কি নকল বুড়িমা?

কী জানি বাপু, কেষ্টনগরে নাকি মাটি দিয়ে কী সব বানায়, ঠিক আসলের মতো দেখতে। সে জিনিস নয় তো? এই অনেকটা আমাদের মতোই, মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু মানুষ নয়।

আহা বুড়িমা, তোমার মাথাটাই গেছে, একটু খেয়েই দেখো না।

না বাছা থাক, দেখনসই জিনিস, একটু বরং দেখি।

অ বুড়িমা! বলি ঘুমোচ্ছ নাকি?

তা কে জানে বাছা। চোখ বুজলে কখনও মনে হয় ঘুমোচ্ছি, কখনও মনে হয় মরে গেছি। কোনটা তা বলতে পারি না।

ফলগুলো তো খাওনি দেখছি!

যত্ন করে রেখে দিয়েছি। ও কি খাওয়ার জিনিস বাপু?

খাওয়ার জিনিস না তো কী?

জন্মে খাইনি। আপেল, আঙুর ওসব কি খায় বাছা?

খায় তো। খেলে শরীর ভাল হয়।

আমার হবে?

হবে না কেন?

মরা জিব বাছা, খেলে আবার ভিরমি খাই কিনা কে জানে। সকালে এক ডেলা পাউরুটি দিয়েছিল, আর দুধ, তা বেশ খেলুম বাছা, অনেকে দুধ মুখে দিয়ে ওয়াক তুলে বলছিল ও নাকি মোটে দুধই নয়, চকখড়ি গুলে নিয়ে এসেছে। তা বাপু, আমার কিন্তু খারাপ লাগেনি। দুপুরে বেশ ভাত দিয়েছিল অনেকটা। সঙ্গে এক টুকরো মাছ আর ডাল। সেও সবাই ছি ছি করছিল, বলছিল মাছ নাকি পচা, ডাল নাকি হলদে জল, ভাতে নাকি গন্ধ, তা বাছা, আমার তো কিছু খারাপ লাগল না।

তা সেসব খেতে পারলে আর ফলগুলো পড়ে রইল? তুমি কেমন ধারা লোক?

ওই ভয়েই তো খাইনি। ওসব ফল-টল খেলে জিব যদি ফের স্বাদগন্ধ পেতে শুরু করে তখন কি আর হাসপাতালের খাবার খেতে পারব?

নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

রাগ কোরো না গো ভালমানুষের ছেলে। তুমি বড় ভাল লোক। আমি আজকাল যাকেই দেখি তাকেই মনে হয় ভাল লোক। পরশুদিন আমার ভাইঝি দেখতে এসে দুটো টাকা দিয়ে গিয়েছিল। বালিশের তলায় রেখেছিলাম যত্ন করে। সকালবেলায় জমাদারটা এসে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে বের করে নিয়ে গেল। তা বাপু তাকেও আমার কেন যেন ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছিল। সবাই তাকে গালমন্দ করে বটে, সে নাকি ঝাটপাট দেয় না, পায়খানা পরিষ্কার করতে চায় না, তার জন্যই নাকি চারধারে গু-মুত জমে আছে, কিন্তু আমার তাকে দিব্যি ভালমানুষ বলে মনে হল।

এটা সরকারের হাসপাতাল বুড়িমা, সরকার ওদের মাইনে দেয়, ওদের কাজ করা উচিত।

হ্যাঁ বাবা, এই সরকার লোকটা কে বলো তো! সবাই তাকে খুব গালমন্দ করে বটে শুনি, সে-ই নাকি নাটের গুরু, যত নষ্টের গোড়া, তা লোকটা যদি এতই খারাপ তবে তার এত নামডাক কেন বলো তো!

আহা সরকার মানে কি আর একটা লোক? অনেক লোক মিলেই তো সরকার।

ও বাবা! এত সরকার! তা বাবা সরকারেরাই বা খারাপ কেন বলো! গাঁটের কড়ি দিয়ে হাসপাতালখানা তো বানিয়ে দিয়েছে! দিব্যি পাকা ঘর, মেঝেতে পড়ে আছি বটে, কিন্তু বাড়ির চেয়ে তো ঢের ভাল, বাড়ির মাটির মেঝেতে কি এত আরাম হত।

নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না বুড়িমা, হাসপাতালের এইসব অব্যবস্থার জন্যই তো আমরা আন্দোলন করছি।

ওই আর একটা লোক, সবাই আন্দোলনবাবুর কথা খুব বলে। সে নাকি খুব ভাল। সে এলে সব নাকি ফের ঠিকঠাক হয়ে যাবে। তা আন্দোলনবাবু আসে না কেন বলো তো! তাকে বড় দেখতে ইচ্ছে যায়। দেখতে পেলে একটু পায়ের ধুলো নিতাম।

না বুড়িমা, তোমাকে কিছু বোঝানো যাবে না, বুঝে তোমার কাজও নেই। ফলগুলো দয়া করে খেও। কাল থেকে পড়ে আছে। এরপর পচে উঠবে! মাছি তো ভনভন করছে দেখছি।

হ্যাঁ বাবা, মাছিরা খুব ছেঁকে ধরে আমাকে। বড় বড় নীল মাছি, গুয়ের মাছি, তা হোক, মাছিগুলো দেখতে ভারী সুন্দর।

বুড়িমা! ও বুড়িমা! সাড়া দিচ্ছ না কেন? ... এই রে! টেঁসে গেল নাকি?

কে বাবা! যমদূত?

না বুড়িমা, আমি যমদূত নই।

তবে কি তুমি সরকার না আন্দোলন?

না বুড়িমা, আমি সরকারি লোক নই, আন্দোলন করতেও আসিনি। শাবলরাম মাড়োয়ারির ছেলের বিয়ে বলে গরিবদের কম্বল দেওয়া হচ্ছে। এই নাও, তোমার জন্যও একখানা এনেছি।

বাঃ বাঃ, এ তো ভারী বাহারি জিনিস গো! বিনি মাগনা দিচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ গো বুড়িমা, একদম বিনি মাগনা।

তা ভাল বাছা, কলিকালে এখনও বিনি মাগনা জিনিস মেলে তাহলে গো, কেমন যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

কেন বলো তো! বিশ্বাস না হওয়ার কী আছে?

এখেনে যে আমাকে ওষুধপত্তর কিছু দেয় না বাবা, শুনেছিলুম সরকারবাবু হাসপাতালে বিনি পয়সায় ওষুধ দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে। তা এখানকার লোক বলে ওসব বাজে কথা। ওষুধ খেতে হলে পয়সা দিতে হবে। এই যে চারদিকে গু-মুত-বমি-গয়ের-থুথু পড়ে আছে এসবও নাকি পয়সা না দিলে পরিষ্কার করা হবে না। ডাক্তারবাবু বুকে নল লাগালেও পয়সা লাগবে। তা বাবা, সেদিন ভয়ে ভয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁ গো, এই যে শ্বাস নিচ্ছি এর জন্য পয়সা চাইবে না তো!

এ দেশে গরিবদের দেখার তো কেউ নেই বুড়িমা। সেইজন্যই তো তোমাদের আন্দোলনে নামতে বলি। একবার রুখে দাঁড়াও, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

আন্দোলনবাবুকে আমার পেন্নাম দিও বাবা। সে বড্ড ভাল লোক।

এখানে এত দুর্গন্ধ কেন বলো তো বুড়িমা? তা আর হবে না বাছা, আমার যে পেট ছেড়েছে!

এঃ মাঃ!

পরশুও হামাগুড়ি দিয়ে পায়খানায় যেতে পেরেছি, কাল থেকে হাত-পায়ে যেন সাড়া পাচ্ছি না, বিছানাতেই হয়ে যাচ্ছে।

অ্যাঁঃ তা পরিষ্কার করছে না কেউ?

না বাবা, সেরকম নাকি নিয়ম নেই।

ওষুধপত্রও দিচ্ছে না!

এই তো বললাম, ওষুধপত্র দিলে পয়সা নেবে।

এ তো ভীষণ অন্যায়!

রাগ কোরো না বাবা, আমি কিছু খারাপও তো নেই, সবাই বলছে বুড়িটা গপগপ করে খায় বলে হাগছে। তা তাই হবে বোধহয়, তা এই সময়ে তুমি কম্বল এনেছ দেখে বাঁচলুম। কম্বলটা আমার মাথায় ঠেকিয়ে শিয়রে রেখে দাও। কম্বলেই আমার অসুখ ভাল হয়ে যাবে।

ধ্যেৎ! কী যে বলো!

কম্বলে অসুখ সারবে না বাবা?

তাই কখনও সারে? কম্বল কি পেট খারাপের ওষুধ?

তবে তুমি আনলে যে! আমি তো ভাবছি ওষুধ না হোক কম্বল তো জুটল। ভগবান বোধহয় কম্বল দিয়েই দাস্ত বন্ধ করবেন।

নাঃ, তোমার মাথাটাই গেছে দেখছি। কম্বল কেন দেয় জানো না? ওম-এর জন্য। এই যে ঠান্ডার মধ্যে মেঝেতে পড়ে আছ, তোমার শীত করে না?

ও বাবা, তা আর করে না! খুব করে বাবা, খুব শীত করে। কিন্তু ওম কি আমার সইবে বাবা? বেশি ওম-এ আবার গায়ে ফোসকা না পড়ে যায়, ঠান্ডা থেকে হঠাৎ গরম হলে গোলমাল হবে না তো।

ওঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না, এই জন্যেই বলে মানুষের ভাল করতে নেই।

এটা কার কথা বাবা? বড় ভাল কথা তো!

ও বুড়ি!

অ্যাঁ! কে রে?

আমি যমদূত।

বটে!

হ্যাঁ রে, এবার শরীরটা ছেড়ে ফেলে দে দিকিনি।

শরীর ছেড়ে ফেলব? কেন বাপু?

তুই যে মরেছিস!

সত্যি?

হ্যাঁ রে।

নিয্যস?

হ্যাঁ, এবার বেরিয়ে আয় ভিতর থেকে।

মরলাম কখন? কই টের পেলাম না তো?

টের পাবি কী করে? মরেছিস কি আজকে? সেই কবে থেকে মরতে শুরু করেছিস। একটু একটু করে মরেছিস বলে হ্যাঁচকাটা লাগেনি, তা সেটা একরকম ভালই।

সে তো বুঝলাম। এখন বেরোই কোথা দিয়ে বলো তো বাবা যমদূত!

কেন, অসুবিধে কী? নাক মুখ কান গুহ্যদ্বার ব্রহ্মতালু যে কোনও একটা ফুটো দিয়ে টুক করে বেরিয়ে আয়।

বড্ড অন্ধকার যে, ফুটোফাটা দেখব কী করে বলো তো বাবা, একটা বাতি-টাতি দেখাতে পারো না?

দুর বুড়ি, তোর বড্ড বায়নাক্কা, চারদিকে ঢুঁ মারতে থাক, রন্ধ্র একটা ঠিক পেয়ে যাবি। শরীরের মধ্যে বাতি কোথা পাবি?

বড্ড ভয় করছে যে বাপু!

ভয়টা কীসের?

অজান জায়গায় কোথায় নিয়ে ফেলবে বাবা?

তা এটাই বা তোর কোন কালের জায়গা ছিল শুনি! এটাও তো অজানা জায়গা।

তা অবিশ্যি বটে। তবু কেন ভয়-ভয় করছে বলো তো!

ও তোর ভয় পাওয়ার অভ্যাস। মেঘ করলেও ভয়, রোদ উঠলেও ভয়, তোদের কি ভয়ের শেষ আছে? চোরে যেমন সিধ কাটে তেমনি সিধ কাটতে থাক।

তা হ্যাঁ বাবা যমদূত, আমার শরীরের মধ্যে এত যন্ত্রপাতি কেন বলো তো? ই রে বাবা, যেদিকে ঢুঁ মারি সেদিকেই যন্ত্রপাতি!

তা আর হবে না! মানুষ বানাতে কি কম মেহনত লাগে আমাদের?

তা আমার ভেতরে এত যন্ত্রপাতি দিয়েছ তোমরা, কই টের পাইনি তো! শুধু পেটের খোঁদলটা খুব টের পেতাম। ই রে বাবা, এ যে কলকারখানা বানিয়ে ফেলেছিলে গো! আমাদের মতো মনিষ্যির কি এত যন্ত্রপাতি লাগে?

তবেই বোঝো, ভগবান মোটেই একচোখো নয়, তোকেও কারও চেয়ে কম দেননি।

কিন্তু বাবা, এখন যে আমার বড্ড মায়া হচ্ছে।

কীসের মায়া রে বুড়ি?

এমন সুন্দর শরীর ছাড়তে ইচ্ছে যাচ্ছে না যে!

মর বুড়ি! এখন মায়ায় পড়লে কি হয়? আর শরীরে তোর আছেটাই বা কী বল! বুড়ো থুথুরে হয়ে গেছিস, শনের নুড়ি চুল, চামড়া ঝুলে গেছে, হাড্ডিসার চেহারা, রাজ্যের অসুখে শরীর ঝাঝরা, ও পচা শরীর দিয়ে কী হবে তোর?

না বাছা, শরীরটা ভেঙে গেছে বটে, কিন্তু তাতে কী? ভেতরে যে ভারী ভাল ভাল বন্দোবস্ত ছিল, এও কি জানতাম? আমার মতো এমন পোড়াকপালির জন্যও এত কিছু করেছ তোমরা।

ভাল করে ভেবে দেখ বুড়ি, শরীর ছাড়বি কিনা।

দুটো চারটে দিন সবুর করো না বাবা, তাড়া কীসের?

তবে শরীর আঁকড়ে পড়ে থাক। আমি চললুম। আমার মেলা কাজ।

কী করছ গো বসে বসে?

অমল একটু তটস্থ হয়ে ম্লান হেসে বলল, কিছু না ঠাকরোন, আগড়ম বাগড়ম নানা কথা মাথায় আসে, সেগুলো লিখি।

ও কি তোমার সায়েন্সের ব্যাপার?

না না।

অনেকক্ষণ সাড়া না পেয়ে ভাবলাম ঘুমোচ্ছ বুঝি। কিন্তু শীতের বেলায় বেশি ঘুমোলে শরীর খারাপ করবে ভেবে বুদ্ধি করে চা নিয়ে এলাম। ভাবলাম চায়ের ছুতো করে জাগিয়ে দিয়ে যাই, তা এসে দেখছি, মন দিয়ে লেখাপড়া করছ।

লেখাপড়া নয় ঠাকরোন, এ একরকম চিকিৎসা।

ও মা! লেখাপড়া আবার কীসের চিকিৎসা?

ও তুমি বুঝবে না, মাথায় এলোমেলো চিন্তা এলে সেগুলো ঠেকানোর জন্য আমি মনে যা আসে লিখতে থাকি। লেখায় একটা প্যাটার্ন চলে আসে। তাতে মনটা একটু স্থির হয়।

হ্যাঁ গো, তোমার মনের অশান্তি কি আর শেষ হবে না?

চায়ের কাপটা হাতে নিতে গিয়ে একটু চলকে গেল। অমল টের পায় আজকাল তার হাত কাঁপে। অকারণেই কাঁপে। কিংবা কোনও গূঢ় কারণে।

কলকাতায় খবর দিয়েছ তো!

দিয়ে লাভ কী?

দুশ্চিন্তা করবে তো! আজ তিন দিন।

আজ তিন দিন? বলো কী? আমার তো মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন হল এসেছি।

চালাকি কোরো না, আজই একটা খবর দাও। তোমার এসব হাবভাব আমার মোটেই ভাল লাগে না। বাপু। অবিশ্যি তোমার দাদাটি বিবেচক লোক। সে হয়তো খবর একটা দিয়েছে।

অমল হেসে বলল, খবর যে দেওয়া হয়ে গেছে তা কি আর আমি জানি না বলে মনে করো? তোমরা সংসারী মানুষ, বেহিসাব তোমাদের কুষ্টিতে নেই।

বেহিসেবি চলন কি ভাল ঠাকুরপো? এবার খোলসা করে বলো তো হুট করে চলে এলে কেন।

শুনে কী করবে?

শুনিই না।

অমল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, শুনলেও তোমার বিশ্বাস হবে না।

কেন হবে না?

আমি ওদের খুব ভয় পাই।

ও মা! কাদের ভয় পাও?

আমার বউ, ছেলে আর মেয়েকে।

ভয় পাও কেন? ওরা কি তোমাকে কামড়ায় নাকি?

না। এ ভয়টা একটু অদ্ভুত ধরনের।

বউকে একটু আধটু ভয় পাও সে ঠিক আছে। অনেকেই পায় বলে জানি। কিন্তু ছেলেমেয়েকে ভয় কীসের?

আমি ওদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পেরে উঠি না। সবসময়ে মনে হয় ওরা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব, অনেক বেশি পাওয়ারফুল।

যত উদ্ভুটে কথা। আর তাও যদি হয় তো ভয়টা কীসের!

আমার ওদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে ইচ্ছে করছিল।

তাই না বলে কয়ে চলে এলে? ওরা তোমার আপনার জন না কি?

অস্বীকার করি কী করে?

তাহলে?

সেইসবও ভাবি, কেন যে আজকাল আমার ভয় হয়।

তুমি তো বামুনের ছেলে!

অমল অবাক হয়ে একটু হেসে বলল, তাতে কী?

বলি বামুনের ছেলে হয়ে জন্মেছ, পৈতেও হয়েছিল জানি, তা গলার যজ্ঞসূত্রটা কোথায় গেল?

দুর! সে কবে হারিয়ে ফেলেছি।

গায়ত্রী মন্ত্র মনে আছে?

ওং ভূর্ভুবঃ সঃ তো? কেন মনে থাকবে না?

কখনও জপ-টপ করো?

দুর দুর, ওসব কবেই চুকেবুকে গেছে।

তোমার মাথা, কিছু চুকেবুকে যায়নি। ফের শুরু করো তো!

কী শুরু করব?

সকাল সন্ধে একটু গায়ত্রী জপ করো, আমি বাবাকে বলব তোমার জন্য একটা পৈতে গ্রন্থি দিয়ে দিতে। কাল স্নান করে ভক্তির সঙ্গে পৈতেটা গলায় দিও।

এসব আবার কী জুলুম শুরু করলে? আমি জন্মসূত্রে বামুন হলেও আচার আচরণে চাঁড়াল। আমাকে দিয়ে ওসব হবে না।

দেখো বাপু, আমি সম্পর্কে গুরুজন, তার চেয়েও বড় কথা, আমি তোমার ভাল চাই। যে তোমার ভাল চায় তার একটা কথা শুনতে দোষ কি?

অমল হেসে বলল, তোমার যে সব অদ্ভুত অদ্ভুত নিদান। একবার বললে বউয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হবে। এখন বলছ পৈতে পরে গায়ত্রী জপ করতে হবে।

তাতে তো বাড়তি পরিশ্রম নেই। না হলে করলেই একটু, ওই যে বলছিলে মনটাকে স্থির করার জন্য লেখো, এও একরকম তাই, মন্ত্র ধরা থাকলে মন স্থির হয়।

মাথা নেড়ে অমল একটু হেসে বলে, মন্ত্র জপ করলে মন স্থির হয় না ঠাকরোন, বিশ্বাস করলে মন স্থির হতে পারে। আমার যে সেখানেই ফাঁক।

তুমি বড্ড ঝগড়ুটে লোক বাপু। একটা না একটা ক্যাঁড়া কাটবেই। বলি বিশ্বাস কি মানুষ সঙ্গে করে নিয়ে আসে?

তবে?

করতে করতেই বিশ্বাস আসে।

আগে তো বুঝতে হবে মন্ত্রের সত্যিই কোনও জোর আছে কি না।

করেই দেখো না।

অবশ্য শাস্ত্রে বলে মনকে যা ত্রাণ করে তাই হল মন্ত্র। একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি। কিন্তু যদি কাজ না হয়?

না হলে না হবে।

তখন কিন্তু বিশ্বাস একেবারে চলে যাবে। ছায়াটুকুও থাকবে না।

কাজ হবেই, করেই দেখো।

দীপ্ত মুখে বউদি উঠে চলে গেল।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল অমল। ধীরে ধীরে বিকেলের আলো মরে আসছে। সন্ধের সময়টা বড় বিষাদের সময়। এই দিন গিয়ে রাত যখন আসে তখন অমলের মনটায় যেন হু হু করে বিষণ্ণতার বাতাস বয়ে যায়। সে ভারী ছটফট করে তখন।

আজও সে তাড়াতাড়ি গায়ে জামাকাপড় চাপিয়ে রোদ মরতে না মরতেই বেরিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্যহীন যাওয়া। সে শুধু পথে বিপথে জোর কদমে হেঁটে যায়, কোথাও পৌঁছোয় না।

পঁয়তাল্লিশ

এবার তোর ছেলে হবে।

যাঃ, কী করে বুঝলে?

বুঝব না! সে কী রে! আমিই তো আসছি!

তুমি?

হ্যাঁ রে। জন্মাতে বড্ড ইচ্ছে যায় যে! নিরালম্ব ঘুরে বেড়াই, এ কি ভাল লাগে বল!

সত্যি বলছ?

সত্যি বলছি।

তিন সত্যি করে বললো। আমার গা ছুঁয়ে বলো।

দুর পাগল! এতে অবিশ্বাসের কী আছে? তোর ছেলে হয়ে আসতে বরাবর ইচ্ছে ছিল আমার।

আমার গর্ভ কি শুদ্ধ, পবিত্র বাবা?

কেন বল তো!

তোমার মতো মানুষ কি অপবিত্র শরীরে জন্ম নিতে পারে?

তুই অপবিত্র কেন মা?

তুমি তো জানো না বাবা, যখন আমার সতেরো বছর বয়স তখন যে আমি অপবিত্র হয়ে যাই।

জানি রে মা, জানি। পাপ-পুণ্যের হিসেব তো অত সহজ সরল নয়। দেহ ভ্রষ্ট হয়েছিল বটে, মন ভ্রষ্ট হয়নি যে! দেহ নয় মা, পাপ হল মনের। শরীর কি পাপ করে? মন তাকে যেমন করতে বলে সে তেমন করে।

তবু কেমন খুঁতখুঁত করে মনটা, ভাবি, কী দরকার ছিল ওরকম হওয়ার? কেন হল? না হলে কি পারত না?

দুনিয়ায় সব ঘটনা কি আমাদের পছন্দমতো ঘটে? দুর পাগল, তাহলে দুনিয়ায় কোনও মজা থাকত না।

কেন আমাকে নিয়েই মজা হল বলো! আমি তো কত শুদ্ধ ছিলাম, মনটাও কত সহজ সরল ছিল, লোককে টপ করে বিশ্বাস করতাম। কাউকে খারাপ বলে মনে হত না। অথচ আমার কপালেই কেন ওরকম বিচ্ছিরি কাণ্ড হল? আকাশ থেকে যেন মাটিতে আছড়ে পড়লাম। তখন আমার কী মনে হয়েছিল জানো? মনে হয়েছিল ভগবান বলেও কিছু নেই। থাকলে কেন এরকম হবে? সেই যে ঘেন্না এল লোকটার ওপর, আর ওর ছায়াটাও সহ্য হত না। এখন দেখলে মায়া হয়।

হ্যাঁ মা, একটা ভুল থেকে কত ভুলে জড়িয়ে পড়ল অমল। ওকে একটু মায়া করিস, সে ভাল। যখন ছোট্টটি ছিলি তখন থেকেই তোর বড় মায়া। আর কাউকে নয়, কিন্তু তোকেই আমি বরাবর আসকারা দিয়েছি।

হ্যাঁ বাবা, তুমি খুব আসকারা দিয়েছ আমায়। সবাই ভয় পেত তোমাকে, আমার একটুও ভয় ছিল না।

যখন হামা দিতি তখন আমি মোকদ্দমার কাগজ দেখতুম, আর তুই টেবিলের নীচে পায়ের কাছটিতে বসে খেলা করতিস। একটু যখন বড় হয়েছিস তখন কী করতিস মনে আছে? রান্নাঘরে গিয়ে যা-কিছু রান্না হত তার খানিকটা বাটি করে নিয়ে এসে আমাকে খাওয়াতিস। অসময়ে আমি কখনও কিছু খেতাম না, কিন্তু তোর পাল্লায় পড়ে খেতে হত। আরও শুনবি? বাড়ির অন্যেরা খেতে বসলে তোর ভয় হত সবাই বুঝি তোর বাবার ভাগেরটা খেয়ে ফেলবে। তাই খুব চেঁচামেচি করতি তুই, তোমরা সব খাচ্ছ যে! আমার বাবা কী খাবে তবে? তারপর কান্না জুড়তিস।

হ্যাঁ, একটু একটু মনে আছে।

তোর ছেলেই তো ছিলাম আমি। তাই ফের তোর ছেলে হয়েই আসছি।

উঃ, আনন্দে আমার বুকটা কেমন ধক্ করছে? হ্যাঁ বাবা, সত্যি তো?

সত্যি রে, খুব সত্যি।

তুমি খুব দস্যি হবে বাবা?

হয়তো হব। তা বলে মারধর করিসনি যেন!

পাগল! খুব আদর দেব তোমায়, যেমন তুমি দিয়েছ। শিগগির এসো। আমার যে তর সইছে না।

গর্ভ পূর্ণ হোক মা। অপেক্ষা করো।

এসো বাবা, এসো...

ওই এসো শব্দটা জেগে উঠে শুনতে পেল পারুল। তার নিজের গলায়। পা থেকে লেপ সরে গেছে বলে শীত করছে খুব। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, ধড়মড় করে উঠে বসল সে। স্বপ্ন! এ কি স্বপ্ন! কটা বাজে এখন? ডিমলাইটের আলোয় সে মস্ত দেয়ালঘড়িতে দেখল, পৌনে পাঁচ। এ ভোররাতের স্বপ্ন, এই স্বপ্ন সত্যি হয় বলে সে শুনেছে। সমস্ত শরীর জুড়ে আনন্দ যেন সেতারের মতো ঝংকার দিচ্ছে। বাবা আসবে! তার গর্ভে বাবা আসবে! এ কি সত্যি? বিশ্বাস হয় না যে!

উত্তেজনায় উঠে পড়ল পারুল। বেসিনে গিয়ে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিল চোখেমুখে। না, আর ঘুমোবে না সে। ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠান্ডা মেঝের ওপর উপুড় হয়ে প্রণাম করে বলল, তাই যেন হয় ঠাকুর, তাই যেন হয়।

চোখে জল আসছে আনন্দে, আবেগে। বুকে উথলে উঠছে এক পরিপূর্ণতা। তার কি এত ভাগ্য হবে!

আর আধঘণ্টা বাদে খোলা বারান্দায় তাকে আবিষ্কার করে বলাকা অবাক।

ও মা! ও কী রে? এই চাষাড়ে শীতে বারান্দায় বসে আছিস যে বড়!

স্বপ্নাচ্ছন্ন, ঘোরলাগা দুটি অপরূপ চোখ মায়ের দিকে ফেরাল পারুল।

একটা কথা বলবে মা।

কথা পরে হবে। আগে ঘরে আয় তো শিগগির। শরীরের এই অবস্থায় ঠান্ডা লাগাতে আছে? নতুন তো মা হোসনি, তবু খেয়াল রাখিস না কেন? এ বাবা, গা তো বরফ হয়ে আছে তোর! আয় শিগগির ঘরে।

ঘরে এনে তাকে বিছানায় বসিয়ে ঢাকাচাপা দিল বলাকা।

শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

পারুল সুন্দর করে হাসল, একটুও খারাপ নয় মা, আজ আমার শরীর ভাল, মন ভাল, আজ আমার সব ভাল।

ভাল হলেই ভাল বাছা। এ অবস্থায় শরীরের খেয়াল রাখতে হয়। মায়ের শরীর খারাপ হলে পেটের কুঁচোটারও যে ভোগান্তি হয়!

শোনো মা, খুব মন দিয়ে একটা কথা শুনে জবাব দাও।

কী কথা?

ভোরের স্বপ্ন কি সত্যি হয়?

কী স্বপ্ন দেখলি?

আগে বলো।

শুনি তো সত্যি হয়। কিন্তু জোর দিয়ে বলি কী করে? লোকে তো কত কথাই বলে, তার কতক ফলে, কতক ফলেও না। স্বপ্ন দেখেছিস বুঝি? ভাল স্বপ্ন তো?

ভাল না হলে বলছি! আজ আমার আকাশে উড়তে ইচ্ছে করছে।

ভাল হলে কাউকে বলিস না, বললে নাকি ফলে না।

ও বাবা, এ এত ভাল স্বপ্ন যে না বললে আমার বুক ফেটে যাবে।

তাই নাকি? তাহলে টাপটোপে বল। খুলে বলিসনি।

মায়ের কাছে নাকি সব বলা যায়! মাকে বললে দোষ হয় না, জানো না?

তাহলে দাঁড়া ঠাকুরঘরের বাসি কাজ সেরে নিই আগে। নইলে দেরি হয়ে যাবে।

তুমি বড্ড বেরসিক। শোননা, আমার খুব খিদেও পেয়েছে। তাড়াতাড়ি পুজো সেরে আমাকে খেতে দাও তো!

ও মা গো! আজ কোন দিক দিয়ে সুয্যি উঠবে কে জানে? খিদের কথা শুনে তো বিশ্বাস হয় না।

খাব মা, দেখো খুব খাব আজ।

তাহলে দুখুরিটাকে তুলে দিই। একটু ময়দা মাখুক। খেয়ে আবার উগরে দিও না কিন্তু।

মিষ্টি হেসে পারুল বলে, আজ কিচ্ছু হবে না, দেখো। আজ আমার কিচ্ছু হবে না।

তাই যেন হয়। মহিম ঠাকুরপো যে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে গেছে তার চারটে বড়ি মুখে ফেলে বসে থাক না।

আজ আমার ওষুধ লাগবে না মা। আমি আজ খুব ভাল আছি।

কী জানি মা, ভয় করে। পেটে কুটো গাছটিও থাকছে না বলে দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হয় না।

আর ভয় নেই মা। আমার পেটে কে আসছে জানো?

বলাকা অবাক হয়ে বলে, পেটে কে আসছে মানে? হিটলার নাকি?

পারুল মিষ্টি হেসে বলে, তাকে অনেকে হিটলারও বলত মা। বলো তো কে?

কী জানি বাবা, সকালে উঠে হেঁয়ালি করতে লেগেছিস।

তার টকটকে ফর্সা রং, ইয়া তাগড়াই চেহারা, চোমড়ানো গোঁফ, পুরুষ সিংহের মতো বুকের পাটা। কে বলো তো? চিনতে পারছ না?

বলাকা বিহ্বল চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মৃদু গলায় বলল, কার কথা বলছিস? তোর বাবা?

দুহাতে মাকে জাপটে ধরে বুকে মাথা ঘষতে ঘষতে পারুল বলল, বাবা গো, বাবা!

তাকেই স্বপ্নে দেখেছিস?

স্বপ্ন কী গো! এই যেমন তোমাকে দেখছি ঠিক সেরকম স্পষ্ট, জীবন্ত, ইজিচেয়ারটায় বসে আছে, আমি পায়ের কাছটিতে।

আমি কেন দেখি না রে! কী বলল তোকে?

পরিষ্কার বলল, আমি তোর গর্ভে আসছি, ছেলে হয়ে।

যাঃ! সত্যি?

এই দেখ, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

বলাকা পারুলের মুখটা বুকে চেপে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, তা আসবে না কেন? তুই ছিলি মানুষটার প্রাণ, তা বলে একচোখে ছিল না মোটেই। সব কটা ছেলেমেয়েকেই ভারী ভালবাসত। কিন্তু আসকারা দিত তোকে।

কত কথা হল বাবার সঙ্গে! কত পুরনো কথা!

বলাকার চোখে জল এসেছিল। ধরা গলায় বলল, কত ভাগ্যি তোর!

হ্যাঁ মা, আজ মনে হচ্ছে আমার বড় ভাগ্য।

আমারই পোড়া কপাল। রোজ ঘুমোনোর আগে তাকে বলি, ওগো, চোখের আড়ালে গেছ, আজ একবার স্বপ্নে দেখা দিও। কিন্তু একদিনও দেখি না তাকে। কত কথা জমে আছে বুকের মধ্যে। ইচ্ছে যায় মুখোমুখি বসে দুটো কথা কই, তা যাই হোক, তুই তো দেখলি! কেমন দেখলি তাকে? রোগা হয়ে যায়নি তো! মুখখানা তেমনি ঢলঢলে আছে? গায়ে রংটা তেমনি আছে?

সব ঠিক আছে মা।

মনে মনে আমারও কতবার ইচ্ছে হয়েছে মানুষটা কোনও না কোনওভাবে ফের ফিরে আসুক, তোদের কারও ঘরে। তারপর ভেবেছি, তোরা সব বড় হয়ে গেছিস, এ বয়সে আর কি কারও ছেলেপুলে হওয়ার কথা! মনটা ভেঙে যেত। আজ বুকটা খুব হালকা লাগছে। এখন আর মরতেও ইচ্ছে করছে না। ঠাকুরকে গিয়ে বলি, যতদিন না ছেলেটা হয় ততদিন আমাকে বাঁচিয়ে রেখো ঠাকুর।

মরার কথা বোলো না তো! এমন একটা সুন্দর সকালে এসব বলতে নেই।

না মা, মরার কথা নয়, বাঁচার কথাই তো বলছি। বাঁচতে কি ইচ্ছে যায় না, বল তো। কিন্তু বাঁচতে হলে এমন একজনকে চাই যার জন্য বেঁচে থাকার একটা মানে হয়। তোর বাবা গিয়ে অবধি সেইটেই হারিয়ে গিয়েছিল।

আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে মা। শিগগির গিয়ে পুজো সেরে লুচি-টুচি ভাজতে বলে দাও। আর নতুন আলু দিয়ে পাঁচ ফোড়নের একটা চচ্চড়ি।

বলাকা চলে যাওয়ার পর গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে ফের বারান্দার কোণে এসে দাঁড়ায় পারুল। পুব দিকটা এখান থেকে দেখা যায়। সামনে বাঁশঝাড় আর একটা দোতলা বাড়ির ফাঁক দিয়ে সূর্য ওঠে। এখানে দাঁড়িয়েই তার বাবা রোজ সকালে সূর্য প্রণাম করত। আজ পারুলও করল। তারপর হঠাৎ আপনমনেই হেসে ফেলল।

সে একজন বেশ লেখাপড়া জানা মেয়ে, এম এ পাস। সে কম্পিউটার-শিক্ষিত। সে একটা কারখানা চালানোর প্রায় সব কলাকৌশলই জানে। আধুনিক পৃথিবীর মোটামুটি সব খবরই সে রাখে। মুক্ত নারী, তার কোনও কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাস থাকার কথা নয়। তার মনের একটা সত্তা এই স্বপ্ন-দেখার ভিতরে কোনও সত্যকে স্বীকার করে না। আবার দ্বিতীয় আর একটা সত্তা দুহাতে আঁকড়ে ধরতে চাইছে ওই অন্ধ বিশ্বাসকে। বাবা আসছে, আমার গর্ভে বাবা আসছে। বাবাই যে আসছে তার কোনও যুক্তিসংগত প্রমাণ কখনও পাওয়া যাবে না, জানে পারুল। অন্ধ বিশ্বাসই হবে একমাত্র সম্বল। এই নিষ্ঠুর সত্যকেও সে এড়াতে পারে না। আর এই দোলাচল নিয়েই রচিত হয় মানুষের অদ্ভুত মনোভূমি।

না, আজ সে অবিশ্বাস করবে না। আজ সে একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন চাষি বউয়ের মতো বিশ্বাসটা করবে ভোরের ওই স্বপ্নকে। ওই অন্ধ বিশ্বাসই আজ তার বড় দরকার। সে তাই আজ সূর্যের কাছে প্রার্থনা করল, ভুলিয়ে দাও, যা শিখেছি, যা বুঝেছি তা ভুলিয়ে দাও, বিশ্বাস করতে দাও আমার ভোরের স্বপ্নকে....।

ওই বাঙালি এসে বসেছে পশ্চিমের দাওয়ায়। পাশে দিশি বিস্কুটের টিন। রোদে ডগোমগো উঠোনে বসে আছে নেড়ি কুকুর আর তিনিটে কুশি কুশি ছানা। বাঙালি খইনি টিপছে মন দিয়ে। তার কোনও তাড়া নেই। দুখুরির মাস-মাইনেটা হাত পেতে নিয়ে যায় প্রতি মাসকাবারে।

আজ বলাকা বলল, হ্যাঁ রে বাঙালি, তুই যে ফি মাসে এসে দুখুরির মাইনে নিয়ে যাস তারপর তা পেটায় নমঃ করিস, তা মেয়েটার তো আখের দেখতে হবে। আমি ভাবি ওর নামে পোস্ট অফিসে কিছু কিছু করে রাখলে তো ওরও সুবিধে, তোরও সুবিধে। ওর বিয়ের সময়ে তাহলে আর তোকে হাত পাততে হবে না, ধারকর্জও করতে হবে না।

বাঙালি শশব্যস্তে বলে, উও বাত তো ঠিক আছে মাতাজি। এখুন কিছু মুসিবাত হচ্ছে, দু-চার মাহিনাকে বাদ আপনি ডাকঘরে রেখে দিবেন।

কেন রে, তোকে যে দোকান করার টাকা দিলুম তার কী করলি? দোকানটা নিসনি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ জরুর, দুকান তো লিয়েছি মাতাজি!

তা তোর কি দোকানে লোকসান যাচ্ছে?

নুকসান তো যাবেই মা। ভুজিয়ার দুকান তো এখানে ভাল চলে না। বর্ধমান হলে চলত।

নাঃ। তোকে দিয়ে কিছু হবে না দেখছি। মেয়েটাকে পথে বসাবি।

আর দু-চার মাহিনা বাদ সব ঠিক হয়ে যাবে মা।

দুর মুখপোড়া! সেই কবে থেকে শুনছি দু-চার মাস বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর নতুন বউটার পিছনে ঢালছিস বুঝি সব কিছু? তা মা-মরা মেয়েটার কথাও তো ভাববি! ভালমানুষের মতো মুখ করে ওর মাইনের টাকাটা নিয়ে যাচ্ছিস, ওর তো কিছু জমছে না। এবার এসেছিস, টাকা নিয়ে যা। এর পরের মাস থেকে কিন্তু আর পুরো টাকা দেব না। পোস্ট অফিসে জমা করব। বুঝলি?

বাঙালি ভারী লাজুক ভঙ্গিতে বসে মাথা চুলকায়। মুখে একটু ক্যাবলা হাসি।

বলাকা রাগ করে বলে, তুই তো জন্ম দিয়েই খালাস, নামে মাত্র বাপ। মেয়েটাকে তো কোলেপিঠেও করিসনি বোধ হয়। বউ মরতেই আর একটা বিয়ে করে এনেছিস। ধন্যি বাপ তুই! মেয়েটা তো বাপকে দেখলে

যেন ভূত দেখে।

বাঙালি লজ্জা পেয়ে বলে, আমার মুচ আছে তো মা, দুখারি মুচকে খুব ডরায়, উসি লিয়ে উ আমার পাশ আসে না।

আহা, বাপের গোঁফ থাকলে মেয়ে ভয় পায় জন্মে শুনিনি বাবা। হ্যাঁ রে পারুল, তোর বাপেরও তো গোঁফ ছিল, তার জন্য কি তোরা ভয় পেতি? মুখপোড়ার কথা শোন।

পারুল উঠোনে বলাকার পাশে রোদে বসেছিল। আজ ভারী আনমনা সে। কথাবার্তা কিছুই কানে যাচ্ছিল না তার। ভারী বিভোর হয়ে আছে নিজের মধ্যে। ডাক শুনে গভীর অন্যমনস্কতা থেকে বলল, উঁ!

বলাকা ফের বাঙালির সঙ্গে কথা ফেঁদে বসে। পারুল ফিরে যায় তার অন্যমনস্কতায়। তার পেটের ভিতরে এক দিব্য পুরুষ। এই পৃথিবীর কিছুই আজ তাকে স্পর্শ করছে না।

হ্যাঁ রে, জ্যোতিপ্রকাশ কখন আসবে?

ফের যেন গভীর অতল থেকে বাস্তবে উঠে আসতে হয় পারুলকে। বড় কষ্ট হয়।

কী বলছ মা?

বলি জামাই আসবে কখন?

টাটা থেকে সকালে রওনা হবে। পৌছতে দুপুর গড়িয়ে যাবে মনে হয়।

কালকেই তো রওনা হয়ে যাবি! বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যাবে।

পারুল একটু হাসল, তোমার কি ফাঁকা লাগে মা? তুমি যেদিকে তাকাও সেদিকেই তো বাবাকে দেখতে পাও, তাই না?

তা পাই। তা বলে কি তোরা আমার কিছু নয় নাকি?

মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমরা সত্যিই তোমার কাছে কিছু নয়। বাবাই তোমার সব।

তোদের মধ্যেও তো তোর বাবাই জন্ম নিয়েছে। নইলে জায়া বলেছে কেন? বাপ তার ছেলেপুলের ভিতরে দিয়ে ফের জন্মায় বলেই না তার ছেলেপুলের মা হল তার জায়া।

তবু স্বীকার করবে না যে তুমি বাবাকে আমাদের চেয়ে বেশি ভালবাসতে?

বলাকা হাসে, ভালবাসার কমবেশি কি বোঝা যায় রে, নাকি মাপা যায়? কাকে ফেলে কাকে রাখি বল তো! তোরা যে কে কার চেয়ে কম তা কি ঠিক বুঝতে পারি? সকলের জন্যই বুক টনটন করে।

দেখলে তো মা, আজ আমার বমি হল না।

রোসো বাছা, সবে খেয়েছ। এখনও সময় যায়নি। বেশি বাহাদুরি করতে হবে না। আগে খাবারটা তল হোক তারপর বোঝা যাবে।

আর হবে না মা। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বলাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আজ আমাকে একটু বাবার কথা বলো তো মা। খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।

ওরে, ঝাঁপি খুলে বসলে কথায় কথায় বেলা হয়ে যাবে। কত শুনবি?

তা হোক, একটু বলো।

তোরা বলিস আমি নাকি একচোখো, শুধু ওই মানুষটার ওপরেই নাকি আমার যত টান। কিন্তু আমরা তো এখনকার মতো ঢলাঢলি করিনি কখনও। দুজনে যেন কুলি আর কামিন। সংসার গড়ে তুলতে দুজনেই মনেপ্রাণে খেটে গেছি। তখন শ্বশুর শাশুড়ি ছিল, দেওর ননদরা ছিল। মস্ত সংসার। দিনমানে তো স্বামী-স্ত্রীর দেখাই হত না। সংসারের নানা কাজে জড়িয়েমড়িয়ে থাকতুম। কিন্তু সবসময়ে মনটা সজাগ থাকত ওই মানুষটার জন্য।

ওরকম হ্যান্ডসাম পুরুষ তুমি আর দেখেছ?

দুর বোকা! হ্যান্ডসাম বলেই কি আর ভালবাসতুম? দেখতে কুৎসিত হলেও অন্যরকম হত না। তার রূপটা চোখ টানে ঠিকই, কিন্তু মেয়েরা যাকে পায় তাকে ঘিরেই লতিয়ে উঠতে চায়। ওইটেই তো মেয়েদের স্বভাব। সেই স্বভাবকে এখনকার মেয়েরা জলে ভাসিয়ে দিয়ে অন্যরকম হতে চায় বলেই তো এত অশান্তি।

বাবা তোমার জন্য কেমন অস্থির হত বলো।

না বাপু, তার আদিখ্যেতা ছিল না। যখন দশ বছরেরটি এসেছিলুম, তখন তো সে ছিল বাপ- দাদার মতো একজন। বয়স্ক, গম্ভীর, সবসময়ে আগলে রাখত। যখন বড় হয়েছি তখন হল অন্যরকম। আমার ওপর খুব নির্ভর করত। যা বেঁধে দিতুম তাই খেত, টু শব্দটি করত না। কাজকর্মে ভুল হলে মাথায় হাত বুলিয়ে নরমভাবে বুঝিয়ে দিত। তার মুখ থেকে যে কথা বেরোত তাই আমার মনে হত বেদবাক্য।

কখনও ঝগড়া হয়নি তোমাদের, না?

না বাপু, ঝগড়া কাকে বলে তা জানতুম না। মতের অমিল হলে দুজনে বসে কথা কয়ে কয়ে সব ঠিক করে নিতুম। যারা বলে সে অত্যাচারী পুরুষ ছিল তাদের মুখে আগুন। তারা তার হাঁকডাকটা দেখত। তার বুকের ভিতরটা তো আর দেখতে পেত না।

কথায় বাধা পড়ে গেল। দুখুরি এসে বলল, ও মা, তুমি বসে আছ যে! বামুন ঠাকুর বলে পাঠাল, কী রান্না হবে তার জোগাড়যন্তর হয়নি এখনও।

বলাকা বলে, তাড়া কীসের? যাচ্ছি বল গে। হ্যাঁ রে দুখুরি, তোর বাপটা কখন থেকে এসে বসে আছে, একবার সামনে আসিস না কেন? ওরও তো মেয়েকে একটু চোখের দেখা দেখতে ইচ্ছে করে।

ইল্লি! আমার জন্য মোটেই আসে না, টাকার জন্য আসে।

ছিঃ, ওরকম বলতে নেই। ও গরিব মানুষ, টাকা তো লাগবেই। তা বলে ওরকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবি? তুই কী রে?

চাপা গলায় দুখুরি বলে, গায়ে ঘামের গন্ধ যে! খইনি খায়, এ মা! ঝাঁটার মতো গোঁফ।

ও মাঃ তাতে কী হল! তবু তো বাপ! যা না একটু কাছে গিয়ে দাঁড়া, খুশি হবে খন।

ইল্লি। ও আমি পারব না।

ছিঃ মা। ওরকম করতে নেই। লোকটা দুঃখ পাবে। যা একটু কাছে।

গিয়ে কী করব?

একটা পেন্নাম কর।

দুখুরি ভারী লজ্জা-লজ্জা ভাব করে বলে, পেন্নাম করিনি তো কখনও।

আজ কর। বাবাকে পেন্নাম করতে হয়। যা।

দুখুরি একটু গুম হয়ে থেকে তারপর খুব অনিচ্ছের সঙ্গে গিয়ে বাপের সামনে দাঁড়াল।

বাঙালির মুখখানায় ভারী বোকা একটা হাসি ফুটে উঠল হঠাৎ।

দুখুরি, তু তো বড় হয়ে গেছিস!

দুখুরি খপ করে নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিতেই বাঙালি দুহাতে আঁকড়ে ধরল তাকে। তারপর হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল।

ছেচল্লিশ।

ওই দেখুন, ভারতসুন্দরী মিস ইন্ডিয়া দাঁড়িয়ে আছে এক মোহিনী বিভঙ্গে। কাঁধ থেকে কোমর অবধি লম্বমান সোনালি ম্যাশ, তাতে সমুদ্রনীল রঙের অক্ষরে লেখা "মিস ইন্ডিয়া.."। ভারী রূপবতী মেয়ে। দীর্ঘকায়া, নির্মেদ। চোখে বৌদ্ধিক আলো আর কলঙ্কহীন দাঁতে শ্বেতশুভ্র হাসি।

কী বললেন! ভোগ্যপণ্য? আপনি দোষদৃষ্টিপরায়ণ বলেই কি একথা বলছেন না? আপনার সৌন্দর্য দেখার চোখই নেই। শুনুন মশাই, সৌন্দর্যের সবটুকুই শুধু শরীরীনয়, শরীরের অতিরিক্ত কিছুও নিশ্চয়ই আছে। সেইটে উপভোগ করুন। মেয়েটিকে ভাল করে লক্ষ করুন, ওকে ঘিরে কি এক আশ্চর্য চৌম্বক- বলয় রচিত হয়নি?

একজন রসিক বিচারক ওকে প্রশ্ন করেছিল, হে সম্ভাব্য ভারত সুন্দরী, আপনি ভূত ও আরশোলার মধ্যে কাকে বেশি ভয় পান?

সুন্দরী সহাস্যে বলেছিল, আরশোলাকে।

আর একজন বিচারক প্রশ্ন করে, দুজন পুরুষ মানুষের মধ্যে একজন খুব একটা সুন্দর নয়, খুব একটা চালাক-চতুর বা চটপটে নয়, খুব মানিয়ে-গুছিয়ে চটকদার কথা বা জোক্স বলতে পারে না, কিন্তু সে খুব সৎ, সত্যবাদী, চরিত্রবান। আর একজন চৌখশ, চালাক, বেশ স্মার্ট, মাচো হ্যান্ডসাম চেহারা, কথাবার্তায় খই ফুটছে, কিন্তু সে ঘুষখোর, মিথ্যেবাদী এবং লম্পট। এ দুজনের মধ্যে যদি একজনকে বেছে নিতে হয় তবে আপনি কাকে নেবেন?

একটু মিষ্টি হেসে সুন্দরী বলেছিল, দুজনের মধ্যে যার টাকা বেশি আমি তাকেই বেছে নেব।

কী বিপুল হাততালি পড়েছিল শুনেছেন? কী চোখধাঁধানো জবাব বলুন তো! জবাবটা কি আপনার পছন্দ হল না? না! টাকা জিনিসটাকে কি আপনি পুরুষের সর্বোত্তম গুণ বলে মনে করেন না? আশ্চর্য মশাই, আপনি নিতান্তই সেকেলে লোক দেখছি! এরপর আবার বর্ণাশ্রমের কথাও তুলবেন নাকি? বস্তাপচা সব ধারণা নিয়ে বসে থাকলে এই শৃঙ্খলমুক্ত মানসিকতার যুগকে আপনি বুঝবেন কী করে? মেয়েটা কী ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল, স্মার্ট এবং ডাউন টু আর্থ বলুন তো!

কী বললেন! এই শরীর-দেখানো, কটাক্ষ-মদির সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা একধরনের বিপণন! তার মানে কী মশাই? বিপণন কথাটা আসছে কোথা থেকে? মার্কেটিং-এর বঙ্গানুবাদ নাকি? তার মানে আপনি কী ইঙ্গিত করছেন বলুন তো! ঝেড়ে কাশুন তো মশাই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি বলতে চাইছেন এটা একধরনের সূক্ষ্ম বেশ্যাবৃত্তি? শুনুন মশাই, এখন যৌনকর্মীরাও মেইনস্ট্রিমে চলে আসছে। তারাও এখন আর আলাদা কিছু নয়। তাদের এখন এক ধরনের শ্রমজীবী বলেই ধরা হয়। সুতরাং আপনার ওরকম কটাক্ষ করাটা মোটেই যুগোপযোগী হচ্ছে না।

আপনি একটা অদ্ভুত লোক মশাই, এঁড়ে তর্কের ওস্তাদ। যৌনকর্মী কথাটার তাৎপর্য স্বীকার করতে চাইছেন না তো! বলতে চাইছেন নাম বা অভিধা পালটে দিলেই বিষয়বস্তুটা পালটে যায় না? আপনার মতে বারাঙ্গনা বা বারবধূ যৌনকর্মীর চেয়ে অনেক ভাল শব্দ! এই প্রসঙ্গে আপনি হরিজন শব্দটিও লক্ষ করতে বলছেন আমাকে! অন্ত্যজ শ্রেণীকে মর্যাদা দিতে গান্ধীজি যে হরিজন শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন তাতে মোটেই তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি!

কী বললেন? বেশ্যাদের যৌনকর্মী আখ্যা দিয়ে আদিখ্যেতার চেয়ে তাদের নিয়মিত ডাক্তারি পরীক্ষা, চিকিৎসা, মাসি ও গুণ্ডা তোলাবাজদের হাত থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করা অনেক বেশি জরুরি? আহা, আস্তে আস্তে হবে, সব হবে। আগে মর্যাদা দিতে শিখুন তো, তারপর চিকিৎসা ইত্যাদিও হতে থাকবে! দেশে এখন একটা নবজাগরণ শুরু হয়েছে। মানুষ সচেতন হচ্ছে। ভাল-মন্দের নতুন বিন্যাস শুরু হয়েছে।

আচ্ছা মশাই, আচ্ছা, আমি মেনে নিচ্ছি যে নবজাগরণ কথাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। তবে এটা তো মানবেন যে পুরনো মূল্যবোধগুলি ধীরে ধীরে পালটে যাচ্ছে। যেমন ধরুন, পৃথিবীতে নাস্তিকের সংখ্যা বাড়ছে। ধরুন, জাতপাত বর্ণাশ্রম এসব আজকাল আর তেমন মানতে চাইছে না কেউ। মেয়েরা আবদ্ধ থাকতে চাইছে না সতীত্বের সংজ্ঞায়। পাপ বা বিকৃতি বলে ধরা হচ্ছে না সমকামিতাকে। আপনি মানতে না চাইলেও এসব তো ঘটছে। এগুলো কি প্রগতির লক্ষণ নয়?

নয়? জানতাম আপনি এসব বুঝতে চাইবেন না। তর্ক থাক, আসুন আমরা ওই সুন্দরী নারীটির সৌন্দর্য কিছুক্ষণ অবলোকন করি। আমাদের ভাঁটিয়ে-যাওয়া যৌবনের জন্য একটু শোক হবে হয়তো। তা হোক। শরীর বুড়ো হয় বটে, কিন্তু মন তো হয় না। ওই সৌন্দর্য আমাদেরও স্পর্শ করে।

কী বললেন? একজন নরখাদক বাঘের কাছে ভারতসুন্দরীর সৌন্দর্যের কোনও আবেদন নেই? শুধু রক্তমাংসের লোভ আছে। কী বীভৎস চিন্তা আপনার! ধন্যি মশাই, এমন চমৎকার এক সন্ধ্যায় হঠাৎ আপনার নরখাদকদের কথা মনে হল কেন? আপনি দর্শকদের মধ্যে সেই নরখাদকদেরই দেখতে পাচ্ছেন বলে? না মশাই, সত্যিই আপনাকে নিয়ে পারা যায় না...

পাশের ঘরে একটা খুটখাট শব্দ হচ্ছিল। কে যেন তালা খুলে ঘরে ঢুকল। একটু গলাখাঁকারির শব্দ। মেয়েলি গলা। ঘরটা বন্ধই থাকে। তবে কি কাজের মেয়েটা ঘর পরিষ্কার করতে ঢুকেছে?

চিন্তার সূত্রটা ছিড়ে যাওয়ায় অমল কলমটা রেখে দিয়ে চেয়ারে বসেই আড়মোড়া ভাঙল। শরীর দুর্বল লাগছে। সকালে দুবার চা খেয়েছিল সে, আর কিছু খায়নি। টেবিলের একপাশে এখনও জলখাবারের প্লেটটা পড়ে আছে যা স্পর্শও করেনি সে। দুটো মাখন মাখানো টোস্ট, ডিম সেদ্ধ আর দুটো কলা। খেতে ইচ্ছে হয়নি, তারপর ভুলেও গেছে। এখন খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে তার।

ঘড়ি দেখে একটু অবাক হল অমল। বেলা পৌনে একটা। এখনই বউদি খেতে ডাকবে নীচে। কয়েকটা মাছি উড়ে উড়ে বসছে টোস্ট আর ডিমের ওপর। সে প্লেটটা তুলে নিয়ে পিছনের বারান্দায় এসে নীচে আগাছার জঙ্গলে খাবারগুলো ফেলে দিল। ভূতভুজ্যিতে লাগুক। কাক-কুকুরেরা সন্ধান করে ঠিক খেয়ে নেবে।

গায়ে বহুকাল তেল মাখে না সে। ছেড়েই দিয়েছে ওসব। বড়জোর স্নানের পর একটু ক্রিম জাতীয় কিছু মেখে নেয় হাতে, পায়ে, মুখে। তার বড় শুস্ক শরীর, সহজেই খড়ি ওঠে গায়ে, ঠোঁট ফাটে। শরীরে স্নেহজাতীয় পদার্থের অভাবই হবে হয়তো। শরীরে আরও অনেক অভাব নিশ্চয়ই রয়েছে তার। কে সেসবের খবর রাখে?

এখানে ক্রিম-ট্রিম নেই বলে তার শরীরে প্রায় বিভূতির মতো খড়ি উঠেছে। ঠোঁট ফেটে প্রায়ই রক্তের স্বাদ পায় জিভে। চুল ছাটতে খেয়াল থাকে না বলে লম্বা চুল ঘাড় অবধি নেমেছে। মাথা চুলকোয়ও খুব। উকুন হয়ে থাকতে পারে। বা খুসকি। কে জানে কী। নিজের দিকে বহুকাল নজর দেওয়া হয়নি।

পিছনের বারান্দার কোণে ত্রিভুজের মতো এক টুকরো রোদে দাঁড়িয়ে থাকে অমল। স্নান করতে হবে। বড্ড শীত। ঠান্ডা জল গায়ে ঢালতে হবে ভাবলেই যেন শরীর সিরসির করে।

একটা শব্দ পেয়ে আনমনা চোখ ঘুরিয়ে লম্বা বারান্দায় অন্য প্রান্তে সে একজন ফর্সা মহিলাকে দেখতে পেল। নীল শাড়ি, তার ওপর কাশ্মীরি শাল। দেখতে বেশ সুন্দরীই মনে হল।

কেমন আছ?

প্রশ্ন শুনে বেশ কুঁকড়ে গেল অমল। কী লজ্জা! এ তো মোনা!

আমাকে দেখে কি ভয় পেলে নাকি?

অপরাধবোধ, লজ্জা, ভয় সব একসঙ্গে চেপে ধরল অমলকে। হঠাৎ বড্ড ঘাবড়ে গেছে সে। একটু ক্যাবলা হাসি হাসতে গিয়ে ফাটা ঠোঁট চড়াক করে আরও একটু ফেটে গেল। এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে নামল ঠোঁট থেকে থুঁতনি বেয়ে। আলোয়ানটা তুলে ঠোঁট চেপে ধরল সে।

এমনভাবে চেয়ে আছ যেন চিনতেই পারনি!

ভারী অপ্রস্তুত অমল বলে, আরে না না, চশমাটা চোখে নেই বলেই বোধহয়—

চশমা তো তোমার চোখেই রয়েছে।

ওঃ হ্যাঁ। তাও বটে। কী আশ্চর্য! কখন এলে?

এই মাত্র।

কেউ বলেনি তো আমাকে!

বললে কী করতে? আহ্লাদে নেচে উঠতে?

তা নয়। আসলে আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম হয়তো!

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কার কথা ভাবছিলে?

আরও ঘাবড়ে ভয় খেয়ে অমল বলে, না তো! কারও কথাই ভাবছিলাম না তো! একটু লেখালেখি করছিলাম তো! তাই বোধহয়—

তুমি কি সাহিত্যিক হওয়ার চেষ্টা করছ?

পাগল নাকি! ওসব নয়। এটা একধরনের ক্যাথারসিস। ওই যে কী বলে যেন, মোক্ষণ না কী যেন।

আমি আজই চলে যাব। তোমার সাহিত্য সাধনায় বাধা দিতে আসিনি।

কী বলবে ভেবে না পেয়ে অমল বলল, ও, আচ্ছা।

আমি তোমাকে খুঁজতেও আসিনি, ফিরিয়ে নিয়ে যেতেও আসিনি।

বিপন্ন অমল তার ভীত চোখে চেয়ে থাকে মোনর দিকে। তার গালে কয়েক দিনের দাড়ি, প্রায় জটবাঁধা চুল, আধময়লা পোশাকে মোনার সামনে নিজেকে খুব নিম্নস্তরের জীব বলে মনে হচ্ছে তার। বড় অপরাধবোধও হতে থাকে।

তুমি আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাও?

অমল আবার ঘাবড়ে গিয়ে বলে, না না, কে বলেছে ওসব?

কেউ বলেনি, তোমার আচরণই বলছে।

অমল কথা খুঁজে না পেয়ে মাথা নিচু করে।

পালিয়ে আসার দরকার ছিল না।

অমল দ্রুত ভাববার চেষ্টা করছে। এই আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে তার কোনও পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। তাই কথা আসছে না মুখে। নিজের অস্বাভাবিক আচরণের সপক্ষে কোনও যুক্তিও খুঁজে পাচ্ছে না সে। তার মাথা আজকাল কাজ করে না। তার রিফ্লেক্স বলে কিছু নেই।

সে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসহীন গলায় বলার চেষ্টা করল, না ঠিক পালিয়ে নয়। কী যে একটা ব্যাপার হল, আমি ঠিক জানি না।

তুমি না জানলেও আমি জানি। তুমি আমার হাত থেকে মুক্তি চাইছ! তাই তো!

না, তা বলিনি।

তুমি কী বলবে তা তুমিই জান। আমিও তোমার হাত থেকে রেহাই চাইছি।

অ্যাঁ? বলে অমল হাঁ করে চেয়ে থাকে।

তুমি কবি-সাহিত্যিক হবে না দার্শনিক হবে তা নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তোমার ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু ভেবেছ?

ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভাববে তা কেউ প্রম্পট করে দিলে সুবিধে হত অমলের। সে ভেবেই পেল না ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই শীতের দুপুরে তাকে মাথা ঘামাতে হবে কেন?

সে নির্বোধের মতো চেয়ে রইল।

এর পর যখন-তখন তোমার উধাও হয়ে গেলে তো চলবে না। কারণ আমি তোমার ঘরদোর সংসার আগলে পড়ে থাকতে পারছি না। আমাকে আমার পথ দেখতে হচ্ছে। ছেলে-মেয়ের ভার তোমাকেই নিতে হবে। তুমি সক্রেটিস হবে না শেকসপিয়র হবে তা জানি না, কিন্তু ওদের দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। আই অ্যাম লিভিং ফর এভার।

অপমানিত নয়, বরং ভারী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল অমল। কিছুক্ষণ মোনার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, কোথায় যাচ্ছ?

সেটা ইর্‌রেলেভেন্ট। আমার যাওয়ার অনেক জায়গা আছে।

অমল সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়ে বলল, সে তো বটেই।

তুমি কয়েক বছর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে বলে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি ছাড়াও আমার যে আশ্রয় আছে এটা তোমার জানা দরকার।

অমল মাথা নেড়ে জানাল যে এ ব্যাপারেও সে একমত।

আমি উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছি। মিউচুয়াল ডিভোর্সের কাগজপত্রও সব তৈরি হয়েছে। তুমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে সইসাবুদ করে দিয়ে এসো।

ডিভোর্স! বলে আবার হা হল অমল। মাথার ভিতরে একটা বজ্রপতনের মতো শব্দ হল। তার ফুলকিও যেন দেখতে পেল সে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে তার। টলে উঠে হাত বাড়িয়ে রেলিং চেপে ধরল

অমল।

হ্যাঁ, ডিভোর্স। অবাক হওয়ার তো কিছু নেই! তুমি তো মনে মনে দূরে সরেই গেছ। আইনের সেপারেশন তো তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। তোমার মন যা চাইছে সেটাকেই লিগালাইজ করে নেওয়া।

অমল যে বুঝতে পারছে না তা নয়। আবার বুঝতে পাবছে বললেও ভুল হবে। ধারালো তলোয়ারের মতো সামনে লকলক করছে মোনা। তার সর্বাঙ্গে ধার, চোখে ধার, মনে ধার, কথায় ধার। কতখানি ক্ষতবিক্ষত হল তা নিজেও বুঝতে পারছে না অমল। শুধু ঠোঁট থেকে রক্ত মুছতে গিয়ে জিবে নোনতা স্বাদ পায় সে।

ক্লিষ্ট, মার-খাওয়া জন্তুর মতো সে বোধহীন চোখে চেয়ে থেকে অনেকক্ষণ বাদে বলে, ডিভোর্স।

হ্যাঁ। কথাটা কি নতুন শুনলে!

এইবার অমল অদ্ভুতভাবে বলে উঠল, একটু নতুন লাগছে।

সে কী! নতুন লাগার মতো কথা তো নয়!

অমল নিজেকে সামলাতে রেলিং ছেড়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। তার হাঁফ ধরছে কেন কে জানে। বলল, নতুন নয়, বড় আকস্মিক।

কাব্য করে লাভ নেই। তুমিও তো এটাই চাইছিলে!

অমল নেতিবাচক মাথা নাড়ল, কিন্তু জবাব দিল না।

ডিভোর্স পেলেই বা তোমার কী সুবিধে হবে তা জানি না। যে বিদ্যাধরীর জন্য তুমি সংসার ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেছ সেও তো দুটো বাচ্চার মা, সে কি স্বামী ছেড়ে তোমাকে নিয়ে থাকতে রাজি হয়েছে?

অবাক অমল বলে, কে? কার কথা বলছ?

আকাশ থেকে পড়লে নাকি? জান না কে?

মোনার পিছনে বউদি এসে দাড়িয়েছে। হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে মোনার কাঁধটা ধরে বলল, ওসব কথা পরে হবে ভাই। এখন এসো তো আমার সঙ্গে।

মোনা একটু ঝাঁঝের গলায় বলে, কোথায় যাব?

এতটা রাস্তা এসেছ, পরিশ্রম তো কম হয়নি। একটু জিরিয়ে নাও আগে। কথা তো পরেও হতে পারবে। ধুলো-পায়ে ওসব এখন বলতে হবে না।

বউদির বলাটার মধ্যে একটা দীন ভাব ছিল। ভারী নরম গলায় বলা। মোনা কী ভাবল কে জানে, একবার অমলের দিকে চোখ হেনে চলে গেল।

শরীরটাকে সামলাতে একটু সময় নিল অমল। আজকাল তার কী হয়েছে কে জানে, একটু উত্তেজনার ব্যাপার হলেই শরীর কাঁপতে থাকে, মাথা টাল খায় এবং দুর্বল লাগতে থাকে।

একরকম টাল খেতে খেতেই সে ঘরের লাগোয়া বাথরুমে এসে ঢুকল। স্খলিত হাতে আলোয়ানটা খুলে রডে রাখতে গেল সে, পারল না। আলোয়ানটা পড়ে গেল মেঝের ওপর। সেটা আর তুলল না সে। একইভাবে গায়ের সোয়েটার, জামা আর পায়জামা ছেড়ে রডে ঝুলিয়ে রাখার চেষ্টা করল। পায়জামাটা ঝুলে রইল বটে, জামা আর সোয়েটার খসে পড়ল নীচে। পড়েই রইল।

শীতকালে শাওয়ারে চান করতে বড় কষ্ট। শরীরে যেন লক্ষ ছুঁচ ফোটার যন্ত্রণা হয়। কিন্তু মগে করে গায়ে জল ঢালার সাধ্যই নেই অমলের। মগ জলে ডুবিয়ে তোলাও যেন অগাধ পরিশ্রমের কাজ। সে শাওয়ার ছেড়ে

ঝরনা জলের নীচে দাঁড়াল। প্রচণ্ড ঠান্ডা জলে তার শরীর শিহরিত হতে লাগল। অবশ হয়ে যেতে লাগল।

জলের ঝরোখার নীচে দাঁড়িয়ে সে আবছায়া বাথরুমটা দেখতে পাচ্ছিল। গ্রামদেশে কেউ এত মহার্ঘ্য বাথরুম করে না। ছেলেবেলায় তারা কতবার মাঠঘাটে মলত্যাগ করতে গেছে, স্নান করেছে পুকুরে বা খালে। শখ করে দোতলায় এই অ্যাটাচড বাথ তৈরি করিয়েছে সে নিজের খরচে। ডিজেল পাম্প বসিয়েছে, ওভারহেড ট্যাঙ্কও। সব বড্ড অর্থহীন মনে হচ্ছে তার কাছে।

সে কি এরকমই চেয়েছিল? তাও এই দুর্বল মাথায় বুঝতে পারছে না অমল? মানুষের অবচেতনে অনেক বাসনা থাকে। হয়তো অমলেরও ছিল। ঝগড়ার সময় কতবার তারা ডিভোর্সের কথা বলেছে, কতবার। কিন্তু এরকম কঠিন, প্রস্তুত হয়ে তো কখনও শেষ সিদ্ধান্ত জারি করা হয়নি। ঝগড়ার পর আবার ডিভোর্সের কথা ভুলে গেছে তারা। এ তো তা নয়। মোনা সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছে।

অনেকক্ষণ ঠান্ডা জলের নীচে দাঁড়িয়ে থাকে অমল। তার হয়তো সর্দি হবে, জ্বর হবে, নিউমোনিয়া হবে। হোক। তার এখন নিজের জন্য কোনও ভাবনা হচ্ছে না। তার যা খুশি তোক।

কতক্ষণ গেল কে জানে। হঠাৎ দরজায় ধাক্কার শব্দ হল।

মেজদা! এই মেজদা!

সচকিত অমল বলল, কে?

আমি সন্ধ্যা। কতক্ষণ ধরে চান করছিস?

মাথাটা গরম লাগছে।

ঠান্ডা লাগবে যে! বেরিয়ে আয় এবার।

যাচ্ছি।

কলটা বন্ধ কর।

করছি।

অমল কল বন্ধ করল। তোয়ালে দিয়ে মাথা, গা মুছল। পায়জামা পরে জামা আলোয়ান কুড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখল সেগুলো একদম ভিজে গেছে।

বাথরুম থেকে বেরোতেই বড় বড় চোখ করে সন্ধ্যা বলল, তুই কী রে মেজদা? এতক্ষণ ধরে কী করছিলি?

অমল কাঁপছিল শীতে। কঁপতে কাঁপতেই বলল, মাথাটা বড্ড গরম লাগছিল বলে—

ইস! জলে সাদা হয়ে গেছিস। শিগগির গায়ে জামা দে। তারপর রোদে গিয়ে দাঁড়া।

পরিশ্রান্ত অমল জামা গায়ে দিতে দিতে যেন প্রচণ্ড পরিশ্রমে হাঁফিয়ে পড়ছিল। বলল, তোর বউদি চলে গেছে?

মুখটা বিকৃত করে বলল, কোথায় আর যাবে। বউদির ঘরে গুজগুজ ফুসফুস হচ্ছে। আমি তো খেয়ালও করিনি, হঠাৎ বাবা ডেকে বলল, যা তো সন্ধ্যা, দেখে আয় তো অমলের বাথরুমে এতক্ষণ ধরে শাওয়ারে জল পড়ে যাচ্ছে কেন! শুনে আমি দৌড়ে এলাম। ভয় পাচ্ছিলাম, অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছিস নাকি।

অনেকক্ষণ চান করেছি নাকি?

অনেকক্ষণ নয়! চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো হবেই।

অবাক হয়ে অমল বলে, কই, টের পাইনি তো!

কী যে হয়েছে তোর কে জানে। ওই রাক্ষুসীই তোকে খাবে। কেন যে পারুলদিকে বিয়ে করলি না কে জানে বাবা। এখন যা তো রোদে গিয়ে বোস। আমি চেয়ার পেতে দিচ্ছি।

আর কেউ আসেনি রে?

কার কথা বলছিস?

সোহাগ বা বুড়ঢা!

বুড়টা আসেনি। সোহাগ এসেছে।

একটু উদ্দীপ্ত হয়ে অমল বলে, এসেছে?

হ্যাঁ, মন খুব খারাপ।

কোথায় বল তো!

আমার সঙ্গে একবার চুপটি করে দেখা করে এসে বোধহয় দাদুর ঘরে বসে আছে।

কী বলল তোকে?

তেমন কিছু নয়। শুধু বলল, মন খারাপ। পরে কথা হবে পিসি।

সন্ধ্যার পিছু পিছু উঠোনে নেমে রোদে চেয়ারে বসল অমল। দুপুরের ঝাঁঝালো রোদ যেন বন্ধুর মতো বুকে টেনে নিল তাকে। আরামে ঘুম এসে যাচ্ছিল তার। মাথাটা ব্যথা করছে স্নানের পর থেকেই। তার কি জ্বর আসবে?

ঘুম আর জাগরণের মাঝখানে বসে রইল সে। কতক্ষণ গেল কে জানে।

ভাইঝি চটপটি এসে ডাকল, কাকা, খাবে এসো।

অমল উঠল। খাবার ঘরে গিয়ে ভাতের থালার সামনে বসলও। কিন্তু খিদে মরে গিয়ে পেটের ভিতরে কেমন একটা ঘোলানো ভাব। টক জল উঠে আসছে গলায়।

কিছু খেয়ে, কিছু ফেলে উঠে এল অমল।

ফের রোদে এসে বসল।

সামনেই সন্ধ্যা তার বিষয়সম্পত্তি ছড়িয়ে নিয়ে বসেছে। আচার, কাসুন্দি, আমলকি রোদে দিচ্ছে বসে। ওই সবই ওর ধ্যানজ্ঞান।

মেয়েটা কোথায় রে?

দেখছি না তো। কোথাও গেছে বোধহয়।

আমার শরীরটা খারাপ লাগছে, বুঝলি!

যাও না, লেপচাপা দিয়ে শুয়ে থাকো গিয়ে। সোহাগ এলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবোখন।

অমল ফের উঠে এল দোতলায়। মাথার ভিতরে যেন একটা কলকারখানা চলার শব্দ হচ্ছে। শরীর টালমাটাল। ঘরে এসেই সে বিছানায় শুয়ে পড়ল লেপমুড়ি দিয়ে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ল না। ঘুম এলই না তার। অবসন্ন শরীর শুধু ঝিমঝিম করছে।

একথা ঠিক যে, মোনার প্রতি আর সে কোনও আকর্ষণই বোধ করে না। যৌন আকর্ষণ দূরে থাক, মোনার মুখোমুখি হতে সে আজকাল অস্বস্তি বোধ করে, ভয় পায়। এও ঠিক তাদের ভিতরে কোনও সম্পর্কই গড়ে

ওঠেনি। একসময়ে যা-ও একটু বোঝাপড়ার চেষ্টা ছিল তাও শেষ হয়ে গেছে কবে। অভ্যাসবশে দুজনে একসঙ্গে থাকে মাত্র। তবু মোনা চলে যাবে ভাবতেই বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে কেন? কেন ভয় খামচে ধরে বুক!

তবে কি ভালবাসা নয়, মানুষ দাস হয়ে থাকে তার অভ্যাসের কাছে? এ যেন দাবার ছক-এ সাজানো গুটির মতো ব্যাপার। একটা খোপ ফাঁকা হয়ে গেলে, গুটিটা উধাও হলে হঠাৎ যে ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয় সেটাই যেন অনিশ্চয়তায় ফেলে দেয় তাকে। সাহেবদের এ-সমস্যা নেই। তারা ছক পালটে ফেলে, শূন্যতা পূরণ করে নেয় নতুন গুটি বসিয়ে। সে কেন পারে না। তার মধ্যে নেই কেন কোনও অ্যাডভেঞ্চার? খাত বদলের আগ্রহ?

চোখ খোলা রেখে, চালি করা নীল মশারির পর্দায় সে নানা দৃশ্যের প্রক্ষেপ ঘটাতে থাকে। নানা সম্ভব অসম্ভব কথা। নানা সম্ভাবনা। নানা উদ্বেগ। অনেক দিন বাদে উদ্বেগ। তার জরাগ্রস্ত মন থেকে উদ্বেগও উধাও হয়ে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে। মোন চলে যাবে। নতুন করে শুরু করতে হবে জীবন। সে কি পারবে?

মোনার সন্দেহ, পারুলের টানেই তার এই পালিয়ে আসা। কিন্তু পারুলের কাছে সে তো যায়ও না। কতদিন দেখা হয়নি। পারুলের শরীর লুট করেছিল এক দুপুরে বিশ বছর আগে। কৃতকর্মের জন্য কত গুনোগার দিতে হল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ঘনিয়ে উঠল বুকের মধ্যে। অনেকক্ষণ ধরে শ্বাসটা বেরোল।

চোখ বুজে সে টের পাচ্ছিল তার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে কি কাঁদছে? হয়তো। কিন্তু বুঝতে পারছে না কেন কাঁদছে।

তুমি কি ঘুমোচ্ছ?

চোখ খুলে ঘরের দরজায় মোনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল অমল। তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গিয়ে মাথাটা ঝিম করে উঠল।

না, ঘুমোচ্ছি না। কিছু বলবে?

আমরা যাচ্ছি।

আজই যেতে হবে?

আমি তো থাকব বলে আসিনি। কথাটা তোমাকে জানিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। জানিয়ে গেলাম।

আমাকে কী করতে হবে যেন!

যদি দয়া করে কলকাতায় আসতে পারো তা হলে আমার উকিল তোমাকে সব বলে দেবে। তোমাকে কোর্টে অ্যাপিয়ার হতে হবে না।

তুমি কোথায় চলে যাবে মোনা?

সেটা জেনে কী হবে?

এমনি জানতে চাইছি।

জেনে তো লাভ নেই।

তুমি চলে যাবে, ধরো আমিও হারিয়ে গেলাম। তারপর কী হবে?

সে তো আমার জানা নেই।

বড় মুশকিল হল।

মুশকিল! তোমার আবার মুশকিল কীসের?

আমি তো আজকাল কিছুই পারি না।

তোমার কোনও মুশকিল নেই, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, প্রেমিকার পিছনে ছুটছ, তোমার তো খুশির প্রাণ গড়ের মাঠ। শুধু বলে যাই, বুড়ো আর সোহাগকে ভাসিয়ে দিও না।

কিছুক্ষণ আবার বোকা চোখে মোনার দিকে চেয়ে থাকে অমল। তারপর বলে, কোথায় একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। বুঝলে! কোথাও একটা ভীষণ ভুল হচ্ছে।

সেটা তুমি বসে বসে ভেবে বের করো। আমার অত সময় নেই। আমাকে নতুন করে নিজের জীবনটা গুছিয়ে নিতে হবে। কাজেই আমার এখন সময় নেই।

মোনা।

বলো।

একটা কথা যদি জানতে চাই?

কী কথা?

তুমি কি আর কাউকে বিয়ে করবে?

মোনার ফর্সা রং হঠাৎ টকটকে লাল হয়ে উঠল। কঠিন চোখে অমলের দিকে চেয়ে বলল, সেটা জেনে তোমার লাভ কী? তুমি তো আর আমার জন্য ডুয়েল লড়তে যাবে না!

তা বলিনি তো!

আমার বয়স ত্রিশের কোঠায়। মেয়েদের পক্ষে অনেক বয়স। আর সবাই তো তোমার মতো নয় যে একটা ছেড়ে আর একটা ধরে বেড়াবে।

মার খেয়ে বিবর্ণ মুখে বসে রইল অমল। এর চেয়ে থাপ্পড় ভাল ছিল। শুধু মিনমিন করে আবার বলল, ভুল হচ্ছে, কোথাও বড় ভুল হচ্ছে।

আমার কোনও প্রেমিক নেই। জুটলে তোমাকে জানিয়ে দেব। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলি।

দরজাটা ফাঁকা হয়ে গেল। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল ফের। ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছে তার হৃৎপিণ্ডে।

খোলা দরজা দিয়ে একটা ভারী সুন্দর গেরুয়া আর খয়েরি রঙের প্রজাপতি এসে ঘর জুড়ে ঘুরতে লাগল।

আবার চোখ বুজতেই জলে ভেসে যেতে লাগল চোখ।

কী গো, শরীর খারাপ?

চোখ চাইল অমল, এসো ঠাকরোন।

কাঁদছিলে নাকি?

না না, এমনি চোখে জল এল হঠাৎ।

এতকালের সম্পর্ক কাটান-ছাড়ান হলে কান্না তো পাবেই ভাই।

অমল চেয়ে রইল। অঝোর ধারায় জল পড়ছে চোখ দিয়ে।

এই জন্যই তোমাকে বলেছিলাম পাগলামি না করে কলকাতা ফিরে যাও। কথা তো শুনলে না!

আমি যে ওদের ভয় পাই।

ওসব অলক্ষুণে কথা বোলো না তো! শুনলে রাগ হয়।

মোনা তোমাকে কী বলল ঠাকরোন?

কী আবার বলবে। মেয়েমানুষের কি দুঃখের শেষ আছে? তোমরা তো মনেও রাখো না, ওই মেয়েমানুষই ঘরদোর সন্তান সংসার আগলে থাকে বলে তোমরা ভেসে যাও না। ঘরের মহিলাটি ঘাঁটি আগলে না থাকলে এত পাগলামি, বাউণ্ডুলেপনা করে বেড়াতে পারতে বুঝি? অত সোজা নয়, বুঝলে?

বউদির সঙ্গে একমত হয়ে মাথা নাড়ল অমল। বিড়বিড় করে বলল, ভুল হচ্ছে, কোথাও বড় ভুল হচ্ছে আমাদের।

সাতচল্লিশ

বিশু চলে গেল কলকাতায়, আর বাড়িটা কী ফাঁকাই না হয়ে গেল। সব যেন ঝিমিয়ে পড়ল। চারদিকটা কেন মলিন লাগছে। পান্নার সঙ্গে তার দাদা বিশুর যেমন ভাব, তেমনই ঝগড়া, তেমনই খুনসুটি। বালিশ নিয়ে মারপিটও কত হত আগে। বালিশ ফেটে তুলো উড়ত আর মা বকে বকে হয়রান হত। এবার আর সেই আগের মতো হল না। বিশুর এখন পড়ার চাপ বাড়ছে, গম্ভীর হয়েছে, বড় হয়েছে। আর পান্নাও সংসার নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। মায়ের বকুনিও আছে সঙ্গে। এটা ঠিকমতো হল না, ও কাজটা পড়ে রইল। ওর মধ্যে মধ্যেই প্রিয় দাদাটির সঙ্গে যা-একটু ইয়ার্কি ঠাট্টা গল্প। সেটাও কি কম? দাদাটাকে আর সহজে পাওয়াও যাবে না। পাস-টাস করে যদি চাকরি পায় বা বিদেশে চলে যায় তাহলে তো হয়েই গেল। আর তা করতে এদিকে তো পান্নার বয়সও বসে থাকবে না। হয়তো বাবা পাত্র জুটিয়ে এনে বিয়ে দিয়ে দেবে। ঘোরো সংসারের ঘানিতে। সংসার কেমন তা মায়ের অসুখ হওয়ার পর কয়েক দিনেই বুঝে গেছে পান্না। এমন সংসারে তার দরকার নেই বাপু। কিন্তু সে জানে, তার জন্য এই হাঁড়িকুড়িই অপেক্ষা করছে ভবিষ্যতে।

আজ সকালেই চলে গেল দাদা। সেই থেকে মনটা খারাপ। আর বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। পারুলদির কাছে যখন-তখন যাওয়া যেত। তা পারুলদিকে আজই নিতে আসছে তার বর। পান্নার কিছুদিন এসব সয়ে নিতে হবে। সয়েও যায় সব কিছু।

মায়ের নাকি হার্টের দোষ ধরা পড়েছে। খুব ভয়ের কিছু নয়। তবে সাবধানে থাকতে হবে। সংসার-যুদ্ধ থেকে একটু আলগোছ হতে হবে।

বাবা তাই কদিন ধরে রান্নার জন্য বামুনঠাকুর বা বামনি খুঁজে বেড়াচ্ছে। অবশেষে পাওয়া গেছে একজনকে। বড়মার বাড়ির বামুনঠাকুরের সম্পর্কে ভাই। সে আজ কাজে আসবে। এলে বাঁচে পান্না। একটু হাঁফ ছাড়তে পারে। কদিন হারমোনিয়াম নিয়ে বসেনি, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা নেই। লেখাপড়ায় ফাঁক পড়ছে। মুখ তুলে চারদিকটা দেখারও যেন ফুরসত ছিল না।

ছেলে চলে যাওয়ার পর মা ছেলের ঘরে ঢুকে সব দেখে-টেখে বলল, ওই দেখ, কত করে বললুম, ফুলহাতা সোয়েটারটা নিয়ে যাস। ভুলে ঠিক ফেলে গেছে। দাড়ি কামানোর খুর পড়ে আছে, নতুন মোজা, তিনটে গেঞ্জি, খুঁজলে আরও বেরোবে। আমি যেটা না গুছিয়ে দেব সেটাই ঠিক ফেলে যাবে। বলি ও পান্না, দাদার জিনিসগুলো গুছিয়ে দিবি তো! কী যে করিস তোরা।

সব দোষ এখন পান্নার।

আচ্ছা মা, আমি আবার কবে দাদার জিনিস গুছিয়ে দিই? ওটা তো বরাবর তুমিই করো!

আহা কী কথার ছিরি। আমি করতে পারলে কি আর তোদের ঠ্যাঙের তলায় যাই? আমি গুছিয়ে দিইনি বলেই ছেলেটা এত সব ফেলে গেল, তোরা একটু দেখবি না? সোয়েটারটা নিল না, কলকাতায় গিয়ে শীতে

কষ্ট পাবে।

পান্নার চোখে জল এল। ভগবান বলে কিছু নেই। থাকলে এত অবিচার সইতেন কি? দাদার প্রতি মায়ের পক্ষপাত এত প্রকট যে কোনও চক্ষুলজ্জা অবধি নেই। দাদার যে নিজেরই সব গুছিয়ে নেওয়া উচিত ছিল এই সত্যটা মা স্বীকারই করবে না। ছেলেদের প্রতি এই আসকারা মায়েদের চিরকাল চলে আসছে। দাদাকে পান্না ভালবাসে বটে, ভীষণ ভালবাসে, কিন্তু সে একচোখো হতে পারে না।

পান্না মৃদুস্বরে সাহস করে বলেই ফেলল, দাদা নিজে কেন গুছিয়ে নেয়নি বলবে?

মা এমন অবাক হয়ে তাকাল যেন এরকম অদ্ভুত কথা জন্মে শোনেনি। বলল, বিশু গুছিয়ে নেবে? তার কত মাথার কাজ জানিস? আনমনা আলাভোলা ছেলে, তার কি অত সংসারবুদ্ধি আছে? নিজেরা চোখে ঠুলি পরে থাকিস আর অন্যের দোষ খুঁজিস।

ছেলের পক্ষ নিয়ে কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারে মা। আনমনা, আলাভোলা ছেলে, সংসারবুদ্ধি নেই! পান্নার বেলায় এই দরদটা মার কেন যে উবে যায় কে জানে! গত পরশু পান্নার হাতে গরম ভাতের ফেন পড়ে গিয়েছিল, মায়ের কোনও উদ্বেগই দেখা গেল না। শুনে বলল, এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে ভাতের মাড়টা পর্যন্ত গালতে শিখল না এখনও।

দাদাকে ভীষণ ভালবাসে ঠিকই পান্না, কিন্তু মায়ের এই একচোখোমি দেখলে দাদার ওপরেও রাগ হতে থাকে।

ব্যাপারটা দাদাও জানে। পোড়া হাতে কী সব ওষুধ-টষুধ লাগাতে লাগাতে দাদা বলল, কাঁদছিস কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মায়ের ব্যাপারটা দেখলি দাদা?

বিশু হেসে বলল, আরে, মা তো ওরকমই। তা বলে তোকে যে কম ভালবাসে তা কিন্তু নয়। সব সময়ে কাছে থাকিস বলে চোখে-হারাই ভাবটা নেই। কিন্তু বিয়ে হয়ে যখন শ্বশুরবাড়ি যাবি দেখিস তখন কীরকম আপলা-চাপলা খাবে।

অবাক হয়ে পান্না বলল, ও দাদা! ওটা কী বললি রে? আপলা-চাপলা না কী যেন।

হ্যাঁ তো! আপলা-চাপলা মানে হল আছাড়ি-পিছাড়ি না কী যেন বলে!

এমা! ও তো বাঙাল কথা! কোত্থেকে শিখলি?

বিশু হেসে ফেলে বলে, আরে হয়েছে কী জানিস, আমার রুমমেট বীরভদ্র বলে একটা ছেলে আছে। সে হল কাঠ-বাঙাল। সে আমার বেস্ট ফ্রেন্ডও বটে। তার সঙ্গে মিশতে মিশতে অনেক টার্ম শিখে গেছি। এখন মুখে এসে যায়।

খুব হেসেছিল দুজনে।

সেদিন রসিক বাঙাল বড়মার কাছে কার্টসি ভিজিটে এসেছিল। অনেক ফল-টল মিষ্টি সব নিয়ে এসেছিল। এসেই বলল, ঠাইরেন, আমারে পোলার লাহান দ্যাখবেন। যখন যা মনে লয়, যা খাইতে ইচ্ছা করে একবার আমারে কইয়া পাঠাইয়েন। বুড়া কর্তার কর্জ তো আমি জীবনেও শোধ দিতে পারুম না। এইসব হাউমাউ করে বলছে আর বড়মা হাঁ করে চেয়ে আছে। পরে রসিক বাঙাল চলে যাওয়ার পর আমাকে বলল, বাঙালের সব কথা বোঝা যায় না বটে কিন্তু লোকটা বড় ভাল।

বাঃ! তুই তো বেশ বাঙাল কথা বলতে পারিস। উইথ কারেক্ট অ্যাকসেন্ট।

পান্না হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে, মোটে পারি না। আমি আসলে অন্যকে খুব ভাল নকল করতে পারি।

তাই দেখছি।

তারপর শোন না, বড়মা যেই বলেছে বাঙাল খুব ভাল লোক অমনই আমি বড়মার সঙ্গে ঝগড়া লাগালুম। বললুম, ও বড়মা, যারা দুটো বিয়ে করে তারা আবার ভাল লোক হয় কী করে? বড়মা বলল, দুর পোড়ারমুখি, দুটো বিয়ে করেছে বলে কি পচে গেছে? বড়মা কিছুতেই মানবে না, আমিও ছাড়ব না। তখন বড়মা হার মেনে বলে, কী জানি বাপু, একালের ছেলেমেয়েরাও তো দুটো-তিনটে করে বিয়ে বসছে শুনি। একটাকে ছেড়ে আর একটাকে ধরে। তোর জ্যাঠা সেইজন্য ডিভোর্সের মামলা নিতে চাইত না। ডিভোর্স করে ফের বিয়ে করাও তো বাপু, বহু বিবাহই, তোরা যার নিন্দে করিস। বরং ডিভোর্স আরও খারাপ, একটাকে তাড়িয়ে আর একটাকে আনে।

ইস, তুই তো বড়মার কাছে গো-হারা হেরে গেছিস তাহলে। হারারই কথা, বড়মা কত বড় উকিলের বউ জানিস? তুই গেছিস তার সঙ্গে লাগতে!

ইল্লি! মোটেই হারিনি। আমি তখন বড়মাকে বলেছি, ও বড়মা, বড় জ্যাঠা যদি আর একটা বিয়ে করে বউ আনত তাহলে কী করতে? তখন বড়মা বলল, ও বাবা, সে আমার সহ্য হত না। গলায় দড়ি দিতুম তাহলে। ব্যস, বড়মা সারেন্ডার করে ফেলল।

এইভাবে হাসিঠাট্টায় সেদিনকার মন-খারাপটা উড়িয়ে দিয়েছিল দাদা। কিন্তু নিজের অনাদরটা আজ বড় টের পাচ্ছে পান্না।

আজ আবার মনটা মেঘলা হয়ে আছে। দাদা চলে গেল, আজ আবার পারুলদিও চলে যাবে। ভাল খবরের মধ্যে একটাই। আজ রান্নার লোক আসবে। যদি আসে তাহলে বেঁচে যায় পান্না। একটু আপনমনে থাকতে পারে। মা অবশ্য বলে দিয়েছে, ছেলেছোকরা বামুন হলে চলবে না, বাড়িতে বয়স্কা মেয়ে রয়েছে। বাবুবাবু চেহারা হলেও রাখা যাবে না। মায়ের কি বায়নাক্কার শেষ আছে? রান্না করতে তো আর রাজপুত্তুর আসবে না। আর আজকালকার মেয়েরা আগের দিনের মতো বোকা নয় যে, কাজের লোকের সঙ্গে পালিয়ে যাবে। কিন্তু মাকে কে বোঝাবে সে কথা! মা সেই গত শতাব্দীর চৌকাঠে আটকে আছে। হ্যাতান্যাতা পুরুষ দেখলেও সোমথ্থ মেয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

আগে চড়াতে হয় ডাল। এ-বাড়ির নিয়ম। পরিমাণও বড় কম নয়। এ-বাড়ির চারজন আর কতটুকুই বা খায়? কাজের লোক তো কম নয়। তিনজন কাজের মেয়ে, দুটো মুনিশ, একটা রাখাল। সকালে ডাল-ভাত সবার বরাদ্দ। কলাইয়ের ডাল হলে তিন হাতার জায়গায় পাঁচ হাতা নেবে। আজ কলাইয়ের ডালেরই হুকুম হয়েছে। চারপোয়া ডাল মেপে দিয়েছে মা, কাজের মেয়ে ধুয়ে দিয়েছে। পান্না গ্যাসের উনুনে ডাল চাপিয়ে মৌরির কৌটোটা খুঁজছিল, এমন সময়ে বাইরে থেকে কে যেন বলল, হাই।

ভারী চমকে উঠল পান্না। তারপর অবাক হয়ে বলল, ও মা! সোহাগ! কবে এলে?

মুখখানায় হাসি আছে বটে সোহাগের, কিন্তু ভারী শুকনো দেখাচ্ছে। পোশাক ঠিক আগের মতোই বাড়তি শুধু একটা চমৎকার রংদার ঢিলা ফিটিং-এর পুলওভার। বোধহয় বিদেশি জিনিস। সোহাগ বলল, কাল এসেছি। তুমি কি বান্না করো আজকাল?

আর বোলো না। মায়ের অসুখ, এ-বাড়িতে আবার খুব শুচিবায়ু। বামুন ছাড়া হেঁসেল ছুঁতে দেওয়া হয় না। তাই খুব খাটুনি যাচ্ছে। চলো, ঘরে বসবে। ডাল সেদ্ধ হতে সময় লাগবে।

দরকার কী ঘরে যাওয়ার। ওই ছোট টুলটা দাও না, এখানেই বসি। ভাল কথা, আমি বসলে আবার তোমাদের কোনও পাপ-টাপ হবে না তো! যদি ছোয়া-টোয়া লাগে।

ধ্যাত। তুমি একটা কী বলল তো! তোমরাও তো বামুন।

ভারী অবাক হয়ে সোহাগ বলে; ও হ্যাঁ, তাই তো! আসলে আমার ওসব একদম খেয়াল থাকে না। ঠিকই তো, আমিও তো শুনেছি যে, আমরা ব্রাহ্মণ। তবে ভাই, আমি কিন্তু গোরুর মাংস, শুয়োরের মাংস সব খেয়েছি। তাতে দোষ হবে না তো!

চোখ বড় করে পান্না বলে, খেয়েছ?

অনেক। বিদেশে তো ওসবই রোজ খেতাম।

তোমার মা?

সবাই। দোষ হচ্ছে না তো এখানে বসলে?

আরে না। মা তো আর জানে না যে তুমি ওসব খাও। না জানলে কিছু নয়। কেমন লাগে বলো তো গোরুর মাংস! খুব শক্ত হয়, না? তেতো নাকি?

না না, খেতে খুব ভাল। ভেরি প্যালেটেবল।

ঘেন্না করত না খেতে?

অবাক হয়ে সোহাগ বলে, না তো! ঘেন্না করবে কেন? মিট ইজ মিট, গোরুরই হোক, পাঁঠারই হোক।

আমি বাবা মরে গেলেও খেতে পারব না। আগে তো শুনতাম গোরুর মাংস নাকি ভীষণ শক্ত, তেতো আর এমন গরম যে খেলে গায়ে ফোসকা বেরোয়।

সোহাগ হেসে ফেলে বলে, যাঃ, ওসব কিছু হয় না।

তুমি হঠাৎ এলে যে! একা নাকি?

না। মায়ের সঙ্গে এসেছি। বাবা চার-পাঁচ দিন আগে কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ চলে এসেছে এখানে।

ওমা! কেন?

ঠোঁট উলটে সোহাগ বলে, গড নোজ।

তাই হঠাৎ সেদিন অমলদার মতো কাকে যেন দেখলাম জানালা দিয়ে। একবার ভাবলাম, অমলদা। তারপর ভাবলাম আর কেউ হবে।

সোহাগ একটু উদাস হয়ে গিয়ে বলল, আমার মা আর বাবা সেপারেট হয়ে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে পান্না বলে, সে কী! ডিভোর্স নাকি?

হ্যাঁ।

ওমা! কেন?

মা আর বাবার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে না।

পাংশু মুখে পান্না বলল, কী হবে তাহলে সোহাগ?

উই আর ইন এ জ্যাম নাউ।

এ বাবা! ডিভোর্স তো বিচ্ছিরি ব্যাপার!

সোহাগ মলিন মুখেও একটু হাসল, বিচ্ছিরি কেন বলো তো!

মা আর বাবা আলাদা হয়ে যাওয়া কি ভাল? কী হবে তাহলে।

জানোই তো, আমাদের ফ্যামিলিতে কোনও আঠা নেই। যে যার নিজের মতো থাকে। কেউ কারও পরোয়া করে না। কেউ কাউকে ভাল-টালও বাসে না। তবু যদি ডিভোর্স হয় তাহলে আমাদের লাইফ প্যাটার্নটা ভীষণ আপসেট হয়ে যাবে।

তাই তো! কিন্তু হঠাৎ কী হল বলো তো! হঠাৎ ডিভোর্স হচ্ছে কেন?

হঠাৎ হচ্ছে না। অনেকদিন ধরেই ব্যাপারটা তৈরি হচ্ছিল। আমরা আন্দাজ করছিলাম এরকম একটা কিছু হতেই পারে।

দুজনের ঝগড়া হয়েছিল বুঝি?

না। ঝগড়া আজকাল হয় না। তোমাকে তো বলেইছি আমাদের মধ্যে কেমন যেন একটা ঘেন্নার সম্পর্ক। কেউ যেন জোর করে আমাদের একটা কৌটোয় পুরে রেখেছে। আমাদের মধ্যে আসলে কোনও রিলেশনই যেন তৈরি হয়নি। মাঝে মাঝে আমার তো মনে হয় আমরা চারজনই যেন চারজনের কাছে টোটাল স্ট্রেঞ্জার। কেউ কাউকে যেন চিনিই না। তোমার খুব অদ্ভুত লাগছে, না?

হ্যাঁ। আমরা তো কেউ কাউকে ছাড়া থাকতেই পারি না। এই তো আমার দাদা আজ কলকাতায় চলে গেল বলে সকাল থেকে কী ভীষণ মন খারাপ লাগছে।

তোমরা খুব ভাল আছ, তাই না?

পান্না করুণ মুখেও ফিক করে হেসে ফেলে বলল, ঠিক তাও নয়। এই তো একটু আগে মায়ের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। কেঁদেছিও একটু। মা তো ভীষণ পার্শিয়ালটি করে দাদার জন্য। তাই খুব রাগ হয়। কিন্তু ধরো, মাকে ছাড়াও তো আমার চলে না। অসুখ-সুখ হলে আবার ওই মা-ই তো এসে রাত জেগে পাশে বসে থাকে। আবার দেখ মা আর বাবার মধ্যেও তো মাঝে মাঝে খিটিমিটি হয়, তবু মায়ের হাতের রান্না ছাড়া বাবার মুখে রোচে না। কদিন ধরে আমি যে এত যত্ন করে রাঁধছি তা বাবার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি মনের মতো হচ্ছে না।

উই আর লাইক অ্যালিয়েনস। আমি আজকাল খুব আমাদের নিয়ে ভাবছি। আগে ভাবতাম না, কিন্তু এখানে এসে যখন কিছুদিন ছিলাম তখন আমার জ্যাঠামশাই, জেঠিমা, তোমার মা বাবা, তারপর পারুলদের বাড়ির সবাইকে দেখে ভারী অদ্ভূত লাগত। কই, এরা তো আমাদের মতো নয়। দে আর কোয়াইট ডিফারেন্ট পিপল! সেই থেকে ভাবি।

সোহাগ, তুমি কিছু করতে পারো না?

ঠোঁট উলটে সোহাগ হতাশ গলায় বলল, কী করার আছে বলো তো? ফাদার উইল নট চেঞ্জ, মাদার উইল নট চেঞ্জ। তাহলে কী করে কী হবে! আমার বাবাকে রিসেন্টলি দেখেছ?

ভাল করে লক্ষ করিনি। কেন বলো তো!

কেমন যেন পাগলামিতে পেয়ে বসেছে।

কিন্তু অমলদা কত ভাল ছাত্র ছিল বল। স্কুল ফাইন্যালে স্ট্যান্ড করেছিল।

সেসব বাবা ভুলে গেছে। একদিন মায়ের সঙ্গে কী নিয়ে কথা হচ্ছিল, বাবা কাউকে কিছু না বলে নীচে নেমে গাড়িতে উঠে চুপচাপ ঘুমিয়ে রইল। আর আমরা চারদিকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। শেষে রাত দুটো নাগাদ বাবাকে লক করা গাড়ি থেকে বের করা হয়। সাফোকেশনে হয়তো-বা মরেই যেত।

ও বাবা!

বাবার ভিতরে একটা সেলফ ডেস্ট্রাকশনের টেন্ডেন্সি দেখতে পাচ্ছি।

পান্নার চোখ ছলছল করছিল। বলল, ডিভোর্স হলে তো তাহলে অমলদা সত্যিই সুইসাইড করে বসবে।

সেসব কথাও ভাবি। আমার মনে হয় আমাদের পরিবারে একটা ডেথ-টেথ কিছু হবে। ইট ইজ ইমিনেন্ট।

যাঃ, ও কথা বোলো না। শুনলেই ভয় করে।

মলিন মুখে একটু হাসল সোহাগ। বলল, ওরকম কিছু না হলে কি আমাদের ফ্যামিলিটা বদলাবে?

যাঃ, কেউ মরলেই বুঝি সবাই বদলে যায়?

কোনও কোনও সিচুয়েশনে বোধহয় যায়।

ওসব বোলো না তো, আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়।

সোহাগ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ইট মাস্ট এন্ড সামহোয়ার। ইট হ্যাজ টু। আমি দাদুকেও কথাটা বলেছিলাম।

মহিম জ্যাঠাকে!

হ্যাঁ।

জ্যাঠা কী বলল?

দাদুর মনটা খুব খারাপ। শুধু বলল, দিদিভাই, আমি তো ওল্ড টাইমার, এ-যুগের মানুষের কাছে আমাদের দাম নেই।

শুধু এই কথা!

হ্যাঁ। অ্যান্ড দাদু ওয়াজ রাইট। আমি দেখেছি, দাদুকে কেউ বেশি মানে-টানে না। কিন্তু দাদু ইজ এ নাইস কুল হেডেড ম্যান।

তাহলে কী হবে সোহাগ?

মা ভীষণ অ্যাডামেন্ট। মা সন্দেহ করে বাবা এখনও ভেরি মাচ ইন লাভ উইথ পারুল। পারুল এখন এখানেই আছে। আর সেই জন্যই বাবা পালিয়ে এসেছে এখানে। মায়ের এমনও ধারণা হয়েছিল যে, দুজনে হয়তো একটা ষড়যন্ত্র করেছে।

পান্না সবেগে মাথা নেড়ে বলে, এ মাঃ! না না, একদম বাজে কথা সোহাগ। পারুলদি ওরকম মেয়েই নয়। তার ওপর পারুলদি এখন প্রেগন্যান্ট।

মাই গড! আর ইউ সিওর?

হ্যাঁ। পারুলদি আজই ফিরে যাচ্ছে জামশেদপুরে। আমি তো রোজ ওবাড়িতে যাই। আমি জানি অমলদার সঙ্গে পারুলদির দেখা-সাক্ষাৎও হয় না।

সোহাগ ম্লান মুখে বলল, কিন্তু মা কি আর ওসব বিশ্বাস করবে? এখন মায়ের হচ্ছে ওয়ান ট্র্যাক মাইন্ড। আমার কী মনে হয় জান?

কী?

শী উইল ডেস্ট্রয় হিম অ্যান্ড হি উইল ডেস্ট্রয় হার। দুজনেই দুজনকে ধ্বংস করবে। তারপর জুড়োবে।

ফের ওরকমভাবে কথা বলছ! ওসব শুনতে আমার ভাল লাগে না।

দেন লেট আস টক অ্যাবাউট সুইট থিংস। বলে হাসল সোহাগ।

পান্নাও হেসে ফেলল, বলল, আচ্ছা, আমরা কিছু করতে পারি না, না?

তুমি! তুমি কী করবে?

আমার কী ইচ্ছে হয় জান? খুব ইচ্ছে হয় পৃথিবীর সকলের সব দুঃখ দূর করে দিই।

সোহাগ হেসে বলে, তোমার শত্রুরও?

হ্যাঁ তো। তবে আমার কোনও শত্রু নেই যে!

সোহাগ বলল, এবার এসে কী দেখলাম জাননা?

কী?

বাবার গলায় পৈতে। আর বাবা নাকি আজকাল গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে দুবেলা।

ওমা! সে তো বামুনরা করেই। বাবা করে, জ্যাঠারা করে, এমনকী বিজুদা যে নাস্তিক, সেও কিন্তু করে। অমলদার পৈতে ছিল না বুঝি!

না। কখনও দেখিনি।

সেইজন্যই তোমাদের এমন হচ্ছে। গায়ত্রীমন্ত্রের জোর জান? গায়ত্রী জপ করলে ভূতপ্রেত সব পালিয়ে যায়। আরও অনেক কিছু হয়।

সোহাগ হেসে বলে, তাই বুঝি? আমার মা-বাবার রিলেশান খুব স্ট্রেইন্ড হলেও এতদিন সম্পর্কটা টিকে ছিল। গায়ত্রী জপ করার পর তো ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে। সেটাও কি মন্ত্রের জন্যই?

না বাবা, তা নয়।

তাহলে?

হতাশ হয়ে পান্না মাথা নেড়ে বলে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এ মা, ডালটা পোড়া লাগল নাকি? গন্ধ বেরোচ্ছে যে!

বলে ছুটে গেল পান্না। ডালটার তলার দিকটা একটুখানি ধরেছে মনে হয়। তাড়াতাড়ি ঘটি উপুড় করে জল ঢেলে হাতা দিয়ে তলাটা ভাল করে নেড়ে দিল সে। জল শুকিয়ে চড়চড় করছিল এতক্ষণ।

এই সোহাগ, পোড়া গন্ধ পাচ্ছ?

সোহাগ বাতাস শুঁকে বলল, একটু একটু অ্যাক্রিড স্মেল পাচ্ছি।

এমা! তাহলে আজ মায়ের কাছে আবার বকুনি খেতে হবে। আমার কপালটাই বকুনি খাওয়ার।

একটু ভিনিগার দিয়ে দেখ না!

ভিনিগার! ও বাবা, ওসব মা হেঁসেলে ঢুকতে দেয় না। ভিনিগার নাকি মদ থেকে তৈরি হয়।

রান্নায় মাঝে মাঝে ওয়াইন দিলে তো খেতে চমৎকার হয়।

সে তোমাদের হয়, আমাদের হয় না।

মল্টেড ভিনিগারে অ্যালকোহল থাকতে পারে, সিনথেটিক ভিনিগারে তা থাকে না।

কাঁদো কাঁদো হয়ে পান্না বলে, কিন্তু ভিনিগার তো নেই, কী করি বল তো! বেশি করে হিং দিয়ে ফোড়ন দিলে হবে না?

মাথা নেড়ে সোহাগ বলে, আই নো নাথিং অ্যাবাউট কুকিং। আমি ওমলেট বা চাওমিন বানাতে পারি, আর বার-বি-কিউ। হিং আমাদের বাড়িতে কেউ পছন্দ করে না।

একটু পরে ডাল ফোটার যে গন্ধটা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল সেটা কলাই ডালের মিষ্টি গন্ধই বটে।

সোহাগ বলল, না, এখন আর অ্যাক্রিড স্মেলটা নেই তো।

বাঁচা গেল বাবা! যা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

আমি এসে তোমার কাজ নষ্ট করছি পান্না। আজ বরং আমি যাই।

আহা, বোসো না। রান্নাঘরে আমি যে বড্ড একলাটি হয়ে থাকি।

আচ্ছা, পরে আসব। আজ আমরা কলকাতা যাচ্ছি না। হয়তো কাল যাব।

বিকেলে আসবে?

আমার তো সবসময়ে তোমার কাছে আসতে ইচ্ছে করে।

এসো কিন্তু বিকেলে। আচ্ছা।

সোহাগ চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ভাবল পান্না। ভেবে ভেবে চোখে জল এল। ইস্, মা-বাবা আলাদা হয়ে গেলে কী করে থাকবে ওরা? কেন যে ডিভোর্স জিনিসটা উঠে যাচ্ছে না পৃথিবী থেকে? কেন যে মা-বাবারা চিরকালের মতো মিলেমিশে যাচ্ছে না?

লোকটা এল এগারোটা নাগাদ। রোগা, লম্বাপানা, রংটা ফর্সার দিকেই, বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। পরনে হাঁটু অবধি ধুতি, গায়ে একটা ফতুয়া, গলায় খুব মোটা সুতোর পৈতে। মুখখানা লম্বা মতো, তাতে একটু বোকা বোকা ভাব আছে। বামুন বলে বাইরের ঘরে বসতে একটা জলচৌকি দেওয়া হয়েছে। নিচুতে বসায় লম্বা হাঁটু দুটো উঠে আছে জোড়া উটের মতো। পাশে একখানা মলিন পুঁটুলি রাখা। নাম সুদর্শন মিশ্র।

মা-বাবা দুজনেই বসল তার ইন্টারভিউ নিতে।

পান্নার বাবা তেমন বলিয়ে কইয়ে মানুষ নয়। যা বলার মা-ই বলছিল, তা হ্যাঁ বাপু, বামুন তো বলছ, গায়ত্রীমন্ত্রটা জান তো!

হ্যাঁ মা, সে আর বলতে! ওঁ ভূর্ভুবঃ স...

সঙ্গে সঙ্গে কানে হাত চাপা দিয়ে মা ককিয়ে উঠল, থাক থাক। ও মন্তর মেয়েমানুষের শুনতে নেই। কেমন বামুন তুমি, মেয়েমানুষের সামনে গায়ত্রী উচ্চারণ করো!

কী করব মা! যারা ব্রাহ্মণ চায় তারা তো যাচাই করেই নেবে!

বলি রান্না-বান্না কী জান?

গেরস্তঘরের রান্না জানি মা, বিরিয়ানি-টিরিয়ানি পেরে উঠব না। সাহেবি কেতার রান্নাও শিখিনি।

আগে কোথায় কাজ করেছ?

রান্নার কাজ নয় মা। এক পাথর ভাঙা কলে ছিলাম, তা সেখানে থেকে অসুখ বাধিয়ে বসলাম।

সে কী গো! টি-বি নাকি?

না। পেটের রোগে ধরেছিল।

দ্যাখ বাপু, রোগ-টোগ থাকলে তা গোপন করে কাজে ঢুকে পোড়ো না আবার।

গরিবের কথা কেউ বিশ্বাস করে না মা, তবে খারাপ রোগ কিছু হয়নি। আমাশা হয়েছিল। খাদানের কাজ তো, শরীর চুঁইয়ে দিতে হয়। ব্রাহ্মণের ধাত তো শক্ত ধাত নয়, সইবে কেন?

আমাদের বাপু, একটু পরিষ্কার বাতিক আছে। হেগো, বাসি কাপড়-চোপড় ছাড়তে হয়। ঠিকমতো হাতমাটি করতে হয়। পেচ্ছাব করে জল নিতে হয়।

ওসব বলতে হবে না মা। আমাদের বাড়িতে রোজ নারায়ণসেবা হত। আজও শরিকদের ভাগে হয়।

তোমাদের ভাগে হয় না বুঝি?

আমাদের আর ভাগ-টাগ নেই মা। বেচেবুচে পেটায় নমঃ করতে হয়েছে।

বউ-টউ সব কোথায়?

বিয়ে আর করা হল কই? নিজেরই জোটে না।

বিয়ে করনি, সেও তো এক চিন্তার কথা।

চিন্তা কীসের মা? বিয়ে করিনি বলে পিছুটানও নেই। ঘরের ছেলের মতো যদি রাখেন তাহলে থেকে যাব।

থাকবে তো বাছা, কিন্তু মাইনে কত নেবে?

এ বাজারে কি কমে কিছু হয়? পাঁচশোটি টাকা দেবেন।

বল কী? পাঁচশো টাকায় তো কেরানি রাখা যায়।

সে যুগ আর নেই মা। এই বর্ধমান জেলাতেই এখন পাঁচ-ছ টাকার নীচে মোটা চালটাও পাবেন না। তাও পাইকারি দরে। সর্ষের তেলের কেজি কত জানা আছে তো মা!

তিনশো টাকা দেব। ভেবে দ্যাখ।

মাথা নেড়ে লোকটা বলল, আমারও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। আখেরে টাকা ছাড়া কে আমাকে দেখবে বলুন!

বিস্তর ঝোলাঝুলির পর লোকটা চারশো টাকায় রাজি হল।

সখেদে বলল, কলকাতায় হলে হাজার টাকা হাঁকতাম। এ গ্রামদেশ বলে মাথা নোয়াতে হল।

পুষিয়ে দেব গো সুদর্শন। বছরে একবার ধুতি-জামা পার্বণী তো পাবেই।

ও সবাই দেয় মা, নতুন কথা কী?

রান্না-বান্না বুঝেশুনে কোরো বাপু। আবার আমার জন্য আঝালি মশলা ছাড়া রাঁধতে হবে। ডাক্তার পোড়ামুখোরা বলছে আমার রক্তে চকলেট না কী যেন বেড়েছে।

রামহরি বলে উঠল, কী যে ছাই বল। চকলেট হবে কেন, ও হল কোলেস্টোরাল।

ওই হল বাপু। তা আজ থেকেই লেগে পড়। আমার মেয়েটার রাঁধতে গিয়ে পড়ায় ফাঁক পড়ছে।

পুকুর থেকে হাত-পা ধুয়ে মুড়ি খেয়ে সুদর্শন কাজে লাগবার পর ছুটি পেয়ে হাঁফ ছাড়ল পান্না। এবার তার ছুটি।

মাকে গিয়ে বলল, একটু বড়মার বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি মা।

যে-ই রান্নার লোক এল অমনি পাখা মেললে!

অমন করছ কেন? আজ পারুলদি চলে যাচ্ছে না!

মা তবু একটু গজগজ করতেই থাকে। ওসব কানে তুললে বেঁচে থাকাই মুশকিল। পান্না আর দাঁড়াল না, এক ছুটে হাজির হয়ে গেল বড়মার বাড়িতে।

ঢুকতেই থমকাতে হল তাকে। কী সুন্দর ঝকঝকে একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সদরের সামনে। রং-টা স্টিল গ্রে। চ্যাপটা, লম্বাটে কী যে সুন্দর ডৌল গাড়িটার। কাচগুলো তোলা। ভিতরে নরম, নিচু গদির ওপর টারকিশ তোয়ালের ঢাকনা। একজন অল্পবয়সি ড্রাইভার পালকের ঝাড়ন দিয়ে যত্ন করে বনেট পরিষ্কার করছে। নাঃ, সত্যিই পারুলদিদের অনেক টাকা। যেমন সুন্দরী, তেমনই ভাগ্যবতী। ভগবান যেন ওকে ঢেলে দিয়েছেন। সাধে কি আর সোহাগ ওকে "গডেস" বলে! পারুলদিকে আজকাল তারও যেন ঈশ্বরী ভাবতে ইচ্ছে করে।

গাড়ির পিছনে রূপালি অক্ষরে 'টয়োটা' নামটা একবার দেখে নিল পান্না। জাপানি গাড়ি। তার তো হবে না এসব কখনও। তবু পারুলদির তো হয়েছে।

পারুলের চোখে জল দেখে অবাক হল না পান্না। বাপের বাড়ি ছেড়ে যেতে কোন মেয়ের না কষ্ট হয়! পাশের ঘরে জামাইবাবু আর ছেলেমেয়েদের গলা পাওয়া যাচ্ছিল। অনেকদিন পর বাবাকে পেয়ে ছেলেমেয়েদের কথা শেষ হচ্ছে না। এ-ঘরে একলাটি পারুল।

তাকে দেখে হেসে স্নিগ্ধস্বরে বলল, আয়, কাছে বোস এসে।

গাড়িটা নতুন কিনলে বুঝি তোমরা! কী সুন্দর গাড়ি।

তোর জামাইবাবু কিনেছে। বেশি শখশৌখিনতা তো নেই, তাই বেশি আপত্তি করিনি। এককাঁড়ি টাকা অবশ্য বেরিয়ে গেল।

তা যাক পারুলদি। তোমার তো অভাব নেই।

পারুলের চোখে জল, মুখে মিটি মিটি হাসি। একটু চুপ করে থেকে বলল, কাউকে বলতে নেই, কিন্তু কথাটা চেপে রাখতে পারছি না।

কী কথা গো?

পারুল এক অপরূপ চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, কাল রাতে কী স্বপ্ন দেখলাম জানিস?

কী গো?

বাবা আমার পেটে এসেছে।

আটচল্লিশ

সিগারেট ছেড়ে কি শেষে নস্যি ধরলে নাকি হে বাঙাল?

আর কইয়েন না খুড়া। মাঝখানে কাশের লগে ছিটা ছিটা রক্ত পড়ছিল। ডাক্তার দেইখ্যাই সিগারেট বন্ধ কইরা দিল। ত্রিশ বচ্ছরের নেশা ছাড়ন কি সোজা? ধুয়া বন্ধ হইতেই কেবল ঘুমে ধরে, মাথা কাম করে না।

ওঃ, বিড়ি সিগারেটে নেশা বড় জব্বর। আমাকেও খুব জ্বালিয়েছে। তা নস্যি কেমন জিনিস বলো তো!

সিগারেটের কাছে লাগে না। কিছুদিন খইনিও খাইছিলাম। জুইত হইল না, বোঝলেন! মেলা ডলাডলি করতে হয়।

দাও দেখি এক টিপ, নিয়ে দেখি।

লন, লন। দুই একটা হাইচ্চো মারলে মাথা পরিষ্কার হইয়া যাইবো।

ধীরেন কাষ্ঠ এক টিপ নিল দু আঙুলে চেপে। তার সবই চলে। এই দেহ যে কী চায় সব সময়ে তার দিশা পাওয়া যায় না। সব রকম রসই শরীরকে দিয়ে দেখে ধীরেন। তার সবই সয়। কাটোয়ায় কিছুদিন সাধুসঙ্গ হয়েছিল। তখন গাঁজাও চাপান দিয়েছে। জিনিস খারাপ নয়। শরীর গরম হয়, খিদে বাড়ে, দুনিয়াটাকে ভারী ভাল লাগে। একসময়ে গায়ের বড়লোক ছিল পীতাম্বর। বাপের সুদের কারবার ছিল, দোহাত্তা পয়সা। বাপ লোপাট হওয়ার পর কদিন খুব ফুর্তি লুটেছিল বটে। তখন তার মোসাহেবি করে কয়েকদিন খুব হুইস্কি ব্র্যান্ডি চলেছিল ধীরেনের। কিছু খারাপ লাগত না। সঙ্গে ছোলার চাট থাকত, কাঁচা পেঁয়াজ, মাংসের বড়া। সে একটা দিনই গেছে। তবে বেশি দিন নয়। বছর না-ঘুরতেই পীতাম্বরের বাবার পয়সা উবে গেল, তখন তার হা-ভাত জো-ভাত। ধীরেন দেখল মদ সে খেয়েছে বটে, কিন্তু নেশায় ধরেনি। মদের উৎস বন্ধ হতেই সে আবার যেমন-ধীরেন তেমন-ধীরেন হয়ে গেল।

গোটা চারেক হাঁচি হল ধীরেনের। মাথায় বেশ একটা ঝাকুনি লাগল। আর একেবারে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত একটা ঝিলিক তুলে দিয়ে গেল এক টিপ নস্যি।

নাকের জলটা ঝেড়ে নিয়ে ধরা লগায় ধীরেন বলল, বেশ জিনিস বাপু। কখনও পরখ করা হয়নি বটে। বেশ ঝাঁঝ আছে কিন্তু, ওঃ, এক টিপেই একেবারে নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা।

ওই প্রথম প্রথম একটু ঝাঁঝ দেয়। তারপর দেখবেন ম্যান্দামারা জিনিস। ভুসিমাল। তবু লগে লগে রাখি। তামুকপাতা তো, একটু সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট হয় বোঝলেন?

ধীরেন বুঝেছে। মাথা নাড়ল। ভিতরের যন্ত্রপাতি একটু ঝাকুনি খেয়েছে। প্রায় আশি বছরের পুরনো কলকবজা, কখন কোনটা বিগড়োয় তার ঠিক কী? মানুষ বেশি বুড়ো হলে প্রাণবায়ু যখন-তখন বেরিয়ে যেতে পারে। এই যে চারটে পেল্লায় হাঁচি হল এর যে-কোনও একটা হাঁচির সঙ্গেও তো বেরিয়ে যেতে পারত। দুঃখকষ্টের জীবন, প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলে একরকম বোধহয় ভালই। তবু কে জানে কেন, ধীরেনের মরতে

ইচ্ছে যায় না। জীবনে আর কিছু হওয়ার নেই, জানে। কিছু করার নেই, তাও জানে। কিছু দেখার নেই, উপভোগ করার নেই, সব জানে। তবুমরতে ইচ্ছে যায় না। এ একটা অদ্ভুত ব্যাপারই বটে। আলায়-বালায় অকাজে ঘুরে বেড়ায় সে, কত কী চোখে পড়ে। পোকাটা, মাকড়টা, গাছটা, ফুলটা, পাখিটা, সবই দেখে ধীরেন। বেলা শেষের ঢলানে আলো, কি মাঠের ওপর মেঘের ছায়া, ছেলেদের ফুটবল খেলা সব কিছুই ভারী উপভোগের ব্যাপার তার কাছে। শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ কত রকমই তো সবসময়ে তৈরি হচ্ছে চারধারে। এইসব ছোটখাটো ব্যাপারই আজকাল ভারী গুরুতর হয়ে ওঠে তার কাছে। ঘরে কুলুঙ্গির ওপরে চড়াই পাখি বাসা করছে, তাই দেখতে দেখতে চৌপর দিন কেটে যায় তার। পৃথিবীতে নিঃশব্দে যে কত ঘটনা ঘটে যায় মানুষ তা টেরই পায় না।

কই খুড়া, আপনের জোগাইল্যা তো অখনও আইল না?

বর্ধমান থেকে আসবে তো, তাই দেরি হচ্ছে।

কিছু মনে কইরেন না খুড়া, গ্রামের মাইনষের কিন্তু টাইমের ঠিক নাই। ঘটি মাইনষের গায়েগতরে বড় আইলসামি। হেইর লিগ্যাই তো আমি কইলকাতা থিক্যা মিস্তরি আনতে চাইছিলাম। কিন্তু আমার বিদ্যাধরী বউ কয়, না পাম্পের কাম খুড়া করব। আমি কই, খুড়া তো বুড়া হইছে, হায়-হয়রানের কাম কি পারব? কিন্তু হ্যায় শোনে না। তা খুড়া, আপনের বয়স কেমন হইল?

এক গাল হেসে ধীরেন বলে, তা বাপু, বয়সের হিসেব কে আর রাখে! তুবে আশির কাছাকাছি হবে বলে মনে হয়। মহিমদারই বিরাশি চলছে। আমার চেয়ে ধরো তিন চার বছরের বড়।

বাপ রে! আশি তো মেলা বয়স খুড়া! এই বয়সে অসুইরা খাটনি কি পারবেন?

খুব হাসল ধীরেন, ও বাঙাল, আমি কি ফুলবাবুটি নাকি? খেটেপিটে টনকো শরীর। তবে চোখটাই যা ঝাপসা। ছানি কাটানোর তারিখটাও দিচ্ছে না ব্যাটারা। কবে থেকে নাম লিখিয়ে বসে আছি।

অন্যের লেঙ্গুর ধইরা পইড়া থাকলে তো ওই রকমই হয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরেন বলে, যা বলেছ।

আমার বউ কয়, ধীরেন খুড়া কলকবজা খুব ভাল চিনে। খুড়া হাত লাগাইলেই কল কথা কয়। তা হইলে খুড়া, আপনে তো মেলা পয়সা করতে পারতেন!

মাথা নেড়ে ধীরেন বলে, না হে বাপু, গাঁ-দেশে কলকবজার কাজ কোথায়? এই গাঁয়ে তো ওভারহেড ট্যাঙ্কের বালাই ছিল না। পুকুর আর টিউবওয়েল। ইদানীং চার-পাঁচজন করেছে বটে। আমি বোকা লোক তো, তাই যা পারি শিখেছি। কিন্তু কোনওটাই কাজ দেয়নি। কলকবজা বরাবর খুব ভাল লাগত আমার। ইলেকট্রনিক ব্যাপারটা বুঝতে পারি না বটে, কিন্তু সাবেক যন্ত্রপাতি, কলকবজা খানিকটা চিনি। গাঁ-দেশে ও-বিদ্যের কদর নেই।

সকাল সাড়ে আটটা বাজে। পড়ার ঘর থেকে মরণ বারবার উঁকি মেরে দেখছিল মিস্তিরিরা এসেছে কিনা। মিস্তিরিরা এলে তার সুবিধে হয়। সবাই হুড়োহুড়ি করে পাম্পসেট নিয়ে পড়বে। গোলে হরিবোল দিয়ে সেও উঠে পড়তে পারবে। কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠছে না। মিস্তিরিরা আসতে যে কেন এত দেরি করছে কে জানে! বাবা আর ধীরেনদাদু কখন থেকে উঠোনে বসে কথা কয়ে যাচ্ছে।

ওই দিদি নামছে সিঁড়ি দিয়ে। চোখে এখনও ঘুম। দাদা আর দিদি দুজনেই বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে। কালও অনেক রাত অবধি টিভি দেখেছে সবাই মিলে। শুধু মরণকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। মরণের নাকি টিভি দেখতে নেই। মরণের কপালটাই এরকম। বাড়িতে একটা নতুন জিনিস এল, অমনি মরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেল। মরণের অবশ্য দুঃখ নেই। এবাড়ি সে বাড়ি ঘুরে সে ইচ্ছে করলে টিভি দেখতেই পারে। তবে কিনা তার টিভি দেখার বেশি নেশা নেই। তার চেয়ে মাঠঘাট, উধাও আকাশ, পাঁই-পাঁই করে ছুট, তার বেশি ভাল লাগে।

নামতে নামতে দিদি একটা হাই তুলল। ঘুম-চোখে চারদিকটা দেখল। ইস্, এখন যদি দিদির মরণের কথা মনে পড়ে তবে বড্ড ভাল হয়। একবার ডাকলেই সে এক লাফে গিয়ে দিদির সঙ্গে জুটে যেতে পারে। তাহলে বাবা আর কিছু বলবে না। মরণ দেখেছে, তার বাঙাল বাবার দিদির ওপরেই একটু বেশি টান। এই যেমন এ-বাড়িতেও বাবা হাম্মিকেই বেশি ভালবাসে, তাকে দুর-ছাই করে।

কিন্তু দিদিও ডাকল না তাকে। কিছুক্ষণ উঠোনে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। গায়ে ফুলহাতা সোয়েটার। তার ওপর গরম চাদর। দিদি বলে, ইস্, তোদের এখানে এত ঠান্ডা কেন রে? সবই যেন তোদের বেশি বেশি।

মরণ খুব হি হি করে হাসে। বলে, তোমার বড্ড শীত, না? তাহলে তুমি শীতকাতুরে আছ।

আহা, আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। তুই যে চানের সময় রোজ গাঁইগুঁই করিস।

সেটা ঠান্ডা জলের ভয়ে নয় গো। পুকুরে পড়ে কতক্ষণ দাপাই জান না?

তাহলে গাঁইগুঁই করিস কেন?

তোমরা আছো বলে রোজ মা আমাকে সাবান মাখায় যে!

ওমা! আমরা না থাকলে তুই বুঝি সাবান মাখিস না?

না তো! সাবান মাখতে বিচ্ছিরি লাগে।

আর তেল মাখতে লাগে না বুঝি? রোজ তো দেখি চানের আগে কলুর মতো জ্যাবজ্যাবে করে সর্ষের তেল মাখিস! মা গো, সর্ষের তেল যা বিচ্ছিরি জিনিস!

মরণের মুখ শুকিয়ে গেল। সর্ষের তেল কি খারাপ জিনিস দিদি?

খারাপই তো! বিচ্ছিরি গন্ধ। সর্ষের তেল মাখলে রংও কালো হয়ে যায়!

মরণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়ে বলে, ঠিক তো! তাই আমি কালো, না দিদি?

পুঁটি টেরছা চোখে তার দিকে একটু চেয়ে বলল, তুই অবশ্য তেমন কালো নোস। সাবান মাখছিস বলে বেঁচে গেছিস। হ্যাঁ রে, তুই তো সাঁতার জানিস!

হ্যাঁ তো।

কী করে শেখে রে?

আমি তো বাবার কাছে শিখেছি। বাবা একদিন ধরে মাঝপুকুরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল। হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে হাত-পা দাপিয়ে কোনওরকমে পাড়ে আসতেই বাবা বলল, এই তো সাঁতার শিখে গেছিস। ব্যস, সেই শিখে গেলাম।

ও বাবা! আমি পারব না। ডুবে যাবো।

গাঁয়ের মেয়েরা কেমন করে শেখে জানো?

কেমন করে?

বুকে কলসি নিয়ে।

দুর! ওটাও আমি পারব না। বুকে কলসি চেপে জলে নামলে লোকে হাসবে।

সব মেয়েই তো তাই করে।

তোদের গায়ের মেয়েগুলো যা বোকা!

কেন, আমাদের পান্নাদি আছে।

পুঁটি হেসে ফেলে বলল, আহা, কথা উঠলেই কেবল পান্নাদি! পান্নাদি তোর মাথাটা খেয়েছে। নিয়ে আসিস, দেখবখন তোর পান্নাদিকে।

পান্নাদি কী সুন্দর নাচে, গায়।

জানি তো কেমন নাচ আর গান! রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে নাচে তো! ও সবাই পারে। আর নিশ্চয়ই নাকি সুরে প্যানপ্যান করে গায়!

দিদির ভঙ্গি দেখে ফের হি হি করে হাসল মরণ। বলল, তবে দাদা পুজোর ফাংশনে পান্নাদির গান শুনে বলেছিল, পান্নাদি নাকি ভাল গায়।

নাক সিটকে পুঁটি বলে, ও গানের কিছু বোঝে?

বাঃ, দাদা যে গায়! সবাই প্রশংসা করে।

পুঁটি হেসে ফেলে বলে, তবেই হয়েছে। ওই যদি তোদের কাছে ভাল গান হয় তবে পান্নাদি তো এখানকার লতা মঙ্গেশকরই হবে।

হ্যাঁ দিদি, তুমি বুঝি আরও ভাল গাও?

পুঁটি মাথা নেড়ে বলে, না রে, আমি গান জানিই না। তবে শুনতে ভালবাসি। আমার কাছে গাদা-গাদা গানের ক্যাসেট আছে।

গাও না কেন?

আমি পারি না।

নাচ জানো?

না তো! ওসব আমার আসেই না।

দিদিটা যে একটু পাগলি মতো আছে তা আগেই বুঝে গিয়েছিল মরণ। নাচ-গান না জানলেও দিদি দৌড়ঝাঁপে ভারী ভাল। দুদিনে গাছে-টাছে উঠতে শুরু করে দিল। এই কুল পাড়ছে, এই পেয়ারা পাড়ছে, কদবেলের গাছেও উঠে গেল একদিন। মরণ ভয়ে মরে।

ও দিদি, পড়ে যাবে যে!

অত সোজা নয়।

তুমি বেশ ডানপিটে আছ কিন্তু।

সবাই তাই বলে। তুই কি ভাবিস তুই একাই ডানপিটে?

দিদিটাকে তাই মরণের বড্ড ভাল লেগে গেছে। মাত্র দু-তিন দিনেই সে দিদির খুব কাছ-ঘেঁষা হয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ দিদি উঠোনে ঘোরাফেরা করল। কয়েকটা কুকুরছানা এ ওর গায়ে উঠে খেলছিল, সেগুলোকে আদর করল খানিক। তারপর বোধহয় হঠাৎ মরণের কথা মনে পড়ল।

জানালার কাছে এসে বলল, অ্যাই!

মরণ একগাল হেসে বলল, কী দিদি?

এতক্ষণ হাঁ করে জানালার দিকে চেয়ে বসেছিলি কেন রে? তোর পড়া নেই?

হয়ে গেছে তো!

পুঁটি হেসে ফেলে বলে, হয়ে গেছে না হাতি! পড়া ধরলেই তো এখন মুখ শুকিয়ে যাবে।

কোন ভোর থেকে পড়ছি যে!

কেমন পড়ছিস খুব জানি। ওই বুড়োটা কে রে? বাবার সঙ্গে বসে গল্প করছে।

ও হচ্ছে কাষ্ঠদাদু।

কাষ্ঠদাদু! সে আবার কী! কাষ্ঠ মানে তো কাঠ।

দাদুর পদবি কাষ্ঠ যে!

যাঃ!

সত্যি!

হি হি করে হেসে পুঁটি বলে, তোদের গ্রামটাই ভারী মজার। জন্মে কখনও কাষ্ঠদাদু শুনিনি বাপু। লোকটা কী করে?

কিছু করে না। ঘুরে বেড়ায়।

বাঃ, বেশ তো! শুধু ঘুরে বেড়ায়?

কাষ্ঠদাদুই তো আজ আমাদের পাম্পসেট সারাবে। কাষ্ঠদাদুর লোকেরা আসবে বলে বসে আছে।

তাই বল, মিস্তিরি।

না, কাষ্ঠদাদু মিস্তিরিও নয়।

তাহলে মেশিন সারাবে কী করে?

কাষ্ঠদাদু সব জানে। কিন্তু কিছু করে না।

পুঁটি হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে বলল, আচ্ছা আমার নাম যদি সুমনা কাষ্ঠ হত তাহলে কেমন হত বল তো।

বিচ্ছিরি।

সাহার চেয়ে ভালই হত। ইন্টারেস্টিং সারনেম। তুই হতি মরণ কাষ্ঠ।

যাঃ!

অনেক পড়ার ভান হয়েছে। এখন বেরিয়ে আয় তো। চল একটু ঘুরে আসি।

এই ডাকটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল মরণ। বইখাতা বন্ধ করে দুটো লাফ মেরে বেরিয়ে এল।

চলো।

কোথায় যাব বল তো! চল আজ তোর পান্নাদিকে দেখে আসি।

চলো তাহলে।

এই যে দিদিটাকে সে এত ভালবাসে, এটা ঠিক হচ্ছে কিনা এ নিয়ে তার একটা ধন্ধ আছে। জিজিবুড়ি মাঝে মাঝে ঘরের পিছন দিয়ে তার জানালায় উঁকি মারে। সেদিন এসে বলল, ওরে মুখপোড়া, অত গাল ভরে ভরে দাদা দিদি বলে যে ডাকিস, ওরা কি সত্যিই তোর কেউ হয়? জন্মে ততাদের মতো আহাম্মক দেখিনি বাপু। বলি ওদের সঙ্গে অমন নেই-আঁকড়েপনা করতে আছে? মতলব তো জানিস না!

অবাক হয়ে মরণ বলেছিল, মতলব! কীসের মতলব?

পেটের কথা সব টেনে বের করতে এয়েচে। তুই তো তোর মায়ের মতোই বোকা। কত বোঝালুম বাসন্তীকে, ওলো, সতীনপো, সতীন-ঝিকে নিয়ে অমন মেতে থাকিস না। একটু রাশ টেনে চল। তা কান দিচ্ছে কথায়? জান চুঁইয়ে ওদের খুশি করতে লেগেছে। বলি দুনিয়ার নিয়ম কি তুই উলটে দিতে পারবি রে আহাম্মক। সতীনের ছায়েরা কখনও আপনা হয়? বরং তোর ভালমানুষি দেখে ঘাড়ে চেপে বসবে।

মৃদু প্রতিবাদ করে মরণ বলল, কী বলছ জিজিবুড়ি! দিদিটা তো ভীষণ ভাল।

ওরে, অমন সেজে থাকে। চোখ দুটো দেখিস, মিটমিটে শয়তানি ঘাপটি মেরে আছে ভিতরে। শুনলুম তো একরাত্তির থেকে চলে যাবে। গেল? আজ তিন দিন গ্যাঁট হয়ে বসে আছে।

মা-ই তো যেতে দেয়নি। বলেছে, এই প্রথম এলে, এখনই যাবে কী? তোমাকে তো ভাল করে দেখলুমই না।

ওই তো, নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে বসে রইল। সাধে কি বলি আহাম্মকের গু তিন জায়গায়? ঘটে বুদ্ধি থাকলে প্রথম থেকেই শক্ত হয়ে কোমর বেঁধে রুখে দাঁড়ালে এ-বাড়িতে মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসতে পারত না।

দাদা দিদিকে খারাপ বলছ কেন জিজিবুড়ি? ওরা তো কিছু করেনি!

তুই তো আর একটা হাঁদা গঙ্গারাম। বুঝবি কী করে? ওপর ওপর ভালমানুষি দেখাচ্ছে, তলায় তলায় কাজ সারছে। এই যে আসা-যাওয়া শুরু হল, এ কি ভাল হচ্ছে? খাল বেয়ে কুমির আসছে বই তো নয়। এই যে ঢুকল এই কিন্তু ঢুকে পড়ল। আর বেরোবে ভেবেছিস? ছুতোয়নাতায় এসে হাজির হবে। এখন তো ছানাপোনা পাঠাচ্ছে, এর পর রাঘব-বোয়ালটাও এসে ঢুকবে, বুঝলি? তোর আহাম্মক মাকে দিয়ে পা টেপাবে, দাসীগিরি করাবে। আর তোরা হবি সব চাকর-বাকর।

ভয় খেয়ে মরণ বলে, ধ্যাত, কী যে বল না!

দুর মুখপোড়া, ঘটে বুদ্ধি থাকলে ঠিক বুঝতে পারতিস। বাঙালরা সব বশীকরণ বিদ্যে নিয়েই জন্মায়, বুঝলি? ওসব বিদ্যেধর বিদ্যেধরী, এমন ভাবখানা করবে যেন চোখে হারাচ্ছে। দাঁত নখ সব লুকিয়ে রাখছে এখন, বুঝলি? যখন হালুম করে ঘাড়ে এসে পড়বে তখন তোদের আক্কেল হবে।

মরণ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, ওরা মোটেই ওরকম নয়। দিদি তো আমাকে কত ভালবাসে।

আহা আবার গাল ভরে দিদি ডাকা হচ্ছে! তা হ্যাঁ রে, তোর কি দিদির অভাব? তা যা না কুসুমদির কাছে, টগরদির কাছে। তারা দেখিস কত ভাল। মামাতো দিদি সব, এক গাঁয়ে মানুষ, মায়ের পেটের দিদির মতোই তো!

এ কথায় মরণ একটু ভয় খায়। তার মামাতো দিদিদের সে খুব চেনে। এমন ঝগড়ুটে যে বলার নয়। লেখাপড়ার বালাই নেই তাদের। দেখা-সাক্ষাৎ হলে বাঁকা বাঁকা কথা শোনায় খুব। তোরা তো বড়লোক। তোর

মা তো বাবুর রাখা-মেয়েমানুষ। বাঙালদের পূর্বপুরুষেরা সব রাক্ষস ছিল... এমনি সব কথা।

মরণ টপ করে বলল, না, আমার দিদির দরকার নেই তো!

আহা, ও কি কথা! দরকার আবার কারও হয় নাকি?

কুসুমদি, টগরদির সঙ্গে মিশতে মা বারণ করেছে।

ওই তো ওর দোষ। আপনার জন ছেড়ে শত্তুরের ভজনা করতে লেগেছে। বলি কী, ওই শ্যাওড়াগাছের পেত্নীটাকে একবার ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আয় না মামাবাড়িতে। টগর আর কুসুমের মুখে ফেলে দে। দেখবি বিষ একেবারে ঝেড়ে দেবে। গাঁ ছেড়ে পালানোর পথ পাবে না। তোদের ভালর জন্যই বলছি। নিজেরা না পারিস, আমরা সব আপনজনেরা তো আছি, দে না আমাদের হাতে ছেড়ে।

জিজিবুড়ি, বাবা যদি জানতে পারে, তুমি এসব কথা বলেছ, তাহলে কিন্তু কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে।

ওই দেখ, কী এমন খারাপ কথা বললুম বল তো! তোদের ভালর জন্যই তো বলা, নাকি! বাঙালের কানে কথাটা তুলবি কেন রে বোকা? সেই তো নষ্টের গোড়া। তোদের আর এজন্মে আক্কেল হবে না।

দিদি মোটেই শ্যাওড়াগাছের পেত্নী নয়।

আহা, তবে কি রম্ভা মেনকা নাকি? হাড়গিলে চেহারা, কেলে কুষ্টি, গেছো মেয়েছেলে। এই তো শুনলুম বেলগাছে উঠে নাকি বেল পাড়ছিল। শুনেছিস কখনও মেয়েছেলে বেলগাছে ওঠে? ও হল বামুন গাছ। যে মেয়েছেলে বেলগাছে ওঠে সে হল ডাকিনী-যোগিনী। বুঝলি? কালও তো সন্ধেবেলায় দেখলুম, এলোচুলে ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধেবেলা এলোচুলে কারা ঘুরে বেড়ায় জানিস? ডাইনিরা। কোন মন্তরে তোকে বশ করেছে কে জানে। এর পর কোনওদিন দেখব, ভেড়া হয়ে পাছু পাছু ঘুরে বেড়াচ্ছিস।

চোখ ফেটে জল আসছিল মরণের। দিদিটাকে সে সত্যিই খুব ভালবাসে। সে বলল, এখন তুমি যাও জিজিবুড়ি।

যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। মেয়েটাকে বাঙালের ঘরে দিয়ে যে কী পাপই করেছি বাবা, দিনরাত বুকটা ধড়াস ধড়াস করে। বিয়ের ভড়ং করে মেয়েটার মাথা চিবিয়ে খেল। বোকা মেয়ে বুঝতেও পারছে না, দোরগোড়ায় সর্বনাশ এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন শক্ত না হলে কি জোতজমি, বিষয়-আশয় কিছু থাকবে? সব ফক্কা হয়ে যাবে একদিন দেখিস। তখন বাবা, আমে-দুধে মিশে যাবে আর তোরা আঁটি চুষবি। আমি হলে কবে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করতুম। হরেন কাপালিককে ধরেছি, এখন দেখি সে কী করে। তার মায়ের বটুয়া থেকে পঁচিশটা টাকা সরিয়ে এনে চুপটি করে আমাকে দিবি ভাই?

টাকা! টাকা দেব কেন?

হরেন চেয়েছে।

শঙ্কিত মরণ জিজ্ঞেস করে, হরেন ঠাকুর কী করবে জিজিবুড়ি?

জিজিবুড়ি ঝেঁঝে উঠে বলল, ওই আঁটকুড়ির ব্যাটার কি আর সাধন-ভজন আছে, নাকি ভক্তি আছে! দিনরাত দিশি মদ চাপান দিয়ে পড়ে থাকে, গাঁজা, চরস, গুলি কোন গুণটা নেই? তার কি আর বাণ-বশীকরণের তেমন ক্ষ্যামতা আছে? তবু জোর ধরে পড়েছি, যদি লেগে যায়। পঁচিশ টাকায় কি আর রাজি হয়! তার খাঁই অনেক। তবু ঘাড় কাত তো করেছে। এখন দেখা যাক। কাজ না হলে আমিও তো সোজা পাত্রী নই, ঝেড়ে কাপড় পরাব। যা দাদা, টক করে নিয়ে আয়।

ও আমি পারব না জিজিবুড়ি।

ওরে তোদের ভালর জন্যই তো করছি।

বাণ মারা বুঝি ভাল?

যেমন কুকুর তার তেমন মুগুর তো চাই রে ভাই। ওরা কি সোজা ত্যাঁদড়?

না, জিজিবুড়ি, আমি টাকা আনতে পারব না।

তোদের কপালে কী লেখা আছে জানিস? তোবড়ানো বাটি হাতে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরে ভিক্ষে করবি। নিজের ভাল যে বোঝে না তাকে কে বোঝাবে বাবা?

তুমি যে হরেন ঠাকুরকে বাণ মারতে বলেছ, তা বাবাকে বলে দেব।

দুর হ গু-খেগোর ব্যাটা। ছিঃ দাদা, ওসব কি বলতে আছে? আচ্ছা না হয় থাকগে। বলিসনি যেন।

ঊনপঞ্চাশ

লম্বা বাঁশের ডগায় পায়রার মাচান। বাঁশটাকে চিরে তাতে আটকানো হয়েছে কঞ্চির চৌখুপি। পায়রারা এমনই উঁচু জায়গায় বসতে ভালবাসে। দুদিন ধরে খেটেখুটে পায়রাদের বসবার জন্য জিনিসটা বানিয়েছে সুদর্শন। তাদের বাড়িতে নাকি ছিল। একটু মাথা-পাগলা আছে বটে লোকটা। কাক, কুকুর, বেড়াল, পায়রা, চড়াইপাখি সবার ওপর খুব দরদ। এসেছে তো মাত্র কয়েকদিন, এর মধ্যেই বাড়ির আর পাড়ার রাজ্যের বেড়াল কুকুর তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, রান্নাঘরের সামনে উঠোনে এসে বসে থাকে খাপ পেতে। সুদর্শন তাদের রুটি, বিস্কুট, মুড়ি, চালভাজা যা হোক খাওয়ায়। নিজের বরাদ্দের খাবার থেকেই দেয় বেশির ভাগ।

মা রাগ করে বলে, এ তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে বাপু। নিজের ভাতটুকুর আধা-আধিই তো দেখছি রোজ কাক-কুকুরকে খাওয়াচ্ছ! বলি অত লাই দেওয়া কি ভাল। লোভ দেখালে রাজ্যের নেড়ি কুকুর এসে আড্ডা গাড়বে।

তা মা, ভূতভুজ্যি বলেও তো একটা জিনিস আছে।

জন্মে শুনিনি বাপু।

চারদিকে উপোসি আত্মা থাকা কি ভাল মা? দিয়ে-থুয়ে খেতে হয়। আজকাল বাবুদের বাড়িতে দানধ্যান উঠে যাচ্ছে, ভূতভুজ্যি নেই, ব্রাহ্মণভোজন নেই, কাঙালিরা একমুঠো ভাত পায় না, ভিখিরিকে ভিক্ষে দেয় না।

মা গজ গজ করে। তার কারণও আছে। এ-বাড়িতে দানধ্যানের পাট নেই তেমন। ভিখিরিরা গাঁয়ের বা আশেপাশের মানুষ, তারা বাড়ি চেনে। এ-বাড়িমুখো বড় একটা হয় না। মা একটু আছে ওইরকম। ব্যাপারটা ভাল না মন্দ তা পান্না কখনও ভেবে দেখেনি। জন্ম থেকেই দেখে আসছে, তারও ওরকমই অভ্যেস হয়ে গেছে, কিন্তু এখন এই উটকো লোকটা এসে কিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছে। কথাগুলো একটু ক্যাটক্যাটে বটে, কিন্তু বেশ উচিত-কথা বলেই পান্নার মনে হয়।

মা-র ভয় ছিল, লোকটা হয়তো বেশি খাবে। রোগাপানা লোকেরাই নাকি বেশি খায়। কিন্তু দেখা গেল, খাওয়ার চেয়ে খাওয়ানোতেই সুদর্শনের আনন্দ বেশি। তার পাতের ভাত অধিকাংশই যায় কুকুর বেড়ালের পেটে।

রান্নাটা খারাপ করে না। আহামরি না হলেও খাওয়া যায়। একটু দুখে রান্না। তেল-মশলা হাত টেনে দেয়। সেটা এ-বাড়ির হিসেবি মানুষদের পছন্দই।

একদিন মাকে বলল, হ্যাঁ মা, আমরা বীরভূমের লোক, খুব পোস্ত হয় ওদিকে। তা বর্ধমানের লোকে কি পোস্ত খায় না?

মা মুখটা গোঁজ করে বলল, তা খাবে না কেন? আগে খুব হত। এখন পোস্তর যা দাম।

সুদর্শন এক গাল হেসে বলে, কাঁড়ি পোস্ত তো লাগে না। একটু হলেই হয়। রাইসর্ষে মিশিয়ে দিলে দিবি পোস্তর মতোই লাগবে খন।

না বাপু, সর্ষেবাটা পেটের পক্ষে ভাল নয়। ও যা হচ্ছে তাই হোক। শীতকালে তো সবজির অভাব নেই। মাছও তো হচ্ছে। পোস্ত না হয় গ্রীষ্মে বর্ষায় করা যাবে।

সুদর্শন বেশ মুখের ওপরেই বলে দিল, আপনারা একটু হিসেবি মানুষ, না?

সুদর্শন আলাপি মানুষ। দু-চারদিনের মধ্যেই দেখা গেল পাড়ার লোকের সঙ্গে দিব্যি ভাবসাব জমে গেছে তার। দুপুরের দিকে খাওয়ার পর পশ্চিমের ঘরের নির্জন বারান্দায় আশপাশের কয়েকজনা আসে বেশ। কথা-টথা কয়।

মা বলে, ও সুদর্শন, বলি অত আড্ডা কীসের? এ-বাড়ি ও-বাড়ি কথা চালাচালি কিন্তু ভাল নয় বাপু। ধর্মের কথা কি খারাপ কিছু মা?

কী জানি বাপু কী কথা। অত কথায় কাজ কী?

কথা নইলে কি কাজ হয় মা? মানুষের কথাই তো সম্বল।

সুদর্শনকে নানা কারণেই পছন্দ হচ্ছে না মায়ের। ঠিক যেন মাইনে করা কাজের লোকের মতো নয়। একটু ব্যক্তিত্ব আছে, নিজের মতামত আছে, যা-তা বললেই মেনে নেয় না। আবার ঝগড়াও করে না। আসল কথা লোকটা একটু জানেশোনে, একটু যাকে বলে আপারহ্যান্ডও নেয়। ওইটে মায়ের সহ্য হচ্ছে না।

কিন্তু এই ক্ষ্যাপাটে গোছর লোকটাকে পান্নার ভারী পছন্দ। ধারেকাছে এরকম একটা লোক থাকলে মাঝে মাঝে নিজেদের একটু দীন লাগে বটে, কিন্তু ভালও লাগে। একদিন মা একটু বড়মার কাছে বেড়াতে গিয়েছিল। তখন চুপ করে সুদর্শন একজন ভিখিরিকে পাছদুয়ারের কাছে বসিয়ে ভাত দিয়েছিল চাট্টি। পান্না দেখে ফেলেছিল।

ও সুদর্শনদা, ওকে কার ভাগের ভাত দিলে? তোমার ভাগের নাকি? নিজের ভাগটুকু অতজনকে দিলে তুমি যে উপোস করে মরবে!

সুদর্শন এক গাল হেসে বলল, না দিদি, নিজের ভাগেরটা দিইনি। দুজন মুনিশ আজ কাজে আসেনি। তাদেরটাই দিচ্ছি। ভাল করিনি?

পান্না একটু হেসে বলল, ভালই তো। কিন্তু বকুনি খেও না যেন!

সুদর্শনের শাস্ত্রজ্ঞান আছে। রামায়ণ-মহাভারত ভাল পড়া। কে কার মা, কে কার বাপ, কে কার ছেলে এসব তার ভুল হয় না কখনও। সে এ-বাড়িতে আসার পর এ-পাড়ায় একটা রটনা হয়েছে, সুদর্শন লোকটা সাধারণ মানুষ নয়। ওর ভিতরে বিভূতি-টিভূতি কিছু আছে।

কথাটা বলতে এসে একদিন পাড়ার পালগিন্নি মায়ের কাছে খুব ঠোক্‌না খেল। মা বলল, তোমাদের যত অলক্ষুণে কথা। বলি যার বিভূতি থাকে তার কি পেটের রোগ হয়? নাকি পরের বাড়িতে গতর খাটিয়ে খায়?

পালগিন্নি মিনমিন করে বলল, ওঁরা অমন সেজে থাকেন কিনা!

তোমার মুণ্ডু। দু-চার পাতা বই পড়েনি তা বলছি না। তা বলে বিদ্যেসাগরও তো নয়। টক করে গাছে তুলে দাও ওই তোমাদের দোষ।

পাড়াটা এখন ফাঁকা। পারুলদি তার নতুন এ-সি গাড়ি করে চলে গেল জামশেদপুর। সোহাগ আর তার মা ফিরে গেছে কলকাতায়। পান্নার এখন পড়াশুনোর চাপ। হায়ার সেকেন্ডারির সিলেবাস তো কম না। স্কুলেও যেতে হচ্ছে।

সকালবেলায় লেপমুড়ি দিয়ে বিছানায় বসেই পড়ছিল পান্না। এত ভোরে লেপের ওম ছেড়ে উঠতে ইচ্ছেও হয় না। চোখেমুখে জল দেওয়া হয়নি, বাথরুমে যাওয়া হয়নি, দাঁত মাজা হয়নি। আজ একটা ক্লাস পরীক্ষা আছে ইংরিজির। এই একটা বিষয়েই সে বেশি নম্বর পায়। গত মাসে চিরশ্রী তাকে টপকে গিয়েছিল। এবার চিরশ্রীকে টপকানোর জন্য সে প্রাণপণ করছে। পাশেই শুয়ে ঘুমোচ্ছে হীরা। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। মা ওকে কিছু বলে না। পান্না জানে এ-বাড়িতে তারই আদর সবচেয়ে কম। সে বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে মা কটকট করে কত কথা শোনাত!

আলো আসার জন্য সুমুখের জানালাটা অল্প ফাঁক করে রেখেছিল সে। ওই ফাঁকটুকু দিয়ে একটু আগে ডালে লঙ্কা ফোড়নের গন্ধ পেয়েছে সে। সেই ফাঁকটুকু দিয়েই হঠাৎ চোখ তুলে সে দেখতে পেল, তাদের রান্নাঘরের দাওয়ায় উসকো-খুসকো চুল, খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা একটা লোকে বসে আছে। এখনও রোদ ওঠেনি বলে উঠোনের কমজোরি আলোয় মুখখানা চিনতে পারল না পান্না। এত সকালে কে এল রে বাবা? তাও রান্নাঘরের দাওয়ায় বসা! পাগল-টাগল ঢুকে পড়ল নাকি? পাগলকে তার ভীষণ ভয়।

জানালাটা একটু ফাঁক করে পান্না চেঁচিয়ে ডাকল, সুদর্শনদা! ও সুদর্শনদা! দেখ তো কে এসেছে।

কেউ সাড়া দিল না। লোকটা যেমনকে তেমন বসে রয়েছে।

হীরা বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে বলল, সকালবেলাতে অমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন? ঘুমটা ভেঙে গেল।

চেঁচাব না! কে একটা উটকো লোক ঢুকে পড়েছে বাড়িতে।

কে আবার ঢুকবে! ভিখিরি-টিকিরি হবে বোধহয়। সুদর্শনদার তো অনেক পুষ্যি।

মনে হচ্ছে পাগল।

যাঃ!

হ্যাঁ রে, কেমন যেন চেহারা।

হীরা আবার ঘুমোল।

পান্নার পড়া মাথায় উঠল। সে লেপ ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গিয়ে চমকে উঠল। অমলদা না! এত সকালে অমলদা এসে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে আছে কেন? এ মা। ছিঃ কত বড় মানুষ!

গরম চাদরটা টেনে গায়ে জড়িয়ে চটি পায়ে গলিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল পান্না।

অমলদা! আপনি দাওয়ায় বসে আছেন কেন?

অমল তার দিকে তাকাল। সে তাকানোর মধ্যে কোনও স্মৃতি নেই। ভ্যাবলা চোখ। তাকে চিনতে পারছে না।

অবাক হয়ে অমল বলল, তুমি কে বলো তো!

ও মা! আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি পান্না। রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে!

অমল চারদিকে চেয়ে যেন সংবিৎ ফিরে পেল। ভারী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, এটা তোদের বাড়ি বুঝি!

হ্যাঁ তো! আপনি চিনতে পারেননি?

অমল একটু হেসে বলল, আসলে আমি পথ-টথগুলো কেমন গুলিয়ে ফেলেছিলাম।

পথ গুলিয়ে ফেলেছিলেন! সে কী!

অমল একটু লজ্জা পেয়ে হেসে বলল, আজকাল খুব অন্যমনস্ক থাকি তো। খুব ভোরে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পথ-টথ সব এলোমেলো হয়ে গেল। তারপর একটা লোক ডেকে এনে এখানে বসাল। বলল, চা খাওয়াবে।

লোকটা কে বলুন তো?

ঠোঁট উলটে অমল বলল, চিনি না। ঢ্যাঙা, রোগামতো। বলল, বাবু, আমি আপনাকে চিনি। আপনি অনেক লেখাপড়া জানেন বলে শুনেছি, আজ আপনার কাছে কয়েকটা কথা শুনব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আমার খুব ভাল লাগে। এই বলে নিয়ে এল।

পান্না হেসে ফেলে বলল, ও তো সুদর্শনদা, আমাদের রাঁধুনি।

তাই হবে। লোকটা খুব বকবক করে, তাই না?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে বসিয়ে রেখে সে গেল কোথায়?

বলল, গিন্নিমা এখনও ওঠেননি বাবু, দাঁড়ান, দোকান থেকে আপনার জন্য ভাল বিস্কুট নিয়ে আসি।

আপনি উঠুন তো, বৈঠকখানায় এসে বসুন। আমি চা করে দিচ্ছি।

অমল লজ্জা পেয়ে বলে, তুই দিবি।

হ্যাঁ, আসুন। ইস, আমার যে কী ভীষণ লজ্জা করছে! আপনি দাওয়ায় বসে আছেন! ছিঃ ছিঃ!

তাতে কী হয়েছে। তোদের বাড়ির দাওয়ায় বসলে কি আমার মান যায়? এ-গাঁয়ের ধুলো মেখে বড় হয়েছি। হ্যাঁ রে, রামহরিকাকা, কাকিমা সব ভাল তো?

হ্যাঁ।

কতকাল দেখাসাক্ষাৎ নেই। তোর সঙ্গে সোহাগের খুব ভাব, তাই না?

হ্যাঁ। সোহাগ খুব ভাল মেয়ে।

ভারী আনমনা হয়ে খানিকক্ষণ ভ্যাবলা চোখে চেয়ে থেকে অমল বলল, সবাই ভাল। কিন্তু আমার সঙ্গেই কারও বনল না।

অমল উঠল। বৈঠকখানায় এসে বসল।

আপনি ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন অমলদা!

বয়স হচ্ছে। এখন ফ্যাট ঝরে গেলেই তো ভাল।

এই শীতে শুধু একটা সোয়েটার পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! শীত লাগে না আপনার! আমি তো সকালে লেপ ছেড়ে উঠতেই পারি না।

হাঁটলে গা গরম হয়ে যায় তো, তাই আর চাদর-টাদর নিইনি।

বসুন, আমি চা করে আনছি।

রান্নাঘরে এসে পান্না দেখল, সুদর্শন ঠোঙায় বিস্কুট এনে চায়ের জল চাপিয়েছে।

সুদর্শনদা! তুমি কী লোক বলো তো! কাকে এনে দাওয়ায় বসিয়ে রেখেছিলে জানো?

সুদর্শন এক গাল হেসে বলে, তা জানি দিদি। সবাই বাবুকে জানে। মাথা-পাগলা আছেন বটে, কিন্তু পেটে মেলা বিদ্যে। তাই তো রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এলুম। বেভুল ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

তোমার আক্কেল যে কবে হবে। বৈঠকখানায় তো বসাতে পারতে! অত বড় মান্যিগন্যি লোককে কি দাওয়ায় বসায়? আমার ঘরের বারান্দায় চেয়ারও তো ছিল?

কী জানি দিদি, ওসব করতে গেলে গিন্নিমা যদি চটে যায়। তাই সাহস করিনি। চা খাওয়াতেও দোনোমোনো করছিলাম। হিসেবের বাড়ি তো!

চিমটিকাটা কথা। তবে গায়ে মাখল না পান্না। বলল, একটা প্লেট দাও, বিস্কুটটা সাজিয়ে নিয়ে যাই।

সুদর্শন একটু দুঃখ করে বলল, ঘরে নিয়ে বসালে দিদি, তা হলে আর বাবুর সঙ্গে কথা-টথা হল না আজকে। দাওয়ায় বসলে দিব্যি কথা হত দুজনে। নাগালের বাইরে নিয়ে ফেললে তো।

থামো তো! উনি হেঁজিপেঁজি লোক নাকি?

ওই তো হয়েছে মুশকিল। এসব লোককে হাতের নাগালে পাওয়া চাঁদ পাওয়ার শামিল। আজ জুতমতো পেয়েছিলুম দিদি, দিলে তুমি সব ভণ্ডুল করে।

তোমার কী কথা বলো তো অমলদার সঙ্গে!

সুদর্শন একটু লজ্জার হাসি হেসে বলে, এই নানা রকম কথাই তো মনে আসে। দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিতুম আর কী। এই ধরো নমঃশূদ্রের মেয়ের সঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের ছেলের বিয়ে হলে সেটা অনুলোম না প্রতিলোম হচ্ছে। তারপর ধরো বলরামের মা-বাবার একটু গোলমেলে বিয়ে ছিল, তা হলে বলরামের বর্ণটা আসলে কী হবে। তারপর ধরো...

দুর! তোমার যত আজগুবি কথা। ওসব কি অমলদা জানে নাকি? অমলদা বিলেত আমেরিকায় ছিল, সাহেব মানুষ, সায়েন্টিস্ট। ওসব জাতপাতের খবর রাখার কথাই নয় তার।

কিন্তু দিদি, এও তো সায়েন্স।

তোমার মুণ্ডু। এবার চা-টা ভাল করে বানাও। গুচ্ছের চিনি দিও না যেন, আর লিকার বেশি ঘন করবে না। পাতলামতো হবে।

অ্যাঁ। বলে অবাক হয়ে সুদর্শন কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, ওই কি তোমাদের ভাল চা?

হ্যাঁ তো!

আমরা তো ভাল চা বলতে বুঝি কড়া লিকার, কড়া মিষ্টি, ঘন দুধের গন্ধ।

সে হল গরিবদের চা। বড় মানুষরা কি ওরকম চা খায়?

তুমি তো বলেই খালাস। ওদিকে বাবু কী বলেছে জানো?

কী?

যখন চা খাওয়াবো বলে ধরে আনছিলাম তখন বাবু নিজে থেকেই বলল পানসে চা খেতে পারি না বাপু, চা হবে কড়া লিকার আর খুব মিষ্টি। ওপরে সরের টুকরো ভাসবে। আর মুড়ি ছড়িয়ে দিয়ে সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে খাবো।

বলল ও কথা?

হ্যাঁ গো।

তবে তাই করো। কী জানি বাবা, অমলদার হয়তো অন্য রকম রুচি।

পান্না ফিরে এসে দেখল, অমল সোফায় বসে ঘাড় কাত করে ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর ঘুম। চোখের কোলে কালি পড়েছে লোকটার। গালের হনু দুটো উঁচু। কী মলিন বেশবাস। এ লোকে যে ওরকম সাংঘাতিক স্কলার ছিল কে বলবে এখন দেখে? বয়সও তো খুব বেশি নয়। চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে বোধহয়। কিন্তু এর মধ্যেই যেন কেমন শরীরে যৌবনের টান চলে গেছে, জবুথবু ভাব।

পাশের ঘরে মায়ের ঘুম ভেঙেছে।

ও ঘরে কে রে?

আমি মা!

ও ঘরে কী করছিস?

পান্না দরজার কাছে গিয়ে চাপা গলায় বলল, অমলদা এসেছে।

অমলদা আবার কে?

আহা, অমলদাকে চেনো না?

মহিম ভাসুরঠাকুরের ছেলে?

হ্যাঁ।

ও মা! এত সকালে কী ব্যাপার? কিছু হয়েছে নাকি?

না, না, কিছু হয়নি। এমনি এসেছে।

এত সকালে!

চা খেয়ে চলে যাবে।

বউয়ের সঙ্গে কী যেন গোলমাল শুনছিলুম।

আস্তে মা। শুনতে পাবে।

দরজাটা আবজে দে না। কাছে আয়।

দরজাটা সাবধানে ভেজিয়ে আধো-অন্ধকার ঘরে ঢুকল পান্না। মশারির ভিতর থেকে মা বলল, মাথাটা নাকি একটু খারাপ হয়েছে?

না তো! গাঁয়ের লোকে একটা ছুতো পেলেই রটায়।

তা নয় বাপু। অনেক টাকার চাকরিটাও নাকি ছেড়ে দিয়েছে। গাঁয়ে এসে থানা গেড়ে বসে আছে। এ তো ভাল লক্ষণ নয়। লোকে পুরনো কথা তুলছে।

কী কথা?

ওই যে পারুলকে নিয়ে। পারুলের জন্যেই নাকি পাগল। ওর বউ নাকি সন্দেহ করে এখনও দুজনের সম্পর্ক আছে।

বাজে কথা। পারুলদি কি সেরকম মেয়ে?

কে জানে বাবা কী। তোর অত সাউকারি করতে হবে না। সংসারের মারপ্যাঁচ বোঝার মতো বুদ্ধি কি তোর হয়েছে? নাপতেবুড়ি বলে গেল, পারুলের যে ছেলে হবে তার পিছনে নাকি ওই অমল।

ছিঃ মা, ওসব মনে করাও পাপ।

তা বাপু, বললেই দোষ? কীর্তিটা কি দোষের নয়?

কী করে ভাবলে বলো তো!

ভাবতে আমার বয়েই গেছে। ও আবর্জনা না ঘাঁটাই ভাল। লোকের মুখ তো তা বলে বন্ধ থাকছে না। ওসব লোককে বাড়িতে বেশি ঢুকতে দিতে নেই।

তুমি বড্ড সেকেলে মা। কিচ্ছু বোঝে না। কেবল কানে শুনে সব বিশ্বাস করো। পারুলদি কি তেমন মেয়ে বলে তোমার মনে হয়?

সকালবেলাটায় আর মুখ নাড়তে হবে না। ঠাকুর দেবতার নাম এখনও উচ্চারণ করিনি। তোর বাবা এসময়ে গেল কোথায়?

বাবা তো রোজ সকালে মর্নিং ওয়াক করতে বেরোয়।

মর্নিং ওয়াক না ছাই। চাষের মাঠে গিয়ে বসে আছে দেখ গে। খেজুর রস সাঁটছে। কিন্তু এখন অমলের সঙ্গে কথা বলে কে?

আমিই বলছি। সুদর্শনদা চা করছে।

বেশি গলাগলির দরকার নেই। ও মানুষ কিন্তু ভাল নয়। চরিত্রের দোষ আছে।

পান্না একটু রাগ করেই এ-ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। অমল এখনও নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। মাথাটা আরও ঝুলে পড়েছে বাঁ ধারে।

সুদর্শন চা নিয়ে আসার পর পান্না ডাকল।

অমল ঘুম ভেঙে ভারী লজ্জিত হয়ে বলল, ইস, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আপনি খুব টায়ার্ড, না?

হ্যাঁ। খুব টায়ার্ড। রাতে ঘুম হয় না তো। সেই রাত দুটোয় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি।

রাত দুটো!

হ্যাঁ। ঘুম না এলে ঘরে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে।

বেরিয়ে কোথায় যান?

কোনও ঠিক থাকে না। বেরিয়ে পড়ি।

কলকাতায় যাবেন না?

যেতে ভয় হয়।

ভয় কেন অমলদা?

কলকাতাকে ভয় পাই না। ওদের পাই।

কাদের ভয় পান অমলদা?

অমল একটু হেসে বলল, সবাইকে ভয় পাই রে। আমার আত্মবিশ্বাস বড্ড কমে গেছে।

সোহাগ কিন্তু আপনাকে খুব ভালবাসে।

হুঁ।

সোহাগ বলছিল, ওর মন খুব খারাপ।

কেন?

আপনার আর বউদির নাকি সেপারেশন হয়ে যাচ্ছে?

অমল চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ স্থির হয়ে। তারপর বলল, তোরাও শুনেছিস বুঝি?

হ্যাঁ। সেইজন্যই তো আপনি—

কথাটা শেষ করল না পান্না। আসলে এতটাও তার বলার কথা নয়। তার হঠাৎ মনে হল সে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

অমলের অবশ্য তেমন ভাবান্তর হল না।

মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, মনটা ভাল নেই রে। আমার যে কী হয়েছে তা বুঝতে পারি না। পাগল হয়ে যাচ্ছি কি না কে জানে। গেলে একরকম ভালই। পাগলের তো স্মৃতি থাকে না। মাথার মধ্যে সব উলটোপালটা হয়ে যায়।

কেন পাগল হবেন অমলদা? ওসব ভাববেন না। কলকাতায় ফিরে যান। সব ঠিক হয়ে যাবে।

অমল ভারী সরল চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, বলছিস?

হ্যাঁ।

যাব?

হ্যাঁ অমলদা, প্লিজ।

অমল মাথা নেড়ে বলল, বেশ, তুই যখন বললি যাব। অনেক সময়ে ভগবান ছোট ছোট মানুষের ভিতর দিয়ে কথা বলে ওঠেন, জানিস?

পঞ্চাশ

মায়া-দরজায় অকস্মাৎ মৃদু করাঘাত, শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি নন্দিন। কী চাও এই অসময়ে?

অসময় কেন হবে? শুনতে পাই তুমি চিরজাগ্রত, চির তৎপর। তোমার কি বিশ্রামের প্রয়োজন হয়?

না। নন্দিন। আমার সময় নেই। এখন বিরক্ত কোরো না।

আমি এলে বুঝি তোমার সময় নষ্ট হয়? এই আমি বসে রইলুম তোমার দোরগোড়ায়। এখানে বসে আমি বারবার তোমার দরজায় করাঘাত করব। চেঁচিয়ে গান গাইব, আপন মনে কথা কইব, যতক্ষণ তুমি দরজা না খোলো।

তোমার বুঝি কাজ নেই? কিন্তু আমার যে অনেক কাজ। মাটির অতল থেকে উঠে আসছে সোনা, থরে বিথরে সেসব আমি সাজিয়ে তুলছি। এই বিপুল সম্পদের দায় তো কম নয়। এখন কি আমার অকাজের কথা বলার অবকাশ আছে? তোমার রঞ্জন আসছে, সে তোমার অবকাশ ভরিয়ে দেবে। আমাকে কাজ করতে দাও।

শোনো রাজা, আমার রঞ্জন আসবে বলে কি তোমার হিংসে হয়?

না নন্দিন। আমার তুচ্ছ কোনও হৃদয়দৌর্বল্য নেই। আমি কাজের লোক।

আজ তোমাকে একটা কথা বলব।

আজ নয়। অন্য দিন এসো।

আজ না বললে যদি আর বলার সময় না হয়?

তা হলে বাইরে থেকে বলো, আমি শুনছি।

আমার রঞ্জন আসবে, তবু আমি বারবার তোমার কাছে কেন ছুটে আসি তা বুঝতে পারো না রাজা?

বুঝবার দরকার কী নন্দিন? বাইরে দখিনা বাতাস বয়ে যায়, পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে, ফুলের গন্ধে বাতাস মাতাল হয়, আমি সব টের পাই, কিন্তু আমার যে আনমনা হতে নেই।

শুধু কাজ? শুধু সঞ্চয়? শুধু সোনার গারদে আত্মনির্বাসন?

রাষ্ট্রযন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি হল তার সম্পদ। বস্তুগত সম্পদ হল পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতর বিষয়। তুমি কি ভুলে যাও নন্দিন, যে আমি দেশের রাজা? অনেক কিছু থেকে মনকে প্রত্যাহার করে নিই আমি।

আগে বলো, রঞ্জনকে তোমার হিংসে হয় না? একটুও না?

হয়তো হয়। আমার হৃদয়বৃত্তি এতই সামান্য যে ঠিক বুঝতে পারি না।

আমি কতবার মালা গেঁথে এনেছি, তুমি পরোনি। শুধু বলেছ, নিজে পরো। আমার মালা ফিরিয়ে দাও তুমি, তবু আমি তোমার কাছে ছুটে ছুটে আসি। মনে আছে তোমার? একদিন তুমি বলেছিলে, আমার সবটুকু দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই, ধরা দেবে কি নন্দিন? বলোনি?

বলেছি।

তুমি কি জানো সেই কথা শুনে আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়েছিল? মন নেচে উঠেছিল তিতিরের মতো। সেদিন সারা বেলা আমি যেন মেঘ হয়ে আকাশে ভেসে বেড়ালুম। কিন্তু জানি, ও তোমার মনের কথা নয়।

হয়তো তখনকার মতো ও আমার মনের কথাই ছিল!

ছিল? সত্যি বলো, ছিল?

বললে তুমি খুশি হবে?

হব না! বলো কী? আমার আধখানা মন যে সবসময়ে তোমার কাছে পড়ে থাকে। বলে দেখ, আমি ফের মেঘের মতো ভেসে বেড়াব।

কথাটা তখন সত্য ছিল। কিন্তু এখন যদি সত্য না থেকে থাকে?

সত্য কি বদলে যায়?

যায় নন্দিন। সংসারে সব সত্যই তো আপেক্ষিক, শর্তনির্ভর। এমনকী প্রেম ভালবাসা এসবও।

ওরকম বোলো না তো। ওরকম নিষ্ঠুর কেন তুমি? ভাল করে নিজের মনের ভিতরে খুঁজে দেখ, কথাটা সত্যিই মিথ্যে ছিল কিনা।

আমার যে সময় নেই নন্দিন। আমার অনেক কাজ। ধ্বজাপুজোর সময় এগিয়ে আসছে।

আমি তো তোমার কাছে দিনে শতেকবার ছুটে আসি একটু কথা কইবার জন্যই। একটু মায়া হয় না তোমার?

মায়া হয় নন্দিন। এ-রাজ্যে একমাত্র তুমিই আমাকে একটু দুর্বল করে ফেলেছ। কিন্তু এই দুর্বলতা তামাকে ঝেড়ে ফেলতেই হবে। তুমি যাও নন্দিন।

কথাটা আর একবার বলো।

কোন কথাটা?

ওই যে বললে এ-রাজ্যে একমাত্র আমিই তোমাকে দুর্বল করে ফেলেছি। সত্যি? বলো না!

হ্যাঁ নন্দিন। আমি জানি এ-রাজ্যের কোনও মানুষই আমাকে দু চোখে দেখতে পারে না। শ্রমিকরা আমাকে ঘৃণা করে, প্রজারা আমার মুণ্ডপাত করে। কেউ আমার সঙ্গে কথা কইবার স্পর্ধা অবধি দেখায় না। একমাত্র তোমারই কোনও ভয় নেই, সংকোচ নেই, কুণ্ঠা নেই।

কেন নেই তা কি জানো?

না নন্দিনী, জানি না। ওসব নিয়ে ভাববার সময় নেই। তুমি যাও।

বলেছি তো, আজ আমি সারাদিন তোমার দোরগোড়ায় বসে থাকব।

তা হলে যে আমার কাজের ব্যাঘাত ঘটবে। শ্রমিকেরা তাল তাল সোনা বয়ে আনছে আমার ঘরে। সেসব সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলা, হিসেব রাখা, সব যে গণ্ডগোল হয়ে যাবে।

যাক। আমি আজ মান করেছি।

অভিমান তার কাছেই করা ভাল যে তার দাম দিতে পারে।

আমার অভিমানের দাম তুমি কেন দিতে পারো না?

আমি, আমি তো তোমার রঞ্জন নই নন্দিনী!

আমার অর্ধেক মন জুড়ে যদি রঞ্জন, তো বাকি অর্ধেক মন জুড়ে যে তুমি!

ভুল হচ্ছে নন্দিনী। আমি জানি যে হৃদয় রঞ্জনকে ভালবাসে সেই হৃদয় কখনও এই অন্ধকার গর্ভগৃহের অধিপতিকে ভালবাসতে পারে না।

ভালবাসার তুমি কী জানো?

ভালবাসার আমি কিছুই জানি না নন্দিনী। আমার সব ভালবাসা গিয়ে শেষ হয় আমার চারদিকে তিল তিল করে জমে ওঠা এই সোনার পাহাড়ে। আমি অন্ধকার ভালবাসি, একাকিত্ব ভালবাসি, শক্তিমত্তা ভালবাসি। সংগীতের চেয়েও চাবুকের শব্দ আমার অধিক প্রিয়।

না না, ওরকমভাবে বোলো না। তুমি ওরকম নও কিছুতেই।

আমি কীরকম নন্দিনী?

আমাকে মুখোমুখি পেয়ে একদিন আমার অরণ্যের মতো চুলে দুটো শক্তিমান হাত ডুবিয়ে কী গভীরভাবে চেয়ে ছিলে তুমি আমার চোখের দিকে। সেই দৃষ্টি যে আমি ভুলতে পারি না রাজা। হ্যাঁ, তুমি মস্ত মানুষ, নিষ্ঠুর রাজা, তুমি ভয়ংকর। কিন্তু সেদিন তো আমার একটুও ভয় করেনি!

ভয় পাওনি বলেই ভেবে নিও না যে, আমি ভয়ংকর নই।

তোমাকে যে আমার এক নিস্পাপ শিশুর মতো লেগেছিল সেদিন। তোমার দুটি চোখের ভিতরে আমি যেন স্নান করে উঠলাম। কী আশ্চর্য গভীর তোমার চোখ, যেন সমুদ্দর। তোমার চোখের দিকে চেয়ে আমি সমুদ্রের গভীর কল্লোল শুনতে পেয়েছি, যেন অনেক শঙ্খ বেজে উঠেছিল একসঙ্গে। মনে হয়েছিল তোমার মতো বিশাল পুরুষ আমি কখনও দেখিনি! আর কী ভীষণ একা তুমি!

তুমি আমাকে ভয় পাও না নন্দিনী?

না। তোমাকে যে চেষ্টা করেও ভয় করতে পারিনি। ভয় করলে কি ছুটে ছুটে আসতুম তোমার কাছে?

তোমাকে নিয়েই তো আমার বিপদ নন্দিনী।

কীসের বিপদ?

আমাকে এতকাল সকলেই ভয় পেত। কেউ কখনও আমার দিকে মুখ তুলে তাকানোর সাহসটুকুও দেখায়নি। ওই ভয় থেকেই এসেছে শৃঙ্খলা, ওই ভয় থেকেই এসেছে বিনা প্রশ্নে আদেশ-পালন করা, ওই ভয়ই মাটির গভীর থেকে তুলে আনে তাল তাল সোনা। এ রাজ্যে কখনও বিদ্রোহ হয়নি। কিন্তু নন্দিনী, তুমি যে চারদিকে ভয় ভাঙানিয়া হাওয়া বইয়ে দিচ্ছ!

লোকে তোমাকে ভয় পেলে বুঝি তোমার ভাল লাগে?

লাগে নন্দিনী। আমার সামনে এলে মানুষ কুঁকড়ে যায়, পাঁশুটে হয়ে যায়, বাকরোধ হয়, চোখ বুজে ফেলে—আমি তখন বুঝতে পারি যে, সব ঠিক আছে। আমার কোনও বিপদ নেই। কিন্তু একবার ওদের ভয় ভেঙে গেলেই আমার বিপদ। এক মহা বিস্ফোরণে খানখান হয়ে যাবে আমার যতেক নির্মাণ। উবে যাবে সোনা, অন্তর্হিত হবে সিংহাসন, লোপ পাবে আমার সীমাহীন ক্ষমতা। নন্দিনী, আমি তোমাকে শাসন করার আগেই তুমি আত্মসংবরণ করো। ভয় ভাঙানিয়া হাওয়া বইতে দিও না।

শোনো, শোনো। তুমি ওরকম নও! তুমি কিছুতেই ওরকম নও। তোমাকে যে আমি আমার মনের ভিতরে চিনতে পেরেছি।

কী চিনতে পেরেছ নন্দিনী?

তুমি ওরকম নও।

আমি কীরকম?

তুমি এক বিশাল পুরুষ। তুমি মহা শক্তিমান। তোমার শাসনে জড় হয়ে থাকে মানুষ। তোমার অতুল ঐশ্বর্য। তবু আমার কেবলই মনে হয় ও তুমি নও। এসবই তোমার খেলনাপাতি। তুমি যেন এক দুরন্ত বালক, খেলায় মেতে আছ। ভুলিয়ে রাখছ নিজেকে। কিন্তু তুমি আবার এক লহমায় সব খেলনা হুটপাট করে দিয়ে উধাও হয়ে যেতে পার। তোমার চোখের ভিতর দিয়ে তোমার গভীর মনের ভিতরে সেই বৈরাগ্যকেও যে আমি দেখেছি।

ওসব তোমার কল্পনা নন্দিন। তুমি আমাকে তোমার মন দিয়ে গড়ে নিয়েছ মাত্র। ও আমি নই। আমার বেলা বইয়ে দিও না। কাজের সময়ে ফাঁক পড়ছে, আমার সময় নেই। তুমি যাও নন্দিনী।

আমি তো বলেইছি তোমার দোরগোড়ায় আজ আমি সারাদিন বসে থাকব। তোমাকে জ্বালাব, কাজ ভণ্ডুল করব, আনমনা করে দেব তোমাকে।

কেন নন্দিন?

তুমি কেন অন্ধকারের রাজা হয়ে থাকবে? তুমি আলোর কেউ নও, আনন্দের কেউ নও? তোমার বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে দিয়ে ফিরে যায় পৃথিবীর আলো, গান, গন্ধ, কেন এই নির্বাসন তোমার?

আমি যা, আমি ঠিক তা-ই।

আচ্ছা, কী করে তোমাকে দেখাই বলো তো!

কী দেখাতে চাও?

আমার মনের মধ্যে যে-তুমিটা বসে আছ তাকে।

সে অলীক, সে মিথ্যে।

একবার যদি তোমার সামনে তাকে আনতে পারতাম।

বৃথা কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে। এবার তুমি যাও নন্দিন। গুপ্তচরেরা আমাকে গোপন তথ্য দেবে বলে অপেক্ষা করছে। সেনাপতি দাঁড়িয়ে রয়েছেন আদেশের অপেক্ষায়। কোটাল এসেছেন পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে।

তোমার সারাদিন শুধু ভারী ভারী কাজ।

আমি যে কাজের লোক নন্দিন। আমি তোমার রঞ্জন নই।

তুমি কি রঞ্জনকে কটাক্ষ করলে?

না নন্দিন। আমি তোমাকে বলছি, তোমার রঞ্জন আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জীব। শঙ্কায়, উদ্বেগে, অনিশ্চয়তায় আমার সময় কাটে। অবসরহীন এই জীবনে মাঝেমধ্যে মনে হয় বটে, অন্য রকম হলেও বোধহয় মন্দ হত না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যায়, আমার বিপুল সম্পদ, অমিত শক্তি ও দুর্বার শাসনের কথা। নন্দিন, তোমাদের কত ছুটি, কত অবকাশ, কত গান, কত কথা। কেন আমার কাছে আসো নন্দিন? তোমার জগতে আমার কোনও স্থান নেই। বড্ড বেমানান।

তাই বুঝি?

রঞ্জনকে নিয়ে স্বপ্নের স্রোতে ভেসে যাও নন্দিন। আমাকে ভুলে যাও।

শোনো, শোনো। শ্রবণের কপাট বন্ধ করে দিও না এখনই। আমার কথা যে শেষ হয়নি।

তোমার মনে বুদ্বুদের মতো কথার জন্ম হয়। আমি কি অত কথা কইতে পারি!

পারতেই হবে। শোনো, তোমাকে আজ আমার একটা কথা বলতেই হবে।

তবে তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

তাড়াতাড়ি বলার মতো কথা নয় যে! এক একটা কথা আছে যা খুব ধীরে ধীরে ফুলের পাপড়ির মতো ফুটে ওঠে। তাড়া দিলে হবে না।

আমার সামনে তুলাদণ্ডে সোনার ওজন হচ্ছে। আমার যে এক মুহূর্তও অন্যমনস্ক হওয়ার উপায় নেই। আজ তোমাকে শুনতেই হবে।

বলল, শুনছি।

না, শুনছ না। এক মুহূর্ত তোমার কাজ ফেলে রেখে আমার কাছাকাছি এসো। চুপটি করে বসো। রাজকার্য অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু আমার কথার যে তর সয় না। একটা কথা মাথা খুঁড়ে মরছে আমার ভিতরে। কতক্ষণ তাকে আটকে রাখতে পারি বলো!

এই কাছে এলুম। এবার বলো।

আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি নন্দিন। আমি সবাইকে দেখতে পাই, কিন্তু কেউ আমাকে দেখতে পায় না।

বলো তো আমি আজ কোন সাজে সেজেছি!

বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছ। এলোকেশে আলতো একটি মালা জড়িয়ে রয়েছে। কপালে একটি শ্বেতচন্দনের ফোঁটা। মেয়েদের সাজের কোনও মর্মই আমি জানি না। তবু বলি, তোমাকে আজ অপরূপ দেখাচ্ছে। এ সাজ কার জন্য নন্দিন? রঞ্জন আসবে বলে?

কেউ বুঝি তোমার জন্য কখনও সাজেনি?

রাজ-অবরোধে নারীর অভাব নেই। নৃত্য-গীত পটীয়সীরাও আমার মনোরঞ্জন করতে সর্বদাই তৎপর। তবু তোমাকেই বলি নন্দিন, তারা কেউ আমার জন্য সাজেনি কখনও। সাজতে হয় বলে সাজে মাত্র।

তুমি কি জানো আজ রঞ্জনের জন্য নয়, আমি সেজেছি তোমারই জন্য!

বৃথাই সেজেছ। এই অন্ধকূপ থেকে তোমাকে যে আমার কিছুই দেওয়ার নেই।

আমার আছে।

আমি কৃপণ, সঞ্চয়কারী, লোভী, নৃশংস, মদমত্ত এক যন্ত্র মাত্র। নন্দিন, কী দেবে তুমি আমাকে? এই দুই লোভী হাত শুধু পৃথিবীর সম্পদ কেড়ে নিতে চায়! তুমি আমাকে কী দেবে?

কেন বুঝতে পারো না তুমি, আমার অর্ধেক হৃদয় যদি রঞ্জন জয় করে থাকে, বাকি অর্ধেক আমি তো কবেই তোমার দরজার চৌকাঠে রেখে দিয়ে গেছি।

অর্ধেক! অর্ধেক নন্দিন? আমি কখনও অর্ধেক গ্রহণ করিনি। আমি চাই সবটুকু। সবটুকু চাই, নইলে সবটুকুই প্রত্যাখ্যান করি। নন্দিন, তুমি রঞ্জনের জন্য তোমার সবটুকু হৃদয় তুলে রাখো। মরুভূমিতে সিঞ্চন করার মতো বোকা তুমি নও।

আমার প্রগলভতা ক্ষমা করো। দ্বিধাদীর্ণ এই অসহায় নারীর দিকে একবার ভাল করে তাকাও। আমার সবটুকু তো রঞ্জনেরই ছিল। এই নন্দিনী তো রঞ্জনেরই রচনা। জানতুম রঞ্জনই আমার সব। সে আমার গান, আমার আলো, আমার মুক্তি। রঞ্জন যেখানে যায় সেখানেই চারদিক ফুল্ল হয়ে ওঠে।

জানি নন্দিন। রঞ্জনের কথা তুমি অনেক বলেছ।

তবু দেখ, যেদিন তোমাকে দেখলুম, তরাসে কেঁপে উঠেছিল বুক। কী ভয়ংকর বিপরীত তুমি! কী নিষ্ঠুর! কী কঞ্জুষ! কী স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব! আবার দেখলুম, কী প্রবল তোমার শক্তি! ঐরাবতের মতো সামর্থ্য তোমার! রঞ্জন সুন্দর বটে, কিন্তু কবির মতো সুন্দর। আর তুমি! তোমার সৌন্দর্য যেন অন্ধকার কুঁদে তৈরি করা। কী বিশাল, কী স্থির, কী একাগ্র!

আর বোলো না নন্দিন।

আজ আমাকে বলতেই হবে। রঞ্জন সুন্দর বটে, কিন্তু সে যেন ময়ূরের পালকের মতো পলকা, উড়ে যায়। সে এক বিবাগী পুরুষ, তার কোনও স্থণ্ডিল নেই। পৃথিবীর আনন্দের সঙ্গেই যেন তার সম্পর্ক। কিন্তু তুমি তো তা নও।

জানি নন্দিন।

পৃথিবীর গভীর দুঃখ, গভীর বিষাদ, গূঢ় অভ্যন্তরের ভিতরে তোমার অবস্থান। এ জীবনকে তুমি মন্থন করেছ ঢের বেশি। মন্থনের হলাহলে জর্জরিত তুমি এক বিষণ্ণ পুরুষ। নন্দিনীকে বিদীর্ণ করেছ তুমি, দ্বিখণ্ডিত করেছ। রঞ্জনকে কী করে আমার সবটুকু দেব আর? বলে দাও।

ক্ষমা করো নন্দিন। এ আমার অজানিত অপরাধ।

তুমি তো লুণ্ঠন করোনি আমাকে। তবে ক্ষমাভিক্ষা কেন?

একদিন কুঁদ ফুলের মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছিলে। মনে পড়ে কি নন্দিন?

পড়ে। তুমি বলেছিলে, নিজে পরো। কী অপমান!

আজ বলি, এই সত্যটিও ঢাকা দিয়ে রাখো। ঢাকা থাক, সব বেদনাবহ সত্য আজ ঢাকা থাক।

রঞ্জন আমার চোখের দিকে একপলক তাকালেই বুঝতে পারবে, আমি আর সবটুকু তার নেই। ওগো, রঞ্জনের কাছে যে আমি কিছুই লুকোতে পারি না। আমার বড় ভয় হয়।

কীসের ভয় নন্দিনী?

ভয় হয় যদি আমাকে নিয়ে তোমার আর রঞ্জনের মধ্যে লড়াই বাঁধে।

রঞ্জনের সঙ্গে আমার কোনও লড়াই নেই নন্দিনী। আমি রাজ্য জয় করতে ভালবাসি, আমি খনির গভীর থেকে তুলে আনতে ভালবাসি সোনা, আমি ভালবাসি সম্পদ ও আধিপত্য। তোমাদের মিহিন প্রেমের তৃতীয় কোণ তো আমি নই। যদি তোমাকে লুণ্ঠন করতে চাইতুম তবে সে প্রলয়ঝড়ের মুখে কবেই উড়ে যেত রঞ্জন। আমার লড়াই কার সঙ্গে জানো? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মল্লবীর, ক্ষ্যাপা ষাঁড়, ক্ষুধার্ত বাঘ, ক্রুদ্ধ সিংহ, মত্ত হাতি কতবার লুটিয়ে পড়েছে আমার পায়ের তলায়। এই সূক্ষ্ম মায়া-দরজার অন্তরাল থেকে তাদের গর্জন আর আর্তনাদ শোনোনি কখনও?

শুনেছি।

কতবার তুমিই বলেছ তোমার রঞ্জন আসবে ভোরের আলোর মতো, বসন্ত সমাগমের মত, ফুলের সুগন্ধের মতো। রঞ্জন যেখানে যায় সেখানে সবাই জেগে ওঠে, শুরু হয় উৎসব, গান। সে কি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে নন্দিন?

তবু ভয় হয়। কেন জানো?

কেন?

আমার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার এক জায়গায় বড্ড মিল।

কীসের মিল?

আমার রঞ্জনের বুকে যে একটুও ভয় নেই। ভয়ের ছায়াটুকু কখনও তাকে স্পর্শ করে না। সে কাউকে ভয় পায় না বলেই তার বিপদ বেশি। শুধু ভাবি, দুজন ভয়হীন মানুষ যখন মুখোমুখি হবে—তুমি আর রঞ্জন—তখন কি প্রলয় হবে!

এই পৃথিবীতে আমি একমাত্র নিজেকেই ভয় পাই। কেন জানো?

কেন?

এই যে আমার বিপুল শক্তি ভিতর থেকে কেবলই ফুঁসে উঠছে, ওই অন্ধ শক্তি সবসময়ে চারদিকটাকে তছনছ করে দিতে চায়। সুন্দর, স্বচ্ছ, শুভ্র, পবিত্র কাউকেই রেয়াত করতে চায় না সে। এই অন্ধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন বিপুল শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন। তোমার রঞ্জন যখন আসবে তখন আমাকে সতর্ক করে দিও।

শুনে আরও ভয় করছে আমার।

রঞ্জনের আগমনের আগাম বার্তা তোমার কাছে তো পৌঁছে যাবেই। তুমি আমার দরজায় করাঘাত করে বলে যেও সে কোন পথ দিয়ে আসবে। আমি সে পথ থেকে প্রহরা তুলে নেব, মসৃণ ও নিরাপদ করে দেব তার আবির্ভাব। বিষাণ বাজবে, প্রতিহারীর ঘোষণা শোনা যাবে। তোমার ভয় নেই নন্দিন। এখন যাও। আমাকে কাজ করতে দাও।

এটা কি ইমপ্রুভমেন্ট অন রবীন্দ্রনাথ? নাকি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তার? নাকি বিকল্প রক্তকরবী? সে নিজের লেখাটা পড়ে কিছুতেই বুঝতে পারল না কেন লিখল, কেন লিখতে গেল। লেখাটা বারবার পড়ল সে। এর ভিতরে কে আছে? কেউ কি আছে তার চেনা? মোনা, পারুল, কিংবা আর কেউ? সে নিজে? যাই হোক এই ভুসিমাল নিয়ে তো কেউ আর রিসার্চ করবে না।

এখন কবোষ্ণ দুপুর। তার ভীষণ খিদে পেয়েছে। এই একটা জিনিস সে ভীষণ টের পায়। খিদে, একটা আগ্রাসী খিদে তার শরীরে, পাকস্থলীতে মন্থনদণ্ডের মতো পাক দিয়ে ওঠে। তখন বড্ড মাথা গরম হয়ে যায়। কেন কেউ তাকে খেতে দিচ্ছে না বলে একরকম অবোধ অভিমান হতে থাকে।

ব্লাড সুগার হয়নি তো? সে শুনেছে ব্লাড সুগারের একটা লক্ষণ ঘন ঘন ভীষণ খিদে পাওয়া। শরীরের খবর সে তো রাখে না। কত জট পাকিয়ে আছে ভিতরে কে জানে।

কিছুক্ষণ বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়ে রইল অমল। সে কি আজ সকালে কিছু খায়নি? খিদেটা পেটের মধ্যে বেড়ালের মতো হাঁচোড়-পাঁচোড় করছে কেন? একটু ভাবতেই অবশ্য মনে পড়ল, আজ সকালে সে রুটি আর

আলুভাজা খেয়েছিল। ঘড়িতে এখন মোটে সাড়ে এগারোটা। এত তাড়াতাড়ি খিদে পাওয়ার কথা নয়। পেটের খোঁদলটায় হাত রেখে সে কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল।

অমলদা! ডাক শুনে কেঁপে উঠল অমল। এ নিশ্চয়ই বিভ্রম। চোখ চাইলেই এই মধুর বিভ্রম ভেঙে যাবে।

অমলদা, তুমি কি ঘুমোচ্ছ?

অমল চোখ মেলল। মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল তার।

না। কী চেহারা হয়েছে তোমার বলো তো! কতকাল দাড়ি কামাওনি? চুল আঁচড়াওনি!

অমল উঠে বসল, বোসস পারুল।

বসবার জন্য আসিনি। ঝগড়া করার জন্য এসেছি।

ঝগড়া! বলে অমল স্মিতমুখে মাথা নেড়ে বলল, আমি কি ঝগড়া করতে জানি? কীসের ঝগড়া পারুল?

কী শুনছি বলো তো!

অমল চোখ নত করে বলল, কী শুনছ?

তুমি আর মোনা নাকি ডিভোর্সের মামলা লড়ছ?

আমি তো মামলা লড়ছি না। মোনা লড়ছে।

কেন?

তা জানি না। মোন আমাকে সহ্য করতে পারছেনা আর।

সেই দোষটা কি মোনার? তোমার নয়?

আমারই তো দোষ।

যদি জানো তোমার দোষ, তবে শোধরাও না কেন?

অমল মাথা নেড়ে বলল, পারি না।

কেন পারো না?

আর নতুন করে কিছু হওয়ার নেই আমার।

ওসব বোলো না। তোমার মেয়ে এসে পান্নার কাছে অনেক দুঃখ করে গেছে তোমাদের সেপারেশন হয়ে যাচ্ছে বলে। ছেলেমেয়ে দুটোর কথা ভেবেও তো নিজেকে একটু বদলাতে পারো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অমল বলে, ওরাই বা আমার কে বলো! আমাদের যে সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি তেমন করে। সবাই কেমন ছাড়া-ছাড়া, আলাদা-আলাদা। যে যার নিজের শেল-এর মধ্যে গুটিপোকার মতো আটকে আছি।

তোমাদের কি ইগো প্রবলেম?

কে জানে পারুল! তাই হয়তো হবে।

ঘেন্নার কথা কী জানো? মোনা নাকি বলে গেছে সে তোমাকে আমার জন্যই সন্দেহ করে।

মাথা নেড়ে অমল বলে, হ্যাঁ।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সবচেয়ে বড় শত্রু হল সন্দেহ। যদি ওটা এখনই উপড়ে ফেলতে না পারো তা হলে নিউরোসিসে দাঁড়িয়ে যাবে।

তার কি আর কোনও প্রয়োজন আছে পারুল? মোন তো ডিভোর্সের মামলার জন্য তৈরি হচ্ছে।

শোনো, একজন বাঙালি সাদামাটা গৃহস্থঘরের বউ কি সহজে ডিভোর্সের মামলা করে? এদেশে ডিভোর্সি মহিলার ভবিষৎ বলে কিছু কি আছে?

তা তো আমি জানি না।

জানতে তো কেউ বারণ করেনি। তোমার বিয়ে কেন ভেঙে যাচ্ছে তা জানার চেষ্টা না করে তুমি গাঁয়ে এসে পড়ে আছ কেন?

আজ কি আমাকে বকতে এসেছ পারুল?

হ্যাঁ। তোমার দুঃখের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে থাকলে কি আমার ভাল লাগার কথা?

সেটা মোনার ভুল।

সবটাই ভুল? যদি তাই হয় তা হলে ঠুনকো ভুলটা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করোনি কেন? সাধারণ একটা ঘটনাকে জটিল করে তুলছ অমলদা।

আমি কি জট ছাড়াতে পারি?

কেন পারছ না? কেন চেষ্টা করছ না?

কী করব পারুল?

তুমি কলকাতায় ফিরে যাও।

গিয়ে?

চাকরিটা আছে না গেছে?

সহজে যাবে না। বেতন কাটবে হয়তো।

তা হলে আগে চাকরিতে জয়েন করো। লিভ অর ট্রাই টু লিভ নর্মালি।

আমি আর নর্মাল নেই পারুল। আমার মাথা কাজ করে না, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, বিড়বিড় করে কথা কই, হঠাৎ হঠাৎ আচমকা অদ্ভুত সব কথা বলে ফেলি, অদ্ভুত সব আচরণ করি। না পারুল, আমি আর স্বাভাবিক নেই।

পারুল থমকাল, ডাক্তার দেখিয়েছ?

হ্যাঁ। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে মাঝে মাঝে কাউনসেলিং নিতে যেতাম।

কিছু হয়নি তাতে?

হয়। তারপর ফের যেন সব গোলমাল হয়ে যেতে থাকে। না পারুল, এই গহ্বর থেকে আমার আর ওপরে উঠে আসার উপায় নেই।

তুমি কি বাস্তব থেকে পালাতে চাইছ?

মাথা নেড়ে অমল বলে, জানি না।

তবু কলকাতায় ফিরে যাও অমলদা। এখানে পড়ে থাকলে মোনা আরও ক্ষেপে যাবে। এত অবহেলা ওর প্রাপ্য নয়।

তুমি বললে যাব।

আজই যাও।

যাব। তারপর কী করব?

সেটা ঠিক করে নাও এখন থেকে।

মাথা নেড়ে অমল বলে, ওটা পারি না। আমাকে কেউ যদি চালিয়ে নিয়ে যেতে রাজি থাকে একমাত্র তা হলেই আমি চলতে পারি। সে খেতে বললে খাব, শুতে বললে শোব, চলতে বললে চলব, বলতে বললে বলব, চুপ করে থাকতে বললে চুপ থাকব। আমার এখন ঠিক এরকমই একজনকে চাই।

পারুল হাসল, তা হলে তো তুমি লক্ষ্মী ছেলে!

হ্যাঁ পারুল। আমি যা করতে চাই সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। পদে পদে ভুল করে বসি। তাই আই ওয়ান্ট টু বি ডোমিনেটেড বাই সামওয়ান।

সেই সামওয়ান যদি মোনাই হয়!

নয় কেন? কিন্তু মোনা কি হবে? মোনা তো আমাকে চায় না।

বরং বলো, তুমিই তোমাকে চাও না।

একান্ন

গভীর রাত, না ভোরের কাছাকাছি তা বুঝতে পারছিল না অমল। তবে পাখিদের শব্দ নেই। চারদিক নিঃঝুম। আর হিমযুগের মতো শীত। আজকাল দিক ঠিক রাখতে পারে না সে। জানালা বন্ধ করে শোওয়ার অভ্যাস নেই বলে পায়ের দিকের জানালাটা খোলা রেখে দিয়েছিল সে। এখন ঘুম ভেঙে একটু ভেবে দেখল যে, ওটাই উত্তর দিক। আর সেইজন্যই এত হিম হয়ে আছে ঘরখানা।

হাতে ঘড়ি নেই। কটা বাজে বুঝতে পারছিল না সে। সময়ের বোধ তার ভিতরে আজকাল কাজ করে না। আগে করত। আগে ঘড়িতে বাঁধা জীবন ছিল তার। কখনও অফিসে যেতে দেরি হয়নি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল হত না, ট্রেন বা প্লেন কখনও মিস করেনি সে। এখন সেই লোকটাকে আর চেনা বলেই মনে হয় না। মনে হয় ওটা পূর্বজন্ম।

অন্ধকারে উঠে বসল সে। সকালে সে কলকাতায় যাবে। কেন যাবে, গিয়ে কী হবে তা সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে না। মোনা ডিভোর্সের মামলা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। ডিভোর্সই বা করতে চায় কেন? তারা যেমন পরস্পরকে মনে মনে প্রত্যাখ্যান করে এক ফ্ল্যাটেই বসবাস করছে ডিভোর্স কি তার চেয়ে বেশি কিছু লাভজনক হবে? এও তো ডিভোর্সই। এবং তারা যে যা খুশি করতে পারে। বিয়ে বা সম্পর্ক না মানলেই তো হয়। কোর্ট-কাছারি করার দরকারই বা কী। একগাদা পয়সা খরচ এবং অনভিপ্রেত পাবলিসিটি। মোনা আর তার মধ্যে বন্ধনই তো নেই, তা হলে এই ভাগভিন্ন হওয়ার পরিশ্রমই বা কেন?

লজিকটা খুঁজে পায় না অমল। ডিভোর্সের প্রয়োজন সম্পর্কে সে তেমন অবহিত নয়। তবু সে কলকাতা যাবে। কিছু সইসাবুদ করতে হবে হয়তো। করে দেবে অমল। তারপর মোনা সরে যাবে। তারপর কী হবে তা অমল জানে না।

উঠে সে বাতি জ্বালতে গিয়ে দেখল, বাতি জ্বলছে না। বাতি কেন জ্বলছে না সেটা খুব অবাক হয়ে বুঝতে চেষ্টা করল সে এবং অনেকক্ষণ পরে বুঝতে পারল, এখানে প্রায়ই সুইচ টিপলে বাতি জ্বলে না। এখানে লম্বা লম্বা লোডশেডিং হয়। তা হলে সেটা বুঝতে এত সময় লাগল কেন তার?

চেনা ঘর। হাতড়ে টেবিলের ড্রয়ার খুলে ঘড়িটা বের করল সে। রেডিয়াম ডায়ালের ঘড়ি অন্ধকারে বেশিক্ষণ থাকলে আর ঝলমল করে না, আলো নিভে যায়। ঘড়ির ডায়ালের দিকে চেয়েও তাই সময়টা বুঝতে পারল না সে। হতাশ হয়ে কিছুক্ষণ বসে মশার কামড় খেল।

হঠাৎ নীচে কোথাও দরজার হুড়কো খোলার একটা শব্দ হল। কান খাড়া করে শুনল সে। একটা কাশির মৃদু শব্দ। তারপর কুয়োতলায় জলের শব্দ। বাবা উঠল নাকি? তা হলে এখন ব্রাহ্মমুহূর্ত। ভোর চারটে।

দপ করে আলো জ্বলে উঠল ঘরে। কারেন্ট এল।

খুব বেশি কিছু গোছানোর নেই তার। সম্বল একটা অ্যাটাচি কেস মাত্র। বাড়তি জামা-প্যান্ট অবধি নেই। বাবার দুটো পুরনো ধুতি চেয়ে নিয়ে তাই লুঙ্গির মতো করে পরতে হয় ঘুরিয়েফিরিয়ে। এসবে আর কোনও অসুবিধে হয় না তার। সম্মানে লাগে না। এক সময়ে লাগত। এক সময়ে সে দিনে দুবারও দাড়ি কামিয়েছে। এক সময়ে সে যা ছিল ভাবলে আজকের সে খুব অবাক হয়।

নীচে নামতেই মুখোমুখি বাবা। বাবার হাতে টর্চ।

কোথায় যাচ্ছিস?

কলকাতা।

কলকাতা! তা এত ভোরে কেন?

যাই। সকালে যে গাড়ি পাব তাতেই যাব।

এখানে এত ভোরে বাস পাবি কোথায়!

পাব না?

সাড়ে ছটা-সাতটার আগে বাস-টাস পাওয়া যায় না। খামোখা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

যেন ভারী সমস্যায় পড়ল অমল এমন উদ্বেগের গলায় বলল, তা হলে?

সকাল সকাল যাওয়ার দরকার নাকি? তা হলে কাল যেতে পারতিস।

অমল অনেক ভেবে বলল, না, সকাল সকাল যাওয়ার দরকার নেই তো! ভাবলাম বেরিয়ে পড়ি, তাই বেরিয়ে পড়েছি।

বরং ঘরে এসে বোস। আর ঘণ্টা দেড়েক পরে বেরোলেই হবে। রাস্তাঘাট এখন অন্ধকার।

অমলের আপত্তি হল না। বাবাকে তার আজকাল ভালই লাগে। সংসারের সাতেপাঁচে নেই, নিজের মনে নিজের ঘরখানায় একাবোকা সময় কাটিয়ে দেয়। বায়নাক্কা নেই। নিজের মনেই পুজো-টুজো করে। কিন্তু বাড়াবাড়ি নেই। সোহাগ তার দাদুকে খুব পছন্দ করে। বলে, এ ম্যান অফ উইজডম। সোহাগ খুব কম লোককেই পছন্দ করে। দুনিয়ার বেশির ভাগ লোককেই সে সহ্য করতে পারে না।

বাবার ঘরটার মধ্যে যেমন ওম তেমনি একটা বেশ প্রাচীনতার গন্ধ। গন্ধটা কী দিয়ে তৈরি তা সে বলতে পারবে না। আসবাব বা জিনিসপত্রের কোনও বাহুল্য নেই। শুধু একখানা চৌকি, একখানা আলনা, দুটো কেঠো চেয়ার, একধারে কুলুঙ্গিতে ঠাকুরের আসন। হ্যারিকেনটা উসকে দেওয়ায় ঘরের দৈন্যদশা প্রকট হল।

বোস।

অমল চেয়ারে বসল।

বউমার সঙ্গে কি বনিবনা হচ্ছে না তোর?

হ্যাঁ।

কী নিয়ে গণ্ডগোল?

কিছু নিয়ে নয়। সব নিয়েই।

বড় বউমার কাছে শুনলাম ডিভোর্সের মামলা করবে। সত্যি নাকি?

হুঁ। সেই রকমই তো কথা।

তুই কি বউমার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছিলি?

ঝগড়া! না, ঝগড়া করিনি তো!

তা হলে চলে এসেছিলি কেন?

ভাল লাগছিল না। ওদের কাছে থাকলে আমার কেবল ভয়-ভয় করে।

ভয় করে?

হ্যাঁ।

ভয় তো করেই লোকের। আমারও তো ভয় হত।

আপনার ভয় হত বাবা?

হত না? তোর মাকে ভয় পেতাম, ছেলেমেয়েদের ভয় পেতাম। সব থেকে বেশি ভয় পেতাম তোকে।

আমাকে! বলে ভারী অবাক হয়ে বাবার দিকে চেয়ে থাকে অমল।

তোকে সবচেয়ে বেশি। পরীক্ষায় ভাল ফল-টল করলি। সে এত ভাল যে এ-বংশের কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তার পর তোর নিজের মতামত হল। লোককে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শিখলি। তখন তোকে এত ভয় হত যে কথাটথা বিশেষ কইতে পারতাম না। মানুষ যখন গৌরব করার মতো কিছু করে তখন তার অহংও বেসামাল হয়ে ওঠে কিনা। একটা জীবন আমারও তো কত ভয়ভীতি নিয়ে কাটল।

ভাবী অবাক হয়ে অমল তার বাবার দিকে চেয়ে রইল। তাই তো! বাবা তো মিথ্যে কথা বলছে না। যখন স্কুলে সে ঝুড়ি ঝুড়ি নম্বর পাচ্ছে, যখন মাস্টারমশাইরা তার মেধায় বিস্মিত এবং আপ্লুত তখন তার চারদিকে একটা ভয়, শ্রদ্ধা, সংশয় ও বিস্ময়ের বলয় কি রচিত হয়নি? ঘনিষ্ঠ তুইতোকারির বন্ধুরা পর্যন্ত যেন একটু সন্তর্পণে দূরে সরে যেতে লাগল। তাদের সাধারণ বোধবুদ্ধির জগতে হঠাৎ এক অতি-মগজ আবির্ভূত হওয়ায় তারা কিছুটা হতচকিত। এই তফাতটা সে তার বাড়িতেও টের পেতে শুরু করে। তার ভাইবোনদের ব্যবহারে, মায়ের পক্ষপাতিত্বে তার মেধাব পূজা কি তখনই সে টের পায়নি? বাবার সঙ্গেও তখন থেকেই তার দূরত্ব শুরু হয়। সত্যি কথা বাবার বোধবুদ্ধি, পরামর্শ বা উপদেশকে তখন থেকেই সে তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং অগ্রাহ্য করতে শুরু করে। তার বাবা যে ইংরিজিতে এম এ পাস সেটাও বোধহয় সে গুরুত্ব দেয়নি।

হ্যাঁ, এসবই সত্য। কোনও ভুল নেই।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবার দিকে চেয়ে বলল, আজ আমার পতন কি কোনও কর্মফল বাবা?

পতন! পতনের কথা বলছিস কেন?

আমার পতন আপনি দেখতে পান না?

মহিম অবাক হয়ে বলে, পতন আবার কীসের? চাকরি যায়নি তো!

না।

ডিভোর্সের কথা ভেবে বলছিস? সেটা তো আর একতরফা কারও দোষ নয়।

সেটাও বলছি না। আমার মাথাটাই যে ঠিক নেই। কী সব আবোল তাবোল ভাবি, বলি, আমার সব বোধবুদ্ধি যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কর্মফল কিনা বুঝতে পারছি না।

তোর চেয়ে অনেক বেশি অকাজ করেও কত লোক দাবড়ে বেড়াচ্ছে। তুই আর এমন কী করেছিস? আজকাল মা-বাপকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে আর কজন? ওসব নিয়ে ভাবার কিছু হয়নি। বউমার কথা বল। সে কী চাইছে?

ঠোঁট উলটে অমল বলে, কী জানি। একদিন এসেছিল। গটমট করে অনেক কথা বলে গেল। সবটা বুঝতে পারলাম না।

মহিম মশারি চালি করে তুলে ফেলে বিছানায় বসে ছেলের দিকে চেয়ে বলল, বুড়ো বয়সের এই একটাই কষ্ট। ছেলেপুলেরা কষ্ট পেলে স্বস্তি থাকে না।

আপনার বয়স কত হল বাবা?

আশি।

অনেক বয়স, না?

হ্যাঁ। অনেক বয়স। সামর্থ্য থাকলে বয়সটা সমস্যা নয়। কিন্তু অপটু হয়ে পড়লে বয়স হল ভেজা কম্বল।

আপনার বয়সে আমি কোনওদিন পৌঁছব না। তার অনেক আগেই আমি যেন বুড়ো থুথুরে হয়ে গেছি।

তোর মনে শান্তি নেই বলে ওরকম মনে হচ্ছে।

শান্তি নেই কেন, সেটাই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি। কী হল আমায় একটু বলুন তো!

মাথা নেড়ে মহিম বলে, সত্যি কথা বললে বলতে হয়, আমি জানি না। তোর জীবনটা তো অন্যরকম। অনেক বেশি জটিল, ঘটনাবহুল। তার ওপর শিক্ষাদীক্ষা, কালচারাল মিক্স-আপ, সেসব আমি কি আর বুঝতে পারব? তবে জানি, তোর ভিতরে অনেক গাদ জমে আছে। নিজের জোরে ঝাঁকি মেরে উঠে দাঁড়াতে পারছিস না। তাই তোর কষ্ট আড়াল থেকে দেখি। কিছু বলতে ভরসা পাই না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অমল বলে, আমার জন্য কারও কিছু করার নেই।

শুধু একটা কথা বলার আছে। ভেবে দেখতে পারিস।

কী কথা?

ডিভোর্স জিনিসটা ভাল নয়।

হুঁ।

অনেকক্ষণ বসে রইল অমল। বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ল ঘাড় কাত করে।

মহিম করুণ চোখে দৃশ্যটা দেখে ফুলের সাজিটা নিয়ে উঠে গেল বাগানে। অনেক সময়েই তার মনে হয় কূপমণ্ডুক হয়ে এই গাঁয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া ঠিক হল না। দুনিয়াটাকে আরও একটু জানার আর বুঝবার দরকার ছিল। মানুষের যে কত রকমের জ্বালাপোড়া আছে তার খতেন নিতে পারলে আজ এই অচিন ছেলের জন্য একটা নিদান দেওয়ার মতো বোধবুদ্ধি গজাত।

ফুল তুলে ঘরে এসে মহিম দেখল, চেয়ার ফাঁকা। অমল চলে গেছে।

না, ছেলেটার জন্য তার কিছু করার নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় তার শরীর থেকে জন্মালে কী হয়, এই ছেলে যেন কোন আজব দেশের আজগুবি বাস্তবতার মানুষ, নিজের ছেলে বলে চেনা যায় না যায় না। ভারা যায় না। ভাবটা, ভাষাটা অবধি বুঝে উঠতে পারে না মহিম।

অন্ধকার কাটেনি এখনও, তবে আবছায়া একটু ঘোলাটে আলো ক্ষীণ আভায় চারদিকের অন্ধকারকে একটু হালকা করেছে মাত্র। তবে কুয়াশা আছে। চারদিকের গাছপালা থেকে টুপটাপ শব্দে ঝরে পড়ছে হিম।

চণ্ডীমণ্ডপ ঘেঁষে এই রাস্তাটা দিয়েই সবাই বাসস্ট্যান্ডে যায়। পথটা একসময়ে খুব জঙ্গুলে ছিল। বর্ষাকালে জলকাদায় হাঁটাই যেত না। সাপ-খোপ, জোঁক বেরোত যখন-তখন। চণ্ডীমণ্ডপটা ভেঙে পড়েছিল প্রায়। পঞ্চায়েত হওয়ার পর রাস্তা বাঁধানো হয়েছে, চণ্ডীমণ্ডপ তৈরি হয়েছে নতুন করে। খুব আনমনে হলেও গাঁয়ের এইসব উন্নতি লক্ষ করে অমল। তাতে ভাল হয়েছে, না মন্দ, তা অমল বলতে পারবে না।

হঠাৎ খুব কাছ থেকে একটা বাজখাই গলার আওয়াজে চমকে উঠল অমল। বুকটা ধড়াস-ধড়াস।

আরে! বড়ভাই নাকি? কই চললেন মশয়?

এই কাকভোরের কুয়াশায় আলো বিশেষ ফোটেনি বটে, কিন্তু লোক চেনা যায়। রসিক বাঙালের গায়ে প্রিন্স কোট, মাথায় কান অবধি ঢাকা রাশিয়ান টুপি, গলায় মাফলার।

অমল কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, কলকাতা যাচ্ছি।

আহেন, আহেন। লন, একলগেই যাই।

রসিক বাঙালকে তার কিছু খারাপ লাগে না। লোকটার মনের মধ্যে কোনও ঘুরঘুট্টি নেই, গোলোকধাঁধা নেই। লোকটা পয়সা রোজগার করতে ভালবাসে, খরচ করতে ভালবাসে, খেতে আর খাওয়াতে ভালবাসে। অমল একজন বউ নিয়েই হিমসিম খাচ্ছে, আর এই লোকটা দু-দুটো দুরকমের বউ সামাল দিয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে। সে শুনেছে রসিকের একটা বউ বাঙাল, শহুরে এবং খাণ্ডার। অন্য বউটা ঘটি, পেঁয়ো এবং ভিতু। কী করে সামলায় কে জানে। হয়তো এও একটা প্রতিভা কিংবা এ একরকমের মস্তিষ্কহীনতা। সেটা যাই হোক, অমলের তা নেই।

দাড়িদুড়ি ফ্যালান নাই ক্যান মশয়? শোকাতাপা মাইনষের লাহান লাগে!

নিজের গালের খড়খড়ে দাড়িতে একটু হাত বুলিয়ে নিয়ে অমল বলল, ইচ্ছে হয়নি। আজকাল খেয়ালই থাকে না।

গালখান চকচকা থাকলে মাইনষে খাতির করে, বোঝলেন?

সেটা বোঝে অমল। ফিটফাট থাকার যে দাম আছে সেটা তার মতো আর কে জানে। তবে কিনা, সে সেই যুগ পার হয়ে এসেছে।

সে মৃদু স্বরে বলল, হুঁ।

শীত লাগে না আপনের বড়ভাই?

অমল মাথা নেড়ে বলল, লাগে। শীতটা খুব পড়েছে এবার।

আমার ব্যাগে একখানা আলোয়ান আছে, দিমু আপনেরে?

লজ্জা পেয়ে অমল বলে, আরে না, তার দরকার নেই।

ঘিন্না পাইলেন নাকি বড়ভাই? বোয়াকাচা আলোয়ান, গন্ধ-গুন্ধ পাইবেন না।

অমল বাঙালের দিকে চেয়ে বলল, আপনি বড় ভাল লোক তো!

কী যে কন বড়ভাই! এই কাল ঠান্ডাটার মইধ্যে আপনের গায়ে তো দ্যাখত্যাছি একখান স্যান্ডো গেঞ্জির মতো সোয়েটার। অসুখ-বিসুখ কইরা ফালাইব। নামডাকের মানুষ আপনে, আপনের লগে লগে যে হাটতাছি, কথা কইত্যাছি হেইবে কি কম কথা নাকি?

বসিক দাঁড়িয়ে তার ব্যাগের চেন খুলে আলোয়ানটা বের করল।

বেশ নরম, মোলায়েম নস্যি রঙের ওম-ওলা চাদরখানা গায়ে জড়াতেই ভারী আরাম বোধ করল অমল। বলল, বাঃ, বেশ আলোয়ানটি তো!

আইজ্ঞা, পাঞ্জাবের জিনিস। আলোয়ানটা পরম স্নেহে অমলের গায়ে ঠিকঠাকমতো জড়িয়ে দিতে দিতে রসিক বলল।

রসিককে ধন্যবাদ দেওয়ার কোনও মানেই হয় না, ওসব রসিক বাঙাল বুঝবেও না। কিন্তু অমল ভারী কুণ্ঠিত এবং কৃতজ্ঞ বোধ করছিল। এ লোকটার জন্য কখনও সে কিছু করেনি, কখনও করবেও না হয়তো। কিন্তু আজ তার ভারী ইচ্ছে করছে কিছু প্রতিদান দিতে। সেটা কীভাবে দেওয়া সম্ভব তা অবশ্য মাথায় এল না তার। কিন্তু কুণ্ঠাটা রয়ে গেল।

আলোয়ানখান লইয়া যান বড়ভাই। আপনেরে দিলাম। একরকম নৃতনই কইতে পারেন। গায়ে দিলে মাঝেমইধ্যে আমাগো কথা মনে পড়ব।

না না, আমার আলোয়নের দরকার নেই। আপনি জোর করে গায়ে দেওয়ালেন বলে দিলাম।

জানি বড়ভাই, আপনের মেলা আছে।

শাল আলোয়ান তো আমার লাগে না।

আইচ্ছা মশয়, কইলকাতায় গিয়া ফিরত দিলেই হইবে। অখন লন একটু গরম চা খাই দুইজনে। বাস আইতে মেলা দেরি।

আলোয়ান গায়ে দিয়ে এখন আরামের চেয়ে অস্বস্তিই বেশি হচ্ছে অমলের। রসিক তাকে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড আলোয়ান দান করতে চাইল কেন? সে কি ওর এতটাই করুণার পাত্র? আচ্ছা বেয়াদব তো লোকটা! মন থেকে কৃতজ্ঞতা আর কুণ্ঠার ভাবটা তো উড়ে গেলই, বরং কান গরম হয়ে উঠছিল অপমানে।

আজকাল নিজের বোধ, বুদ্ধি, আবেগের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই অমলের। অপমানের বোধটা তীব্র ঝিঝি পোকার মতো আওয়াজ করছিল মাথার মধ্যে। সে অসুস্থ হয়ে পড়বে নাকি?

বাসস্ট্যান্ডে চায়ের দোকান কম করেও চার-পাঁচটা। ভোরবেলার যাত্রীরা এই শীতকালে চা খায় বলে সকালেই দোকানে উনুন ধরানো হয়েছে। খদ্দেরও আছে মন্দ নয়।

আহেন মশয়, শীতলের দোকানে বহি। হ্যায় চা-টা খুব ভাল কইরা বানায়।

শীতলের দোকানের বেঞ্চে বসে পড়ল অমল। তার এখন গরম লাগছে। তার এখন ভাল লাগছে না। বসেই চাদরটা খুলে ফেলে পাশে জড়ো করে রাখল সে। রসিক লক্ষ করল না। সে তখন শীতলকে বোঝাচ্ছে, আমার লগে কেডা বইয়া আছে জাননি শীতল? মস্ত মাপের মানুষ। গ্রামের মানুষ তোমরা, এই মানুষের দাম তোমরা কী বুঝবা! অখন ভাল কইরা চা বানাইয়া খাওয়াও তো বাবুরে।

শীতল দাস একটু বিরক্ত হয়ে বলে, কার কথা কইছেন বাবু? এ যে মায়ের কাছে মাসির গপ্পো। অমলকে আমি এত্তটুকুন বেলা থেকে চিনি। ওদের বাড়ির চেলাকাঠ ফেড়ে দিতুম, মহিমকর্তার সঙ্গে মাছ ধরতে বড় ঝিলে গেছি কতবার। অমল তখন কতটুকু? ব্যাঙাচির লেজ খসল এই তো সেদিন! পাস-টাস করে জলপানি পেয়েছিল, বিলেত গেল, এই তো সেদিনের কথা সব। বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়েছিলুম।

বাঙালরা না চেঁচিয়ে কথা কইতে পারে না, তাদের হাসি মানেই অট্টহাসি। রসিকের গলা যেমন বাজখাঁই, হাসিও তেমন বিকট। সেই হাসিটা হেসে রসিক বলল, খুব চিনছ হে শীতল! আমি কই, বাবুরে ল্যাংটাবেলা

থিক্যা তো দেইখ্যা আইতাছ, কিন্তু মানুষটার দাম জাননি? কত বড় বহরের মানুষ হেইটা নি ট্যার পাইছ কোনওদিন? যাউকগা, কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। চা-খান একটু প্রেমসে বানাও দেখি।

দুজনের এই ছেলেমানুষি চাপান-উতর শুনতে শুনতে অমলের চিনচিনে অপমানবোধটা উবে গেল। খানিকটা হেঁটে এসেছে বলে শরীরটা গরম হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন খোলামেলা রাস্তার পাশে বসতেই উত্তুরে হাওয়ায় কেঁপে উঠছিল অমল। না, বাঙাল তাকে অপমান করতে চায়নি বোধহয়। আসলে লোকটার আদরের প্রকাশ ওরকমই। কাণ্ডজ্ঞান কম হলেও রসিক লোকটা তেমন খারাপ নয়। এই তো সেদিন তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে কত যত্ন করল।

আলোয়ানটা ফের গায়ে জড়িয়ে নিল অমল। তার তেমন অপমান লাগছে না আর।

রসিক তার পাশে বসে বলল, বড়ভাই, কিছু মনে কইরেন না, মুখখান শুকনা লাগে ক্যান? কিছু হইছে নাকি?

না, কিছু হয়নি। এমনিই মনটা ভাল নেই।

গ্রামের মাইনষে নানান আকথা-কুকথা কয়।

একটু অবাক হয়ে অমল বলে, কী বলে তারা?

কয় যে আপনের লগে নাকি ওয়াইফের বনে না। মামলা মোকদ্দমার কথাও শুনি! নাকি?

অমল ম্লান একটু হেসে বলে, হ্যাঁ।

মাইয়ালোক লইয়া সমস্যা কার নাই মশয়? যত ঝুট-ঝঞ্ঝাট তো তারাই পাকাইয়া তোলে। তবে কিনা মাইয়ালোক বশ মানলে এক্কেবারে গঙ্গাজল। তারাই তখন বৃষ্টির দিনের ছাতা, শীতের বালাপোশ, গরমের শীতলপাটি। বোঝলেন?

বুঝলাম। তবে আমি তো ওসব পেরে উঠিনি।

ঝঞ্ঝাট কি আমারও কিছু কম গেছে মশয়? মাইরধইরও খাইছি, কিন্তু ডিভোর্স করি নাই। বিয়া করা বউ, তারে ছাড়ুম ক্যান কন? জজসাহেব রায় দিলেই হইব? তা হইলে তো বিষয়সম্পত্তি ছাইড়্যা ল্যাংটা- চ্যাংটা হইয়া বিবাগী হইয়া যাইতে হয়। বউও আমার সম্পত্তি, পাজি হউক ব্যাচাইল্যা হউক, তারে ছাড়ুম ক্যান?

জোর করে কি রাখা যায়?

আরে মশয়, কথায়ই তো আছে জোর যার মুল্লুক তার। আমি যখন বাসন্তীরে বিয়া করলাম তখন বড়বউ মেলা চিল্লামিল্লি করছিল, উকিলবাড়ি হাটাহাঁটিও শুরু করল। আমি তখন কইলাম আমি যদি আরও চাইরটা বিয়াও করি তবু তোমারে ছাড়ুম না। দেখি তুমি কেমনে যাও!

এতটা মস্তিষ্কহীন হওয়া তার পক্ষে সম্ভব কিনা তা একটু ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলল অমল। বলল, হ্যাঁ, ওভাবেও হয়তো হয়। গুহামানবদের যুগে হত।

আইজও হয় মশয়। না হইলে আমার দুই সংসার টিক্যা আছে কেমন কইরা। নেন, চা খান। লগে দুইখান মুড়মুড়া বিস্কুট খাইবেন নাকি? টোস্ট বিস্কুট খাইতে কিন্তু আচিমিৎকার।

আচিমিৎকার শব্দটা ভারী নতুন ঠেকল অমলের কানে। বলল, না, কিছু খেতে ইচ্ছে করেছে না। আপনি খান।

যারা মাথার কাম বেশি করে তাগো ক্ষুধা কম।

অমল বলল, না না, আমার তো ভীষণ খিদে পায়।

নাকি? ক্ষুধা পাওন ভাল। আমি তো রাইক্ষসের মতন খাই। বড়ভাই, একখান কথা কমু? বলুন না।

আপনের পোলাপান কয়টা?

দুটো। এক ছেলে, এক মেয়ে।

দুর মশা, আপনের মতো মাইনষের পোলাপান যত বেশি হয় ততই ভাল।

কেন?

মগজওলা মাইনষের পোলাপানও মগজওলাই হয়। দুঃখের কথা কী জানেন, আমাগো দ্যাশে ছোটলোকগুলারই পোলাপান বেশি হয়। তাতে লাভ কী কন? দ্যাশে ছোটলোকের সংখ্যা বাড়ে।

রসিকের এইসব বৈপ্লবিক কথাবার্তায় একটু হাসে অমল। তারপর মৃদুস্বরে বলে, আমার মগজ এখন আর কাজ করে না।

চা খেয়ে তারা উঠল। বাস আসছে।

ভারী যত্ন করে তাকে হাত ধরে বাসে তুলল রসিক। সকালের বাস বলে এতটা ফাঁকা। তাকে টিকিটটা অবধি কাটতে দিল না রসিক। বলল, আরে মশয়, টিকিটের দাম আর কয়টা পয়সা, হয়লেই দিতে পারে। মাইনষের দাম দেই ক্যামনে?

অমল জোরাজোরি করল না। সেটা পণ্ডশ্রম হবে।

বউয়ের লিগগ্যা কী লইয়া যাইবেন মশয়?

অবাক হয়ে অমল বলে, কিছু নেব না তো!

ওইটাই তো ভুল করেন বড়ভাই।

তাই নাকি? কেন বলুন তো!

মাইয়ালোকে জিনিসপত্র পাইতে ভালবাসে। তাগো কাছে খালি হাতে যাইতে নাই। যা হউক একটু কিছু লইয়া যাইতে হয়।

অমল অবাক হয়ে বলে, ওর জিনিসপত্র সব তো ও-ই কেনে, এমনকী আমার জিনিসপত্রও কেনে। আমি কেনাকাটা পারি না।

রসিক হেসে বলে, আপনেরে লইয়া আর পারুম না মশয়। আমার বউও তো গড়িয়াহাট থিক্যা বড় বাজার ইস্তক টানা মাইরা হাবিজাবি কিন্যা ঘরবাড়ি ছিটাল করতাছে। তবু মশয় আমি তার লিগ্যা কিছু না কিন্যা ঘরে ঢুকি না। যেদিন আর কিছু না পারি এক ঠোঙ্গা চিনাবাদাম কিন্যা লইয়া যাই। খুশি হয়, বোঝলেন! খুশি হয়। জিনিসটা বড় কথা না, আসল হইল অ্যাটেনশন। তারে যে ভুইল্যা যাই না এইটা হইল তার প্রমাণ।

তাই বুঝি?

হ বড়ভাই। পিরিতের সার কথাই হইল লেনদেন। যত লেনদেন তত আঠা। লেনদেন ছাড়া পিরিত হইল বন্ধ্যা। বোঝলেন! যতই মিঠা মিঠা কথা কন না ক্যান, শুকনা লাগব। লগে একখান গোলাপফুল গুইজা দেন, দ্যাখবেন মুখে হাসি ফুটছে।

স্ত্রীর জন্য উপহার কেনা এই ব্যাপারটিকেই অমলের মস্তিষ্কহীনতা বলে মনে হয়। ঘুষ ছাড়া সেটাকে আর কী বলা যায়? জিনিসের উপযোগই বা কতক্ষণ থাকে?

বউ কি কম নাকি বড়ভাই? সাক্ষাৎ ভগবতী। মাঝে মাঝে খাণ্ডারনি হইয়া খাড়য় ঠিকই, কিন্তু তারাই তো বাচ্চা দেয়, সংসার বাইন্ধ্যা রাখে। কী কন? কাইজ্যা করে আবার আগলাইয়াও তো রাখে।

বর্ধমানে পৌঁছে আবার তাকে লজ্জায় ফেলল রসিক। অমলের টিকিটও সেই কেটে ফেলল চট করে।

এটা বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে রসিকবাবু।

দুই-চাইরটা টাকা লইয়া মাথা ঘামাইয়েন না বড়ভাই। বড় বড় জিনিস লইয়া চিন্তা করেন। পাবলিকের কি আপনের লিগ্যা কিছু করনের নাই?

অমল ভদ্রতার লড়াই পারবে না জেনেই আর কথা বাড়াল না।

বেশি ভোরের ট্রেন বলেই ভিড় ছিল না তেমন। কোণের সিটে তাকে ঠেলে বসিয়ে দিয়ে রসিক বলল, এইবার জুইৎ কইরা বইয়া ঠাইস্যা একটা ঘুম দেন। আমিও ট্রেনে উঠলেই ঘুমাই।

কথাটা ভারী পছন্দ হল অমলের। সে খাঁজের মধ্যে মাথা রেখে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল।

হাওড়ায় যখন নামল তখন সোয়া নটা।

লন, আপনেরে একটা ট্যাক্সিতে উঠাই দিয়া যাই।

আমি ধরতে পারব ট্যাক্সি।

আপনি হগ্গলই পারবেন। কিন্তু আমারও তো করন উচিত।

বাবা যেন ছোট ছেলেটিকে আগলে নিয়ে যাচ্ছে এমনভাবেই রসিক তাকে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে নিয়ে এসে বসিয়ে দিল ট্যাক্সিতে। অমল বলল, আপনিও তো বড়বাজারেই যাবেন? চলুন নামিয়ে দিয়ে যাই।

আরে না, আমার তো হাঁটা রাস্তা। একটু মর্নিং ওয়াকও হইয়া যাইব।

অমল আর সাধাসাধি করল না। সে এসব পেরে ওঠে না।

ট্যাক্সি বাড়ির দিকে রওনা হতেই বুকে একটা দুরুদুরু শুরু হল অমলের। সামনেই কি যুদ্ধক্ষেত্র? ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব? কোন ধুন্ধুমার অপেক্ষা করছে তার জন্য? তার মুখের কথা ক্রমে ফুরিয়ে যাচ্ছে। তার মনেও আজকাল কথা আসে না। তার মন কি ধীরে ধীরে বোবা হয়ে যাবে? গেলেই ভাল। গেলেই শান্তি।

বাইরে হিজিবিজি কলকাতা শহর বয়ে যাচ্ছে। সকালের কবোষ্ণ রোদেও বাইরেটাকে বাস্তব মনে হয় না তার।

যেতে যেতে দূরত্ব কমছে। বাঘিনীর গর্জন শোনা যাচ্ছে কি নেপথ্যে? মাটিতে ল্যাজ আছড়ানোর শব্দ? গাঁয়ের গন্ধ? বাতাসে কি বারুদের ঘ্রাণ?

গড়িয়াহাটার কাছে সে চেঁচিয়ে উঠল, থামো! থামো!

তাড়াহুড়ো করে ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল সে।

সবে বেলা দশটা। দোকানপাট এখনও খোলেনি। তবু সামনে যে দোকানটা খোলা পেল তাতেই ঢুকে পড়ল সে। দোকানে এখন ধূপধুনো দেওয়া হচ্ছে। প্রস্তুত নয়। সে শো-কেসে সাজানো শাড়ি দেখতে লাগল। শাড়ির কিছুই বোঝে না সে। কেনেওনি কোনওদিন। তবু দেখতে লাগল।

একটা বাফ্ রঙের শাড়ির ওপর জমকালো এমব্রয়ডারির কাজটা বেশ পছন্দ হল তার।

এটার দাম কত?

আড়াই হাজার।

অ্যাটাচি কেস খুলে টাকাটা দিয়ে দিল সে।

বাহান্ন

শাড়ি কেনাটা একটু নাটকীয় হয়ে গেল নাকি?

তা হোক। তার জীবনে তো কোনও নাটকীয়তা নেই। নিতান্তই ভ্যাতভ্যাতে ঘটনাহীন জীবনযাপন। মদ্যপান ছাড়া নিজের লেভেলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

গড়িয়াহাটার মোড় থেকে সে জটিল কলকাতার দৃশ্য দেখল খানিক। চট করে বাড়িমুখো হতে পারল না। শাড়িটার জন্যই বাড়ি যেতে একটু লজ্জা হচ্ছে তার। কোনওদিন এভাবে কিছু উপহার দেয়নি মোনাকে। কী বলবে, কী বলতে হয় বা আনুষ্ঠানিকভাবে কী করে উপহার দিতে হয় তা তো অমল জানে না। তাই পা চলছিল না তার। মোনা কি বিদ্রুপের হাসি হাসবে? ঘুষ বলে মনে করবে? গ্রহণ করবে, নাকি ছুড়ে ফেলে দেবে আক্রোশে, এইসব জরুরি প্রশ্ন ও সমস্যায় ভারী পীড়িত হচ্ছিল সে।

রসিক বাঙালের কথাকে গুরুত্ব দেওয়াটা কি ঠিক হল?

এর পর যা-ই ঘটুক, তার তো হারানোর কিছু নেই। এই ভেবে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল, গড়িয়াহাট থেকে তার বাড়ি হাঁটাপথ। শীতের রোদে কলকাতা এখনই বেশ তেতে উঠেছে। গাঁয়ে শীত অনেক বেশি। রোদ যেন তেজালো হতেই চায় না। অমল খুব আস্তে আস্তেই হাঁটছিল। মনে মনে একটু প্রস্তুতির দরকার, একটু রিহার্সাল। কিন্তু ইদানীং তার মুখে কথাই আসতে চায় না। অনেক অন্যায় অভিযোগেরও যথাযোগ্য জবাব দিতে পারে না সে।

শোওয়ার ঘরে কন্ডোম পাওয়ার পর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মোনা। তার গূঢ় সন্দেহ, তার অনুপস্থিতিতে অমল অন্য মেয়েমানুষ এনেছিল ফ্ল্যাটে। অমল সেই অভিযোগের জবাবই দিতে পারল না। আজও রহস্যময় সেই ঘটনাটার সমাধান খুঁজে পায়নি। সমাধান খুঁজে বের করার জন্য মাথাও ঘামায়নি সে। নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করার কোনও তাগিদ সে আর অনুভব করে না। সে যা আছে তা-ই আছে, ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। এই অস্ত থেকে আর উদয় হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

একটি থান-পরা বুড়ি ভিখিরি তার সামনে এসে মুখপানে চেয়ে হঠাৎ বলল, ও তুমি! তুমি তো বাপু দাও না।

বলে বুড়ি পিছু ফিরল। গড়িয়াহাটার প্রায় সব ভিখিরিকেই মুখ চেনে অমল। তবে কস্মিনকালেও সে কাউকে ভিক্ষে দেয় না। ভিক্ষে করা ব্যাপারটাকেই যে ভীষণ অপছন্দ করে।

আজ হঠাৎ মনে হল, এ-দিনটা অন্য রকম হোক। সে ডাকল, ও বুড়ি! ও বুড়ি মা!

বুড়ি একটু অবাক হয়ে ঘুরতেই অমল পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বলল, নাও।

বুড়ি বলল, ও বাবা! দশ টাকা!

বুড়িটা একটু ঠ্যাটের মানুষ। আশীর্বাদ-টাশির্বাদ করল না। এরকম ভাল। ভড়ং নেই।

অমল একটু হাসল।

যত বাড়ির কাছাকাছি হচ্ছিল অমল তত অস্বস্তি বাড়ছে। যত নষ্টের গোড়া এই শাড়িটা। এটা না কিনলে অনেক সহজ হত ফেরাটা। কিন্তু যতই যাচ্ছে ততই যেন শাড়িটা বোঝা হয়ে উঠছে। জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকী এসব তাদের নেই। কেন কে জানে প্রথম থেকেই ওসব পালন-টালন করে না তারা। ফলে উপহারের ঝঞ্ঝাটও নেই। পুজো উপলক্ষে কিছু কেনাকাটা করা হয় বটে, কিন্তু সেটা মোনা একাই করে। কেন তারা বিবাহবার্ষিকী বা জন্মদিন পালন করে না সেটাও অমল বলতে পারবে না। কিন্তু অন্যেরা করে এবং অন্যের বিবাহবার্ষিকী বা জন্মদিনে তারা নেমন্তন্নও খেয়েছে।

এমনকী নিজের ছেলেমেয়ের জন্মদিনও পালন করে না মোনা। কথাটা এখন হঠাৎ মনে পড়ায় অমল একটু অবাক হয়। মোনা কি একজন সংস্কারমুক্ত মহিলা? তার কি কোনও সেন্টিমেন্ট নেই? এসব প্রশ্ন আগে অমলের মনে আসেনি, আজ এই শাড়ি কেনার সূত্রে এসব অনেক প্রশ্ন মনের তলায় স্থিতাবস্থা থেকে হঠাৎ ভুড়ভুড়ি কেটে উঠে আসছে। মোনাকে হয়তো আর একটু স্টাডি করা উচিত ছিল তার। কাছাকাছি বাস করেও হঠাৎ মোনাকে কেন যে এত অচেনা মনে হচ্ছে।

ফ্ল্যাটবাড়িতে পৌঁছে সে দেখল, গ্যারাজে তার গাড়িটা নিশ্চল পড়ে আছে। গায়ে ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়েছে। ড্রাইভারটাকে হয়তো ছাড়িয়ে দিয়েছে মোনা। নইলে সে এসে রোজ গাড়িটা ঝাড়পোঁছ করত।

লিফটে ওপরে উঠতে উঠতে নিজের বোকা-বোকা ভাবটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছিল অমল। তাতে আরও বোকা-বোকা লাগতে লাগল নিজেকে।

ডোরবেলের সুইচে হাত দিয়ে আবার একটু দ্বিধা।

তারপর ডোরবেলের মিষ্টি শব্দটা বেজে গেল ভিতরে। ল্যাচ ঘোরানোর শব্দ।

দরজায় মোনা। পরনে হাউসকোট, একটু অবাক চোখ।

দরজাটা ছেড়ে তাকে ভিতরে যেতে দিল মোনা। তারপর দরজাটা প্রায় নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়ে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, ওটা কার চাদর গায়ে দিয়ে এসেছ! এটা তো আমাদের চাদর নয়!

চাদরের কথাটা খেয়ালই ছিল না অমলের। মেয়েদের চোখ এড়ানো মুশকিল।

থতমত খেয়ে বলল, রসিকবাবু দিল।

রসিকবাবুটা আবার কে?

গাঁয়ের একজন লোক।

নাক কুঁচকে মোনা বলল, অন্যের চাদর গায়ে দিতে ঘেন্না হল না?

অমল কথাবার্তার এই ঝোঁকটা চালিয়ে যেতে চায়। নইলে সহজ হওয়া যাবে না। মোনার সঙ্গে একমত হয়ে বলল, ঘেন্না করছিল, উনি জোর করে দিলেন।

ওটা খুলে রাখো, কেচে ফেরত দিয়ে দিতে হবে।

অমল সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য ছেলের মতো চাদরটা খুলে ফেলল।

শাড়ির বাক্সটা দেখে মোনা অবাক হয়ে বলল, ওটা কী?

অমল খুব কাঁচুমাচু হয়ে বলল, তোমার জন্য।

আমার জন্য!

হ্যাঁ।

আমার জন্য কী?

তোমার জন্য আনলাম।

মোনা কিছুক্ষণ বড় বড় চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, কী ওটা?

একটা শাড়ি।

হঠাৎ?

এমনি পছন্দ হয়ে গেল। তাই।

ডিভানের ওপর থেকে বাক্সটা তুলে নিল মোনা। বাঁধন খুলে বাক্সর ঢাকনা তুলে দেখল প্রথমে। তারপর শাড়িটা বের করে আলোয় একটু খুলে দেখে নিয়ে তার দিকে তাকাল।

অমল জানে, শাড়িটা ওর পছন্দ হবে না। সে তো আর শাড়ি চেনে না। চোখে যেটা লেগেছে সেটাই কিনে এনেছে। মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের খবর সে আর রাখল কই?

কিন্তু তাকে ভীষণ অবাক করে দিয়ে মোনা শাড়িটা নিরীক্ষণের পর বলল, বাঃ, বেশ পছন্দ আছে তো তোমার!

খারাপ হয়নি তো!

নাঃ, খুব আনইউজুয়াল রং। কাজটাও ভারী সুন্দর। কে পছন্দ করে দিল?

কেউ না।

তুমি নিজেই পছন্দ করলে?

হ্যাঁ।

হঠাৎ আমার জন্য শাড়ি কেনার কী হল?

এমনি। মনে হল, তোমাকে তো কখনও কিছু দিই না।

সেটাই তো আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। হঠাৎ ঘটা করে শাড়ি-টাড়ি দিলে কেমন যেন সন্দেহ হয়। সন্দেহ! সন্দেহ কীসের মোনা?

অতি-ভক্তি চোরের লক্ষণ কিনা।

চোরা মারটা হজম করে নিল অমল। দুজন মুষ্টিযোদ্ধা যখন লড়ে তখন তারা পরস্পরকে মারে এবং পরস্পরের মার হজমও করে। দুটোই দরকার। শুধু মারতে জানলেই হয় না, অম্লান মুখে মার হজমও করতে পারা চাই।

আমি কিছু ভেবে কিনিনি কিন্তু। হঠাৎ ইচ্ছে হল তাই।

নাকি কেউ বুদ্ধি পরামর্শ দিচ্ছে আজকাল!

অমল ভয় পেল। কথা যেভাবে এগোচ্ছে তাতে মোনা তাকে কোণের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এরকম চললে হয়তো সে কবুল করে ফেলবে যে, নিজের বুদ্ধিতে সে কাজটা করেনি।

আচ্ছা, একটু চা-টা কিছু কি পাওয়া যাবে? খুব ভোরে বেরিয়েছি, গাড়িতে ভীষণ ঠান্ডা লাগছিল।

মোনা তার দিকে সেকেন্ড দুয়েক চেয়ে রইল। মেয়েদের মন, শত শত্রুতা থাকলেও একটা জায়গায় দুর্বল। তারা যে পুরুষের আশ্রয়দাত্রী এটা শেষ অবধি ভুলতে পারে না।

বাইরের জামাকাপড় বদলাও। চা দিচ্ছি।

আমার খুব খিদেও পেয়েছে।

জানি। পাওয়ারই কথা। হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়ার টেবিলে বোসো।

তুমি কি বাড়িতে একা? ওরা কই?

দুজনেই স্কুলে গেছে। বাসুদেব তিন দিনের ছুটি নিয়েছে।

ওঃ, তাহলে?

তাহলে কী?

চা-টা করবে কে?

কেন, আমি কি নুলো, না অচ্ছুৎ?

কষ্ট হবে।

বাব্বাঃ, আমার কষ্টের কথা ভেবে তেরাত্তির ঘুম হবে না বোধহয়?

তা নয়।

একা ঘরে আমাকে আবার ভয় হচ্ছে না তো! ঘাড় মটকে দিই যদি!

অমল হাসল। বলল, তোমাকে ভয় কীসের?

তা তো জানি না। চোখমুখ দেখে তো মনে হচ্ছে বাড়িতে আর কেউ নেই জেনে খুব অস্বস্তিতে পড়েছ।

তা পড়েছে অমল। কিন্তু সেটা তার মুখভাবে প্রকাশ পাচ্ছে জেনে তার আরও দুশ্চিন্তা হচ্ছে, সে বোকার মতো বলল, না না, আমি ভীষণ টায়ার্ড।

মোনার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না অমল।

তাকে এই অস্বস্তিতে বেশিক্ষণ রাখল না মানা। হঠাৎ ঝটকা মেরে মুখ ফিরিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

অমল শোওয়ার ঘরে এসে পোশাক পালটাল। মস্ত আয়নায় তার প্রতিবিম্ব দেখতে পেল হঠাৎ। দাড়ি-গোঁফ এবং বড় চুলে তাকে বনমানুষের মতো দেখাচ্ছে। তবু ভাল। তার চেহারায় এমনিতে কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। তার উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুটের চেয়েও একটু কম। হিল পরে পাশে হাঁটলে মোনাকেও তার চেয়ে লম্বা লাগে। তার গায়ের রং ময়লা না হলেও ফর্সা নয়। মুখশ্রী নয় আকর্ষক। বন্য পুরুষালি আকর্ষণ তার একটুও নেই। দাড়ি-গোঁফ হওয়ায় বরং একটু কৃত্রিম বন্যতা এসেছে। দাড়ি-গোঁফের একটা আরোপিত গাম্ভীর্যও আছে।

কিছুক্ষণ নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে রইল অমল। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল সে। কে যেন বলে উঠল, উই আর ইন ট্রাবল। উই আর ইন এ জ্যাম।

কে বলল কথাটা? ঘরে দ্বিতীয় কেউ তো নেই! তাহলে কি সে নিজে?

হ্যাঁ, কথাটা বোধহয় সেই বলেছে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে অমল। কী আর করা।

একা এই ফ্ল্যাটে সে আর মোনা। যেন বাঘিনী আর তার শিকার। ছেলে-মেয়েরা থাকলে হয়তো কিছু ডাইভারশন থাকত। তারা নেই, ফলে একা অমলের ওপরেই মোনা তার শব্দভেদী বাণগুলো প্রয়োগ করবে। বড্ড ভয়-ভয় করছে তার। একসময়ে যৌবনে মোনার সঙ্গে তার মাঝে মাঝেই তর্ক বা ঝগড়া হয়েছে। তখন মোনাকে তার ভয় হত না। এখন হয়। এখন সে মানসিকভাবে দুর্বল, শারীরিকভাবেও। তার ভিতরে কোনও

লড়াই আর অবশিষ্ট নেই। মোনা দয়া করে যদি তাকে বাক্যবাণ থেকে রেহাই দেয়। এই দয়াটুকু সে হাঁটু গেড়ে বসে চাইবে কি?

বাথরুমে হাতমুখ ধুতে গিয়েছিল অমল। কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগল, স্নান করে নেবে কিনা। সিদ্ধান্ত নিতে বেশ সময় লাগে তার আজকাল। খুব সামান্য বিষয় নিয়েও তার মন দুভাগ হয়ে দুরকম মত প্রকাশ করতে থাকে।

বাথরুমের দরজায় একটু শব্দ।

কে?

তোমার হল? কফি ঠান্ডা হয়ে যাবে যে!

ও আচ্ছা।

সে শাওয়ারটা খুলে নীচে দাঁড়িয়ে গেল। বোধহয় আরও কিছু শীতলতাই তার দরকার।

স্নান করে একরকম ভালই লাগছিল তার। শরীরে একটু কাঁপুনি হচ্ছে বটে, কিন্তু বেশ লাগছে।

বেরিয়ে এসে দেখল, খাওয়ার টেবিলে মোনা কফি সাজিয়ে বসে আছে।

পরোটা আর আলুভাজা খাবে?

অমল হ্যাঁ বলবে কিনা ভাবতে লাগল।

আমি বলি এত বেলায় ভারী জলখাবারের দরকার নেই। বরং একবারে ভাত খেও। এখন বিস্কুট দিয়ে কফি খাও। কেমন?

এই আশ্চর্য সদ্ব্যবহারে বিগলিত হয়ে গেল অমল, বলল, সেই ভাল।

তুমি কি স্নান করলে?

শীতে কাঁপছ। তোমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। গিজারে গরম জল তো ছিল, নাওনি?

না। খেয়াল হয়নি।

আজকাল তোমার মন কোথায় থাকে?

কফি একটু চলকে গেল অমলের। নরখাদকদের দুন্দুভি বেজে উঠল নাকি? ঝলসাবে, তারপর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, হাড়গোড় চিবোবে।

দুপুরে কী খাবে?

নতমুখে অমল বলল, যা হয়।

আমি রাঁধতে যাচ্ছি। বাসুদেব চলে যাওয়ায় বাজারহাট হচ্ছে না। ডিপ ফ্রিজে শুধু খানিকটা মাছ আছে।

ব্যগ্র হয়ে অমল বলল, ওতেই হবে। ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই।

আমি রাঁধতেও ভুলে গেছি। তোমার মুখে রুচবে কি না জানি না।

একসময়ে তোমার রান্নাই তো খেতাম। চিন্তার কিছু নেই।

চিন্তার আছে বইকী! রান্না মনের মতো না হলে আবার হয়তো না বলেকয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

অমল নতমুখে বসে রইল।

তোমার একটা চাকরি আছে, সেটা ভুলে যাওনি তো! তারা তোমাকে মোটা মাইনে দেয়। সেখানে তোমার বেশ দায়িত্বের কাজ আছে বলেই শুনেছি। তোমার কি ধারণা তারা এরপর থেকে তোমাকে মুখ দেখে মাইনে

দেবে?

অমল একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কথাটা মিথ্যে নয়। তার কোম্পানি তাকে বিরাট অঙ্কের মাইনে দেয়। কিন্তু চাকরি করার জন্য একটা মোটিভেশন দরকার। সেটা কোথায় যে উবে গেছে কে জানে। তার কেবলই মনে হয় তার আর কিছু দেওয়ার নেই। তার বিদ্যা, তার বুদ্ধি, তার উর্বর মস্তিষ্ক কিছুই আর কাজ করে না।

দয়া করে অফিসে একটা ফোন করো। এই ভদ্রতাটুকু তারা আশা করতেই পারে। পরশুদিন তোমাদের এম ডি ফোন করে তোমার হোয়ারঅ্যাবাউটস জানতে চেয়েছিলেন। আমাকে এক গাদা মিথ্যে কথা বলতে হল।

কী বললে?

বললাম ওঁর বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দেশের বাড়িতে গেছেন। সেই সঙ্গে এও বলতে হল যে, আমরাও গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং সেখানে ফোন নেই। ইত্যাদি। ভদ্রলোক বলেছেন, ফিরে এসে তুমি যেন ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করো।

ঠিক আছে।

তোমার ভাল-মন্দ তুমি বুঝবে। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার এখন বয়স হচ্ছে। নিত্যনতুন চাকরি করা তোমার পক্ষে কি ভাল হবে? এরা যদি তোমাকে ছাড়িয়ে দেয় তা হলে কী করবে তুমি? আর একটা নতুন চাকরি তো? সেটা যদি কলকাতায় না হয়ে দিল্লি, বোম্বে বা ব্যাঙ্গালোরে হয় তা হলে আবার এখানকার বাস তুলে আমাদের অন্য জায়গায় গিয়ে সেটল করতে হবে।

এই প্রথম অমল মোনার চোখের দিকে সরাসরি চাইল। চেয়ে রইল। কী বলছে মোনা? তার শেষ বাক্যটায় "আমাদের" শব্দটা ছিল না? তার মানে কি ডিভোর্সের কথা ভুলে গেছে মোনা? সিদ্ধান্ত বদল করেছে? বুকটা ধুকপুক করছিল তার।

অমল আলটপকা বলে উঠল, আচ্ছা আমরা, মানে আমাদের এই পরিবারে কখনও জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকী করিনি, না?

ভীষণ অবাক হয়ে মোনা তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, হঠাৎ এ কথা কেন?

এমনি, মনে হচ্ছিল।

না, ওসব ফর্মাল ব্যাপার আমার ভাল লাগে না। পার্টি-টার্টি আমার কোনওদিনই পছন্দ নয়। তুমিও তো কখনও বলোনি ওসব করতে।

না না, এটা আমার কোনও অভিযোগ নয়। জাস্ট কৌতূহল। অনেকেই ওসব সেলিব্রেট করে কি না তাই।

ভ্রু কুঁচকে মোনা বলল, সেলিব্রেশনের কী আছে বুঝি না বাবা। একটা বিশেষ তারিখে জন্মানো বা বিশেষ দিনে বিয়ে করা কী এমন একটা আহামরি ব্যাপার যে বছর বছর সেটার জন্য আহ্লাদ করতে হবে!

তা তো ঠিকই।

তোমার কি এখন জন্মদিন বা ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি করতে ইচ্ছে হয়েছে নাকি?

আরে না। ফরগেট ইট।

হঠাৎ এমন এক একটা প্রশ্ন করো যে চিন্তায় ফেলে দাও। তোমার হল কী বলো তো!

কিছু হয়নি।

কেউ নতুন কোনও ফর্মুলা দেয়নি তো!

কীসের ফর্মুলা?

গৃহশান্তির!

না, কেউ এ ব্যাপারে কিছু বলেনি আমাকে।

একবার তো শুনেছিলাম আমার জা তোমাকে একটা ফর্মুলা শিখিয়েছিল।

কী বলো তো!

তোমাকে শেখায়নি বউয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুলে ভাব হয়?

অমল সামান্য লজ্জা পেয়ে বল, ওঃ হ্যাঁ, বউদি গাঁয়ের মেয়ে, তার সেকেলে সব ধারণা।

তাই ভাবছিলাম এই নতুন ফর্মুলাটা আবার কেউ শেখাল কি না।

ফর্মুলা নয়। আজ হঠাৎ তোমার জন্য শাড়িটা কেনার পর মনে হচ্ছিল তোমাকে কোনও অকেশনে কিছু কখনও দিইনি। তখনই ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি আর বার্থ ডে-র কথা মনে হল।

তুমি আমাকে আজ খুব অবাক করে দিয়েছ। তোমার হঠাৎ শাড়ি নিয়ে ঘরে ঢোকার দৃশ্যটা আমার অনেক দিন মনে থাকবে।

অমল কফিটা শেষ করে বলল, শাড়িটা কি পছন্দ হয়নি?

সেটা পরের কথা! শাড়ি নিয়ে আসাটাই তো অভিনব ব্যাপার। কত দাম নিল?

আড়াই হাজার।

গড়িয়াহাটার এই দোকানটা দাম একটু বেশিই নেয়।

তা নিক। এটাই তো প্রথম।

হ্যাঁ। তবে তোমার ভয় নেই। শাড়িটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

অমল একটু তৃপ্তির হাসি হাসল।

খুশি হয়েছ?

মোনা হঠাৎ করুণ একটু হেসে বলল, খুশিই তো হওয়ার কথা।

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ।

তারপর মোনা বলল, ভাবছি শাড়িটার বদলে তোমাকে এখন আমি কী দিই!

অমল ব্যস্ত হয়ে বলে, আরে না, আমাকে আবার তুমি কি দেবে?

মোনা একটু হেসে বলল, আমি তো আর রোজগার করি না যে নিজের পয়সায় তোমাকে কিছু কিনে দেব। যা দেব তা তো তোমার পয়সাতেই কেনা। সে দেওয়ার কথা তো বলিনি।

তা হলে?

তা ছাড়াও কি কিছু দেওয়ার নেই?

অমল একটু ধন্দে পড়ে বলে, কিছু দিও না মোনা, প্লিজ। শোধবোধ হয়ে গেলে কি দেওয়ার আনন্দ থাকে?

একটা রহস্যময় হাসি হেসে মোনা বলল, থাকতেও পারে।

এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটে গেল যে প্রস্তুত হওয়ার সময়ই পেল না অমল। চেয়ার থেকে উঠে হঠাৎ একটা ঝলকের মতো তার ওপর এসে পড়ল মোনা। দুটো হাতে গলা জড়িয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল। ওই

আলিঙ্গনের ধাক্কায় ডাইনিং টেবিলের পলকা চেয়ার উলটে পড়েই যেত অমল। মোনাই পড়তে দিল না তাকে। ধরে রইল।

পরের পনেরো মিনিট তারা কোনও মনুষ্য ভাষায় কথা কইল না। দুজনের মুখ দিয়ে শুধু অদ্ভুত জান্তব সব শব্দ বেরিয়ে এল। কীভাবে হলঘর থেকে শোওয়ার ঘরের বিছানা অবধি এল তারা তাও স্পষ্ট মনে নেই অমলের।

পনেরো মিনিট পরে তাদের দুজনেই সামান্য হাঁফাচ্ছিল। শিথিল বাহুতে তখনও ধরে আছে পরস্পরকে।

মোনা মৃদু হেসে বলল, শোধ হল?

অমল ম্লান একটু হেসে বলল, শোধবোধের দরকার কী?

আমি কেমন?

তুমি! তুমি তো ভালই।

এই বয়সেও আমার শরীরে একটুও ফ্যাট নেই, দেখেছ? দুটো ছেলেমেয়ের মা হওয়া সত্ত্বেও!

দেখেছি। তুমি বোধহয় ব্যায়াম করো।

করি। তুমি আমার কোনও খবর রাখো না।

অমল উঠল। দীর্ঘ দিনের পর স্বামী-স্ত্রীর এই হঠাৎ মিলন যে কোনও সমস্যারই সমাধান করতে পারে না তা সে জানে। শরীরে শরীর মিশিয়ে দিলেই কি দূরত্ব ঘোচে? সাহেবরা বলে লাভ মেকিং। আদিখ্যেতা, মিথ্যাচার। সেক্স হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ লাভ। সাহেব শালারা ওসব বোঝে না। ওদের ভালবাসা বড় বেশি লিঙ্গ-নির্ভর। বউ নিয়ে যেমন লোক-দেখানো আশনাই করে, হনিমুনে যায়, তেমনি টপাটপ খারিজ করে দেয় পরস্পরকে।

মোনা আর তার যা সম্পর্ক তাতে কবেই ডিভোর্স হয়ে যেতে পারত, হয়নি, তারা সাহেবদের মতো নয় বলেই।

পাশাপাশি খাট থেকে পা ঝুলিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল তারা। নগ্ন, চুপচাপ

খিদে পায়নি?

না তো! এই তো কফি খেলাম

খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে মোনা বলল, তোমাকে শেভ করতে বলিনি, কেন জানো?

কেন?

দাড়ি আর গোঁফে তোমাকে বেশ ভালই লাগছে। দাড়িটা বরং রাখো, তবে ট্রিম করা দরকার।

অমল মোনার দিকে চেয়ে বলল, আমাকে কি তুমি সত্যিই ডিভোর্স করতে চাও?

মোনা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, তুমি চাও?

আমি! না তো! আমি চাই না।

কেন চাও না? এ সম্পর্ক টিকিয়ে রেখে কী লাভ?

সেটা ভেবে দেখিনি কখনও। কিন্তু মনে হয় সম্পর্ক ভেঙে দিয়েও তো কোনও লাভ নেই।

মোনা উঠে অলস হাতে হাউস কোটটা তুলে নিয়ে বলল, আমি ডিভোর্স চেয়েছিলাম ঠিকই। উঁকিলের পরামর্শও নিয়েছিলাম। কাগজপত্র তৈরি হচ্ছিল। একদিন বিকেলে সোহাগ বলল, তুমি বাবাকে ডিভোর্স

করতে চাইছ, করো, কিন্তু তোমার কি ধারণা তোমাদের দুজনের সম্পর্ক শুধু তোমাদের দুজনকে নিয়েই? স্বামী আর স্ত্রী? তার মধ্যে কি আমরাও নেই? আমাদের এতকাল একসঙ্গে থাকার অভ্যাস নেই? বিয়ের এত বছর পরও যদি তোমাদের মনে হয় যে ইট ইজ এ ফেইল্ড ম্যারেজ তা হলে তার জন্য তো তোমরাই দায়ি। আর সেজন্য তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। ট্রাই এগেইন টু রিকনস্ট্রাক্ট ইট।

বিস্মিত অমল বলল, সোহাগ!

হ্যাঁ। কথাগুলো আমার কাছে অদ্ভুত শোনাল। তারপর আমি কেবল কদিন ধরে ভেবেছি। তাই তো! স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা তো শুধু তাদের দুজনের নয়। তাদের জড়িয়ে আরও কত কিছু গড়ে ওঠে। সবসময়ে যে ভালবাসা থাকবেই তাও তো নয়। থাকে দায়দায়িত্ব, থাকে কর্তব্য, থাকে নির্ভরতা। সংসার গড়ে তোলা কি কম কথা? দাবার ঘুঁটি হলে না হয় হাটকে-মাটকে দেওয়া যায়।

অমল চুপ করে মোনার দিকে চেয়ে রইল। এ কথা ঠিক যে, এই ভদ্রমহিলার প্রতি তার তেমন কোনও আকর্ষণ নেই, একে খুশি করার কোনও উদ্যমও নেই তার, একে গভীরভাবে জানার চেষ্টাও সে কখনও করেনি। তবু মোনা যদি চলে যায় তা হলে একটা অদ্ভুত শূন্যতার সৃষ্টি হবে। সেটা বোধহয় তার ভাল লাগবে না।

মোনা ভারী উদাস গলায় বলে, সোহাগের ধারণা আমি চলে গেলে তুমি বেশি দিন বাঁচবে না, একদিন বলছিল, বাবা তোমাকে ভালবাসে কিনা আমি জানি না, কিন্তু তুমি চলে গেলে বাবা ঠিক মরে যাবে। নিজের দেখাশোনা করার মতো শক্তিই বাবার নেই। না খেয়ে-খেয়ে, অযত্নে শেষ হয়ে যাবে লোকটা। নিজের ভাল-মন্দ বাবা তো বুঝতে পারে না।

নিজেকে ভারী বেকুবের মতো লাগছিল অমলের। এরা তাকে নিয়ে ভাবে তা হলে? একটু হলেও ভাবে! সে তো ধরে নিয়েছিল, সে মরে গেলেও এদের তেমন কিছু যাবে আসবে না।

মোনা বিষণ্ণ মুখে বলল, তুমি আমাকে চাও বা না চাও, আমি তবু ওদের মুখ চেয়ে সিদ্ধান্ত বদল করেছি। আরও কিছুদিন দেখা যাক। কী বলো?

হ্যাঁ, মোনা, আরও কিছুদিন দেখা যাক।

কী করব আমরা?

তা তো জানি না। তুমি যা বলবে আমি তাই করতে রাজি।

লক্ষ্মীছেলে হয়ে গেলে নাকি?

না মোনা। লক্ষ্মীছেলে নয়। আমার মাথা বিভ্রান্ত, বুদ্ধি ঘোলাটে, চিন্তা বিক্ষিপ্ত, আমি নিজে কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারি না আজকাল। আমার মনে হয়, কারও ওপর নির্ভর করাটা এখন বড্ড দরকার, কিন্তু কার ওপর করব মোনা? আমার তো কোনও বন্ধু নেই!

আমারও মনে হচ্ছে তুমি ঠিক স্বাভাবিক নেই।

না। আমি স্বাভাবিক নেই।

মোনা তার দিকে নিবিড় স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলল, একটা সত্যি কথা বলব?

বলো।

ঠিক এখনই কিন্তু তোমাকে আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে। এত ভাল কখনও লাগেনি।

তিপ্পান্ন

ব্রহ্মচারী মারা যাওয়ার পর বিজু আর তার ঘরে চড়াইপাখিদের বাসা করতে দিত না। খড়কুটো নিয়ে চড়াইপাখিরা তবু চেষ্টা কিছু কম করেনি। তাদের লক্ষ্য ছিল বিজুর ঘরে সিলিং-এর কাছ বরাবর বইয়ের তাক। বইগুলো তেমন কাজের নয়। কিন্তু বিজুর স্বভাব হল সে কখনও তার পুরনো, বাতিল কোনও বই আজ অবধি ফেলে দিতে পারেনি। এমন কী তার স্কুলের পাঠ্য বই-খাতা সে জমিয়ে রেখেছে। সেগুলোই ওই ওপরের তাকে সাজিয়ে রাখা। চড়াইপাখিদের খুবই প্রিয় জায়গা ওটা। নাগালের বাইরে একটু ঘিঞ্জি, ঘুপসি জায়গায় তারা বাসা করতে ভালবাসে।

কিন্তু বিজু খড়কুটো জড়ো হতে দেখলেই সেগুলো ফেলে দিত। তাতে পাখিরা সাময়িক নিরস্ত হলেও হাল ছাড়েনি কখনও। বারবার চেষ্টা করে গেছে। শেষ অবধি হাল ছেড়েছে বিজুই। ছাদের ঘরে সে একদম একা। মাঝে মাঝে মোতি নামের বেড়ালটা এসে বিজুর বিছানায় আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু বিছানায় বেড়ালের অনুপ্রবেশ একদম পছন্দ করে না বলে বিজু মোতিকে তাড়িয়ে দেয়। মোতির অভ্যাসটা খারাপ করেছে বিজুর মা। আদুরে বেড়ালকে বিছানায় নিয়ে শোয়া তার অভ্যাস। বিজু মাকে অনেক বকেও অভ্যাস ছাড়াতে পারেনি। মোতি তবু মাঝে মাঝেই নির্লজ্জের মতো আসে এবং একবার বিজুর ঘরে সন্তান প্রসবের চেষ্টাও করেছিল। শেষ অবধি মোতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ছানাপোনা নিয়ে সে আজকাল নীচেই থাকে। তবে মাঝে মাঝে এসে গম্ভীরমুখে ঘরে একটু হাঁটাহাঁটি করে যায়। সেটা তার অধিকার প্রতিষ্ঠাও হতে পারে, বিজুর ওপর মায়াও হতে পারে।

যাই হোক, বিজুর ঘরে চড়াই বা বেড়াল কিছুই ছিল না। এখন চড়াইপাখিরা বাসা করেছে। বিজুর প্রতিরোধ একটু একটু করে মায়াবশে ভেঙে যাচ্ছিল। কে না জানে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হল এই মায়া। আবার কে না জানে মায়াই হয়তো মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুও।

কিন্তু চড়াইয়ের বাসা থেকে যে বিজুর আর এক অশান্তি শুরু হবে তা কে জানত? ঘরের সর্বত্র পুরীষ ত্যাগ এবং পালকের ওড়াউড়ি তো আছেই। তা ছাড়া মাঝে মধ্যেই ডিম ভেঙে পড়া এবং চড়াইছানার আকস্মিক পতন হল আর এক দুশ্চিন্তার কারণ। প্রথম যে চড়াইছানাটা পড়ে গিয়েছিল সেটাকে সযত্নে বইয়ের তাকের বাসায় পুনর্বাসিত করার চেষ্টা করেছিল বিজু। কিন্তু চড়াইরা বোধহয় পতিতজনকে আর গ্রহণ করে না। তুলে দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্রুদ্ধ চড়াইরা সেটাকে ফের ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। বারকয়েক পতনের পর অক্কা পেল সেটা। সদ্য-উড়তে-শেখা একটা ছানা কীভাবে যেন জখম হয়ে মেঝেয় পড়ে রইল একদিন। হাঁটতে পারে, কিন্তু উড়তে পারে না। তাকে ধরতে গেলেই খাট বা টেবিলের নীচে পালায়। অবশেষে ধরেও জখমটা ঠিক বুঝতে পারল না বিজু। চড়াইপাখি যে কী খায় তাও তার জানা নেই। অগত্যা খানিকটা চাল এনে ছড়িয়ে

দিল মেঝেতে। ছোট বাটিতে জল। দেখা গেল পাখিটা জলে একটু-আধটু মুখ দিলেও চাল খাচ্ছে না। কী যে মুশকিল হল বলার নয়।

মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ মা, চড়াইপাখি কী খায় জান না?

কে জানে বাবা কী খায়। পোকামাকড়ই খায় বোধহয়। কেন, চড়াই পড়েছে নাকি?

হ্যাঁ।

সে তো নীচের ঘরেও কতবার পড়েছে।

সেগুলোর গতি কী হয়েছে?

গতি আর কী হবে। মোতিই মুখে করে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসে।

মোতিটা একটা যাচ্ছেতাই তো।

তা ওকে দোষ দিয়ে কী হবে। যার যা স্বভাব। বরং ধানুকে জিজ্ঞেস কর। ওরা আদিবাসী, কাকপক্ষী খুব চেনে।

ধানুর বয়স বছর কুড়ি-বাইশ। কালো, রোগাটে চেহারা। সে ঢেঁকি, উদুখল আর কাচাকুচির জন্য বহাল হয়েছে। বেশি কথা কয় না, নিঃশব্দে কাজ করে।

কুয়োপাড়ে ধানু কাপড় কাচছিল। ডাক শুনে উঠে এল।

হ্যাঁ রে ধানু, চড়াইপাখিরা কী খায় জানিস?

কেন গো, চড়াই দিয়ে কী হবে?

বল না।

পোকা খায়, ঘাসের বীজ খায়, ভাতও খায়, ওদের কোনও ঠিক নেই।

আমার ঘরে একটা চড়াইপাখি পড়ে গেছে। বাচ্চা পাখি। কী করব বল তো!

সাদা দাঁত দেখিয়ে হাসল ধানু, বলল, ও কি আর বাঁচবে?

কেন বাঁচবে না?

ওম না পেলে বাঁচে না।

দুর, তুই কিছু জানিস না।

বেশি খেতে দিও না কিন্তু, বেশি খেলে তাড়াতাড়ি মরে যাবে। একটু ভাত দাও। আর জল।

তাই দিল বিজু। অনেকক্ষণ সংকোচের সঙ্গে পালিয়ে থেকে অবশেষে পাখিটা এসে ভাত ঠোকরাতে লাগল। জলও খেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বিজু। কিন্তু এ-ঘরে মোতির আনাগোনা আছে এবং তার আগমন-নিষ্ক্রমণের পথ বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব। দরজা বন্ধ রাখলে মোতি জানালা দিয়ে আসবে। জানালা বন্ধ রাখলে পাখিদের যাতায়াত বন্ধ হবে। ঘুলঘুলি আছে বটে, কিন্তু তাতে জাফরি দেওয়া বলে পাখি আসতে পারে না। কী যে মুশকিল হল পাখিটাকে নিয়ে!

মোতির হাতে নয়, পাখিটা দিন তিনেক বাদে মরে গেল। ঝি ঘর ঝাঁট দিতে এসে টেবিলের তলা থেকে মরা পাখিটাকে বের করল। বিজুর চোখে জল এসে গিয়েছিল ঘাড় লটকানো, চোখ ওলটানো পাখিটাকে দেখে। মায়া যে কী সর্বনেশে জিনিস! দুদিন মন খারাপ রইল তার। একটা পাখিকে বাঁচানোর মতো সামান্য এলেমও তার নেই কেন? এই সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে বেঁচে থাকাটা তো একটা ডিসক্রেডিট।

জ্যাঠা তাকে ওকালতিতে জুতে দিয়ে গিয়েছিল। গৌরহরির প্রায় সব আইনের বই-ই নিয়ে এসেছে সে। গৌরহরির ঘনিষ্ঠ এক উঁকিলের জুনিয়র হয়ে কিছুদিন কাজ করেছে। এখন দু-একটা মামলা নিজেও করে, অবাক কাণ্ড হল গৌরহরির মক্কেলরা আজকাল তার কাছেই আসতে লেগেছে। এক মক্কেল তাকে বলে ফেলল, মশাই, আমি স্বপ্নে দেখেছি, চাটুজ্যেমশাই বলছেন, ওহে বিজুর কাছে যাও, আমি বিজুর ওপরেই ভর করব।

জ্যাঠামশাই ভর করুন বা না করুন বিজু কথাটার প্রতিবাদ করেনি। মক্কেল আসছে, এটাই বড় কথা। সংখ্যায় তারা বেশি নয়, পাঁচ সাতজন, অন্যরাও লক্ষ রাখছে। হাতযশ দেখলে তারাও এসে জুটবে। নিজের ভবিষৎ জ্যাঠামশাইয়ের কল্যাণে খুব একটা অনুজ্জ্বল দেখছে না বিজু। ওকালতি কাজটা তার ভালও লাগে। কলম পেশার চেয়ে ঢের ভাল। উত্তেজনা আছে, থ্রিল আছে, জয়-পরাজয়ের আনন্দ ও দুঃখ আছে। একঘেয়ে তো নয়।

গাঁয়ের বাড়িতে মক্কেল আসবে না বলে পুজোর পরই বর্ধমানে জি টি রোডের ওপর দোতলায় একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে চেম্বার খুলেছে বিজু। কোর্টের পর সেখানেই বসে আজকাল।

সেদিন জনা চারেক লোক ছিল চেম্বারে। মামলামোকদ্দমার ব্যাপার নয়, এরা এমনিই গল্প-সল্প করতে আসে। দু-একজনের কেস করেছে বিজু। পাখিটা মরে যাওয়ায় মনটা সেদিন ভাল ছিল না। সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা চড়াইপাখিদের লাইফ স্টাইল সম্পর্কে আপনারা কেউ কিছু জানেন? আমার একটা সমস্যা হয়েছে। ঘরে চড়াইপাখি বাসা করেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে চড়াইয়ের বাচ্চা পড়ে যায়।

একজন আঁতকে উঠে বলল, চড়াইপাখি! ও তো নুইসেন্স মশাই। তাড়িয়ে দিন! তাড়িয়ে দিন! বাস ভেঙে ঝাঁটাপেটা করে তাড়ান। অতি অসভ্য পাখি। ঘরদোর নোংরা করবে। কোনও কাজের পাখি তো নয়। রাধাকৃষ্ণ বলবে না, দেখতেও হতকুচ্ছিত, পোষ মানাতেও পারবেন না। এক্ষুনি বিদেয় করুন।

ননীবাবু মৃদু একটু প্রতিবাদ করে বললেন, না না, ওরকম করাটা ঠিক হবে না। চড়াইপাখি বাসা করাটা নাকি সুলক্ষণ। সেই বাড়িতে লক্ষ্মীশ্রী থাকে। মা-ঠাকুমার কাছে তাই তো শুনেছি।

বিজু মাথা নেড়ে বলে, আমি ওসব কুসংস্কার মানি না। আমার প্রবলেমটা হচ্ছে হিউম্যানেটেরিয়ান গ্রাউন্ডে।

চড়াই-বিরোধী লোকটা বলে, চড়াইপাখির সঙ্গে আবার হিউম্যানিটি কী মশাই? তাও যদি বুঝতুম যে চড়াইয়ের মাংস খাওয়া যায়। তাও যখন নয় তখন ওদের জন্য হিউম্যানিটি দেখানোর কোনও মানে হয় না। দুনিয়ার নিয়ম কী জানেন? ভাল ভাল জীবজন্তুগুলো সব এক্সটিংট হয়ে যায়, আর নিঘিন্নে, বাজে, ফালতু, নোংরা স্পেসিসগুলো সংখ্যায় বাড়ে। ডোডো পাখি এক্সটিংট না হয়ে চড়াই হলে কী ক্ষতি ছিল বলুন তো!

চড়াইপ্রেমী ননীবাবু এ কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, যার হিউম্যান ফিলিংস আছে সে সব জীবজন্তুর প্রতিই সিমপ্যাথি ফিল করে। আর চড়াই মোটেই কোনও ভিলেন পাখি নয়। হাত থেকে রসগোল্লা ছোঁ মেরে নেয় না বা ঠোক্কর মারে না। ছোট, নিরীহ একটা পাখির ওপর আপনার যে কেন এত আক্রোশ।

আক্রোশ-টাক্রোশ নয় মশাই। শুধু বলছি চড়াই এক উৎপাত। এদেশে এত গাছগাছালি আছে তাতে গিয়ে বাসা করে থাক না বাপু। মানুষের ঘরদোরে এসে ছিষ্টিনাশ করার স্বভাব কেন? কই, আর কোনও পাখি তো এমনধারা করে না।

বিজু মৃদু হেসে বলল, তাহলে চড়াই সম্পর্কে আপনারা তেমন কিছু বলতে পারলেন না। আমি একজন চড়াই-বিশেষজ্ঞ খুঁজছি।

চড়াইবিরোধী লোকটা বলল, লোকের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই মশাই যে চড়াইয়ের ঠিকুজি-কুষ্ঠি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে।

ননীবাবু বললেন, না না, আছে। আমার এক শালা আছে পাখি-টাখি পোষে। সে বোধহয় বলতে পারবে।

তাকে একবার বলবেন তো আমি একটু দেখা করতে চাই।

বলবখন। সে কাটোয়ায় থাকে। বর্ধমানে এলে—

এর বেশি আর কথা এগোল না।

কিন্তু ঠিক তিনদিন বাদে ফের চড়াই নিয়ে সমস্যায় পড়ল বিজু। একটা বাচ্চা চড়াই পড়ে গেল। ভালরকম চোট পেয়েছে। তীব্র আর্তনাদে ঘর ভরে গেল। সন্ধেবেলা পাখিটাকে হাতে নিয়ে ভাল করে দেখে বিজুর মনে হল, ঘাড় ভেঙে গেছে কিংবা ঘাড়ে ভালরকম চোট হয়েছে।

মেঝেতে ছেড়ে দিলেই পাখিটা যন্ত্রণায় পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে চরকির মতো পাক খায় আর আর্ত চিৎকার করতে থাকে। হাতে তুলে নিলে চিৎকার বন্ধ হয় বটে, কিন্তু খিঁচুনির মতো পা টানা দেয়, পাখা ঝাপটানোর চেষ্টা করে। ওর যন্ত্রণাটা বুঝতে পারে বিজু, কিন্তু নিরাময় বা উপশম তো তার জানা নেই। কোনও পক্ষীবিশারদ বা পক্ষীচিকিৎসক হয়তো জানে। সে জানে না। পাখিটাকে নিয়ে অসহায়ের মতো অনেকক্ষণ বসে রইল সে। একটা কৌটোর ঢাকনায় জল নিয়ে মুখের কাছে ধরল। পাখিটা ঠোঁটে একটু জল ছিটকোল বটে, কিন্তু শান্ত হল না। ওকে কি ঘুমের ওষুধ বা পেইন-কিলার দেওয়া উচিত? ভেবেই চিন্তাটা কত হাস্যকর তা বুঝতে পারল বিজু। মানুষের ওষুধ খাওয়ালে পাখিটা হয়তো মরেই যাবে।

অনেক রাত অবধি পাখিটাকে হাতে নিয়ে বসে নাস্তিক বিজু ভাবছিল, ঈশ্বর নামক অলীক বস্তুর কাছে ওর প্রাণভিক্ষা করা উচিত কিনা। যুক্তিজালে তার কাছে কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই ঠিক কথা, কিন্তু মানুষের বস্তুজ্ঞানের সীমানার ওপারটা আজও তো আবছা। ওই আবছায়ায় ঈশ্বর বা ভূতের মতো কেউ নেই তো! থাক বা না থাক, প্রার্থনায় তো দোষ নেই!

না, প্রার্থনা করা উচিত হবে না। সামান্য একটা পাখির জন্য যদি সে নিজের বিশ্বাস ও মত বিসর্জন দেয় তাহলে নিজেকেই তার একদিন ঘেন্না হবে।

নাস্তিক হয়েও দুর্গাপুজো কালীপুজো নিয়ে মাতামাতি করে বলে অনেকে তাকে প্রশ্ন করেছে। সে বলে, দুর্গাপুজো কালীপুজো কোনও ধর্মকর্ম নয় রে। ওটা একটা উৎসব মাত্র। একটা উপলক্ষ করে খানিক ফুর্তি করা।

সারা রাত তো আর পাখি নিয়ে জেগে থাকা যায় না। একসময়ে সে পাখিটাকে মেঝেয় ছেড়ে দিন। পাখিটা অবিরল ঘুরপাক খেতে লাগল যন্ত্রের মতো। সঙ্গে সেই আর্তনাদ।

সারা রাত ভাল করে ঘুমোতে পারল না বিজু। বারবার ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। বারবারই মনে হতে লাগল, এত কম জেনে বেঁচে থাকার মানেই হয় না। একটা চড়াইপাখি, নিত্যদিনকার চেনা একটা জীব, তারও ব্যথাবেদনা কমানোর উপায় কেন তার জানা নেই?

সকালবেলায় উঠেই সে প্রথম পাখিটার খোঁজ করল। লক্ষ্যহীন, নিয়ন্ত্রণহীন ঘুরপাক খেতে খেতে পাখিটা দরজার কাছ বরাবর গিয়ে নেতিয়ে কাত হয়ে পড়ে আছে। প্রথমে ভাবল মরেই গেছে বোধহয়। কিন্তু ধরতে যেতেই ফের চিড়িক শব্দ করে তার প্রবল ঘুরপাক শুরু করে দিল। জান আছে বটে পাখিটার।

জল ছিল, ভাতও ছিল একটা প্লেটে। পাখিটাকে ধরে খাওয়ানোর চেষ্টা করল সে। খেল না।

পাখিটাকে ফের তার যান্ত্রিক ঘুরপাকে ছেড়ে দিয়ে বসে রইল সে। মা-পাখিটা অপেক্ষা করছিল বোধহয়। সে সরে বসতেই নেমে এসে বাচ্চার কাছে বসল। কিন্তু মাকে দেখেও বাচ্চাটার ঘুরপাক থামল না। মুখে করে দানা জাতীয় কিছু এনেছিল মা-পাখিটা। কিন্তু খাওয়াতে পারল না।

অসহনীয় চিৎকার সহ্য করতে না পেরে নীচে নেমে গেল বিজু।

মা তাকে দেখেই বলে উঠল, কী হয়েছে রে? মুখটা অমন গম্ভীর কেন?

এমনি। কিছু হয়নি।

শরীর খারাপ নয় তো!

না, না ওসব ঠিক আছে।

কী যে হয় তোর মাঝে মাঝে। দেখে ভয় লাগে বাবা।

চা নয়, সকালে এক গ্লাস গোরুর দুধ খেতে হয় তাকে। ছেলেবেলার অভ্যাস। দুধটা কোনওক্রমে খেয়ে সে বাগানে গিয়ে কিছুক্ষণ উদাস মুখে বসে রইল। পাখিটার যন্ত্রণা তাকে সারা রাত বিঁধেছে। একসময়ে তার মনে হচ্ছিল যন্ত্রণাটা তার শরীরের মধ্যেই হচ্ছে।

অনাত্মীয়, ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত, নামগোত্রহীন ওই পাখিটার জন্য এই যে টান এটা অ্যানিম্যাল লাভার্সদেরও থাকে। কত লোক রাস্তার কুকুরের জন্য আশ্রয় বানিয়েছে। ওটা বড় কথা নয়। সে অজ বাগানে শীতের রোদ ও ছায়ায় ঘুরতে ঘুরতে আর একটা মহৎ ব্যাপার অনুভব করছিল। সমস্ত পৃথিবী, বিশ্বজগৎ, মহাজগৎ জুড়ে একটা সিস্টেম রয়েছে। তার সঙ্গে সে, ওই চড়াইপাখি, মোতি এবং সবাই ও সব কিছু বাঁধা। কেউ একা নয়, বিচ্ছিন্ন নয়। সব কিছুই সব কিছুর সঙ্গে এক সূক্ষ্ম মাকুর কারসাজিতে পরস্পরের সঙ্গে যোগ হয়ে আছে। ধর্মে এরকমই এক মহা সম্পর্কের কথা বলা হয় বটে। সেটা গাঁজাখুরি হতেও পারে। কিন্তু সম্পর্কও যে একটা আছে—যা মায়া, মোহ, ভালবাসা বা যাই হোক— তাও তো মিথ্যে নয়।

ঘণ্টাখানেক বাদে তার ঘর ঝাঁটপাট দিতে এল কাজের মেয়ে। বিজুর সামনে মেঝের ওপর তখনও পাখিটা অবিরাম চক্কর খাচ্ছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। পাখিটা দুপায়ে উঠে দাঁড়াতে পারছে না, উড়তে পারছে না, শুধু আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে চক্রাকারে ঘুরে যাচ্ছে। যন্ত্রণাটা চোখে দেখা যায় না।

কাজের মেয়েটা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ও কী গো! ওটা কী মেঝের ওপর?

বিজু ধমক দিয়ে বলল, চেঁচানোর কী হল তোর! ওটা একটা চড়াইপাখি। জখম হয়েছে। কিছু করতে পারিস?

ফের পাখায় ধাক্কা খেয়েছে বুঝি?

আমি কি পাগল যে শীতকালে পাখা চালাব! পাখা চালিয়ে একটাকে তো তুই-ই মেরেছিলি।

আহা, আমার কী দোষ বলো। পাখিগুলো অমন আহাম্মক হলে আমি কী করব?

এটার জন্য কিছু করতে পারিস?

মেয়েটা পাখিটাকে দুহাতের আঁজলায় তুলে নিয়ে বলল, ওর তো হয়ে গেছে। ঘাড় ভাঙলে কেউ বাঁচে?

ঘাড়ই ভেঙেছে বলছিস?

তাই তো মনে হচ্ছে। মাথা সোজা করতে পারছে না যে। ফেলে দিই গে?

না না। ওই ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে আপাতত রেখে দিয়ে তুই ঘরটা ঝাঁটপাট দে। তারপর দেখা যাবে।

তোমাদের বাড়িভর্তি বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা হুলোও রোজ আনাগোনা করে। এটাকে রাখতে পারবে?

দেখা যাক।

রাখা যাবে না সে জানে। বেড়ালে না নিলেও খাদ্য-পানীয় ছাড়া পাখিটা এমনিতেও মরবে। ধীর মৃত্যু। সেটা প্রত্যক্ষ করতে হবে তাকে। বিজু ব্যাপারটা সইতে পারছে না।

কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করবি। ওই যে দুটো কৌটোর ঢাকনায় জল আর ভাত রয়েছে। দেখ না চেষ্টা করে।

মেয়েটা কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, না এ খাচ্ছে না যে। কুশি বাচ্চা এরা কি নিজে খেতে পারে? মায়ের ঠোঁট থেকে খায়।

বিজু সেটা জানে। তাই সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কোর্টে গিয়েও তার আজ অন্যমনস্কতা কাটল না। তবে অনেকটা সহজ হল। বুকটা হালকাই লাগছিল। কিন্তু যে-ই সন্ধেবেলায় চেম্বারের পর মোটরবাইকের মুখ বাড়ির দিকে ঘোরাল তখনই সে অলক্ষ্য থেকে সেই প্রাণান্তকর আর্তনাদ অগ্রিম শুনতে পাচ্ছিল। মেঝেময় লাট খেয়ে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে ভাঙা শরীরের এক পাখি।

মাসি কিলিং! বাড়ি ফিরে কি পাখিটার যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে মেরে ফেলবে ওকে? না, তা পেরে উঠবে না সে।

রাতে ঘরে খুব সাবধানে ঢুকল সে। আলো জ্বালল। ঘরে কোনও শব্দ নেই। মরে গেল নাকি পাখিটা? নিচু হয়ে মেঝের ওপর খুব ক্ষীণ রক্তের দাগ আর আঁশের মতো একটু পালক দেখতে পেল সে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বাইরের দিকের জানালার পাল্লাটা খোলা। মার্সি কিলিং-এর কাজটা হয় মোতি, না হয় আগন্তুক কোনও হুলোই করে গেছে। আপাতত শান্তি। কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান তো নয়। এ-ঘরে যতদিন চড়াইয়ের সংসার থাকবে ততদিন এই ঘটনা বারবার ঘটবে।

জামাকাপড় পালটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিজু। আজ আর পড়াশুনো করতে ইচ্ছে হল না। মোটে আটটা বাজে।

মা রান্নাঘর থেকে জিজ্ঞেস করল, আবার কোথায় চললি?

দেখি, একটু আড্ডা মেরে আসি।

রাত করিস না।

আরে না। কাকার বাড়ি যাচ্ছি।

তবেই হয়েছে। ওরা ঠিক রাতের খাবার খাইয়ে দেবে। শুনেছি পিঠেপায়েস হয়েছে ও-বাড়িতে।

তাহলে তো ভালই। সেঁটে আসবখন।

তাকে দেখেই পান্না এক গাল হাসল, বাব্বাঃ, যা কাজের লোক হয়েছ তুমি! আজকাল টিকিরই নাগাল পাওয়া যায় না।

তোর মতো বসে খেলে আমার চলবে? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়।

ইস! আমি পড়াশুনো করি না বুঝি! দাঁড়াও না, পাস করেই চাকরি করতে লেগে যাব। পারুলদিকে বলে রেখেছি। ওদের কোম্পানিতেই ঢুকে যাব।

দুর! ও তো মিস্তিরির কাজ। তুই পারবি?

না না, ওদের অফিস ওয়ার্কারও লাগে। এ-গাঁয়ে আমি আর থাকছি না বাবা।

কেন, গাঁ আবার কী দোষ করল?

পান্নার মুখ থেকে হাসি উবে গেল। বড় বড় চোখ করে বলল, জানো না বুঝি? আমাদের নতুন রান্নার লোক সুদর্শন রোজ ভূত নামায়।

বিজু হেসে বলল, তুইও তো একটা ভূত।

যাঃ, বাজে কথা বোলো না। রোজ রাতের বেলা সবাই ঘুমোলে ও নাকি মন্তর পড়ে ভূতেদের নামিয়ে আনে। তখন সারা বাড়ি বোঁটকা গন্ধে ভরে যায়। বাসন্তী, হিমি সবাই গন্ধ পেয়েছে।

বটে!

ভয়ে আমি মরে যাচ্ছি বাবা।

চুয়ান্ন

ভূত, ভূত, আর ভূত! দুনিয়াতে এত ভূত থাকলে তার চলবে কী করে? কেন যে এত ভূত-টুত চারদিকে আছে বাবা! ভগবান যে কেন ভূতের সৃষ্টি করল কে জানে! পান্নার কান্না পায়। যত নষ্টের গোড়া ওই সুদর্শন। ভূত জিনিসটাকে মাঝে মাঝে দিব্যি ভুলে থাকত পান্না। ওই সুদর্শন এসেই আবার ভূতের তাণ্ডব শুরু করেছে, সবাই বলে রোজ নাকি মাঝরাতে ও ভূত নামায়। মরতে তাদেরই বাড়িতে এসে জুটেছে বিটকেল লোকটা। নিশুতরাতে নাকি এ-বাড়িতে থিকথিক করে তারা। শোনার পর থেকে দিনরাত রাম নাম করছে পান্না। তবু কি ভয় যায়?

বিজুদা বলেছে, পান্না, তুই কমিউনিস্ট হয়ে যা, তা হলে আর ভূতের ভয় বলে কিছু থাকবে না।

যাঃ, কী যে বলো। কমিউনিস্টের সঙ্গে আবার ভূতের কী?

ওই তো মজা। মানুষ যেমন ভূতকে ভয় পায়, তেমনই ভূত আবার কমিউনিস্টদের ভয় পায়।

দুর! সবসময়ে ঠাট্টা ভাল লাগে না। রাতে আজকাল লেপ চাপা দিয়েও ঘুমোতে পারি না, জানো? বাঁ ধারে হীরা, ডান বারে মা শোয়, দুজনের মাঝখানে মাথা অবধি লেপ ঢাকা দিয়ে শুয়েও মনে হয়, ওই বুঝি ভূতের হাসি শুনতে পাচ্ছি।

তোর পক্ষে সবচেয়ে ভাল জায়গা কী জানিস? হয় হাসপাতালের কোয়ার্টার, না হয় শ্মশানের ধারে বাড়ি।

ও বাবা গো! তা হলে আমি মরেই যাব।

দুর বোকা! হাসপাতাল বা শ্মাশানে কখনও ভূতের উপদ্রবের কথা শুনেছিস? খোঁজ নিলেই দেখতে পাবি কোনও হাসপাতালে একটাও ভূত নেই। কোনও শ্মশানে ভূতের টিকিরও নাগাল পাবি না। কেন জানিস? ও দু জায়গায় এত ভূত যে ভূতে ভূতক্ষয় হয়ে যায়।

তোমাকে বলেছে?

আরে আমি তো একসময়ে ভূতের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতাম, জানিস না?

সেটা অবশ্য জানে পান্না। বিজুদার দুর্জয় সাহস। ভূত বলে যে কিছু নেই সেটা প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। তখন সত্যিই শ্মশান আর কবরখানায় রাতবিরেতে ঘুরে বেড়িয়েছে অনেক।

অত সাহস কিন্তু ভাল নয়, বুঝলে।

কেন, তোর ভূতেরা কি তাতে চটিতং হবে নাকি? তা হোক না। হয়ে আমার ঘাড় মটকাতে আসুক না। আমি তো সেটাই চাই। সুদর্শন ভূত নামায় শুনে ওকে গতকাল চেপে ধরেছিলুম, বুজরুকির আর জায়গা পাওনি? দেখাও তো তোমার ভূত! শুনে ও তো আকাশ থেকে পড়ল। বলল, জন্মে ভূতপ্রেতের কারবার করিনি বাবু। কে যে ওসব গাজাখুরি কথা রটায়! ব্রাহ্মণসন্তান জপতপ একটু-আধটু করি বটে, কিন্তু ওসব তান্ত্রিক কারবারে নেই।

আমাদের কাছেও স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু সবাই জানে ও ভূতপ্রেত নামাতে পারে। ওকে না তাড়ালে আমি আর এ-বাড়িতে থাকতে পারব না।

এ-বাড়িতে তোর আর থাকার দরকারটাই বা কী? ভাল দেখে একটা কমিউনিস্ট পাত্রকে বিয়ে করে সটকে পড়। কাকাকে বলছি কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে। তাতে লেখা থাকবে, সুন্দরী, শিক্ষিতা সপ্তদশী ভুতভীতা পাত্রীর জন্য অনধিক ত্রিশ ব্রাহ্মণ অকাশ্যপ, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা সরকারি অফিসার এবং কট্টর কমিউনিস্ট পাত্র চাই। হ্যাঁ রে, কমিউনিস্টও তো আবার নানা রকম আছে। তোর কোনটা পছন্দ? সি পি আই, সি পি এম না নকশাল? নকশালের ঝাঁঝ বেশি, ওদের ধারেকাছে ভূত ঘেঁষবে না। নকশালই লিখে দিতে বলি কাকাকে?

পান্না ফিক করে হেসে বলল, ছেলেবেলার মতো আবার চিমটি কাটব কিন্তু। আমি মরছি নিজের জ্বালায়, উনি এলেন ঠাট্টা করতে।

ভাল কথা বললে তো শুনবি না। তা হলে একটা তুক শিখিয়ে দিচ্ছি। যখন ভূতের ভয় পাবি তখন রামনাম না করে কার্ল মার্ক্স কার্ল মার্ক্স করিস, দেখবি তাতে অনেক বেশি কাজ হবে।

কমিউনিস্টরা ভীষণ বাজে লোক হয়।

কী করে বুঝলি?

তোমাকে দেখে।

আহা, আমি আর সাচ্চা কমিউনিস্ট হতে পারলাম কী? একটা ক্যারিকেচার হয়ে রইলাম। সাচ্চা কমিউনিস্ট তো দেখিসনি।

আর দেখে কাজও নেই।

ভূতপ্রেত নামাক আর যাই করুক সুদর্শনের রান্না কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস। বুঝলি, কাল একটা পালংচচ্চড়ি রান্না করেছিল, ওরকম ভাল রান্না জন্মে খাইনি। বোধহয় ভূত-টুত ফোড়ন দিয়েছিল, অর্ডিনারি রান্না নয় কিন্তু।

কথাটা মিথ্যে নয়। সুদর্শনের রান্নার ভূয়সী প্রশংসা পান্না তার খুঁতখুঁতে মায়ের মুখে অবধি শুনতে পায়। শুধু রান্নাই নয়, সুদর্শন খুব পয়পরিষ্কার মানুষ। এই চণ্ড শীতেও সকালে উঠে স্নান এবং জপতপ না করে হেঁশেল ছোঁবে না। মানুষটা লোভী নয়, হাতটান নেই। ফলে সুদর্শনের পাল্লা খুব ভারী। একা পান্না তাকে তাড়ানোর কথা ক্ষীণভাবে বলার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাতে কোনও ফললাভের আশা সে দেখছে না।

সুদর্শন কড়াইশুঁটি দিয়ে একটা নতুন ধরনের ধোঁকার ডালনা রান্না করেছে। রান্নার সময়ে গন্ধে বাড়ি মাত হয়ে যাচ্ছিল। মা একটা টিফিন কৌটোয় খানিকটা ভরে পান্নার হাতে দিয়ে বলল, যা, তোর বড়মাকে দিয়ে আয়। গতকাল একাদশী গেছে, আজ একটু ভাল-মন্দ পেটে যাক। শুনি, আজকাল খাওয়াতে বড্ড অরুচি হয়েছে দিদির।

বলাকা এই শীতে একটু ক্ষীণ হয়েছেন। গায়ে তেল মাখার অভ্যাস নেই বলে একটু খড়িওঠা ভাব থাকেই। টানের সময় তেল-টেল না মাখলে শরীর একটু শুকোয়। বড় ঘরের মাদুরে বসে দুখুরিকে পাশে নিয়ে একটা অ্যাটলাস খুলে আফ্রিকার ম্যাপ দেখছে দুজনে।

ও বড়মা!

তাকে দেখে বড়মার চোখেমুখে যে আনন্দটা ছড়িয়ে পড়ে সেটা বড় ভাল লাগে পান্নার। জ্যাঠামশাই যে কী একাকিত্বের মধ্যে বড়মাকে ফেলে গেছে সেটা পান্না খুব টের পায়। বাড়িটা এত বড় বলেই যেন বড়মার

নিঃসঙ্গতাটা বড় বেশি চোখে লাগে। কয়েকজন কাজের লোক ছাড়া ওই দুখুরিই শুধু বড়মার ছায়া হয়ে ঘোরে। দুখুরির বাবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা কামাবে বলে তক্কে তক্কে ছিল। বড়মা অনেক টাকা দিয়ে দুখুরিকে একরকম কিনেই নিয়েছে। বাঙালি এসে মাঝে মাঝে তবু বলে, মেয়ের বারো- তেরো বছরে বিয়ে না দিলে দেশে তার খুব বদনাম হবে। বড়মা বলেছে, তোর আবার বদনাম কী রে মুখপোড়া? কোন গুণের মানুষ তুই? আর দুখুরি আবার তোর দেহাতের মেয়ে হল কবে? ওকে আমি বড় করেছি, আমিই বিয়ে দেব। মেয়ে ভাঙিয়ে পয়সা রোজগারের ধান্ধা করবি তো তোকে গাঁ-ছাড়া করে ছাড়ব।

বাঙালি সেটা জানে। তাই আজকাল ঘাঁটায় না। তবে ধানাইপানাই করে মাঝে মাঝে দশ-বিশ টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। স্পষ্টই ব্ল্যাকমেল, তবে বড়মা দেয়। শত হলেও বাপ তো।

আয়, আয়, দুদিন আসিসনি কেন রে?

পড়ছিলাম। সামনে পরীক্ষা।

আজকাল ছেলেপুলেদের সারা বছর যে কীসের এত পরীক্ষা থাকে তা বুঝি না বাবা। এই একরত্তি দুখুরিরও শুনি ফি মাসে পরীক্ষা লেগেই আছে। এর পর বই জলে গুলে খাওয়াবে। হাতে ওটা কী রে?

মা পাঠিয়েছে। ধোঁকার ডালনা।

বলাকা হেসে বলে, সুদর্শনের রান্না তো! বড় ভাল রান্নার হাত ছেলেটার।

একটু অভিমান করে পান্না বলে, ছাই ভাল, ও মোটেই নিজে রাঁধে না।

বলাকা অবাক হয়ে বলে, ও রাঁধে না? তা হলে কে রাঁধে?

সেসব আমি বলতে পারব না। গভীর ষড়যন্ত্র আছে।

বলাকা একটু চেয়ে থেকে বলে, ভেঙে বলবি তো মুখপুড়ি! কোনও অনাচার হয়ে থাকলে ও জিনিস তো আমি খাব না। শুনেছিলুম তো সে খুব আচারবিচার মেনে চলে। আগে নিরিমিষ্যি রেঁধে আলাদা উনুনে আলাদা কড়াইতে মাছ রাঁধে। সেসব শুনেই তো ওর রান্না খেয়েছি কদিন, কী হয়েছে বল তো!

শুনলে তোমার বিশ্বাস হবে না। বলে কী লাভ?

ওরে, অনাচারের কথা লুকোতে নেই। পাপ হয়। আমি শুদ্ধাচারে থাকি, অনাচার সইবে না।

অনাচার কি না জানি না, তবে ওসব রান্না ওর নিজের বলে আমার বিশ্বাস হয় না। ওসব ওর পোষা ভূতের রান্না।

বলাকা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে পান্নার দিকে চেয়ে থেকে মুখে আঁচল তুলে হেসে ফেলে। তারপর বলে, যা, খাওয়ার টেবিলে টিফিনবাটিটা রেখে আমার কাছে এসে বোস একটু।

পান্না তাই করল। বলাকার কাছ ঘেঁষে বসে বলল, তোমার বিশ্বাস হল না তো!

হবে না কেন? খুব বিশ্বাস হয়েছে। তবে ভূতের তো জাত নেই, তাদের রান্না খেলে অনাচার হবে না, কী বলিস?

তুমি ঠাট্টা করছ। ও লোকটা যে ভূত নামায় তুমি বিশ্বাস করো না বুঝি?

কেন বিশ্বাস করব না? যে ভূত নামাতে পারে সে তো মস্ত মানুষ। তাকে রোজ প্রণাম করা উচিত।

ফের ঠাট্টা?

বলাকার সঙ্গে দুখুরিও হাসছিল। বলল, এম্মাঃ, তুমি বুঝি ভূতের ভয় পাও? আমি তো রাতবিরেতে কত কত জায়গায় ঘুরে বেড়াই। একটুও ভয় করে না তো!

তুই তো একটা কিম্ভূত। হ্যা বড়মা, তুমি তো বিশ্বাস করো, না কি? তুমি তো আর বিজুদার মতো নাস্তিক নও।

বিজু কি নাস্তিক নাকি?

ও বাবা, বিজুদা নাস্তিক নয়? বলো কী? ভীষণ নাস্তিক। ভগবান মানে না, ভূতপ্রেত মানে না। আমাকে কী বলেছে জানো? ভূতের ভয় পেলে রামনাম না করে কার্ল মার্ক্সের নাম করতে। ওর মুখে কিছু আটকায় না।

ও ওইরকম সব বলে। সেদিন তো দেখলুম শ্যামল দত্তর বাড়িতে দিব্যি নারায়ণ পুজো করে এল। নাস্তিক বলে মনে হল না তো। শ্যামলদের বাড়িতে যার পুজো করার কথা ছিল সেই পুরুতঠাকুরের ম্যালেরিয়া হওয়ায় বিজুকে ধরে এনেছিল।

সে তো আমাদের বাড়িতেও কতবার করেছে। ও তো বলে দক্ষিণা পাই বলে পুজো করি, ভক্তি- টক্তি থেকে তো করি না। বোকা লোকেরা ভগবানের নামে গাঁটগচ্চা দিতে চাইলে আমার কী করার আছে! ও বড়মা, বলো না, তুমি তো ভূতে বিশ্বাস করো।

ওমা, তা করব না কেন?

তা হলে ভয় পাও না কেন বলো তো!

তা তারা তাদের মতো আছে, ভয় পাওয়ার কী হল? এই তুই আছিস, আমি আছি, গাছপালা, পাখিপক্ষী, গোরু ছাগল যেমন আছে তেমনই তারাও আছে। ভয়ের তো কিছু নেই।

আহা, যদি দেখা দেয় তখন?

অত ভাগ্য কি করে এসেছি রে! তোর জ্যাঠা চলে যাওয়ার পর কি কম চেষ্টা করেছি তাকে একবার চোখের দেখা দেখবার! কত নিশুত রাতে জেগে বসে থেকেছি একা ঘরে। কত ডেকেছি তাকে মনে মনে।

বাবা গো! শুনেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

হ্যাঁ রে, আমি মরলে আমাকে কি তোর দেখতে ইচ্ছে করবে না?

পান্না কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, ওসব বোলা না তো, ভাল লাগে না। মরবে কেন? একদম মরতে পারবে না বলে দিচ্ছি। আজ থেকে কেউ তোমরা আর মরবে না বলে রাখলাম। এখন থেকে সব্বার মরা বারণ।

হেসে পান্নাকে বুকে টেনে নিয়ে বলাকা বলে, ভূতের ভয়ে সবাইকে অমর করে দিলি বুঝি! তা হলে যে বুড়ো-বুড়িতে দুনিয়া ভরে যাবে। খুনখুনে থুত্থুরে বুড়োবুড়ি চারদিকে থিকথিক করবে সেই বুঝি ভাল?

সে আমি জানি না। আজ থেকে সকলের মরা বন্ধ।

দিনের বেলাটা একরকম কাটিয়ে দিতে পারে পান্না। কিন্তু যেই সন্ধেটি হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগিয়ে আসে, আর শীতের কুয়াশা মাঠঘাট থেকে সাদাটে শরীর নিয়ে পাক খেয়ে উঠে আসতে থাকে, আর শকুনের ডানার মতো নেমে আসে অন্ধকার তখনই বুকের ভিতরে ভয় খামচে ধরে তাকে।

এ সময়ে যে কেন লোকে এত সত্যনারায়ণের পুজো করে কে জানে বাবা। আজ বাড়িসুদ্ধ সকলের নেমন্তন্ন ছিল মরণদের বাড়িতে। পান্না যাবে না, তার পরীক্ষার পড়া। মা বলল, তা হলে তোর গিয়ে কাজ নেই। তুই

বরং ঘরে বসে পড়। সুদর্শন আছে, বাসন্তী কাজ করছে, তোর বাবাও এসে পড়বে খন। সন্ধে রাত্তিরে তো আর ভয় নেই।

পান্না স্বীকারও হয়েছিল। কিন্তু কে জানত আজই বাসন্তী কাজ সেরে বেলাবেলি চলে যাবে, বাবার আসতে দেরি হবে এবং সুদর্শনের পাত্তা পাওয়া যাবে না! যখন কপাল খারাপ হয় তখনই এরকম সব ঘটনা ঘটে। সন্ধে ছটা নাগাদ পড়া ছেড়ে উঠে কুঁজো থেকে জল গড়ানোর সময় হঠাৎ সে বাড়ির আঙিনায় সন্দেহজনক নির্জনতাটা টের পেল। বারান্দায় এসে বাসন্তীকে ডাকল। তারপর সুদর্শনকে। কেউ সাড়া দিল না। গোটা বাড়িটা ছমছম করছে। সে একা।

কী করে এখন পান্না! ছুটে গিয়ে পাশের বাড়িতে হাজির হবে? তা হলে বাড়ি খালি পড়ে থাকবে। মা টের পেলে কুরুক্ষেত্র হবে। বাড়ি নির্জন হলেও আশপাশের বাড়ি থেকে অবশ্য লোকজনের গলা পাওয়া যাচ্ছে। পথে লোক চলাচলও আছে। কিন্তু সেটা তো কোনও ভরসা নয়। এ-বাড়ির মধ্যে সে একা। অসহায়। চারদিকে প্রকৃতির রসায়নে এক অদ্ভুত বিক্রিয়া ঘটে যাচ্ছে। বাস্তবের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে পরাবাস্তব। দিনের বেলায় যারা ঘুমিয়ে ছিল তারা জেগে উঠছে। উঠে আসছে। আর পুবের আকাশে কুয়াশার মায়াজালে জড়ানো পূর্ণিমার চাঁদ ম্যাজিক লণ্ঠনের মতো দুলতে দুলতে একটু একটু করে ওপরে উঠছে ওই।

কী করবে এখন পান্না! খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠবে? কেঁদে ফেলবে? অজ্ঞান হয়ে যাবে?

হাই!

পান্নার হার্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই কয়েক সেকেন্ডের জন্য। পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল সে। অবশ্য বেশিক্ষণ নয়।

ভগবান বলে কিছু একটা তো আছেই। কেউ একজন। নইলে কি এমন হয়? উঠোনে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সোহাগ।

সোহাগকে দেখলে সে খুশি হয় বটে, কিন্তু আজ সে চিৎকার করে যে লাফটা দিল সেটা শুধু খুশির নয়, উল্লাসের। উঠোনে নেমে সে প্রায় জাপটে ধরল সোহাগকে।

উঃ সোহাগ! বাঁচলাম বাবা! শিগগির ঘরে এসো। একা একা আমার যা ভয় করছিল না!

সোহাগ হেসে ঘরে এল। বলল, একা তোমার ভয় করে বুঝি! ইউ ডোন্ট এনজয় লোনলিনেস!

না বাবা, না। একা থাকতে আমার একটুও ভাল লাগে না।

খুব সুন্দর করে হাসল সোহাগ। বলল, লোনলিনেস-এর মতো এত ভাল আর কী আছে বলো তো। আমার তো একা থাকতেই সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে।

তোমার ভাই ভীষণ সাহস। মাঝরাতে উঠে একা একা মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াও। আমি তো ভয়েই মরে যাব।

তোমার খুব ভূতের ভয়, তাই না?

ভূত তো আছেই। পাগল, মাতাল, বদমাশ আমার যে কত ভয়। সবচেয়ে বেশি ভূত।

আমার তো ভূতকে ভীষণ পছন্দ।

মাগো! মরেই যাব।

ভূত হল হিস্টরি। আমি যখন মাঝরাতে একা একা ঘুরে বেড়াই তখন আমার সবসময়ে মনে হয়, আমার চারপাশে ওরা সব রয়েছে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। আজ অবধি যারা জন্মেছে এবং মরে গেছে তারা সবাই।

খুব বন্ধুর মতো লাগে তাদের। তারা আশেপাশেই আছে, কিন্তু ডিস্টার্ব করে না, শুধু সঙ্গে থাকে। আমি খুব ফিল করি তাদের। অনেক সময়ে তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করার চেষ্টাও করি।

করো?

হ্যাঁ তো।

কথা বলে তোমার সঙ্গে?

কী জানি? হয়তো বলে। ঠিক বুঝতে পারি না। একদিন মার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছিল। রাগ করে রাতে বেরিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ির পাশের বাঁশঝড়টা পেরিয়ে একটা মাঠের মতো উদোম জায়গায় অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। সেদিন আমার কেমন যেন একটা আনক্যানি ফিলিং হয়েছিল। খুব মনে হচ্ছিল আমার কাছ ঘেঁষেই কে যেন বসে আছে।

ও মা গো!

ভয়ের কী বলো। পৃথিবীতে তো কত কী আছে আনএক্সপ্লেইনড, আনএক্সপ্লোরড।

চেঁচাওনি?

না। আমার কেমন একটা ঘোরের মতো অবস্থা হল। আমি তখন ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? কী চাও? তুমি কীরকম একজিস্টেন্স? তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

কী বলল?

প্রথমে কিছু নয়। তারপর হঠাৎ আমিও একটা হুইসপার শুনতে শুরু করলাম। সামওয়ান ওয়াজ টেলিং মি সামথিং। কিন্তু স্পষ্ট নয়। অস্পষ্ট, স্ট্যাটিকের আওয়াজের মতো। মনে হল যে কথা বলছে সে একটা মেয়ে। কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না ঠিকই কিন্তু যেন খুব জরুরি গলায় বলে যাচ্ছে। মেয়েটা আমাকে কিছু বলতে চাইছে। আমি বুঝতে পারছি না। তখন খুব দুঃখ হচ্ছিল আমার। ওদের ল্যাংগুয়েজ কে আমাকে শেখাবে বলো।

পান্না হাঁ করে শুনছে। তার দুটো হাত শক্ত মুঠি পাকিয়ে আছে। সোহাগকে তার জোয়ান অফ আর্ক বা ঝানসির রানির চেয়ে কম বলে মনে হচ্ছে না।

পরে দাদুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এরকম হয় কি না। দাদু বলেছিল, হতেই পারে। তবে দাদুর ওরকম কোনও অভিজ্ঞতা নেই।

কাউকে দেখতে পেলে না?

না। হয়তো দেখার জন্য আরও কিছু প্র্যাকটিসের দরকার হয়। আমার তো তা নেই।

বিজুদাকে তোমার গল্পটা বোলো তো। বিজুদা না কিছু বিশ্বাস করতে চায় না।

তোমার বিজুদা তো একজন হিরো। হিরোরা সহজে হার মানতে চায় না।

বিজুদার ওপর তোমার খুব রাগ, তাই না?

না তো! তবে হিরোদের আমি খুব একটা পছন্দ করি না।

আহা, বিজুদার কী দোষ বলো। তোমার পিছনে বদমাশ ছেলেরা লেগেছিল দেখে আমিই বিজুদাকে বলে দিই। তাই বিজুদা ওদের একটু শাসন করেছিল। আগ বাড়িয়ে তো কিছু করেনি। দোষ তো আমার।

সোহাগ মুখ টিপে হেসে বলে, তুমি বিজুদাকে খুব ভালবাসো, না?

ওঃ, ইয়েস। বিজুদা ইজ এ নাইস নাইস নাইস ম্যান। একদিন ভাল করে আলাপ করলেই বুঝতে পারবে। ওর ঘরে একটা চড়াইপাখি মরে গেল বলে কী মন খারাপ! দুদিন দাড়ি কামায়নি। একটা চড়াইপাখির জন্য কে এত ভাবে বলো!

ওকে! লেট আস লিভ বিজুদা অ্যালোন। জানো তো, এখন থেকে আমরা প্রত্যেক উইকএন্ডে গ্রামে বেড়াতে আসব বলে ঠিক হয়েছে!

ওমা! তাই? আর তোমার মা-বাবার সেই ব্যাপারটা?

একটা সেটেলমেন্ট হয়েছে। দে আর নাউ স্লিপিং ইন সেম বেড। পরে কী হবে বলা যায় না। কিন্তু এখনকার মতো ধামাচাপা।

তাই তোমায় আজ ব্রাইট দেখাচ্ছে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সোহাগ বলে, হবে হয়তো। বড়রা যখন ঝগড়া করে তখন আমার খুব ইন্স্যাচিওর মনে হয়। কেন ঝগড়া হয় বলো তো!

আমার মা-বাবার মধ্যেও মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়। তবে বাবা একদম ঝগড়া করতে পারে না। না খেয়ে বেরিয়ে যায়।

দুজনে খুব হাসল।

এই এত বইখাতা ছড়িয়ে কী করছিলে এতক্ষণ!

পড়ছিলাম। সামনে পরীক্ষা না!

এ মা! তা হলে তো আমি এসে তোমাকে ডিস্টার্ব করলাম।

তুমি এসে আমাকে বাঁচিয়েছ। এ বাড়িতে কী হচ্ছে জানো না তো! সাংঘাতিক কাণ্ড! ভয়ে আমি দিনরাত কাঁটা হয়ে আছি।

মাই গড! কী বলো তো!

আমাদের একজন নতুন রান্নার লোক রাখা হয়েছে। সুদর্শন। লোকটা না নানারকম তন্তরমন্তর জানে। নিশুতরাতে নাকি ভূত নামায়। আর তখন এ-বাড়ির আনাচে-কানাচে গিজগিজ করে ভূত।

চোখ গোল গোল করে শুনছিল সোহাগ। বলল, তোমরা ভূত দেখেছ বুঝি?

পাগল! দেখলেই আমি অক্কা পাবো ভয়ে। কিন্তু অনেকে দেখেছে। তারা নাকি বোঁটকা গন্ধও পেয়েছে।

ভূতের কি গন্ধ থাকে?

সবাই তো তাই বলে।

লোকটা ফ্রড নয় তো?

না বাবা, লোকটা তুকতাক জানে ঠিকই। কিন্তু স্বীকার করে না।

সোহাগ ঠাট্টা করল না, হেসে উড়িয়ে দিল না। বরং গম্ভীর মুখ করে বলল, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে? আমি ওর কাছ থেকে শিখতে চাই।

তোমার ভাই দুর্জয় সাহস। আমি তো মাকে বলেছি লোকটাকে তাড়িয়ে দিতে।

না না, তাড়িও না। এরকম লোক খুঁজলে পাওয়াই যাবে না আর। ডাকো তো লোকটাকে!

কিন্তু সুদর্শনকে ডেকে পাওয়া গেল না। বোধহয় দোকানপাটে গেছে, কিংবা আড্ডা মারছে কোথাও।

পঞ্চান্ন

এতদিন তার কোনও স্বদেশ ছিল না। স্বদেশের বোধও ছিল না। থাকার কথাও নয়। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে এক দেশ থেকে আর এক দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাকে। কখনও ফরাসি, কখনও জার্মান, কখনও ইংরিজি ভাষা বলতে শিখেছে। দুই ভাই-বোন বুঝতেই পারত না কোনটা তাদের আসল ভাষা। হ্যাঁ, ঠিক বটে, তাদের মা-বাবা নিজেদের মধ্যে অনেক সময়েই বাংলা বলত। বিশেষ করে ঝগড়ার সময়। সেই ভাষা তারা অল্প-অল্প বুঝতে পারত বটে, কিন্তু মা বা বাবা তাদের বাংলা শেখানোর চেষ্টাই করত না কখনও। যখন আমেরিকায় সোহাগ স্কুলে ভর্তি হল তখন আমেরিকান ইংরিজি হল তার মাতৃভাষার মতো। আর তখন আমেরিকাকেই তার স্বদেশ বলে মনে হত। দিস ইজ মাই কান্ট্রি— কতবার একথা মাকে বলেছে সে। সে বুঝতে পারত তার মা-বাবা ঠিকঠাক ইংরিজিটা বলতে পারে না, হোঁচট খায়। বিশেষ করে মা। একদিন সে মাকে বলেছিল, তোমরা এত খারাপ ইংরিজি বলো কেন? মা বলল, আমরা তো তোর মতো আমেরিকান হয়ে যাইনি। আমরা বাপু ভেতো বাঙালিই আছি।

দ্বন্দ্বের শুরু সেখানেও, বুঝতে পারত, সে আমেরিকান হলেও তার মা-বাবা তা নয়। বেশ কিছুদিন এদেশে থাকার পরেও তার মা বা বাবা আমেরিকার অনেক কিছুই বুঝতে পারত না। যেমন জ্যাজ বা রক, যেমন রেয়ার স্টেক বা যৌন ব্যবহার। দুই ভাই-বোনের সঙ্গে মা বাবার একটা ব্যবধান রচিত হচ্ছিল ধীরে ধীরে। যেন তীরের নোঙর ছেড়ে নৌকো চলে যাচ্ছে মাঝদরিয়ার দিকে।

এতদিনে আমেরিকাই দুই ভাই-বোনের দেশ হয়ে যেত পুরোপুরি। হল না। তার কারণ একটা অদ্ভুত ঘটনা। একটি কালো মেয়ে আসত তাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে। আগে যে ছিল তার মায়ের ডোমেস্টিক হেলপা সাদা কথায় ঝি। মোনার শরীর খারাপ ছিল বলেই রাখা হয়েছিল তাকে। গাড়ি করে আসত, ঘণ্টা দুয়েক অসুরের মতো খেটে কাজকর্ম করে ঘরদোর পরিষ্কার আর ফিটফাট সাজিয়ে রেখে চলে যেত। একদিন তার মা-বাবা হিসেব করে দেখল মেয়েটার জন্য প্রচুর ডলার বেরিয়ে যাচ্ছে। মোনা বলল, ওকে ছাড়িয়ে দাও। আমি কাজ করতে পারব। ছাড়িয়ে দেওয়ার পরও যে আসত সোহাগের আকর্ষণে, সবাই ভেবেছিল হয়তো মায়া পড়ে গেছে, তাই আসে।

সেই মেয়েটিই একদিন সোহাগকে তুলে নিয়ে যায়। গাড়ি করে সোজা যে জায়গায় তাকে নিয়ে তুলেছিল মেয়েটি সেটা একটা খোলা, আবরণহীন মাঠ। কিছু আগাছার জঙ্গল আছে। সেখানে স্বল্পবাস বা নগ্ন বিশ-পঁচিশজন মেয়ে আর পুরুষ। কয়েকটা বাচ্চাও ছিল। সকলেরই বড় বড় চুল, নখ, পুরুষদের দাড়ি আর গোঁফ। দু-চারজন সামান্য জামাকাপড় পরলেও সেগুলো ছিল ভীষণ নোংরা আর ছেঁড়া। কেউ সাবানটাবান মাখত না। কাছে একটা বড় ঝিল মতো ছিল, সেখানেই চান করত। টয়লেট ছিল না। সকলেই প্রকাশ্যে মলমূত্র ত্যাগ করত। খোলাখুলি যৌন মিলনও হত সেখানে, বাচ্চাদের সামনেই। শুধু নারী-পুরুষ নয়, মেয়েতে মেয়েতে,

ছেলেতে ছেলেতে। ভয়ে, লজ্জায়, ঘেন্নায় সোহাগ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলত। ওরা কিছু বলত না তাকে। নির্বিকার। খাবার দিত ভুট্টা সেদ্ধ আর গোরুর মাংস, ফল-টল।

তাকে শেখানো হয়েছিল, একমভাবে থাকাই হল ন্যাচারাল লিভিং। এই থাকার মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা নেই। আদিম কালের মানুষ এভাবেই থাকত এবং তখনই ছিল তারা সবচেয়ে সুখী।

বৃষ্টি বা রোদ কোনওটা থেকেই তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করত না। নির্বিকারভাবে থাকত। সোহাগকে ন্যাংটো করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখত তারা। বলত, ফিল দি আর্থ, দি উইন্ড, দি অ্যাটমোসফিয়ার। জামা কাপড় জুতো আমাদের সঙ্গে জগতের দূরত্ব সূচনা করে। কিছুদিন এইরকম আদিম জীবনযাপন করলে তুমি প্রকৃতিকে অনেক গভীরভাবে বুঝতে পারবে। ভূমিকম্প হবে কিনা, ঝড়-বৃষ্টি হবে কিনা, বন্যা হবে কিনা তা আদিম মানুষ তাদের অত্যাশ্চর্য অনুভূতি দিয়ে টের পেত, যেমন পায় কাঠবেড়ালি, বানর, টিকটিকি বা পিপড়ে। যন্ত্রসভ্যতার দাস হয়ে মানুষ সেই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। পৃথিবীকে অনুভব করার চেষ্টা করো, তোমার সামনে সত্য উদ্ঘাটিত হবে।

কথাগুলো কিছু বুঝতে পারত না সোহাগ। সে হাঁ করে চেয়ে থাকত। কাঁদত, অস্থির হত, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত ঘাসের ওপর। তার শরীরে চুলকুনি হচ্ছিল, দাদের মতো চক্কর দেখা দিচ্ছিল চামড়ায়, চুলে জট, দাঁত মাজতে পারত না বলে মুখে বিচ্ছিরি গন্ধ।

সন্ধের পর ক্যাম্পফায়ার। সবাই বিশাল এক বৃত্ত রচনা করে বসত। মাঝখানে আগুন জ্বলছে। দুর্বোধ্য জঙ্গলের ভাষায় সবাই মিলে কী বলে যাচ্ছে কে জানে। জেনি নামে একটি মেয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে ঘুরে ঘুরে শুরু করত নাচ। তার নগ্ন শরীরে আগুনের কাঁপা কাঁপা আলো। বিভোর হয়ে তালহীন ছন্দহীন ঢেউ-ঢেউ একটা নাচে তার শরীর টলতে টলতে ঘুরতে থাকত। ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ছিটকে পড়ত ঘাসের ওপর। কেউ দৌড়ে যেত না, ধরে তুলত না। নির্বিকারভাবে তাদের সুরহীন মন্ত্র বলে যেতে থাকত।

জেনি বলত তার ট্রান্স হয়। তার মানে বোঝেনি সোহাগ। জেনি তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে একদিন বলল, তোমাকে দেখে মনে হয় তোমারও হবে। মহান প্রেত যার তার ওপর ভর করে না।

জেনিই শেখাল সোহাগকে তার অদ্ভুত মন্ত্র, নাচ। মিথ্যে বলবে না সোহাগ, ওই অদ্ভুত মানুষদের মধ্যে যে কয়দিন ছিল তার মধ্যে ওই একটা জিনিসই ভাল লেগেছিল তার। অর্থহীন অদ্ভুত সব শব্দ বলতে বলতে ঘুরে ঘুরে নাচ। নাচতে নাচতে হঠাৎ মাথা অন্ধকার করে পড়ে যাওয়া। ওরা বলত ট্রান্স। হতে পারে সোহাগ তখন অপুষ্টিজনিত কারণে দুর্বল বলেই তার মাথা অন্ধকার হয়ে যেত। শুধু শরীর কেন, কেঁদে কেঁদে তার মনটাও তো তখন দুর্বল।

কতদিন তাকে ওই জীবনযাপন করতে হবে বুঝতে পারত না সে। শুধু ভয় পেত, সে জংলি হয়ে যাচ্ছে, অসভ্য বর্বর হয়ে যাচ্ছে, ডাইনি হয়ে যাচ্ছে। নিজের গায়ের চিমসে গন্ধে তার নিজেরই বমি পেত। গা চুলকোতে গেলে বড় নখের কোলে উঠে আসত কালো ময়লা। ওই ভূমিখণ্ডের চারপাশে ছিল র‍্যাটল সাপ আর কাঁকড়াবিছের আস্তানা। প্রায়ই একটা দুটো সাপ দেখা যেত। ঘাসের ওপর চিড়বিড় করে হেঁটে বেড়াত বিছে। ওরা মারত না। কিন্তু ভয়ে রাতে ঘুমোতে পারত না সে। ঘুমোতে পারত না খোলা আকাশের নীচের ঠান্ডায়। বৃষ্টি হলে তো আরও দুর্দশা।

কতদিন কেটেছিল কে জানে। হিসেব নেই। তারপর একদিন সকালে হঠাৎ একটা হেলিকপ্টার এল। চক্কর দিতে লাগল তাদের মাথার ওপরে। দলের আধবুড়ো একটা লোক আকাশের দিকে চেয়ে বলল, দ্যাট চপার ইজ ব্যাড নিউজ, দে আর লুকিং ফর দ্যাট কিড। ওকে ফেরত দিয়ে এসো, নইলে পুলিশ আমাদের ছিঁড়ে খাবে।

যে মেয়েটি নিয়ে গিয়েছিল তাকে সে-ই দুপুরবেলা গাড়ি করে তাকে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

পুরনো অভ্যস্ত জীবনে ফিরে এল সোহাগ। ফিরল, আবার ঠিক ফিরলও না। তার অস্তিত্বের একটা খণ্ড যেন রয়ে গেল ওই উন্মার্গগামী, আধপাগলা, যাযাবর মানুষগুলোর সঙ্গে, যারা পুলিশ তাড়া করলেই নিজেদের অস্থায়ী আস্তানা ছেড়ে ভাগ ভাগ হয়ে পালিয়ে যায়। ফের সংকেতমতো জড়ো হয়ে যায় কোথাও কোনও লক্ষ্মীছাড়া জায়গায়। হয়তো একটা ভুল জীবনই যাপন করে তারা, কিন্তু অবস্থান করে প্রকৃতির খুব কাছাকাছি। খাওয়ার কষ্ট, শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট, পোকামাকড় বা মশার কামড়, রোগ- ভোগ সব সহ্য করেও একটা আনন্দও কি পায়?

সোহাগ ফিরে এল বটে, কিন্তু সেই সোহাগ নয়। মাত্র কয়েকদিনের এই অদ্ভুত জীবন তাকে বয়ঃসন্ধিতেই যেন সাবালিকা করে দিয়েছিল। ছেলেবেলাটাই যেন হারিয়ে গেল তার। একটু গম্ভীর, একটু বিষন্ন, একটু অন্তর্মুখী। ওই বন্ধুর পতিত ঊষর ভূখণ্ডে, আদিম জীবনযাপনের স্মৃতি সুখকর ছিল না মোটেই। তবু ফিরে আসার পর সে কখনও কখনও একটা আকর্ষণও অনুভব করত ওই জীবনের প্রতি। কেন, কে জানে!

পুলিশ তাকে কয়েকদিন ধরে জেরা করেছিল। ওরা মারধর বা ধর্ষণ করেছে কিনা তাকে, সম্মোহিত করেছে কি, কোনও গুপ্তবিদ্যা শিখিয়েছে কিনা, কোনও রাজনৈতিক মতবাদ ঢুকিয়েছে কিনা মাথায়, সন্ত্রাসবাদে দীক্ষা দিয়েছে কিনা, ড্রাগ ধরিয়েছে কিনা ইত্যাদি। সে কিছু গোপন করেনি বটে, কিন্তু মনে মনে চায়নি, ওরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ুক। পুলিশ বারবারই বলত, দে আর দি ভুডু পিপল। দে প্র্যাকটিস ব্ল্যাক ম্যাজিক।

ওই ঘটনার পরই তার বাবা আমেরিকা থেকে তল্পিতল্পা গুটোতে লাগল। বলল, আর বিদেশে নয়।

গল্পটা তার মুখে সন্ধ্যা অন্তত দশবার শুনেছে। তবু আবার শোনে, আর চোখ গোল করে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে, ধন্যি তোর সাহস!

না পিসি, সাহসের কাজ তো কিছু করিনি! ওরা তো জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

না রে মেয়ে, তোর সাহসও আছে। ওরা তোকে এখনও চিঠি দেয় বুঝি?

ই-মেল জিনিসটা কী তা অনেক কষ্টে পিসিকে বুঝিয়েছে সোহাগ। আজকাল ব্যাপারটা অনেকটাই বুঝতে পারে সন্ধ্যা। গাঁয়েগঞ্জেও একটা-দুটো করে কম্পিউটার দেখা দিচ্ছে ইদানীং।

হ্যাঁ তো।

কী লেখে রে?

লেখে, পৃথিবীর যেখানেই তুমি থাকো, তুমি আমাদেরই লোক। চিরকাল তুমি আমাদেরই লোক থাকবে। মনে রেখো আদিম মানুষেরাই ঠিকভাবে বাঁচতে জানত। তারাই টের পেত বেঁচে থাকার গভীর আনন্দ। মানুষদের জড়ো করো, সভ্যতার কৃত্রিমতা থেকে দূরে নিয়ে যাও, বাঁচতে শেখাও এক মুক্ত জীবনে। চারদিকে ছড়িয়ে দাও আমাদের আনন্দের বীজ। তোমাকে আমরা ভুলিনি, তুমিও আমাদের ভুলে যেও না।

হ্যাঁ রে, তোকে ওরা আবারও চুরি করবে না তো! চারদিকে আজকাল নাকি খুব ছেলেধরার উৎপাত। মানুষজনকে হুটহাট তুলে নিয়ে যায়।

না পিসি, ওদের অত ক্ষমতা নেই, তবে কে জানে, আজও আমরা আমেরিকায় থাকলে আমিই হয়তো ওদের খুঁজে বের করতাম!

ওমা! খুঁজে বের করে কী করবি?

সোহাগ সন্ধ্যার করুণ মুখ দেখে হেসে ফেলে। মাথা নেড়ে বলে, মাঝে মাঝে উইকএন্ডে গিয়ে ওদের সঙ্গে একটু অন্য স্বাদের জীবন কাটিয়ে আসতাম।

মাগো! এই যে বলিস ওরা ন্যাংটা হয়ে থাকে, যা-তা খায়।

হ্যাঁ তো। ওইটেই তো মজা!

দুর পাগলি! তুই একটা কী রে? ওসব অসভ্যদের কথা একদম ভাববি না। শুনলে আমারই কেমন গা গুলোয়। হ্যাঁ রে, তোর শহব-টহর একদম ভাল লাগে না, না? গাঁ-গঞ্জ, গাছপালা ভাল লাগে?

ঠিক ভাললাগা নয় পিসি, প্যাশন। গাছপালার মধ্যে আমার কখনও ভয় করে না। আমাকে যদি সুন্দরবনের বাঘের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দাও তাহলেও আমার একটুও ভয় করবে না। আমি মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াব।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্ধ্যা বলে, তাহলে তোকে ওরা মন্তবই করেছে।

সোহাগ হেসে বলে, করেছেই তো।

তুই সত্যিই মন্ত্র জানিস?

শব্দগুলো জানি। মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু অর্থ জানি না।

মন্ত্র পড়লে কী হয়?

শব্দগুলো উচ্চারণ করতে করতে মাথাটা কেমন ধোঁয়াটে হয়ে যায়। তারপর কেমন যেন শরীরে সাড় থাকে না।

জ্বলজ্বলে চোখে সন্ধ্যা চেয়ে থেকে বলে, আমাকে শেখাবি?

কেন শেখাব না? সত্যি শিখবে?

সন্ধ্যা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে একটু ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, না বাবা, কী থেকে কী হয়ে যাবে। মাথা গুলিয়ে গেলে আমার ব্যবসা লাটে উঠবে। তখন খাব কী বল? একা মানুষ, কে দেখবে আমাকে! সংসারের তো ভরসা নেই। যতদিন বাবা আছে ততদিনই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক। বাবা চোখ বুজলে ঠিক তাড়িয়ে দেবে।

কেন পিসি, ওভাবে বলছ কেন? বড়মা, জেঠু এরা তো কত ভাল।

সন্ধ্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে তোদের কাছে ভাল। লোক বুঝে লোকে ভাল হয়, বুঝলি? এখনও তো বড় হোসনি, সংসারের সব প্যাঁচ বাইরে থেকে বুঝতে পারবি না। তার ওপর আমার তো আবার পোড়া কপাল, স্বামীর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। শ্বশুরবাড়ি ফেরত মেয়েদের কেউ ভাল চোখে দেখে না। সবাই ভাবে, নিশ্চয়ই চরিত্রের দোষ ছিল, না হলে ঝগড়ুটে বজ্জাত, নইলে গোপন রোগ আছে, না হলে বাঁজা, নইলে

তাড়াবে কেন! এদেশে যত দোষ তো মেয়েদের ঘাড়েই চাপে কিনা। এসব এখন বুঝবি না, বড় হলে তখন টের পাবি। সাধে কি আর উদয়াস্ত খেটে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি!

মুখটা করুণ হয়ে গেল সোহাগের। বলল, হ্যাঁ পিসি, তুমি লেখাপড়া করলে না কেন?

সন্ধ্যা হেসে ফেলে বলল, ওরে আমি হলাম অমল রায়ের অপদার্থ বোন। একই মায়ের পেটে জন্মে তোর বাবার কী মাথা! আর আমার মাথায় গোবর। রোজ চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করেও আকবরের বাবার নাম মনে থাকত না। কী ভাল লাগত জানিস? আজকালকার মেয়েরা শুনলে হাসবে। আমার ভাল লাগত সংসার করতে। মায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সংসারের যাবতীয় কাজ করতাম। খুব ভাল লাগত। মনে হত নিজের সংসার যখন হবে তখন এমন গুছিয়ে কাজ করব যে, বাড়িতে লক্ষ্মীশ্রী ফুটে থাকবে। বেশি আশা করেছিলাম তো, তাই সংসারই হল না আমার।

আচ্ছা পিসি, তুমি তো আবার বিয়ে করতে পারো!

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বলল, না রে পারি না। ভাইঝি হলেও তুই তো আমার বন্ধুর মতোই হয়ে গেছিস। তোকে লুকোব কেন? আমার চেহারাটা তো কারও নজরে পড়ার মতো নয়! তার ওপর বয়সও তো বসে নেই। একজন ঘুরঘুর করে আসে, বিয়ের কথাও বলে। সে আমাদের স্বজাতি বামুন নয়। বাবাকে তার কথা বলেছিলাম। বাবা শুনে চুপ করে অনেকক্ষণ ভেবে বলল, দ্যাখ মা, ট্র্যাডিশন যদি ভাঙতে চাস ভাঙবি। তোর জীবনটা তো স্বাভাবিক নয়। কিন্তু কী জানিস, এক ধাপ নেমে যদি বাঁচতে পারিস তবে নামার একটা অর্থ হয়। ভাল করে ভেবে দ্যাখ, বিয়েটা এখন তোর কতটা প্রয়োজন। যদি তেমন প্রয়োজন না বুঝিস তবে খামোখা ঝঞ্ঝাট ডেকে আনবি কেন?

তুমি কী বললে?

আমি অনেক ভেবে দেখলাম, বাবা ঠিকই বলেছে। আমার বিয়ের আর তেমন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এই যে কাজকর্ম নিয়ে সকাল থেকে রাত অবধি কেটে যায় এতেই বেশ আনন্দে আছি। সঙ্গে আর একটা মানুষ জুটলে তারও তো কিছু বায়নাক্কা থাকবেই। এখন হয়তো আমার আর সেসব সইবে না।

তুমি তা হলে কুমারীই থেকে যাবে?

দুর বোকা! আমি যে হিন্দুমতে সধবা। বর তো দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে। আবছা করে হলেও এখনও রোজ সিঁদুর পরি। বামুনের মেয়ে তো, তাই এখনও ওসব ঘুচিয়ে দিতে পারিনি। যদিও সত্যি বলতে শাঁখা-সিঁদুরের মহিমা কিছু আছে বলে মনেই হয় না আমার। সব ভণ্ডামি।

তুমি কিন্তু বেশ লিবারেটেড উওম্যান। সেইজন্যই তোমাকে আমার এত ভাল লাগে।

দুর মুখপুড়ি! পেটে বিদ্যে নেই, মাথায় বুদ্ধি নেই, গতরে খেটে খাই, আমাকে নিয়ে অত বড় বড় কথা বলতে আছে?

বুদ্ধি না থাকলে কি ব্যবসা করতে পারতে? অ্যান্ড ইউ আর আর্নিং এ লট নাউ।

ওরে চুপ চুপ! জোরে বলিসনি। বেশি রোজগার করি শুনলে চারদিকে চোখ টাটাবে। তবে আমার বুদ্ধি বলতে ওইটুকুই, লোকের পছন্দমতো জিনিস বানাও আর টাকা কামাও। ঠাকুরের দয়ায় টাকা কিছু হয়েছে। তোর বিয়েতে তোকে একটা নেকলেস দেব, দেখিস।

যাঃ, বিয়ে কে করবে?

তবে কি পিসির মতো লক্ষ্মীছাড়া জীবন কাটাবি? ও কথা ভাবা ভাল নয়। বরং অল্প বয়সে একটা সুন্দর ভাল ছেলেকে বিয়ে করে ফেল, সুখে থাকবি।

আমার কারও সঙ্গে বনিবনা হবে না পিসি। আমি একটু অদ্ভুত আছি তো।

কে বলল তুই অদ্ভুত?

সবাই বলে। আমার মা-বাবা অবধি।

তোর যেটুকু অদ্ভুত সেটুকুই ভাল। পাঁচজনের মতো গড়পড়তা হয়ে লাভ কী?

তুমি আমার সব কিছুই ভাল দেখ, না?

সন্ধ্যা ম্লান হাসল। তারপর ধরা গলায় বলল, তোর ওপর আমার কেন যে এত মায়া! কে জানে, আর জন্মে বোধহয় আমার মেয়ে ছিলি।

এই কথাটা অনেকক্ষণ রিনরিন করল সোহাগের কানে। অনেকক্ষণ। পিসির হাহাকার, একাকিত্ব, ব্যর্থতা যেন ওই কথার মধ্যে ঘন হয়ে আছে।

বিকেলে পান্না তাকে বলল, তোমাকে বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

হাসল সোহাগ, এখানে এলেই আমি ভাল থাকি।

কিন্তু এটা তো একটা ধ্যাধধেড়ে গোবিন্দপুর। ম্যাগো, কী আছে বলো তো এখানে! আমার তো কলকাতায় চলে যেতে ইচ্ছে করে খুব।

আমার ঠিক উলটো। আমার তো কোনও দেশ ছিল না, জানো তো! কোনটা আমার দেশ, দেশ মানে কী তা বুঝতামই না। এক সময়ে আমেরিকা খুব ভাল লাগত। তারপর ফের একটা ভ্যাকুয়াম। মেট্রোপলিটান সিটিগুলো তো কারও দেশ হতে পারে না। তাই কলকাতা কখনও আমার দেশ হয়নি।

আহা, এটা তো তোমার দেশই। কিন্তু আমাদের গ্রামটায় কী আছে বলো!

ওটা একটা ডিসকভারির ব্যাপার। তোমাকে আবিষ্কার করতে হবে।

কীভাবে?

তা জানি না। আমি শুধু জানি, ফিল করি, এটা আমার জায়গা।

বড় বড় চোখে পান্না বলে, করো?

সোহাগ একটু লাজুক হেসে বলে, এখন করি।

না বাবা, এই ভুতুড়ে গাঁ ছেড়ে আমি বরং একটা জমজমাট শহরে চলে যেতে চাই, যেখানে অনেক আলো, অনেক লোকজন, অনেক হইচই।

ভূত যদি থেকেই থাকে তা হলে তাদের মধ্যে তো আমার আনসেস্টররাও থাকবে। তাদের সঙ্গে দেখা হওয়া তো ভীষণ রোমান্টিক।

ওরে বাবা! এখন দাদু এসে সামনে দাঁড়ালে যে আমার হার্টফেল হয়ে যাবে।

দাদু এসে সামনে দাঁড়াল না, পান্নারও হার্টফেল হল না। কিন্তু এই সময়ে দরজায় এসে যে লম্বা ছিপছিপে লোকটি দাঁড়াল তাকে দেখে সোহাগের হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক ধক শব্দ হচ্ছিল।

লোকটা গম্ভীর মুখে বলল, ওঃ, সরি।

বলেই ফিরে যাচ্ছিল।

পান্না চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই বিজুদা! কী হচ্ছে? এসো বলছি।

বিজু মুখ ফিরিয়ে বলল, তোরা গল্প করছিস কর। আমি বরং একটু কাকিমার ঘরে যাই।

না না, প্লিজ! একটু এসো। একে তো তুমি চেনো বাবা! অত লজ্জা কীসের?

বিজু বলল, লজ্জা-টজ্জা নয়। তোরা গল্প কর না। টু ইজ কম্পানি, থ্রি ইজ ক্রাউড।

আচ্ছা বাবা, তার অ্যাভয়েড করতে হবে না। প্লিজ এসো।

সোহাগ বিছানায় আধশোয়া হয়েছিল। উঠে বলল, না পান্না, এবার আমি যাব। আপনি আসতে পারেন।

পান্না ধৈর্য হারিয়ে বলে ফেলল, উঃ, তোমাদের দুজনের মধ্যে যে সেই থেকে কী হচ্ছে! আমি আর পারি না তোমাদের নিয়ে। একটা শো-ডাউন করে নাও তো। তারপর ভাব করে ফেল।

বিজু হেসে ফেলল। বলল, শো-ডাউন আবার কীসের? কফি খাওয়াবি? তা হলে পাঁচ মিনিট বসে যেতে পারি। আজ যা শীত পড়েছে।

খাওয়াচ্ছি বাবা, কফির সঙ্গে আর কী খাবে?

আর কিছু না। তোদের ঘরে ঢোকাও এক ঝামেলা, জুতো খুলতে হয়

আর ফাঁড়া কাটতে হবে না। এসো ভিতরে। এই সোহাগ, কফি খাবে তো!

না, আমি এখন যাবো।

প্লিজ একটু বোসো। আমি আসছি।

বলেই পান্না এক লাফে নেমে ছুট দিল রান্নাঘরে।

সোহাগ মাথা নিচু করে ছিল। পুরুষদের সে কখনও লজ্জা পায় না। তার অনাবশ্যক কোনও সংকোচ বা হীনম্মন্যতা নেই। তবু এই মানুষটার চোখে চোখ রাখতে তার একটু সংকোচ হচ্ছিল।

কেমন আছ সোহাগ?

এটা কি একটা প্রশ্ন হল? ভীষণ বোকা-বোকা ওপেনিং। সোহাগ একটু হাসল। তারপর কাঁধ ঝাকিয়ে বলল, বোধহয় ভালই।

বোধহয় কেন?

আমি বুঝতে পারি না কেমন আছি।

ও।

কথা ফুরিয়ে গেল। হয়তো সূক্ষ্ম একটু অপমানও করে ফেলল সোহাগ। তা হোক। অমন বোকা- বোকা প্রশ্ন করে কেন?

বসে বসে পা দোলাচ্ছিল সোহাগ। দেয়ালে একটা টিকটিকি একটা পোকার দিকে এগোচ্ছে। ওই যা! পোকাটা উড়ে দূরে গিয়ে বসল। তার কোনও প্রশ্ন নেই।

প্রশ্ন নেই। কিন্তু হয়তো কথা আছে। কী কথা তা মনে পড়ছে না তার। কথা বলতেই হবে এমন কোনও নিয়মও তো নেই। তাকাতেই হবে, এমনও তো নয়। সোহাগ বসে রইল। বিজু বসে রইল। চুপচাপ।

কিন্তু সোহাগের বুকের ভিতরে ধক ধক শব্দটা হয়েই যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ড রক্ত পাম্প করে। সুতরাং শব্দ তো হওয়ারই কথা। তফাত হল, অন্য সময়ে শব্দটা সে শুনতে পায় না। এখন পাচ্ছে। তার খারাপ লাগছে না।

আরও একটা সত্য হল, এই লোকটা এসে কাছাকাছি বসবার পর সোহাগের কেন যে ব্যাপারটা ভাল লাগছে। বেশ ভাল লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে এভাবে বসে থাকতে। এরকম লাগার কথা নয়। অথচ লাগছে।

ছাপান্ন

কাজটা দেখতে সামান্যই। সেদ্ধ ডিম কেটে দু-আধখানা করা। কিন্তু তার মধ্যেও যে কত কারিকুরি আছে সেটা অবাক হয়ে দেখছিল ধীরেন কাষ্ঠ। তার বউ একটা সুতো পায়ের আঙুলে চেপে হাত দিয়ে টান করে ধরে কত সাবধানে হিসেবনিকেশ করে ডিমগুলো কাটছে, একটু হেলদোল নেই, ডিম ছোট-বড় হচ্ছে না। ঠিক মাঝখানটা দিয়ে সুতোর করাতে ভাগ হয়ে যাচ্ছে ডিম। সূক্ষ্ম কাজ। বাহবা দেওয়ার মতো। শুধু কি তাই? সাদা সুতোটার গায়ে ডিমের কুসুম লেগে ভারী সুন্দর একটা রং-ও ধরে যাচ্ছে। রসস্থ মুখে বসে দেখছিল ধীরেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এ-বাড়িতে আস্ত ডিমের চলনই উঠে গেছে। আধখানা বৈ পুরো আর পাতে পড়ে না। আধখানা ডিম এরা কী করে রাঁধে কে জানে। রান্নার সময় নাড়াচাড়ায় কুসুমটা বেরিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু যায় না। খোলের মধ্যে ঠিক আটকে থাকে। আধখানা ডিম রাঁধতেও মাথা চাই। হাতের কারসাজি চাই। এইসব প্রতিভা ছাড়া কি গরিবের চলে?

একটা ডিম ভাগ করে থালায় রেখেছে তার বউ। ধীরেন ডিম দেখছিল। তখনই লক্ষ করল ডিমটাও দেখছে তাকে। দু-আধখানা ডিম ঠিক একজোড়া চোখের মতো ভারী ফ্যাকাশে নির্বিকার চোখে একটা অপদার্থ লোককে চেয়ে দেখছে খুব। মাপজোক করছে, বুঝবার চেষ্টা করছে লোকটা কেমনধারা। ডিমের এই তাকিয়ে থাকা দেখে ভারী খুশি হচ্ছে ধীরেন। এও একটা ঘটনা। লোকে টেরই পায় না, এরকম কত ঘটনাই সবসময়ে ঘটে যাচ্ছে চারদিকে।

দিন দশেক হল চোখ খুলে গেছে ধীরেনের। আজকাল খুব দেখছে সে। কত রং, কত সূক্ষ্ম ঘটনা, কত শিল্প। ডান চোখের ছানি কাটিয়ে এল বর্ধমান থেকে। সেও এক অশৈলী ব্যাপার। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। মানুষকে বড্ড প্রণাম করতে ইচ্ছে যায় ধীরেনের। মানুষ যে কী কাণ্ড ঘটাতে পারে তার কি লেখাজোখা আছে। তার আবছা ভাল চোখটায় কুটুস করে কী একটু করে দিল ডাক্তার, বান্ডেজ খোলার পর ধীরেন অবাক। মরি মরি! সে যে একেবারে আদিগন্ত দেখতে পাচ্ছে! মানুষের এলেম কি কম? যত ভাবে তত মানুষের ওপর ভারী শ্রদ্ধা হয় তার।

অপারেশনের পাঁচদিন পর চেক আপ-এ গিয়েছিল ধীরেন। অল্পবয়সি ডাক্তারবাবুটি দেখে-টেখে বললেন, বাঃ, চোখ তো খুব ভাল আছে!

ধীরেন ডাক্তারবাবুটির মুখের দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আপ্লুত হয়ে তাকিয়ে ছিল। এরা কি আর মানুষ? এদের ভিতরেই ভগবান ভর করে আছে।

সে বলে ফেলল, ডাক্তারবাবু, আমি কি আপনাকে একটু প্রণাম করতে পারি?

ডাক্তার চমকে উঠে বলল, না না, সে কী? প্রণাম করবেন কেন? ছিঃ ছিঃ, আপনি পিতৃতুল্য মানুষ।

ধীরেন বলল, প্রণাম তো আপনাকে নয়, মানুষকে। মানুষ যে বড় ভাল ডাক্তারবাবু। মানুষ যে বড় ভাল।

ডাক্তার হাসল। বলল, তা তো ঠিকই। কিন্তু প্রণাম করার দরকার নেই। আপনি খুশি হয়েছেন, সেইটেই বড় কথা।

শুধু ডাক্তারবাবুটিই বা কেন? যারা নিজের খরচে তার অপারেশন করিয়ে দিল তারাই কি কিছু কম ভগবান? ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে চোখ কাটানো তো সম্ভব ছিল না ধীরেনের।

চোখ খুলে যাওয়ায় এখন দেখার খুব নেশা চেপেছে ধীরেনের। খুব দেখছে চারদিক, মনের সুখে দেখে বেড়াচ্ছে। এই যে ডিমের দুখানা চোখ তার দিকে চেয়ে আছে এটাই তো চোখে পড়েনি এতদিন! ওই যে চৌকির নীচে ডাঁই করা কৌটো-বাউটোর ভিতর থেকে একটা ইঁদুর তার ছুঁচলো মুখ বাড়িয়ে চারদিকটা দেখে নিচ্ছে এটাও কি এতদিন নজরে পড়েছে ধীরেনের! মুগ্ধ হয়ে ইঁদুরটার কাণ্ড দেখছিল ধীরেন। চারদিকে পুঁতির মতো চোখ দুটো দিয়ে দেখে নিচ্ছে। মুখখানা কী সুন্দর! কী নিস্পাপ! মুখ থেকে লেজের ডগা অবধি সৌন্দর্য ইঁদুরের। লোকে তেমন লক্ষ করে না, করলে বুঝত এত সুন্দর জীব বড় বেশি নেই।

মোট ছটা ডিম কেটে বারো টুকরো করল তার বউ। একেবারে মাথা গুনতি হিসেব। এখন অনেকগুলো ডিমের চোখ তাকে দেখছে। আহা, দেখুক। তাকে তো কেউ বিশেষ চেয়ে দেখে না।

ওই যে তার বউ, এক ঘরে থাকে বটে, কিন্তু তাদের চোখে চোখে কদাচিৎ হয় কি হয় না। বেঁচে থেকেও কেমন করে যেন মানুষ একে অন্যের কাছে মরে যায়। ভেবে ভারী অবাক হতে হয় বটে।

এই যে মরে যাওয়াটা, এটা কিন্তু তেমন খারাপ লাগে না ধীরেনের। আসল মরার পর তো কিছু টের পাওয়া যাবে না। এই জীয়ন্ত মরার মধ্যে একটা মজা আছে কিন্তু।

এই যে চোখ কাটাতে বর্ধমান যাওয়া সেটাও ভারী মজার হল। লায়নস ক্লাব অপারেশনের তারিখ জানিয়ে চিঠি দেওয়ার পর ধীরেন সেটা প্রথমে তার বউ, তারপর দুই ছেলেকে জানিয়েছিল। কেউ যেন তেমন গা করল না। ধীরেনের ছানি কাটার ওপর তো দুনিয়ার কিছু নির্ভর করছে না। কিন্তু একজন সঙ্গীর দরকার ছিল। চিঠিতেও লিখেছে, একজন অ্যাটেনডেন্ট সঙ্গে আনতে হবে।

বউ শুনে বলল, আমার মাজায় যা ব্যথা। ছেলেদের বলে দেখ, ওরা যদি যায়।

বড় ছেলে সবে গ্রিলের একটা কারখানা খুলেছে বাড়িতেই। মহা ব্যস্ত। বলল, দেখছ তো ফুরসত নেই।

ছোট ছেলে এতদিন নেশাভাঙের ব্যবসা করত। তারপর গাঁয়ের ভাল ছেলেরা জোট বেঁধে তাকে প্রথমে শাসায়, তারপর উস্তম-কুস্তম পেটায়। বিজু ছিল তাদের নেতা। বিজুর ভয়েই এখন ওসব ব্যবসা ছেড়ে সে শাড়ির ব্যবসায় নেমেছে। বলতেই বলল, কালই আমি মংলা হাটে যাচ্ছি। সেখান থেকে শান্তিপুর।

জানাই ছিল। একটুও দুঃখ হল না ধীরেনের। জীয়ন্ত থাকতে থাকতেই নিজের মরাটা কেমন তা বেশ উপভোগই করছিল সে।

কথাটা লতায়পাতায় বেয়ে বেয়ে যার কানে পৌঁছল সে ধীরেনের কেউ নয়। তার গরজও থাকার কথা ছিল না। তবু বিজুই বলল, ভাবছেন কেন ধীরেনখুড়ো, আমি তো রোজ বর্ধমানে যাই। আমার মোটরবাইকের পিছনে চেপে যেতে পারবেন না?

শুনে একগাল হেসেছিল ধীরেন, মোটরবাইক! ওরে বাবা! সে তো বড় ভাল জিনিস! জীবনে কখনও চাপিনি। জন্মের শোধ একবার চেপে নিলে হয়। উরে বাবা, মোটরবাইক যখন ছোটে তখন যেন চারদিকের বায়ুমণ্ডলে একটা মন্থন হতে থাকে।

শুনে বিজু খুব হাসল।

বিজুই নিয়ে গেল। আর সেই যাওয়াটার কথা মরণ অবধি মনে থাকবে ধীরেনের। কানমুখ ভাল করে ঢেকে নিয়েছিল বটে, তবু কী হাওয়া রে বাবা! আর কী স্পিড। এ যেন মাটির ওপর উড়ে যাওয়ার মতোই ব্যাপার। পড়ার মরার ভয় করেনি একটুও। তার মতো মনিষ্যির মরাই বা কতটুকু ঘটনা? উকুন মারার শব্দটুকুও হবে না। ভয় নয়, বরং ভারী অন্যরকম লাগছিল ধীরেনের। একটু দোল খেয়ে খেয়ে ডাইনে বাঁয়ে হেলে দুলে এরকম যাওয়া সে কখনও যায়নি তো। মানুষ যে কত কলই বানিয়েছে। কী যে আছে মানুষের মাথায় কে জানে বাবা! কী বুদ্ধি! কী বুদ্ধি! মানুষকে তার বারবারই প্রণাম করতে ইচ্ছে যায়।

বিজুই ছিল আগাগোড়া তার সঙ্গে। অপারেশনের পর বিকেলে যখন ছেড়ে দিল তখন বিজু বলল, মোটরবাইকে ঝাঁকুনি লাগতে পারে ধীরেনখুড়ো, চলুন আপনাকে গাড়ি করে নিয়ে যাই।

ধীরেন হাঁ করে থেকে বলল, না না বাবা, ওতেই হবে। গাড়ি যে অনেক পয়সা নেবে।

সেসব চিন্তা করতে হবে না। গাড়ি আমার মক্কেলের। আমি তাকে ফোন করে দিচ্ছি।

শেষ অবধি মারুতি গাড়িতেও চড়ল ধীরেন। নিজেকে রাজাগজার অধিক মনে হচ্ছিল তার। আনন্দে চোখে জল আসছিল।

তুমি অনেক করলে বাবা, আমার জন্য। কী যে বলি তোমাকে!

দুব দুর! এসব তো আমাকে করতেই হয় খুড়ো। কতটুকু আর পারি।

কথাটা ঠিক। বিজু মানুষের জন্য করে। সারা গাঁয়ে তার নামে একটা ধন্যি ধন্যি ভাব আছে।

কৃতজ্ঞতায় অভিভূত ধীরেন মারুতি গাড়ির ভিতর থেকে বাইরের দিকে একটা চোখে চেয়ে বুঝল জলে চোখটা আরও ঝাপসা হয়ে গেছে।

ইঁদুরটা আবার ঢুকে গেছে ভিতরে। চৌকির তলায় অন্ধকার জগতে ওদের দিব্যি থাকা। ওদের মতো যদি অন্ধকারেও দেখতে পেত ধীরেন আরও কত কী দেখা যেত!

উঠোনের ওধারে দুই বউয়ের মধ্যে একটা চাপা গলার ঝগড়া চলছিল কিছুক্ষণ ধরে। এবার সেটা তুঙ্গে উঠল। প্রায়ই হয়, চুলোচুলি অবধি গড়ায়। আর ভাষা যা ব্যবহার হয় তা কোনও ডিকশনারিতে পাওয়া যাবে না।

হঠাৎ তার বউ তার দিকে ফিরে বলল, শুনলে?

কী শুনব?

বড়বউ বলছে তারা নাকি বাড়ির সবটাই আমাদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে। আমাদের নাকি বের করে দেবে।

ও আর শুনে কী হবে?

ভাল করে খোঁজ নাও। গুণধর ছেলে কোনও বদমাশ উকিলের সঙ্গে সাঁট করে সত্যিই নকল দলিল- টলিল কিছু বের করেছে কিনা। আজকাল বড়বউয়ের মুখে প্রায়ই কথাটা শুনছি। ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকে। কিন্তু তলে তলে কিছু একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে নিশ্চয়ই।

ধীরেন একটু চিন্তিত হয়ে বলল, তাই কি হয়?

আজকাল সব হয়। মাস ছয়েক আগে একবার আমার কাছে বাড়ির দলিল চেয়েছিল। আমি দিইনি। কিছু একটা মতলব আঁটছে তখনই সন্দেহ হয়েছিল। গ্রিলের কারখানা খুলে এখন সাপের পাঁচ পা দেখেছে। কাঁচা টাকা আসছে তো হাতে।

ধীরেন উঠে পড়ল। আয়ুর আর কটা দিনই বা বাকি? মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকলে মূল্যবান সময় লোকসানে যাবে।

কোথায় চললে?

একটু ঘুরে-টুরে আসি।

সারাদিনই তো ঘুরছ। বলি এদিকটাও তো দেখতে হবে।

ধীরেন তটস্থ হয়ে বলে, আমি দেখে কী করব? আমাকে কি কেউ মানে?

তোমাকে মানে না, সে তোমারই দোষ। মানবে কী করে বলল তো! একটু মানুষের মতো হবে তো। তা তো বটেই।

চুপ করে থাকো বলেই যে তুমি ভালমানুষ তা তো নয়। তোমাকে কি আমি আজকে চিনেছি? এত বড় শয়তান গোটা পরগনা খুঁজলে পাওয়া যাবে না। বাবা তোমার মধ্যে কী দেখেছিল বাবাই জানে।

এসব কথায় যে ধীরেনের রাগ হয় তা নয়। একসময়ে হত বটে, আজকাল আশ্চর্যের বিষয় এইসব গালমন্দের মধ্যে সে নিজেকে একটু একটু আবিষ্কারও করে ফেলে। সে কতখানি শয়তান তার খবর কিন্তু তার বউ রাখে না। ঘোর বর্ষার এক ভুতুড়ে দিনে তার হাতে খুন হয়েছিল মিদ্দার। ঠিক বটে, মিদ্দার খুন না হলে মিদ্দারের হাতে সে খুন হয়ে যেত। যেত তো যেত। তার পরেও এতগুলো বছর বেঁচে থেকে হল কোন অষ্টরম্ভা?

গলা দিয়ে যে এখনও তোমার ভাত নামে এতেই আশ্চর্য হয়ে যাই। নিজের ওপর ঘেন্নাও হয় না তোমার? গলায় দড়ি জোটে না? আবার গিয়ে চোখ কাটিয়ে এলে। বলি চোখ কাটিয়ে হবেটা কী? লেখাপড়া করে ব্যারিস্টার হবে নাকি বুড়ো বয়সে? নাকি পথে পথে ঘুরে ছুঁড়ি দেখে বেড়াবে!

বেশ বলছে কিন্তু। জিভের ধার আছে। কথাও গুছিয়ে বলে। এও এক প্রতিভা। শান পড়ে পড়ে আরও ধারালো হচ্ছে দিনকে দিন।

এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরে এঁটোকাঁটা খেয়ে বেড়াও, লজ্জাশরম নেই? বাসন্তীর মা এসে কত কুচ্ছো গেয়ে যায়। লজ্জায় মরি।

বাসন্তীর মা যে এ-বাড়িতে আসে তা জানে ধীরেন। কেন আসে তাও জানে। ধীরেন যে লজ্জা পাচ্ছে। না তা নয়। বাস্তবিক লজ্জা করে বইকী! বাসন্তীর মা তো কত কথাই শুনিয়েছে আড়াল থেকে। কিন্তু কথাগুলো তাকে তেমন চিমটিও কাটে না। বরং সে কথাগুলো শুনে তারিফই করে। বেশ বলে লোকে। মানুষকে কেমন করে অপমান করতে হয়, কখনও সূক্ষ্মভাবে, কখনও স্থূলভাবে তাও কি একটা শিক্ষার বিষয় নয়? এই রণচণ্ডী মহিলা আজ যেমনই হোক, একদিন কিন্তু ভারী রসালো রকমের যুবতী ছিল। ঢলঢল করত। বউঠানের কাছে যেতে বুক ঢিপঢিপও করত একটু। তাকালে জীবন যেন ধন্য হয়ে যেত। ঠোঁট টিপে মাঝে মাঝে এমন মোহন হাসি হাসত যে সারাদিন ওই হাসি মনে পড়ত।

বলি বাড়িতে কি গেল না? সকালে গুচ্ছের বাসি রুটি না হয় মুড়ি তো দেওয়া হয়, নাকি? দুপুরে থালাভর্তি ভাত তত জুটছে। তবে কুকুরের মতো লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ল্যালানোর মতো রুচি হয়? লোকে কী বলে তা কি কানে যায় না? মানুষের চামড়া, না গণ্ডার?

ধীরেন একটু তটস্থ ভাব করে মাত্র। বউকে খুশি কবার জন্যই। নইলে বড়ই বেহায়া ভাববে।

বলি, মুখে কি পুলিপিঠে গুঁজে বসে আছ? বলবে তো কিছু?

ধীরেন বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলল, তা কী বলতে বলছ?

ওদের বাড়িতে যাও কেন? কোন মধু আছে ওখানে শুনি?

ধীরেন ভালমানুষের মতো বলে, না এমনি যাই না। বাঙাল ধরে নিয়ে যায় তাই যাই। বাসন্তীও শ্রদ্ধাভক্তি করে খুব। ওদের পাম্পটা সারিয়ে দিলুম তো সেদিন।

ওসব আমি জানি। ছোঁচার মতো বেহান হতে না-হতেই গিয়ে হানা দাও খাবারের লোভে। ছিঃছিঃ ঘেন্নায় মরে যাই। ঝাটা মারি অমন খাবারের মুখে। আর মাগীরও আস্পর্ধা কম নয়, বাড়ি বয়ে এসে বিষ উগড়ে গেল। বলি লোকে এত সাহস পায় কেন? তোমার মতো ঘাটের মড়ার জন্যই তো!

ওদিকে দুই বউয়ের ঝগড়া একেবারে উদারা-মুদারা-তারায় ঠেলে উঠছে। বাচ্চাগুলো তার মধ্যে ভেজালে পড়ে চিল-চেঁচানি চেঁচাচ্ছে। তার মধ্যেই কিল চাপড় মারার শব্দ হচ্ছে। সব মিলিয়ে ভারী একটা গোলমাল। যেমন কেত্তনের সময় খোল কত্তাল বাজে, এও যেন ঠিক তেমনি। অনেক চেঁচামেচি মিশে একটা শব্দের ঘ্যাঁট তৈরি হয়।

ঝগড়া শোনা ধীরেনের পুরনো বাতিক। একটু বয়স হওয়ার পর থেকেই হয়েছে এই বাইটা। পথেঘাটে ঝগড়া লেগেছে দেখলে সে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে শোনে।

বউ ডিমের থালা নিয়ে উঠে গেল। এখন সেও গিয়ে আসরে নেমে পড়বে। দুই বউয়ের ঝগড়া লাগলে শাশুড়ির তাতে মুখ এঁটো না করাটা বোধহয় খারাপই দেখায়।

ঝগড়া শুনতে ধীরেন বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

খুড়া আছেন নাকি বাড়িতে? খুড়া!

ধীরেন তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে নেমে একগাল হেসে বলল, বাঙাল যে!

তড়াতড়ি লন তো খুড়া, আমাগো মিক্সিখান খারাপ হইছে। যন্ত্রপাতি লগে লইয়া লন তো।

আহা, পরান মিস্তিরিকে ডেকে নিয়ে যাও না।

আরে ওইটা একটা পাঠা। বাসন্তী কয়, খুড়া হইল কলকবজায় ওস্তাদ। তারে ধইরা লইয়া আস গিয়া। চলেন চলেন, ভাল চিতল মাছ আনছি বৈঠকখানা বাজার থিক্যা। আইজ আমার বাড়িতেই দুফুরে দুইটা খাইবেন।

ধীরেন ফাঁপড়ে পড়ে বলে, খাবো!

ক্যান, খাইবেন না ক্যান? খুড়িমারে কইতে হইব নাকি? উরেব্বাস, ঘরে তো কাইজ্যা লাগছে দেখি।

ধীরেন হেসে বলে, না বলতে হবে না। বলার কিছু নেই। চলো, যাচ্ছি।

বাঙালের পিছু পিছু বেরিয়ে এল ধীরেন। না, তার লজ্জা করছে না তো!

মিক্সি তেমন জটিল যন্ত্র নয়। ধীরেনের বিদ্যের অকুলান হল না। যন্ত্রটা খুলে খুব যত্ন করে সারাল সে। একটা কানেকশনের অভাব ঘটেছিল। আধঘন্টাতেই হয়ে গেল।

সকালে কী খাইছেন খুড়া?

ধীরেন হেসে বলল, খেয়েছি দুখানা রুটি আর গুড়।

রামচন্দ্র! রুটি আর গুড় একটা খাদ্য হইল?

ধীরেন মাথা নেড়ে বলে, না হে বাঙাল, রুটি গুড় কিছু খারাপ জিনিস নয়। আখিগুড়ে একটা ভারী মিঠে গন্ধ আছে, রুটির সঙ্গে বনেও ভাল।

কী যে কন। গরমাগরম একটু হালুয়া খাইয়া জুইৎ কইরা বসেন। মুখ গুইজ্যা বাড়িতে বইয়া থাকেন ক্যান? বাড়িতে যত গুইজ্যা থাকবেন ততই অশান্তি। বউ বুড়া হইলেই খাণ্ডার।

ধীরেন তা জানে। খাণ্ডারকে সবাই ভয় খায়। ধীরেনও খায় বটে, তবে তার তেমন বিচলন হয় না। মিহিন মানুষ না হলে দুনিয়াটাকে বোঝাও যায় না কিনা। মাথা গরম হলে দুনিয়া আবছা হয়ে যায়। তখন মানুষ নিজের বিয়ে নিজেই জ্বলেপুড়ে মরে। ওতে লাভ হয় না কিছু। বরং জলের মতো মানুষ হওয়া ভাল।

হালুয়া এসে গেল। গরিব ঘরের কেলটি মার্কা জিনিস নয়। গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ ছাড়ছে। কিসমিস কাজু গিজগিজ করছে।

কেমন খান খুড়া?

বাস রে! এ যে একেবারে দাঙ্গাহাঙ্গামা হে বাঙাল। এরকমও যে হয় জানতাম না।

যত গুড়, তত মিষ্টি, বুঝলেন খুড়া? যত মালমশলা ঠাসবেন ততই স্বাদ সোয়াদ পাইবেন।

তাই নাকি?

আইজ্ঞা। খাওনের ব্যাপারে বাঙালের লগে কেউ পারব না। বাঙালরা আর কিছু না পারুক কাছা খুইলা খাইতে জানে।

শুধু খেতেই জানে না, খাওয়াতেও জানে।

ওই কথা কইয়েন না খুড়া, মাইনসে খায় নিজের কপালে।

হালুয়াই চেচেপুঁছে খেল ধীরেন। তারপর চা। লজ্জা হল না তো! লজ্জা-লজ্জা করছেও না তার।

চিন্তা কইরেন না খুড়া। মরণরে পাঠাইয়া দিছি, খুড়িমারে কইয়া আইতে যে আপনে আইজ দুফুরে এইখানে খাইবেন।

ধীরেন একটু ভাবল। আধখানা ডিম বরাদ্দ ছিল আজ। তার বাড়িতে ডিমের ঝোলে তেমন মশলাপাতি পড়তে পায় না। ট্যালট্যালে ঝোল হয়। তাও কিছু খারাপ লাগে না তার। সকাল থেকে ডিমের জন্য মনটা প্রস্তুত হয়ে ছিল বলে একটু খারাপ লাগল ধীরেনের। ভাগের ডিমটা ফাঁকই গেল আজ।

তার বদলে দুপুরে চিতলের পেটি ধীরেনের সব দুঃখ ভুলিয়ে দিল বটে, কিন্তু তবু খুব সূক্ষ্যভাবে একটা অভাববোধও কাজ করছিল। তার বরাদ্দ আধখানা ডিম কি তার জন্য অপেক্ষায় ছিল না!

কত কী চোখে পড়ছে আজকাল তার! চালে লাউডগার মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা কচি লাউ, ওই উঁচু আমগাছের জটিল ডালপালার মধ্যে একখানা মৌচাক। দোতলায় একটা দরজার ওপর একটা ঘোড়ার নাল লাগানো। কই, এসব তো এতদিন চোখে পড়ত না।

এই চোখেই ধীরেন বিকেলে কাঞ্জিলালের পোড়ো জমিটার ধারে একটা মেয়েকে একা বসে থাকতে দেখল। কী যে সুন্দর মেয়েটা! টকটক করছে গায়ের রং, তেমনি সুন্দর মুখের ডৌল। ভারী আনমনে বসে আছে।

ধীরেন দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখল। মেমসাহেব নয় তো!

একটু চেনা-চেনাও ঠেকছিল যেন! কে মনে পড়ছে না।

তারপর মনে পড়ল। এ তো মহিমার নাতনি!

দেখেছে বটে, তবে আবছা চোখে এতদিন বুঝতেই পারেনি যে মেয়েটা এত সুন্দর।

এই যে এইসব সুন্দর ছেলেমেয়ে এরা যে কোথা থেকে আসে কে জানে! ওই যে ক্ষুরধার বুদ্ধির মানুষ, ওই যে রবি ঠাকুর বা আইনস্টাইন, কিংবা যে লোকটা এরোপ্লেন বানিয়েছে এরাই বা হয় কী করে? এই যে তারা কালো ময়লা খর্বুটে হাঁদা মানুষ, সাহেবরা তো এমন নয়! তারা কেমন ফর্সা, তাগড়াই, বুদ্ধিমান মানুষ। এই যে এত তফাত এইটেই ভারী অবাক করে দেয় ধীরেনকে।

সন্ধের পর মহিম ঘরেই ছিল। সাড়া পেয়ে বলল, আয় ধীরেন।

ধীরেন ঢুকে দেখল, গরম চাদরে মুড়িসুড়ি দিয়ে মহিম রায় বসা!

আজ যা শীত পড়েছে, হাতে পায়ে যেন সাড়া পাচ্ছি না।

ধীরেন বলল, তা পড়েছে।

তোর তো গায়ে তেমন কিছুই নেই দেখছি। ওই ছেঁড়া হাফ সোয়েটারে শীত মানে?

ধীরেন লজ্জা পেয়ে বলে, তা মানে।

বলিস কী?

ধীরেন বলল, শীত করতে করতে এক সময়ে আর করে না। এক জায়গায় থেমে যায়। শীতেরও তো ধৈর্যের শেষ আছে।

ভাল বলেছিস। চা খাবি?

তা একটু হলে হয়।

ভুল বললুম! চা নয়, কফি।

ও বাবা, সে তো তোফা জিনিস।

নাতনি এবার নিয়ে এসেছে আমার জন্য। একটা হিটার আর সসপ্যানও এনেছে। যা, ওই টেবিলে সব আছে। হিটার জ্বালিয়ে জল বসিয়ে দে তো।

বাঃ, এ তো দিব্যি ব্যবস্থা।

হ্যাঁ। নাতনি বলে, তোমার আর একটু ভাল থাকা উচিত।

বলে বুঝি? দেখতেও হয়েছে মেমসাহেবের মতো। বিকেলে কাঞ্জিলালের মাঠে বসেছিল। যেন পদ্মফুল।

মেয়েও বড্ড ভাল। আগে একটু সাহেবি ভাব-টাব ছিল, এখন ঝরে গেছে।

দুজনে মিলে কফি বানিয়ে খেল। ধীরেনের সবই ভাল লাগে। কফিটাও লাগল। বেজায় ভাল জিনিস।

চোখটা কেমন আছে রে?

একগাল হেসে ধীরেন বলল, চোখের কথা আর কবেন না দাদা। এত দেখছি যে অবাক কাণ্ড! দেখে দেখে যেন আর কূল করতে পারছি না।

এত দেখতে দেখতেই ফিরছিল ধীরেন। রাত হয়েছে। চারদিকে কুয়াশা। তার ফাঁকেই চাঁদ উঠেছে ঠেলে। চারদিকে কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না যেন দুনিয়া ছাড়া জিনিস। এরকম জ্যোৎস্না বিলেতে-টিলেতে ওঠে। এদেশের জিনিসই নয়।

আচমকাই যেন বাতাসে একটা ঢেউ দিয়ে কে যেন তার পাশে চলে আসে। পায়ে পায়ে চলে তার সঙ্গেও।

ধীরেন, মেরে ফেললি আমাকে?

সে কবেকার কথা, অত কি মনে রাখতে আছে দাদা?

কিন্তু এখনও ব্যথা করে যে রে! এখনও যে দম বন্ধ হয়ে আসে।

ওসব বোলো না। তুমি কি কিছু কম করেছ?

করব না! আমার বউয়ের সঙ্গে নষ্টামি করলি, তাই তো ওকে মারলুম। আমার সংসার ভাসিয়ে দিলি তুই!

ও মেয়েছেলেকে কি সামলাতে পারতে মিদ্দার দাদা? ও ছিল কেউটে। সাপের মন্তর না জানলে কি বশ করা যেত ওকে?

সাতান্ন

একজন অন্ধ মানুষ নিশ্চিন্দিপুর যাবে বলে বেরিয়েছে, সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে। তারা হাঁটছে আর হাঁটছে।

ও দাদু, আর কতদূর গো? বেলা যে মজে এল!

ওরে, দূর বইকী! সোজা দূর! অনেক দূর চলে গিয়েছিলুম যে নিশ্চিন্দিপুর থেকে।

ওই যে একটু আগে চাষি লোকটা বলল, আর একটুকুন পথ! তা সেই একটুকুন পথ তো কখন ফুরিয়ে গেছে! তুমি তা হলে ছাড়িয়ে এসেছ নিশ্চিন্দিপুর। চোখে তো দেখতে পাও না, তাই বুঝতে পারোনি।

পাগল! তাই কখনও হয়! নিশ্চিন্দিপুর এলে আমি ঠিক বুঝতে পারব।

কী করে পারবে? নিশ্চিন্দিপুরের হাওয়াবাতাস কি অন্যরকম, নাকি তার কোনও আলাদা গন্ধ আছে? তুমি টের পাওনি।

তাই কি হয় রে! আমি নিশ্চিন্দিপুরে পা দিলেই পুরনো সব গাছপালা ফিস ফিস করে বলে উঠবে, ওই আমাদের অপু। নিশ্চিন্দিপুরের মাটি ঠিক বলে উঠবে, অপু এলি বাবা? বাতাসে মায়ের গায়ের গন্ধ পাবো ঠিক। বাবার কাশির শব্দ, দিদির কান্না সব এখনও নিশ্চিন্দিপুরের বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। তুই বুঝতেও পারবি না সেসব। আমি কিন্তু ঠিক শুনতে পাবো।

ওরকম হয় নাকি! গাঁ কি কাউকে মনে রাখে! তোমার নিশ্চিন্দিপুর নিশ্চয়ই হেজেমজে গেছে। কেউ নেই সেখানে। আমাদের পটাশপুরে সেবার কলেরা হয়ে সবাই মরে গেল। গাঁ উজাড় হয়ে গেল। তারপর আগাছা হল, জঙ্গল হল, সাপ-খোপের বাসা হল।

বুড়ো লোকটা মাথা নেড়ে বলল, না, নিশ্চিন্দিপুর কখনও মরে না। ওটা এক আশ্চর্য জায়গা। যত দিন আমি আছি, ততদিন মরবে না। কোল পেতে বসে থাকবে আমার জন্য।

আমার যে খিদে পাচ্ছে দাদু, পা ব্যথা করছে।

খিদে! খিদের কথা বললি নাকি?

বললুম তো।

সেই খিদের গল্পই তো আমাদের সবার গল্প। সারা নিশ্চিন্দিপুর কেবল এক-পেট খিদে নিয়ে বসে থাকত। সকলের খিদে পেত, কেবল খিদে পেত। খিদে কিছুতেই মিটত না। আর ওই খিদে থেকেই তৈরি হত আমাদের গল্প। কত কত গল্প রে! বাঁচার গল্প, মরার গল্প। প্রেম ভালবাসার গল্প। সব কিছুর গোড়ায় ওই এক বাটি খিদে।

এক বাটি খিদে কী গো! খিদের কি বাটি থাকে?

থাকে রে থাকে। নিশ্চিন্দিপুরের যিনি ভগবান তিনিই গাঁয়ের মাঝ মধ্যিখানে কোথায় যেন খিদের বাটিটা লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। আর আমরা সারাদিন ধরে সেই বাটিটা খুঁজে বেড়াতাম। আজও তার সন্ধান

মেলেনি। কিন্তু বাটি একটা ঠিকই আছে কোথাও।

হ্যাঁ দাদু, নিশ্চিন্দিপুরের ভগবানও কি আলাদা?

তা বইকী! সব জায়গারই আলাদা আলাদা ভগবান। যে যার নিজের ভগবান খুঁজে নেয়। ও তুই বুঝবি না।

ও দাদু, রোদে মাথা গরম হয়ে ভুল বকছ না তো!

ভুল! সেও কি আর বকি না! যত ভুল বকি, ভুল করি, ভুল পথে চলে যাই, চারদিকে কত ভুল কথা, ভুল কাজ, ভুল পথ। ভুল তো হতেই পারে। হ্যাঁ রে, গোরুর গলার একটা ঘন্টি শুনলুম না।

হ্যাঁ তো।

ওটা আসলে কী যাচ্ছে রে! আমি একটা ছিলছিলে শব্দ শুনতে পাচ্ছি রে।

ও বাবা, মস্ত একটা সাপ যে গো! দাঁড়াশ সাপ।

অন্ধ মানুষটি আনন্দে চিৎকার করে উঠল, ওই! ওই তো এসেছে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে। চল চল, ওর পিছু ছাড়িস না। ওই নিয়ে যাবে নিশ্চিন্দিপুর।

খানিকক্ষণ তারা পড়ি কি মরি করে হাঁটল।

ধুস, সাপটা যে গর্তে ঢুকে গেল গো দাদু!

ঢুকে গেল! তা হলে দাঁড়া। এইখানেই!

এইখানে কী?

এটাই নিশ্চিন্দিপুর। কী দেখছিস বল তো!

এ তো একটা মাঠ, আগাছার জঙ্গল! আর কিছু নেই।

দূর বোকা! ভাল করে দ্যাখ। ওই বাঁদিকে তাকালে শিবমন্দির। সামনে ওই একটা দোতলা বাড়ি দেখছিস না, ওরাই নিশ্চিন্দিপুরের সবচেয়ে বড় মানুষ। আর ওই আশ-শ্যাওড়ার জঙ্গলটা দেখছিস, ওটা পেরোলেই মজা পুকুর। তার ডান পারে আমাদের বাড়ি। দেখ না ভাল করে।

ধুস! কোথায় কী গো!

ওই শুনছিস, কে যেন বলে উঠল, অপু এলি? শুনলি না।

না দাদু। আমার একটু ভয়-ভয় করছে।

বোকা ছেলে, ভয়ের কী? এবার বাতাসে কান পাত। গাছের পাতায় ফিসফিস শব্দ হচ্ছে, ওই আমাদের অপু!

তোমার মাথা ঠিক গরম হয়েছে দাদু।

না রে, না। আমি এসেছি বলে নিশ্চিন্দিপুরের আকাশে বাতাসে জলে স্থলে যে সাড়া পড়ে গেছে। সবাই কেমন খুশি, ডগমগ করছে টের পাচ্ছিস না?

আমি শুধু কাকের ডাক শুনতে পাচ্ছি গো।

ভাল করে দেখ, সব আছে। সব ঠিক সেই আগের মতোই আছে। ভাল করে ঠাহর করে দেখ তো, একজন বুড়ো মানুষকে কোথাও দেখা যাচ্ছে কি না! অল্প অল্প খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রোগা, চোখটা একটু ঘোলাটে, গাঁয়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, পরনে হেঁটো ধুতি। দ্যাখ কোথাও গাছতলায় বসে আছে কি না, নয়তো কাঠকুটো কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কিংবা মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে আকাশ পানে চেয়ে আছে।

কেউ কোথাও নেই।

তোর একদম চোখ নেই!

ওই বুড়োমানুষটা কে গো দাদু? কার কথা বলছ?

ওই হল নিশ্চিন্দিপুরের ভগবান। আমাদের গরিব গাঁ তো, তাই আমাদের ভগবানও বড্ড গরিব। ছেলেবেলায় কতবার তাকে দেখেছি।

কথা বলেছ?

না। কথা বলতে গেলেই একটু হেসে পালিয়ে যেত। তার ভয় ছিল আমরা পাছে নালিশ করি।

কী নালিশ ছিল তোমার?

কত নালিশ! খিদের কথা, অভাবের কথা, আকালের কথা, রোগভোগের কথা, নির্যাতনের কথা। ভাল কথাও ছিল অনেক বলবার মতো। কী সুন্দর জংলা ফুল ফুটত, গাছে ফল হত, শরৎকালে কী সুন্দর আলো হত!

না গো, তোমার বুড়ো ভগবানকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তোমার ভয়ে সে তা হলে পালিয়ে গেছে।

না রে। সে পালাবে কোথায়? নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে সবাই চলে গেলেও তার যে পালানোর উপায় নেই। সে যে ঘুরে ঘুরে নিশ্চিন্দিপুরের ঘরে ঘরে কখনও দুঃখ, কখনও আনন্দ ছড়িয়ে দিয়ে আসে। সে কত কী চুরি করে নিয়ে চলে যায়, আবার কত কী পূরণও করে দিয়ে যায়।

এই খাড়া দুপুরে মাঠের মধ্যে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে গো দাদু? ফিরে চলো।

ফিরে যাবো? কী যে বলিস, তুই এখানে একটু দাঁড়া। আমি সবার সঙ্গে দেখা করে আসছি।

কার সঙ্গে দেখা করবে! এ যে পতিত একটা জায়গা। কেউ কোথাও নেই।

ওই চোখ দিয়ে কি দেখা যায়? আমার চোখ হলে দেখতে পেতি।

তুমি কী করে দেখছ দাদু? তুমি যে অন্ধ!

কে বলল আমি অন্ধ! আমি যে সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আজ। নিশ্চিন্দিপুরের ভগবান আজ আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে যে। বাতাসে বলে পাঠিয়েছে আজ তুই দেখতে পাবি। দাঁড়া না, একটু দাঁড়া। আমি দৌড়ে যাব, আসব।

বেশি দেরি কোরো না কিন্তু। দেরি দেখলে আমি ঠিক পালিয়ে যাবো।

তাই যাস। নিশ্চিন্দিপুর যদি আমাকে তার বুকের মধ্যে রেখে দেয় তা হলে তুই একা ফিরে যাস।

অন্ধ মানুষটি এগিয়ে গেল। বড় আনন্দ, বড় চঞ্চলতা।

ছেলেটা দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দাদু ফিরল না। আর ফিরল না। কোনওদিনই আর ফিরল না।

শোনো! একটা কথা বলছি।

অমল তার আচ্ছন্ন চোখ তুলে মোনার দিকে চাইল।

কিছু বলছ?

হ্যাঁ। কিছু যদি মনে না করে তা হলে একটা কথা বলব?

অমল আজকাল তার বউয়ের সঙ্গে বাক্য ব্যবহারে সতর্ক হয়েছে। মাইন পাতা জমির ওপর দিয়ে যেমন পা টিপে টিপে হিসেব করে হাঁটতে হয় ঠিক তেমনভাবে। এই সতর্কতার সুফলও সে পায় আজকাল, ঠিক কথা, তাদের মধ্যে নতুন করে প্রেম জন্মায়নি, মানসিক দূরত্বও দুস্তর। কিন্তু আজকাল তারা মিলেমিশে থাকছে। এ ব্যাপারে মোনাও কি তারই মতো সতর্ক নয়? হ্যাঁ, হয়তো মোনাও দাম্পত্যটাকে অক্সিজেন দেওয়ার চেষ্টা করছে।

অমল অমায়িক হেসে বলল, কী ব্যাপার?

আমাদের তো উইক এন্ড শেষ করে আগামীকাল কলকাতায় ফেরার কথা।

হ্যাঁ।

কিন্তু আমার একদম মনে ছিল না, আগামীকাল সকাল নটায় পার্ক স্ট্রিটে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ডাক্তার বিমল সেনের সঙ্গে।

অবাক হয়ে অমল বলে, ডাক্তার! ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কেন! কী হয়েছে তোমার?

মোনা ম্লান একটু হেসে বলল, কাছে থেকেও তো আমার খোঁজ রাখো না। হয়েছে একটা কিছু। মেয়েলি ব্যাপার। বিমল সেন ভারী ব্যস্ত ডাক্তার। কালই বিদেশে চলে যাবে। অ্যাপয়েন্টমেন্টটা মিস করা চলবে না।

অমল মোনার দুটো বাহু দুই হাতে ধরে বলল, খুব গুরুতর কিছু নয় তো মোনা? সিরিয়াস কিছু নয় তো!

মোনা হেসেই বলল, তা কী করে বলব? তবে প্রবলেম একটা হচ্ছে।

অমলের মুখ শুকিয়ে গেল। ভালবাসা থাক বা না-থাক, সে কোনও জনকে হারাতে চায় না। মোনা ডিভোর্স করবে বলে হুমকি দেওয়াতেও তার ভুবন শূন্য হয়ে গিয়েছিল। বড্ড অসহায় লেগেছিল তখন। এখন আবার কী বিপত্তি হল কে জানে।

মোনা মায়াভরে একটু হেসে বলল, টেনশনের মতো কিছু হয়নি এখনও। ডাক্তার দেখালে ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

তা হলে আমাদের তো আজই কলকাতায় ফেরা উচিত।

হ্যাঁ। তবে তাড়াহুড়ো নেই। সন্ধেবেলা রওনা হলেই হবে। গাড়িতে তো মোটে আড়াই ঘণ্টার রাস্তা। এখন তো সবে সকাল।

তা হলে বাসুদেবকে একটা ফোন করে দাও।

ফোন করে লাভ নেই। আমাদের লাইনে কেবল ফল্‌ট হয়েছে। সাত দিনের ধাক্কা ধরে রাখো। ঠিক আছে।

তোমার মন খারাপ হল না তো! উইকএন্ডটা এখানে এসে থাকতে তোমার ভাল লাগে।

না মোনা। মন খারাপ হবে কেন? একটা তো মোটে রাত। বরং তোমার কথা শুনে মনটা একটু আপসেট লাগছে।

মেয়ে একটু আপসেট হবে। সে তো এখানে এসে পিসি, পান্না, বড়মা এদের নিয়ে মজে থাকে। সি এনজয়েস হিয়ার ভেরি ম্যাচ।

প্রতি উইক-এই তো আসছি আমরা। ওটা কোনও ব্যাপার নয়। বুঝিয়ে বললেই বুঝবে। ওকে বলেছ তোমার অসুখের কথা?

না। কী জানি কেন, দেখেছি অসুখ শুনলেই সোহাগ কেমন নার্ভাস হয়ে যায়। বিশেষ করে আমার।

শি লাভস ইউ।

এমনিতে তো আমি ওর চোখের বিষ। লোককে বলে, আমি এবং আমরা কেউ নাকি ওকে পছন্দ করি না, ঘেন্না করি।

সেটা ওর বুঝবার ভুল!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোনা বলল, ভুল বোঝার তো শেষ নেই। তবে আমাকে একটুও পছন্দ করে বলে মনে হয় না। কিন্তু অসুখ-বিসুখ করলে খুব ঘাবড়ে যায় দেখেছি। রীতিমতো আপসেট। তাই মনে হয় একটু মায়া হয়তো আছে।

অমল একটু হাসল মাত্র। বেশি ব্যাখ্যায় গেল না। সে দেখেছে বেশি ব্যাখা-ট্যাখ্যা করতে গেলেই নানা রকম অনভিপ্রেত কথার সৃষ্টি হয় এবং তর্ক ঝগড়া ঘুলিয়ে ওঠে।

অমল শুধু বলল, ঠিক আছে। বিকেল পাঁচটা ছটা নাগাদ বেরোলেই হবে। ফেরার পথে পার্ক স্ট্রিট বা কোথাও ডিনার সেরে নিয়ে বাড়ি ফিরব। কী বলো?

সেটাই ভাল। ওরাও চাইনিজ-টাইনিজ খেতেই ভালবাসে।

অপু তার নিশ্চিন্দিপুর খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। মোনাকে বলল, একটু ঘুরে আসছি।

অপু তার নিশ্চিন্দিপুরকে কখনওই আর খুঁজে পাবে না, অমল তা জানে। একমাত্র অন্ধই খুঁজে পায়। সে তার মনের মধ্যে সব গড়ে নিতে পারে।

বিকেলে রওনা হল তারা। আসার সময় ড্রাইভার ছিল। কিন্তু সে থাকেনি। ছুটি নিয়েছে দুদিনের। তাতে অসুবিধে নেই। অমল ভালই চালায়। তবে অভ্যাস কম।

সোহাগ বলল, বাবা, পারবে তো!

খুব পারব।

বুডঢা বলল, দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে কিন্তু আমি চালাব বাবা।

সেটা কি ঠিক হবে? তোর লাইসেন্স নেই।

তাতে কি? ওখানে পুলিশ-টুলিশ থাকে না। আর আমি তো ভালই চালাই।

ঠিক আছে। চালাস কিছুক্ষণ।

শুধু এ ব্যাপারে নিস্পৃহ রইল সোহাগ। সে যন্ত্রপাতি পছন্দ করে না তেমন। গাড়ি চালানোর আগ্রহ তার কখনওই হয়নি।

সে বলল, আজ আমরা কোথায় খাব বাবা?

তোরাই ঠিক কর না।

বুডঢা বলল, তোমরা যাই বলল, আমার ফ্যানটাস্টিক লাগে ধাবা। ধাবার রান্না খেলে অন্য কিছু মুখে লাগে না।

সোহাগ বলল, তোর ধাবা ভাল লাগবে না কেন, তুই তো একটা ছোটোলোক।

তুই খাসনি, তাই বলছিস।

যত তাড়াতাড়ি ফেরা যাবে ভেবেছিল তারা তত তাড়াতাড়ি হল না। ট্রাকের একটা লম্বা জ্যাম পেরোতে গিয়ে ঘণ্টা খানেক মার খেয়ে গেল। তাও নটার মধ্যে পার্ক স্ট্রিটে ঢুকে গেল তারা।

নিজের পরিবারটিকে এতকাল অনুভবই করত না অমল। কত ছাড়া ছাড়া ছিল তারা, কত আলগা ছিল সম্পর্ক। এখন ততটা নয়। কোনও না কোনও সূত্রে তারা একটু কাছাকাছি হচ্ছে। পরস্পরের সঙ্গে তাদের বাক্য বিনিময় একসময়ে এত কম ছিল যে, বোবার বাড়ি মনে হত। এখন ততটা হয় না। পরস্পরের মধ্যে একটা আনন্দিত হাই-হ্যালো সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। ঠিক বেঁধে ওঠেনি এখনও। তবু হচ্ছে। প্রগ্রেস ভালই।

বাবা, তুমি কি ড্রিংক করবে?

কেন রে? করলে আপত্তি আছে?

না। তবে গাড়ি চালিয়ে বাকি পথটা ফিরতে হবে তো!

মেয়ের দিকে চেয়ে হাসল অমল। তারপর হঠাৎ বলল, ঠিক আছে, আজ শুধু খাবারটাই খাই। দেখি হজম করতে পারি কিনা।

মোনা সামান্য আপত্তি করে বলল, তোমার পুরনো অভ্যাস। একদম ড্রিংক না করলে কি পারবে?

চেষ্টা করা যাক। বলে হাসল অমল।

বুড্ঢা মন দিয়ে মেনু পড়ছিল। বলল, আমি কিন্তু একটা চিংড়ি খাবোই। আর চাওমিন, তোমরা?

সোহাগ বলল, আমার টেস্ট বাড চেঞ্জ করে গেছে। আজ বড়মা কচুর শাক রেঁধেছিল। সেটা খেয়ে এত মুগ্ধ হয়ে গেছি যে এসব আমার ভাল লাগবে না। জীবনে খাইনি ওরকম জিনিস।

মোনা অমলকে বলল, তোমার মেয়ে কিন্তু আস্তে আস্তে গেঁয়ো হয়ে যাচ্ছে।

তা যাচ্ছি। উচ্ছে চচ্চড়ি, চাপর ঘন্ট, খেজুর গুড় চালতা আর নারকোল দিয়ে অম্বল, পাটিসাপটা— ইট ওয়াজ এ রিয়েল ট্রিট।

অমল স্নিগ্ধ চোখে তার পরিবারটিকে দেখছিল।

হ্যাঁ গো, তুমি সত্যিই ড্রিংক করবে না?

না, আজ থাক। তেমন অসুবিধে বুঝলে বাড়িতে ফিরে শোওয়ার আগে একটু খেয়ে নেওয়া যাবে।

খেয়ে-দেয়ে বিল মিটিয়ে উঠতে রাত এগারোটার কাছাকাছি হল। বাড়ি ফিরতে সোয়া এগারোটা।

লিফটে ওপরে উঠে তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে দরজার চাবি বের করল মোনা। বলল, হ্যাসবোল্ট দিয়ে না থাকলে বেচারাকে আর জাগানোর দরকার নেই।

হ্যাসবোল্ট দেওয়া ছিল না। চাবি ঘোরাতেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। বাঁদিকে পর পর দুখানা শোওয়ার ঘর দুই ভাইবোনের। ডানদিকে অমলের স্টাডি, হলঘরে মৃদু একটা বাল্‌ব জ্বলছে, আর পুরো ফ্ল্যাটটা অন্ধকার। বুড্ঢা আর সোহাগ তাদের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মোনা শোওয়ার ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে খুলতে গিয়ে একটু থমকাল।

অমলের দিকে চেয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ থাকতে ইশারা করে দরজায় কান পেতে কিছু শুনল।

তারপর ফিসফিস করে বলল, ভিতরে কারা আছে বলো তো!

অমল অবাক হয়ে বলল, কে থাকবে!

মেয়ের গলা শুনতে পাচ্ছি।

মাই গড!

দেখ তো, প্যাসেজের ঘরে বাসুদেব আছে কিনা।

অমল গিয়ে দেখল, বিছানা ফাঁকা।

স্কাউড্রেলটা কি বান্ধবী নিয়ে তাদের ঘরে ফুর্তি করছে! সেটা কি সম্ভব? গত দু বছর ধরে আছে, বিশ্বাসী ভাল লোক বলেই তো বিশ্বাস ছিল তাদের!

মোনা তার হাতে চাবিটা দিয়ে বলল, দুজন আছে। ডুয়িং সামথিং... দরজাটা তুমিই খোলো।

বুড়ঢা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এনিথিং রং ড্যাড?

কিছু সন্দেহ করে সোহাগও বেরিয়ে এল, কী হয়েছে মা? আমি দেখছি।

অমল চাপা গলায় বলল, তোরা ঘরে যা। বি অন দি সেফ সাইড। আমি দেখছি।

বুড়ঢা অবশ্য এগিয়ে এসে বলল, ইনট্রিউডার?

তাই মনে হচ্ছে।

অমল দরজাটা খুলল না। নক করল।

ভিতরে কথাবার্তা থেমে গেল। একদম চুপ।

অমল ফের নক করে বলল, দরজা খোলো।

কোনও কাজ হল না কথায়। অগত্যা অমল চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল।

ভিতরে আবছা আলোয় দুই নগ্ন নরনারী তাড়াতাড়ি তাদের পোশাক পরে নেওয়ার নিস্ফল চেষ্টা করছিল। অমল আলোটা জ্বেলে দিল।

দুটি নগ্ন নরনারী তাদের নগ্নতা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।

অমল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে বলল, আপনারা পোশাক পরে বেরিয়ে আসুন।

মোনা বলল, কারা?

অমল একটা মাথা নাড়া দিয়ে বলল, ছেলেটাকে চিনি না। মহিলা ওপরের তলার সুহাস মজুমদারের বউ।

কে! পিউ?

হ্যাঁ।

সর্বনাশ! পিউ কী করছিল আমার ঘরে?

ওকেই জিজ্ঞেস করো।

ছিঃ ছিঃ। সেই জন্যেই আমার শোওয়ার ঘরে মাঝে মাঝে কন্ডোম পাওয়া যায়! ছেলেটা কে?

কী করে বলব? তবে ভদ্রলোকের মতোই তো চেহারা।

সে ছেলেমেয়ের দিকে চেয়ে বলল, তোদের দেখলে লজ্জা পাবে। তোরা বরং একটু আড়ালে যা।

সোহাগ তেতো মুখে বলল, আমাদের ফ্ল্যাটে এসব কী হচ্ছে বলো তো! কেন এরকম হবে?

অমল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, বাসুদেব স্কাউড্রেলটাকে আজ রাতেই বিদেয় করে দেব বুঝলে?

মোনা বলল, বিদায় করব মানে? ওকে পুলিশে দেব। বুড়ঢা থানায় ফোন কর তো!

অমল বলল, প্লিজ! অতটা কোরো না। পুলিশ এলে বিচ্ছিরি লজ্জার ব্যাপার হবে।

হোক। তা বলে ছেড়ে দেব? কোথায় গেল বলো তো! নীচে গিয়ে কোথাও আড্ডা মারছে হয়তো

ধীরে দরজা খুলে মাথা নিচু করে দুজন বেরিয়ে এল। ছেলেটি লম্বা, ফর্সা এবং সুপুরুষ। মেয়েটিকে তারা সবাই চেনে, ওপরের তলার পিউ। চমৎকার ফিগারের জন্য তার প্রশংসা হয়ে থাকে।

কোথাও কিছু না, হঠাৎ বুড়টা একটু খাপ্পা হয়ে এগিয়ে এসে লোকটাকে ঠাস করে একটা চড় মারল।

লোকটা পালাল না। দাঁড়িয়ে একটু অবাঙালি টানে বাংলাতেই বলল, মারছেন কেন? আমি কী করেছি?

কিছু করনি!

অন্যায় কিছু করিনি। এ বাড়ির কেয়ারটেকারকে নগদ একশো টাকা দিয়ে তবেই ঢুকেছি। এতে অন্যায়ের কী আছে?

আটান্ন

লোকটার সাহস এবং স্মার্টনেস দেখে অবাক হন অমল। একজন সৎ ও সাহসী লোকের যে-গুণগুলো থাকে আজকালকার বদমাইশরাও কি সেইসব গুণ অর্জন করছে নাকি? অন্যের ফ্ল্যাটে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ঢুকে অন্যের বিছানায় পরস্ত্রীর সঙ্গে ফুর্তি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। পরিস্থিতি ওর সম্পূর্ণ প্রতিকূল। এই অবস্থায় লোকে ঘাবড়ে যায়, তোতলায়, উলটোপালটা মিথ্যে কথা বলে, হাতে- পায়ে ধরে বা কাকুতি-মিনতি করে। এ তো অকুতোভয়, বিন্দুমাত্র ঘাবড়ায়নি এবং বেশ হিসেব করে তেজের সঙ্গে মুখে মুখে জবাব দিচ্ছে! এর তো পিঠ চাপড়ে দেওয়া উচিত।

আর একটা হতাশার চড় তুলেছিল বুডঢা, অমল গিয়ে তাকে আটকাল। বলল, এসব করা ঠিক নয়। ঘরে যা, আমি দেখছি।

বুডটাকে না আটকালে বুডঢা হয়তো আবার মারত। সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হত না। অবাঙালি ছেলেটা বুডঢার চেয়ে অনেক লম্বা এবং অ্যাথলেটিক চেহারার মানুষ। উলটে সে বুডঢাকে মারলে বিপদ ঘটবে। মারপিট ব্যাপারটা অমল একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

স্কাউড্রেল! ইতর! বদমাশ! বলে গালাগাল দিতে দিতে বুডঢা গিয়ে তার ঘরে ঢুকে একটা বেসবল ব্যাট হাতে করে বেরিয়ে এল।

লোকটা অমলের দিকে সটান তাকিয়ে বলল, আপনার ছেলেকে ঝামেলা করতে বারণ করুন। আই অ্যাম সরি। আমি জানতাম এ-ফ্ল্যাট এসব কাজে ভাড়া দেওয়া হয়।

অমল শান্ত থাকার চেষ্টা করছিল, কিন্তু উত্তেজনায় তার গলা কাঁপছে এবং স্বরভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। সে বলল, আপনি এই ফ্ল্যাটে আগেও এসেছেন?

তিন চারবার।

আমি যদি পুলিশ ডাকি?

ছেলেটা অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাকিয়ে বলল, ডাকলে ডাকবেন। কী আর হবে বলুন, পুলিশ কিছু টাকা খাবে। তার চেয়ে ইফ ইউ ওয়ান্ট মানি, আই শ্যাল পে ইউ। কেন ওসব ঝামেলায় যাবেন? এটা ফ্যামিলি অ্যাপার্টমেন্ট জানলে আমি আসতাম না।

এ-ফ্ল্যাটের সন্ধান আপনাকে কে দিয়েছে?

উনি। বলে পিউকে ইশারায় দেখিয়ে দিল।

পিউ বেরোতে পারেনি, কারণ, বুডটা দরজাটা আটকে দাঁড়িয়েছিল তখন থেকে। সে দেওয়ালের দিকে সরে গিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। চুপচাপ।

এবার মোনা তাকে জিজ্ঞেস করল, এসব কী পিউ?

আই অ্যাম সরি বউদি। এক্সট্রিমলি সরি।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু সরি বললেই তো হল না। তুমি কী কাণ্ড করছ তা তুমি জানো?

আমি পরে এসে আপনাকে সব বুঝিয়ে বলব। প্লিজ, এখন এটা নিয়ে চেঁচামেচি করবেন না।

মোনা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলল, পিউ, তোমার একটা পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে আছে। তুমি একজন হাউজওয়াইফ। এই লোকটাকে কোথা থেকে জুটিয়েছ?

আপনাকে পরে বলব বউদি।

তুমি যেমন মেয়েই হও তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু ওসব নোংরামি আমার ফ্ল্যাটে কেন?

পুজোর সময় আপনারা অনেকদিন ছিলেন না। তখন বাসুদেব—

ফ্ল্যাট খালি ছিল বলেই সেটাকে অপবিত্র করতে হবে? তোমার বিবেক কি তাই বলে?

পিউ আর কথা বলল না। চুপ করে নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মোনা অমলের দিকে চেয়ে বলল, তুমি থানায় ফোন করে দাও। পুলিশ এসে যা করার করুক।

এতক্ষণ বাদে হঠাৎ সোহাগ বলল, আমাদের ফোন তো ডেড।

তাহলে বুড্ঢা, তুই যা তো দারোয়ানদের ডেকে আন।

স্মার্ট ছেলেটা মোনার দিকে চেয়ে বলল, ম্যাডাম, ব্যাপারটা এত বেশি সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন?, আমি কলকাতায় একা থাকি। আই নিড গার্লফ্রেন্ডস।

তার জন্য তো হোটেল আছে, গেস্ট হাউস আছে, ব্রথেলস আছে। আমার ফ্ল্যাটে কেন, উড ইউ এক্সপ্লেন?

প্লেসটা মেয়েরাই ঠিক করে। ওটাই সিস্টেম। আপনার ফ্ল্যাটে আসাটা আমার ভুল হয়েছে বুঝতে পারছি। আমি বরং কিছু টাকা দিয়ে যাচ্ছি ফর এনি ড্যামেজ আই হ্যাভ ডান। লেট আস মেক পিস। ফাইফ থাউজ্যান্ড ম্যাডাম? ইজ দ্যাট ওকে?

এবার বেসবল ব্যাটটা নিয়ে আর একবার এগিয়ে এল বুডটা। তাকে ফের ঠেকিয়ে অমল বলল, আপনার নাম কী?

অরুণ মালিক। বিজনেসম্যান। আমার কার্ডটা রেখে দিন বরং। নাথিং টু হাইড অন মাই সাইড। আমি পাটনার লোক। কলকাতায় মাসে দু-চারবার আসতে হয়।

ফুর্তি করতে নাকি?

না স্যার। বিজনেসে আসি।

ছেলেটা তার দামি ওয়ালেট খুলে একটা সুদৃশ্য কার্ড বের করে অমলের হাতে দিয়ে বলল, আই অ্যাম এ জেনুইন পারসন। নট এ ফ্রড। ইচ্ছে করলে আমার মোবাইল ফোন-এ আপনি পাটনার নম্বর ডায়াল করে জেনে নিতে পারেন।

আপনি ম্যারেড?

না স্যার। আমি এখনও ব্যাচেলর। পুলিশ ডেকে যদি ধরিয়ে দেন তাহলেও আমার কিছু হবে না। পুলিশ টাকা পেয়ে ছেড়ে দেবে, কে দেবে না। তার চেয়ে আমি ফাইভ থাউজ্যান্ড অফার করেছি, প্লিজ হাস ইট আপ।

অমলের খুব ক্লান্ত লাগছিল। আজ সে অনেকক্ষণ টানা গাড়ি চালিয়েছে। চাইনিজ ডিনারটাও বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। ঘুম পাচ্ছে। সে মোনার দিকে চেয়ে বলল, কী করবে মোনা?

তুমি কী করতে চাও?

বুঝতে পারছি না। এরকম অদ্ভুত সিচুয়েশনে তো পড়িনি কখনও।

ছেড়ে দাও। কিন্তু কাল সকালেই মিস্টার মজুমদারকে তুমি নিজে গিয়ে ব্যাপারটা জানাবে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

এরপর লোকটার দিকে চেয়ে অমল বলল, নাউ ইউ মে গো।

হিপ পকেট থেকে একগোছা পাঁচশো টাকার নোট বের করেছিল ছোকরা। অমল সেদিকে তাকিয়ে বলল, আপনি খুব টাকায় বিশ্বাসী, না?

ছোকরা থমকে গিয়ে বলল, না স্যার, ব্যাপারটা ওভাবে নেবেন না। আই অ্যাম জাস্ট ট্রায়িং টু কমপেনসেট।

আপনার কি মনে হয় আমরা যে-শকটা পেয়েছি তা টাকা দিয়ে কমপেনসেট করা যাবে? বিশেষ করে আমাদের ছেলেমেয়েরা যে-শকটা পেয়েছে?

আই আম রিয়েলি সরি স্যার। ভেরি সরি।

টাকাটা পকেটে রেখে দিন। অ্যান্ড প্লিজ গেট আউট।

ইয়েস স্যার। অ্যাজ ইউ প্লিজ।

মোনা পিউয়ের দিকে চেয়ে বলল, তুমিও যাও।

মোনা আর অরুণ দুজনে দরজার দিকে নিঃশব্দে এগোল। দরজার কাছ থেকে ফিরে অরুণ হঠাৎ বলল, স্যার, যদি কিছু না মনে করেন তবে একটা কথা বলব?

কী?

শুনলাম আপনাদের ফোনটা খারাপ আছে। আপনি ইচ্ছে করলে আমার মোবাইল ফোনটা রেখে দিতে পারেন। রোমিং সিম কার্ড লাগানো আছে। আমার আরও দুটো মোবাইল ফোন আছে, কোনও অসুবিধে নেই। কয়েকদিন কাজ চালিয়ে নিন, আমি কাল সকালে চার্জারটা পাঠিয়ে দেব।

না, আমার মোবাইল ফোনের দরকার নেই।

রেখে দিন স্যার। আমি কয়েকদিন পরে এসে নিয়ে যাব।

না, আমি আর আপনার মুখ দেখতে চাই না। প্লিজ গো।

অ্যাজ ইউ প্লিজ, বলে ছোকরা বেরিয়ে গেল। পিছু পিছু পিউ।

বুড়োর মুখ রাগে ফেটে পড়ছিল। বলল, তোমরা লোকটাকে ছেড়ে দিলে বাবা? ধোলাই দেওয়ার দরকার ছিল।

কী লাভ? একটা সিন ক্রিয়েট করা হত। লোকটা বদমাশ, কিন্তু ওর চেয়ে বাসুদেব বেশি ক্রিমিন্যাল। আর এই পিউ।

সোফায় বসে মোনা ক্লান্ত স্বরে বলল, আমার শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে। বোধহয় প্রেশার বেড়ে গেছে।

সোহাগ গিয়ে তার মায়ের পাশে বেড়ালের মতো গুটিসুটি হয়ে বসে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, চলো আমার বিছানায় একটু শুয়ে থাকবে। ইউ লুক সিক!

ঘেন্নায় গা রি রি করছে। এই বেডরুমে আজ আর আমি ঢুকতেই পারব না। মা গো! কী জানোয়ার হয়ে গেছে মানুষ! আমি এখনও বুঝতে পারছিনা, পিউ এরকম কাজ কী করে করতে পারে। দেখা হলে এমনিতে তো কত ন্যাকা ন্যাকা কথা!

এসব নিয়ে এখন ভাবতে হবে না। একটা সেডেটিভ খেয়ে শুয়ে থাকো। টেক রেস্ট।

মোনা উঠে অমলের দিকে চেয়ে বলল, বাসুদেব এখনও ফিরল না। ও ফিরলে আমাকে ডেকো তো।

অমল বলল, বাসুদেবের ফেরার চান্স খুব কম। আমরা যে এসে গেছি তা ও হয় দারোয়ানদের কাছে জেনে যাবে না হয় তো গ্যারাজে গাড়ি দেখে বুঝবে। সুতরাং হি উইল স্ক্যাম।

কী সাংঘাতিক শয়তান বলো তো!

তাই তো দেখছি।

তুমি বরং বাইরের ঘরে সোফাতেই শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দাও। কাল বেডরুম ভাল করে ডেটল ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার না করিয়ে ও-ঘর আমি ব্যবহার করব না। ওয়াশিং মেশিনে চাদর বালিশের। ওয়াড় সব কাচতে হবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। তুমি সোহাগের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকো।

মোনা সোহাগের ঘরে গিয়ে শুল।

বুড়ঢা বলল, বাবা, সোফায় বরং আমি শুচ্ছি, তুমি আমার বিছানায় শুয়ে থাকো।

আরে না। আমার ঘুম চটে গেছে। আমি বরং বসে একটু বই-টই পড়ি, তুই শুয়ে পড় গিয়ে।

সবাই শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়েও পড়ল বোধহয়।

একা অমল বাইরের ঘরে সোফায় অনেকক্ষণ বসে রইল। নৈতিক অধঃপতনের কথাই ভাবছিল সে। অনেক বছর আগে সে কি ওই অরুণ মালিকের চেয়ে উচ্চতর মানুষ ছিল? এক দুরন্ত দুপুরের স্মৃতি যেন হাউড় বাতাসের মতো ধেয়ে এসে তার শ্বাসনালি আটকে দিচ্ছিল। তার হাতে একটি প্রস্ফুটিত ফুল্ল কুসুম ঝরে পড়ে গিয়েছিল। এক সুন্দরকে মলিন করে দিয়েছিল সে।

পতিতাগমনের অভ্যাস তার তৈরি হয়েছিল ইনজিনিয়ারিং পড়ার সময়েই। তারপর পারুল তাকে প্রত্যাখ্যান করায় প্রতিহিংসায় পাগলের মতো হয়ে সে আরও ভেসে গিয়েছিল। আজ মধ্যবয়স্ক, শান্ত ও নির্জীব বটে সে, কিন্তু অনেক প্রায়শ্চিত্তই তার বাকি।

তার কাল অতিক্রান্ত। অরুণ মালিকের মতো এ-যুগের লম্পটরা লুকোছাপার ধার দিয়েও যায় না। তাদের গোপন করার মতোও কিছু নেই। ধরা পড়লেও তারা চোখে চোখ রেখে দিব্যি ঠান্ডা মাথায় কথা কইতে পারে। এ-বিদ্যে অমলের নেই। আজ একটি ঘটনার গ্লানি তার গায়ে এঁটেল মাটির মতো লেগে আছে।

জেনারেশন গ্যাপটা বড্ড বিশাল। মাত্র কুড়ি বছরের তফাতে এ-দেশের মানুষ কত পালটে গেছে।

তার অন্যমনস্কতার সুযোগে চোখের সামনেই মানুষ কতটা পালটে গেছে তার প্রমাণ অমল পেল পরদিন সকালে।

পিউয়ের স্বামী সুহাস মজুমদার একজন চোখা চালাক মধ্য ত্রিশের লোক। বেশ স্মার্ট হাসিখুশি। ওদের ফ্ল্যাটে প্রায়ই পার্টি-টার্টি হয়। তার একটা কনসালটেনসি ফার্ম আছে বলে অমল জানে। তবে সেটা কীসের

কনসালটেনসি তা জানা নেই। একখানা ফিয়াট গাড়ি আছে। সুতরাং পয়সাওলা লোক। বলেই মনে হয়। এইসব তথ্য দিয়ে একটা মানুষ সম্পর্কে কোনও অঙ্কই মেলানো যায় না।

অঙ্কটা আজ সকালে আরও বিপথে চলে গিয়ে গোলমেলে হয়ে দাঁড়াল।

অমল মুখোমুখি সুহাসকে ব্যাপারটা বলতে সংকোচ বোধ করছিল বলে সকালে কাছে-পিঠের একটা বুথে গিয়ে ফোন করল।

সুহাসের আহ্লাদিত গলা বলে উঠল, হেল্লো! মজুমদার হিয়ার।

সুহাসবাবু, আমি অমল রায় কথা বলছি।

গলায় আরও একটু আহ্লাদ মিশিয়ে সুহাস বলল, আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন। কী খবর?

ইট মে বি শকিং টু ইউ। কীভাবে বলব তা ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু বলাটাও দরকার।

আরে, সংকোচ করছেন কেন? বলেই ফেলুন না।

ইট ইজ রিগার্ডিং ইওর ওয়াইফ পিউ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।

আমরা কলকাতায় ছিলাম না।

হ্যাঁ, আপনারা তো উইক এন্ডে কোথায় একটা র্যানচ হাউসে যান বলে শুনেছি।

র‍্যানচ হাউস নয়, আমাদের গ্রামে যাই।

দ্যাটস গুড। তারপর বলুন।

কাল একটু আন-এক্সপেকটেডলি আমরা রাত বারোটা নাগাদ ফিরে আসি। এসে দেখি আমাদের বেডরুমে পিউ আর একটি ছেলের সঙ্গে শুয়ে আছে।

সুহাস মজুমদারের শক অ্যাবজর্ভারগুলো বোধহয় খুবই ভাল। বিন্দুমাত্র না চমকে খুবই আপসসাসের ভান করে একটা চুকচুক জাতীয় শব্দ করে সে বলল, দ্যাটস ব্যাড, ভেরি ব্যাড।

আপনি কি কাল রাতে বাড়িতে ছিলেন না?

ছিলাম। তবে নট ইন মাই সেনসেস। বুঝতেই তো পারছেন। তাজ-এ পার্টি ছিল। ড্রাইভার ধরে ধরে এনে ফ্ল্যাটে তুলে দিয়ে যায়।

বলে খুব আহ্লাদের হাসি হাসল সুহাস মজুমদার।

আপনার জানা দরকার যে ছোকরার নাম অরুণ মালিক।

ও। ইটস ওকে মিস্টার রায়। আমি দেখছি।

সুহাসবাবু, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা আপনি গায়ে মাখছেন না।

সুহাস মজুমদার একটু চুপ করে থেকে বলল, পিউ তো একজন স্বাধীন মহিলা মিস্টার রায়, তাই না?

তাই নাকি? স্বাধীন মহিলা কাকে বলে আমি অবশ্য জানি না। তাদের কি লাভার নিয়ে অন্যের ফ্ল্যাটে অনধিকার প্রবেশ করে ফুর্তি করার স্বাধীনতা আছে?

আই অ্যাম সরি ফর দ্যাট। কিন্তু কমপেনশেসন দিলে চলবে?

তার মানে?

আরে মশাই, উই আর নাউ ইন এ পারমিসিভ সোসাইটি। এসব কি কেউ মাইন্ড করে?

আপনি না করলেও আর কেউ যে করবে না তা তো নয়।

সে যাই হোক, মিস্টার রায়। আমরা দুজনেই খুব দুঃখিত।

আমার সন্দেহ হচ্ছে পিউ যা করেছে তা আপনার অজানা ছিল না।

বললাম তো মিস্টার রায়, পিউ একজন স্বাধীন মহিলা, আমার কেন বাঁদি তো নয়। আমিও নই তার কেনা গোলাম। উই হ্যাভ আওয়ার পারসোন্যাল লিবারটিজ।

অবশ হাত থেকে প্রায় খসেই পড়ে যাচ্ছিল ফোনটা। না, দুনিয়া তাকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। স্ত্রীর ব্যাভিচারের খবরেও যে-মানুষ দেবশিশুর মতো নিরুদ্বেগ ও অবিচল থাকে তার কাছে কি অমলের অনেক কিছুই শেখার নেই?

সে নিজেকেই প্রশ্ন করল, ব্যাপারটা কী?

অঙ্কটা যে মিলবে না তা সে জানত, কিন্তু এতটাই গরমিল হবে বলে বুঝতে পারেনি। খানিকক্ষণ ভ্রু কুঁচকে থেকে অমল হঠাৎ হেসে ফেলল একা একাই। সাহেবরা অনেক বেশি পারমিসিভ বটে, কিন্তু তাও এতটা সহ্য করে না। পৌরুষে লাগে।

বাড়ি ফিরে অফিসের জন্য তৈরি হচ্ছিল অমল। বাসুদেব না থাকায় আজ মোনা আর সোহাগ রান্নায় নেমেছে। এজেন্সিকে ফোন করে দেওয়া হয়েছে, তারা কাজের লোক পাঠিয়ে দেবে। আজ সকালেই তারা স্থির করেছে আর উটকো কাজের লোক রাখা হবে না। এজেন্সির লোক বরং ভাল, কিছু করলে এজেন্সি দায়ি থাকবে।

মোনা তাকে খাবার দিতে এসে বলল, একটু আগে পিউ এসেছিল।

তাই নাকি? কী চায়?

ভিতরে আসেনি। দরজা খুলে দেখি, দাঁড়িয়ে আছে। পরনে নাইটি। মুখেচোখে লজ্জা সংকোচের বালাই নেই। বলল, কাল আমি একটা জিনিস ফেলে গিয়েছি। নিতে এলাম।

কী জিনিস?

বলল, আংটি। আমি বললাম, ও-ঘরে আমরা এখনও ঘেন্নায় ঢুকিনি। আজ ঘর পরিষ্কার করা হবে। তখন পাওয়া গেলে পাঠিয়ে দেব।

আর কিছু বলল না?

মনে হয় বলতে চাইছিল। আমি মুখের ওপরেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। তুমি বরং অন্য কোথাও ফ্ল্যাট দেখ। এই ঘটনার পর আমার আর এখানে ভাল লাগছে না।

কেয়াতলার মতো ভাল জায়গা কোথায় পাবে? আর এসব এলিমেন্ট সব জায়গাতেই আছে।

মোটেই না। এসব মেয়েকে কী বলে জান?

জানি। হাফ গেরস্ত।

হ্যাঁ। অনেক মেয়ে বউ আছে যারা পার্ট টাইম প্রস্টিটিউশন করে সংসার চালায়। কিন্তু পিউরা তো তা নয়। ওদের পয়সার অভাব নেই।

কে বলল নেই?

আছে! দেখে তো মনে হয় না। সুহাস মজুমদারের নাকি অনেক পয়সা শুনতে পাই।

পয়সা থাকলে কী হবে? অভাব তো মনে। পয়সার অভাব থেকে তো পয়সার অভাব আসে না। আসে মন থেকে।

সুহাস তোমাকে কী বলল?

খুব সারপ্রাইজিং কথাবার্তা বলল।

কীরকম?

মনে হল, সবই জানে। অবাক হল না।

দেখ তো, হয়তো বউ ভাঙিয়ে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। পুরুষমানুষরা সব পারে।

হ্যাঁ, এবার অঙ্কটা মিলে গেল অমলের। তাই তো! এরকম তো হতেই পারে। অরুণ মালিক তো সুহাস মজুমদারের একজন কাস্টমারও হতে পারে। আর বিজনেসের ব্যাপারে মেয়েদের কাজে লাগানো নতুন কিছু নয়।

আজ বাজার করল কে বল তো!

বুড়ো।

বুড়ো বাজার করতে পারে বুঝি?

করল তো! শুধু পরিমাণটা একটু গোলমাল করেছে। পাঁচশো গ্রাম উচ্ছে নিয়ে এসেছে। মাছটা ভালই কিনেছে।

এইভাবেই তারা চারজন প্রাণী ক্রমে আরও একটু কাছাকাছি হচ্ছে বলে মনে হয় অমলের। আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের ব্যাপারটা কমছে, উদাসীনতা বা উপেক্ষা কমছে। একটা ঘরের মধ্যে যে কত কুরুক্ষেত্র লুকিয়ে থাকে!

অফিস থেকে ফিরে অমল দেখল একজন মধ্যবয়স্কা গ্রাম্য চেহারার মহিলা কাজে বহাল হয়েছে। বেতন আটশো টাকা। মুখখানা দেখে ভালমানুষ বলেই মনে হয়। বাসুদেব ফিরে আসেনি, তবে তার দেশের একজন লোক এসেছিল। সে খবর দিয়েছে, বাসুদেবের মায়ের খুব অসুখ। খবর পেয়ে সে দেশে চলে গেছে। সে আর কাজ করবে না। তার জিনিসপত্র আর বকেয়া বেতন যেন লোকটার হাতে দেওয়া হয়। মোন তাকে বলে দিয়েছে, বাসুদেবের নামে পুলিশে ডায়েরি করা হয়েছে, সে এলেই পুলিশ তাকে ধরবে। টাকা-পয়সা বা জিনিস কিছুই দেওয়া হবে না।

রাতে দুজনে এক বিছানায় শোয়ার পর মোনা বলল, জান, আমার এখনও কেমন যেন ঘেন্না করছে।

ঘেন্নার কী আছে? ওরা তো আদিম নরনারীর পবিত্র কাজটাই করছিল।

পবিত্র কাজ বুঝি? মুখে আটকাল না বলতে?

তা নয়তো কী? ওর ভিতর দিয়েই সন্তান আসে।

ওরা তো আর সেজন্য অসভ্যতা করছিল না।

তা অবশ্য ঠিক। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

কী হল?

আজকালকার ডাক্তাররা যা করে। একগাদা টেস্ট করাতে বলল।

কিন্তু ডাক্তার তো আজই বিদেশে চলে যাচ্ছে বলছিলে।

হ্যাঁ। তবে এক মাসের জন্য।

ততদিন অপেক্ষা করতে হবে? বাজারে কি ডাক্তারের অভাব?

আসলে একে একজন রেফার করেছিল।

কী হয়েছে তোমার?

মোনা একটু হাসল। অমলের গলাটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিয়ে বলল, বউকে নিয়ে পুরুষের দুশ্চিন্তা কখন শুরু হয় জান?

কখন?

বুড়ো হলে। তাই বলি, তুমিও বুড়ো হচ্ছ নাকি?

তা তো হচ্ছিই। কী হয়েছে তোমার?

হয়তো কিছুই নয়।

হয়তো কেন?

পরীক্ষা করলে জানা যাবে।

আমাকে বলতে চাইছ না কেন?

ইউটেরাসে টিউমারিক গ্রোথ বলে আলট্রাসোনোতে ধরা পড়েছে।

বিপজ্জনক কিছু?

কে জানে কী। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মোনা।

এটা এমন কিছু গোপন করার মতো ব্যাপার তো ছিল না। তাহলে আমার কাছে গোপন করছিলে কেন মোনা?

একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তোমার সঙ্গে একটা দূরত্ব ছিল তো। তখন সব কথা চেপে রাখতাম। সেই থেকে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল।

মোনাকে হঠাৎ প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে অমল বলল, কাছে এসো, আরও কাছে। কত কাছে আসতে পার।

এ বাবা! দম বন্ধ হয়ে আসছে যে! পাগলটা কোথাকার।

অমলের মনে হল, এত কাছে, তবু কি দূরত্ব নেই?

ঊনষাট

টুপুকে সে পুকুরে স্নান করতে দেখেছিল। টুপু বেশ দীঘল, লম্বাটে ঢলঢলে মুখ। চোখ দুখানা খুব ঝকঝকে। এসব আগে কখনও দেখেনি সে। পরশু দেখল। দুপুরবেলা সে উঠেছিল মনু পিসিমার আমগাছে ভীমরুলের চাক ভাঙতে। কষে ঘুঁটে আর ভেজা তুষ এবং কাঠকুটোর ধোঁয়া দিয়েছিল মনুপিসি। শীতের দুপুরে থম-ধরা বাতাসে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠতেই ভোঁ ভোঁ করে একটি দুটি ভীমরুল উড়ে যেতে লাগল। ধোঁয়া মোটে সহ্য হয় না ওদের। উড়ন্ত কীট পতঙ্গরা ধোঁয়া সহ্য করতে পারে না কখনও।

মনুপিসি কদিন ধরেই বলছিল, সবাইকে বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গেল বাবা, ভীমরুলের চাক ভাঙতে কেউ সাহস পায় না। তুই তো ডাকাবুকো আছিস, দে বাবা ভেঙে, নইলে কবে কোন দুষ্টু ছেলে দূর থেকে ঢিল মেরে পালায়, তখন কি রক্ষে আছে? ভীমরুলের হুল যমের দোর। শয্যে নিতে হবে। দে বাবা ভেঙে, পেট ভরে পিঠেপায়েস খাওয়াব।

মরণ এসব কাজ খুব পারে। বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছির হুল কতবার খেয়েছে সে। ওসব তার তেমন লাগে না। গতবার যখন একটা প্রায় এক ফুট লম্বা পাকা তেঁতুলবিছে তাকে কামড়েছিল তখন তো ব্যথায় নাকি তার হার্টফেল করার কথা। কিন্তু সেই আশ্চর্য সাংঘাতিক ব্যথাও প্রায় নীরবে সহ্য করেছিল সে। পাড়ার লোকে তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায় ভয় পেয়ে। সেখানকার ডাক্তারবাবু পর্যন্ত তাকে অবশ করার ইনজেকশন দেওয়ার সময়ে বলেছিল, এ ছেলেটির ব্যথা সহ্য করার শক্তি তো সাংঘাতিক! এসব কেসে ব্যথায় তো অনেকে মরেও যায়।

মরণ মরেনি। বরং তার মনে হয়েছে, সে এর চেয়েও বেশি ব্যথা অনায়াসে সহ্য করতে পারে। মানুষ ব্যথাকে খুব ভয় পায়। মরণ পায় না। বরং ব্যথাকে তার কখনও কখনও বন্ধু বলে মনে হয়।

আমগাছটা বড্ড পুরনো। বর্ষাকালে মনুপিসির এই আমগাছের কোটর থেকে সে একটা সাপকে বেরোতে দেখেছিল। কে জানে সাপটা হয়তো এখন কোটরের মধ্যে শীতঘুম ঘুমোচ্ছে। মোটা আমগাছটায় হালকা শরীরে দিব্যি উঠে গেল মরণ। কোমরে দা। ভীমরুলের মস্ত মাটির চাকটা অনেক ওপরে। এক-আধটা ভীমরুল থেকেও যেতে পারে হয়তো। কিন্তু এসব ভয় মরণের নেই। সে বিশাল চাকটাকে দা দিয়ে কুপিয়ে ভেঙে ফেলতে লাগল টুকরো টুকরো করে। একটু মায়াই বরং হচ্ছিল তার। কী সুন্দর মসৃণ চাকটা বানিয়েছে ভীমরুলরা, কত কষ্ট করে।

আর তখনই নীচের পুকুরে তাকিয়ে সে টুপুকে দেখতে পেয়েছিল। জলে ডুব দিয়ে উঠছে। লম্বা চুল লেপটে আছে গালে, কপালে। ভেজা ফ্রক আঁকড়ে ধরেছে লতানে শরীর। বুকে সদ্য ফুটে ওঠা দুটি স্তন। দেখতে নেই। ওসব দেখতে নেই। লজ্জার কথা। তবু কি চোখ মানে! পাপ হচ্ছে। "শিবঠাকুর! শিবঠাকুর!" বলে যে বিড়বিড় করল কয়েকবার। কিন্তু এ যেন আঠাকাঠিতে আটকে পড়া পাখি। তার চোখ বারবার ধেয়ে যায় টুপুর দিকে।

ডুব দিয়ে উঠে ফের সাঁতার কাটছিল টুপু। গাঁয়ের মেয়েরা ভাল সাঁতার জানে না। ঘুপ্ ঘুপ্ করে জল ভেঙে ভেঙে এগোয়। আমগাছে ডালপালার আড়ালে বসে চোরের মতো দেখছিল মরণ।

নীচে উর্ধ্বমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনুপিসি।

ও মরণ! সবটা ভেঙেছিস তো বাবা? ভাল করে জায়গাটা চেঁছে দে। বাসার গোড়া থাকলে আবার না এসে জোটে।

না পিসি, আর জুটবে না। ভাল করে চেঁছে দিয়েছি।

তাহলে নেমে আয় বাবা। পরের ছেলে, পড়ে-উড়ে গেলে বড় পাপ হবে।

মরণ তবু একটু অপেক্ষা করল, টুপু জল থেকে উঠে গামছা নিংড়োচ্ছ, দুটো হাত তুলে মাথা মুছছে। চুলে গামছার ঝটকা মারছে। মুগ্ধ চোখে দেখছিল সে।

টুপুকে সে পুকুরে স্নান করতে দেখছে। টুপুর বয়স চৌদ্দ। তার চেয়ে দু বছরের বড়। কিংবা তাও নয়। এক বছর কয়েক মাস।

কেউ তাকে বারণ করেনি তবু তার মনে হয়, বড় মেয়েদের এভাবে দেখতে নেই। ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকলে মেয়েরা রাগ করে। দোষ হয়। টুপু অবশ্য তেমন বড় মেয়ে নয়। মরণের চেয়ে একটু বড়। ওরও ক্লাস সিক্স। এই তো সেদিনও টুপু গোল্লাছুট কি দড়ি লাফানো কি চারা ছুড়ে এক্কাদোক্কা খেলত, দুই বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেত। কতবার তাদের বাড়ি এসেছে নুন, তেল, চিনি ধার করতে। মায়ের সঙ্গে যোলো গুটি খেলেছে দুপুরে। কখনও তাকিয়েও দেখেনি মরণ। আজ সেই গুয়ের গ্যাংলা মেয়েটার ভিতর থেকে কি রাজকন্যা বেরিয়ে এল? রাজকন্যা বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। রাজকন্যাদের থাকে দুধে-আলতায় গায়ের রং—সেটা কীরকম রং তা অবশ্য মরণ জানে না। আর থাকে কুঁচবরণ কেশ। কুঁচফল খুব চেনে মরণ, তাদের বাড়ির বেড়াতেই তো কত লতিয়ে ওঠে। ছোট্ট দানার আধখানা লাল, বাকি অর্ধেক কালো। এত সুন্দর ফল যে কেন খাওয়া যায় না কে জানে। কুঁচবরণ কেশকি লাল না কালো তা নিয়ে ধন্ধ আছে মরণের। রাজকন্যাদের আরও কী কী সব যেন থাকে। না, টুপু মোটেই রাজকন্যার মতো নয়। তবু টুপুর ভিতর থেকে এক অচেনা টুপু বেরিয়ে এসে ওই চান করছে পুকুরের জলে। মরণ তাকে দেখছে, আর পাপ করছে। শিবঠাকুর এত পাপ সইবে কি? শিবঠাকুরকে তার বড্ড ভাল লাগে। সব দেবতার মধ্যে শিবঠাকুর তার সবচেয়ে প্রিয়। আর শিবঠাকুরকে মরণ যখনই ডাকে তখনই যেন এসে হাজির হন। না, চোখ খুললে দেখা যায় না ঠিকই, কিন্তু কষে চোখ বন্ধ রাখলে ঠিক তাঁর গায়ের সুন্দর বোঁটকা গন্ধটা পায় মরণ। শিবঠাকুর তো আর সাবান মাখে না, তার ওপর শ্মশান-মশানে পড়ে থাকে, গায়ে ছাই-টাই মাখে, বোঁটকা গন্ধ হতেই পারে। সেই গন্ধটা খুব ভাল লাগে মরণের।

শিবঠাকুরের কাছে মরণ যা চায় তাই শিবঠাকুর দিয়ে দেন। না, সব দেন না। আসলে শিবঠাকুর তো বড্ড ভুলো মনের মানুষ। আধখানা হয়তো দিলেন, বাকি আধখানা দিতে ভুলেই গেলেন। তবুমরণ যা চায় তার সবটাই প্রায় তাকে দিয়ে দেন শিবঠাকুর। তাঁর বরেই না তার মাকে মা বলে ডেকে ফেলল দাদা। দিদিটা তেমন সুন্দর হল না ঠিকই, কিন্তু কেমন ভাব করে গেল মরণের সঙ্গে! তাকে দাদা আর দিদির খুব পছন্দ হয়েছে। তারা বলে গেছে আবার আসবে। হয়তো বড়মাও আসবে একদিন। শিবঠাকুরের কাছে এই বরটা চেয়ে রেখেছে মরণ। হে ঠাকুর, বড়মা এসেও যেন আমাকে খুব ভালবাসে। আমি তো বাঁদর ছেলে,

লেখাপড়ায় নম্বর পাই না, আবার নামটাও ভারী বিশ্রী, তবু যেন বড়মা আমাকে অপছন্দ না করে। যেন বলে, ও মরণ, আমার সঙ্গে কলকাতায় চল তো বাবা! তোকে আমিই মানুষ করব। না, তা বলে মরণ হুট করে চলেও যেতে পারবে না। ঠিক বটে, মায়ের ওপর রাগ হলে সে মাঝে মাঝে কলকাতায় বড়মার কাছে চলে যাবে বলে ঠিক করে ফেলে। আবার এও মনে হয়, মাকে ছেড়ে সে তো থাকতেও পারবে না। মা কেঁদে কেঁদে মরেই যাবে। আর মাকে ছেড়ে তারও খুব মন খারাপ হবে।

জিজিবুড়ি অবশ্য খলখল করে হেসে বলে, ওরে, ও ডাইনি এল বলে। আগে ছানাপোনা পাঠিয়ে তত্ত্বতালাশ নিয়ে রাখল। ওরা হচ্ছে ডাইনির চর। তারপর সে এসে মুষলপর্ব শুরু করবে। তোর মেনিমুখো মা পারবে তার সঙ্গে যুঝতে? বেড়াল কুকুরের মতো তাড়াবে। কত করে বললুম, ওলো, ভাইদের হাতে দলিল-টলিলগুলো সব দিয়ে রাখ। তারা ভাল উকিল লাগিয়ে সব বুঝে রাখবে। তা শুনল আমার কথা? কিছু কিছু করে টাকাপয়সা সরিয়ে আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে বললুম, তা মেয়ের কী রাগ! ওরে গর্ভধারিণী মাকে অবধি তোর বিশ্বাস হয় না এমন গুণ তোকে কে করল বল তো!

মরণ জানে জিজিবুড়ির অনেক দোষ আছে। কিন্তু মরণের তাকে মোটেই খারাপ লাগে না। জিজিবুড়ি তাকে অনেক গল্প শোনায়। আর কাছে বসলেই জিজিবুড়ির গা থেকে দোক্তার মিষ্টি গন্ধ আসে। আর জিজিবুড়ি খারাপ লোক হলেও মরণকে ভালবাসে খুব। অসুখের সময় তার শিয়রে বসে কী কান্না!

সংসারের এই খারাপ, ভাল লোকের বিচারটা ভাল বুঝতে পারে না মরণ। জিজিবুড়িকে বাড়ির সবাই খারাপ বলে, কিন্তু বুড়িটার জন্য মরণের বড় মায়া। সে অনেক সময়ে চুরি করে জিজিবুড়িকে জিনিসপত্র দেয়। বাঙাল কলকাতা থেকে ফি সপ্তাহে রাজ্যের জিনিস নিয়ে আসে। সংসারের যাবতীয় জিনিস— দড়িদড়া থেকে আচার আমসত্ত্ব সোনামুগের ডাল অবধি। সব জিনিসেরই অবশ্য হিসেব থাকে তার মায়ের। বাবা বেহিসেবি কেনাকাটা করলেও মা সব গুছিয়ে গুনেগেঁথে খাতায় লিখে রাখে। তাই থেকে মাঝে মাঝে জিজিবুড়ি চায়। মা দেয় না। তখন হয়তো চুপি চুপি মরণকে বলে, দিবি ভাই, এক শিশি মধু? বাঙাল নাকি কোথা থেকে খাঁটি চাকভাঙা মধু আনে। তা বাঙালরা খাবার জিনিস খুব চেনে। ওরা রাক্ষসের জাত ত, খেতে-টেতে খুব ভালবাসে।

তা দেয় মরণ। কিন্তু মায়ের কাছে ধরাও পড়ে যায়। মা একদিন গুম করে তার পিঠে কিল দিয়ে বলেছিল, অত আদিখ্যেতা কীসের রে? তুই দিতে যাস কেন? মাকে যখন যা দেওয়ার আমিই তো বুঝে- সুঝে দিই। কাঙাল ভিখিরির মতো হাত তো পেতেই আছে সব সময়। সব খাঁই মেটাতে গেলে তো আমার সংসার লাটে উঠবে। দানছত্র তো খুলে বসিনি।

তা জিজিবুড়ির জন্য একটু কষ্ট আছে বটে মরণের। মা বলে, জিজিবুড়ির কথায় নাকি এমন ধার যে লোহা কাটতে পারে। কটর কটর কথা বললেও জিজিবুড়ির কি গুণও নেই? মহাভারতের অত কথা জিজিবুড়ির মতো কেউ জানে? কত অবাক করা গল্প শোনায় তাকে জিজিবুড়ি!

তবে হ্যাঁ, যখন জিজিবুড়ি বড়মাকে ডাইনি ডাকে তখন তার কষ্ট হয়। কিংবা বলে, ওই বড় মাগী কি আর তোর মায়ের মতো বোকা মাথার মানুষ? শহুরে মেয়েছেলে বাবা, জাঁহাবাজ মানুষ, সাত হাটে তোর মাকে বিক্রি করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তার ওপর যদি সেও বাঙাল মেয়েছেলে হয়ে থাকে তবে তো আরও চিত্তির। শুনি তো নাকি হুগলির মেয়ে। ও বাপু, আমার বিশ্বাস হয় না। বাঙালরা কত ফেরতাই জানে। দ্যাখ

গে খোঁজ নিয়ে, সে মাগীও বাঙাল। এসব শুনলে মরণের ভারী রাগও হয়। বড়মার একটা ছবি সে তার মনের মধ্যে টাঙিয়ে রেখেছে। বড় বড় শান্ত চোখ, মুখে একটু প্রশ্রয়ের হাসি, আর ভারী ঢলঢলে দুর্গা প্রতিমার মতো মুখ। তবে না বড়মা! যদি সত্যিকারের বড়মা ওরকম নাও হয় তবু মরণ ঠিক মানিয়ে নেবে। জিজিবুড়ি যে কেন ওসব বলে।

মা কিন্তু কখনও বড়মা সম্পর্কে খারাপ কথা বলে না। তবে একটু ভয় পায়। মা অবশ্য সব কিছুতেই ভয় পায়। ভয়ের শেষ নেই মায়ের। দাদাকে ভয়, দিদিকে ভয়। বড়মাকে দেখেনি, কেমন মানুষ তাও জানে না। ভয়টা সে কারণেই। কিন্তু মরণ বড়মাকে ভয় পায় না। সে ঠিক জানে, শিবঠাকুর তার বড়মাকেও ঠিক মনের মতোই করে একদিন এই গাঁয়ে নিয়ে আসবেন।

সবাই জানে সে বাঁদর ছেলে। টুপুও তাই জানে। এ-গাঁয়ে মরণের কোনও সুনাম নেই। অনেকদিন আগে টুপুদের বাড়িতে বর্ষাকালে একদিন মেঘ কেটে রোদ ওঠায় তোশক বালিশ রোদে দেওয়া হয়েছিল উঠোনে। বিকেলবেলায় তোশক তুলবার সময় মস্ত এক কেউটে সাপ বেরিয়ে এসেছিল তোশকের ভাঁজ থেকে। প্রবল চিৎকার আর চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে গিয়েছিল মরণ। বাড়ির সবাই বারান্দায় উঠে পড়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল। বিশাল সাপটা বুকসমান ফণা তুলে দুলছিল উঠোনের মাঝমধ্যিখানে।

এসব মরণের কাছে জলভাত, কত সাপ মেরেছে সে। যদি বুদ্ধি থাকত তাহলে সাপেরা মরণের বিরুদ্ধে মিটিং বসাত। সে একখানা আধলা ইট তুলে ঘাঁই করে মেরে দিয়েছিল। তার হাতের টিপ কখনও ফসকায় না। একবারেই সাপের মাথা থেঁতলে দিয়েছিল সে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন তার ওই বাহাদুরিতে বাহবা দেওয়ার মতো বড় ছিল না টুপু। আর তখন লক্ষ করে দেখার মতোও ছিল না হাড় জিরজিরে মেয়েটা। এই টুপু অন্য আর একজন, যেন এ-গাঁয়ে নতুন আসা মেয়ে। একে কী বাহাদুরি দেখাতে পারে মরণ? ধারেকাছে তো ফণা-তোলা সাপ নেই!

গাছের একটা আড়া ডাল অনেকখানি এগিয়ে ঝুঁকে আছে পুকুরের ওপর। মরণ হিসেব করে দেখল ওই ডালটা বেয়ে যদি একেবারে শেষপ্রান্তে যাওয়া যায় তাহলে পুকুরের জলে লাফিয়ে পড়া সম্ভব। তবে একটু ভুলচুক হলে ঘাটের সান বাঁধানো সিড়িতে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। বাহাদুরিটা দেখাতে পারলে এই নতুন টুপু কি নতুন চোখে তাকে দেখবে না? একটু হিরোর মতো ভাববে না তাকে?

আড়া ডালটায় নামা কঠিন নয়, কিন্তু মুশকিল হল, গাছটা পুরনো, পোকা-টোকা লেগে যদি আড়া ডালটার গোড়া কমজোরি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আগার দিকে মরণের ভার বইতে না পেরে মড়মড় করে ভেঙে পড়তে পারে। তা পড়ুক, তাহলেও তো মরণের জন্য একটু আহা উহু করবে ওই নতুন টুপু!

ওপরের ডাল থেকে হাতের ঝুল খেয়ে তলার ডালটায় নেমে পড়ল মরণ। আড়া ডালটা মোটা, মরণ গাছের চরিত্র খুব ভাল চেনে, মোটা ডাল মানেই ভারী জিনিস। অনেকখানি ঠেকননাহীন ক্ষীণ ঝুলে আছে বলে এসব ডালই বেশি বিপজ্জনক, যখন তখন ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু অত হিসেব করার সময় নেই। টুপুর চুল ঝাড়া হয়ে গেছে। এবার চলে যাবে। হাওয়াই চটি জোড়া জলে ধুতে সিঁড়িতে নেমে টুপু জলেনামা অন্য কয়েকজন মেয়েছেলের সঙ্গে কথা কইছে। বিশ্বাস বাড়ির বড়বউ রাধিকা, নয়নের বুড়ি পিসি, কাদুর মা।

মরণ বুক হেঁচড়ে ডালটা বেয়ে বেয়ে ঠিক চলে এল ডগায়। ডালটা দোল খাচ্ছে খুব জোর। সামনে কোথাও কাকের বাসা আছে বোধহয়। কাকগুলো খুব ডেকে উঠল হঠাৎ। তাদের ক্রুদ্ধ ডানার শব্দ শোনা

যাচ্ছে। বিপুদ বুঝলে ঠিক এসে ঠুকরে দেবে মরণকে।

ডালটার ডগায় এসে মরণ বুঝতে পারল ফুটখানেকের হিসেব গোলমাল হয়েছে। লাফ দিলে জলে পড়তে পারে। আবার পৈঠাতে পড়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু হিসেব করলে আর বাহাদুরিটা কী হল?

মরণ ডালটা ধরে ঝুলে পড়ল প্রথমে। তারপর ট্রাপিজের খেলোয়াড়ের মতো শরীরটা বারকতক দুলিয়ে নিল ভাল করে। তারপর জলের দিকে ঝুল খেয়ে হাত ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল জলে। অনেকটা ওপর থেকে। এত ওপর থেকে কখনও যে জলে লাফায়নি সে এ কথাটা খেয়াল ছিল না তার। টুপ আজ মাথাটা গোলমাল করে দিয়েছে যে!

জলে পড়ার কিছু নিয়ম আছে। খাড়া হয়ে সরু হয়ে না পড়লে মসৃণভাবে জলে ঢুকে যাওয়া যায় চিৎপাত হয়ে পড়লে জলের চাটি খেতে হয়। মরণের জুটলও তাই। ডাইভ দিতে জানলে এরকমটা হত না। সে পড়ল নিরালম্ব চিৎপাত হয়েই। জলের প্রচণ্ড চাটি লাগল পিঠে, মাথায়। দম বন্ধ হয়ে এল তার ব্যথায়। সবজে নীল জল কলকল করে ঢুকল কানে, নাকে, চোখে। কয়েক ঢোঁক জল গিলেও ফেলল সে। চোখে অন্ধকার ঠেকল কিছুক্ষণ। কোন তলানিতে চলে যাচ্ছিল সে কে জানে। হাত-পা অসাড় লাগল কিছুক্ষণ। কিন্তু তবু গাঁয়ের পুকুরে দীর্ঘদিন স্নান করার অভ্যাস আছে বলে সে সামলেও গেল। ভুরভুরি কেটে ভুস করে যখন ভেসে উঠল তখন পুকুরধারে "গেল গেল" বলে শোরগোল উঠে গেছে।

সবার আগে মরণের চোখ পড়ল টুপুর ওপর। ভারী অবাক হয়ে চেয়ে আছে টুপু। মুখে ভয়, চাউনি অবাক।

বাহাদুরিটা ভালই দেখিয়েছে মরণ। সে হি হি করে হেসে উঠল আনন্দে।

কে যেন বলে উঠল, আ মোলো ওটা কি মরণ নাকি রে? পিলে যে চমকে দিয়েছিলি বাবা।

কোথা থেকে জলে পড়লি রে, ও ভূত!

কী অসভ্য ছেলে রে বাবা।

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা বলল টুপু, কী বদমাশ ছেলে রে বাবা!

বলেই মুখটা ফিরিয়ে পৈঠা বেয়ে উঠে গেল ওপরে। তারপর আর দেখাই গেল না তাকে।

ভেজা গায়ে উঠে এল মরণ। জামা প্যান্ট সব ভেজা। কেমন বোকা বোকা লাগছে নিজেকে। তাপমানও বোধ হচ্ছে। তোর জন্যই লাফ দিলাম টুপু, আর তুই-ই ওরকম করলি? তোদের বাড়িতে যে কেউটে সাপ মারলুম, মনে নেই? আমার মতো গাছ বাইতে পারে কেউ? জোরে ছুটতে পারে আমার মতো কেউ? পারে কেউ আমার মতো তেঁতুলবিছের কামড় সহ্য করতে? পারুক তো কেউ দেখি!

ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল বলে মা লক্ষ করল না তাকে। করলে জামা ভিজিয়ে এসেছে বলে বকুনি দিত। গা মুছে জামা প্যান্ট ছেড়ে নিজের পড়ার ঘরখানায় এসে চুপটি করে বসে রইল মরণ। টুপু কি আর কখনও তার দিকে তাকাবে? দেখলেও হয়তো অবহেলায় চোখ ফিরিয়ে নেবে। পাত্তাও দেবে না তাকে! না দিক। তারই বা কী গরজ! এই তো সেদিনও টুপুকে পাত্তা দিত না মরণ। ভারী তো মেয়ে। রোগা, কেলটিস মাকা। উচ-কপালি, চিরনদাতি কোথাকার। অবশ্য উঁচ-কপালি আর চিরুনদাঁতি কাকে বলে তা জানে না মরণ।

লেখাপড়ায় ভাল হলে তাকে কি কেউ এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত? এটা মরণ আজকাল খুব টের পায়। কিন্তু তার যে মোটে পড়তে ইচ্ছে যায় না। কী যে করবে তা বুঝতে পারছিল না সে।

দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে মা যখন শুতে গেল তখন মবণ চুপ করে গাছতলায় তার নিজস্ব শিবঠাকুরের থানে এসে ঘাসের ওপর বসল। এখানে মন্দির নেই, শিবলিঙ্গ নেই, কিছু নেই। তবু মরণের এটাই শিবঠাকুরের থান। এখানেই সে ডাকলে শিবঠাকুর এসে হাজির হন।

আজও সে চোখ বুজে শিবঠাকুরকে খুব প্রাণভরে ডাকল, শিবঠাকুর আজ কি পাপ করে ফেললাম? ক্ষমা করে দিও ঠাকুর। তোমাকে বলছি, আমাকে কিন্তু কেউ ভালবাসে না। আমি কি খুব খারাপ? আজ যদি পুকুরে ডুবে মরে যেতাম তাহলে বুঝি ভাল হত?

শিবঠাকুরের গায়ের বোঁটকা গন্ধটা আজও পেল মরণ। তার সামনেই শিবঠাকুর ব্যোম ভোলানাথ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ না খুললেই তাঁকে দেখা যায় ভাল।

একটু থেমে খুব লজ্জায় লজ্জায় মরণ বলল, ও যেন আমার দিকে একটু তাকায়-টাকায় ঠাকুর।

এই বলেই ছুটে পালিয়ে এল ঘরে।

এই তো সেদিন জিজিবুড়ি সকালে রোজকার মতো এসে বসে ছিল উঠোনে। রোদ পোয়ানোর নাম করে রোজই আসে, যদিও তাদের বাড়িতে রোদের অভাব নেই। চোখ কুঁচকে মরণকে দেখে বলেছিল, তুই কি একটু ঢ্যাঙা হয়েছিস নাকি রে ভাই?

ভারী লজ্জা পেয়েছিল মরণ। সে যে একটু ঢ্যাঙা হচ্ছে, তা সে খুব টের পায়। শরীরে আরও নানা বদল ঘটছে তার। সুড়সুড়ি বাড়ছে, হাতে পায়ে কেমন একটা অস্বস্তি যেন, চামড়ায় কখনও কখনও ফাটলের মতো দাগ। এসব কী হচ্ছে তা ঠিক বুঝতে পারে না মরণ।

জিজিবুড়ির কথাটা কানে গিয়েছিল বাসন্তীর। ঝেঁঝেঁ উঠে বলল, নজর দিও না তো মা। এটা তো বাড়েরই বয়স। বাড়বে না তো কী? অত তাকিয়ে থাকার মতো কিছু হয়নি।

মায়ের নানা ভয় আছে। নজর লাগার ভয়, শনির দৃষ্টি, ফাঁড়া, আরও কত কী। মাঝে মাঝেই তার আঙুল কামড়ে, শরীরে থুথু ছিটানোর ভান করে কী সব যেন তুকতাক করে মা। তার নামে বারের পুজো দিতে শনি মন্দিরে যায় ফি শনিবার।

আমাকে নিয়ে তোমার এত ভয় কেন মা?

আমার বাপু সবাইকে নিয়েই ভয়।

ষাট

এই যে প্রাণের তত্ত্ব শাস্ত্রে এত বলা আছে, তা সেই প্রাণটা কোথায় থাকে এই দেহপিঞ্জরে সেটাই তো আজ অবধি ঠাহর পাওয়া গেল না। প্রাণ কি বিন্দু, না শিখা, নাকি বুদ্বুদ? জিনিসটা খুব একটুখানি। এই শরীর আর মনের নিউক্লিয়াস। তাকে ঘিরেই কি শরীরের অণুপরমাণু আবর্তিত হয়? কে জানে বাবা কী, কিন্তু আছে একটা কিছু। চোখের দেখা, কানের শোনা, বুদ্ধি-শুদ্ধি, বুকের ধুকপুকুনি এইসব তার জন্যই হচ্ছে-টচ্ছে। অথচ তার হদিশ করাই মুশকিল।

আজকাল কফি খাওয়ার ঝোঁক হয়েছে মহিমের। জিনিসটা ভাল। শীতে বেশ গা গরম হয়। শরীরটা চনমনে লাগে। তার নাতনি সোহাগ জিনিসপত্র সব এনে দিয়েছে তাকে। শিখিয়েছে কালো কফি খেতে। বলেছে, দুধ দিয়ে খেও না দাদু, ওতে খারাপ হয়।

সন্ধের পর নিজের ঘরে স্টোভ জ্বেলে নিজেই এক কাপ কফি করে মহিম খুব তৃষ্ণার্তের মতো খায়। ওই এক কাপই। লোভে পড়ে একবার তিন কাপ খেয়ে বিপদ হয়েছিল। রাতে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। উগ্র জিনিস, সাবধানে খেতে হয়।

সন্ধের পর কারেন্ট থাকলে মুকুল এসে তাকে হাত ধরে একরকম টেনে তাদের ঘরে নিয়ে যায়, চলো দাদু, সিরিয়াল দেখবে। মুকুল হল মুকুলিকা, কমলের ছোট মেয়ে। ওদের ঘরে এখন রঙিন টিভি এসেছে, কে কানেকশন নেওয়া হয়েছে। লোকে আজকাল খাক না খাক, টিভি না দেখলে বেজার হয়ে পড়ে। ওয়ান ডে ক্রিকেট থাকলে তো ও-ঘরে ঘেঁষাঘেঁষি ভিড় হয়। সিরিয়াল দেখার তেমন আগ্রহ বোধ করে না মহিম। সবই কৃত্রিম লাগে। বানানো গল্প, বানানো রিঅ্যাকশন। যাত্রা বা নাটকে যে একটা উচ্চগ্রামের ব্যাপার থাকত এসব সেরকম নয়। তবু গিয়ে মাঝে মাঝে ওদের আসরে বসতে হয়।

সেদিন সন্ধেবেলাতেও মুকুল এসে ডেকে গেছে। যাবে বলে তৈরি হয়ে মহিম তার বরাদ্দ কফিটা তৈরি করে সবে ঘুরে চেয়ারের দিকে আসছিল। হঠাৎ মাথায় একটা প্রবল চক্কর। গোটা ঘর যেন টালমাটাল হয়ে দোল খেয়ে গেল, মেঝেটা যেন নেমে যাচ্ছিল পাতালে। প্রথমে মনে হয়েছিল বঝি ভূমিকম্প। কিন্তু ভূমিকম্প হলে চারদিকে শাঁখ বাজত। কয়েক মুহূর্তেই মহিম ওই অবস্থাতেও বুঝতে পারল, আশি পেরোনো এই শরীরেরই কোনও অধঃপাত। সে কি মারা যাচ্ছে?

কফির কাপটা পড়ে ভাঙল, গরম কফি ছিটকে লাগল পায়ে। চোখে অন্ধকার, কানে ঝিঁঝির ডাক। জ্ঞান হারানোর আগে সে টের পেল, কাপ ভাঙার শব্দ পেয়েই বোধহয় সন্ধ্যা দৌড়ে আসছিল, ও বাবা! কী হল...

ডাক্তার বদ্যি সারাজীবনে খুব কমই দেখিয়েছে মহিম। একটা জীবনে হোমিওপ্যাথির চর্চা করত। চার পাঁচখানা ইংরিজি এবং বাংলা বই আছে তার। ওষুধের বাক্স আছে। একসময়ে পাড়া প্রতিবেশীরা অনেকেই তার কাছে এসে ওষুধ নিত। তখন গাঁ গঞ্জে ডাক্তার অমিল ছিল খুব। অসুখ হলে দু-তিনজন শখের

হোমিওপ্যাথই ভরসা। নইলে বর্ধমান নিয়ে যেতে হত রুগিকে। আজকাল অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। পাশ-করা বড় ডাক্তাররা নিয়মিত আসছে গাঁয়ে। তিন চারজন পাশ-করা হোমিওপ্যাথ ডাক্তারও আছে।

তাকে দেখতে এল অনল বাগচী। মেডিকেল কলেজে নাকি পড়ায়। খুব নাম। ভারী অমায়িক মানুষ, গোমড়ামুখো গেরামভারি নয়।

প্রেশার দেখে বলল, সামান্য বেশি আছে। এর জন্য ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই। একটু হাঁটাহাঁটি করলেই কমে যাবে।

মহিম বলল, থোড়ের রস খেলে প্রেশারের উপকার হয় শুনেছি।

অনল ডাক্তার ভারী সুন্দর করে হেসে বলল, টোটকাতে কাজ হতে পারে। ইচ্ছে হলে খেয়ে দেখবেন। আজকাল তো এসব টোটকা ওষুধকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তারি শাস্ত্রে থোড়ের কথা অবশ্য নেই। কিন্তু তাতে কী? খাবেন। তবে হাঁটাচলাটা বাদ দেবেন না।

না। হাঁটতে আমার ভালই লাগে।

বয়সের অনুপাতে আপনার শরীর তো বেশ ভালই আছে দেখছি। হার্ট ইজ ওকে, বুকে কোনও কমপ্লিকেশন নেই। তবে মাথার রিলিংটা হয়তো স্পন্ডেলাইটিসের জন্যও হতে পারে। একবার বর্ধমানে গিয়ে ঘাড়ের একটা এক্স-রে করাবেন। আর একটা ব্লাড টেস্ট। সবই প্রেসক্রিপশনে লিখে দিয়েছি।

একটা কথা ডাক্তারবাবু।

বলুন।

আপনারা তো মানুষের শরীরে অনেক কাটাছেঁড়া করেন।

অনল বাগচী মৃদু হেসে বলল, আমি মেডিসিনের লোক। কাটাছেঁড়া সার্জনদের কাজ। তবে ডাক্তারি পড়ার সময়ে ডিসেকশন করতে হয়েছে। যাই হোক, আপনি বলুন।

না, এই মাঝে মাঝে অনেক আবোল তাবোল কথা মনে হত। খুব জানতে ইচ্ছে করে মানুষের আত্মাটা শরীরের ঠিক কোথায় তাকে। ডাক্তাররা শরীর কাটাছেঁড়া করার সময়ে কি সেটা বুঝতে পারে?

অনল বাগচী বিশেষ ভদ্রলোক। এ কথায় একটুও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল না। বরং বেশ সিরিয়াস মুখ করেই বলল, ডাক্তাররা আত্মা দূরে থাক, শরীরেরই বা কতটুকু জানে বলুন। এই তো মানুষের একটুখানি শরীর, কতই বা লম্বা চওড়া। তবু এর মধ্যেই এত অদ্ভুত আর সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি যে তাক লেগে যেতে হয়। এর মধ্যে কত জটিলতা, কত কো-অর্ডিনেটেড সিস্টেম। শরীরকেই তো আজও পুরোপুরি জানি না আমরা। আত্মা তো আরও দুর্জ্ঞেয়।

ডাক্তারবাবুটিকে বড় ভাল লেগে গেল মহিমের। সে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আত্মা মানেন?

আমি না মানার কে? প্রায় সব ধর্মেই আত্মার কথা বলা আছে। সুতরাং জিনিসটা তো উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। আমরা যে ভাইটাল ফোর্সের কথা বলি সেটাই হয়তো এই আত্মা।

শুনে বড় ভাল লাগল। আজকাল তো এসব কেউ মানতে চায় না।

মানুষ ভাবতে চায় না বলে মানে না। আত্মার অস্তিত্ব আমি অস্বীকার করতে পারি না।

মহিম একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমি একটু হোমিওপ্যাথির চর্চা করি। স্পন্ডেলাইটিসের ওষুধ আছে। খাব কি?

নিশ্চয়ই খাবেন। আমার নিজের কোনওরকম পেন-টেন হলে আমিও তো আর্নিকা খাই।

সত্যি?

অনল বাগচী হেসে বলল, বললাম না আজকাল খুব আনকনভেনশনাল ওষুধের গুরুত্ব বাড়ছে। ভারত সরকার তো আদিবাসীদের ওষুধ নিয়ে রিসার্চ করাচ্ছে। বিদেশেও হারবাল মেডিসিনের চল হচ্ছে। কীসে যে কী হয় তা তো আমরা জানি না।

আপনি বড় উদারচেতা মানুষ।

তা নয়, আই ট্রাই টু বি লজিক্যাল। আমাদের লিমিটেশনগুলোও যে আমি জানি।

মহিমের খুব ইচ্ছে হল ডাক্তারবাবুটিকে আশীর্বাদ করে। মুখে শুধু বলল, ঠাকুর আপনার মঙ্গল করুন। বড্ড অমান্যির যুগ পড়েছে বলে ভারী দুশ্চিন্তা হয়। কেউ কিছু মানতে চায় না।

তা ভাবছেন কেন? কিছু লোক মানে, কিছু লোক মানে না। বরাবরই এরকম চলে আসছে। আপনি যা বিশ্বাস করেন সেটা ছাড়বেন কেন? শুধু অন্ধ কুসংস্কার জিনিসটা ক্ষতিকারক। সেটা পেয়ে বসলে মুশকিল।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ মহিম লোকটার কথা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাবল।

সন্ধ্যা কাছেই বসেছিল। কেঁদে কেটে চোখ লাল। গলা ধরেছে। ডাক্তারের কথা শুনে এখন একটু মুখটা স্বাভাবিক হয়েছে। বাড়ির সবাই ভিড় করে ছিল এতক্ষণ। কমল এখনও আছে। আর মুকুল পায়ের কাছে বসে একটা হট ওয়াটার ব্যাগ ধরে আছে পায়ের তলায়।

কমল বলল, অমলকে ফোন করে দিয়েছি বাবা।

মহিম অবাক হয়ে বলে, কেন?

তুমি মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ায় ভয় পেয়ে ওকে জানিয়েছি।

দেখ কাণ্ড! তাড়াহুড়োর কী ছিল? সে কাজের মানুষ, অফিস কামাই করে হয়তো এসে পড়বে। ডাক্তার তো বলেই গেল কিছু হয়নি।

আহা, আসুক না। আজ তো শুক্রবার। আগামীকাল তো এমনিতেই ওদের আসবার কথা।

তাহলেও দুশ্চিন্তা করতে পারে। হ্যাঁ রে, ডাক্তার কোনও ওষুধ দিয়েছে?

হ্যাঁ, প্রেসক্রিপশনে তিনটে ওষুধের নাম দেখছি।

ওসব ওষুধ আর আনিস না যেন। খাওয়ার কথা কিছু বলে গেল?

শুধু বলল, নুনটা কম খেতে। আর তেল মশলা তেমন না খাওয়াই ভাল। তা খাওয়া নিয়ে আবার কবে তোমার মাথাব্যথা ছিল? তুমি এমনিতেও তো একটুখানি খাও। তোমার বউমা তো বলে, বাবার খাওয়া দিনদিন কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ বাবা, কফি ধরেছ বুড়ো বয়সে, তাই থেকেই এসব হল না তো!

দুর পাগল। কফি থেকে কী হবে?

নেশার জিনিস তো!

নেশা মানে তো মদ গাঁজা নয় রে বাবা।

সন্ধ্যা বলল, ও তোমার আর খেয়ে দরকার নেই বাবা। কী থেকে কী হয় কে জানে। তোমার কিছু হলে আমার বাপু হার্টফেল হয়ে যাবে। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে আজ।

আমার কী মনে হয় জানিস?

কী?

পেটে বায়ু হয়ে এরকমটা হয়েছিল। উর্ধ্বগামী বায়ু থেকে কত কী যে হয়।

আমার কাছে হজমি আছে। দেব? নিজের হাতে যত্ন করে তৈরি করেছি। যারা খাচ্ছে সবারই উপকার হচ্ছে।

দিস খন। ভয়ের কিছু নেই।

চুপটি করে শুয়ে থাকো। আজ রাতে আমি এ-ঘরেই ক্যাম্পখাট পেতে শুয়ে থাকব।

আবার লেপলোশক টানাহ্যাঁচড়া করতে যাবি কেন? আমি তো ভালই আছি।

ভালই যদি আছ তাহলে মাথা ঘুরল কেন?

ওই যে বললুম, বায়ু।

থাক আর নিজের ডাক্তারি নিজে করতে হবে না। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বলো তো। তোমার কিছু হলে আমার যে কী হবে।

এ কথায় মহিমের বুকের ভিতরটায় যেন একটা মন্থন শুরু হল। তার এই মেয়েটা যে কত অসহায় তা মহিম জানে। ভাগ্য ভাল যে নিজের আর্থিক সংগতিটা নিজেই করে রেখেছে। কাজকর্ম নিয়ে সংসার ধর্মের অভাব ভুলে আছে। কিন্তু এ তো খেলনা, চুষিকাঠি। মেয়েদের রক্তের ভিতরে তো অন্য স্বপ্ন থাকে। যতই জজ ব্যারিস্টার হোক, তার মাতৃত্বে হাহাকার থাকলে সব ছাইমাটি হয়। আজকালকার মেয়েরা হয়তো বুঝতে চাইবে না। কিন্তু সত্যকে আর কত ঢাকাচাপা দিয়ে রাখা যাবে?

মহিম মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলল, ওসব ভাবছিস কেন? দুনিয়ায় কারও জন্য কিছু আটকে থাকে না।

ওরকম বোলো না। আজ আমি বড্ড ভয় পেয়েছি।

ভাবিস না। শরীর আমার ভালই আছে।

পায়ের কাছ থেকে মুকুল বলল, ও দাদু, টক করে রাত আটটার সিরিয়ালটা দেখে আসব?

দেখে আয়। আর পায়ে সেঁক দিতে হবে না তোকে। পা গরম হয়ে গেছে।

আধঘন্টা বাদেই ফের আসব।

আসিস।

হ্যাঁ দাদু, মা জানতে চাইল রাতে কী খাবে?

আজ কিছু না খাওয়াই ভাল।

সন্ধ্যা বলে, না বাবা, শরীর দুর্বল হবে। বরং দুধ-খৈ খেও।

তাই পাঠিয়ে দিতে বলিস।

বলে একটু চোখ বুজল মহিম। মাথা ঘোরার ভাবটা একটু আছে। মাথা নাড়া দিলেই টলটলে একটা ভাব। ঘর দুলে উঠছে। বয়স আশির চৌকাঠ ডিঙিয়েছে। এখন কত কী হতে পারে। বেসুর বাজতে লেগেছে।

রাতে গভীর ঘুম হল মহিমের। সকালবেলা সূর্যাস্তের কিছু আগে ঘুম ভাঙল। পুব আকাশ সবে ফর্সা হতে লেগেছে। মহিম রোজ অন্ধকার থাকতে ওঠে। আজ দেরিই হল।

খুব সাবধানে পাশ ফিরে কাত হয়ে হাতের ভর দিয়ে মাথাটা তুলল সে। প্রথমটায় মনে হল, ঠিক আছে। কিন্তু আর একটু খাড়া হয়ে বসতে যেতেই মাথাটায় এমন চক্কর দিল যে মহিম ধপ করে বালিশে ক্লান্ত মাথাটা

ফেলে হাঁফাতে লাগল। কী মুশকিল। সকালে প্রাতঃকৃত্য আছে, পুজোপাঠ আছে। এরকম হলে কী করে চলবে?

সন্ধ্যা পাশেই ক্যাম্পখাটে শুয়ে আছে। একবার ভাবল, সন্ধ্যাকে ডাকবে। তারপর ভাবল, এই অবস্থায় ওকে ডেকেই বা কী হবে! কিছু তো করতে পারবে না। বরং চেঁচিয়ে-মেচিয়ে লোক জড়ো করবে।

তার চেয়ে শুয়ে থাকাই ভাল।

মনে পড়ছিল এই মাথা ঘোরার ব্যামো ছিল তার মায়ের। আর সেই ব্যামো নিয়েই মা মরে মরে ঘর-সংসারের কাজ করত। মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি হলে শয্যা নিয়ে পড়ে থাকত। চিকিৎসা বলতে মাথায় ভেজা গামছা চেপে রাখা। স্পন্ডেলাইটিসই হবে বোধহয়। তখন তো লোকে এত জানত না।

বেশ একটু বেলার দিকে মহিম উঠতে পারল। মাথা ঘুরছে বটে তবে সওয়া যাবে। পুজোর ফুল সন্ধ্যাই তুলে দিয়ে গেল। মহিম পুজোপাঠ সেরে রোদে ইজিচেয়ারে বসে রইল ক্লান্ত শরীরে।

বসে ঘুমিয়েই পড়েছিল বোধহয়।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার চেঁচানিতে, ওম্মা গো, কে এসেছে দ্যাখোসে সব। এতদিনে মনে পড়ল আমাদের, ও জ্যাঠাইমা।

মহিম চমকে চোখ মেলে যাকে দেখল তাকে প্রথম যেন মতের মানবী বলে মনেই হল না তার। শ্বেত শুভ্র বসনে এ যেন শ্বেতপাথরের দেবীপ্রতিমা। বলাকা কদাচিৎ কারও বাড়িতে যান। পাড়া-বেড়ানোর অভ্যাস কোনওকালে ছিল না বলাকার, গাঁয়ের মেয়েদের মতো কূটকচালিও করেননি কখনও। আর সেই জন্যই সারা গাঁয়ে এই মহিলার প্রতি প্রত্যেকের ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রমের ভাব আছে।

একবার—জীবনে মাত্র একবার, বহুকাল আগে এক বৈশাখী ঝড়ের দিনে আমবাগানে কিশোরীরবধূ বলাকার প্রতি কামভাব বোধ করেছিল মহিম। সেটা বয়সের দোষ। অমন সুন্দরীর প্রতি কোন পুরুষ না আকর্ষণ বোধ করবে? কিন্তু মহিলা তো মানবী নন, দেবী। চোখ দেখেই কিছু টের পেয়ে এক ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ির ভিতরে। ওই একবারই। তার পর থেকে মহিম এই মহিলাকে সর্বদাই শ্রদ্ধা করে এসেছে। একটু ভয় পেয়েছে।

বউঠান! বলে তড়িঘড়ি উঠতে যেতেই মাথার শত্রুতায় ফের এলিয়ে পড়তে হল মহিমকে।

উঠবেন না। চুপ করে বসে থাকুন তো। বলে বলাকা সন্ধ্যার এগিয়ে দেওয়া কাঠের চেয়ারটায় বসে বলল, আজ সকালে খবর পেয়েই ছুটে এসেছি। কী হয়েছে আপনার?

মহিম ম্লান হেসে বলে, গুরুতর কিছু নয় বোধহয়, ডাক্তার ভরসা দিয়ে গেছে। স্পন্ডেলাইটিস বলে সন্দেহ।

ওসব আজকাল সকলের মুখেই শুনি। রোগটা কী?

ঘাড়ে হাড়ে গোলমাল। তাই থেকে নার্ভের দোষ।

যাক বাবা, সিরিয়াস কিছু না হলেই হয়। আমাদের বয়সিরা তো সব একে একে চলে যাচ্ছে। তাই খবরটা পেয়েই খুব চিন্তা হয়েছিল। কর্তা তো মহিম বলতে অজ্ঞান হতেন।

মহিম ভারী খুশির হাসি হাসল। বলল, দাদা আর আমি ছিলুম হরিহরাত্মা, ছায়া হয়ে ঘুরতুম পিছনে পিছনে উনি গিয়ে অবধি আমার ভারী একা লাগে বউঠান।

তা জানি। দুজনের বন্ধুত্ব তো দেখেছি।

বলাকা এসেছেন খবর পেয়ে বাড়ির সবাই এসে ঘিরে ফেলল। এটা একটা ঘটনাই বটে। বলাকাকে গাঁয়ের অন্য কোনও বাড়িতে যেতে দেখে না কেউ। এই আসাটা তাই এ-বাড়ির পক্ষে একরকম একটা গৌরবজনক ঘটনাই। গৌরহরি যেমন তেজি মানুষ ছিলেন, বলাকাও তেমনি তেজস্বিনী।

বলাকার গায়ে একটা দামি কাশ্মীরি শাল। কী মুখ চোখ, কী গায়ের রঙের জেল্লা। বাড়ি যেন আলো হয়ে গেল।

মহিম কৃশ, দীপশিখার মতো নারীমূর্তির দিকে চেয়ে থেকে বলল, আপনি রোগা হয়ে গেছে বউঠান।

মোটা হলে ভাল হত বুঝি? মেয়েরা যত মোটা হবে ততই রোগের আকর হবে। সেদিন এক ডাক্তার তো বলে গেল, আমার নাকি কোনও রোগই নেই।

রোগা হয়ে ভালই আছেন বউঠান। এরকমই ভাল।

ভাল থাকতে কে চায় বলুন তো! বেঁচে থাকার মতো এমন একঘেয়ে জিনিস আর হয় না। উনি যতদিন ছিলেন কিছুই খারাপ লাগত না। এখন প্রতিদিন সকালে মনে হয়, দিনটা কেমন করে কাটবে। কতদিন যে বেঁচে থাকতে হবে তাই ভেবেই ভয় করে।

মহিম একটু হেসে বলল, বেঁচে কি আপনি আছেন বউঠান? যেদিন গৌরদা মারা গেলেন সেদিন আপনি সহমরণে যেতে চেয়েছিলেন, আমার মনে আছে। সেদিনই বুঝেছিলাম গৌরদার সঙ্গে আপনার শরীরটা না গেলেও সত্তাটা সহমরণেই গেছে। আনন্দে আমার চোখে জল এসেছিল।

এখন চুপ করুন তো, অত কথা বলতে হবে না। ওষুধপত্র কিছু খেয়েছেন?

না। ডাক্তার বলে গেছে ওষুধের তেমন দরকার নেই। হাঁটাহাঁটি করলেই হবে।

আমি আপনাকে চিনি ঠাকুরপো। আপনি অ্যালোপ্যাথি করতে ভয় পান।

তা একটু পাই।

কিন্তু পুরনো অভ্যাস আঁকড়ে থাকলে তো চলবে না। মাথা ঘোরাটা না কমালে অচল হয়ে পড়বেন যে।

মহিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, অচল হওয়াতেই তো ভয়। মৃত্যুটা তো ভয়াবহ নয়, ভোগান্তিই আসল ভয়ের জিনিস।

তা হলে ওষুধ আনিয়ে আজ থেকেই খান।

বলাকা বেশিক্ষণ বসলেন না। বললেন, একা সংসার আগলানো যে কী বন্ধন তা কী আর বলব। উনি যে কী অচলায়তনের সঙ্গে জুতে রেখে গেলেন আমাকে। ওই রাক্ষুসে বাড়ি যেন সারাদিন আমাকে গিলতে আসে। হ্যাঁ, ঠাকুরপো, মানুষ এমন বিষয় সম্পত্তির জন্য হেদিয়ে মরে কেন বলতে পারেন? আমার কোন কাজে লাগছে বলুন তো বিষয়-আশয়? ছেলেমেয়ে কেউ কাছে থাকে না, কারও ভোগে লাগে না। কী যে জ্বালা!

মহিম ম্লান হেসে বলে, সব জানি বউঠান। গৌরদা তো বলতেন, দ্যাখ মহিম, এই যে বিষয় সম্পত্তি তিল তিল করে করলাম, এ আবার তিন মিনিটে উড়িয়েও দিতে পারি। তবে না পুরুষ!

তিনি পুরুষ ছিলেন, আমি তো তা নই। আমি তো তিন মিনিটে ওড়াতে পারব না। বড় জ্বলছি ভাই। বলাকা উঠে বড়বউয়ের সঙ্গে একটু বাড়িঘর ঘুরে দেখল। যাওয়ার সময় বলল, ভাল থাকবেন আর বেঁচে থাকবেন। বুঝলেন?

এটা কি আশীর্বাদ বউঠান?

আপনি বয়সে বড় না? আপনাকে কি আশীর্বাদ করতে পারি?

দেবীরা পারেন। সে যাক, সহজে মরব বলে মনে হয় না বউঠান। ভাববেন না।

বলাকা চলে যাওয়ার পর সন্ধ্যা এসে বলল, চলো তো বাবা, এবার ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে থাকবে।

কেন রে, আমাকে রুগি বানাতে চাস কেন? বেশ তো খোলামেলায় বসে আছি। আমার ভালই লাগছে তো।

চোখমুখ তো সে কথা বলছে না। দেখে মনে হচ্ছে ভারী ক্লান্ত আর দুর্বল হয়ে পড়েছ।

ও তোর মনের ভুল। তেমন খারাপ লাগছে না। বরং একটু কফি করে দে, রোদে বসে খাই। কফি বড্ড ভাল জিনিস। শরীর চনমনে করে দেয়।

ভাল না ছাই। ওটা খেয়েই তো এরকমটা হল তোমার।

দুর পাগলি। তোর শাসনেই আমি কাহিল হয়ে পড়ব।

এইসব কথাবার্তার মাঝখানেই উঠোনের বড় আগলটার কাছ ঘেঁষে নিঃশব্দে অমলের ঝকঝকে গাড়িটা এসে থামল।

মহিম ভারী খুশি হয়ে বলল, ওই তো ওরা এসে গেছে!

খাড়া হতে গিয়ে মাথাটা ফের টলোমলো হল মহিমের। সভয়ে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে ইজিচেয়ারে চেপে ধরে রইল সে। কী যে হল মাথায় কে জানে বাবা।

প্রথমেই নেমে দৌড়ে এল সোহাগ। হাঁটু গেড়ে বসে মহিমের হাঁটুর ওপর হাতের ভর দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বলল, কী হয়েছে তোমার?

কিছু হয়নি রে তেমন। মাথাটা কাল থেকে বড় ঘুরপাক খাচ্ছে দিদি।

জেঠু ফোনে বলেছে স্ট্রোক। সেই থেকে আমার কী মনখারাপ।

আরে না। স্ট্রোক নয়। কমল ভয় পেয়ে বলেছে।

মহিম তার দুর্বল চোখে চেয়ে দেখল তার সামনে যেন ঝলমল করছে চারটে মানুষ। অমল, মোনা, সোহাগ আর বুড়া। কিছু কাল আগেও বড় ম্লান, মলিন, দড়কচা মেরে ছিল ওরা। কোন মন্ত্রে যেন আরোগ্য হয়েছে। সংসারে তো জোয়ার ভাটার বিরাম নেই। মাঝখানে তো অমল আর মোনার ডিভোর্সের কথা চলছিল। আজ ওদের দেখে বুকটা ভরে গেল মহিমের। জীবনের শেষ রাউন্ডে এরকম ছোটোখাটো কিছু আনন্দ পাওয়াই তো অনেক পাওয়া।

অমল রাগ করে বলল, দাদা এমনভাবে খবরটা দিয়েছে যে আমি তো ভাবলাম সকালে এলে আর তোমাকে দেখতেই পাব না। এত ভয় পেয়েছিলাম।

মহিম হেসে বলল, ওর দোষ কী? ঘটনাটা এমন অতি নাটকীয়ভাবে ঘটল যে ওরা ভেবেছিল গুরুতর কিছু। ডাক্তার এসে দেখে-টেখে বলল তেমন কিছু নয়। হার্ট ভাল আছে, লাংস ক্লিয়ার।

যে যাই হোক, এবার কলকাতায় চলো তো আমার সঙ্গে। ভাল করে চেক আপ করিয়ে দেব।

মহিন হেসে বলে আগেই উতলা হওয়ার কী আছে। ডাক্তারবাবটি বেশ ভাল, বিবেচক। মস্ত বিলিতি ডিগ্রি আছে। এরও চিকিৎসা খারাপ নয়। সামান্য ব্যাপার হলে টানা হ্যাঁচড়ার দরকার কী?

মোনার হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগে ফলের ঠোঙা।

আপনার জন্য এনেছি।

ভারী আপ্যায়িত হয়ে মহিম বলল, বাঃ! কত কী এনেছ?

শরীরটা তো একটু শুকিয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

এই বয়সে একটু শুকোনোই ভাল বউমা। হালকা পলকা থাকলে রোগ বালাই কম হয়। তোমরা যাও, বিশ্রাম করোগে। এতটা পথ গাড়িতে এসেছ।

শুধু সোহাগ রইল কাছে। দাদুর হাঁটুতে হাত রেখে নিলডাউন হয়ে বসে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল মুখের দিকে। চোখ দুখানা করুণ।

কেন রে দিদি, অমন করে চেয়ে আছিস? এত সহজে মরব না রে। ভয় পাস না।

সোহাগ অনেকক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থেকে হঠাৎ অদ্ভুত একটা কথা বলল, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে দাদু? তোমাকে তো ভাল করে চিনতামই না।

মহিম হেসে বলল, সাহেবদের দেশে থাকলে ওরকমই তো হয়। আর সেইজন্যই আমার ওসব দেশ ভারী অপছন্দ। ওরা রক্তের টানটা মানেই না।

সন্ধ্যা কফি করে নিয়ে এসে বলল, এই মেয়ে, আমার ঘরে চল তো। সকালে কিছু খেয়েছিস? মুখটা তো শুকিয়ে গেছে।

খেয়েছি। টোস্ট আর দুধ।

দুর, সে তো কখন হজম হয়ে গেছে। আমার ঘরে আয়, তোকে চন্দ্রপুলি খাওয়াব।

চলো, বলে উঠে গেল সোহাগ।

মহিম চুপচাপ একা বসে রইল কিছুক্ষণ। সংসারের নানা কাজের শব্দ-সাড়া পাওয়া যাচ্ছে এখানে বসে। রোদটা মুখে লাগছে বড়। গাছের ছায়া সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

কফিটা শেষ করে খুব সাবধানে ধীরে ধীরে মাথাটা তুলল মহিম। না, ঘুরছে না তো!

খুব সাবধানে উঠে দাঁড়াল সে। না, ঘুরছে না এখনও। বিশ্বজয়ীর মতো একটা হাসি ফুটল তার মুখে। ধীরে ধীরে হেঁটে সামান্য কয়েক পা হেঁটে নিজের ঘরের দরজায় উঠল সে। এখন এইসব ছোটোখাটো অ্যাচিভমেন্টে যুদ্ধজয়ের আনন্দ।

শুয়ে থাকা ব্যাপারটা ভারী অপছন্দ মহিমের। বিছানা জায়গাটা তার কোনওকালেই প্রিয় নয়। সে তাই শুল না। একখানা হোমিওপ্যাথির বই নিয়ে জানালার পাশে চেয়ারে বসল। সন্ধ্যার ঘর থেকে পিসি-ভাইঝির কলকলানি আর হাসির শব্দ আসছে খুব।

মহিম একটু তৃপ্তির হাসি হাসল।

সন্ধেবেলা কম্পিউটার নিয়ে বসেছিল বিজু। অখণ্ড মনোযোগে ই-মেল চেক করছে।

দরজার কাছ থেকে মিহি মেয়েলি গলা এল, ও বিজুদা, তোমার কি ইন্টারনেট কানেকশন আছে?

বিজু ভ্রূ কুঁচকে দরজার দিকে চোখ ফিরিয়ে পান্নাকে দেখে বলল, কেন রে বাঁদর, তোর সে খবরে দরকার কী? কতবার তো বলেছি কম্পিউউটার শিখতে, কথা শুনেছিস?

আহা, শেখার সময় বুঝি চলে গেছে!

গেছে নয়, যাচ্ছে। আজকাল বাচ্চা ছেলে মেয়েরাও কম্পিউটার জানে। তোর তো ওইজন্যই ভাল পাত্র জুটছে না। যখনই পাত্রপক্ষ জানবে যে তুই একটা কম্পিউটার-মূর্খ তখনই সম্বন্ধ বাতিল করে দেবে।

আহা, আজ তো আমি কম্পিউটার শিখতেই এসেছি।

তাই বুঝি? আজ বোধহয় পশ্চিমে সূর্য উঠেছে।

তা বলে তোমার কাছে নয়।

তবে কার কাছে?

আমি তাকে সঙ্গে নিয়েই এসেছি।

একষট্টি

পান্নার পিছনে সোহাগকে দেখে ভারী অবাক হল বিজু। মেয়েটা তাকে পছন্দ করে না। কয়েকবার বিজুকে বেশ অপমানও করেছে। একটু খেপা গোছের আছে। কখন কী রকম রি-অ্যাক্ট করবে তার ঠিক নেই। আনপ্রেডিকটেবল মেয়েটিকে সে একটু ভয় পায়। কিন্তু সেটা তো আর প্রকাশ করা চলে না। সে বলল, আরে, এসো তোমরা।

ঘরে ঢুকে সোহাগ নিঃশব্দে চারদিক খুব কৌতূহলী চোখে চেয়ে দেখছিল। বিজু শৌখিন মানুষ। তার ঘরে খুব আধুনিক মিউজিক সিস্টেম, রঙিন টি ভি ইত্যাদি আছে। খাট, আলমারি, টেবিল, বইয়ের র‍্যাক, ক্যাবিনেট সবই খুব বাছাই ম্যাট ফিনিশ দামি কাঠের তৈরি।

পান্না বলল, সোহাগ আমাকে একটু কম্পিউটার শেখালে তোমার আপত্তি নেই তো।

না, আপত্তি কীসের?

তুমি কম্পিউটারে কোনও কাজ করছিলে নাকি?

না না, তেমন কিছু নয়। তোরা বোস না। আমি বরং একটু ঘুরে আসছি।

যাঃ, তুমি না থাকলে মজাটাই হবে না।

কেন, তুই তো কম্পিউটার শেখার মাস্টারমশাইকে সঙ্গেই নিয়ে এসেছিস। আমি তো আর কম্পিউটার এক্সপার্ট নই। শুধু আমার কাজটুকু করে নিতে পারি।

সোহাগ কম্পিউটারের সামনে বসে যন্ত্রটার চাবি টিপে স্পেসিফিকেশন দেখে মৃদু স্বরে বলল, মডেলটা আপডেট করা দরকার। বেশ স্লো।

বিজু বলল, জানি। তবে আমার তো বেশি সফিস্টিকেটেড জিনিসের দরকার হয় না। কিছু নথিপত্র লোড করে রাখি। বেশির ভাগ সময়েই এটা ব্যবহার করা হয় টাইপরাইটার হিসেবে। আর ইন্টারনেট, তবে নেটওয়ার্ক সিগন্যাল এখানে খুব উইক।

সোহাগ একটু হাসল। আর কিছু বলল না, কিছুক্ষণ মগ্ন হয়ে নানা চাবি টিপে টিপে অনেক কিছু দেখে নিয়ে পান্নাকে বলল, এতে তোমার শেখার কাজ চলে যাবে। তোমার দাদা বোধহয় ই-মেল চেক করেছিলেন, আমরা এসে ডিস্টার্ব করলাম।

বিজু বলল, আরে দুর দুর। ই-মেল আসে নাকি আমার। বেশির ভাগই জাঙ্ক মেল। দু-চারটে কাজের মেল আসে। চেক করা হয়ে গেছে। তোমরা এখন ব্যবহার করতে পারো।

আপনি বসুন না। আমি এসেছি বলেই যদি আপনি চলে যান তা হলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

সন্ধেবেলা কি আমি বাড়িতে বসে থাকি নাকি? ক্লাবে ব্যাডমিন্টন খেলতে যাই। তারপর নাটকের রিহার্সাল আছে।

পান্না বলল, আচ্ছা, আজ না হয় আমাদের অনারে একটু বসলেই বাবা। রোজই তো ওসব আছে।

আরে আজ শনিবার। অনেকে আসবে। যারা কলকাতায় থাকে তারা উইক এন্ডে চলে আসে যে।

একদিন না হয় একটু আমাদের সঙ্গেই আড্ডা মারলে।

আড্ডা মারতে তো আসিসনি। এসেছিস তো কম্পিউটার শিখতে।

কম্পিউটার তো আর পালাচ্ছে না। পালাচ্ছ তুমি। চুপ করে বোসো তো ওই সোফাটায়।

বিজু বসল। তবে অস্বস্তি নিয়ে। সোহাগ মেয়েটাকে সে ঠিক বুঝতে পারে না। এই বেশ মিষ্টি করে কথা বলল, আবার কোন কথায় পালটি খাবে তার ঠিক নেই।

কম্পিউটারে মগ্ন সোহাগ একবার হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখল, তারপর চোখ ঘুরিয়ে নিল। মেয়েদের চোখের ভাষা পড়বার মতো অভিজ্ঞতা বিজুর নেই। তার বান্ধবী-টান্ধবী নেই। প্রেমিকা নেই, নেই বলে দুঃখও নেই কিছু। তবে মেয়েদের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা কম থাকায় কখনও-সখনও একটু অসুবিধেয় পড়তে হয়। এই যেমন এখন। ওই যে সোহাগ একবার তাকাল এটা অর্থহীন না অর্থপূর্ণ তা অনুমান করা তার অসাধ্য। শুধু মনে হল, আর যাই হোক তাকানোটা অন্তত হোস্টাইল নয়।

দুই বান্ধবী কম্পিউটার নিয়ে খুব মজে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। খুব নিচু স্বরে পান্নাকে কম্পিউটারের ব্যবহার শেখাচ্ছে সোহাগ। স্বর এত নিচু যে, সামান্য দূরত্বে বসেও কিছুই ভাল বুঝতে পারছে না বিজু। সে নিজে কম্পিউটার খুব ভাল জানে না। শুধু নথিপত্র ফাইলভুক্ত করতে পারে, ইন্টারনেট খানিকটা পারে আর পারে গেমস। কিন্তু কম্পিউটার তো একটা মহাসমুদ্র, শেখার শেষ নেই। সে উকিল মানুষ। ভবিষ্যতে ওকালতিই করবে। তার কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ না হলেও চলবে। কিন্তু আজ এখন সোহাগের সহজাত দক্ষতা দেখে তার একটু হিংসে হচ্ছিল। মেয়েটা অনেক জানে। আর একটু আপডেটেড কম্পিউটার হলে আরও ভাল এলেম দেখাতে পারত।

উপযাচক হয়ে বিজু বলল, একটু অসুবিধে হচ্ছে, না?

সোহাগ ভারী সুন্দর একটু হেসে তার দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। বলল, আপনার সেটটা এমনিতে তো ভালই। মাদার বোর্ড, প্রসেসর আর হার্ড ডিস্কটা বদলে নিলেই হবে। স্পিকার দুটোও চেঞ্জ করে নেবেন। আজকাল খুব ছোট আর পাওয়ারফুল স্পিকার পাওয়া যায়।

বিজু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে অডিও বা ভিডিও সিডি কখনও চালায় না কম্পিউটারে। অত সব করার সময় কোথায় তার। ওকালতি আছে, ক্লাব আছে, সমাজসেবা আছে, মোটরবাইকে চড়ে ছোটখাটো অভিযানে বেরিয়ে পড়া আছে। কম্পিউটার সে সামান্যই ব্যবহার করে। তবু বলল, আচ্ছা।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ তুলে মা উঠে এল, পিছু পিছু কাজের মেয়ে ননীবালা। ননীবালার হাতে ট্রে এবং তাতে গরম ফুলকপি আর বাঁধাকপির বড়া, মিষ্টি আর নাড়ু, আর চা।

পান্না চেঁচিয়ে বলল, এ মা, ছোটমা, এসব কী করেছ? তোমাকে না বললাম এক্ষুনি আমাদের একরাশ চাওমিন করে খাইয়ে দিয়েছে। তাও আবার চিংড়িমাছ দিয়ে! এই সোহাগ, বলো না।

সোহাগ হাসছিল। বলল, এখানে এলেই সবাই কেবল খাওয়ায়। কেন বলুন তো? আমাদের বাড়িতেই ভীষণ খাওয়ার জন্য প্রেশার। পিসি খাওয়ায়, বড়মা খাওয়ায়, জ্যাঠা রোজ রাজ্যের খাবার নিয়ে আসে।

বিজুর মা হেসে বলল, এইটুকু তো বয়স, এখনই তো খাবে। ওই যে আমাদের পান্নারানি ওর কথা আর বোলো না। ওর ধারণা হয়েছে মোটা হয়ে যাবে। তাই খাওয়া ধরাকাট করছে। নাও তো, এসব খুব হালকা জিনিস। কাজ করতে করতে খেয়ে নাও। শীতকালে খুব তাড়াতাড়ি সব হজম হয়ে যায়।

সোহাগ বলল, আমি কিন্তু এমনিতেই একটু ফ্যাটি। আমারই সবচেয়ে বেশি ডায়েটিং দরকার।

ও মা! যাব কোথায়। তুমি নাকি ফ্যাটি। তুমি তো বেশ রোগা। পান্নার চেয়েও।

কিন্তু আমার যে মনে হয় আমি বেশ ফ্যাটি!

একদম বাজে কথা। তুমি তো রোগাই। শরীরে আর এক পরত মাংস লাগলে তোমাকে আরও অনেক বেশি সুন্দর লাগবে।

পান্না নাক সিঁটকে বলল, ইস ছছাটমা, তুমিও কেমন যেন আদ্যিকালের বুড়ি হয়ে যাচ্ছ। কেবল মোটা হ, সোটা হ, মোটা-সোটা হলেই বুঝি ভাল?

ওরে, তা বলিনি। মোটা হবি কেন? মানানসই হবি তো। হাড়গিলে হওয়া বুঝি ভাল।

সোহাগ হাসছিল। বলল, আমেরিকায় জাঙ্ক ফুড খেয়ে খেয়ে মা আর আমি একবার বেশ ওয়েট গেন করেছিলাম। তারপর চেক আপ করাতে গিয়ে ডাক্তারের কী বকুনি। মাকে বলল, এক মাসের মধ্যে তোমাকে কুড়ি পাউন্ড ওজন কমাতে হবে। আমাকে বলল দশ পাউন্ড।

কী করলে তখন?

আমি তো তখন আরও ছোট। সকালে উঠে রোজ দৌড়াতাম। আমার এক মাসে পনেরো পাউন্ড কমে গেল। কিন্তু মা পারেনি। জগিং-টগিং তো পারত না, হাঁফিয়ে পড়ত। খাওয়া কন্ট্রোল করে করে একটু কমল।

পান্না বলল, জাঙ্ক ফুড কী বলল তো!

হ্যামবার্গার, হট ডগ, পিৎজা, চকোলেট, আইসক্রিম। যত খাবে তত মোটা হবে। খেতে ভীষণ ভাল ততা ওসব। আমেরিকানরা তো ওসব খেয়ে খেয়েই ওরকম মোটা।

গোরুর মাংস খেতে, না?

মৃদু হেসে সোহাগ বলল, হ্যাঁ। এখানে শুনেই সবাই আঁতকে ওঠে।

বিজুর মা বলল, মা গো! কী করে খেতে? গন্ধ লাগত না?

না তো? গন্ধটা খারাপ ছিল না। এখানে এসে শুনলাম হিন্দুরা নাকি খায় না।

না বাপু, এদেশে ওসব চলে না। আজকাল খাচ্ছে অনেকে শুনি। দিনকাল বদলে যাচ্ছে তো। মানুষ হল আসলে রাক্ষস। সব খায়।

সোহাগ হি হি করে হাসল।

নীরবে দৃশ্যটা দেখছিল বিজু। মেয়েটা কী সুন্দর হাসে! যখন হাসে তখন মনে হয় ওর ভিতর আর বাইরেটা একাকার হয়ে গেল।

এই খাবার রেখে যাচ্ছি, যা পারো খেয়ো। গরম থাকতে থাকতে না খেলে ভাল লাগবে না।

ছোটমা চলে গেলে পান্না বলল, এই বিজুদা, একটু খাও না গো আমাদের সঙ্গে।

ভ্যাট। আমি কোর্ট থেকে ফিরেই রুটি তরকারি খেয়েছি। তোরা খা।

আমরা কি আর পারব? না খেলে ছোটমা ঠিক বকুনি দেবে।

তার আমি কী জানি! দু-চারটে তুলে ঢিল মেরে পিছনের বাগানে ফেলে দে বরং।

ওমা, খাবার জিনিস ফেলে দিলে পাপ হবে না?

অনিচ্ছের সঙ্গে খেলে আরও পাপ হবে।

সোহাগ মাঝে মাঝে তার ঘন চুলে ঝাপটা মেরে বিজুর দিকে ফিরে দেখছে, আপনি বোরড হচ্ছেন, না?

না না, ঠিক আছে।

সোহাগ কম্পিউটারের দিক থেকে তার দিকে একটু ঘুরে বসে বলল, আমি একটু মুডি বলে মাঝে মাঝে অকওয়ার্ডলি বিহেভ করি, তাই না?

বিজু হেসে বলল, সবাই তো এক রকম হয় না। তুমি তোমার মতো হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

কেউ কেউ বলে আমি নাকি পাগলি।

বলে নিজেই হেসে কুটিপাটি হল সোহাগ।

স্মিত মুখে বিজু বলল, আমরা সবাই একটু একটু পাগল। যে যার নিজের মতো।

পান্না বলল, যাঃ, সোহাগ মোটেই পাগলি নয়। একটু ডেয়ারিং আছে অবশ্য।

সোহাগ আবার কম্পিউটারের দিকে ফিরে বসল। পান্নাকে বলল, আমি সুইচ অফ করে দিচ্ছি। তুমি নিজে নিজে সুইচ অন করো। নিজে অপারেট না করলে হবে না।

আমার বাবা ভয় করে। ইলেকট্রিকের সব জিনিসকেই আমি ভয় পাই।

যাঃ, ভয়ের কী আছে?

যদি শক-টক দেয়। আমি আগে টেপ রেকর্ডার অবধি চালাতে পারতাম না। আরও ছোট যখন ছিলাম তখন ঘরের লাইট ফ্যানের সুইচে অবধি হাত দিতে ভয় করত।

ওমা! কেন?

একবার বর্ষাকালে সুইচে হাত দিতেই যা শক দিয়েছিল। সেই থেকে ভয়।

তোমার দাদা না ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে!

হ্যাঁ তো। দাদা বাড়ি এলে আমাকে ভীষণ খেপায়। ইলেকট্রিকের তার নিয়ে এসে ভয় দেখায়। বিজু হেসে বলল, তোর সব ভয়ের কথা সোহাগ জানে?

আমি সব বলেছি। ভূতের ভয়, একা থাকার ভয়, অন্ধকারের ভয়, পাগল আর মাতালের ভয়। আর চোর ডাকাতের ভয় তো আছেই। ঠাকুর-দেবতাকেও খুব ভয় পাই বাবা। আমার বাপু ভয়ের জীবন। এত কেন ভয় পাই বলো তো সোহাগ?

তোমার যেমন ভয় বেশি, আমার আবার তেমনি ভয় ভীষণ কম।

সেই জন্যই তো তোমাকে আমার ভীষণ হিংসে হয়।

আবার দুজনে হেসে কুটিপাটি হল। মেয়েদের নিয়ে বিজুর এই এক সমস্যা। এই টিনএজার মেয়েরা নিজেদের মধ্যে সামান্য কথায় এত হাসি যে কেন হাসছে তার তাল রাখাই মুশকিল। বিজুর তাই নিজেকে বড্ড বোকা বোকা আর বহিরাগত আর অনধিকারী এক আগন্তুক বলে মনে হচ্ছে।

অস্বস্তি বোধ করে বিজু বলল, তোরা কাজ কর, আমি একটু ঘুরে আসি।

পান্না চোখ পাকিয়ে বলল, খবরদার না। তুমি চলে গেলে মজাটাই মাটি।

স্মিত হেসে বিজু বলল, আমাকে নিয়ে মজা করতে এসেছিস নাকি?

আহা, ওভাবে বলছ কেন? আজ সোহাগ তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছে।

বিজু বলল, আড়ি তো ছিল না।

ছিল বইকী। চুপ করে বোসো। নড়বে না।

বিজু ফের বসে পড়ল।

সোহাগ কম্পিউটারে চোখ রেখে বলল, পান্না একটু বাড়াবাড়ি করছে। আসলে আমি বোধহয় আপনার সঙ্গে একটু অভদ্র ব্যবহার করে ফেলেছি। আপনি তো আমার ভাল করতেই চেয়েছিলেন।

আরে সেসব আমি মনে করে রাখিনি। তবে এখানে আগে ছেলেরা কখনও মেয়েদের টিজ করত না আজকাল কিছু ছেলে ইভ টিজিং করে বলে খবর পাই। ওটা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। আমি একটু প্রাচীনপন্থী মানুষ। মেয়েদের শ্রদ্ধা করা উচিত বলেই মনে করি।

সোহাগ আর একবার একঝলক তার দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, শ্রদ্ধার কথা কেন বলছেন?

কেন বলছি তা জানি না। ওরকমই শিখে এসেছি ছেলেবেলা থেকে।

আমার তো মনে হয় খোলামেলা মেলামেশা হলেই ছেলে আর মেয়েদের সম্পর্ক ভাল হয়।

আমার ঠিক ওরকম ভাল লাগে না। আজকাল মেলামেশা খুব বেশি হয়, কিন্তু সম্পর্ক টিকছে কই? মেয়েদের প্রতি সামাজিক অপরাধ তো বেড়ে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে তোমার মত মিলবে না।

মত মিললেই বুঝি ভাল?

কথাটার অর্থ বুঝতে পারল না বিজু। ম্লান মুখে বলল, আমি একটু সেকেলে, না?

একটু আছেন। তাতে কী? নিজের মতো হওয়াই তো ভাল। আমার প্রবলেমটাও তো তাই। কেউ আমাকে নিজের মতো হতে দিতে চায় না, তার মতো হওয়াতে চায়। সেইজন্যই মা-বাবার সঙ্গে আমার ক্ল্যাশ হয়।

তুমি বোধহয় একটু লিবারেল, তাই না?

মিষ্টি হেসে সোহাগ বলে, উইমেনস লিব? এসব নিয়ে ভাবি না কখনও। আমার প্রবলেম আমার নিজেকে নিয়ে।

সকলেরই তো নিজেকে নিয়ে প্রবলেম।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্মিত মুখে দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল। না, কোনও বিদ্যুৎ বাহিত হল না মধ্যবর্তী শূন্যতায়। কিন্তু যেন একটু সুগন্ধী একটা বাতাস বয়ে গেল। মেয়েটাকে নিয়ে একটা অস্বস্তি ছিল বিজুর। একটু ভয়-ভয় ভাব। সেটা উড়ে গেল আজ।

আপনাকে জোর করে বসিয়ে রেখেছে পান্না। আই অ্যাম সরি। আজ যাই। ফিরে গিয়ে দাদুকে কফি করে দেব বলে এসেছি। দাদু ঠিক আমার জন্য বসে থাকবে।

বিজু একটু হেসে বলল, এসো।

বাই।

দুজনে চলে যাওয়ার পর ঘরটা অনেক ফাঁকা লাগল বিজুর। আনমনে উঠে সে চটি পরে ধীর পায়ে বেরোল। সারা সন্ধেটা সে অন্যমনস্ক রইল আজ। ব্যাডমিন্টনে সহজ শট ফসকাল বারবার। আড্ডায় সে-ই

বরাবর প্রধান বক্তা। আজ সে প্রায় নির্বাক রইল। আজ তার ভিতরকার বিজু যেন হারিয়ে গেছে। কী হল তার হঠাৎ?

এক বড়লোক মক্কেল গাড়ি হাঁকিয়ে রাতের দিকে এল। তার সঙ্গে একটা গুরুতর মামলা নিয়ে কথা বলতে বলতেও বিজু টের পাচ্ছিল সে খানিকটা রিফ্লেক্সের ওপর কথা বলছে, যন্ত্রের মতো। ভাবছে না মামলা নিয়ে। তার মন সোহাগকে ভাবছে। ঠিক এরকম ব্যাপার তার আগে কখনও হয়নি। এই প্রথম।

কিন্তু এরকম কেন হবে? সুন্দরী মেয়ে সে কি বিস্তর দেখেনি? মেয়েদের সম্পর্কে তার একটা সহজাত বিমুখতাই আছে। সে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে না, প্রেম করার কথা তার মনেও হয় না। নারীচিন্তার সে ঘোর বিরোধী। তাকে বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই ব্রহ্মচারী আখ্যা দিয়ে রেখেছে। তবে এসব কী হচ্ছে? কেন হচ্ছে? পচা শামুকে পা কাটলে তো তার চলবে না।

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে সে নিজের সঙ্গে লড়াইটা শুরু করল। মন থেকে যেভাবেই হোক ওই মেয়েটার চিন্তাকে তাড়াতেই হবে। তার সেই মানসিক শক্তি আছে। ছ্যাবলা ছেলেদের মতো দুম করে একটা মেয়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে গেলে তো তার হবে না। এ তার নিজের পক্ষেই অপমানজনক।

লড়াইটা করতে গিয়ে তার ঘুমের বারোটা বাজল। মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় সে উঠে ওডহাউসের একটা উপন্যাস পড়ার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। তারপর সেটা রেখে একটা থ্রিলার খুলে বসল। তাতেও মন লাগল না দেখে কম্পিউটারে একটা গেম খেলল কিছুক্ষণ। আর খেলতে খেলতেই হঠাৎ ভারী অবাক হয়ে সে মৃদু—খুব মৃদু একটা সুবাস পেল নাকে।

কোথা থেকে সুন্দর মৃদু গন্ধটা আসছে? সে এদিক ওদিক তাকাল। সন্দেহজনক কিছু দেখা গেল না কোথাও। গন্ধটা এতই মৃদু যে, আছে না নেই তা নিয়েই খানিকটা ধন্দে পড়তে হয়।

হঠাৎ মনে পড়ল ওরা দুই বান্ধবী যখন ঘরে ঢুকেছিল তখনই গন্ধটা পেয়েছিল সে। তখন খেয়াল করেনি। এরকম গন্ধ পান্না মাখে না। এ গন্ধ আটলান্টিকের ওপারের গন্ধ।

এমনিতেই বিজু খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। একটু ধ্যান করে। তারপর দৌড়তে বেরোয়। এসব তার অনেক দিনের অভ্যাস। স্বামী বিবেকানন্দ তার এক সময়ে আদর্শ ছিল। আজকাল আর ততটা কঠোরভাবে সব দিক বজায় রাখতে পারে না। তব অভাসটা এখনও আছে।

শেষ রাতে ঘুমিয়েও ঠিক পাঁচটাতেই ঘুম ভাঙল আজও। প্রচণ্ড শীত। বাইরে এখনও অন্ধকার। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। তবু উঠে অভ্যাসমতো ধ্যান করতে বসে গেল সে। আর কী আশ্চর্য! ধ্যানের শুরুতেই সোহাগের মুখ দপ করে ভেসে উঠল আজ্ঞাচক্রে। কী গেরো রে বাবা!

ফের লড়াই। এবং সোহাগের প্রস্থান।

গায়ে পুলওভার চাপিয়ে, জার্সি এবং জুতো মোজা পরে দৌড়তে বেরিয়ে পড়ল বিজু। আজ সে পাগলের মতো দৌড়াল। যেন নিজের কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা, চেষ্টা যে ফলবতী হচ্ছে, এমনটা তার মনে হল না। গায়ের নির্জন রাস্তায় তাকে তাড়া করছে নারীচিন্তা, যৌবনের জ্বালা, পতনের আহ্বান। সে হাঁপিয়ে পড়ছিল আজ। ঘুমহীনতার ক্লান্তিই হবে বোধহয়।

দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। আজ রবিবার। রবিবার সকালে যে সে দৌড়োয় না। সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম নেয়। কথাটা একদম খেয়াল ছিল না তার। এত

অন্যমনস্কতা তো ভাল নয়! কেন এরকম হচ্ছে? কেন হবে?

আজ তার ব্যায়াম করার কথা নয়। তবু ঘরে ফিরে সে রোজকার মতো ব্যায়াম সারল। গা ঘেমে গিয়েছিল শীতের মধ্যেও। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে স্নান সেরে নিল ঠান্ডা জলে। মনের অস্থির চঞ্চল ভাবটা কিছুতেই যেতে চাইছে না। বড্ড ক্লান্ত করে দিচ্ছে তাকে। সে এরকম নয়। সে এরকম হতে চায়নি কখনও। এর পর থেকে দেখা হলেই সে সোহাগের সঙ্গে ইচ্ছে করেই খারাপ ব্যবহার করবে। পাত্তা দেবে না। তেমন হলে অপমানও করবে। সবচেয়ে ভাল অবশ্য দেখাই না হওয়া। কিন্তু ওরা আজকাল নিয়মিত প্রতি উইক এন্ডে গাঁয়ে আসে। তা হলে বিজু শনি আর রবিবার গাঁ থেকে গায়েব হয়ে যাবে?

কী করা উচিত সে বুঝতে পারছিল না। তবে এই ফেজটা কেটে যাবে বলেই তার মনে হয়। সে শক্ত মনের ছেলে। সে বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য। তাকে একটা ন্যাকা খুকি যদি নাকে দড়ি পরিয়ে ঘোরায় তা হলে এই লজ্জা সে রাখবে কোথায়?

রবিবার সকালটায় সে বড়মার কাছে জলখাবার খেতে যায়। এটা প্রায় নিয়মেই দাঁড়িয়ে গেছে। রবিবার বড়মার বাড়িতে কড়াইশুটির কচুরি, না হয় লুচি বা পরোটা কিছু একটা হবেই। বড়মা অপেক্ষাও করে থাকে।

আজ তাকে দেখেই বলাকা বলল, তোর মুখটা অমন শুকনো কেন রে?

আর বোলো না। রাতে ঘুম হয়নি।

ওমা! ঘুম হয়নি কেন?

বায়ু চড়া হয়ে গিয়েছিল।

বলাকা হাসল, তোর জ্যাঠারও হত মাঝে মাঝে। গোলমেলে মামলা নিয়ে পড়লে মাঝে মাঝে রাতে ঘুম হত না। তখন আমাকে ঠেলে জাগিয়ে নিত।

কেন?

গল্প করবে বলে। ও মানুষটা তো ওরকম ধারাই। আমার সঙ্গে যত কথা ছিল তার। সব কথা আমাকেই বলত।

তোমাদের দারুণ প্রেম ছিল বড়মা।

সে কি আর তোদের মতো ফচকে প্রেম রে? ওটা অন্য জিনিস। সে আর আমি ছিলুম যেন একই দেহের সত্তা। কিংবা কে জানে বাবা ভুলভাল বললুম কি না।

যা-ই বললা, বুঝে নিয়েছি।

বাষট্টি

গুরু বললেন, ওহে শিষ্য।

শিষ্য বলল, আজ্ঞা করুন গুরুদেব।

বলি, তোমাকে যে চারিপাদ ব্রহ্মজ্ঞান দিলাম তা কি হৃদয়ঙ্গম হয়েছে?

আজ্ঞে গুরুদেব, হয়েছে।

হয়ে থাকলে তোমার মুখমণ্ডলে ব্রহ্মজ্ঞানের দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছে না কেন? বলো তো কী বুঝেছ, ব্রহ্ম ব্যাপারটা কী?

আজ্ঞে গুরুদেব, ব্রহ্ম হচ্ছে হাওয়ার নাড়ু।

বৎস, সেটা কী বস্তু।

হাওয়া দিয়ে নাড়ু পাকালে যা হয় আর কী। পুরোটাই ফক্কিকারি।

বৎস, তুমি যে ব্রহ্মকে একেবারে বোঝোনি তা নয়। ব্রহ্ম অনেকটা ওরকমই বটে। কিন্তু আগে কহো আর।

যদি অভয় দেন তো বলি।

ভীত হওয়ার কিছু নেই বৎস। নির্ভয়ে বলো।

আজ্ঞে ব্রহ্ম-ট্রক্ষ কিছু নেই। ব্রহ্মের আকার নেই, প্রকার নেই, গুণ নেই, বাক্য বা মন দিয়ে তার হদিশ মেলে না। সুতরাং ও বস্তুর থাকাও যা, না-থাকাও তাই। ব্রহ্ম হচ্ছে কিছু মানুষের অলীক কল্পনা। ব্রহ্ম আমাদের কোনও কাজে লাগে না, ব্রহ্ম ব্যবহারযোগ্য নয়, সুতরাং তার জ্ঞানেও আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই।

বৎস, তা হলে গত পাঁচ বছর ধরে তুমি আমার সন্নিধানে কায়ক্লেশে অবস্থান এবং সাধনাদি করলে কেন? তোমার উদ্দেশ্য কী?

ব্রহ্মসাধনই আমার উদ্দেশ্য ছিল বটে, কিন্তু হে আচার্য, সাধনা করতে গিয়েই ধীরে ধীরে এই সাধনার নিরর্থকতাও আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি। ব্রহ্ম আছেন এটাও যেমন জ্ঞান, ব্রহ্ম নেই এটাও তেমনই জ্ঞান। সাধনা করে আমি বুঝতে পেরেছি ব্রহ্ম-ট্রহ্ম কিছু নেই। এই নেতিবাচক জ্ঞানটির জন্যই সাধনার প্রয়োজন ছিল।

বৎস, আমার ধারণা হচ্ছে তুমি ঠিক মতো ব্রহ্মচর্য পালন করোনি, যথাবিহিত সংযম অবলম্বন করোনি এবং যথার্থ নিষ্ঠাও তোমার ছিল না।

হে ঋষি, আপনি অযথা আমাকে ভর্ৎসনা করছেন। তপোধন, এই সুবিশাল নৈমিষারণ্যে বহু ঋষিই নানা প্রকার তপস্যায় নিয়োজিত রয়েছেন, তাঁরা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী, তবু মাঝে মাঝেই তাঁরা চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে পড়েন বলে শোনা যায়। অথচ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মই হয়ে যান বলে কথিত আছে, তাই ব্রহ্মজ্ঞানীর পতন সম্ভব নয় বলেই আমরা শুনে আসছি। অথচ তাদের মধ্যে অনেকেই কোপন স্বভাববিশিষ্ট, ব্যভিচারী, লোভী, পরশ্রীকাতর,

সংকীর্ণমনা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অহংকারী। তা হলে ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের কেন অভীষ্ট সিদ্ধ করে তা আজ্ঞা করুন।

বৎস, তোমার অনাবিল দৃষ্টি এবং সরল অভিব্যক্তির জন্য তোমাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। অপিচ তোমাকে ইহজীবনের কিছু সারসত্যকেও উপলব্ধি করতে হবে। ঋষিরা কেউ সামান্য মানুষ নন। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁরা সাধারণ হবেন কী করে? তুমি তাদের মধ্যে যে সব অবগুণ প্রত্যক্ষ করেছ তাও ভ্রান্তি। প্রয়োজনে প্রত্যেকেই নির্মোক ধারণ করেন মাত্র। বহিরঙ্গের আচরণে তাঁদের বিচার না করাই ভাল। অন্তরে এঁরা সকলেই নির্বিকার, অচঞ্চল, স্থিতধী, মহাজ্ঞানী মানুষ। একমাত্র পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুগমন করলেই এঁদের স্বরূপ বুঝতে পারা যায়। আবার স্বভাবনিন্দুকদের অপপ্রচারও আছে। রটনার বশীভূত হয়ে এঁদের বিচার না করাই ভাল।

তপোধন, আপনি আমার পূজনীয় গুরু। দীর্ঘ পাঁচ বছর আমি আপনার গোধনের পরিচর্যা করেছি, গৃহকর্মে যথাসাধ্য সাহায্য করেছি, সমিধ ও ফলমূল আহরণ করেছি, নিজহাতে আপনার অঙ্গ সংবাহন করেছি, গোধূমাদি চূর্ণ করেছি। আমার সেবায় কোনও ফাঁকি ছিল না। আমার পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হয়েই আপনি আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেছিলেন।

বৎস, একথা অতি সত্য। তোমার সেবা ও সৎকর্মে সন্তুষ্ট হয়েই আমি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপযুক্ত পাত্র বলে স্থিরনিশ্চয় হয়েছিলাম। তোমার অধ্যয়ন ও পঠনপাঠনও সন্তোষজনক ছিল। আমার সিদ্ধান্তে কোনও ভুল ছিল বলে মনে হয় না।

তপোধন, ব্রহ্মজ্ঞানী যেহেতু ত্রিকালদর্শী হয়ে থাকেন তাই তাঁদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল হতে বাধ্য বলে শাস্ত্রের নির্দেশ আছে। তথাপি যদি আপনার ভুল হয়ে থাকে তা হলে ব্রহ্মজ্ঞানকেই সন্দেহ করতে হবে।

বৎস, তুমি আমাকে যে ধিক্কার দিচ্ছ তা প্রতিহত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ব্রহ্মজ্ঞানও সন্দেহাতীতভাবে সত্য। আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই, ব্রহ্মজ্ঞান তোমার অন্তরকে আলোকিত করল না কেন? পুত্র, তুমি আনুপূর্বিক বলো, কিছু গোপন করো না। আমি যোগযুক্ত হয়ে বসছি।

মহাভাগ, আমি এক সামান্য রাজকর্মচারীর পুত্র। আমার পিতা রাজকীয় কোষাগারের রক্ষক। চিরকাল পরধন প্রহরার কাজে নিযুক্ত। প্রত্যহই তিনি শতসহস্র স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রত্যক্ষ করেন। মাসান্তে সামান্য বেতন নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। আমাদের কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করতে হয়। পিতা আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, যাতে আমি বিদ্যাশিক্ষা করে অধ্যাপক বা আরও কোনও সৎকর্মে নিযুক্ত হতে পারি। পিতার উদ্দেশ্য পূরণার্থে আমার চেষ্টার অবধি ছিল না। আমি সাতিশয় মেধাবী এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ায় আমার অধ্যাপক স্বল্পকাল শিক্ষাদানের পরই বললেন, বৎস, তোমাকে আমার আর কিছুই শেখানোর নেই। তুমি সভাপণ্ডিতের শরণাপন্ন হও। সভাপণ্ডিত আমার মেধার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়ে বললেন, শাস্ত্রাদি, ব্যাকরণ ও কাব্য সবই তোমার কণ্ঠস্থ দেখছি। তোমাকে আমি আর কী শেখাব? তুমি কোনও সর্বজ্ঞ পুরুষের সন্ধান করো। নানা পণ্ডিতদের নানা বিধান শুনে শুনে আমি অবশেষে আপনার কাছে উপনীত হই। কিন্তু পিতা, মেধার বড় জ্বালা, মেধা যে সর্বদাই স্বস্তিদায়ক তা নয়। শাস্ত্রাদি আমার কণ্ঠস্থ বটে, কিন্তু হৃদয়স্থ নয়। উপরন্তু জন্মসূত্রে আমি রূপবান ও সুগঠন। মদনবাণে আমি প্রায়শই জর্জরিত হই। নগরের যুবতী নারী, কুলবধূ, কুমারী, বরাঙ্গনা ও বারাঙ্গনা সকলেই আমার প্রতি সহজেই আকর্ষিতা হয়। আমি কৈশোরকাল থেকেই রমণীগমনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। অবৈধ প্রণয়, ব্যাভিচার, বলাৎকার

কোনওটাতেই আমি অপটু নই। আসঙ্গপিপাসা ও তৃপ্তি ব্রহ্মস্বাদসহোদর বলেই শুনেছি। প্রভো, নারীসঙ্গ আমাকে যে আনন্দ দিয়েছে, ব্রহ্মের জ্ঞান যদি তাদৃশও দিত তা হলেও আমার বলার কিছু ছিল না। এখন আপনি বলুন পিতা, আমার দোষ কী!

পুত্র, অন্যান্য অনেক ঋষি যেমন বিবাহাদি করে থাকেন আমি তেমন নই। চিরকাল ব্রহ্মচর্যই অবলম্বন করে আছি। নারীসঙ্গ আমি কখনও লাভ করিনি। আসঙ্গপিপাসাও বোধ করি না। সুতরাং তোমার অভিজ্ঞতা কীরকম তা আমি অবগত নই।

হে মহর্ষি, নারীদেহে অবগাহন এক আশ্চর্য আনন্দ, রাজা থেকে ভিক্ষাজীবী সকলেই নারীদেহের বশ। নারীর প্রণয়ও এক বিরল অভিজ্ঞতা। আপনি নারীসঙ্গসুখ কখনও উপভোগ করেননি বলে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আপনার অগোচর রয়ে গেছে। প্রভু, আপনি মৃদু হাস্য করলেন কেন?

পুত্র, রমণীগমনের অভিজ্ঞতা বিষয়ে তোমাকে বিশেষ আগ্রহী দেখছি। সত্য বটে আমার সেই অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু নারী বিষয়ে আমি অজ্ঞ নই। বিধাতার সৃষ্টি কিছুই উপেক্ষার বস্তু নয়। তাঁর সৃষ্টি সবকিছুই বিশেষ অর্থ বহন করে। নারী বিনা কোনও মহান অবতার পুরুষেরও মানবজন্ম সম্ভব নয়। বৎস, সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক নিগূঢ় কথাই আমি তোমাকে বলেছি। তুমি যে-সম্ভোগের কথা বলছ তার পিছনেও সৃষ্টিরই অনুপ্রেরণা বিদ্যমান। নর ও নারীর বিহিত মিলন শ্রদ্ধারই ব্যাপার।

ভগবান, আপনি কখনও মাধ্বী বা দ্রাক্ষাসব পান করেননি।

না বৎস।

আপনি কখনও গীত শ্রবণ বা নৃত্য পরিদর্শন করেননি।

না পুত্র।

আপনি কখনও দ্যূতক্রীড়া বা বাজিতে অংশগ্রহণ করেননি।

না ধীমান।

আমি সবই আস্বাদ করেছি। অজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানহীন, প্রাকৃতজনেরা এই সকল উৎস থেকেই আনন্দ আহরণ করে। ক্ষণিকের তীব্র সুখানিভূতি তাদের গ্লানি, শ্রম, ক্লান্তি, বিষাদ, উদ্দীপনার অভাব অপনোদন করে। আয়ুষ্কাল পদ্মপত্রে নীরবিন্দু মাত্র। সাধারণ মানুষও এইসব সুখানুভূতির ভিতর ব্রহ্মস্বাদই পেয়ে থাকে। জীবনযাপন সহনীয় হয়।

তোমার এই বাক্য আমাকে বিস্মিত করছে বৎস।

মহাভাগ, বিস্ময় উৎপন্নের হেতু আপনার অনাস্বাদ। আপনি এইসব সুখানুভূতির শরিক নন। শরিক হলে বুঝতেন এও ব্রহ্মেরই আস্বাদ।

বটে!

আজ্ঞা ঋষিশ্রেষ্ঠ।

বৎস, তোমার কথা শুনে ওইসব ক্ষুদ্র ব্রহ্মবিশ্বকে অনুধাবন করার ইচ্ছা হচ্ছে।

অতি উত্তম প্রস্তাব মহর্ষি।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করো, আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

গুরুদেব তাঁর গৃহমধ্যে অন্তর্হিত হলেন এবং কয়েক দণ্ড পর যখন নিক্রান্ত হলেন তখন শিষ্য বিস্ফারিত লোচনে স্থানুবৎ বসে রইল। কোথায় সেই শ্মশ্রুগুস্ফমণ্ডিত প্রবৃদ্ধ অশীতিপর ঋষি। ইনি যে এক সতেজ, সটান, উজ্জ্বলকান্তি অতীব সুদর্শন এক যুবা পুরুষ।

আপনি কে?

বৎস, আমিই তোমার গুরু। বিস্মিত হয়ো না। আমি সামান্য পরিচর্যা করেছি মাত্র।

সেই লোলচর্মবিশিষ্ট, পলিতকেশ অশীতিপর বৃদ্ধই কি আপনি?

হ্যাঁ পুত্র, বৃথা কালক্ষেপে কাজ কী? সন্ধ্যা ঘনায়মান, এই তো প্রমোদের কাল। চলো।

কিছুকাল পরে গুরু ও শিষ্য একত্রে নগরের দুর্ধর্ষ নটী রাজবিননাদিনীর আলয়ে প্রবেশ করলেন। সেখানে নগরের শ্রেষ্ঠ ধনী, রাজন্যবর্গ, সেনাধ্যক্ষ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত। প্রত্যেকেরই অঙ্গে মহার্ঘ পোশাক, স্বর্ণালঙ্কার, পেটিকায় প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা ও মূল্যবান উপহারসামগ্রী। প্রত্যেকেই রাজবিনোদিনীর আসঙ্গলিপ্সু ও স্তুতি-উন্মুখ। প্রমোদশালা গন্ধে, পুষ্পে, রত্নখচিত বস্ত্রসম্ভার ও বর্ণাঢ্য গালিচায় শোভাময়। রাজবিনোদিনী সভাস্থলে অচিরেই প্রবেশ করবেন। সুন্দরী দাসীরা অতিথিবৃন্দকে উত্তম আসব ও নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য বিতরণে নিরন্তর পরিচর্যা করে চলেছেন। পরিচারকেরা বড় বড় সুদৃশ্য পাখায় ব্যজন করছেন। শিষ্য সমভিব্যাহারে ঋষি প্রবেশ করামাত্র সভাস্থল যেন হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতিথিরা সকলেই হতচকিত, বিস্মিত। তাঁরা এরকম দিব্যকান্তি পুরুষ আর দেখেননি। ঋষির পরনে নিতান্তই দুটি বস্ত্রখণ্ড। কিন্তু সেই সামান্য বেশবাসেই তাকে বড় অপরূপ দেখাচ্ছে। সকলেরই বিস্মিত দৃষ্টি তাঁর উপর নিবদ্ধ। যেসব যন্ত্রানুসঙ্গী নানা বাদ্যযন্ত্রে মধুর শব্দলহরী সৃষ্টি করছিল তারাও আচমকা থেমে গেল।

দেবর্ষি, আপনার আগমনে এখানে কিছু রসভঙ্গ হয়েছে।

কিন্তু বৎস, আমি তো রসভঙ্গ ঘটাতে আসিনি। গীতবাদ্য যেমন চলছে চলুক। তুমি সকলকে আশ্বস্ত করো। আমি আজ রসগ্রহণ করতেই এসেছি।

গীতবাদ্য ফের শুরু হল বটে, কিন্তু বেসুর বাজছিল।

উপস্থিত শ্রেষ্ঠীদের মধ্যে একজন উঠে পড়লেন। ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার আগে কী ভেবে হঠাৎ এগিয়ে এসে নতজানু হয়ে ঋষিকে প্রণাম করে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেলেন।

ক্ষণকাল পরে রাজন্যবর্গের একজন অনুরূপভাবেই উঠে পড়লেন। তিনিও বিদায় নেওয়ার আগে ঋষিকে অভিবাদন করে গেলেন।

ক্ষণকাল পরে আরও একজন এবং তার পরে আরও একজন। এমনি করে প্রমোদালয় ধীরে ধীরে শূন্য হতে লাগল।

শিষ্য উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, প্রভো, এঁরা রণে ভঙ্গ দিচ্ছেন কেন তা বুঝতে পারছি না। এঁরা কি আপনাকে অসম প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছেন? রাজবিনোদিনীর অনুগ্রহপ্রার্থীরা সহজে হার মানার মানুষ নন।

গুরু মৃদু হাস্য করলেন মাত্র।

প্রমোদগৃহ শূন্য হয়ে গেল। শেষ অতিথি রাজ্যের সহসেনাপতি বিদায় নিয়ে যাওয়ার আগে যথাবিহিত প্রণাম করলেন ঋষিকে। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না। মাথা নত করে বিদায় নিলেন।

গীতবাদ্যকাররা নীরবে বসে রইল। তাদের কণ্ঠে সুর আসছে না। বাদ্যযন্ত্রে আঙুল স্থির হয়ে আছে। এমন বিস্ফোরক অবস্থায় নিরানন্দ প্রমোদগৃহে প্রতিহারী অতি নির্বাপিত কণ্ঠে রাজবিনোদিনীর আগমনবার্তা ঘোষণা করল।

আগমন তো নয়, যেন আবির্ভাব। রাজবিনোদিনী সর্বাঙ্গসুন্দরী। কেশদাম থেকে পাদনখ পর্যন্ত যেন কোনও চতুর শিল্পীর কারুকার্য। স্বর্ণ, হীরকখণ্ডের আবরণে যেন বিদ্যুৎ খেলা করছে। অতি মূল্যবান রেশমি বসনের কুশলী বিন্যাস দেহযষ্ঠিকে আরও প্রকট করেছে। আয়ত দুই চোখে অপ্সরাসদৃশ কটাক্ষ্য। লীলায়িত দুখানি হাত যেন সর্বদাই নানা নৃত্যের মুদ্রায় আন্দোলিত। রাজবিনোদিনীর চলনেও ছন্দ, নৃত্যবিভঙ্গ প্রকাশ পাচ্ছে। অপরিমেয় এই সৌন্দর্য যে-কারও ধ্যান ভঙ্গ করতে সক্ষম।

রাজবিনোদিনী প্রমোদকক্ষে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল।

এ কী! আজ আমার প্রমোদগৃহ শূন্য! এ যে অবিশ্বাস্য। আমার কি যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে? কেশপাশে কি দেখা দিয়েছে বার্ধক্যের শ্বেতাভাস! আমার নৃত্য কি আকর্ষণ হারিয়েছে? ছলাকলা কি বিস্মৃত হয়েছি? নাকি অতিথিবৃন্দকে যথেষ্ট পরিচর্যা করা হয়নি? নাকি তাঁরা অপমানিত বোধ করে আমার গৃহ ত্যাগ করেছেন?

প্রমোদগৃহের এক কোণ থেকে শিষ্য উঠে দাঁড়িয়ে বিনয় সহকারে বলল, না ভদ্রে, প্রমোদগৃহ একেবারে শূন্য নয়। আমরা তোমরা দর্শনাভিলাষী হয়ে অপেক্ষা করছি।

অপরূপ নারী এবার তাঁদের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করল। চোখে বিরক্তি। মুহূর্তকাল মাত্র। তার পরেই রাজবিনোদিনীর দুটি আয়ত চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। প্রমোদগৃহের এক কোণে দীপশিখার আলো তেমন উজ্জ্বল নয়। অথচ সেখানে যেন একটি দীপদণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে। না, দাউ দাউ করে জ্বলছে না। অগ্নিরেখার মতো স্থির ও দীপ্ত হয়ে আছে। এ কে? কোনও প্রণয়প্রার্থী? প্রমোদপ্রিয়? সংগীতরসজ্ঞ?

বিভ্রান্ত রাজবিনোদিনী চঞ্চল হল। পদক্ষেপে স্বর্ণমঞ্জরীর নিক্বণ তুলে কয়েক পা এগিয়ে গেল অতিথিদ্বয়ের দিকে। তারপর বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সর্বাঙ্গ প্রকম্পিত হচ্ছিল এক অজ্ঞাত ভয়ে। বুকের মধ্যে এক সুগভীর দুন্দুভি বেজে উঠল যেন। আর বিস্ফারিত লোচন হঠাৎ সিক্ত হল অকারণ অশ্রুতে। স্থাণুবৎ কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থেকে আচমকা প্রবল বাত্যায় উৎপাটিত বৃক্ষের মতো ভূপাতিত হল রাজবিনোদিনী। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার পর অতি ধীরে নিজেকে উত্তোলন করে দুই পদ্মপত্রের মতো চোখে তাকিয়ে রইল ঋষির দিকে। মুখে বাক্যস্ফূর্তি হল না।

শিষ্য সবিস্ময়ে বলে উঠল, মহাতপ, এ কী! এই প্রমোদগৃহকে যে আপনি বিষাদগৃহে পরিণত করেছেন।

গুরু শুধু মৃদু হাস্য করলেন।

রাজবিনোদিনী তার স্খলিত অঞ্চল তুলে নিয়ে নীরবে নতমস্তকে প্রমোগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে গুরুদেব গাত্রোত্থান করে বললেন, চলো বৎস, আমাদের নৈমিষারণ্যের তপোবনে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। আর কালক্ষেপ বৃথা।

শিষ্য স্তম্ভিত মুখে গুরুদেবের অনুসরণ করতে লাগল।

নিশাকালে জনবিরল শব্দহীন তপোবনে গুরুদেবের পদপ্রান্তে বসে শিষ্য প্রশ্ন করল, গুরুদেব ব্রহ্মজ্ঞান আসলে কী বস্তু তা আজ্ঞা করুন।

গুরুদেব সহাস্যে বললেন, বৎস, ব্রহ্মজ্ঞান কোনও অলীক কল্পনা নয়, ধরাছোঁয়ার বাইরের ব্যাপারেও নয়, তোমার হাওয়ার নাড়ুও নয়। ব্রহ্মজ্ঞান হল কাণ্ডজ্ঞান বা বাস্তব চৈতন্য।

মহাশয়, আপনি বিস্তারিত বলুন। আমার কোথায় ভুল হয়েছিল?

বৎস, মানুষ যৌবনের অনিত্যতার কথা জানে, প্রমোদের ক্লান্তির কথাও জানে, সৌন্দর্যের অবসানের কথাও জানে। জীবনের শেষে যে মৃত্যু অপেক্ষমাণ তার কথাও কি মানুষ জানে না? তবু নিজেকে সে ভুলিয়ে রাখতে চায়। যে-জ্ঞান সব ধাঁধাকে ধ্বংস করে বস্তুর মর্মে পৌছয় তাই ব্রহ্মজ্ঞান। তুমি আবার সাধনায় ব্যাপৃত হও।

যথা আজ্ঞা গুরুদেব।

শীতের প্রকোপ কমে আসছে। মাঝে মাঝে দক্ষিণের হাওয়া বয়ে যায় আজকাল। গাঁয়ে বসন্তকালের দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া যায় এখনও। ভারী আরামদায়ক একটি আবহাওয়ায় সকালে নিজের ঘরে বসে আপনমনে লিখছিল অমল। আজকাল তার মন ভাল আছে। রাতে ঘুম হয়। আবার প্রশ্নও জাগে, ভোঁতা হয়ে যাচ্ছি নাকি? বুড়ো হয়ে গেলাম না তো! কিংবা কে জানে, আর পাঁচজন এলেবেলে মানুষের মতো আমিও হয়ে যাচ্ছি নিরীহ গৃহপালিত একটি প্রাণী! মেধাবী অমলের এ কি অধঃপতন? প্রশ্ন কমছে, জীবনের রহস্যময়তা হ্রাস পাচ্ছে, গণ্ডিবদ্ধ সংসারে দিব্যি খাপে খাপে বসে যাচ্ছে সে। মোনার সঙ্গে যে আকচা-আকচিটা ছিল সেটাও আর নেই। এখন সে খুবই ভদ্রভাবে অনুগত স্বামীর মতো বেশির ভাগ কথাতেই সায় দিয়ে চলে। ভিতরের সব অঙ্গার খাক হয়ে গেল নাকি তার? মাঝে মাঝে এই খাতাকলম নিয়ে বসা। এটাই তার একমাত্র অ্যাডভেঞ্চার। এইসব খণ্ডচিত্র কোনও নাটক-নভেল নয়, উপন্যাস বা গল্পও নয়, শুরু-মধ্য-শেষ বলে কিছু নেই। এগুলোর নেই কোনও ভবিষ্যৎও। তবু এই একমাত্র তার আবরণহীন হওয়ার ক্ষেত্র।

গতকাল শুক্রবার গেছে। অফিসের পর গাড়ি নিয়ে সন্ধের মুখেই তারা বেরিয়ে পড়েছিল উইকএন্ডে। একটু রাতের দিকেই পৌঁছেছে গাঁয়ে। এটা আজকাল তাদের প্রিয় অভ্যাস। এক সময়ে নাকি মোনার খুব গাছপালার শখ ছিল। বিদেশবিভুঁইয়ে আর সেসব শখ বজায় রাখা যায়নি। কলকাতার ফ্ল্যাটে টবে কিছু গাছপালা পালনের চেষ্টা হয়েছিল, সুবিধে হয়নি। মোনাকে তার শ্বশুরমশাই একটা ফাঁকা জমি ঘিরে দিয়ে বলেছে, তোমার এত গাছপালার শখ, আমি তোক ডেকে লাঙল দিয়ে দিচ্ছি। তুমি ইচ্ছেমতো গাছ লাগাও! সারা সপ্তাহ জল-টল আমরা দিয়ে দেবখন।

মোনা কলকাতার নার্সারি থেকে ইচ্ছেমতো ফুলের গাছ কিনে এনে লাগাচ্ছে তিন সপ্তাহ হল। তার চোখমুখে নতুন খেলনা পাওয়ার উত্তেজনা। সকাল থেকেই বাগানে পড়ে আছে। অন্য কোনও দিকে খেয়ালই নেই।

থাক, একটা কিছু নিয়ে থাক। যারা একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকে তাদের মাথায় শয়তানের বাসা হয় কমই। মোনা আজকাল অশান্তি কমই করে।

বাবা।

অমল তার অন্যমনস্ক চোখ ফিরিয়ে মেয়েকে দেখল, কী রে?

একটু ঘুরে আসছি। আজ চাক ভাঙা মধু খাব।

অমল হাসল। সব মধুই তো চাক ভাঙা।

হ্যাঁ। কিন্তু ভাঙা চাক থেকে টপ টপ করে মুখে গরম মধু পড়ার মতো তো নয়। খাবে? তা হলে তোমার জন্য নিয়ে আসব ক্যারিব্যাগে করে।

আনিস।

ওই রকম করে খেতে হবে কিন্তু। স্কুইজ এ লিটল, ড্রিংক এ ড্রপ অর টু।

তাই করব। কার বাড়িতে চাক ভাঙছে রে?

পান্নাদের জামগাছে। ইয়া বড় চাক।

এখানে এলেই সোহাগের মুখে একটা উজ্জ্বলতা দেখা যায়। ভিতরকার আনন্দ যেন ফেটে বেরোতে চায়। শহর ওর ভাল লাগে না, অমল জানে। শরীরও ভাল থাকে না কলকাতায়। মেয়েটা ভারী মানিয়ে নিয়েছে সকলের সঙ্গে।

অমল একটা তৃপ্তির শ্বাস ফেলল। হঠাৎ তার জীবনে সবকিছুই ভারী অনুকূল মনে হচ্ছে। গ্রহনক্ষত্রের খেলা নাকি? কে জানে বাবা! এত ভাল কি সত্যিই ভাল? ভালর আবার গুনোগার দিতে হবে না তো!

গাছের তলায় রাজ্যের ছোবড়া, ঘুঁটে আর কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া তৈরি হয়েছে। নিথর বাতাসে ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। কোনও পতঙ্গই ধোঁয়া সহ্য করতে পারে না।

সোহাগের হাতে একটা নতুন গামছা দিয়ে পান্না বলল, এটা দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে নাও।

ওমা! কেন?

কী জানি বাবা, মৌমাছিদের ঘর ভাঙা হচ্ছে, ওরা যদি রাগ করে ছুটে এসে কামড়ায়!

যাঃ, কিচ্ছু হবে না।

বিজুর পরনে ফুলপ্যান্ট, গায়ে টি শার্ট, কোমরে বাঁধা একটা গামছা, তাতে একটা চকচকে দা গোঁজা। সে খুব সন্তর্পণে টারজানের মতো জামগাছটা বেয়ে উঠে যাচ্ছিল। পিছু পিছু উঠছিল মরণ।

জানো তো, বিজুদা হল গাছ বাওয়ার ওস্তাদ। আর মরণ। কেউ ওদের মতো পারে না।

ঊর্ধ্বমুখে সোহাগ দেখছিল বিজুকে। ছিপছিপে দীঘল সুপুরুষ এই যুবকটিকে সে আজকাল কেন যেন খুব খুঁটিয়ে লক্ষ করে। একটু প্রাচীনপন্থী, ডু গুডার, একটু কুসংস্কারাচ্ছন্নও বোধহয়। কিন্তু লোকটা মন্দ নয়। মেয়েদের সামনে একটু আপসেট হয়ে পড়ে।

বিজু চাকটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। মরণ ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল, পান্নাদি চাদরটা দুজনে শক্ত করে ধরবে কিন্তু। মস্ত বড় চাক। অনেক মধু।

বিজু বলল, দুজনে পারবি তো! না হলে সুদর্শনকে বরং ডেকে আন।

মৌমাছিদের পাখার শব্দে চারদিকে ঝালা বেজে যাচ্ছে। অনেক মৌমাছি উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধোঁয়ার পরিধির বাইরে। খুব দূরে যায়নি এখনও। বাসার বড্ড মায়া। কত যত্নে কতদিন ধরে তৈরি করেছে এই চাক।

দাঁড়াও সোহাগ, সুদর্শনদাকে বরং ডেকেই আনি। মস্ত বড় চাক। আমরা পারব না।

পান্না সুদর্শনকে ডাকতে গেল। সোহাগ চেয়ে রইল ওপর দিকে। হঠাৎ যেন মধুর মতোই এক সুস্বাদ সে অনুভব করছিল তার সর্বাঙ্গে। কেন কে জানে।

তেষট্টি

বাইগুনগুলা দ্যাখেন খুড়া, কেমন বোঝেন?

ধীরেন কাষ্ঠর চোখ ভারী জুলজুল করছিল। গোয়ালের পিছন দিকটায় পচাই সার দিয়ে বেগুন ফলিয়েছে বাঙাল। শীতের মাঝামাঝি পার করে তবে ফলেছে বটে বেগুনের মতো বেগুন। কিছু সবজে-বেগুনি দো আঁশলা, কিছু প্রগাঢ় কালচে-বেগুনি রঙের। আখাম্বা বিরাট সাইজের নয়, মাঝারি গড়নের। বড় বড় পাতার আড়ালে আবডালে যেন নববধূর মতো সব আধো-ঢাকা হয়ে উঁকি দিচ্ছে। বেগুন চেনে ধীরেন। এর জাতই আলাদা। গা এত চকচকে যেন কেউ তেলে ডুবিয়ে এইমাত্র তুলেছে।

হাঁটু মুড়ে বসে জহুরির চোখে কয়েকটা বেগুন নেড়েঘেঁটে দেখল ধীরেন। ভারী নরম শরীর, ভিতরে যেন বিচিই নেই মোটে।

বাঙাল হে, এ তো বড় জাতের বেগুন দেখছি। ফলনও তো ধুন্ধুমার।

আইজ্ঞা। আপনারা কাশীর বাইগুন কইতে লোল ফালান, আমি কই ময়মনসিংহের বাইগুন একটু চাইখ্যা দেইখেন, রসগোল্লা ফালাইয়া বাইগুন খাইবেন।

আরও বড় হবে তো!

কন কী! আরও বড় মানে! লাউয়ের লাহান হইব। অখনই কী দ্যাখতাছেন, আর এক মাস পরে দেইখ্যেন, চোখে ধন্দ লাগব।

আজ বাঙালকে বেগুনে পেয়েছে। এক একদিন এক একটা পায় ওকে। তবে সত্যি কথা বলতে কি, ধীরেন সব বেগুনেরই স্বাদ পায়। পেটে খিদে থাকলে স্বাদ-সোয়াদের অভাব হয় না। তার কাছে কাশীর বেগুন যেমন, ময়মনসিংহের বেগুনও তেমন। তফাত হয়তো আছে, কিন্তু বাছবিচার নেই, তবে মোসাহেবি করা তার রক্তের মধ্যেই আছে, যখন যে যা বলে তাতেই তাল ঠুকে না গেলে ধীরেনের চলেই বা কী করে? সুতরাং সে সারা সকালটা বেগুনের ক্ষেতে ঘুরে ঘুরে বিস্তর হ্যাঁ, হুঁ, বটেই তো বলে যেতে লাগল। বেগুন নিয়ে আরও কিছুক্ষণ কাটত। কিন্তু বাঙালের কোলে তার মেয়ে হাম্মি চড়া রোদে আর থাকতে চাইছে না। সে কান্নাকাটি শুরু করায় বাঙাল বাড়ির দাওয়ায় ফিরে এসে ছায়ায় বসল। মেয়েটাকে ছেড়ে দিল উঠোনে।

একটা মেয়ের বমি করার শব্দ আসছিল কুয়োতলার দিক থেকে। কুয়োতলাটা আবডালে। রান্নাঘরের ওপাশটায় একটা নিমগাছের ছায়ার নীচে। এখান থেকে দেখা যায় না। বাঙাল কুয়োতলাটা বানিয়েছে হিসেব করে। নিমপাতা পড়ে পড়ে কুয়োর জল নাকি শুদ্ধ হবে, তা হবে হয়তো। কিন্তু বমিটা করছে কে? একটু কান খাড়া করে ধীরেন। লক্ষণ ভাল নয়। এ যদি বাসন্তী হয় তা হলে চিন্তার কথা। বমি করে নেতিয়ে-টেতিয়ে পড়বে হয়তো। তা হলে ধীরেনের সকালের খ্যাটনটা গেল।

বমির শব্দটা বাঙালও শুনছিল। মন দিয়েই শুনল। তারপর ধীরেনের দিকে চেয়ে বলল, মাইয়ালোকের এই বড় দোষ।

ধীরেন বুঝতে না পেরে একটা হুঁ দিয়ে দায় সারল।

রসিক নিজেই ফের বলল, প্যাটে বাচ্চা আইলেই বমিছমি কইরা নান্দিভাস্যি কাণ্ড।

এবার ধীরেন বুঝল, বলল, বলো কী। হাম্মি তো এই সবে দাঁড়াতে শিখেছে।

আর কইয়েন না খুড়া। ইচ্ছায় তো হয় নাই অ্যাকসিডেন্টাল কেস। হইয়া পড়ছে আর কী!

এরকম তো হতেই পারে। ধীরেন ব্যাপারটার মধ্যে আর কোনও দোষ দেখতে পেল না। তবে সকালে আজ হাঁটাহাঁটি হয়েছে বিস্তর। মহিমদাদার বাড়িতে আজকাল সকালের দিকে গিয়ে পড়লে একটু কফি জোটে। কফির একটু নেশাও হয়েছে আজকাল ধীরেনের। তা গিয়ে শুনল, কফি ফুরিয়েছে। আজ তাই লিকার চা জুটেছে। লিকার চা নিমকহারাম জিনিস। পেটে গিয়ে ঘুমন্ত খিদেকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দেয়। তখন ভারী হাল্লাচিল্লা পড়ে যায় পেটে। পেটের সেই হাঁচোড়-পাঁচোড় থেকেই মনে পড়ে গেল আজকাল বিজুদের বাড়িতে সকালের দিকে পাঁউরুটি সেঁকা হয়, পুরু মাখন লাগিয়ে খায় সবাই। জব্বর জিনিস। গিয়ে শুনল, সকালে সব পিকনিকে গেছে। আজ শনিবার, বাঙালের আজ বিকেলে আসার কথা। রোববার সকালে তার বাঙালের বাড়িতে পাকা বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু বাঙাল না-থাকলে সুবিধে হয় না। বাসন্তীর মা এসে সকালবেলায় থানা গেড়ে বসে থাকে। যৌবনের সেই রসে ঢলঢল মেয়েটি এখন কাকতাড়ুয়া বুড়ি। দেখলেই বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে। তার বউয়ের কাছে নালিশও করে এসেছে।

কামারপাড়ার রাস্তায় সকালে হঠাৎ বলাইয়ের সঙ্গে দেখা। বাসন্তীর হেক্কোড় দাদা। কানাই আর বলাইয়ের মধ্যে মারদাঙ্গা লেগেই আছে। একসময় বাঙাল ভগ্নীপোতকে গাঁ-ছাড়া করে বিষয়সম্পত্তি গাপ করার ফন্দি এঁটেছিল। কালু গুণ্ডাকে দিয়ে খুন অবধি করানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাঙাল শক্তপোক্ত লোক, সে ভয় খায়নি। মার খেয়েও নিজের দখল ছাড়েনি। গোঁ আছে বটে। মাঝখানে থেকে কানাই-বলাইকেই এখন আঁটি চুষতে হচ্ছে।

তাকে দেখেই বলাই হাঁটায় ব্রেক কষে বলল, এই যে ধীরেনকাকা কোথায় চললেন?

গলার চড়া আওয়াজটা ধীরেনের ভাল মনে হল না। বলাই মারমুখো মানুষ। তাই মিনমিন করে বলল, এই একটু বেরিয়েছি বাপু।

ওই শালার কাছে আপনার নাকি খুব যাতায়াত শুনতে পাই!

শালাটা কে তা বুঝতে না পেরে ধীরেন থতমত খেয়ে বলল, না তো! কে বলেছে তোমাকে?

লুকিয়ে তো লাভ নেই কাকা। সব জানি। আপনারা কিছু লোকই তো আসকারা দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছেন। এখন শালা চোখে ভেলভেট দেখছে। নইলে শুয়োরের বাচ্চার এত সাহস হয়?

ধীরেন বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল। বড্ড তেড়িয়া মেজাজ বলাইয়ের। গদগদে একটু হেসে বলল, না বাবা, কে কী রটায় কে জানে। ওসবে কান দিও না।

কেন কাকা, মিছে কথা বলে বুড়ো বয়সে পাপের বোঝা বাড়াচ্ছেন। ওই খানকির ছেলে আপনাদের মাথা খাচ্ছে কী করে? বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে আমাদের গাঁ ছারখার করে দিচ্ছে, দেখছেন না? আমার বোন তখন কুঁড়ি মেয়ে, বোধবুদ্ধি হয়নি। তাকে ফুসলিয়ে শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে বিয়ের ভড়ং করল, আপনারা

পাঁচজন টুঁ শব্দটি করলেন না। নইলে নাবালিকা হরণের জন্য ওর দশ বছর জেল হয়। ও শালা কী মতলবে একটা বউ থাকতে আবার বিয়েতে বসল সেটা কি বোঝেন না আপনারা?

এইবার কার কথা হচ্ছে তা ধরতে পারল ধীরেন। তবে সম্পর্কটা রাগের মাথায় বড্ড গুলিয়ে ফেলছে বলাই। কে কার শালা তার পর্যন্ত হিসেব করছে না।

আমতা আমতা করে ধীরেন বলল, যা হয়েছে তা তো হয়েই গেছে বাবা। একটা মিটমাট করে নাও বরং।

মিটমাট! ভাল বলেছেন বটে। ও হারামজাদা মিটমাটে আসতে চাইলে তো!

যেন ভারী অবাক হয়েছে এমন ভাব করে ধীরেন বলল, চাইছে না বুঝি?

রাগে বলাই যেন দুনো হয়ে উঠছিল, এ কথায় ফেটে পড়ে বলল, ও শালার পাখা গজিয়েছে, বুঝলেন? পেটে পেটে শয়তানি কি কম? আমার বোনকে ফুসলিয়ে বের করে নিয়েছে, লোককে ধাপ্পা দিয়ে দোহাত্তা জমি গাপ করছে, খোঁজ নিলে দেখবেন আরও কটা বিয়ে করে বসে আছে। এসব বদমাশ লোককে আপনারা প্রশ্রয় দিচ্ছেন কী করে? ভুবন জ্যাঠা তো বলেছিল, এই গাঁয়ে বাইরের লোক বসান দিতে দেবে না। পঞ্চায়েত না কচু। কিছু পারল করতে, টাকা খাইয়ে সব মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। বেশি নয়, আমার ধূপকাঠির ব্যবসায় দশটি হাজার টাকা ঢাললেই ফুলেফেঁপে উঠবে। খদ্দের ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। মাত্র দশটি হাজার টাকা ধার হিসেবে চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। আমার মাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ধীরেন ভারী অবাক হয়ে বললে, তাই নাকি? এ তো অন্যায় কথা।

অন্যায় নয়! বলে পাঠিয়েছিলুম হ্যান্ডনোট লিখে দিচ্ছি, না হয় বউয়ের নথ বাউটি বাঁধা দিচ্ছি, তা কানেই তুলল না। আপনারা সবাই মিলে এই অন্যায়ের একটা বিহিত তো করতে পারেন। নাকি?

হে হে করে ভারী বুঝদারের মতোই হাসছিল ধীরেন। বাসন্তীর মা বিয়ের সময় মোটা টাকা পণ নিয়েছিল রসিকের কাছ থেকে, সবাই জানে। বিষয়-সম্পত্তিও সবই বাসন্তীর নামে। এদের হয়তো আশা ছিল লোকটাকে হাড়িকাঠে ফেলা গেছে। কিন্তু বাসন্তীকে যত বোকা বলে ধরে নিয়েছিল এরা ততটা বোকা যে বাসন্তী নয়, সেও যে নিজের ভাল-মন্দ বোঝে এটা টের পেয়ে এখন এদের এক গাল মাছি। শুধু তাই নয়, বাসন্তী তার বাঙাল স্বামীকে ভালবাসে খুব। যদিও তার কানে বিষ বড় কম ঢালেনি কানাই-বলাইয়ের মা।

তবে এতসব আস্ফালনের ভিতর থেকে পরমহংস যেমন জল থেকে দুধ তুলে নেয় তেমনি ধীরেনও আসল খবরটা পেয়ে গেল। তা হল বাঙাল এসেছে। আর তার মানেই হল সকালে আজ একটা খ্যাটনের ব্যবস্থা হল।

তা এ পর্যন্ত ভালই এগোচ্ছিল ব্যাপারটা। বেগুনক্ষেত দেখে বেড়ানো অবধি, কিন্তু বাধক হচ্ছে বাসন্তীর ওই বমিটা, ওতেই এক বালতি দুধে এক ফোঁটা গোচোনা পড়ে যাচ্ছে।

সে বাঙালের দিকে চেয়ে বলল, তাই বুঝি?

হ খুড়া। ইচ্ছায় হয় নাই। তবে ভগবানের ইচ্ছার উপর তো হাত নাই।

তা তো বটেই।

আমি বউরে কইছি, কষ্ট-টষ্ট হয় হউক, পোষাইয়া দিমু অনে। কিন্তু মুশকিল কী জানেন? প্যাটে তো কিছুই রাখতে পারছে না। যা খায় উগরাইয়া দেয়।

তবে তো সমস্যা।

খুব সমস্যা।

বমির শব্দ থেমেছে। এখন জল কুলকুচি করার শব্দ হচ্ছে। মুক্তার গলার স্বর শোনা গেল, অ বউদি, পেট তো একেবারে খালি করে দিলে। গিয়ে শুয়ে থাকো গে যাও, রান্না-বান্না আমি দেখছি।

বাসন্তীর ক্ষীণ গলায় বলল, না বাপু, শখ করে ইলিশ মাছ এনেছে। বেগুন-ইলিশ খাবে। আমি পারবখন, তুই একটু আগুপিছু করে দিস।

তোমার মাকে একটা খবর দেব কি?

কেন?

শুনেছি নাকি কোন শেকড় বাটা খাইয়ে পোয়াতির বমি বন্ধ করতে পারে।

না বাপু, ওসব জিনিসে আমার দরকার নেই। বমি হচ্ছে হোক। এ তো আর নতুন কিছু নয়।

বাঙাল খুব আনমনে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে। হাম্মি টলোমলো পায়ে দাওয়া ধরে ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে বাপের দিকে ফিরে চেয়ে মোট চারখানা দাঁত দেখিয়ে হাসছে।

ভারী সুন্দর সব দৃশ্য। ছানি-পড়া চোখে এসব দৃশ্য আবছা হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার সব ফুটে উঠেছে। ভারী ভাল দেখছে আজকাল ধীরেন। পেটে খিদে আঁচড়াচ্ছে। তবু কিছু খারাপ লাগছে না এখন। মনটা ভাল থাকলে এমন ধারা হয়! তখন খিদে-টিদে সব চাপা পড়ে থাকে।

মনটা ভাল হতে বেশি কিছু লাগে না! মানুষের এক-একটা উচ্চারণই যেন যুগযুগান্তের কুয়াশা কাটিয়ে রোদের আলো ছড়িয়ে দেয়! ওই যে কুয়োতলায় বাসন্তীর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল, বমি করে উঠে হাঁফ ধরা গলায় বলছে, না বাপু শখ করে ইলিশ মাছ এনেছে। বেগুন-ইলিশ খাবে। আমি পারবখন, তুই একটু আগুপিছু করে দিস।

একটুকুই তো কথা, কিন্তু এই কথাটুকুই বড় বিহ্বল করে ফেলেছে তাকে। তাও বাসন্তী হল গিয়ে বাঙালের দ্বিতীয় বউ। আইনে যার স্বীকৃতি নেই। তার উপর ভিনদেশি মানুষ, গোঁয়ারগোবিন্দ, ভাষাটাও রাক্ষুসে। তা বলে কি ভালবাসায় ভাঁটা হল? নাঃ, বাঙালটার কপাল আছে। পুরুষও বটে।

বুঝলেন খুড়া, টাকাপয়সা বিষয়সম্পত্তি কোনও কামের জিনিস না। যার লিগ্গা করি সেই হইল আসল। হ্যায় যদি না থাকে তাহইলে হগ্গলই ফাক। বুঝলেন?

বুঝেছি হে। বাসন্তীর জন্য ভাবছ তো! আরে, চিন্তা কী? ও গাঁয়ের মেয়ে, শহুরে মেয়ের মতো ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় না।

উপর্যুপরি হইয়া গেল তো, তাই একটু ডরাই।

আগে তো বাপু সব উপর্যুপরিই হত। তখন তো আর আটকানোর উপায় ছিল না।

খুড়া, বাসন্তীরে ভাল কইরা আশীর্বাদ কইরেন তো। আপনে একজন সজ্জন মানুষ, মনে কালিঝুলি নাই, প্রাণ ভইরা আশীর্বাদ কইরেন তো। গর্দিশটা য্যান পার হইতে পারে।

তার আশীর্বাদের কোনও দাম আছে বলে যে কেউ বিশ্বাস করে এটাই ধীরেনের কাছে অবিশ্বাস্য। বিহুল থেকে বিহুলতর লাগতে লাগল তার। এতটাই যে, চোখে জল এসে গেল। বুড়ো বয়সে কিছুই আটকানো যায় না। না পেচ্ছাপ, না চোখের জল। সুড়সুড় করে চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে এল।

ধুতির খুঁটে চোখ মুছে ধরা গলায় ধীরেন বলল, কোনও কাজ হবে কিনা জানি না, তবে পাপীতাপী মানুষেরও মনে আশীর্বাদ জমা হয়ে থাকে, বাসন্তীর কিছু হবে না হে বাঙাল, তুমি দেখো।

বড় চিন্তা হয় খুড়া। মাইয়াটা বড় ভাল। ভালগুলাই তো টিকতে চায় না কিনা।

টিকবে হে টিকবে। শশধর ডাক্তারের সঙ্গে একবার দেখা কোরো। পুরনো ডাক্তার। এরকম হোমিওপ্যাথ পাবে না।

না, পেটের হাঁচোড়-পাঁচোড়টা আর নেই ধীরেনের। মন উপচে আনন্দটা চলকে পড়েছে বঝি পেটেও। বেশ ভরা ভরা লাগছে।

চলি হে বাঙাল। বলে উঠতে যাচ্ছিল সে।

আরে, কই যান খুড়া? গিরস্তের অকল্যাণ চান নাকি?

কী যে বলো বাঙাল। তাই চাইতে পারি?

এই বাড়ি থিক্যা একটা কাউয়া পইর্যন্ত শুধু মুখে যায় না। বহেন বহেন।

আবার চোখে জল আসে ধীরেনের। স্থলিত কণ্ঠে বলে, আজ থাক।

পাগল নাকি? আপনারে খাওয়াইলে তো আমারই লাভ খুড়া। পরকালের বোঝা কমব। বহেন।

তা বসল ধীরেন। মনের বিহ্বল ভাবটা যাচ্ছে না। বড় অন্যরকম লাগছে চারদিকটা। ভারী ভাল লাগছে। জীবনে বোধহয় এরকম দিন দুটো-একটাই আসে।

মুক্তা এসে প্রথমে চা দিয়ে গেল। খাঁটি দুধের জিনিস, চা-পাতাটাও বেজায় ভাল। এরকম চা কোথাও খায়নি কখনও ধীরেন।

একটু বাদেই এল লুচি আর নতুন লালচে ছোট আলুর শুকনো দম।

খান খুড়া, প্যাট ভইরা খান।

আজ ধীরেন খিদের জন্য খেল না। লোভেও না। খেতে খেতে মনে মনে বলল, এদের দোষঘাট যা আছে তা সব আমার হোক ঠাকুর। এদের ভাল হোক। এই এদের সব গ্রহের দোষ, সব রিষ্টি, ফাঁড়া সব আমার গ্রাসে গ্রাসে মিশে যাক।

খুড়া।

অ্যাঁ।

প্যাট ভরছে?

ওঃ, খুব ভরেছে হে বাঙাল।

এইবার এক গ্লাস দুধ খান। নূতন গোরুব দুধ।

নাঃ হে, একদিনে এত ভাল নয়। পেট ছেড়ে দেবে।

আরে ধুর, আপনেরে তো অনেকদিন দেখতাছি। পারবেন।

দুধ খেতে হল। তারপর উঠল ধীরেন।

সকালটা আজ বড় ভাল কাটল। এখন বাকি দিনটা যেমনই কাটুক কিছু যায়-আসে না। দিন কেমন কাটবে তার একটা আন্দাজও আছে ধীরেনের। এই গাঁয়ের ঘাটায়-আঘাটায় চরকিবাজি করে বেড়ানোই তার জীবনযাপন। কোনও অর্থকরী কাজ নেই, লাভালাভ নেই, উপার্জন নেই। বাড়ি ফিরলে অশান্তি হয় বলে

আজকাল বাইরেই সময়টা কাটিয়ে দেয় সে। কেউ বসতে বললে বসে। চুপচাপ ঘন্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে তার কোনও কষ্ট নেই। কত কী দেখে, কত কী শোনে। সূর্য মাথায় চড়ে বসলে ঘরমুখো হয়।

বাড়ি ফিরতেই তার বউ আজ বলল, বাঙাল বাড়িতে কিছু মেগে-পেতে এসেছ নাকি?

ধীরেন সভয়ে বলল, না তো!

তবে যে বড় ঝুড়িভর্তি আনাজ পাঠিয়েছে। কী ব্যাপার?

অবাক হয়ে ধীরেন বলে, পাঠিয়েছে নাকি?

হ্যাঁ। মেলা পাঠিয়েছে। সঙ্গে একটা খোকা ইলিশ অবধি।

আমি কিছু চাইনি। বাঙাল দিলদরিয়া লোক।

সে তো বুঝলুম। সে লোক খারাপ নয় জানি। কিন্তু তার খণ্ডার শাউড়ি এসে না ফের ঝেড়ে কাপড় পরায়।

ধীরেন কী বলবে, চুপ করে রইল।

শুনলুম, ছেলের বউরা মিলে নাকি আজ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তেঁতুলতলায় পুঁটুলি বগলে বসে আছে গিয়ে।

কার কথা বলছ?

বাঙালের শাউড়ির কথাই বলছি। এতকাল ঝগড়াঝাঁটি হত, কিন্তু ঘরের বার করে দেয়নি। আজ দিয়েছে।

কেন?

তা অত কে জানে? ভুতোর মা বলে গেল ছেলের ব্যবসার জন্য বাঙালের কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিল। বাঙাল দেয়নি বলে বুড়ির ওপরে গিয়ে রাগ পড়েছে। তাই বুড়িকে বেড়ালপার করতে চাইছে। কর্মফল তো আছে রে বাবা! আমাকে সেদিন বিঁধিয়ে কত কথাই বলে গেল তোমাকে নিয়ে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল ধীরেনের। এখন অভাবে-কষ্টে, সংসারের অশান্তিতে বাসন্তীর মা হয়তো ডাইনিবুড়ির মতো একজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এরকম তো ছিল না মহিলা। বিয়ে হয়ে যখন এল তখন রূপের বন্যা বয়ে যায়নি ঠিকই কিন্তু ভারী মিঠে চেহারাখানা ছিল। দাঁতের সারি ছিল দেখবার মতো। একটু পুরু রসালো ঠোঁট। গাঁয়ে বেশ বলাবলি হত তাকে নিয়ে। মনে পাপ নেই তার, তবু ধীরেনের স্বীকার করতে বাধাও নেই, ওইরকম একখান বউয়ের বড় সাধ হয়েছিল তার।

সেই জোয়ান বয়সে ধীরেনের শরীরখানাও বড় কম ছিল না। ইয়া বুক ছিল, দু হাতে ছিল কামারের হাতের মতো জোর। ঝাঁকড়া চুল ছিল। অনেক কটাক্ষই তাকে বিঁধেছে এককালে। বাসন্তীর মাও খুব আড়ে আড়ে তাকাত তার দিকে, মিষ্টি মিষ্টি রহস্যময় হাসত। রসালো কথা-টথাও হত মাঝে মাঝে।

না, তার বেশি কিছু হয়নি।

সময়ের পোকা সব কেটেকুটে ফোঁপরা করে দিয়ে গেছে তাদের। এখন সে বউঠানের চোখের বিষ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ধীরেন।

মরণ হাঁফাতে হাঁফাতে রান্নাঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল, ওমা!

দুর্বল শরীরে জলচৌকিতে বসে বাঁশের খুঁটিতে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজে ছিল বাসন্তী। একটু অসাবধানে পেটে এল কুঁচোটা। তাতে বাসন্তী মোটেই বিরক্ত নয়। কিন্তু প্রথম কয়েকটা মাস তার বড় কষ্টের মধ্যে যায়।

এই নিয়ে চারবার। প্রথমটা বাঁচেনি। এটাও বেঁচেবর্তে থাকবে কিনা কে জানে। শরীরে মায়া ছড়িয়ে মাকে কষ্ট দিয়ে আসছে তো!

মরণের চেঁচানিতে চোখ খুলে বলল, কী রে?

জিজিবুড়িকে মামিরা তাড়িয়ে দিয়েছে। তেঁতুলতলায় বসে আছে গিয়ে।

সে কী!

হ্যাঁ গো। খুব কাঁদছে বসে, আর রাজ্যের লোক জুটে গেছে সেখানে।

তুই গিয়ে দেখলি?

হ্যাঁ গো। আমি তো গিয়ে হাত ধরে কত টানাটানি করলাম। বললাম, আমাদের বাড়ি চলো।

সোজা হয়ে বসে শুষ্ক মুখে বাসন্তী বলল, তা কী বলল তোকে?

বলল, তোর মাও তো আমাকে সকালে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি কোথাও যাব না। আমি আজ মরব। হ্যাঁ মা, তুমি সত্যিই তাড়িয়ে দিয়েছ?

বাসন্তী একটু চুপ করে থেকে বলল, তাই বলেছে বুঝি? মার যেমন সব কথা! তাড়াব কেন? টাকা চাইতে এসেছিল, দিইনি।

কী হবে মা? জিজিবুড়ি যদি মরে যায়?

কাঁদছে বললি?

হ্যাঁ গো। খুব হাপুস কাঁদছে। মণিবউ বলল, সে নাকি দেখেছে বড় মামি জিজিবুড়িকে চুল ধরে টেনেছে, আরও সব কী করেছে যেন।

বাসন্তী স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ উনুনের দিকে চেয়ে থেকে বলল, মা তো সব কথা চেপে যায়। ওরা যে কী করে কে জানে!

কী হবে মা?.

লোক জড়ো হয়েছে কেন রে?

জিজিবুড়ি যে তাদের কাছে সব বলছে।

কী বলছে?

এইসব অত্যাচারের কথা-টথা। তোমার আর বাবার কথাও বলছে।

কী বলছে শুনলি?

বলছিল, তোমরা নাকি মা শাশুড়ি বলে মানো না। সব সময়ে দুরছাই করো। উপোস করলেও খেতে দাও না। শাপশাপান্তও করছিল।

মায়ের জিভে যে বড্ড ধার। তোর বাবা কোথায়?

বাবা তো জমিতে গেছে।

দৌড়ে যাবি বাবা, ডেকে নিয়ে আয় তো মানুষটাকে।

বাবাকে ডাকব? বাবা যে জিজিবুড়িকে দেখতে পারে না।

কে বলল তোকে?

আমি জানি তো।

বাজে কথা। বাবাকে তুমি চেনো না ধন। তোমার বাবার মন বড় ভাল। যা দৌড়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়।

তার চেয়ে তুমি চলো না মা।

না বাবা, পাঁচজনের সামনে আমি মেয়েমানুষ গিয়ে আদিখ্যেতা করতে পারব না। তোর বাবা বিবেচক মানুষ, ঠিক একটা ব্যবস্থা করবে। যা, দেরি করিস না।

মরণ পাঁই পাঁই করে ছুটল। বেশি দূর যেতেও হল না। একটু গিয়েই দেখতে পেল তার বাবা ললিতখুড়োর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

বাবা!

তার বাবা ফিরে তাকিয়ে হঠাৎ সচকিত হয়ে বলল, কী রে, তর মায়ের কিছু হইছে নাকি?

না। মা তোমাকে ডাকছে।

ডাকতাছে? ক্যান রে, শরীর খারাপ লাগে নাকি?

না না। মা ঠিক আছে। কী দরকার যেন।

তার বাবা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল বাড়িতে।

কী হইছে গো?

বাসন্তী উঠোনে বসে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছিল। মুখ তুলে বলল, কী করি বলো তো? বউদিরা মাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কও কী?

তেঁতুলতলায় গিয়ে নাকি বসে আছে, রাজ্যের লোক জুটেছে সেখানে। কী করব বলো তো?

অকালকুষ্মাণ্ডগুলা কই? বাড়িতে নাই?

ওদের তো চেনো। মাকে ওরাই কি ভাল চোখে দেখে? দেখলে কি বউদের এত সাহস হয়?

কাইন্দো না। কী করতে চাও কও।

সেইজন্যই তো তোমাকে ডেকেছি। তুমি বলে দাও কী করব এখন।

যদি এই বাড়িতে আইন্যা রাখতে চাও তো রাখতে পারো।

আমার যে বড্ড ভয় করে। যেই মা এ-বাড়িতে আসবে অমনি দাদারাও ওই ছুতোয় এসে হানা দেবে। মাকে তো চেনো। ছেলেরা বিষ দিলেও ছেলেদের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে না।

হেইটা তো পরের কথা। অখন চটজলদি তো কিছু করতে হইব।

মাকে নিয়ে আসবে?

তুমি কইলে আনুন। ভাইব্যা কও।

আমার মাথায় কি বুদ্ধি আছে? আমি তো তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি।

একখান কথা কই?

বলো না।

ঠাইরেনের দম একটু পরেই ফুরাইব। গুটিগুটি বাড়িও ফিরব। কিন্তু হেইটা কথা না। কথা হইল তোমারে লইয়া। এই অবস্থায় বেশি টেনশন ভাল না।

এই অশান্তি আমার আর সহ্য হয় না যে।

হেই লিগ্যাই কই, আমি গিয়া ঠাইরেনেরে লইয়া আসি। দুই দিন থাউক। তারপর ভাল বুঝলে বাড়িতে ফিরা যাইব।

মা তো ইদানীং এ-বাড়িতেই থাকতে চাইছিল। কিন্তু আমি রাজি হইনি। মায়ের কথাবার্তা আমার ভাল লাগে না। বড্ড খারাপ খারাপ কথা বলে। পান থেকে চুন খসলেই শাপশাপান্ত করে। এখনও নাকি করছে, মরণ শুনে এসেছে।

তবু গর্ভে তো ধারণ করছিল। মায়ে কি আর খারাপ হয়?

তুমি যদি ভাল বোঝো তো আনো গিয়ে। আমি কিছু ভাবতে পারছিনা। তুমি কলকাতায় চলে গেলে আমার ভারী ভয়-ভয় করবে কিন্তু।

দুর বলদা মাইয়ালোক, মায়েরে ভয় কী?

আমি যে যুঝতে পারি না।

খুব পারবা। বরং এই অবস্থায় মা কাছে থাকলে তোমার সুবিধাই হইব। বুড়ি-ধুড়িরা ভাল সামাল দিতে পারে।

মাকে তো তুমি চেনো না!

খুব চিনি। একটু ঘুষঘাষ দিলেই বুড়িরে হাত করতে পারবা। চিন্তা নাই।

ঘুষ দেব? মাকে?

আরে, ঠাইরেন কি আর আবগারির দারোগা? একটু দোক্তা, একটু দুধ, একটু মাথার তেল, একখান কাঁকাই, একথান থান, একজোড়া ভাল জুতা এইসব আইন্যা দিলেই দ্যাখবা ঠাইরেনের মুখে তালা ঝুলতাছে।

মুখে তালা ঝুলবার কথায় বেমক্কা হিহি করে হেসে ফেলল মরণ। বাসন্তীও লজ্জা পেয়ে মাথা নোয়াল। রসিক ছেলের দিকে চেয়ে বলল, এই বান্দর, খাড়াইয়া খাড়াইয়া বড় মাইনষের কথা গিলতাছছ্ যে বড়!

চৌষট্টি

তুমি ভূত নামাতে পারো সুদর্শনদা?

কস্মিনকালেও নয় দিদি।

তবে লোকে যে বলে, তুমি ভূত নামাতে পারো।

লোকের যেমন কথা।

কিন্তু তুমি তো লোককে তাবিজ কবচ দাও শুনেছি। নিলুর দিদিমার নাকি তোমার তাবিজে অর্শ সেরে গেছে!

এই সন্ধেবেলাটায় আজ সুদর্শন এসে একখানা ভাঁজ করা বস্তা পেতে মেঝেতে জড়সড় হয়ে বসেছে পান্নার ঘরে। আজ অমাবস্যা, কুয়াশা, এবং লোডশেডিং-এর এ্যহস্পর্শ। তার ওপর বাড়িতে কেউ নেই। বাবা কোথায় আড্ডা মারছে গিয়ে, মা গেছে বড়মার বাড়িতে। হীরা পরেশ মাস্টারের বাড়ি গেছে পড়তে। ঝপ করে বাতিটা নিবতেই ধক করে উঠেছে পান্নার বুক। এবার কী হবে? সন্ধের পর এমনিতেই ভয়ে তার হাত পা গুটিয়ে আসে। হাতের কাছে আকস্মিক লোডশেডিং-এর জন্য হ্যারিকেন আর দেশলাই থাকে। টর্চ জ্বেলে হ্যারিকেনের সলতে ধরাতে গিয়ে পান্না দেখল তার হাত কাঁপছে। রান্নাঘরে আছে শুধু সুদর্শন। লোকটাকে দেখলেই সে ভূত-ভূত গন্ধ পায়। তাই প্রথমে সুদর্শনকে ডাকেনি সে। কিন্তু এই অলক্ষুণে গাঁয়ে সন্ধের পরেই ঝুপ করে এমন নিশুতি নেমে আসে কেন কে জানে বাবা। আর তার মধ্যেই অন্ধকারে কত রকমের যে বিকট শব্দ হতে থাকে। এই কাক ডাকল, কিংবা প্যাঁচা। গাছে গাছে ভুতুড়ে হাওয়া বয়ে গেল। বাঁশবনে এমন মটমট শব্দ উঠল যেন কেউ বাঁশ ভাঙছে। লোডশেডিংটা এখনই না হলে কি চলত না বাপু?

তবু খানিকক্ষণ লেপ চাপা দিয়ে কান মাথা ঢেকে হ্যারিকেনের আলোয় পড়ার চেষ্টা করছিল পান্না। কিন্তু হঠাৎ পশ্চিমের বন্ধ জানালাটায় এমন শব্দ হল যে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

আর না পেরে পান্না উঠে দরজা খুলে চেঁচিয়ে ডাকল, সুদর্শনদা! ও সুদর্শনদা, একটু এসো তো।

সুদর্শন সুকণ্ঠ মানুষ। একটা কালীকীর্তন গাইছিল রাঁধতে রাঁধতে। ডাক শুনে দরজায় এসে দাঁড়াল, কী গো দিদি, ভয় পাচ্ছো নাকি?

সবাই তার ভয়ের কথা জানে। তাই বড্ড রাগ হয়ে যায় পান্নার। বলে, ভয় পাবো না তো কী? একটু এসে বোসা এখানে। আমার পড়া হচ্ছে না।

এই যে যাই। ডালটা নামিয়ে ভাত চাপিয়েই যাচ্ছি।

গ্যাস নিবিয়ে দিয়েই এসো না।

তাই যাচ্ছি দিদি।

সুদর্শন এসে বসে আছে। লোকটা খুব বকাবাজ। কথা কইতে ভালবাসে। তা পান্নার কিছু খারাপ লাগল না। এই গা ছমছমে অন্ধকার সন্ধেবেলায় বরং কথাবার্তাই ভাল।

তাবিজের কথায় লজ্জা পেয়ে সুদর্শন বলল, ও আমার কোনও বাহাদুরি নয় দিদি। পেটের ধান্ধায় নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি তো, নানা লোকের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। এক একজনের কাছ থেকে এক একটা টোটকা শিখেছি। গরিব মানুষদের তো ডাক্তার দেখানো বা ওষুধ কেনার পয়সা থাকে না, টোটকাই ভরসা। তবে ওতে কাজও হয় খুব।

আর কী জানো তুমি?

সুদর্শন মাথা নেড়ে বলে, কিছুই জানি না। পেটে ক্লাস ফাইভের বিদ্যে। তবে টুকটাক অনেক কিছু শিখেছি। পুজোপাঠ জানি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রিরির কাজ জানি, খানিক ছুতোরগিরিও করতে পারি। এসব জানলে কি চলে?

ওসব নয়। ভূতপ্রেতের কথা কী জানো?

ওসব তো আজকাল কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না মোটে। তোমার বয়সি ছেলেমেয়েরা তো হেসেই উড়িয়ে দেয়।

না বাপু, আমার ওসবে খুব বিশ্বাস। হ্যাঁ সুদর্শনদা, তুমি কখনও দেখেছ?

ওই দেখো, ওসব বললে তো তুমি হাঁ করে গিলবে, তারপর ভয় পাবে, আর তারপর মা ঠাকরুন আমাকে বকবে ভয়ের কথা বলেছি বলে।

আচ্ছা, মাকে বলব না।

কাজ কী তোমার ওসব শুনে? আমাদের মতো তো আর তোমাকে ঘাটে অঘাটে ঘুরতে হবে না। তুমি থাকবে পাকা বাড়িতে, বিজলি বাতির তলায়, ভূতপ্রেত সেখানে সেঁধোয় সাধ্যি কী?

একটা ঘটনা বলোই না বাপু।

ঘটনা কি একটা দিদি? অনেক ঘটনা।

একটা কম ভয়ের গল্প বলো তাহলে। বেশি বিদঘুটে গল্প হলে কিন্তু আমি চেঁচাব।

শুনে সুদর্শন খুব হাসল। বলল, তাহলে শোনো। ভয়-ভয় লাগলে বোলো, থামিয়ে দেবো।

আচ্ছা।

তখন রামপুরহাটে একটা বাড়িতে রান্নার কাজ পেয়েছি। সে খুব বড়লোকের বিরাট বাড়ি। দু-দুটো মহল। অগুন্তি ঘর, কিন্তু লোকজন নেই মোটে। স্বামী-স্ত্রী আর একজন বুড়ো চাকর। ওই বিশাল পুরনো আমলের রাক্ষুসে বাড়িতে আর কেউ থাকে না। কর্তা-গিন্নির বয়স বেশি নয়। চল্লিশের নীচেই। পৈতৃক সম্পত্তি আছে বলে কর্তা চাকরি-বাকরি করেন না। সারাদিন শুয়ে বসেই সময় কাটান। গিন্নিও তাই। পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে গল্পগাছা করে আর সেজেগুজে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে দিব্যি আছেন। সন্ধেরাত্তিরেই খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন তাঁরা। বুড়ো চাকরটারও একই দশা। তাদের আয়েস আলসেমি দেখে আমার হাসি পেত। কত লোক দু-মুঠো ভাতের জন্য কত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, আর এরা তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে আয়ু কাটিয়ে দিচ্ছে। তা যাই হোক, আমি সন্ধেরাত্তিরে ছুটি পেয়ে আমার ঘরটিতে বসে লম্ফ জ্বেলে রামায়ণ মহাভারত এইসব পড়তাম। একটু সুর করে গুনগুন শব্দে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়েছ কখনও?

না তো!

পড়ে দেখো, ভারী ভাল লাগবে।

এখনও পড়?

হ্যাঁ। আমি আবার তাড়াতাড়ি ঘুমোতে পারি না। রাত জেগে ওসব পড়া আমার অনেক দিনের অভ্যেস।

তারপর বলল।

একদিন বুড়ো চাকরটা আমাকে বলল, ওহে সুদর্শন, এ-বাড়িতে সবাই আগেভাগে শুয়ে পড়ে কেন জানো? আমি বললাম, না তো! সে বলল, এ-বাড়িতে ভূত আছে, রাতের দিকে তারা সব কোনাঘুপচি থেকে বেরিয়ে আসে। সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। তাদের বিরক্ত করা ঠিক হবে না ভেবেই আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ি। তুমি যে রাতজেগে থাকো এটা কিন্তু ভাল নয়। আমি তার কথা মোটে গায়ে মাখলাম না। বললাম, আমি তো আমার ঘরটিতে বসে বই পড়ি, ভূতেরা তো গোটা বাড়িটাই পাচ্ছে। তা যাই হোক, আমি যেমন রাত জেগে পড়ছিলাম তেমনই পড়তে লাগলাম। দিন কতক পর একদিন রাত জেগে রামায়ণ পড়তে পড়তে হঠাৎ টের পেলাম, আমি ছাড়া ঘরে আরও কে যেন আছে।

ওরে বাবা! সত্যি?

এটা কিন্তু বেশি ভয়ের গল্প নয় দিদি। ভয় পেও না।

আচ্ছা বলো।

টের পেয়ে গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল। ঘাড়টা শক্ত হয়ে গেল, হাত পায়ে খিল-ধরা অবস্থা। গলাটাও ফেঁসে গিয়ে কেমন বেসুর ফাঁপা ফাঁপা স্বর বেরোচ্ছে। প্রথম অভিজ্ঞতা তো!

তুমি তবু চেঁচাওনি?

না দিদি। চেঁচিয়ে লাভ কী? বিরাট বাড়ির আর এক প্রান্তে একটেরে একখানা ঘরে ছিলাম, চেঁচালেও কেউ শুনতে পেত না। তা ছাড়া বিপদে মাথা ঠান্ডা না রাখলে ভুলভাল হয়ে যায়। সব কাজেই তাই বুদ্ধিটা ঠিক রাখতে হয়। এটি গেলেই সর্বনাশ।

তুমি কী করলে?

প্রথম টায় মুখ তুলে চারদিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না। তবে খানিক বাদে ভাবলাম, ভূতপ্রেত বা চোর-ডাকাত যাই হোক, আমার মতো গরিবকে মেরে তার লাভ কী? আর আমি মরলেও দুনিয়ার তো কিছু যাবে আসবে না। আমার মতো মনিষ্যিরা তো পৃথিবীর জঞ্জাল বই নয়। ভিড় বাড়ানো ছাড়া আমরা কোন কাজে লাগি বলো! এইসব ভেবে মুখ তুলে তাকালাম। লম্ফের আলোয় কিছুই প্রথমটায় ঠাহর হল না। তারপর চোখে পড়ল, বাঁদিকে দেয়াল ঘেঁষে কে যেন অন্ধকারে বসে আছে। থান পরা বিধবা বলেই মনে হচ্ছিল।

বাবা গো!

আগেই ভয় পেও না। চোখেরও তো নানা বিভ্রম হয়। বেশির ভাগ ভূত দেখাই তো ভুল দেখা কিনা। তাই চোখ কচলে ভাল করে চেয়ে দেখলাম।

তোমার দুর্জয় সাহস কিন্তু সুদর্শনদা।

না দিদি, সাহস-টাহস নয়। আমরা হলাম মরিয়া মানুষ। আমাদের জলেও বিপদ, ডাঙাতেও বিপদ। ভয়ডর বগলদাবা করেই তো চলতে হয়। ওটা ঠিক সাহস নয়, ও হল “আয় শালা কে কী করবি” ভাব।

সেটা আবার কী?

জানো না বুঝি? মানুষ যখন খুব ভয় খেয়ে যায়, যখন দেখে আর রক্ষা নেই, এবার গেছি, তখন হঠাৎ তার ভিতরে একটা পাগলাটে ক্ষ্যাপা সাহস হয়। সে তখন ফুঁসে তেড়ে "আয় শালা কে কী করবি" বলে ঘুরে দাঁড়ায়। ওটা সাহস বা বীরত্ব নয়, সাময়িক ক্ষ্যাপামি।

আহা, বিধবার কথাটাই তো চাপা পড়ে যাচ্ছে। তুমি বড্ড অন্য কথায় চলে যাও।

সুদর্শন হেসে বলল, না দিদি, পরিস্থিতিটা বলছি আর কী।

তারপর বলল। তুমি সত্যিই দেখলে?

হ্যাঁ। বেশ অন্ধকার, ঝুঁঝকো মতো আবছায়ায় বিধবা মানুষটি আসনপিঁড়ি হয়ে বসা। গায়ে একটা শালও যেন জড়ানো ছিল। খুব স্থির হয়ে বসা। সেই দেখে আমার বুকের মধ্যে ধপধপ করে যেন হাতির পা পড়তে লাগল। গলা শুকিয়ে কাঠ। শিরদাঁড়া বেয়ে বরফজল নেমে যাচ্ছে যেন। আর হাত পায়ের সে কী ঠকঠক কাঁপুনি!

অজ্ঞান হয়ে গেলে না?

না। হয়তো দাঁতকপাটি লাগত, কিন্তু কী হল জানো?

কী?

বিধবা ঠাকরুন হঠাৎ ডান হাতটা দিয়ে রামায়ণ বইটা দেখিয়ে দিলেন।

ওরে বাবা!

বুঝলাম, ঠাকরুন আমাকে রামায়ণ পড়তে বলছেন।

কিন্তু রাম নাম শুনলে নাকি ভূত পালায়।

ওসব লোকের মনগড়া কথা। রামায়ণে তো কোথাও তেমন কথা পাইনে বাপু। রাম তো আর ভূতের ওঝা ছিলেন না।

তারপর কী হল বলো।

ঠাকরুনের হুকুম মনে করে আমি ফের রামায়ণ পড়ার চেষ্টা করতে গেলাম। দেখলাম ভয়ে গলার স্বর বেরোচ্ছে না, চোখেও আবছা দেখছি। কিন্তু তবু কাঁপতে কাঁপতে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলাতেই পড়তে লাগলাম। আশ্চর্যের কথা হল, কিছুক্ষণের মধ্যে গলা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল, হাত পায়ের ঠকঠকানিও রইল না, শীতভাবটা উধাও হল। আড়চোখে দেখলাম, ঠাকরুন স্থির হয়ে বসে আছেন।

আর ভয় করল না?

না গো দিদি। ভগবানের নাম করছিলাম তো, ভয় কি থাকে? ধীরে ধীরে ভয় উবে গেল। মনে হল ঠাকরুন হয়তো অতৃপ্ত আত্মা, ভগবানের নাম শুনলে জুড়োবেন। তাতে আমারও পুণ্যিই হবে। মনে আছে, পড়া শেষ করে বই বন্ধ করতেই ঠাকরুন উঠে আসনখানা কুড়িয়ে নিয়ে নিরেট দেয়ালের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

তখন তুমি কী করলে?

কী আর করব, বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ভয় করল না?

না, আর ভয়ের কী? একবার ভয় কেটে গেলে ও আর হয় না। বসন্ত রোগের মতো, একবার হলে আর হয় না। দিব্যি ঘুমোলাম। পরদিন সেই বুড়ো চাকর নিতাইদাকে ঘটনাটা বলতেই সে খুব গম্ভীর হয়ে বলল,

খুব বেঁচে গেছ। আজ থেকে আর রামায়ণ পড়ার দরকার নেই, বরং আমার ঘরে এসে শুয়ো।

তাই করলে?

পাগল! আমি বললাম, তা কেন, ঠাকরুন যদি রামায়ণ শুনতে চান তাহলে রোজ শোনাব।

শোনাতে বুঝি?

হ্যাঁ দিদি। রোজ রাতে বসে বসে রামায়ণ পড়তাম আর ঠাকরুন এসে শুনতেন। পড়া শেষ হলে রোজ একইভাবে আসন তুলে নিয়ে দেয়ালের মধ্যে মিলিয়ে যেতেন। আমার ভারী তৃপ্তি হত। মনটা ভরা ভরা লাগত।

তোমার দুর্জয় সাহস সুদর্শনদা!

সুদর্শন লাজুক হাসি হেসে বলল, তুমি ভিতু মানুষ বলে সবচেয়ে কম ভয়ের গল্পটা শোনালাম। ভয় পাওনি তো!

পাইনি মানে! আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

আমি কী ভাবি জানো? ভাবি আমরা যেমন ওরাও তো তেমনই। আমরাও আছি, ওনারাও আছেন। ভগবানের দুনিয়ায় কাকে ফেলা যায় বলল। ঘেয়ো কুকুরটাকে যে সৃষ্টি করলেন তিনি, তারও হয়তো দরকার ছিল। ঘুরে ঘুরে এইসব মনে হয়েছে আমার।

তুমি ওই বাড়িতে কতদিন ছিলে?

তা বছরটাক হবে।

চাকরিটা ছাড়লে কেন?

কোনও জায়গায় বেশিদিন আটকে থাকতে যে আমার ভাল লাগে না। আর কী জানো? তারা ভারী অলস লোক। তাদের আলসেমি দেখে দেখে আমারও যেন শরীরে আলিস্যি আসছিল। কিন্তু তা হলে তো আমার চলবে না। আমাকে তো খেটে খেতে হবে। তাই একদিন পুঁটুলি বগলে করে বেরিয়ে পড়লাম।

তার মানে তুমি আমাদের বাড়িতেও বেশি দিন থাকবে না!

সুদর্শন লাজুক হেসে বলল, তা কী বলতে পারি? এখন বয়স হচ্ছে, বেশি ঠাঁইনাড়া হতে আর ইচ্ছে যায় না।

আর একটা গল্প বলবে?

উপর্যুপরি শোনার দরকার কী? আর একদিন শুনো। আমার যে রান্না পড়ে আছে।

লোকে কিন্তু ঠিকই বলে। তুমি ভূতের বন্ধু। ভূতের সঙ্গে কথা বলল।

বাজে কথা বলে। গাঁয়ের লোকের অন্ধ বিশ্বাস তো। তবে একথা বলতে পারি যে আমার শত্রুও কেউ নয়।

কথা ঘুরিয়ো না সুদর্শনদা, তুমি ভূত পোযো কিনা বলো।

বাপ রে, ভূত কি পোষার বস্তু দিদি? বেড়াল কুকুর তো নন। তাঁরা সবাই মান্যিগন্যি মানুষ, শ্রদ্ধার পাত্র।

একটা সত্যি কথা বলবে?

বলব না কেন?

এ-বাড়িতে ভূত দেখেছ?

না দিদি, এ-বাড়িতে ভূত-টুত কিছু দেখিনি।

আমি ভয় পাবো বলে বলছ না। এ বাড়িতে ভূত কিন্তু আছে।

ও তোমার ভয়-ভয় ভাব থেকে মনে হয়। আর থাকলেই বা কী? চোখের আড়ালে তো রোগের জীবাণুও থাকে। ওই যে টিভিতে ছবি দেখো, রেডিওতে গান শোনো ওসবও তো এই হাওয়া বাতাসেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাদা চোখে দেখতে পাও কি? যেই টিভি বা রেডিও খুললে অমনই সব ভেসে উঠল। এও তো ভৌতিক ব্যাপারই, তাহলে ভয় পাও না কেন?

দুর, ওসব তো সায়েন্স। ভৌতিক হবে কেন?

ভৌতিক ছাড়া কী বলো। ওসব ছবি গান তো পঞ্চভূতেই মিলেমিশে রয়েছে। ভয় না পেলেই হল।

না বাবা, আমার বড্ড ভয়।

বাইরে থেকে একটা মিষ্টি মেয়েলি গলা ডাকল, এই পান্না।

গায়ের লেপটা ফেলে সটান উঠে বসল পান্না। মুখ উদ্ভাসিত। সোহাগ এসেছে!

সুদর্শন উঠে দরজাটা খুলে দিয়ে এক গাল হেসে বলল, এসো দিদিমনি।

হাই পান্না!

হাই সোহাগ! জানো, এতক্ষণ বসে সুদর্শনদার কাছে একটা ফ্যান্টাস্টিক ভূতের গল্প শুনছিলাম। রিয়াল লাইফ স্টোরি।

সত্যি!

হ্যাঁ। সুদর্শনদার ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স।

সুদর্শন বলল, তোমার যত ভয় দিদি, আর সোহাগ দিদিমনিকে দেখো তো, একটুও ভয়-ডর নেই!

তা বলে ভেবো না যে, আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। আই ফিল দেম।

হ্যাঁ ভাই, তোমারও ভীষণ সাহস। আমার না ভীষণ কান্না পায়।

ওমা! কেন?

তোমাদের মতো আমার সাহস নেই বলে। ভয় পেয়ে পেয়ে একদিন আমি ঠিক হার্টফেল হয়ে মরে যাব।

যাঃ। হার্টফেল তোমার হবে না। আমার সঙ্গে কয়েকদিন নাইট অ্যাডভেঞ্চার করো, তাহলে তোমারও ভয়ডর কেটে যাবে।

তোমার সঙ্গে! রক্ষে করো। মরেই যাব।

তোমরা বসে গল্প করো, আমি তোমাদের জন্য কফি করে আনছি। বলে সুদর্শন চলে গেল।

এই সোহাগ বিছানায় উঠে লেপচাপা দিয়ে বোসো।

যাঃ, আমি চটি পরে এসেছি, পায়ে ধুলোময়লা আছে না!

এই শীতে চটি পরে ঘুরছ!

তোমার খুব শীত লাগছে বুঝি?

ভীষণ। লেপের বাইরে হাত রাখতে পারছি না।

বাইরে বেরিয়ে দেখো, অত শীত নেই।

তা হবে হয়তো। আমি সেই বিকেল থেকে লেপচাপা হয়ে আছি। কতক্ষণ আগে বাথরুম পেয়েছে, যাইনি।

তুমি ভীষণ কুনো, তাই না!

হ্যাঁ তো।

এই বাংলাটা সবে শিখেছি।

হ্যাঁ, আজকাল তোমার বাংলায় বেশ গাঁইয়া টানও আছে।

তা হবে না। আমি তো বড়মা, পিসি, দাদু এদের কাছ থেকে শিখি। আজকাল ইংরিজি বলি না। শুধু বুডঢার সঙ্গে বলতে হয়। ও বাংলায় তেমন ফুয়েন্ট নয়।

হ্যাঁ সোহাগ, তোমার চেহারাটাও আজকাল বদলে গেছে।

তাই বুঝি?

আগের মতো রাফ-টাফ ভাবটা নেই তো!

আগে কি রাফ-টাফ দেখাত আমাকে?

একটু লাগত যেন।

আমি বিশেষ বদলে গেছি বলে আমি কিন্তু টের পাই না। মনে হয় যা ছিলাম তাই তো আছি। বরং বদলে গেছে আমার মা আর বাবা।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। দে আর নাউ রিকনসাইলড।

সেটা তো ভীষণ ভাল ব্যাপার। আমার মা বাবার মধ্যে ছাড়াছাড়ির অবস্থা হলে আমি তো পাগলই হয়ে যাব।

সেটা আমারও নিশ্চয়ই ভাল লাগত না। কিন্তু যা হল সেটাও কি ভাল?

ভাল নয়! বলো কী?

মাথা নেড়ে সোহাগ বলল, ব্যাপারটা নরম্যাল হলে কথা ছিল না। কিন্তু কী হল জানো! বাবাকে দেখছি, প্রাণপণে মাকে খুশি রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আগে বাবা যেমন একটু খেয়ালি ছিল, আনমনা ছিল, রিসার্চ নিয়ে ডুবে থাকত সেরকমটা আর নেই। ঠিক কথা, বাবার মনে ব্যালান্স ছিল না, কিন্তু তখন বাবার কিছু ক্রিয়েটিভিটি ছিল। একজন পুরুষ যখন কোনও মহিলাকে খুশি করাটাই টারগেট করে নেয় তখন তার চিন্তার জগৎ ধীরে ধীরে ব্যাঙ্করাপ্ট হতে থাকে। আমার বাবার চোখে আগে একটা গ্লিন্ট দেখতে পেতাম। এখন পাই না।

ঝগড়াটা তো মিটেছে সোহাগ।

হ্যাঁ। আর সেটা মেটাতে গিয়ে বাবার ভিতরটা বোধহয় মরে গেছে। অনেক দিন ধরে ডিপ্রেশন চলছিল বাবার। ডিপ্রেশন মানুষকে পাগল করে তোলে ঠিকই, কিন্তু জিনিয়াসদের ওটা হয়। কারণ তারা সব স্বাভাবিক আচরণের সঙ্গে নিজেদের অ্যাডজাস্ট করতে পারে না।

কী যে বলছ মাথামুণ্ডু আমার মগজে একদম ঢুকছে না।

তাহলে থাক। ওসব শুনে তোমার কাজ নেই।

তুমি পালটে গেছ সোহাগ, টের পাও না?

মুখ টিপে একটু হেসে সোহাগ বলল, সাপ তো মাঝে মাঝে খোলস ছাড়ে।

যাঃ! কী একটা উপমা।

সাপ কিন্তু ভারী সুন্দর একটা জীব। তোমার ভাল লাগে না?

মাগো! সাপের কথা ভাবলেই গা শিরশির করে।

কেন বলো তো! সাপের সারা শরীরেই তো লিরিক। যেমন রঙের কম্বিনেশন তেমনই ব্যালেরিনার মতো শরীরের ঢেউ। যখন ফণা তোলে তখনও মনে হয় ম্যাজিক্যাল। তুমি কি জানো যে সাপ একটা স্পিরিচুয়াল প্রাণী?

কী জানি বাবা, শুধু জানি সন্ধের পর নাম নিতে নেই। আস্তিক মুনি, আস্তিক মুনি, আস্তিক মুনি।

ও কে বাবা, লেট আস ড্রপ দি স্নেক বিট। কাল কি তোমাদের পিকনিক হচ্ছে?

হবে না মানে? সব অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেছে। ফ্রম ব্রেকফাস্ট টু আফটার নুন টি।

অতক্ষণ কি ভাল লাগবে, বলো তো! অনেক লোক থাকবে তো!

আরে তাতে কী? আমরা থাকব আমাদের মতো।

সুদর্শন একটা প্লেটে ফুলকপির বড়া আর কফি নিয়ে এল ট্রেতে করে। বলল, খাও তোমরা। গরম আছে, সাবধানে হাত দিও।

ওঃ, ইউ আর অ্যান এঞ্জেল!

শেষ অবধি লোক বেশি হল না। সোহাগ সবাইকে চেনেও না। সে আর পান্না জোট বেঁধে ছিল। কিছুক্ষণ। তারপর এই উদাস প্রান্তরে একমুঠো বনভূমি আর ছোট্ট একটু নদীর একা বয়ে-যাওয়া তাকে ভারী উদাস করে দিল। মানুষের জটলা কি এখানে মানায়? এখানে সবচেয়ে ভাল একা আসা।

পান্না যখন তার সমবয়সি বন্ধুদের সঙ্গে কথায় মেতে আছে সেই সময়ে টুক করে সরে এল সোহাগ। তারপর ছোটো বনভূমিটি পার হয়ে হাঁটতে লাগল।

পিছন ফিরে দেখতে পেল, ওরা আড়ালে পড়েছে।

একটা ছোট্ট ঢিবি পেরিয়ে সোহাগ পরিপূর্ণ নির্জনতা পেয়ে গেল। সামনে ক্ষেত-খামার। বহু দূর পর্যন্ত সবুজ আর হলুদ।

খুঁজে খুঁজে নদীর ধারে ঘাসের ওপর বসল সে। নদী বলতে শুধুই বালি। ক্ষীণ একটু স্রোত কষ্টে বয়ে যাচ্ছে। জলে নামলে হাঁটু অবধিও হবে না।

তার মন ভাল নেই। কেন ভাল নেই তা সে ভাল বুঝতে পারে না। সে কি বদলে যাচ্ছে?

চুপচাপ অনেকক্ষণ শূন্য মনে ঝুম হয়ে বসে রইল সে।

তারপর তার বুকের ভিতরে একটা আশ্চর্য কথোপকথন শুরু হল। এটা আজকাল হয়। হচ্ছে।

একজন অচেনা পুরুষ বলল, কতদিন পালিয়ে থাকবে তুমি? ধরা তো পড়বেই।

পালাচ্ছি কে বলল? পালাব কেন?

টের পাও না?

না। আমি কখনও পালাইনি। আমি তো ভয় পাই না।

পাও। নিজেকে।

নিজেকেই বা কেন ভয় পাব?

পাও নিজের ভিতরকার সত্যের মুখোমুখি হতে চাও না বলে পাও।

বাজে কথা। যাও তুমি।

যাব! যেতে বলছ?

পঁয়ষট্টি

ক্ষীণতোয়া নদীটির ধারে ধারে সাবধানী পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাছলোভী কিছু পাখি। এক কাঠঠোকরা অবিরল ঠুকরে যাচ্ছে কোনও গাছে, তাকে দেখা যাচ্ছে না। একটি দুটি কাঠবেড়ালির ব্যস্তসমস্ত যাতায়াত, এই বিরলে, নির্জনে ভাষাহীন এক কর্মকাণ্ড বয়ে যাচ্ছে। বাতাস কথা কইছে, নদী কথা কইছে, কে জানে গাছে গাছেও কথা হয় কি না, হয় বোধহয়। এই নির্জনতায় বসে সোহাগ তার ভাষাহীন চারদিককার ভাষাহীন কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল। তার ভিতরকার অচেনা পুরুষটি তার মতোই চুপ করে আছে। তার মতোই যেন শুনছে এই চারদিকটার কথা।

সোহাগের পৃথিবী আর সকলের মতো নয়। যা দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, অনুভব করা যাচ্ছে সেখানেই সোহাগের পৃথিবীর শেষ নয়। তার জগৎ আরও অনেক গভীর। চারদিককার শূন্যতার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে কত রহস্য, কত দীর্ঘশ্বাস, কলকাকলি, কত হারিয়ে যাওয়া কথা। তার তো মনে হয় পৃথিবীর প্রথম মানুষ এবং প্রথম মানবীর শ্বাসবায়ু আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে তার চারদিকে।

চারদিকটা আজ যেন প্রাণময়। গাছপালা, পাখি, কীটপতঙ্গ সকলের সঙ্গেই তার বড় ভাব করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সকলের সঙ্গে ভাব হয় না, করাও যায় না। বেড়াল, কুকুর, গোরু, ছাগল একরকম। কিন্তু আরও কত প্রাণী আছে পৃথিবীতে তারা আদর ভালবাসা বোঝে না, তাদের প্রেম-ট্রেম নেই। আছে শুধু কাজ, শুধু বেঁচে থাকা এবং প্রজনন। যেমন পিঁপড়ে, যেমন কেঁচো বা সাপ। কিছুতেই ভাব হয় না তাদের সঙ্গে, সে বইতে পড়েছিল, উইপোকাদের কথা, মাটির গোপন গহন প্রকোষ্ঠে রানি উইপোকাটাকে কেমন তোয়াজে রাখে অন্য উইপোকারা, খাওয়ায়, গরমে বাতাস অবধি করে। তার বদলে অলস রানির কাজ হল কেবল প্রসব করে যাওয়া। তার খুব ইচ্ছে হয়েছিল উইপোকাদের সেই বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসে। মানুষ যদি মাঝে মাঝে পোকামাকড়ের মতো ছোট্টটি হয়ে যেত তবে বড্ড ভাল হত। ওই যে একটা কাক গাছের ডালে বসে তাকে উদ্দেশ করে অনেকক্ষণ ধরে ডাকছে, সোহাগের মনে হচ্ছে ও কিছু বলতে চাইছে তাকে। কাকের ভাষা যদি সে বুঝত!

বন্ধুদের সঙ্গে গল্পে গল্পে একদম খেয়াল ছিল না পান্নার। হঠাৎ একসময়ে খেয়াল হল সোহাগ কোথায় গেল? তাকে তো দেখা যাচ্ছে না কোথাও!

একটা ট্রাকে কমলবাবু আর কোটারারের লোকজন এসেছে। একটা ভাড়া করা বাসে এসেছে তারা। তবু লোকজন বেশি হয়নি। মেরেকেটে সতেরো আঠেরোজন হবে। তার মধ্যে বিজুর ক্লাবের সাত-আটজন ছেলে। সবই এক গাঁয়ের লোক, সবাই চেনা জানা। শুধু সোহাগই এদের মধ্যে নতুন। সে কাউকে ভাল চেনে না। বলতে গেলে এই দঙ্গলে সে-ই একমাত্র সোহাগের বন্ধু। যারা এসেছে তারা অধিকাংশই একটু জায়গাটা

দেখতে গেছে ঘুরেফিরে। শুধু কয়েকজন একটু দূরে ব্যাডমিন্টন খেলছে। দু-তিনজন বয়স্কা মহিলা রোদে পিঠ দিয়ে উল বুনছে বা গল্প করছে শতরঞ্চি পেতে, কোথাও সোহাগ নেই।

পান্না উঠে চারদিকটা দেখে এল। কোথাও নেই।

বন্ধুদের কাছে এসে বলল, এই, সোহাগ কোথায় বলতে পারিস?

টুসকি বলল, ও তো একটা পাগল। কোথায় গিয়ে কার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে দ্যাখ। কয়েকদিন আগেই তো দেখছিলাম কুমোরপাড়ায় সন্ধিবুড়ির দাওয়ায় বসে কী যেন বকবক করে যাচ্ছে।

পান্না বলল, মোটেই পাগল নয়, একটু খেয়ালি আছে।

ইতু বলল, যাই বল ভাই, বড্ড দেমাক। আমেরিকায় ছিল তো, তাই মাটিতে পা পড়ে না।

পদ্মা বলল, দেমাক হলে কি কেউ সন্ধিবুড়ির ঘরে গিয়ে বসে?

সে যাই বলিস, আমাদের সঙ্গে তো মিশতেই চায় না।

পান্না মাথা নেড়ে বলে, বললাম তো, একটু খেয়ালি। কিন্তু ভীষণ ভাল মেয়ে।

টুসকি বলল, মা তো আমাকে বলেই দিয়েছে অমল রায়ের মেয়ের সঙ্গে যেন না মিশি।

কেন রে! কী করেছে এমন সোহাগ?

দেমাক আছে ভাই, সে তুই যাই বলিস।

গাঁয়ের মহিলামহলে সোহাগ যে জনপ্রিয় নয় তা পান্না জানে।

সে বলল, মেয়েটা কোথায় গেল একটু খুঁজে দেখা দরকার।

নন্দিনী এতক্ষণ কিছু বলেনি। এবার বলল, অ্যাডাল্ট মেয়ে বাবা, অত চিন্তার কী আছে? এখানে তো আর হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই, গাড়িও চাপা পড়বে না। অস্থির হচ্ছিস কেন? চারদিকটা ঘুরতে গেছে হয়তো।

চল না, আমরাও একটু চারদিকটা দেখি। সেই তখন থেকে তো বসে গল্পই করে যাচ্ছি।

সবাই উঠে পড়ল।

হঠাৎ একটা খটকা লাগল পান্নার। ধারেকাছে বিজুদাকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এমনকী হতে পারে যে বিজুদা আর সোহাগ কোথাও নির্জনে গিয়ে গল্প-টল্প করছে! এরকমই তো হওয়ার কথা। সে তো নিজেও তাই চায়। ওদের মধ্যে ভাব হোক। খুব ভাব হোক। চায় না কে?

কিন্তু সমস্যা সোহাগকে নিয়েই। নিকষ্যি নারীবাদীরা যেমন হয় সোহাগ তেমন নয়। কিন্তু ওর পাগলা খেয়ালিপনা আছে। কোনও পুরুষ কি পারবে ওকে সামাল দিতে! বিজুদাকে পান্না চেনে। বিজুদা বড় ভাল ছেলে। ভীষণ মরালিস্ট এবং বিশুদ্ধতাবাদী। অন্যায় দেখলে রুখে দাঁড়ায়। বোধহয় পুরুষের সুপ্রিমেসিতেও বিশ্বাস প্রবল। ওর সঙ্গে কি সোহাগের বনবে?

ইস, যদি ওদের মিলমিশ হত কী ভালই হত তবে!

বনভূমি পার হয়ে খানিকটা এগোতেই সোহাগের দেখা পাওয়া গেল। তন্ময় হয়ে, বিভোর হয়ে বসে আছে। বাহ্যচেতনা নেই যেন।

সোহাগ! এই সোহাগ!

সোহাগ চমকাল না। ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ভারী সুন্দর দেখাল ওকে এখন। কী নিস্পাপ, ভাবলেশহীন মুখ! মুখে একটু মিষ্টি হাসি।

কী করছ এখানে বসে? আমরা তখন থেকে খুঁজছি তোমাকে!

নদীর ধারে এসে বসেছিলাম। নদী আমার ভীষণ ভাল লাগে।

ও মা! আমরা তো নদীর ধারেই পিকনিক করছি।

এমনই একা হতে ইচ্ছে করছিল বড্ড। একা না হলে ঠিক ফিল করা যায় না।

ও বাবা! আমরা তো বসে কলকল করে কথা বলেছি এতক্ষণ। কথাই আর ফুরোয় না।

আমারও কি কথা ফুরোয়! কত কথা জমা হয়ে আছে।

কার সঙ্গে কথা বলছিলে তুমি?

কে জানে! কথা হচ্ছিল, তবে কার সঙ্গে তা জানি না। বোধহয় নিজের সঙ্গে নিজের।

পান্না হেসে ফেলল, মাথায় পোকা আছে তোমার।

তা আছে।

বন্ধুরা একটু ছড়িয়ে গেছে। নদীর অগভীর জলে চটি হাতে নিয়ে নেমে পড়েছে সবাই। ওপাশে যাবে। নদীটায় মাত্রই কয়েক হাত চওড়া জলস্রোত। পেরোনো কোনও সমস্যা নয়।

টুসকি মুখ ফিরিয়ে ডাকল, এই পান্না ওপারে যাবি? ছোলার খেত দেখা যাচ্ছে, কাঁচা ছোলা খেতে বিউটিফুল।

তোরা যা আমি একটু পরে আসছি।

পান্না সোহাগকে বলল, হ্যাঁ সোহাগ, তোমাকে একটা কথা বলব?

বলো না।

এত একা তুমি কী করে থাক?

একা? বলে ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবল সোহাগ, তারপর মাথা নেড়ে বলল, না, একা নই তো!

একা নও! এই তো একা বসে আছ।

তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি?

হ্যাঁ তো।

মাথা নেড়ে সোহাগ বলল, আমার তো একা বলে মনেই হয় না। আমার সঙ্গে কত কে থাকে।

শুনে পান্নার গায়ে একটু কাঁটা-কাঁটা দিল।

কে থাকে তোমার সঙ্গে?

সোহাগ হেসে ফেলে বলল, তোমাকে কতবার বলেছি, তুমি ভুলে যাও।

ভূতপ্রেত তো!

ওরকমভাবে ভাবলে হবে না। আমার মনে হয় আজ অবধি পৃথিবীতে যত মানুষ জন্মেছে এবং মরে গেছে তাদের সকলের ইমপ্রেশন আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে রয়ে গেছে। আমি তাদের ফিল করি। এমনকী আদম আর ইভকেও, তারা ঠিক ভূতপ্রেত নয়, তবে একটা এনটিটি।

তুমি তাদের সঙ্গে কথা বল?

ঠিক তা নয়, তবে আমি অনেক কথা যেন শুনতে পাই, বাতাসে একটা ফিসফিসানির মতো, সব কথার কোনও অর্থও নেই, বেশিরভাগ সময় কথাগুলো বোঝাও যায় না। কিন্তু অ্যাটমসফিয়ারটা খুব বাঙ্ময় বলে

মনে হয়।

বাবা গো, শুনে এই দিন দুপুরেও আমার ভয় করছে।

শুধু ওরা কেন পান্না, চারদিকে কত জীবজন্তু, পোকামাকড়, এমনকী ওই নদী বাতাস গাছপালা সকলকেই যে আমার ভারী জীয়ন্ত বলে মনে হয়। বন্ধুর মতো, সঙ্গীর মতো। তাই আমি কখনও একা বলে নিজেকে মনে করি না। তোমাকে বলিনি আমার খুব ইচ্ছে করে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একদিন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বাস করতে। গায়ে কেন পোশাক থাকবে না জানো? অসভ্যতা করার জন্য তো নয়, সম্পূর্ণ নগ্ন হলে চারপাশটাকে আরও বেশি করে অনুভব করা যাবে।

আমি বাবা মরে গেলেও পারব না।

পৃথিবীর কোনও জীবজন্তুরই তো পোশাক নেই।

আহা, মানুষ বুঝি জীবজন্তু?

বায়োলজিক্যালি তাই।

এখন তো বিটকেল বন্ধুদের ছেড়ে মেয়েবন্ধুদের সঙ্গে একটু মিশবে এসো, চলো, নদীর ওপাশটায় যাই।

ওরা বোধহয় আমাকে খুব একটা পছন্দ করে না পান্না।

মিশলেই করবে। না মিশলে নানারকম ভেবে নেয়। ওরা কেউ কিন্তু খারাপ মেয়ে নয়।

মিশলে ওরা আমাকে পছন্দ করবে বলছ?

খুব করবে, ভাব হলে অনেক ভুল ধারণা কেটে যায়।

আসলে আমি ওদের মতো অত হাসতে-টাসতে পারি না তো।

তোমাকে জোর করে হাসতে হবে কেন? চলো তো, আগে থেকেই ওদের নিয়ে অত চিন্তা করার কিছু নেই। গাঁয়ের মেয়ে তো সব, একটু বোকা হয়তো, আমিও তো তাই। আমার সঙ্গে ভাব হল কী করে তোমার?

সোহাগ একটু হাসল, তারপর উঠে পড়ল।

আমি কী ভেবেছিলাম জানো সোহাগ?

কী?

ভেবেছিলাম তুমি হয়তো বিজুদার সঙ্গে একটু কেটে পড়েছ।

বিজুবাবু! তার সঙ্গে কেন?

এমনি ভেবেছিলাম। বিজুদার তো তোমাকে খুব পছন্দ।

তাই বুঝি?

টের পাও না?

না তো!

বিজুদাকে তোমার কেমন লাগে সোহাগ?

বড় ভাল।

তার মানে?

গুডবয় বলতে যা বোঝায় তাই।

তার মানেটা কী দাঁড়াল? অপছন্দ?

তাই বললাম বুঝি?

আমি তো হাঁদা নই। মেয়েরা মোটেই গুডবয়দের বিশেষ পছন্দ করে না।

এ মাঃ। পান্না, চটি খুলেছ, কিন্তু মোজা খোলোনি!

পান্না জিভ কেটে দেখল সত্যিই সে মোজা সমেত জলে পা ডুবিয়েছে।

এখন কী হবে?

সোহাগ বলল, কী আর হবে! খুলে রোদে মেলে দাও। সিন্থেটিক মোজা, কয়েক মিনিটে শুকিয়ে যাবে।

জল হিলহিল করছে ঠান্ডা। পা থেকে শরীর বেয়ে উঠে আসছে ওপরে। গোড়ালি ছাড়িয়ে প্রায় হাঁটু অবধি জল, একেবারে মাঝখানটায় খপাৎ গভীরতা।

এ মাঃ! শাড়ি ভিজে গেল!

সোহাগ তার ঘাগরার মতো পোশাকের ঘেরাটোপটা অনেকটা ওপরে তুলে নিয়েছে। হেসে বলল, অত ভয় পাচ্ছ কেন, শীতের টান বাতাস আর এত রোদে শুকিয়ে যাবে। শাড়ি পরে এসে ভুল করেছ।

হ্যাঁ, কী যে হল, শাড়ি পরে ফেললাম।

এখন আর কী করবে!

দুজনে ফের বালি জমিতে উঠে চটি পরে নিল। চটির মধ্যে বালি কিরকির করছে।

হ্যাঁ সোহাগ, বললে না তো!

কী বলব?

গুডবয়কে নিয়ে ওই কথাটা।

গুডবয়দের নিয়ে আবার কথা কীসের? গুডবয়রা গুডবয় থেকে যায়।

তার মানে বিজুদাকে তোমার পছন্দ নয়।

আমার মুখে কথা বসাচ্ছ পান্না, বিজুবাবু বেশ লোক।

যাঃ, আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ওমা, কেন?

কত আশা করেছিলাম।

কীসের আশা?

বলতে এখন একটু লজ্জা করছে, আশাটা হয়তো একটু বেশিই করেছিলাম।

আগে আশার কথাটা বলো তো।

আসলে বিজুদা আমাদের কাছে হিরো হলেও তোমার কাছে তো কিছুই নয়। কেরিয়ার বলতে ওকালতি, সেটাও এমন কিছু গ্ল্যামারাস কেরিয়ার নয় আজকাল তার ওপর গাঁয়ে থাকে, শহুরে পালিশ নেই।

কিন্তু বিজুদাকে নিয়ে এত কথা হচ্ছে কেন? প্রবলেমটা কী?

আমি যে ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে বিজুদার প্রেম-ট্রেম কিছু একটা হবে।

সোহাগ হেসে ফেলল, তাই বলো। ছেলেতে মেয়েতে ওই একটা ছাড়া আর বুঝি কিছু হতে নেই?

তুমি যে কেন বিজুদাকে পাত্তা দিলে না, অবশ্য দেবেই বা কেন। তুমি কত বড়লোকের মেয়ে, কত স্মার্ট, কত আধুনিক।

তোমাব আজ কী হল বলো তো পান্না! আজ একদম উলটোপালটা কথা বলছ।

না সোহাগ, সত্যিই আমার খুব আশা ছিল। বিজুদার সঙ্গে তোমাকে ভীষণ মানায়।

সোহাগ মৃদু হেসে বলল, পুয়োর গার্ল!

পান্না একটু লজ্জা পেয়ে বলল, কথা উইড্র করছি।

আমি কিছু মনে করিনি পান্না। তোমার বিজুদা অনেস্ট অ্যান্ড গুডম্যান, সেটা কিন্তু তার ডিসক্রেডিট নয়। এ-যুগে ওরকম মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

এটা প্রশংসা হতে পারে, কমপ্লিমেন্টও হয়তো, কিন্তু বড্ড ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের মত শোনাচ্ছে যে!

সোহাগ একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কী করব বলো, আমি যে ঠিক গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। পুয়োর ভোকাবুলারি।

ধ্যুৎ তুমি ভীষণ বুদ্ধিমতী মেয়ে, তোমাকে আমি চিনি।

তা হলে ওকথাটা এখন থেমে থাক।

পান্না হেসে বলল, থাক।

দুপুরে রোদে ঘুরে লাল হয়ে ঘেমে-চুমে তারা যখন ফিরে এল তখন খাবার সার্ভ করা হচ্ছে। ঘাসের ওপর শালপাতার থালা আর বাটিতে সুস্বাদু সব পদ।

টুসকি অভিমানের গলায় বলল, পিকনিকে আজকাল কত গানবাজনা, নাচানাচি হয়, অন্তাক্ষরী হয়, কমপিটিশন হয়, আমাদের কিচ্ছু হল না। বিজুদার পিকনিক তো, বেশি আর কী হবে। যা নীরস লোক!

নিরু ঠোঁটকাটা আছে, বলল নীরস লোক তো তবে লাইন দিয়েছিলি কেন?

টুসকি লাল হয়ে সিঁটিয়ে গেল।

ব্যাপারটা আগাগোড়া লক্ষ করল সোহাগ। এগিয়ে গিয়ে বলল, আমরা একটু সেলিব্রেশন তো করতেই পারি। পিকনিক মানেই তো তাই।

নিরু বলল, কী করে হবে! মিউজিক সিস্টেমই তো আনা হয়নি।

তাতে কী! গান তো গাইতেও পারি আমরা। পারি না?

টুসকি করুণ মুখ করে বলল, ঝিনচাক মিউজিক ছাড়া কি জমবে?

চেষ্টা করতে দোষ কী?

কে কে গান জান বলে। খুব ভাল না জানলেও চলবে।

নবীনা বলল, বিজুদার পারমিশন নিয়ে নাও। নইলে পরে আবার বকবে।

চাপা গলায় সোহাগ বলল, বিজুদা তো আমাদের অভিভাবক নন, অত ভয় পাবার কী আছে? ইনোসেন্ট গান, সঙ্গে একটু নাচ তো হতেই পারে। এ তো ডিসকোথেক নয়।

ভয়ে ভয়ে তিন চারজন নাম দিল। একটা জায়গায় কাঠকুটো জড়ো করে আগুন দেওয়া হল চারদিকে গোল হয়ে বসল তারা।

সোহাগ বলল, এটা ক্যাম্প-ফায়ার। বিকেলের দিকে হলে ভাল হত কিন্তু দুপুরেও দোষ নেই। লেট আস সিং।

পান্না খুব অবাক হয়ে দেখল সোহাগ ভারী সুরেলা গলায় গান ধরেছে, উই শ্যাল ওভারকাম...

সুরটা সকলের চেনাজানা। সহজ গানটার মধ্যে একটা চোরা আবেগ আছে, সহজেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হাততালির সঙ্গে সঙ্গে এই গানে মুহূর্তেই জমে গেল আসর। যারা দূরে দূরে ছিল সব এসে জড়ো হয়ে গেল চারধারে। একটু বাদে গলা মিলিয়ে ফেলল সবাই। আর নাচবার জন্য কাউকে আহ্বান করতে হল না। প্রথমে শরীরের দোল তারপর নাচের ব্যাপারটা আপনা থেকেই ঘুরতে লাগল। সোহাগ এরপর "ডো রে মি..." ধরল। তারপর রবীন্দ্রসংগীত। সব চেনা গান। হিন্দিও হল, গানের উৎসমুখ খুলে যেতেই লজ্জা সংকোচ ঝেড়ে ফেলে সবাই একে একে নিজের জানা প্রিয় গান গেয়ে উঠতে লাগল। গলা মেলাল সবাই।

পান্না চোরচোখে একবার খুঁজে দেখল, বিজুদা কোথায় দাঁড়িয়ে। বেশি খুঁজতে হল না। দেখা গেল, গোল চক্করটার একটু বাইরে বিজুদা বসে আছে, মুখে স্মিত হাসি।

কেটাবারের লোকেরাও গানের আসরে চলে আসায় মধ্যাহ্নের ভোজ স্থগিত রইল। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক চলল গানের আসর।

খাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক অন্তাক্ষরা হল। রোদ মরে আসছিল ক্রমে। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল খুব।

ফেরার সময় পান্না চাপা গলায় বলল, ইস তুমি কী ভাল গাও!

দুর! ওটা শিক্ষিত গলার গান নয়। তবে এসব অকেশনে কাজে লাগে।

আমি গলা চিনি সোহাগ। তোমার গলায় ভীষণ সুর আছে।

আমি কিন্তু গান-টান শিখিনি। স্কুলে-টুলে যা শিখিয়েছে তাই।

তা হলে এখন শেখো। প্র্যাকটিস করলে দারুণ হবে।

কী হবে শিখে? গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড পাব, না কি গানকে কেরিয়ার করব বল তো! আমার ওরকম হতে ভাল লাগে না। গান গাইতে হলে মনের আনন্দে গাওয়াই ভাল। ব্যায়াম বা শরীরচর্চার মতো রেগুলার গলা সাধা ওসব আমার একটুও ভাল লাগে না।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না। কী যে তোমার ভাল লাগে!

সোহাগ হাসল, তোমার বন্ধুরা আর আমাকে অপছন্দ করছে না তো!

না না, তারা তো তোমার ফ্যান হয়ে গেছে।

আচ্ছা, আমরা সকলের সঙ্গে বাসে না ফিরে একটা মারুতি গাড়িতে ফিরছি কেন বলো তো পান্না। এটা খারাপ দেখাচ্ছে না?

কী জানি। শুনছি তো এ-গাড়িটা বিজুদা কিনবে। তার কোন মক্কেলের গাড়ি। ট্রায়াল দিচ্ছে। বোধহয় তোমাকে ইমপ্রেস করার জন্যই এই অ্যারেঞ্জমেন্ট। কিন্তু তুমি তো ইমপ্রেসড হচ্ছ না।

না। মানুষটার বদলে গাড়ি কি বেশি ইমপ্রেস করতে পারে? বরং ব্যাপারটা খারাপ দেখাল। কেউ হয়তো কিছু ভাববে।

তা ভাবুক না। মানুষের স্বভাবই হল নিজেদের ইচ্ছেমতো কিছু একটা ভেবে নেওয়া।

তোমার বিজুদা কিন্তু এ-গাড়িতে ওঠেনি।

উঠলে খুশি হতে?

দুঃখিতও হতাম না। হি ইজ এ গুড কম্পানি।

সেটা আরও খারাপ দেখাত। সবাইকে ছেড়ে উনি কি আলাদা গাড়িতে ফিরতে পারেন? আফটার অল বিজুদাই তো আজকের হোস্ট।

গাড়ি তাকে বাড়ির দোরগোড়া অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল।

সোহাগ ঘরে ফিরে আগে দাদুর ঘরে উঁকি দিল।

কফি খেয়েছ দাদু?

এই খেলাম। কেমন হল তোর পিকনিক?

যে রকম হয়।

যা ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর। সারাদিন ধকল গেছে।

না, সারাদিনের ধকল কিছু টের পাচ্ছে না সোহাগ। তার বেশ ভাল লাগছে। বেশ ভাল।

আজকাল মা বাবা একসঙ্গে ও-ঘরে থাকে। নতুন নিয়ম। বুডঢা এবার আসেনি, তার পরীক্ষা। এ-ঘরে সোহাগ একা।

ফিরে এসে সোহাগ চুপ করে চেয়ারে কিছুক্ষণ বসে রইল। আলো জ্বালল না। খুব চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে সে একটু ধ্যান করল। মেডিটেশন তার প্রিয় এক প্রক্রিয়া। ধ্যানে সে নিজের মনটাকে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখতে চায়। তার মনের মধ্যে আজ অনেক ধাঁধা। অনেক প্রশ্ন।

ছেষট্টি

আচ্ছা এই স্ট্রোক জিনিসটা ঠিক কেমন হয় বলতে পারেন? লোকের মুখে শুনি কিন্তু ঠিক আন্দাজে আসে না।

হঠাৎ স্ট্রোক নিয়ে ভাবতে লেগেছিস কেন?

না এই কদিন ধরেই ভাবছি। বয়সও তো হচ্ছে। এক সময়ে তো চৌকাঠ ডিঙোতেই হবে। তাই ভাবছিলাম একটু আন্দাজ যদি করা যায়। মরার সময় কীসে মরছি, শরীরে কেমনধারা হচ্ছে সেটা বেশ বুঝতে বুঝতে মরা যাবে।

তোর যেমন বুদ্ধি। মরার সময় কি অত শরীরবোধ, অত টনটনে জ্ঞান থাকবে রে? আর আগাম ভেবেই বা কী হবে? থাকবি তো চিৎপাত হয়ে শুয়ে। যা ইচ্ছে হোক না। আগে থেকে ভেবে মরবি কেন?

তা অবিশ্যি ঠিক। তবে কী জানেন দাদা, মরতে তেমন ভয়-টয় নেই আমার। ভাবি কী জানেন, বাঁচাটার মতো মরাটাও বেশ উপভোগ করারই জিনিস। মনে হয়, শরীরের মধ্যে ঠিক যেন ইস্টিশন গার্ডবাবু হুইসল দিল, ঝান্ডা নাড়ল, ড্রাইভারসাহেব ভেঁপু বাজাল, তারপর প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে কু ঝিকঝিক করে ট্রেন চলে গেল। ফাঁকা ইস্টিশন এই দেহখানা রইল পড়ে। পুরো ব্যাপারটাই বেশ একটা ঘটনা।

ঘটনা তো বটেই রে, তবে যে মরে সে কি আর অত বুঝতে পারে? গৌরদাকে তো দেখলি, দুদিন তো জ্ঞানই ছিল না।

সেও তো স্ট্রোক!

সেরিব্রাল। যাওয়া নিয়ে কথা, উপলক্ষ যা-ই হোক।

আগে কিন্তু মরাটা ভারী সোজাসরল ছিল। ডাক্তারবদ্যি ছিল না, এত রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি, এক্স-রে, স্ক্যানেরও বালাই ছিল না। যমে আর মানুষে টানাহ্যাঁচড়া হত কম। কলেরা হল কি সান্নিপাতিক, জ্বরবিকার বা সন্ন্যাস পটাপট মরে যেত লোকে। এমনকী আমাশয়ে ভুগেও কি কম মরেছে? আজকাল কিন্তু ডাক্তারবদ্যি এসে নতুন নতুন ওষুধ দিয়ে মরণটাকে খুব আটকেছে।

হ্যাঁ। আজকাল মরছে কম। তা আজ বেহানবেলাটায় কু-ডাক ডাকছিস কেন?

কী যে বলেন দাদা, কু-ডাক ডাকব কেন? এসব তো জ্ঞানেরই কথা কিনা। আগে থেকে ভেবে রাখা ভাল। দেহখানা যাবে সে তো জানাই আছে। কিন্তু কোন কায়দায় যাবে সেইটেই ভাবি। আপনার কি যোগেন রায়ের কথা মনে আছে? শিবশূলের যোগেন রায়!

তা মনে থাকবে না কেন? সাহেবের সঙ্গে মারপিট করে জেল খেটেছিল বলে তাকে নিয়ে বর্ধমানে সভা হয়।

হ্যাঁ সে-ই। সুভাষ বোস ডেকে পাঠিয়েছিল কলকাতার কংগ্রেস অফিসে। পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল। মনে আছে দাদা?

খুব। যোগেন তো মহেন্দ্র জমিদারের বাড়িতে নিয়ম করে ব্রিজ খেলতে আসত। খেলতও ভাল।

হ্যাঁ। তা সেই যোগেন রায় মরল আমার চোখের সামনে। তখন প্রায়ই গিয়ে বসে থাকতুম তো। আমাদের যৌবনের হিরো বলে কথা। একদিন বিকেলে গিয়ে বসেছি। যোগেন রায় বাগানে ইজিচেয়ার পেতে বসা। ক্ষিতীশ ঘোষ, নবেন্দু চৌধুরী, গণেশ হালদার সব বসে আছে। যোগেন রায় চা খেতে খেতে কী একটা হাসির কথা বলছিল। বলতে বলতে সামনের বেতের টেবিলটায় চায়ের কাপটা রেখে হঠাৎ একটু পিছনে হেলে গেল। মাথাটা চেয়ারের কানায় রেখে ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। চেয়ে রইল তো চেয়েই রইল। চোখের পাতা আর পড়ে না। ঝাড়া আধঘন্টা সামনে বসে থেকেও আমরা বুঝতে পারিনি যে মারা গেছে। মুখে তখনও হাসিটা লেগে আছে।

মহিম রায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ভাগ্যবান লোক, বুঝলি? অমন মরা মরতে পারলে আর চাই কী?

তা যা বলেছেন। তবে কিনা সাহেব পেটানোয় কত দূর পুণ্যি হয় তা আমি জানি না, কিন্তু সেটা বাদ দিলে যোগেন রায়ের আর পুণ্যিটা কোথায় বলুন তো! চেহারাখানা ছিল বটে দেখনসই, লোকে বলত শিবশূলের নেতাজি। কিন্তু কোনও দেখনসই মেয়ে চোখে পড়লে পার পেত না। বউ হোক ঝি হোক যোগেন রায়ের এঁটো হয়নি এমন মেয়ে পাবেন না। তার ওপর বন্ধকী কারবার ছিল। লোকে বলে বন্ধকী কারবার করলে নরকের পথে আর খানাখন্দও থাকে না। তা এত সব করেও অমন ইচ্ছামৃত্যুর মতো ব্যাপার হয় কী করে? প্রাণটা যেন গুড়ুলের মতো বেরিয়ে গেল। তাই বলছিলুম, ওসব কর্মফল-টল সব বাজে কথা, পাপপুণ্যির ব্যাপার-ট্যাপারগুলোতেও গোলমাল আছে, আর ভগবান বলেও কিছু তো ঠাহর হচ্ছে না। কী বলেন?

মহিম একটু হেসে বলল, তা ওরক হিসেব করলে তাই দাঁড়ায় বটে। কিন্তু তুই কি শেষে বুড়ো বয়সে নাস্তিক হলি?

আস্তিকই বা কবে ছিলুম বলুন! সাধনভজন তো আর করিনি কিছু। ওই বাড়িতে ষষ্ঠী বা বারের পুজো হলে বউ নড়া ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে গড় করায়। তা সেও বলে, তুমি হলে পাষণ্ড, মুষল। পচেগলে মরবে। ঠাকুর-দেবতায় যার অত অচ্ছেদ্দা তার রাক্ষসের ঔরসে জন্ম।

এসব বলে?

খুব বলে। জিবে তার ভীষণ ধার। তবে মিছে কথাও তো বলছে না। বিচার করে দেখেছি, ঠাকুর-দেবতা মানামানির ইচ্ছেটাই হয়নি কখনও আমার। ভাবি যা সব অকাজ-কুকাজ করেছি তার জন্য নাকিকান্না কেঁদে লাভ নেই। ভগবান বলে যদি কেউ থেকেও থাকেন তিনি নাকিকান্নায় ভোলার লোক নন।

অনেক এগিয়ে বুঝেছিস রে ধীরেন।

না দাদা, বুঝেছি বলা যায় না। বুঝতে হলে পেটে বিদ্যে চাই। তা সে বস্তু তো আর নেই। আমার বুঝ হল চাষাভুষোর মতো।

দুর বোকা! চাষাভুষোরা নাস্তিক হয়, দেখেছিস? ভয়ভীতি নিয়ে যাদের বেঁচে থাকতে হয় তাদের মধ্যে নাস্তিক খুঁজে পাওয়া ভার। যে যেমন জীবন যাপন করে তার ভগবানের বোধ তেমনতর। এই তো শুনলাম, সেদিন কে যেন বলছিল, কোরিয়া না কোথায় যেন লোকে ভগবানের ভাবটাই লোপাট করে দিয়েছে। মঠ মসজিদ গির্জার বালাই নেই, থাকলেও সেখানে কেউ তেমন যায় না। তারা খাটেপেটে, দেশ গড়ে, ভাল-মন্দ

নিয়ে বেঁচে থাকে, খামোখা ভগবান আমদানি করে জীবনে জটিলতা বাড়ায় না, ও তাদের দরকারও হয় না। ভগবান ছাড়াই যখন চলে যাচ্ছে তখন খামোখা ডাকবে কেন বল!

আমারও তো সেই কথা। ডেকে হবেটা কী? আমার উদ্ধার নেই তা আমি জানি। মিদ্দারের পো এখনও আড়ে আড়ে ঘুরে বেড়ায়, ঘাড় মটকায় না বটে, কিন্তু ভুলতেও দেয় না।

ভগবান মানিস না, ভাল কথা। তবে ভূতই বা মানবি কেন রে?

ভূতের কথা বললুম নাকি? না দাদা, সে ভূত নয়।

তবে কী? এই যে বললি মিদ্দারের পো আড়ে আড়ে ঘুরে বেড়ায়।

তা ঘোরে। তবে সে ভূত নয়। মানুষ মরলেও তার ব্যথা বেদনা জ্বালা কি আর সহজে মরে! সেগুলোই যেন ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়ায়।

তোর মাথা। কবে কী একটা ঘটনা ঘটেছিল তাই নিয়ে ঘষটে মরছিস। মানুষ কত কী ভুলে থাকে।

নিষ্কর্মারা ভুলতে পারে না। কাজকর্ম নিয়ে মেতে থাকলে হয়তো হত। ভেবে দেখতে গেলে মিদ্দারের পো কিন্তু খারাপ মরেনি। হেঁপো রুগি, শরীরে তো কিছু ছিল না। শুধু রোখের বশে বউটাকে তারের ফাঁস দিয়ে মেরেছিল। ওই রোখের জোরেই আমাকেও পেড়ে ফেলেছিল প্রায়। আমি তখন সা-জোয়ান। শেষরক্ষা হয়নি অবশ্য। জলে চেপে ধরেছিলাম, মিনিটখানেক ভুড়ভুড়ি কেটে মরে গেল। এই দেখুন, এখনও রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায় ভাবলে।

তোর শ্রীমন্তকে মনে আছে?

তা থাকবে না? দিনেদুপুরে পাঁচকড়িকে রামদা দিয়ে কাটল বটতলায়, এক হাট লোকের সামনে। সে কী হুড়োহুড়ি করে লোকে পালিয়েছিল বাপ।

তুই তো একটা দেখিছিস। শ্রীমন্ত কত খুন করেছিল তার হিসেব নিজেও রাখত না। বুড়ো হয়ে যখন বয়সের কাছে জব্দ হল তখন মাঝে মাঝে খাল পেরিয়ে ওর ঘরে গিয়ে বসতাম। খুব খাতির করত। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতাম, খুন করতে কেমন লাগে? কী বলত জানিস?

কী বলত?

বলত, কেমন যেন একটা ঝাঁকুনি লাগে। কেমনতরো ঝাঁকুনি, কীসের ঝাঁকুনি তা অত ব্যাখ্যা করে বলতে পারত না। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, খুনের পর অনুতাপ হয় কিনা। কেমন ভ্যাবলার মতো চেয়ে থাকত। অনেক ভেবেচিন্তে বলত, না, তবে পরে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মায়াদয়া তো ছিল না। বুকখানা পাথর হয়ে গিয়েছিল। ওই যে ফাঁকা ফাঁকা লাগত ওইটেই ওর অনুতাপ বলে ধরে নিতে হবে। তা অত খুন করেও তো বুড়ো বয়স অবধি বেশ বেঁচেবর্তেই ছিল। ডাকাতির পয়সা দিয়ে পাকা বাড়ি, ধানী জমি সবই করেছিল। কিছু তো আটকায়নি। তুই তবে দগ্ধে মরছিস কেন? ওটা মোটে খুনই নয়। প্রাণ বাঁচাতে যা করিছিস তাতে আইনেও তো আটকায় না।

আইনে তো অনেক কথাই আছে দাদা। তা দিয়ে কি আর মনের আগুন নেভে? আজকাল কেবল ভাবি, বরং নিজে মরলেই ভাল হত। এই এতদিন বেঁচে থেকে দুনিয়ার কী উপকারটা করলুম বলুন। আর বেঁচে থাকাটাও কি মানুষের মতো হচ্ছে? গোরুছাগলের অধিক নিজেকে ভাবতেই পারি না। বড্ড গ্লানি হয়।

তা আর কী করবি! লাখো লাখো লোক তো ওরকমভাবেই বেঁচে আছে। কটা লোক আর মানুষের মতো বেঁচে আছে বল।

ওই জন্যই তো ভগবানে বিশ্বাস হতে চায় না। ভগবান বলে কিছু থাকলে কি এরকম ধারা হতে পারত, বলুন?

আজ তোকে ফিলজফিতে পেয়েছে দেখছি। কফি খাবি?

এক গাল হাসল ধীরেন কাষ্ঠ। খুশিয়াল গলায় বলল, এই একটা জব্বর কথা বলেছেন। জিনিসখানাও একেবারে মনের মতো। আগেও দু-চারবার খেয়েছি বটে, কেমন পোড়া-পোড়া গন্ধ লাগত। আপনার এখানে খেয়েই প্রথম বুঝলাম, এর সঙ্গে কেউ লাগে না।

আমারও বুড়ো বয়সের নেশা। এই শীতে শরীরটা বেশ গরম হয়।

মহিম কফি করে নিয়ে এল।

বিস্কুট খাবি সঙ্গে? দাঁড়া, দিই।

তা বিস্কুটও হল। দিব্যি মুড়মুড়ে ফুরফুরে দুখানা বিস্কুট!

এই বিস্কুটও নাতনি কলকাতা থেকে এনে দিয়েছে। ওতে নাকি চিজ আছে। তা সে বস্তু বিশেষ চেখে দেখা হয়নি। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছি।

চিজের কথা খুব জানি। শুনেছি, দুধ পচিয়ে নাকি হয়। আজকাল বাঙালিরাও খুব খাচ্ছে। বাসস্ট্যান্ডের মহেশ বলছিল দোকানে নাকি পিজ্জা বানাবে। তাতে মেলা চিজ দিতে হয়।

গাঁ তো শহর হয়ে উঠল রে।

তা তো হওয়ারই কথা।

পিজ্জা খাবি নাকি? সোহাগ বলে গেছে আসছে শনিবার সব নিয়ে এসে এখানে বানিয়ে আমাকে খাওয়াবে। রোববার চলে আসিস এক ফাঁকে। তোর জন্য খানিকটা রেখে দেবোখন। নতুন খাবার, সহ্য হবে কিনা জানি না। চেখে দেখিস একটু।

আমার তো সবই ভাল লাগে। আমার বউ বলে, তোমার জিব হল লম্পট।

তা তোর একটু নোলা আছে বটে। এই সেদিন দেখলাম, হরিপদর মেয়ের বিয়েতে চারখানা রাধাবল্লভি বসান দিলি, তারপর এক কাঁড়ি পোলোয়া, খাঁসির মাংস, সাত টুকরো মাছ, দই-মিষ্টি, ওরে বাবা, এই বয়সে অত খেতে আছে গবগব করে? এখন একটু বেছে গুছে বুঝে খাবি তো!

তাই বলে বটে সবাই। কিন্তু আমার তো সবই তল হয়ে যায়। খেয়েই যদি মরি তাহলেই বা কী বলুন। স্ট্রোক হয়ে মরলেও যা পেট ফেটে মরলেও তাই। চৌকাঠ ডিঙোনো নিয়ে কথা, তা খেয়েই মরা ভাল।

মরার জন্য বড্ড ব্যস্ত দেখছি যে আজকাল। বলি তোর হলটা কী? এতকাল তো এসব বলতিস না।

আজকাল মবা নিয়ে একটু ভাবছি। মরতে যে ইচ্ছে যায় তা নয়। কত কী দেখার রয়ে গেল, বোঝার রয়ে গেল, আয়ুর অর্থটাই ঠাহর হল না, মনে একটা খিচ তো আছেই। তবে লজ্জার মাথা খেয়ে আর কতকালই বা বাঁচব বলুন। এই তো সেদিন ছোট নাতিটাও বলছিল, ও দাদু, বিশুর দাদু মরে গেল তো, তুমি মবছ না কেন?

বলল?

তা বলবে নাই বা কেন। ঠাকুমার কাছে শুনে শুনেই শিখেছে।

নাতি বলল বলেই সবার কথা ভাবছিস?

না দাদা, তা নয়। এই ভাবছি আর কী। কত কী ভাবি।

তোর চেয়ে আমিই তো বোধহয় বছর তিনেকের বড়।

তা হবে।

কফি শেষ করে উঠে পড়ল ধীরেন কাষ্ঠ। ফেরার সময় টের পেল, রাত হয়েছে। আন্দাজ নটা সোয়া নটা হবে। একে গাঁ, তায় শীতকাল। সন্ধ্যারাতেই ভারী নিঃঝুম হয়ে যায় চারদিক। রাস্তায় ভুতুড়ে কুয়াশা আর নির্জনতা। তবু বাসস্ট্যান্ডের দিকটায় এখনও লোকজন দেখা যায়, দোকানপাটও খোলা থাকে। কিন্তু গাঁয়ের ভিতরটা বড্ড সুনসান।

একটা ভাল চোখ আর একটা আবছা চোখে বুঁঝকো অন্ধকারে কুয়াশামাখা এক অলৌকিককে প্রত্যক্ষ করে ধীরেন। দিনের বেলাটা যেমন দগদগে বাস্তবতা এখন সেটাই যেন সাঁঝের পর সেজেগুজে মোহিনীবেশে চোখ ভোলাতে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। কুয়াশায় একটা বাড়ির ছাদটুকু শুধু ভেসে আছে, বাকিটা লোপাট, মনে হচ্ছে যেন, ভেসে থাকা বাড়ি। কালিপড়া লণ্ঠনের মতো ভাঙা একটু চাঁদ আছে আকাশে, তাকে ঠিক ঠাহর হচ্ছে না বটে, কিন্তু এই আলোটুকুই কুহক ছড়িয়ে রেখেছে চারধারে।

ধীরেন হ-হ-হ করে আপনমনে একটু হাসল। বিড়বিড় করে বলল, খুব ম্যাজিক দেখাচ্ছ বাবা! অশৈলী কাণ্ড সব।

কথাটা ঠিক যে, আজকাল সে মরা নিয়ে ভাবছে। মরার পর আত্মা বেরিয়ে আর এক দফা বেঁচে থাকে বলে কারও কারও বিশ্বাস। যদি মরার পর ফের বেঁচে থাকাই বরাতে থাকে তাহলে সেটাই বা কেমন হবে! দেহ মরলে একরকম শান্তি। কিন্তু ফের যদি আত্মা হয়ে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে তো আবার ভজঘট্ট পাকাল। তখন আবার কেমন সব বিলিব্যবস্থা হবে, তাও ভাববার কথা। ধীরেনের সেটা খুব পছন্দ হচ্ছে না। সর্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে লেগে থাকলে তো মুশকিল।

ভাবতে ভাবতে বটতলায় এসে পড়ল ধরেন। এ ভারী অপয়া জায়গা। খুব নির্জন। বটগাছটা বোধহয় দেড়শো বছরের পুরনো। চারদিকে ঝুরি নেমেছে মেলা। তলাটা বাঁধানো, শিবের থানও আছে। কিন্তু বড্ড ছমছমে জায়গা। অনেকেই এখানে ভয়-টয় পায়।

চারপাশটা তাকিয়ে দেখল ধীরেন। জায়গাটা যেন একেবারে জমাট বেঁধে নিথর হয়ে আছে। গাছের পাতাটাও নড়ছে না। আর কী ঝিঁঝির ডাক বাবা।

“ধীরেন!” বলে কেউ ডাকল নাকি? গা শিউরে উঠল হঠাৎ। হ্যাঁ, মিদ্দার ডাকে বটে। কাছাকাছি চলেও আসে। না, ভূত-টুত নয়। ধীরেন কাষ্ঠ জানে, এ হল তার নিজেরই ভিতরকার অনুতাপ। সে-ই মিদ্দার হয়ে কথা কয়। তবু গা ছম-ছম করে খুব।

ও ধীরেন, মনে পড়ে?

পড়বে না! খুব মনে পড়ে।

বিশ্বাসঘাতক, নিমকহারাম, কত বড় সর্বনাশ করেছিলি আমার! তবু দিব্যি বেঁচেবর্তে আছিস!

আমার দোষটা কোথায় বল। তোমার বউ যদি ওরকমধারা করে আমার কী দোষ? আমার তখন কাঁচা বয়স, বুদ্ধি পাকেনি, সেও এসে হামলে পড়ল। আমার কী করা উচিত ছিল বলো!

সাধু সাজছিস হারামজাদা!

তোমাকেও বলি দাদা, ওই জরাজীর্ণ শরীর, হেঁপো রুগি হয়ে অমন ডবকা মেয়েছেলেকে বিয়ে করা তোমার ঠিক হয়নি। মেয়েমানুষ তো আর ঝাপির সাপ নয় যে বন্ধ করে রাখবে।

আমি তোর গুরুর সমান। আমার বউ তোর মায়ের মতো। ঠিক কিনা!

ওসব সেকেলে সম্পর্কের কথা ছাড়ো। ওসব কি আর কেউ মানে! আর গুরু বললেই তো হবে না! হাতের কাজ শিখতে তোমার কাছে ঘুরঘুর করতুম। চাকরের অধিক খাটিয়ে মারতে, মনে আছে?

তোর যদি লজ্জা থাকত তাহলে গলায় দড়ি দিতি।

মরতে বলছ! তা বেঁচেই বা আছি কোথায়? গলায় ফাঁস দিলে তো অনেক জ্বালা জুড়িয়ে যেত গো! বেঁচে থাকার মানে কী বলল তো! শুধু দেহখানার বেঁচে থাকাটাই কি সব? বেঁচে থাকার মানে হল উপভোগ। দিনরাত কেঁদে ককিয়ে, উঞ্ছবৃত্তি করে, লাঠিঝাঁটা খেয়ে এই যে থাকা, এ বেঁচে থাকা হয় কী করে? মরেই আছি বলে ধরে নাও না কেন?

বিড়বিড় করতে করতে জায়গাটা পেরিয়ে এল ধীরেন। সামনে পান্নাদের বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। আর একটু এগোলে গৌরদাদার বাড়ি। চেনা ছক, চেনা রাস্তা। তবু ভারী অচিন লাগে ধীরেনের। একটা স্পষ্ট চোখ, আর একটা আবছা চোখে কত বিভ্রম তৈরি হয়। পাপে জর্জরিত মন কত ভূতপ্রেত সৃষ্টি করে যায়। অনাবিল সত্য বলে তো কিছু নেই।

তিন দিন বাদে এক দুপুরে কাঙালি ভোজন করাচ্ছিল রসিক বাঙাল। বাসন্তীর পঞ্চামৃত আছে আজ। উপলক্ষ্য সেটাই। মহাবীর তেওয়ারিকে বর্ধমান থেকে ভাড়া করে এনেছে রসিক। খিচুড়ি, লাবড়ার তরকারি, বোঁদে আর পায়েস। ভোজের খবর পেয়ে লোক জুটেছে মেলাই। হিসেব করলে শ’ দুই তো হবেই। উঠোনের রোদে সারি সারি শালপাতার থালা নিয়ে বসে গেছে। চিল্লামিল্লি হচ্ছে খুব। এখনও পাতে খিচুড়ি পড়েনি, পড়বে পড়বে ভাব।

বারান্দায় দুখানা চেয়ারে বাঙালের পাশাপাশি ধীরেন।

রসিক বলল, ঠাইরেন আইজকাইল এই বাড়িতেই বহাল হইছে, বুঝলেননি খুড়া?

ধীরেন জানে, এ গাঁয়ে কোনও গাছের পাতা খসলেও তা রটে যেতে দেরি হয় না। নিষ্কর্মার তো অভাব নেই।

একটু হেসে ধীরেন বলল, ভালই তো। বাসন্তীর দেখাশোনা হবে।

কচু হইব। ঠাইরেনরে তো বিলাই পার করছে। আইয়া অখন খাদিমা হইয়া তো বইছে আর গজরাইতাছে।

গজরাচ্ছে কেন?

গজরাইব না! এই যে খরচাপাতি হইতাছে, অপোগণ্ডোরা আমার পয়সায় খাইয়া যাইতাছে, ঠাইরেনের তাতে গায়ে বড় জ্বালা। বোঝালেন? ঠাইবেন চায় সব পোটলা কইরা রাখতে। এই যে গরিবগুলা প্যাট ভইরা খাইব, কালা কালা শুকনা মুখগুলায় একটু ঝিলিক দেখা যাইব ঠাইরেনের বড় অপছন্দ।

খিচুড়ির গন্ধটা ছেড়েছে খুবই ভাল। বাতাস শুঁকেই ধীরেন বলে দিতে পারে খিচুড়িতে ভালরকম গাওয়া ঘি, ফুলকপি, মায় গরমমশলা অবধি পড়েছে। কাঙালিভোজনের খিচুড়িতে এত তরিবত থাকার কথা নয়। তবে

বাঙালের ব্যাপারই আলাদা। সে যা করে মোক্ষম করে। গরিব বলে যারা খেতে এসেছে তারা যে সবাই একেবারে কাঙাল-ফকির তা নয়। বাদামগাছের নীচে একটু ছায়ায় ময়লা হলদে রঙের শাড়িতে ঘোমটা টেনে যে বউটা বসে আছে সে কার্তিকের বউ। বছরটাক আগেও তাদের অবস্থা খারাপ ছিল না। কার্তিক শয্যাশায়ী হল ওই স্ট্রোকে না কী যেন বলে তাইতে। অবস্থা একেবারে তরতর করে পড়তে লাগল। এখন হাঁড়ির হাল। দুটো বাচ্চা নিয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে ওই এসে বসেছে গাছতলায়। ঘোমটায় কি আর সব ঢাকা যায়? শীতল ভট্টাচার্য যেমন, তারও কি কাঙালিভোজনে আসবার কথা! বছর ত্রিশেক আগে এই শীতল ভট্চাযই তো নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে ছাঁদা নিয়ে কত তড়পেছে। এখন ছেলের বউরা নোড়া দিয়ে বিষদাঁত ভেঙেছে ভালরকম। বামনাই এখন খিদের আগুনে ঝলসে গেছে। ওই সেও এসে একটু ফাঁক রেখে বসে গেছে পঙ্‌ক্তিভোজনে। দেখলে কষ্টও হয়, ঘেন্নাও হয়।

ধীরেন বলল, বাঙাল, ওই বাদামতলার বউটা আর শীতল ভট্চায ওদের একটু ভাল করে দিতে বলে দিও। অবস্থা বিপাকে এই দশা বইতো নয়।

নিশ্চিন্ত থাকেন খুড়া, আমার বাড়িতে কারও আধাপেটা হইবো না। ঠাইস্যা খাইব সকলে।

যা আয়োজন আমারই বসে যেতে ইচ্ছে করছে।

রসিক বাঙাল দুঃখ করে বলল, আরও কিছু করার ইচ্ছা আছিল, বুঝলেন! ভাবছিলাম খাসির মাংস খাওয়ামু। কিন্তু ঠাইরেনের যা চক্ষুটাটানি তাতে আর আউগাইলাম না। বাসন্তী কইল, বেশি আয়োজন কইরো না, মায়ের অভিসম্পাত লাগব। এমনিতেই নাকি জ্বইলা পুইড়া মরতাছে।

ও মানুষ এরকম ছিল না হে বাঙাল। বড় রসের মানুষ ছিল। একসময়ে ও-বাড়িতে কত গুলতানি করেছি। বাসন্তীর বাবা ছিল বৈঠকী মানুষ, দরাজ দিল। বউঠানও ছিল ভারী মিঠে স্বভাবের। পয়সার অভাবই মানুষকে বড্ড শুষে নেয়, বুঝেছ?

মানতে পারলাম না খুড়া। লোকে কয় বটে অভাবে স্বভাব নষ্ট, কিন্তু আমি কই নষ্টের বীজ ভিতরে না থাকলে অভাব তারে টলাইতে পারে না।

খিচুড়ির কড়াই চলে এল। একটা জয়ধ্বনির মতো কোলাহল উঠল চারধারে। খিদের মুখে খাবারের চেয়ে মোক্ষম জিনিস আর কীই বা হতে পারে? পাতে ঘপাত ঘপাত খিচুড়ি পড়ছে, খিচুড়ির পাশেই বড় হাতায় এক খাবলা লাবড়া। দেওয়ার হাতটা লক্ষ করল ধীরেন। নাঃ, বড় মাপেই দিচ্ছে। বাচ্চাগুলো কি খেতে পারবে অত? নষ্ট হবে পাতে।

মোহময় গন্ধ ছড়াচ্ছে চারদিকে। মহাবীরের রান্না এ-তল্লাটে বিখ্যাত। পাঁচ-সাতশো টাকার নীচে কাজ করে না। লাবড়ার গন্ধটাও এবার পাচ্ছে ধীরেন। মনে হচ্ছে ডালের বড়ি আর ধনেপাতাও দেওয়া হয়েছে!

লাবড়ায় বড়ি পড়েছে নাকি হে বাঙাল?

তবে? বড়ি না দিলে জমবো কেমনে?

সাতষট্টি

হুট বলতেই রাজ্যের ইষ্টিগুষ্টি খাওয়ানোর ধুম পড়ে যায়, কী কাণ্ড বাবা! শুনেছিস কখনও পঞ্চামৃত না কোন গুষ্টির পিণ্ডি বলেও আবার কাণ্ড আছে! যত বাঙাল দেশের নিয়মকানুন বাবা, সাতজন্মে শুনিনি। তা সে না হয় হল। কিন্তু এই রাজ্যের বউ ঝি, ভিখিরি কাঙালিদের গাণ্ডেপিণ্ডে গেলানোর মতো কী মচ্ছব পড়ল বল তো!

হিমি পালানোর ফাঁক পাচ্ছে না। বাইরে কত কী হয়ে যাচ্ছে। উলু শোনা যাচ্ছে, শাঁখ বাজছে, আরও সব কী কী হয়ে যাচ্ছে, কে জানে। সে অত শত না জেনে একটা পিঁড়ি খুঁজতে এ-ঘরে ঢুকে পড়েছিল। কদিন হল ছেলে আর বউদের তাড়া খেয়ে বুড়িটা এ-বাড়িতে এসে জুটেছে। উত্তরের দালানে মরণের পড়ার ঘরের পাশে এই একটেরে ঘরখানায় রাজ্যের জিনিসপত্র ঠাসা থাকে। হেন জিনিষ নেই পাবে না। কোদাল, কুড়ুল, দা, দড়িদড়া, ডাঁই করা মাদুরি, পিঁড়ি, তক্তা থেকে যা চাও। ছুঁচো, ইঁদুর, আরশোলা আর মাকড়সার আঁতুড়ঘর। এ-ঘরেই মরণদের দুটো বেড়াল বছর বছর বাচ্চা বিয়োয়। এই গুদোমের মধ্যেই কবেকার একটা তক্তপোশ পড়ে ছিল। সেটাই এখন বুড়ির ঠেক। পিঁড়ি খুঁজতে এসে ঘরে ঢুকতেই বুড়ি খপ করে ধরে বসিয়েছে। আর ছাড়া পাচ্ছে না হিমি। সে বলল, তা কেন দিদিমা, পঞ্চামৃত এদেশেও হয়। এই তো সুবলদের বাড়িতেও হল সেদিন, ওর কাকীমার পঞ্চামৃত। এত ঘটা হয়নি অবশ্য।

ওরে সেই কথাই তো বলছি। কত টাকা গচ্চা গেল জানিস? বলি নতুন তো মা হচ্ছে না। আরও তিনবার তো বিইয়েছে! নতুন পোয়াতি হলেও না হয় কথা ছিল।

এখন ছাড়ো তো দিদিমা, মনা জেঠিমা কাজে পাঠিয়েছে।

আহা, বোস না একটু। কাজের বাড়ি সে না হয় বুঝলুম, কিন্তু সকাল থেকে একটা কাজেও ডেকেছে কেউ আমায়? আমার পেটের শত্রুরটা অবধি নয়। এত আম্পদ্দা কি ভাল বল? এই জন্যই মেয়ে-জামাইয়ের কাছে থাকতে নেই।

তাহলে কি ও-বাড়ি যাবে?

কী বলব ভাই, এ-বাড়িতে আজ মচ্ছব, তা ভাই দুটোকেও তো একটু ডাকতে পারত! বড্ড গুমোর হয়েছে মেয়েটার। জামাইয়ের কথা বলছি না, সে হল মগ দেশের লোক। ওরা অদ্রতা-ভদ্রতা জানে না, শেখেওনি। বনজঙ্গলের লোক তো, জাতজন্মেরও ঠিক নেই। কিন্তু মেয়েটা তো মানুষের মতো হবে। জামাইয়ের পাল্লায় পড়ে সেও এমন গোল্লায় যাবে কে জানত বল!

কেন দিদিমা, বাঙাল মেসসা তো খুব ভাল। সবাই বলে অমন দরাজ বুকের তোক হয় না। কত লোককে খাওয়ায়, আপদেবিপদে দেখে।

ওটা তো ভড়ং। লোককে ভুলিয়ে ভালিয়ে মন্তর করে ফেলে, তারপর রক্ত শুষে খায়। তা এত লোকের জন্য করে, নিজের শালা দুটোর জন্য করেছে কিছু আজ অবধি? দুটো জোয়ান ছেলে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে, ঘরে হাঁড়ির হাল, আর এ-বাড়িতে নিত্যি ভূতভুজ্যি হচ্ছে। এত অবিচার কি ভগবান সইবে রে?

ও দিদিমা, বলাই মামাকে তো কালও দেখলুম কাঁটাপুকুরের ধারে মাতাল হয়ে পড়ে আছে সকালবেলা।

তা কী করবে বল! মনের দুঃখেই খায়। ছেলে তো খারাপ ছিল না। অভাবে স্বভাব নষ্ট।

তোমাকে নাকি তাড়িয়ে দিয়েছে?

বউ দুটো তো দুটো ডাইনি। ছেলেদের দুষলে তো হবে না। তারা সাতেপাঁচে থাকে না। খোঁড়ে তো ওই দুটো পাজি মাগী। কোন আঘাটা থেকে ধরে এনেছে কে জানে বাবা। মুখ নয় তো আস্তাকুঁড়।

এখন আমি যাই দিদিমা? দেরি হলে জেঠিমা বকবে। পিঁড়ি দিয়ে যেন কী কাজ আছে।

আর একটু বসে যা। কী হালে রেখেছে আমাকে দেখছিস তো। এই ঘরে মানুষ থাকতে পারে বল দেখি! আমাকে ওদের ঘরদোরে অবধি ঢুকতে দেয় না। কেন রে বাপু, আমি কি সোনা-দানা চুরি করব? বাড়ির ঝি মুক্তা অবধি কী মুখনাড়া দেয় না শুনলে বিশ্বাস করবি না। পাঁচজনকে যদি ডেকে বলি তাহলে ওদের মুখে থুথু দেবে না লোকে?

হিমি করুণ গলায় বলল, এসব কথা আমায় বলছ কেন দিদিমা? আমি কি এত সব জানি? তুমি বাড়ি ফিরে যাও না কেন?

তাই যাবো বাছা। ভাঙা ঘরদোর হোক, সংসারে অশান্তি থাক, তবু সে আমার জোরের জায়গা। এখানে অপমানের ভাত কে খায় বল!

তাই যাও না কেন? এবার আমার হাতটা ছাড়ো, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আ মোলো, অত ছটফট করছিস কেন? বলি, যা বুঝলি তা পাঁচজনকে গিয়ে বলিস। সবাই এসে আমার হেনেস্তাটা দেখে যাক। বেড়ালের মুতের গন্ধে নাক জ্বলে যায়। তার ওপর পোকামাকড়। কী জ্বালায় যে জ্বলছি।

বলবখন সবাইকে। বলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল হিমি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বুড়িটাকে তার মোটে ভাল লোক বলে মনে হয় না। মরণের সুন্দর দাদাটা যখন ছিল তখন হিমিকে ওই বুড়িই তুতিয়ে-পাতিয়ে ওর ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল একদিন দুপুরবেলা। বলেছিল, যা না, ওরা শহুরে ছেলে, ওদের কাছে বললেও কত শিক্ষে হয়।

তা হিমিরও একটু দুর্বলতা ছিল। সুমন একে দেখতে সুন্দর, তার ওপর কী ভাল যে গান গায়। বুড়িটা রোজই তাকে উসকে দিত। গুরুজন মানুষ, খারাপ কথা তো আর বলবে না, এই বিশ্বাসে গিয়েছিল হিমি। বাড়িতে কেউ ছিল না সেদিন। সুমন খারাপ ছেলে হলে সেদিন তার সর্বনাশ হয়ে যেতে পারত। হয়নি। সুমন তাকে মোটেই পছন্দ করেনি তা ওর চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল হিমি।

কিন্তু পরে বুড়ি তাকে অনেক জেরা করেছিল। ভারী অসভ্য সব ইঙ্গিত, হ্যাঁ রে, ও ঘরে যে গেলি, গায়ে হাত-টাত দেয়নি তো।

না তো দিদিমা! ওসব আবার কী কথা!

আহা, ওই বলছিলাম আর কী। কাঁচা বয়সের ছেলে তো!

তুমিই তো পাঠালে!

আহা, আমি তো ভাল ভেবেই তোকে যেতে বললাম। তা বলে কি আর নজর রাখিনি! বলি, কী বলল-টলল? রসের কথা-টথা কিছু বলেনি?

তুমি যেন কী দিদিমা! সুমনদা তো এমনি গল্প-টল্প করল।

আহা, ওর মধ্যেই কথা চাপা কথা থাকে। তা বিছানায় বসলি নাকি?

না, চেয়ারে।

মাথা-টাথা টিপে দিতে বলেনি?

খুব রাগ হয়েছিল হিমির। বলেছিল, বললেই টিপব নাকি?

আহা, তাতে তো আর দোষের কিছু নেই। আবার যাস না হয় ফাঁক বুঝে।

কেন যেতে বলছ?

ওরে, তোর হিল্লের জন্যই বলছি।

পরদিন তাকে ডেকে বাসন্তীমাসি সব জিজ্ঞেস করেছিল। বলেছিল, খবর্দার মায়ের সঙ্গে কথা কইবি না। দেখলে অন্য দিকে চলে যাবি। মা যে কী সর্বনাশা মানুষ তা আমি জানি।

মেয়েরা কি সর্বনাশ চায় না? সর্বনাশকে ভয় পায়? মেয়েমানুষের যে সর্বনাশটা নিয়ে সমাজে এত চিন্তা-ভাবনা, এত সাবধানী হওয়া, এত শাসন আর আঁটবাঁধ তা কি লুকিয়ে রাখা আচারের শিশির মতোই লোভ দেখায় না মাঝে মাঝে? ভেসে যেতে ইচ্ছে করে না? হিমির মতো বয়সে পারে কি একটা মেয়ে নিজেকে অত সামলে-সুমলে রাখতে? শরীরেরও কত খবর সে জানে না। জানে না এখনও চুম্বনের সুস্বাদ, এখনও নিবিড়ভাবে পায়নি পুরুষের স্বেদগন্ধ। তাই ওই অত নিষেধ, অত ভয় সত্ত্বেও সে মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে সুমনের ঘরে গেছে।

গিয়ে দেখেছে, ছেলেটা হয় মোটা-সোটা বই পড়ে, নয় তো ঘুমোয়।

তবে হিমিকে একেবারে তাচ্ছিল্যও করেনি। বসে হেসে কথা বলেছে, চোখে চোখ রেখেছে। কিছু চোখের কথাও হয়েছে তাদের। প্রেম ব্যাপারটা হিমি এই চোদ্দো পনেরো বছর বয়সে ততটা বোঝে না। সে জানে, সব প্রেমেরই পরিণতি হয় বিয়ে, না হয় ছাড়াছাড়ি।

সুমন কেবল বন্ধুদের কথা বলত। ছেলের সঙ্গে মেয়ের বন্ধু-বন্ধু সম্পর্ক হয় বটে, কিন্তু শেষ অবধি বন্ধুত্বই তো ঝুল খেয়ে সেই প্রেমের কোলে গিয়েই পড়ে। আর প্রেম ঢলে পড়ে বিয়ের গায়ে। তাই না?

জিজিবুড়ি নজর রাখত ঠিকই। ধরল একদিন জামতলায়।

ওলো ও হিমি, বলি খবর-টবর কী রে?

কীসের খবর চাও?

বলি, কতদূর এগোলি?

কী বলছ বুঝতে পারছি না।

কচি খুকিটি তোনোস বাছা, সবই তো জানিস। বলি কী, বেশি সতীপনা থাকলে কিন্তু ফসকাবি।

তার মানে কী গো দিদিমা?

পুরুষমানুষকে একটু আসকারাও দিতে হয়। একটু হাত-টাত ধরলে, কি কাছে ঘেঁষলে চেঁচাসনি যেন বোকার মতো। ওতে তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে না রে বাপু। ওভাবেই খেলিয়ে তুলতে হয়।

যাঃ, কী যে সব অসভ্য কথা বলো দিদিমা।

খারাপ কিছু বলিনি, তলিয়ে ভাবলে বুঝবি। তোর বাপের যা অবস্থা মেয়ে পার করতে কোমর বেঁকে যাবে। তিন তিনটে বোন তোর, সেদিকটাও তো ভাববি। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নে না কেন। মাখামাখি যদি করতে চায় তো ভালই তো। গেঁথে তুলতে সুবিধেই হবে। শহুরে ছেলে ওরা, খুব চালাক। পিছলে যাতে না যায় তার ব্যবস্থা করে রাখবি। বুদ্ধি খাটিয়ে চললে দেখিস, কাজ ফর্সা।

দিদিমা যে ভাল লোক নয় তা সবাই জানে, হিমিও জানে। আর কথাগুলোর মধ্যে ভারী অসভ্য ইঙ্গিত। তবু কিন্তু শরীরে একটু শিহরণ দিয়েছিল তার।

খুব ভালমানুষের মতো বুড়ি বলেছিল, তুই তো হাঁদা, তাই বলি, অত গা বাঁচিয়ে চললে কাজ হবে না। কাছ ঘেঁষে বসবি। মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দিবি, ওই সব যা করে আর কী। একটু হাত-টাত ধরলে ঝটকা মেরে সরে আসিস না যেন।

ইস, তুমি ভারী অসভ্য দিদিমা। বলে পালিয়ে এসেছিল হিমি।

কী করলে কী হয় তা কি অত জানে নাকি হিমি?

তবে সে তার সাধ্যমতো, যতদূর সাহসে কুলোয়, লজ্জার মাথা খেয়ে করেনি যে তা নয়।

একদিন দুপুরে নির্জন ঘরে সে বলেছিল, আপনার মাথা টিপে দেব?

খুব অবাক হয়ে সুমন বলল, কেন? আমার তো মাথা ব্যথা করছে না!

হিমি জব্দ হয়ে বসে রইল।

সুমন একটু হেসেছিল। সেটা যে করুণার হাসি তাও বুঝেছিল বোকা হিমি।

একদিন সুমন তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি পান্নাকে চেনো?

পান্না! রামহরি জ্যাঠার মেয়ে?

হ্যাঁ।

আপনি তাকে চেনেন?

না। তবে চিনতে চাই। তুমি চেনো?

চিনব না কেন? পান্নাদির কাছে আমি গান শিখতাম।

এখন শেখো না?

না। আমার গলা সাধতে ভাল লাগে না।

গান খুব ভাল জিনিস। শিখলে পারতে।

আমার গলা একটু চড়া।

তাতে কী? সাধতে সাধতে সুর এসে যায়।

পান্নাদির কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?

মেয়েটা বেশ গায়।

হ্যাঁ, দেখতেও সুন্দর। পান্নাদিকে আপনার কথা বলব?

না না, আমার কথা বলতে হবে না।

বোকা হিমি কী করে যেন বুঝতে পেরেছিল, সুমন পান্নার প্রেমে পড়েছে। বুঝতে পেরে তার ভারী হিংসে হল পান্নার ওপর। হওয়ারই কথা। পান্নারা একে বড়লোক, তার ওপর সুন্দরী, তার ওপর গান জানে, তারও ওপর ওরা একটু অন্য জগতের মানুষ। অনেকটা পরি-টরির মতো। সবাই ওদের সঙ্গেই ভাব করতে চায়, প্রেম করতে চায়, বিয়ে করতে চায়। যদি তাই হয়, তাহলে পৃথিবীতে হিমিদের কী হবে? সুমন পান্নার সঙ্গে ভাব করার জন্য বসে আছে। আর হিমি যে রোজ তার সঙ্গে ভাব করতে আসে সেটা বুঝি কিছুই নয়?

চোখ ফেটে জল আসতে চাইছিল হিমির।

বিকেলেই সে পান্নাকে গিয়ে বলল, জানো তো পান্নাদি, রসিক বাঙালের আগের পক্ষের ছেলেটা ভীষণ অসভ্য।

কেন রে, কী করেছে?

তোমার ওপর নজর আছে।

পান্না হাসল, কী করে বুঝলি?

তোমার কথা বলছিল খুব। খুব হ্যাংলা কিন্তু।

পান্না রাগ করল না। করবেই বা কেন, ওর সঙ্গে তো কত ছেলেই ভাব করতে চায়। সেটা অহংকারেরই ব্যাপার তো। হিমির সঙ্গে যদি রাজ্যের ছেলে ভাব করতে চাইত তাহলে কি হিমির রাগ হত? বরং বুক ফুলে উঠত অহংকারে।

পান্না বলল, শুনেছি, ছেলেটা গান গায়। তাই নাকি রে?

হ্যাঁ তো। হেমন্তের মতো গলা।

তুই কত গান বুঝিস!

না বুঝলে কী! শুনি তো। সবাই বলে।

একদিন নিয়ে আসিস তো! শুনবো!

শুনবে?

হ্যাঁ। দোষ কী?

বেশি লাই দিও না। ওরা কিন্তু বামুন নয়।

ওমা! বামুন নয় তো তাতে কী?

তোমরা তো বামুন, তাই বলছিলাম আর কী।

পান্না খুব হেসেছিল, বামুন হলে কী হত রে হিমি?

বোকা হিমি খুব লজ্জা পেয়েছিল। কিন্তু সে করবেই বা কী? ওই যে পান্না সুমনের গান শুনতে চাইল ওতেই তার ভিতরে একটা পাগলাঘন্টি বেজে গিয়েছিল। যদি গান শুনে পান্নাও ঢলে পড়ে সুমনের দিকে!

আসলে ওই পান্না, ওই সুমন ওরা যেন মেঘের ওপরে থাকে। অত দূর নাগাল পোঁছোয় না হিমির। হিমির মতো মেয়ের কাছে ওরা স্বপ্নের ঘোরের মতো। ওদের জগতে হিমির কোনও জায়গা নেই।

আজকাল আবছাভাবে হিমি বুঝতে পারে, ইচ্ছে মতো কিছু পেতে হলে মেয়েদের নিজস্ব কিছু গুণ থাকা দরকার। অনেক টাকা, না হয় রূপ, গানের গলা, বুদ্ধি এইসব। তার যে কিছুই নেই। তার যে বিয়ে হবে না তা

নয়। কালো, মোটা বিচ্ছিরি চেহারার একজন মিস্ত্রি-টিস্ত্রি গোছের বা পানওয়ালা, মাছওয়ালা, মুদি যা হোক একজন জুটবে। সে তাকে ধামসাবে, চিবিয়ে খাবে, বাচ্চা পয়দা করবে, তারপর খুব নির্বিকার হয়ে যাবে। যেমন তার নিজের বাপ মা। ওরকমই তো হয়।

হ্যাঁ রে হিমি, বললি না ছেলেটা বামুন হলে কী হত!

হিমি হেসেছিল একটু। বলল, তোমাকে সাবধান করে দিলাম আর কী। বেশি প্রশ্রয় দিও না।

আচ্ছা, তা না হয় দেব না। ছেলেটাকে বলিস তো আমার সঙ্গে একদিন দেখা করতে।

ইস্। বলবে বই কী! কেন বলবে হিমি? হিমি কি পান্নার ক্রীতদাসী না দূতী? কক্ষনও বলবে না হিমি। তোমরা দুজনে উড়ে বেড়াবে আর আমি বুড়ো আঙুল চুষব বুঝি?

পান্নাদিকে আপনার কথা বলেছিলাম।

সুমন অবাক হয়ে বলল, কী বলেছ?

আপনি যে ভাব করতে চাইলেন।

এ মাঃ, তোমাকে বারণ করলাম যে! ইস্, প্রেস্টিজ তো একদম ঢিলে করে দিলে দেখছি।

আহা, দোষের তো কিছু নয়।

দুর! তুমি খুব বোকা মেয়ে। কী বলেছ শুনি।

এই আপনি দেখতে খুব সুন্দর, খুব ভাল গান করেন।

কেন বলতে গেলে?

ভাবলাম পান্নাদি হয়তো ভাব করতে চাইবে।

কী বলল শুনে?

পাত্তাই দিল না।

তুমি আর এরকম কোরো না।

খুব অন্যায় হয়েছে?

তা হয়েছে। কথা চালাচালি হলে খুব মুশকিল হয়। এখানে সবাই খুব অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় তো।

পান্নাদিরা কিন্তু বামুন। চাটুজ্জে।

জানি তো! বামুন কায়েতের কথাও তুলল নাকি?

না, আমিই বলছি।

ও, তাই বলো। বামুন কায়েতের কথা মনে হল কেন তোমার?

বাঃ, মনে হবে না?

কেন হবে?

তাই তো! কেন হবে? হিমি যে সবসময়ে ছেলেতে মেয়েতে বিয়ের কথাই ভাবে ওরা হয়তো সেরকম ভাবে না। এরা তো মেঘলোকের মানুষ, হিমির মতো তো নয়। হিমির একটাই সুবিধে, সে সুমনদের স্বজাত। তারাও বৈশ্য। কিন্তু তাতে যে খুব একটা সুবিধে করা যায় না তাও সে বোঝে।

সুমনের কাছাকাছি আর এক কদমও এগোতে পারেনি হিমি। শুধু চলে যাওয়ার দুদিন আগে তাকে ডাকিয়ে এনে সুমন খুব নরম গলায় বলেছিল, তুমি বেশ ভাল মেয়ে। ভাল করে লেখাপড়া করো, গান শেখো।

নিজেকে ছোটো করে রাখতে নেই। আমি আবার যখন আসব তখন যেন তোমাকে অন্যরকম দেখি।

এটা প্রেমের কথা কিনা তা অনেক ভেবেও পরিষ্কার হয়নি হিমির কাছে। সুমন কি বলতে চাইছিল যে, এরকম হিমিকে নয়, হিমি যদি আরও একটু তার মনের মতো হয় তাহলে সে হিমিকে ভালবাসতেও পারে? তাই বলতে চেয়েছিল সুমন?

তার পর থেকে হিমি একটু অন্যরকম হিমি হওয়ার চেষ্টা করেই যাচ্ছে। হারমোনিয়াম নিয়ে ভোরবেলা বসে গলা সাধে। পান্নার কাছে গান শিখতে যায়। পড়াশুনোয় খুব মন দিয়েছে সে যদিও ফল ফলতে শুরু করেনি। মুখে দুই মাখলে নাকি ভাল, তাই সে আজকাল মুখে মাঝে মাঝে টক দই মাখে। তাদের ব্যায়ামের দিদিমনি তাদের মাঝে মাঝে বলে, ফিটনেসই হচ্ছে আসল সৌন্দর্য। যারা কসমেটিক মেখে সুন্দর হতে চায় তারা বোকা। ভাল, ছিপছিপে শরীর, সতেজ চামড়া, চলায় ফেরায় ছমছমে ভাব, চটপটে হাত পা, ভাল দাঁত, ভাল চুল এসবই হল আসল সৌন্দর্য। আর সঙ্গে চাই ব্যক্তিত্ব।

অত শক্ত শক্ত কথা তার মাথায় থাকে না। তবে সে আজকাল স্কিপিং করে, নাচের ক্লাসে যায়। এসব করে সে খানিকটা খানিকটা এগিয়েছে কিনা তা অবশ্য বুঝতে পারে না।

একদিন সে ব্যায়ামের দিদিমনিকে জিজ্ঞেস করল, ব্যক্তিত্বটা কী জিনিস দিদিমনি?

নিজের মতামতকে শ্রদ্ধা করাই হল ব্যক্তিত্ব। অন্যের কথায় বা পরামর্শে ঢলে পড়তে নেই। সব সময়ে হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ করতে নেই, বিপদে পড়লে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়। এইসব আর কী।

নিজের মতো করে হিমি এসবও যে প্রাকটিস করছে না তা নয়। কিন্তু কতটা কী ফল হচ্ছে তা বুঝতে পারছে না। এখনও কেউ মুগ্ধ চোখে তাকায়নি তার দিকে। কেউ বাহবা দিয়ে বলেনি, বাঃ রে, তোকে তো বেশ দেখাচ্ছে! সে যে একটু হলেও বদলে গেছে সেটাও কেউ লক্ষ করেনি আজও।

বাহবা না পেলে সেই কাজটা করে যেতে উৎসাহ থাকে কারও?

এখন সে সুমনের অপেক্ষায় আছে। যার জন্য এত করা সে যদি একটু নরম চোখে তাকে খুঁটিয়ে দেখে একটুখানিও খুশি হয় তাহলেই ঢের।

কিন্তু সে যে কবে আসবে, কখনও আসবে কিনা তা জানবে কী করে হিমি? কাউকে জিজ্ঞেস করতে তার ভয় হয়, বুক ঢিবঢিব করে। লজ্জার মাথা খেয়ে মরণকে জিজ্ঞেস করলে মরণ শুধু বলে, আমার দাদার কত কাজ! কী করে আসবে?

আটষট্টি

দুঃখী দীননাথ বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে গলায় দড়ি দেবে বলে ভরসন্ধেবেলা মাধবপুরের জঙ্গলে এসে একটা বেশ মজবুত গাছে উঠে বসে আছে। যে দড়িটা গলায় দেবে সেটা সদ্য গোরুর গলা থেকে খুলে আনা, গোরু-গোরু গন্ধ ছাড়ছে। দড়িটা কোমরে পেঁচানো। দীননাথের গায়ে একটা ময়লা গেঞ্জি, কাঁধে গামছা। পবনে ময়লা ধুতি। গাছের ডালে বসে দীননাথ এখন বিড়ি খাচ্ছে। ঝুলে পড়ার আগে এই যে একটু সময় আরাম করে কাটাচ্ছে সে, এ সময়টা বড়ই মূল্যবান। সময় জিনিসটা যে কী ভীষণ দামি তা জীবনে এই প্রথম টের পাচ্ছে দীননাথ। চারদিক ভারি সুনসান, ধারেকাছে জনমনিষ্যি নেই, গাছের তলায় তার তাপ্পি দেওয়া পুরনো হাওয়াই চটিজোড়া পড়ে আছে। অনেক দিনের সঙ্গী, টেনে-মেনে দু-আড়াই বছর চটিজোড়া দিয়ে কাজ চালিয়েছে সে। আজ থেকে চটিজোড়ার বিশ্রাম। বেঁচে থাকতে কত কী লাগে। বড়লোকেদের বায়নাক্কা বেশি বটে, কিন্তু গরিব কাঙালদেরও বেঁচে থাকার হ্যাপা তো কম নয়। খিদেতেষ্টা, লজ্জা নিবারণ, শীত-বর্ষার আচ্ছাদন, বিড়িটা-আশটা, একটা মেয়েমানুষ বা একটু ঘরদোর, হিসেব করলে কম নয় ব্যাপারটা। আর ভেবে দেখলে এই দেহখানার জন্যই যা ঝঞ্ঝাট। এটি না থাকলে আর কোনও ঝামেলা থাকে না। তার বউ ফুলি বড্ড গেছে মেয়েছেলে, একটা দিন শান্তিতে তিষ্ঠোতে দেয়নি তাকে। মেয়েছেলের শরীরের ক্ষ্যামতা না থাক, গলার জোরেই পুরুষ কাত। আর সেই জোরটা দীননাথের মোটেই নেই। কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে পাল্লা দেয় বটে, তারপর বাক্যে না পেরে কিলোয়। কিন্তু তাতেও লাভ হয়েছে লবডঙ্কা। কিল-চড় খেয়ে যেন ফুলির গলার জোর দুনো হয়। বাক্যে বড্ড ঝাঁঝরা হয়েছে দীনু। কতবার ভেবেছে বাক্যে তো আর শরীরে ছ্যাঁকা লাগে না, কানে না তুললেই হল। তা সে চেষ্টাও কম করেনি সে। বাক্যেরও কিছু কেতদানি আছে বইকী, বাক্য দিয়ে বোধহয় মানুষও মারা যায়।

দীন, অর্থাৎ দীননাথ বিড়িটা ফেলে আর একটা ধরাল। বেশ ধকওলা ঝাঁঝালো বিড়ি। কালিপদর দোকানের বিড়ির স্বাদই আলাদা। কালো সুতোর মুগুর ব্র্যান্ড এই বিড়ির দাম দেড়া। আজ জীবনের শেষ দিন বলে কিনেছে দীনু। পুরো এক বান্ডিল। সঙ্গে নতুন দেশলাই।

মাধবপুরের জঙ্গলে আগে বাঘ ছিল। আরও নানা জানোয়ার দেখা যেত মাঝে মাঝে। কয়েকটা হরিণও দেখেছে সে ছেলেবেলায়। এখন শেয়ালও নেই বড় একটা। জঙ্গলটাই উঠে যাবে কিছুদিন পর। পুব ধার, পশ্চিম ধার সব দিক দিয়েই ধীরে ধীরে জঙ্গল হাসিল হচ্ছে। ঘন জঙ্গল ছিল এক সময়ে, এখন ভিতরটা অনেক ফাঁকা ফাঁকা। গাছপালা কাটা হচ্ছে রোজই। কাঠের দাম এখন আগুন।

অন্ধকার নেমে আসছে ক্রমে। তবে খুব একটা ভয় নেই। আজ পূর্ণিমা। একটু বাদেই মস্ত চাঁদ উঠবে পুব ধারে। উঠেও গেছে বোধহয় খানিকটা। গাছপালার জন্য দেখা যাচ্ছে না। বিড়ি খেতে খেতে একটু কাশল দীনু। গুন গুন করে একটু গানও গাইল। মরার আগে একটু ফুর্তি করে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে ভেবেই পেল

না, ফুর্তিটা কীভাবে করবে। অভাবি মানুষ সে, ফুর্তি কীভাবে করতে হয় তা জানেই না। মাংস দিয়ে ভাত খেলে কি ফুর্তি হয়? কেত্তন শুনলে? যাত্রা দেখলে? অনেক ভেবেও সে ফুর্তির পথটা খুঁজে পায়নি। বিড়ি খেতে খেতে সে একটু ফুলির কথাও ভাবল। কতবার ফুলি তাকে গলায় দড়ি দিতে বলেছে, কিন্তু যখন সে সত্যিই গলায় দড়ি দেবে তখন মাগীর তেজ থাকবে কোথায়? হুঁ হুঁ বাবা, তখন তো গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে ভাসাবে। ভাসাক, তাই তো চায় দীনু। তবে তার কচি মেয়েটার জন্য বুক একটু টনটন করে। মাত্র বছর চারেক বয়েস। খুব বাপ-ন্যাওটা। তবে মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে দীননাথ চমকে উঠে ডানধারে তাকাল। অবাক হয়ে দেখল, কখন নিঃশব্দে আরও একটা লোক তার কাছ ঘেঁষেই এসে বসেছে। কখন গাছে উঠল, কখন এসে বসল তা দীনু মোটেই টের পায়নি। তারই মতো বয়স হবে। গরিব-দুঃখী মানুষ বলেই আবছা অন্ধকারে মনে হল।

দীনুও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আজকাল নিরিবিলি জায়গা খুঁজে পাওয়াই ভার। মাধবপুরের জঙ্গলে নিশ্চিন্তে মরতে এসেছে সে, এখানেও উটকো একটা লোক এসে জুটে গেল। কী মতলব কে জানে। সন্ধেরাতে গাছ-টাছে উঠতে নেই, সবাই জানে। তবু যদি উঠতেই হয় তবে অন্য গাছে গিয়ে ওঠো না বাপু, দীনুব গাছটাতেই উঠতে হবে এমন তো কথা নয়।

উত্তেজিত হলেও দীনু ফস করে কিছু বলল না। বিড়ি খেতে খেতে আড়ে আড়ে চেয়ে লোকটাকে ঠাহর করতে লাগল। লোকটার হাবভাব কিছু অন্ধকারে বোঝা গেল না। এও কি গলায় দড়ি দেবে বলেই গাছে উঠেছে? কে জানে বাবা। তবে ফাঁসি দেওয়ার জন্য গাছেরও তো অভাব নেই। আর ফাঁসিই বা কেন, মরার কত উপায় আছে। আড়াই মাইল হেঁটে গেলেই রেলরাস্তা। গামছা পেতে লাইনে মাথা দিয়ে শুয়ে ঘুম লাগাও। এক সময়ে ট্রেন এসে কাজ ফর্সা করে দিয়ে চলে যাবে। টেরটিও পাবে না। কিংবা এক বোতল অ্যাসিড বা পোকা মারার বিষ কিনে ঢক ঢক করে মেরে দাও, লম্ফ মেরে আকাশে উঠে পড়বে।

এখন মুশকিল হল, লোকটা কেমন এবং কী মতলব তা না বুঝে দীনু গলায় দড়ি দিতে পারছে না। লোকটার হয়তো দয়া উথলে উঠবে, দীনুকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। নয়তো উপদেশ-টুপদেশ দেবে। ওসব ভ্যাজর ভ্যাজর এখন আর তার সহ্য হবে না।

দীনু অগত্যা বিড়িটা ফেলে গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, বলি কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

লোকটার মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না। তবে গলার স্বর শুনে মনে হল, কথা কওয়ার তেমন জো নেই। বলল, কাছে-পিঠেই থাকি।

বিড়ি-টিড়ি চলে?

তা চলে।

খাবে নাকি একটা?

লোকটা হাত বাড়াল। দীনু একটা বিড়ি আর দেশলাই এগিয়ে দিল হাতে। লোকটা বিড়ি ধরিয়ে উদাসভাবে টানতে লাগল।

ভাবসাব করতে হলে বিড়ির মতো জিনিস নেই। চট করে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। দীনু ফের একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, তা মতলবটা কী? সাঁঝেরবেলায় গাছে এসে উঠেছ যে বড়!

কেন, উঠতে বাধা কীসের? ইচ্ছে হল তাই উঠে পড়লাম।

হাসালে বাপু। গাছে উঠতে ইচ্ছেটাই বা হবে কেন? পাগল নাকি হে তুমি?

তা পাগলও একটু আছি বোধহয়। মাথায় একটু গণ্ডগোল আছে যেন।

তা তোমার হাবভাব দেখেই বুঝেছি। তা বাপু, এ-গাছটাই তোমার পছন্দ হল যে! জঙ্গলে কি আর গাছ নেই?

তা আছে।

তবে?

অন্য গাছে তো আর তুমি নেই!

যাঃ বাবা, তুমি কি আমাকে দেখেই এ-গাছে উঠলে নাকি? এ তো বড় মজা মন্দ নয়। কেন হে বাপু, আমি যা করব তোমাকেও কি তাই করতে হবে?

লোকটা তেমন নির্বিকার গলায় বলল, না, ঠিক তা নয় বটে।

তাহলে?

মনে হল তোমার সঙ্গে এ সময়টায় থাকলে ভাল হবে।

এ সময়টা বলতে কী বোঝাতে চাইছ?

তুমি তো মরতে এসেছ?

কী করে বুঝলে?

না, তা অবশ্য বোঝা যায় না বটে, কেমন যেন সন্দেহ হল।

দুর দুর, মরা-টরা নয় রে বাপু, গাছে উঠেছি চন্দনা পাখি ধরতে। সন্ধের পর হলে ধরতে সুবিধে।

ও। তা হবে।

বিশ্বাস হল না বুঝি?

তা হবে না কেন? দুনিয়া জুড়ে কত মানুষ কত অদ্ভুত মতলব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাহলে তো বুঝতেই পারছ তোমার সন্দেহটা ঠিক নয়।

তাই হবে হয়তো। চিরটা কাল তো কত ভুলই বুঝলাম। তোমার ওই ছেঁড়া হাওয়াই চপ্পলজোড়া দেখেই পুরনো কথা সব মনে পড়ছিল কি না। তাই গাছে ওঠার আগে বসে বসে তোমার চপ্পলজোড়ার সঙ্গে কথা কইলাম।

চপ্পলজোড়ার সঙ্গে! পাগল আর কাকে বলে। তা চপ্পল তোমাকে কী বলল?

জিজ্ঞেস করলাম, ওরে বাপু, তোরা এখানে এমন একাবোকা পড়ে আছিস কেন? তো তারা বলল, জানো না বুঝি! আমাদের কর্তা গলায় দড়ি দিতে গাছে উঠেছেন। আজ থেকে আমাদের ছুটি।

বলল?

হ্যাঁ গো, পষ্ট বলল, তা আমি জিজ্ঞেস করলাম, কর্তা মরতে চায় কেন। চপ্পলজোড়া ভারী কাঁচুমাচু হয়ে বলল, কর্তার মনে বড় অশান্তি। পরিবারের সঙ্গে খুব ঝগড়া হয় কিনা।

দীননাথের একটু প্রেস্টিজে লাগল। একটু ঝাঁঝের গলায় বলল, ঝগড়া হয় তো হয়, তাতে ওদের কী? বড় আস্পদ্দা তো তুচ্ছ হাওয়াই চপ্পলের।

আহা, শুধু চঞ্চলই বা কেন, এই যে গাছটায় উঠে বসে আছ, এও তো সাক্ষী আছে।

বটে!

তবে আর বলছি কী, গাছে ওঠার সময় জিজ্ঞেস করলাম, ওহে বাপু, লোকটা কি ঝুলে পড়েছে। গাছ হাই তুলে বলল, আর বোলো না ভায়া, সাঁঝবেলাতেই আমার রাজ্যের ঘুম পায়। কিন্তু ঘুমুবার কি জো আছে! চোখটি লেগে আসছিল সবে এমন সময় হাড়হাভাতেটা এসে হাজির। কী না গলায় দড়ি দেবে। সেই যে ঘুমটা চটকে গেল আর চোখের পাতা এক করতে পারিনি। নবাবপুত্তুর গাছে উঠেছেন ঝুলবেন বলে, আর আমাকে ফাঁসিকাঠ হতে হবে।

বলল?

তবে আর বলছি কী! আমি বললুম, ঝুলে পড়েছে নাকি? গাছ তখন ভারী তেতো গলায় বলল, তাহলে তো বাঁচতুম। ঝুলবার বায়নাক্কা কি কম! বাবু এখন আরাম করে বসে বিড়ি ফুঁকছেন আর জ্বলন্ত বিড়ি আমার গায়েই টিপে টিপে নেবাচ্ছেন। ছ্যাঁকার চোটে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে গেল। কী বিড়ি-খেকো লোক রে বাবা। সবাই মরার আগে কেন যে এত বিড়ি ফোঁকে কে জানে বাবা। আমার তো এটা নিয়ে ছয় নম্বর। তার মধ্যে একটা বউমানুষও ছিল, তা সে বিড়ি খায়নি বটে, কিন্তু গলায় দড়ি দেওয়ার আগে দু কলসি চোখের জল ফেলেছিল। বড্ড ঝামেলা হে। তা যাও বাপু, গিয়ে লোকটাকে বলল যা করবে তা ঝটপট করে ফেলতে। আমি আর কতক্ষণ রাত জেগে থাকব বলতে পারো?

এবার বিড়িটা আর গাছের গায়ে টিপে নেবাল না দীননাথ। একটু ধরে রইল। বিড়ির আগুন ক্ষণস্থায়ী, সহজেই নিবে যায়।

দীনু বলল, বানিয়ে বানিয়ে বলছ না তো!

লোকটা উদাস গলায় বলল, কী লাভ?

পাগলের মাথায় নানা রকম নতুন কথা আসে জানো তো!

তা জানব না? পাগল কি কম দেখেছি জীবনে?

আর একটা বিড়ি খাবে নাকি?

আছে?

মেলা আছে। এক বান্ডিল কিনেছিলাম, সব কটা কি আর মরার আগে খেতে পারব? এই নাও, ধরাও।

লোকটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু নয়।

দীনু অবাক হয়ে বলে, কী আবার ভাবলাম।

ভাবছিলে দিব্যি চুপি চুপি মরতে পারবে, কেউ টেরও পাবে না। তা কিন্তু নয়। সবাই টের পাচ্ছে, তুমি মরতে এসেছ।

আ মোলো যা, আবার কে টের পেল?

পোকামাকড়, কাকপক্ষী, হাওয়াবাতাস, গাছপালা সবাই।

তারাও সব তোমার কাছে আমার কুচ্ছো গাইছে নাকি?

ঠিক তা নয় তবে দেখছ না চারদিকটা কেমন ঝিম মেরে আছে!

তা আছে। তাতে কী?

ওই ঝিম মেরে থাকা মানেই সবাই অপেক্ষা করছে সর্বনাশটার জন্য। দুঃখও পাচ্ছে।

বাজে কথা।

কান থাকলে ঠিক শুনতে পেতে, বাতাসে একটা হায় হায় শব্দ ছড়িয়ে যাচ্ছে।

তুমি নির্যস পাগলই বটে হে। তবে স্বীকার করি, তুমি বেশ কথা কইতে পারো। আগড়ম বাগড়ম বলছ বটে তবে বেশ গুছিয়ে বলছ।

কথা আমি মোটেই কইতে পারি না। আমাকে কথা কওয়ায় পরিস্থিতি। যখন যেমন কথার জোগান পাই তখন তেমন বলি। বললে প্রত্যয় যাবে না, আমাকে কথা কওয়াচ্ছে তোমারই চারদিকটা।

বেড়ে বলেছ ভায়া। কথাটা বোধহয় খানিকটা ঠিকই। মানুষ কি আর সাধে আজেবাজে কথা কয়। আমার বউমাগী ফুলি যদি অমনধারা কুরুক্ষেত্তর না করত তাহলে কি আমিই অমন সব মুখখারাপ করতাম!

আহা, তোমার শোনার কানই নেই কিনা।

তার মানে?

ফুলি মুখে যা কয় তাই কি কথা? তার মনেও তো কিছু কথা ভুড়ভুড়ি কাটে, না কি?

তা কাটতে পারে।

সেইটে কি তুমি শুনতে পাও?

না বাপু, আমার অত শোনার প্রবিত্তি নেই।

সেইজন্যই তো বলি, তোমার শোনার কান নেই। ফুলি তোমাকে যখন মরতে বলে তখন কি আর সত্যিই মরতে বলে? তুমি মরলে তার লাভটা কী বলল তো!

ওই বজ্জাত মাগীকে তো চেনো না, তাই বলছ। হাড়মাস চিবিয়ে খাচ্ছে হে।

আচ্ছা বাপু, সে না হয় বুঝলুম। কিন্তু তোমাদের তো কখনও-সখনও আদর সোহাগও হয় নাকি?

সে কালেভদ্রে।

তখন ফুলি কী বলে? ভাল ভাল কথা কয় না তখন?

তা কইবে না কেন? খুব আঁঠালো কথাই কয়। তবে সেগুলো ওর মনের কথা নয়।

তাহলে বাপু যখন রেগেমেগে গালাগাল দেয় সেও তার মনের কথা নয়। বুঝলে?

তুমি আমাকে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করছ বুঝি? সুবিধে হবে না। আমার পরিবারকে আমি খুব চিনি। গলায় দড়ি দিয়ে মাগীকে কাঁদিয়ে ছাড়ব, তবে আমার নাম দীনু দাস।

বেশ কথা। ফুলি কাঁদলে খুশি হও বুঝি?

তা নয় তো কী?

কিন্তু ফুলি কাঁদলে খুশি হবে কেন তা ভেবে দেখেছ কী?

ও আর ভাবার কী আছে। মাগী আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে কাঁদছে এটা ভাবতেই সুখ।

বলি ভেবে দেখেছ কী, ফুলিই বা কাঁদবে কেন? তোমার তাকে কাঁদিয়ে সুখ, আর ফুলির তোমার জন্য কেঁদে সুখ। ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়?

কী আর দাঁড়াবে? এবার বুঝবে দীনু দাস ছাড়া কেমন চলে।

ওই তো বললাম, কান নেই বলে শুনতে পেলে না।

কী শুনলুম না বলো তো!

এই যে গাছ কথা কইছে, হাওয়াই চপ্পল কথা কইছে, ঝিঁঝি কথা কইছে, বাতাস কথা কইছে, গাছের কোটরে ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমী কথা কইছে, বিবেক কথা কইছে সব কি শুনতে পাচ্ছ?

দুর! ওসব তোমার মনগড়া কথা। কেউ কিছু কইছে না।

কইছে হে কইছে। ফুলির মনেও ভুড়ভুড়ি ওঠে হে, তুমি শুনতে পাও না।

চুলোয় যাক ভুড়ভুড়ি। ভুড়ভুড়ি ধুয়ে কি জল খাব! খান্ডার মাগীর মনটাও তো আস্তাকুঁড়।

না হে, কথাটা ঠিক হল না। এ হল মাথাগরমের কথা। ঠান্ডা মাথায় ভাবলে অন্যরকম মনে হবে।

তুমি ঠিক কে বলো তো! পাগল যে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নামটা কী?

আমার নাম আমি।

যাঃ, ও আবার একটা নাম হল নাকি?

ওইটেই যে আমার নাম। আমি, ইচ্ছে হলে আমি দাসও বলতে পারো।

ও আবার কেমনধারা নাম! আমি দাস।

কেন, নামটা কি খারাপ? তুমি দীননাথ হলে আমার নাম আমি হতে বাধা কী?

তা বটে। তবে কিনা কাউকে আমি বলে ডাকলে পাঁচজন না আবার আমাকেই পাগল ভাবে।

কিন্তু আসল কথাটাও যে তাই।

তার মানে?

তুমি যে আসলে আমিই!

দুর পাগল! আমি আবার তুমি হব কী করে?

হতে হবে না, হয়েই আছ।

দেখ বাপু, পাগুলে কথা কয়ে আমার মাথাটা আর গুলিয়ে দিও না। একটু বাদেই আমি পটল তুলব, মেলা কাজ রয়েছে হাতে। দড়িখানা ভাল করে গাছের ডালে বাঁধতে হবে। ফাঁসটা ভাল করে ফাঁদিয়ে তুলতে হবে। তারপর ধরো ঠাকুর-দেবতাকেও একটু ডাকতে হবে। এ সময়ে মাথা গুলিয়ে গেলে চলবে না। তুমি এবার বরং এসো গিয়ে।

ব্যস্ত হয়ো না। মরাটা এমন হাতিঘোড়া ব্যাপার নয়। নিত্যি দুনিয়া জুড়ে হাজারে হাজারে মরছে। দু দণ্ড দেরি হলেও ক্ষতি নেই। সারা রাত তো পড়ে আছে সামনে।

না হে বাপু, শুভস্য শীঘ্রম। দেরি হলে আবার মন ঘুরে যেতে পারে। তাই দেরি করাটা ঠিক হবে না।

আহা, তার আগে যে দুটো কথা ছিল।

কী কথা?

তুমি তো কানেই তুলতে চাইছ না। এই যে বললুম আমার নাম আমি, তাও তুমি ব্যাপারটা ধরতে পারলে না।

ভেঙে বলবে তো!

তাই বলছি। এই যে আমাকে দেখছ এই আমি আসলে তুমিই। তবে পটল তোলার পর।

ফের প্যাঁচ মারছ?

মাইরি না। তুমি পটল তোলার পর তোমার যে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে সেটাই হচ্ছে আমি।

ইয়ার্কি মারার আর জায়গা পাওনি। আমি তো এখনও পটলই তুলিনি। তুলতে যাচ্ছি মাত্র। ঝুলব, ছটফট করব, মরব, সে এখনও ঢের দেরি।

ওরে বাপু, মরা তোমার হয়েই গেছে। তোমার ভিতর থেকে আমি বেরিয়ে পড়েছি যে। এখন ও শরীর ঝোলাও, না ঝোলাও একই কথা। মোট কথা, তুমি মরেই গেছ।

অ্যাঁ!

তাই তো বলছি। তুমি মরেই তো আমি হলুম। না মরলে আমার দেখা পেতে নাকি?

বটে! তাহলে তুমি হচ্ছ মরা আমি?

এইবার ধরেছ ঠিক।

তা মরে কেমন লাগছে তোমার?

দুর, নতুন কিছু তো বুঝছি না। একই রকম। বরং ফুলির জন্য বড্ড মনটা আনচান করছে, মেয়েটার কথা ভেবে কান্না আসছে।

অ্যাই! ফুলির কথা তোলার তুমি কে? ফুলি তো আমার বউ!

সে আমারও বউ।

বললেই হল! ফুলি তোমার বউ হতে যাবে কেন?

আহা, হতে বাধা কী?

বাধা আছে বইকী!

ভাল করে ভেবে বলো। বরং ফের একটা বিড়ি ধরাও।

দীনু বিড়ি ধরাল, আমি দাসকেও একটা দিল। তারপর কষে ভাবতে লাগল। তারপর বলল, না হে একটা গোলমাল হচ্ছে।

কীসের গোলমাল?

ঠিক বুঝতে পারছি না। আরও ভাবতে হবে। আজ আর মরা হবে না। বরং বাড়ি যাই। ভেবে ব্যাপারটা বুঝে কাল বা পরশু এসে ফাঁসি যাব।

তা প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এসো গিয়ে।

গাছটা হাই তুলে আপনমনে বলল, বাঁচা গেল। সারা রাত হাতে লাশ ঝুলিয়ে কি ঘুমোনো যায়!

একটা হাওয়াই চটি আর একটাকে ডেকে বলল, ওরে ঘুমোলি নাকি? ওরে ওঠ, কর্তা আজ মরছে না, ওই নামছে গাছ থেকে।

যাঃ বাবা, লম্বা ছুটি ভেবে জিরোচ্ছিলুম, ছুটি কাটা গেল যে!

মোনা ঘরে ঢুকে বলল, শোনো, গ্রীষ্মকালে বোধহয় এখানে উইক এন্ডে আসা যাবে না।

লেখার কাগজ থেকে গভীর অন্যমনস্ক চোখ তুলে অমল বলল, কেন বলো তো!

এখানে যা গরম পড়ে, আর লোডশেডিং।

তা বটে। তারপর একটু চুপ করে থেকে অমল স্নিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ মোনা, তোমার এখানে আসতে এমনিতে খারাপ লাগে না তো!

মোনা তার দিকে চেয়ে একটু ভাবল। তারপর বলল, আগে লাগত। এখন লাগে না।

আমার বাড়ির লোকেরা তত কিছু ভাল নয়। কালচার-টালচার নেই তেমন।

একটা কথা শুনে রাখো। মেয়েদের অ্যাডজাস্ট করতে একটু সময় লাগে, কিন্তু যদি সে তার স্বামীর সাহায্য আর সহানুভূতি পায় তাহলে সে রাক্ষসের সঙ্গেও অ্যাডজাস্ট করে নেয়। বুঝেছ?

অমল মলিন মুখে বলল, হ্যাঁ, তাই বোধহয়।

বোধহয় বললে কেন?

আমার মাথা আজকাল তেমন কাজ করে না মোনা। আমি তো তোমাকে তেমন সহানুভূতি দেখাইনি, সাহায্যও করিনি। তাই ভাবছি...

মোনা এগিয়ে এসে তার মুখখানা দু হাতে তুলে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে একটা চুমু খেল। বলল, অত বুঝতে হবে না।

ঊনসত্তর

কথা বললো, আমার সঙ্গে কথা বলো তুমি। কেউ কি আছ কোথাও? ওই আকাশে, কিংবা শূন্যে, কিংবা পঞ্চভূতে? কেউ যদি কোথাও থেকে থাকো, ঈশ্বর বা সর্বময় কেউ, সর্বশক্তিমান কেউ, একটু চকিত আভাস অন্তত দাও তোমার। তুমি যে আছ, তা বুঝতে দাও। একবার একটিবার মাত্র আমার এই ঘোর আদিগন্ত একাকিত্ব, এই নিঃস্ব মন, এই ক্ষয়িষ্ণু শরীরের, এই অনস্তিত্বময় অস্তিত্বের উৎসকে একবার চিনে নিতে দাও। এতটুকু আভাস যদি পাই তোমার তা হলেই হৃদয় জুড়োবে। বাদবাকি জীবন নিজেকে বহন করা সহজতর হবে।

শীতের গভীর রাত্রি। চারদিকে ঘুমন্ত চরাচর। কুয়াশায় মাখা এক রহস্যময় জ্যোৎস্নার সামান্য ভুতুড়ে আলোয় ছাদে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে অমল দাঁড়িয়ে। মাথা গরম। বুকে হাতুড়ির মতো তার হৃৎপিণ্ড আছড়ে পড়ছে ভঙ্গুর পাঁজরে। দাঁতে দাঁতে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। শীত হয়তো আছে, কিন্তু অমলের ভিতরে আজ যেন সব উত্তাপ নিবে গেছে। রক্ত আজ সাপের রক্তের মতো ঠান্ডা। সর্বাঙ্গে বয়ে যাচ্ছে শীতের প্রহারের কম্পন। পৃথিবীতে এত শীতও আছে এতকাল বুঝতেই পারেনি সে। ঘরে লেপের তলায় নিশ্চিন্তে গভীর ঘুমে ঢলে আছে সবাই। তার বউ, ছেলে, মেয়ে। এই শীতের রাতে হঠাৎ এত অনিকেত কেন লাগল নিজেকে কে জানে। লেপের খোলস ছেড়ে সে নিঃশব্দে উঠে এসেছে ছাদে। কেন তাও সে জানে না। শুধু জানে, এই অর্থহীন জগৎ তাকে পাগল করে দিচ্ছে ক্রমে। কেন এই জগৎ? কেন এই চৈতন্য? এর কোনও স্রষ্টা নেই? শেষ নেই? ব্যাখ্যা নেই? অর্থ নেই? কেন এই আশ্চর্য ধাঁধা তার চারদিকে? এ কি অর্থহীন জড়বস্তুর সমাহার? কেন এসব? কী এসব?

না, মোনার সঙ্গে তার কোনও ঝগড়া হয় না আজকাল। বিচ্ছেদ হতে হতেও তারা খাদের কিনারা থেকে কিছুটা সরে এসেছে। খুবই সতর্কতার সঙ্গে নিজের কথা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করছে অমল। তার ফলে সমঝোতা চমৎকার দুজনের মধ্যে। দৈহিক সম্পর্কটাও প্রায় নিয়মিত। কিন্তু মানসিক? শুধু অমল জানে, কী শূন্য হৃদয় তার। সেখানে কোনও তরঙ্গই ওঠে না আর। ভাগ্য ভাল মনের ভিতরটাকে আর কেউ দেখতে পায় না।

আজ রাতে এক অলৌকিককে অনুভব করতে চাইছে অমল। তার তো বিশ্বাসের কোনও স্থণ্ডিল নেই। তাকে পৈতে পরিয়েছে বউদি, গায়ত্রী জপ করার পরামর্শ দিয়েছে। তাও কি করেনি অমল? কিন্তু আধখানা মন নিয়ে কি ওসব হয়?

একদিন সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, গায়ত্রী জপ করলে কী হয় বাবা? কিছু কি হয়?

প্রশ্ন শুনে মহিম রায় বিস্মিত এবং একটু বিব্রতও। একটু হেসে বলল, কেন রে?

সেই কবে তুমি আমার পৈতে দিয়েছিলে! কিন্তু দণ্ডিঘর ছেড়ে বছরখানেক কিছু করেছিলাম। তারপর সবই ছেড়ে দিয়েছি।

মহিম তার বিদ্বান ছেলেকে কী বলবে তা ভেবে পেল না প্রথমে। অনেকক্ষণ বাদে বলল, মন্ত্র তো মনকে ত্রাণই করে। করার কথা।

আমি তো আজকাল গায়ত্রী জপ করি। কিছু হয় বলে টের পাই না তো!

মহিম ফের একটু বিব্রত। ছেলে সাহেব এবং নাস্তিক হয়ে গেছে বলেই সে জানে। ছেলের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতে বোধহয় ভয়ও পায়। তাই খুবই নরম গলায় বলল, সব মন্ত্রেরই একটা সাক্ষাৎকার আছে।

অবাক হয়ে অমল বলে, সেটা কী বাবা?

কথাটা বলেই মহিম আরও বিব্রত এবং অপ্রতিভ। আবার একটু ভেবে বলল, আসলে ওসব একটু ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে করলে ভাল। পরীক্ষা করার মন নিয়ে করতে গেলে তেমন কিছু হয় না।

আমি তো বিশ্বাস করতেই চাই বাবা। কিন্তু জপ করেও তো বিশ্বাস আসছে না। কেন আসছে না বল তো!

বাবার মুখ দেখেই অমল বুঝতে পারছিল, এসব সংগত প্রশ্নের সামনে তার বাবা অসহায় বোধ করছে, থই পাচ্ছে না, কূল-কিনারা পাচ্ছে না। বাবা বিশ্বাস করেই বড় হয়েছে, বিশ্বাস নিয়েই বুড়ো হয়েছে। কখনও তো প্রশ্ন করেনি ব্যাপারটাকে। তার কাছে দুনিয়াটা স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বরসৃষ্ট, এবং তার ঈশ্বর কোথাও আছেন, ঠিকানা না জানা থাকলেও আছেন নিশ্চয়ই। এই বিশ্বাস আমৃত্যু তাকে বন্ধুর মতো সাহচর্য দেবে। এই বিশ্বাস আছে বলেই কোনও লজিক্যাল প্রশ্ন বিষধর সাপের মতো ফণা তুলবে না তার সামনে। কিন্তু অমলের তো তা নয়। তার কাছে এই চারদিকের জগৎসংসার স্বাভাবিক নয়। এ এক ধাঁধা। অর্থহীনভাবে ফলিত হয়ে আছে। এর না আছে উদ্দেশ্য, না আছে অর্থ, না ব্যাখ্যা। ঈশ্বর এক ঠিকানাবিহীন, নামগোত্রহীন নন-এন্টিটি। যদি সে না-ই থাকে তাহলে এই সৃষ্ট জগতের ধাঁধা আরও জটিল ও কঠিন হল। আশ্রয়হীন, সংহতিহীন এক বিশৃঙ্খলা মাত্র। এটা ওটা এখানে সেখানে পড়ে আছে মাত্র, কারও সঙ্গে কারও কোনও প্রয়োজন বা সম্পর্ক নেই। সারা জগৎময় ওইসব জড়বস্তুর আয়োজন, যার সমাবেশ থেকে কিছুই বুঝবার উপায় নেই। এসব কেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে? কী কাজ করছে এরা? কেন করছে? আর এই জড় জগতে সব কিছু জড়িভূত থাকার কথা, হঠাৎ তার মধ্যেই কেন চৈতন্যের উন্মেষ? আর তা হলই বা কেন?

ভাবতে ভাবতে পাগলপারা মাথা। মাথার কোষে কোষে জমে ওঠে ধাঁধা, কে এর পিছনে? কী এর কারণ? কোথায় এর শুরু বা শেষ? ছোট ঘরের অবরোধে মধ্যরাতে লেপের মধ্যে ভেপে উঠল তার শরীর। তার চেয়েও বেশি বিকল অচল হল মন, বুদ্ধি, চেতনা। দমফোট অবস্থা।

তার বাবা মহিম রায় বিজ্ঞানের মানুষ নয়। কিন্তু এককালে ইংরিজিতে এম এ পাস করেছিল। গেঁয়ো গন্ধ আজও তার বাবার গা থেকে যায়নি। খুব চোখা চালাক বুদ্ধিমান লোক নয়। মহিম রায় তার মেধাবী ছেলের দিকে চেয়ে বলল, বিশ্বাস জিনিসটা সহজে আসতে চায় না তো। অনেক দ্বিধা আসে, অনেক প্রশ্ন আসে। ওটাই তো লড়াই।

তুমি কবে থেকে ভগবান মানেনা বাবা?

মহিম রায় ভারী অপ্রস্তুত হেসে বলেছিল, সে কি মনে আছে? ছেলেবেলা থেকেই বোধহয়।

কখনও ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি?

হয়েছে। কতবার হয়েছে।

এই যে বিশ্বাস থেকে অবিশ্বাস, আর অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাস, এই ট্রানজিটারি পিরিয়ডটার কথা আমাকে বলবে?

ছেলের দুর্মর অস্থিরতা টের পাচ্ছিল মহিম। কিন্তু বেশি কথা বলতেও বোধহয় সাহস হল না। সংক্ষেপে বলল, স্বামী বিবেকানন্দেরও তো হয়েছিল শুনেছি। সবারই হয়।

আমার একজন ভগবান দরকার। ভীষণ দরকার।

মহিম এটা হাসির কথা ভেবেই হেসেছিল। গুরুত্বটা বোধহয় বোঝেনি।

তবে কার কাছে যাবে অমল? কে ধরিয়ে দেবে তাকে?

আকাশের দিকে চেয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। আকাশ তো কিছু বলে না। এক নিরপেক্ষ বিস্তার মাত্র। যে যা খুশি ব্যাখ্যা করে নাও। এই নীরবতাই বড় অসহনীয় লাগে তার। ভগবান যদি আছ কোথাও, তবে সাড়া দাও না কেন? চোর-চোর খেলার লুকিয়ে থাকা খেলুড়িও তো টু দেয়। সেরকম কিছু? একটা টু শব্দও কি শোনা যাবে না কখনও? এই নির্জন মধ্যরাতে তিনি যদি থেকেই থাকেন— একবারও কি এই তাপিত হৃদয়ের ডাকে দৈবের বাণীর মতো বলে উঠবেন না, আমি আছি?

নাকি নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি নিজেও নিশ্চিত নন? তাঁরও কি সংশয় হয়, আমি কি আছি, না নেই?

সিঁড়ি ভেঙে কে উঠে আসছে ওপরে?

বিরক্ত হল অমল। এই মধ্যরাতের নির্জনতায় সে তার অস্তিত্বকে খুঁজছে। বড় জরুরি তার প্রয়োজন। এই নিবিড় গভীর ধ্যানমগ্নতায় কেউ এসে হানা দিয়ে শতেক প্রশ্ন করলে সে খানখান হয়ে যাবে। বড় ভঙ্গুর সে, বড়ই পলকা। কোনও অজুহাত নেই তার। কোনও ব্যাখ্যাই নেই তার আচরণের যা লোকে গ্রহণ করবে।

একটা ঝংকার আশা করেছিল অমল। কিন্তু মোনা আজ সেরকমভাবে ঝংকার দিল না। উঠে এসে নিঃশব্দে তার পাশে দাঁড়িয়ে— কে জানে কেন— কাঁধে নরম করে হাত রাখল। তারপর কোনও প্রশ্ন না করে নরম গলায় বলল, ঠান্ডা লাগবে। ঘরে চলো।

খুব অবাক হল অমল। মোনাকে সে বাস্তবিক বাঘের মতো ভয় পায়। কিন্তু ইদানীং মোনার ব্যবহার— হোক কৃত্রিম— খুব বন্ধুর মতো, বুঝদার সাথীর মতো। কোনও প্রশ্নই করল না, কৈফিয়ত চাইল না।

অনিচ্ছুক অমল এই বন্ধুত্বপূর্ণ আহ্বানকে অপমান করল না। ঘাড় নেড়ে বলল, চলো।

ঘরে এসে একটু হাঁফ ধরছিল অমলের। খোলা ছাদে এতক্ষণ প্রচুর অক্সিজেন পেয়েছে সে। বন্ধ ঘরে সেটা নেই।

মোনা দরজাটা বন্ধ করে তার দিকে ফিরে বলল, ঘুম না এলে শোওয়ার দরকার নেই। বসে বসে বরং লেখো।

বিস্মিত অমল বলল, লিখব?

আমি জানি, তুমি লিখতে ভালবাসো। আর যদি ঘুম পেয়ে থাকে তো শোও, আমি তোমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিই।

অমল মাথা নেড়ে বলল, না, আমি বরং অন্ধকারে একটু বসে থাকি। চুপচাপ।

তাই থাকো। আর দরকার হলে আমার সঙ্গে কথাও বলতে পার।

এত সহৃদয়তা আশাই করেনি অমল। ঠিক বটে, আজকাল তার সঙ্গে মোনার সমঝোতা চমৎকার। তবু এতটা বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা নয়। সে বড্ড অবাক হল। তারপর বলল, না, তুমি ঘুমোও। আমারই দোষ হয়েছে মাঝরাতে হঠাৎ ছাদে যাওয়ায়। তুমি হয়তো ভাবছিলে।

দোষ হবে কেন? ঘুম না এলে লোকে তো খোলা জায়গাতেই গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এখন বেশ শীত। এই ঠান্ডায় ছাদে যাওয়াটা বিপজ্জনক।

বুঝেছি। আচ্ছা আমি ঘরেই বসছি বরং।

কফি খাবে?

কফি? এত রাতে কোথায় পাবে?

কোনও অসুবিধে নেই। একটু আগেই বাবা উঠেছেন। ওঁর ঘরে গিয়ে পাঁচ মিনিটেই করে আনব।

অমল অবাক হয়ে বলে, বাবা উঠেছে? চারটে বেজে গেছে নাকি?

কখন। এখন চারটে কুড়ি।

ওঃ, তাহলে তো ভোরই হয়ে গেল।

কফি করে আনি?

আনবে?

বলে একটু দ্বিধা করল অমল। মোনাকে সে পারতপক্ষে কোনও কাজের কথা বলে না।

একটু বোসো। নিয়ে আসছি। বাবাও এ সময়ে কফি খান!

অমল বসে রইল ফাঁকা ঘরে। ছাদ থেকে এসে ঘরে ঢুকতেই সে ঘরের মধ্যে একটা বাসি গন্ধ পেয়েছিল। ভ্যাপস, গা গোলানো গন্ধ। থাকলে পাওয়া যায় না, কিন্তু হঠাৎ বাইরে থেকে এসে বন্ধ ঘরে ঢুকলেই টের পাওয়া যায়, মানুষের শরীরও কিছু দূষণ ছড়ায়।

উঠে সে চোখেমুখে ঠান্ডা জল দিল।

হঠাৎ শুনতে পেল, নীচে মোনা তার শ্বশুরের সঙ্গে কথা কইছে। কী কথা তা বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে মোনার হাসির শব্দে বোঝা যাচ্ছে দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা সৌহার্দ্যপূর্ণ। এসব একটু আজগুবি লাগছে অমলের। কিছুদিন আগেও ছবিটা ঠিক এরকম ছিল না। তাদের বাড়ির লোকজন সম্পর্কে মোনার ধারণা ছিল, এরা একেবারেই আনকালচার্ড, ঝগড়ুটে, নিন্দুক এবং অন্যের ব্যাপারে বড্ড বেশি নাক গলায়। মহিম রায়কে সে একজন ব্যক্তিত্বহীন, অপদার্থ, নির্বোধ লোক বলেই জানত। কথা বলার প্রয়োজনটাও বোধ করত না। ধারণাটা কি পালটে গেল এত তাড়াতাড়ি? নাকি মোনা নিজের ভিতরকার সাপগুলোকে ঝাঁপিতে বন্ধ করে রেখে প্রাণপণে কৃত্রিমভাবে সমঝোতার চেষ্টা করছে? কারণ মানসিকতা এমনিতে তো পালটায় না। তার একটা পদ্ধতি আছে। যাকে প্রসেস বলে। মোনা তেমন কোনও পদ্ধতির ভিতর দিয়ে যায়নি। কিন্তু সে তার বাইরের আচরণ অনেক বদলে ফেলেছে। সেটা কিছু কম কথা নয়। অভিনয় তো অমলও করে যাচ্ছে। সে জানে, এই বয়সে মোনা তাকে ছেড়ে চলে গেলে তার জীবনের ছকটা পালটে যাবে এবং সেটা মোটেই ভাল হবে না। সব সংসারেরই একটা প্যাটার্ন থাকে, প্রেম না থাকলেও। আর সেটাই আসল। সেই ছকটা হঠাৎ হাটকে-মাটকে গেলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় সেটা সহজে ভরে তোলা যায় না। বন্য, বিশৃঙ্খল জীবন থেকে মানুষ যে সংসার বা পরিবার গড়ে তুলেছিল তা তো এমনি নয়। পরিবারই তাদের রক্ষাকবচ, অনেক মারের

হাত থেকে ওই পরিবারই তো রক্ষা করে। প্রেম-প্রেম করে পাগল হওয়ার চেয়ে পরিবারের অবরোধটিকে দৃঢ় করে তোলাই বরং বুদ্ধিমানের কাজ।

একটু বাদে মোনা যখন কফি নিয়ে এল তখন টেবিলে মাথা রেখে অমল ঘুমিয়ে পড়েছে।

মোনা তার মাথায় আলতো হাত রেখে বলল, কফি এনেছি।

চটকা ভেঙে উঠে অমল একটু লজ্জার হাসি হাসল, বলল, হঠাৎ একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল।

তা তো আসতেই পারে। কফিটা খেয়ে ঘুমোও।

মাথা নেড়ে অমল বলল, না, আর ঘুমোব না।

জপতপ করবে বুঝি?

অমল ফের একটু লাজুক হাসল, করে দেখছি যদি কিছু হয়।

মোনা একটুও বিদ্রূপ না করে বলল, করলে তো ভালই।

অমল হঠাৎ অবাক হয়ে ভাবল, তার বউ মোনা আস্তিক না নাস্তিক তা সে জানে না। এতকাল ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের পরও ব্যাপারটা তার জানা হয়নি। কেন হয়নি তাও সে জানেনা। তবে তাদের বাড়িতে কোনও ঠাকুরের আসন-টাসন নেই, ঠাকুর-দেবতার ছবিও নেই। তারা কখনও কোনও ধর্মীয় আচরণ করে না। ওসব নিয়ে কথাও হয় না তাদের। ঈশ্বর প্রসঙ্গই তাদের কাছে বহুকাল যাবৎ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে আছে।

সে মোনার দিকে চেয়ে বলল, তুমি বোধহয় এসব মানো না, না?

মোনা করুণ চোখে তার দিকে চেয়ে ছিল। বলল, কী জানি, কখনও তো ভেবে দেখিনি।

তার মানে কি মোনা?

প্রয়োজন না হলে কেউ কি ভগবান নিয়ে ভাবে? আমার বাপের বাড়িতে সবাই খুব নাস্তিক ছিল। মা, বাবা, সবাই। কিন্তু তর্কবিতর্ক ছিল না।

কিন্তু আমাদের বিয়ের সময় তোমাদের বাড়িতে সবই তো মানা হয়েছিল।

হ্যাঁ, তাও হয়েছিল। ওই যে বললাম, কোনও বিতর্ক নেই। প্রয়োজন হলে সব প্রথাই মানা হয়, নইলে নয়। বিয়ের পর দেখলাম তুমিও কিছু মানো না, তাই আমিও কিছু মানিনি আর।

কিন্তু এই যে এখন আমি জপতপ করি, এতে তোমার হাসি পায় না তো!

না। বরং মনে হয়, এটা বোধহয় তোমার দরকার।

দরকার কথাটা ভাল বুঝল না অমল। দরকার মানে কী? বাচ্চাদের যেমন ভুলিয়ে রাখার জন্য খেলনার দরকার হয় এটা কি তেমন? না কি খিদের মুখে যেমন খাদ্যের দরকার তেমন? নাকি বৈজ্ঞানিকের যেমন সত্য বা বস্তুর মূলে যাওয়ার দরকার, তেমন? আসল কথা কী, বস্তুটা নেই, কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য ওরকম একটা অলীক কিছু নিয়ে পড়ে থাকা?

এই সংশয় তাকে ছাড়ে না। তাই তো মধ্যরাতে লেপের ওম, ঘরের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে ছাদে যাওয়া। সে ছাদ অবধিই মাত্র যেতে পেরেছিল। অনেকে আরও দূরে যায়। সন্ন্যাস নিয়ে, বিবাগী বা পাগল হয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে। যায়, অনেকেই যায়, মনের ভূত যাদের তিষ্ঠোতে দেয় না।

তার সঙ্গে মোনার একটা লুকোচুরি আছে। বরাবর ছিল, এখন আরও বেশি আছে। তারা আর লড়াই করছে না বটে, কিন্তু সাবধানে পরস্পরকে নজরে রাখছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না। বিদ্রূপও করছে না। আক্রমণ করছে না আর। বরং তারা পরস্পরের সঙ্গে শরীরের সম্পর্কে আসছে, এক বিছানায় শুচ্ছে, অত্যন্ত ভদ্রভাবে কথা কইছে। কিন্তু এসব সৌজন্যের ফলে দূরত্ব কি বেড়ে যাচ্ছে আরও? দেঁতো হাসি, দাঁত নখ লুকিয়ে পরস্পর গাঁ-ঘেষাঘষি, এ কি কাছে আসা, না দূরে যাওয়া?

এসব বুঝতে আজকাল খুব শক্ত লাগে অমলের। তার কাছে ক্রমে এই সম্পর্কের জটিলতা আরও বাড়ছে। সে বিজ্ঞানের ছাত্র, গণিত ভালই জানে। যত শক্ত অঙ্কই হোক, তার একটা সমাধান আছেই আছে। কিন্তু সম্পর্কের গণিত মাঝে মধ্যেই আবছায়া হয়ে যায়, মাথা দিয়ে বোঝা যায় না, হৃদয় দিয়েও নয়। এ যেন পরস্পরের সামনে থেকেও, কাছাকাছি থেকেও কোনও দুরূহ কোণে বা আবডালে লুকিয়ে থাকা।

অসহায় মুখ তুলে অমল বলল, আমার যে জপতপ দরকার এটা তোমার কেন মনে হয় মোনা?

ইউ আর রেস্টলেস। তোমাকে আমি সবসময়ে একটা অস্থিরতায় ভুগতে দেখি। মেন্টাল প্রবলেম তোমার অনেকদিনের। আমি ভাবতাম পারুলের সঙ্গে তোমার লাভ অ্যাফেয়ারের জন্যই বোধহয় ওটা হয়।

এখনও কি তাই ভাবো?

কী ভাবব তা বুঝতে পারি না। তুমি তো কখনও আমাকে সব কথা খুলে বলো না। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, তুমি আর ইয়ংম্যান নও। মাঝবয়সি। এ বয়সে ওসব অতীতের তত প্রভাব থাকার কথা নয়। তবে কিছু বলাও যায় না। শুধু দেখতে পাচ্ছি, তুমি আরও রেস্টলেস হয়ে যাচ্ছ। তোমার বন্ধু হওয়ার চেষ্টা তো আমি করেছি, তাই না? আমি তোমাকে বুঝবার চেষ্টাও করেছি।

অমল বড্ড লজ্জায় পড়ল এ কথায়। মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। ফর এভরিথিং।

লক্ষ করছি তুমিও আমাকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করছো। হয়তো ভালবাসারও চেষ্টা করছ। কিন্তু একটা ডিসকর্ডও আছে। বেসুরো কিছু। সেটাই বুঝতে পারছি না। সেটা কি পারুল? সে তো এখন তিনটে বাচ্চার মা। তাই না?

অমল সবেগে মাথা নেড়ে বলল, না মোনা, পারুল নয়।

তাহলে?

আমি ঠিক জানি না।

হয়তো জেনেও বলতে চাও না। তোমাকে অস্বস্তিতে ফেলব না বলেই আমি কখনও তোমার কাছে জানতে চাইনি। এখনও চাই না। তবে আমি চাই ইউ কাম আউট অফ দি স্টুপর। তার জন্য মেডিটেশন করতে হলে করো। মেডিটেশন ইজ এ গুড মেডিসিন। আমিও তো করি।

তুমি মেডিটেশন করো, আমি জানি। সেটা কীরকম মেডিটেশন মোনা, গড়লেস?

গড! মেডিটেশনের জন্য গডের কী দরকার?

দরকার নেই?

না তো!

তা হলে?

পৃথিবীসুদ্ধ লোক যে মেডিটেশন করছে তাতে কি ভগবানের দরকার হয় নাকি?

তোমাদের মেডিটেশনটা কেমন একটু বুঝিয়ে দেবে?

ইজি। মন থেকে সব চিন্তা, সব স্মৃতি, সব কথা তাড়িয়ে দিয়ে একদম শূন্য করে ফেলতে হয়। চিন্তাশূন্য, ভাবশূন্য, স্মৃতিশূন্য অবস্থায় সোজা হয়ে বসে থাকা। কমপ্লিট ব্ল্যাংক।

সেটা কি সম্ভব?

প্র্যাকটিস করতে হয়। প্রথমটায় হতে চায় না। ধীরে ধীরে রেগুলার প্র্যাকটিস করতে করতে ইট বিকামস ইজি।

তাতে কী হয়?

ইট ইজ এ ফ্রেশনার। মনটা ঝরঝরে হয়ে যায়, টেনশন থাকে না।

আমাকে শেখাবে?

শেখার কিছু নেই। জটিল বা শক্ত কোনও প্রক্রিয়া তো নয়। জাস্ট কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা। মনকে কিছুক্ষণ রেস্ট দেওয়া। নাথিং এলস।

অমল এই ধ্যানে খুব আকর্ষণ বোধ করল না। তার সমস্যা অত সহজ নয়। তবু সে বলল, ও কে। আই উইল ট্রাই।

তোমার জপতপও হয়তো খানিকটা তাই। মনটাকে বাস্তব জগৎ থেকে অন্য ট্র্যাকে ঘুরিয়ে দেওয়া।

অমল আবার খুব সরলভাবে প্রশ্ন করল, তুমি কি নাস্তিক মোনা?

ভেবেই দেখিনি কখনও। তবে এখনও ভগবানকে আমার দরকার হয়নি। যখন দরকার হবে তখন নাস্তিক থাকব কি না জানি না। আই অ্যাম কিপিং মাই ফিঙ্গারস ক্রসড। কিন্তু আমি নাস্তিক হলেই বা তোমার আস্তিক হতে বাধা কোথায়?

অমল জুলজুল করে চেয়ে ছিল মোনার মুখের দিকে। এই মহিলাকে সে একদম চেনে না। বড়ই অচেনা লাগছে এখন। দুজনের মাঝখান দিয়ে এখন যেন এক নিঃশব্দ অদৃশ্য নদী বয়ে যাচ্ছে। সাঁকোহীন, কূল-কিনারাহীন, অনন্ত।

তোমার কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

নিস্তেজ হাতে কফির কাপটা তুলতেও যেন ভার লাগছিল অমলের। গরম কফি খানিকটা চলকে পড়ল তার কোলে। ছ্যাঁকা লাগল।

কফি খেয়ে একটু ঘুমাও, বুঝলে?

ঘুমোব মোনা। তুমি শোও। আই অ্যাম সরি আই ডিসটার্বড ইওর স্লিপ।

তোমারও তো ঘুম হয়নি।

মোনা গিয়ে শুয়ে পড়ল।

কফির কাপ হাতে ভূতের মতো অভিভূত হয়ে বসে রইল অমল। জড়বৎ। কাপটা হাতে ধরা, কিন্তু চুমুক দিতেও মনে রইল না আর।

পিছনে বাগানের দিকে একটা কাশির শব্দ শোনা গেল। বাবা ফুল তুলছে।

কফির কাপটা নামিয়ে রেখে খুব সন্তর্পণে অমল এসে জানালার কাছে দাঁড়াল। বাইরে এখনও অন্ধকার। সাবধানে জানালার একটা পাল্লা খুলে সে বুক ভরে ঠান্ডা বাতাসে দম নিল। শুনতে পেল, খুব মৃদু শব্দে মোনার নাক ডাকছে। ইদানীং একটু মোটা হয়েছে মোনা, সেইজন্যই কি নাক ডাকছে? নাকি কোনও অসুখ!

হঠাৎ চমকে উঠল অমল। মনে পড়ল মোনা একদিন তাকে বলেছিল ওর কী একটা মেয়েলি অসুখ হয়েছে। অসুখের নামটা বলতে চায়নি। একজন বড় ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল অমলকে না জানিয়েই। কী অসুখ হয়েছে মোনার? তাকে বলতে চায়নি কেন? সেও তো জানতে চায়নি কখনও। মোনা কি মরে যাবে নাকি?

হঠাৎ ভীষণ অস্থির বোধ করল অমল। ভীষণ।

সত্তর

তার শরীর সংকেতময়। তার স্মৃতি নেই, বোধ নেই, মস্তিষ্ক নেই, কিন্তু শরীর আছে, আছে বিভিন্ন সংকেত। অতিশয় ক্ষীণ তার দৃষ্টিশক্তি, নিজের চারধারে কয়েক ফুট মাত্র দেখতে পায়, তার বাইরে সব আবছায়া। সে কখনও আকাশ দেখেনি, দিগন্ত দেখেনি, সে চেনে না সূর্যোদয়ের বর্ণ বা জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য। সম্পূর্ণ বধির সে, কোনও সংগীত বা শব্দই সে কখনও শোনেনি। কিন্তু গাছের একটি পাতা খসে পড়লেও তার সংকেত সে শরীরের মৃদু তরঙ্গে টের পায়। পাপ বা পুণ্য, ধর্ম বা অধর্ম কিছুই নেই তার। ভাল মন্দ নেই, অবসাদ নেই, আনন্দ বা বিষাদও নেই। আছে ক্ষুধা, এবং মেটানোর জন্য শ্রম ও ক্লেশ। আছে মরসুমি প্রজননও, যা আনন্দের চেয়ে অনেক বেশি ব্যধ্যতামূলক। হ্যাঁ, তার ভয় আছে, জৈবিক ভয়, যাকে সে সঠিক চেনে না কিন্তু টের পায়।

মাটির গভীরে আঁকা-বাঁকা এক গুহাপথ পেরিয়ে অপরিসর, অন্ধকার, কবোষ্ণ এক সংকীর্ণতায় সে তার দীর্ঘ শরীর গুটিয়ে নিস্তেজ শুয়ে আছে গভীর ঘুমে। স্বপ্নহীন এক অসাড় ঘুম। বাইরে শীত। তার শীতল রক্তের শরীরে শীতের সংকেত ধরা পড়লেই তাকে গভীর গুহায় চলে যেতে হয়। মরণের মতো ঘুম জড়িয়ে ধরে তাকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা লোপ পায়, ধীর হয়ে যায় রক্তের প্রবাহ, বিলম্বিত স্পন্দনে শরীর স্তিমিত হয়ে যায়। উপরে উত্তরের শীতল বাতাস বয়ে যায়, সে তার পাতালঘরে শরীরের অমোঘ সংকেতে শুয়ে থাকে। যখন শীত ঋতু শেষ হবে, উত্তপ্ত হয়ে উঠবে চরাচর তখন এই গহীন গভীর গহ্বরে ঠিক সংকেত আসবে শরীরে, ওঠো! জাগো! দীর্ঘ উপবাস ভঙ্গ করো, ছাড়ো খোলস, বয়ে যাও জলের ধারার মতো। গভীর ঘুমের ভিতর থেকে সে সংকেত পায়, জেগে উঠবার আর দেরি নেই।

তুমি হাত দেখতে পারো সুদর্শনদা?

আমার দোষ কী জানো দিদি? সব জিনিসই একটু একটু জানি। কোনওটাই পুরোপুরি জানি না। শেখার কি আর সময় পেলুম! একটা জিনিস হয়তো সবে মন দিয়ে শিখতে লেগেছি অমনি সেখান থেকে পাততাড়ি গোটাতে হল। আর শেখা হল না।

আহা, যা জানো তাতেই হবে। বলো না আমার হাত দেখে, পরীক্ষায় কেমন হবে।

ওসব কি বলতে পারি। পয়সাখের জ্যোতিষীরা ওসব বলে থাকে। খানিক ফলে, খানিক ফলে না। আন্দাজে বলা তো। ও ব্যাটারা জানেও না কিছু। তবে তোমার হাতের রেখা-টেখা ভাল, খারাপ হওয়ার কথা নয় দিদি।

যাঃ, ওরকম বললে হবে না। বেশ ভাল করে দেখে বলো।

বললুম তো, পরীক্ষায় কী হবে তা বলার মতো এলেম আমার নেই। ভার্গব জ্যোতিষীর কাছে শিখছিলুম একটু-আধটু। চেঁটিয়া লোক, সহজে তার কাছ থেকে বিদ্যে বের করা যায় না। শেখানোর জন্য বিস্তর ঝোলাঝুলি করতে হয়। তাও মাল ছাড়তে চায় না কিছুতেই।

ভার্গবটা কে?

নারায়ণগড়ের নাম শুনেছ?

না তো! সেটা আবার কোথায়?

খড়গপুর থেকে কাঁথির রাস্তায়। বর্ধিষ্ণু গাঁ।

তুমি সেখানেও ছিলে নাকি?

বছরটাক থাকতে হয়েছিল। সেখানকার ইস্কুলে আমার এক মামাতো ভাই ছিল মাস্টারমশাই। কোথাও সুবিধে হচ্ছিল না বলে তার কাছে গিয়ে জুটেছিলাম। সে তখনও বিয়ে-টিয়ে করেনি, দিব্যি ছিলাম দু ভাইয়ে। ইস্কুলেরই অফিসঘরে রাতে বিছানা করে শুতুম। আমার কাজও জুটে গিয়েছিল। হোস্টেলে রান্না করতুম দু বেলা।

তোমার বেশ কালারফুল লাইফ, না সুদর্শনদা?

সুদর্শন লাজুক হেসে বলে, তা বটে দিদি। পেটের দায়ে ঘুরেছি বটে, কিন্তু তাতে ঠকিনি। মেলা মানুষ দেখেছি, মেলা দৃশ্য, কত কাণ্ডকারখানা। মাঝে মাঝে একা একা বসে সেসব খুব ভাবি।

নারায়ণগড়ে কী হয়েছিল বললে না?

হ্যাঁ, সে কথাই বলি। ইতিহাসের মাস্টার ছিলেন কামাক্ষাবাবু। বিষয়ী লোক। জমিজিরেত ছিল। সুদ আর বন্ধকীর কারবার করে বেশ ফুলেফেঁপে উঠেছিলেন। কাঁথিতে একটা সোনার দোকান করে বড় ছেলেকে বসিয়ে দিলেন। ওসব লোকেরই আবার জ্যোতিষীর দিকে টান থাকে খুব। সব রক্ষে হয় কিনা, কারবার আরও বাড়ে কিনা, বিপদ-আপদ হয় কিনা, নানা দুশ্চিন্তায় ভোগে তো। তা তার বাড়িতেই এসে থানা গাড়ল ওই ভার্গব জ্যোতিষী। সবাই বলত মস্ত সিদ্ধাই। তা বলব কী দিদি, দু-চারটে মোক্ষম কথা বলেও ফেলত। নিমাই জানার গোপন রোগ ছিল, কেউ জানত না, ফস করে পাঁচজনের সামনে ভার্গব ফাঁস করে দিলে। গুণধরবাবু তার বউকে নিয়ে গিয়ে সবে পেন্নাম করে বসেছেন, ভার্গব বলল, উটি কে গো তোমার সঙ্গে গুণধর? গুণধর বলল, আজ্ঞে আমার বউ। ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়ে ভার্গব বলল, ও তোমার বউ হতে যাবে কেন, ও তো অন্যের বউ। কী লজ্জার কথা বলো পাঁচজনের সামনে! কিন্তু বউটা তখন হাউরেমাউরে করে কেঁদে গিয়ে ভার্গবের পায়ে পড়ল। তখন জানা গেল, সে সত্যিই বালেশ্বরে স্বামী সন্তান ছেড়ে গুণধরের সঙ্গে দশ বছর আগে পালিয়ে এসেছিল।

এরকম একজন জ্যোতিষীই তো আমার এখন দরকার।

জ্যোতিষী বললে ভুল হবে। এ হল সিদ্ধাই, বুঝলে?

সিদ্ধাই আবার কী?

সে আছে। তুমি অত বুঝবে না। নিচুতলার সাধক আর কী। ওই যেসব মারণ-উচাটন, বশীকরণ করে ওরাই হচ্ছে সিদ্ধাই। পয়সার লোভে, মেয়েমানুষের লোভে শেষ অবধি স্বখাত সলিলে ডুবে যায়।

ভার্গবেরও কি তাই হয়েছিল?

তা জানি না দিদি। তবে ওরকমই হয় বলে শুনেছি। ওদের পাল্লায় যারা পড়ে তাদেরও ভাল হয় না। আমিও একটু পড়েছিলাম কিনা।

তুমি কীভাবে পড়লে?

আমিও গিয়ে জুটেছিলাম তার কাছে। বেশি কিছু আদায় করতে পারিনি ঠিকই, তবে লোকটা আমাকে হাত দেখতে শিখিয়েছিল। বেশ শিখেওছিলাম খানিকটা। একদিন আমাকে বলল, দ্যাখ, এসব কিন্তু ফক্কিকারি। খানিক মিলবে, খানিক মিলবে না। এ বিদ্যে কেউ পুরোটা জানে না। খানিকটা খানিকটা জেনে ওপরটা ওপরটা বলে। তোকে যেটুকু শিখিয়েছি তাই দিয়ে করেকম্মে খেতে পারবি। যা, লেগে যা।

তুমি কি জ্যোতিষীগিরিও করেছ নাকি?

না দিদি। সেসব করিনি। অন্তত পয়সা রোজগারের জন্য করিনি। নারায়ণগড় থেকে আমাকে পালাতে হল।

ওমা! কেন?

সে তোমাকে বলা যাবে না।

কেন বলা যাবে না?

ওসব কথা তোমার শোনার মতো নয়।

বুঝেছি।

কী বুঝলে দিদি?

বোধহয় কোনও মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলে, তাই না?

খুব লজ্জা পেয়ে সুদর্শন বলল, ওরকমই ধরে নাও।

আহা, যখন ধরেই ফেলেছি তখন বলেই দাও না।

তুমি তো ছোট মেয়ে, তোমার কাছে কি ওসব বলতে আছে?

খুব খারাপ কথা নাকি?

না দিদি, খুব খারাপ কিছু নয়। আমি বরাবর ধর্মভীরু মানুষ। তবে বুদ্ধিটা কাঁচা। নানারকম ফেরে পড়ে নাকাল হতে হয় বুদ্ধির দোষে।

তাহলে বলতে দোষ কী?

আমি তো আহাম্মক, সবাই জানে। আর সেজন্যই ভবঘুরেমিও কাটল না আমার। তা এ সেই আহাম্মকিরই গল্প, বুঝলে?

আর ভূমিকা করতে হবে না। বলো তো!

নারায়ণগড়ে যে ইস্কুলে আমি কাজ করতাম সেটাতে ছেলে মেয়ে একসঙ্গে পড়ত। গাঁয়ের মেয়ে তো, সব বেশি বয়সে ছোট ক্লাসে পড়ত। একটা মেয়ে ছিল বেবি। ক্লাস নাইনে পড়ত। দেখতেও বেশ ছিল। স্কুলের দফতরির যক্ষ্মা হওয়ায় সে তখন দেশে গেছে। আমিই তার কাজ চালিয়ে নিচ্ছি তখন। ক্লাসে রোল খাতা বা নোটিশ নিয়ে যাওয়া, ঘণ্টা মারা থেকে বাগানে ঢুকে-পড়া গোরু-ছাগল তাড়ানো অবধি। তখন উঠতি বয়স, চেহারাখানা খারাপ ছিল না। তা ওই মেয়েটা একটু ঘুরঘুর করতে লাগল। ইস্কুল ছুটির পর একটা ভাইঝিকে কোলে নিয়ে চলে আসত ইস্কুলের মাঠে বেড়াতে। কথা-টথা হত।

বাঃ, বেশ রোমান্টিক ব্যাপার তো।

ভারী লজ্জা পেয়ে সুদর্শন বলল, কাঁচা বয়সের ব্যাপার তো, তাই বলতে চাইছিলাম না।

আরে দুর, এসব আজকাল জলভাত।

হ্যাঁ, তা ওই একটু ভাবসাব মতো হয়ে গিয়েছিল। তারাও বড্ড গরিব।

ব্রাহ্মণ ছিল কি মেয়েটি?

না না, তন্তুবায়।

কিন্তু তুমি যে আবার সাংঘাতিক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ।

ওই তো বললাম, কাঁচা বয়সে কি আর হিসেব থাকে?

তারপর কী হল?

গাঁ-দেশ তো, গাছের পাতা পড়লেও পাঁচকান হয়ে যায়। সুতরাং মেয়ের মা-বাপ এসে ধরল আমায় বিয়ে করতে হবে।

রাজি হলে বুঝি?

গাঁইগুঁই করেছিলাম। বংশে কেউ অন্য জাতে বিয়ে করেনি, ঘরে কথা হবে। কিন্তু সবাই এমন ধরে পড়ল যে না বলতে পারিনি। এমনকী হেডমাস্টার বলল বিয়ে করলে চাকরি পাকা করে দেবে। তাই লোভে পড়ে নিমরাজি হতে হল। এরকম যখন অবস্থা তখন ভার্গব গোঁসাই গায়ে জমিয়ে বসেছে। সেই সময়কারই ঘটনা। তুমি কি মানো দিদি, যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব ঘটে?

তাই হবে বোধ হয়।

যাই হোক, এক বর্ষাকালে ভোরবেলা উঠে শুনলাম বেবিকে রাতে সাপে কেটেছে।

ইস! মরে গেল নাকি?

না দিদি। মরেনি। রাত দশটা না এগারোটায় সাপকাটি হওয়ায় তারা গিয়ে ভার্গব গোঁসাইকে ধরে আনে। আর ভার্গব গোঁসাই নাকি সাধনপ্রক্রিয়া করে বিষ টেনে নিয়েছে নিজের শরীরে। গাঁয়ে হইচই, বেবিদের বাড়িতে লোক ভেঙে পড়েছে। কিন্তু সাপকাটি আমি খুব ভাল চিনি। আদাড়ে-পাদাড়ে ঘুরে এসব জ্ঞানগম্যি ভালই হয়েছে। সাপুড়েদের সঙ্গেও তো কম টো-টো করিনি। সাপ ধরতেও পারি।

অবাক হয়ে পান্না বলে, পারো? সোজা ব্যাপার দিদি, সাহস করলেই শেখা যায়।

ধরেছ কখনও?

অনেকবার।

মন্ত্রতন্ত্র আছে, না?

আছে, তবে সেগুলো কোনও কাজের নয়। আসল কথা হল, কায়দা কৌশল রপ্ত করা। নইলে মন্তর জানলে কিছু হবে না।

বেবির বাড়িতে গিয়ে কী দেখলে?

সে খুব সাংঘাতিক ব্যাপার। বেবিকে কলাপাতায় শোয়ানো হয়েছে। চোখ বোজা। মুখ-টুখ কেমন যেন ফোলা আর লাল। পায়ে বাঁধন। কাটির জায়গাটা কী একটা পাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। প্রথমে একটু থতমত খেলেও আমার একটু সন্দেহ হল। ওর মাকে বললাম, কাটার জায়গাটা দেখাতে। তা তিনি বললেন, ভার্গব গোঁসাই নাকি নিষেধ করে গেছে। হাওয়া লাগলে খারাপ হবে। কিন্তু সাপকাটির কেস আমি অনেক দেখেছি। বিষধর কামড়ালে অন্য চেহারা হওয়ার কথা। তারপর শুনলাম গভীর রাত অবধি নাকি ঘর বন্ধ করে ভার্গব গোঁসাই কীসব প্রক্রিয়া করেছে। শুনে মাথাটা একটু গরমই হয়ে গিয়ে থাকবে। নিষেধ না শুনে আমি এক ঝটকায় পাতাটা সরিয়ে দেখলাম চারটে দাঁতের দাগ। বিষধর নয়, জলঢোঁড়া বা হেলে কিছু একটা কামড়েছে।

কিন্তু সেকথা বলবই বা কাকে বলে! বাড়ি বাড়িসুদ্ধু লোক ভার্গব গোঁসাইয়ের কেরদানি দেখে একেবারে ভাবে ভোর হয়ে আছে। এত বড় গুণীন যে আর হয় না তা গাঁয়েও বলাবলি হচ্ছে। তা সে না হয় হোক। সব বজ্জাত গুণিন আর ওঝা তো এভাবেই হাতযশ বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু আসল কাণ্ড হয়ে বসেছে অন্য জায়গায়। আর সেটাই তোমাকে বলা যাবে না।

পান্না একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, তুমি না বললেও বুঝেছি।

বুঝেছ? ও বাবা, তোমার খুব বুদ্ধি।

এ আর না বুঝবার কী আছে। বেবিকে ভার্গব গোঁসাই রেপ করেছিল তো!

বড় লজ্জার কথা দিদি। পাষণ্ডটা নাকি বুঝিয়েছিল ওটাও একটা প্রক্রিয়া।

বেবি কথাটা বিশ্বাস করেছিল বুঝি?

গাঁয়ের মেয়ে, মাথায় তো বুদ্ধির ব-ও নেই। তার ওপর সাপের কামড়ে মাথাটারও ঠিক ছিল না। বুদ্ধিনাশ হলেই তো মানুষের সর্বনাশ কিনা। আমি রোজ সকালে জপতপের পর ঠাকুরের কাছে একটা জিনিসই চাই। বুঝলে! শুধু বলি, বাবা, আপৎকালে যেন বুদ্ধিনাশ না হয়, দেখো। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশতি।

তুমি লোকটাকে কিছু বললে না?

না দিদি। আমি মাথা-পাগলা লোক বটে, কিন্তু মাথা-গরম মানুষ নই। আমি যেন দেখতে পেলাম এই ঘটনার ভিতরে আমার মুক্তির পথ খুলে গেছে। যা কিছু সব ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই তো ঘটে।

মেয়েটাকে ফেলে পালালে বুঝি! ছিঃ সুদর্শনদা, তাহলে কিন্তু তোমাকে ভাল লোক বলা যায় না। তোমার উচিত ছিল মেয়েটাকে উদ্ধার করা।

ভাল লোক আর হতে পারলাম কই বলো! আর এ কথাও ঠিক যে পালানোর ইচ্ছেও ছিল। সেটা বুঝতে পেরেই বোধহয় পাঁচজনে আমাকে চেপে ধরল, শুভস্য শীঘ্রম, তাড়াতাড়ি বিয়ে সেরে ফেলতে হবে। ভার্গব গোঁসাইও খুব চাপাচাপি শুরু করল। বেবিও খুব গোঁ ধরল। শেষে আমি পালাতে পারি ভেবে আমাকে ইস্কুলের এক ঘরে শেকল তুলে রাখা হতে লাগল। দিনরাত চোখে চোখে রাখা হত।

ও বাবা! তুমি কী করলে?

কী আর করব দিদি? ওই অবস্থায় তো করার কিছু ছিল না। শুধু ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। বললাম, ঠাকুর, বুদ্ধিনাশ যেন না হয়। চারদিন বাদেই বিয়ে। একদিন ভার্গব গোঁসাই এসে চোখ পাকিয়ে বলে গেল, পালিয়েও বাঁচবি না, আমার অভিসম্পাত তোকে ধাওয়া করবে। রক্তবমি হয়ে মরবি। আমি বললুম, কিন্তু আমার দোষটা কী? সে বলল, দোষ নয়? বাগদত্তাকে বিয়ে না করলে সে মহাপাতক হয়। তখন আমি বলেই ফেললাম, গোঁসাই, মেয়েটাকে তো বিষধর কামড়ায়নি, কামড়েছিল ঢোঁড়া, বিষধর কামড়ালে কী করতে ওস্তাদ? পারতে বিষ নামাতে? লোকটা কী বলল জানো? এক গাল হেসে বলল, পারতাম না। কিন্তু তাতে কী? লোকে তো জানে আমি পারি। ওতেই হবে। তারপরও আমি বললাম, মেয়েটাকে নষ্ট করলে কেন? তার জবাবে বলল, ওরে, শিবের এঁটোকে এঁটো ধরতে হয় না।

কী বদমাশ!

হ্যাঁ দিদি। বদমাশ বটে, তুখোড় বুদ্ধিমানও বটে।

তুমি কী করলে?

ওই যে বললাম, ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। সেই রাতে সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টি নামল। বুঝলে দিদি, ভগবানের ওপর নির্ভর করে দেখো, কেমন সব অশৈলী কাণ্ড হয়।

আহা, তোমার কী হল তাই বল না।

বৃষ্টির তোড়ে চারদিক ডুবে গেল। আশপাশের লোক বাড়িঘর ছেড়ে এসে উঁচু স্কুলবাড়িতে উঠল। আমার ঘরের দরজায় শেকল তুলে পলকা একটা তালা দিয়ে রেখেছিল। তারাই সব শেকল-টেকল উপড়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। মেলা লোক। সেই রাতে আর পালানো হল না ঠিকই। কিন্তু ডামাডোলে খুব সুবিধে হয়ে গেল। দু দিন বাদে জল নামতেই খঙ্গপুরের বাস ধরে একরাতে পালিয়ে এলাম। আর ওমুখো হইনি।

কিন্তু মেয়েটার কী দোষ বলো!

দোষঘাটের কথা নয় দিদি। আমিই কি আর ভাল? তবে সব ঘটনা থেকেই একটু একট শিক্ষা নিতে হয়।

হ্যাঁ সুদর্শনদা, হাত দেখার কথাই তো হচ্ছিল। দেখই না বাপু হাতখানা আমার।

থাক দিদি, দিনের বেলা দেখে দেবখন। চালসে ধরার পর সন্ধে লাগলেই চোখটা একটু ধোঁয়াটে মেরে যায়। তবে আগেই বলে রাখছি, ও বিদ্যে আমার পুরো জানা নেই।

বলে সুদর্শন উঠতে যাচ্ছিল, এক গাল হেসে বলল, ওই দেখ কে এসেছে! এসো দিদিমনি এসো! সেদিনকার মতো বেগুনি খাবে নাকি?

সোহাগ হেসে বলল, আমি বেশ পেটুক হয়ে গেছি আজকাল, না? সেদিন বড়মাও বলছিল, আমার নাকি আজকাল খুব রুচি হয়েছে। আসলে সোজাসুজি পেটুক বলছে না, মিন করছে।

পান্না গায়ের কাঁথাটা সরিয়ে উঠে বসল, তোমার জন্যই অপেক্ষা করে ছিলাম। কখন এসেছ?

কাল রাতে।

ওমা! আজ সারাদিন কেটে গেল, খবর দাওনি তো!

আজ সকাল থেকে পিসির সঙ্গে অনেক কাজ করেছি। পিসি খুব লোনলি তে। সারা সপ্তাহ আমার জন্য অপেক্ষা করে। আজ দুজনে মিলে অনেক কিছু করলাম।

কী করলে?

তিন চার রকমের আচার, মশলা পাঁপড়, হজমিগুলি। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।

তোমার সঙ্গে এখন সন্ধ্যাপিসির খুব ভাব, না?

হ্যাঁ! খুব। শি ইজ ভেরি লাভিং। আমাকে অনেক কিছু দিতে চায়।

কী?

ঘড়ি, গলার হার, নিজের সব গয়না। আমি বলি, ওসব এখন থাক। তুমি বুড়ো হলে নেব।

বোসো সোহাগ।

বসাই যাক। না বসে উপায় আছে?

ই-মেল পেয়েছ বুঝি?

হ্যাঁ তো। বলে মুখ টিপে হাসল সোহাগ।

এবারও ই-মেল কি সাংকেতিক?

তা ছাড়া কী? ওনলি ডেট অ্যান্ড টাইম।

তোমরা যেন কী! কেউ এক পা এগোবে না, একটুও আবেগ বা উচ্ছ্বাস নেই, কথাও তো বলো না। তোমাদের মধ্যে কী হচ্ছে বলো তো!

কী আবার হবে! কিছু হচ্ছে না। কোনও বোকা-বোকা ব্যাপার তো আমার সহ্য হয় না।

সে না হয় বাড়াবাড়ি না করলে, কিন্তু একটু মনের কথা জানাবে তো! নির্জনে গিয়ে দুজনে একটু বসতেও ইচ্ছে হয় না?

সোহাগ ফের সেইরকম মিষ্টি হেসে বলল, তাতে বা হবে? শুধু কতগুলো সিনেমাটিক ডায়ালগ। ও আমার অসহ্য।

বিজুদাটাও ঠিক তোমার মতো। এক জন্ম দেখে আসছি, কোনও মেয়েকে দেখেই কখনও হেলদোল নেই। একদম অনারোমান্টিক। এই প্রথম অনেক সাধ্যসাধনার পর দেখলাম তোমাকে অপছন্দ করছে না। কিন্তু রোমান্সের কী ছিরি বাবা। যেন দেবা তেমনি দেবী।

রোমান্সের কথা আসছে কেন? উই আর নট ইন লাভ।

উঃ, এমনভাবে বোলো না তো! আমার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা এসে পড়ে।

তুমি ভীষণ রোমান্টিক, না পান্না?

ওঃ, আমি যদি প্রেমে পড়ি তাহলে কথা বলে বলে তাকে পাগল করে দেব।

আর কী করবে?

নির্জনে গিয়ে বসব দুজনে, গল্প হবে, কথা হবে, কবিতা হবে, কোনও অসভ্যতা হবে না অবশ্য।

অসভ্যতা বলতে?

শরীর ছোঁয়া, চুমু এইসব।

ওসব অসভ্যতা বুঝি?

না হলেও স্থূল রুচির ব্যাপার। আবেগ ভাল, কিন্তু শরীর নিয়ে নয় বাবা।

তুমি একটু পিউরিটানও আছ।

হ্যাঁ। আমার আবার দুমদাম শরীরের লজ্জা ঝেড়ে ফেলতে আপত্তি আছে। কিন্তু তুমি তো আরও পিউরিটান।

না, পিউরিটান নই, আসলে ভসভসে আবেগ আমার একদম ভাল লাগে না। দেখবে দুজনে প্রেম করার সময় কত ভাভসে কথা বলে, বিয়ের পর তিন মাসও টিকতে পারে না। কেন জানো?

ওদের কোনও ইন্টিগ্রিটি নেই।

তার মানে কী আমাকে বুঝিয়ে দেবে?

মানে বুঝতে হলে তোমাকে সমাজবিজ্ঞান জানতে হবে। জানতে হবে মানুষের ইতিহাস। মানুষ কেন একস্ট্রীম ফ্রিডম থেকে জংলি জীবনে পরিবার, বিয়ে আর সমাজের দিকে ঝুঁকল তা জানো?

বলো না শুনি?

সেটা নরনারীর প্রেম থেকে নয়। প্রয়োজনে। তখন এরকম প্রেম-ট্রেম হত না তো। তার দরকারও ছিল না। দরকার ছিল বিশ্বস্ততা, দায়বদ্ধতা আর পারস্পরিক নির্ভরতার। একটা পরিবারের ভিতে প্রেমের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন এই তিনটে জিনিসের। মানো?

সে না হয় মানছি। কিন্তু একটু আবেগও থাকবে না, তা কি হয়?
ওই তিনটে না থাকলে আবেগটা বড্ড জোলো হয়ে যায়।

একাত্তর

বড়বউ যে তন্ত্রমন্ত্র জানে তা তো জানত না বাসন্তী। মন্দিরের ভিতরে যে কালীমূর্তি রয়েছে তেমনটা জন্মেও দেখেনি সে। চৌকোমতো বিশাল মুখ, অ্যাই বড় বড় চোখে কী ভীষণ দৃষ্টি, আর সবচেয়ে আশ্চর্যের হচ্ছে জিবখানা। লাল টকটকে রক্ত মাখা জিবখানা তিন হাত নেমে পেটের নীচ অবধি চলে এসেছে। সেই মূর্তির মুখোমুখি লালপাড় গেরুয়া রঙের ছালের শাড়ি পরা বড়বউ বাসন্তীর দিকে পিছন ফিরে বসা। মাথার চুল পিঠ ঝেঁপে নেমে এসেছে বন্যার মতো। কীসব মন্তর যেন বলছে বড়বউ, বাসন্তী কি আর মন্তর-তন্তর বোঝে! সে শুধু হাঁ করে চেয়ে দেখছে কাণ্ডখানা। আজ কী একটা সর্বনাশ যেন হবে। কী হবে তা জানে না বাসন্তী, শুধু তার বুকটা দৌড়চ্ছে খুব। ডুগডুগির মতো আওয়াজ হচ্ছে বুকের ভিতরে। বড়বউয়ের মুখখানা দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ভয়ে ভয়েও দেখতে বড় সাধ হচ্ছে বাসন্তীর। দেখলে হয়তো মূছাই যাবে। তবু না দেখেই বা থাকে কী করে সে? ভয়ে, দুশ্চিন্তায় তার চোখ ভর্তি জল, হেঁচকি তুলে তুলে ফেঁপাচ্ছে সে। ঠাকুর আমার কী হবে গো?

ঠিক এই সময়ে বড়বউ খুব ধীরে ধীরে মুখখানা ফেরাতে শুরু করল, মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে আছে বাসন্তী। কী দেখবে, কাকে দেখবে কে জানে, কিন্তু চোখ যে ফিরিয়ে নেওয়ারও সাধ্য নেই তার। ঘাড় শক্ত হয়ে আছে। হার্টফেল হবে নাকি তার?

এলোচুলে আধখানা ঢাকা মুখখানা যখন তার দিকে ফিরে তাকাল তখন বাসন্তী দেখতে পেল, বড়বউয়ের মুখখানা কী সুন্দর। যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা। কেমন পানপাতার মতো ডৌল, কী সুন্দর নাক, মুখ চোখ। কিন্তু চোখ দুখানা যেন জ্বলছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। অত বড় বড় চোখ যেন বাসন্তীকে ভস্ম করে দেবে।

বড়বউ একটু হেসে কঠিন হিমশীতল গলায় বলল, এসেছিস! তোর জন্যই বসে আছি। আয়, কাছে আয়... আয়,..

আর কাঁদতে কাঁদতে বাসন্তী হামাগুড়ি দিয়ে এগোবার চেষ্টা করছে। বড়বউ, তার কথা মান্যি না করলে উপায় আছে? বাসন্তী কি পারে মান্যি না করে ছুটে পালাতে? সে সাধ্যি তার নেই। কিন্তু সে কাঁদছে, ভীষণ কাঁদছে, আর এগোচ্ছে। কী হবে তা কে জানে। কোন সর্বনাশ!

ও দিদি, মাপ করে দাও, পায়ে পড়ি তোমার... ও দিদি...

নিজের চিৎকারেই ঘুম ভেঙে গেল বাসন্তীর। নিশুত রাতে, ধড়াস ধড়াস করছে বুক, গলা শুকিয়ে কাঠ, গাল বেয়ে চোখের জলের ভাসাভাসি। ঘুমের মধ্যেও কাঁদছিল সে। ভয়ে সে জবুথুবু হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তলপেটে হাত রাখল সাবধানে, বাচ্চাটার কোনও ক্ষতি হবে না তো ঠাকুর? রক্ষা করো। বাথরুমে অবধি যেতে পারছিল না ভয়ে।

শেষে মুক্তাকে ডেকে তুলল সে। মরণের বাবা না থাকলে মুক্তা এ-ঘরের মেঝেতে শোয়।

স্বপ্ন দেখেছ নাকি বউদিদি?

হ্যাঁ। ভীষণ খারাপ স্বপ্ন।

কাল শনিবারে একটু বারের পূজো দিও। এ অবস্থায় খারাপ স্বপ্ন দেখা ভাল নয়।

আর ভয় দেখাসনি বাপু, এমনিতেই ভয়ে মরে আছি।

ভয়, ভয় আর ভয়। এই বাচ্চাটা পেটে আসার পর থেকেই যেন কীসব হচ্ছে। এই নিয়ে তিন চারটে খারাপ স্বপ্ন দেখল গত এক মাসে। কী হবে কে জানে! ঠাকুর-দেবতাকে ডাকা ছাড়া সে আর কীই বা করতে পারে।

বড়বউকে এত ভয় কেন তার কে জানে!

ভয় যা আছে তা তার মনের মধ্যে আছে। ঝাঁপি না খুললে তো সাপ বেরোয় না। রসিকের বড় ছেলে এল, সে এসে থেকে গেল। ভয়-ভয় ভাব ছিল বটে বাসন্তীর। কিন্তু কেটেও গেল ভয়। ভারী ভাল ছেলেমেয়ে দুটো। সুমন তো তাকে শেষ অবধি মা ডেকে গেছে। দুজনের জন্য আজকাল মায়াও হয়েছে বাসন্তীর বুকের মধ্যে। কিন্তু বড়বউ তো আর ছেলেমেয়ে নয়। তাকেই তাই সবচেয়ে বেশি ভয়। বাসন্তী তো তার ভাগীদার, সতীন, চির-শত্তুর। তার সঙ্গে তো সহজে মিলমিশ হওয়ার নয়।

তবু বাসন্তী ভালমানুষের মতো মাঝে মাঝে মরণের বাপকে বলে, একবার দিদিকেও আনো না।

সুখে থাকতে কি তোমারে ভূতে কিলায় নাকি?

আহা, কী কথা! দিদিকে আমি ঠিক জল করে দেবো।

আর আহ্লাদের কাম নাই। তারে দেখলে তো ভয়ের চোটে সিটকাইয়া থাকবা, কাপড়ে-চোপড়ে হইয়া যাইব। তোমারে তো চিনি, এক নম্বরের ডরফোক।

আহা, দিদি তো আর ভয়ের জিনিস নয়।

হ্যায় যদি বাঘিনী, তবে তুমি হইলা মেচি বিলাই।

কথার কী ছিরি বাবা। আমার কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করে।

চাও তো লইয়া আমু, শ্যায়ে কপাল চাপড়াই।

তার চেয়ে একবার আমাকেই কলকাতায় নিয়ে চলো না। গিয়ে একটিবার প্রণাম করে আসি।

ইঃ, প্রণাম করনের লিগ্যা দেখি হাত খাউজ্যাইতাছে!

মরণের বাপ ওরকমধারাই নানুষ। মুখের আগল নেই। মনের কথা সব মুখে বলে ফেলে, জলের মতো। কিন্তু মনে একটু খটকা তো আছেই বাসন্তীর।

সে বলে, দিদির তো আমার ওপর রাগ থাকারই কথা। তার জিনিসে ভাগ বসিয়েছি না!

কার যে জিনিস হেইবে কেডা কইব? আমি হইলাম ফাটা বাঁশের মইধ্যখানে। মাইনকা চিপি আর কারে কয়। শুন তো ভালমাইনষের মাইয়া, তুমি একখানে, তাইন আর একখানে, মইধ্যখানে মেলা ফাঁক। ওই ফাঁকটুক ফাল দিয়া পার হওনের কাম নাই। বোঝলা বলদা মাইয়ালোক?

বাসন্তী যা বলে তা তার মনের কথা নয়। বড়বউয়ের সঙ্গে দেখা করার কৌতূহল থাকলেও আগ্রহ তার নেই। ভীষণ ভয় পায় সে। আর ভয়ই তার ঘুমের মধ্যে নানা দুঃস্বপ্ন হয়ে ফিরে আসে। তবু মুখে ওসবও সে

বলে, তার ভালমানুষিই তাকে দিয়ে বলায়। ভাবে, না বললে খারাপ দেখাবে। তার বর হয়তো ভাববে, সে বড়বউকে হিংসে করে।

ভালমানুষ হয়ে থাকার একটা নেশা আছে। বাসন্তী অনেক সময়ে তার বরের কাছে ইচ্ছের বিরুদ্ধেও ভালমানুষ সাজে। ওই একজনের চোখে সে মন্দ হতে চায় না কখনও। সে মানুষটার মাত্র অর্ধেক পেয়েছে, সেটুকুই আগলে রাখতে হবে তো। সম্পর্কটা তো অধিকারের নয়। মাকড়সা যেমন নাভির সুতোয় ঝুলে থাকে, এও যেন খানিকটা তাই। বাসন্তীর ভয় কি একটা! তার হাজারো ভয়। একটা ভয় থেকে আর একটা ভয় জন্মায়। তারপর ভয় যেন বিরাট বড় হাঁ করে গিলতে আসে।

ঠিক বটে, রসিক তাকে সুখে মুড়ে রেখেছে। ভালওবাসে খুব। তবু কেবলই মনে হয়, তারা কি আসল স্বামী-স্ত্রী? নাকি নকল? সাজা? যাত্রাপালার মতো মিথ্যে জিনিস? বাসন্তীর বুকে ডুগডুগি কি এমনি বাজে?

তার গর্ভে ওই লোকটার ছেলে হল, মেয়ে হল, আর একটাও আসছে, তবু কি আপন হল না লোকটা? তাহলে আর কীসে আপন হবে? মাঝে মাঝে আজকাল এই এক চিন্তা হয় তার। ওই যে এক না-দেখা বড়বউ আধখানা দখল করে আছে, ওই কাঁটাই মনের মধ্যে খচ খচ করে। আধখানা নয়, হয়তো আরও বেশিই দখল করে আছে বড়বউ। হয়তো সবটুকুই। তার মায়ের মুখে বিষ আছে বটে, কিন্তু হয়তো যখন বলে তখন মিথ্যে বলে না, তুই কি আর সত্যিকারের বউ! রাখা মেয়েমানুষের বেশি নোস, এই বলে রাখলুম, পরে বুঝবি।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সোজা পথে যায় না কখনও। মাঝে মাঝেই পাশ ফেরে, বাঁক নেয়। ঠিক নদীর মতোই। শুকিয়ে চর পড়ে যায়, আবার ভেসে যায় প্লাবনে। কিন্তু এ তো ঠিক দুজনের সম্পর্ক নয়। তাদের হল তিন জনের সম্পর্ক। বড়বউ যে ঠিক কেমন ধারা তা জানেই না বাসন্তী। ওই অজানের সঙ্গে সে বৃথাই লড়াই করছে হয়তো।

মাঝে মাঝে একা একা খুব কাঁদে বাসন্তী। আজও দুপুরে একা ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছিল খুব। পাশেই হাম্মি ঘুমিয়ে আছে। আজকাল তার খুব গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে। ছেলেমেয়ে দুটোর জন্য পারে না। নইলে আজকাল কেবলই মনে হয়, তার জীবনটা একটা ফক্কিকারি মাত্র। কিছু নেই তার, এই ইটকাঠের ইমারত, ক বিঘে জমি এর কি কোনও দাম আছে? মানুষটাকেই তো সে পায়নি।

হ্যাঁ লা বাসন্তী, সে কি তোকে কখনও অনাদর করে? দূর ছাই?

না না, তা করে না মানছি।

রাগী মানুষ সে, তবু কখনও তোর সঙ্গে উঁচু গলায় কথা কয়?

না, কখনও নয়।

তোকে কি অবিশ্বাস করে? তোর হাতে ছেড়ে দেয় না সব কিছু?

দেয় তো।

আর সোহাগ করে না? মন চেয়ে কথা কয় না?

সেও কয়, মানছি।

তবে তোর আর চাই কী?

তা কি আর আমি এই বোকা-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি?

মেয়েমানুষের কি বেশি চাইতে আছে? তারা তো নিজেদের বিলিয়ে দিতেই আসে। কত লাথিঝাঁটা খায়, কত উপপাস-কাপাসে দিন কাটায়, কত গঞ্জনা, কত গর্ভযন্ত্রণা সয়, কদিন সুখের মুখ দেখে বল তো একজন মেয়েমানুষ?

তা বইকী! জানি না বুঝি!

তাহলেই দেখ, অন্য সকলের মাপে তুই কি কিছু খারাপ আছিস?

অন্যদের যে ভাগীদার নেই!

কে বলল নেই? পুরুষমানুষ জাতটাই তো ছুঁকছুঁকে। তারা কি একটি নিয়ে থাকে? আর কেউ না জুটল তো বেশ্যাপাড়ায় যেতেও ছাড়ে নাকি?

উম্মা গো! কিন্তু আমার যে অন্য যন্ত্রণা।

যন্ত্রণা কীসের? বড়বউ?

সে নয় তো কে?

তোকে তো লুকোয়নি। দেখে-বুঝেই তো গলায় মালা দিলি।

বুঝলাম? বুঝলাম কোথায়! আমার বুঝি বুদ্ধি আছে?

বুদ্ধি ভাল জিনিস। তা বলে এটাই তো সব নয়। অত যে ভালবাসিস তার দাম নেই বুঝি?

ভালবাসার কী দাম বলো!

হ্যাঁ লা, তবে কি নিষ্কন্টক হতে চাস?

চাইলে?

সর্বনাশী! তুই নিষ্কন্টক হতে চাইলে যে বড়বউকে মরতে হয়! তাই চাস? তবে মা কালীর কাছে তার মরণ চেয়ে জোড়া পাঁটা মানত কর।

বাবা গো! ও কী কথা! আমি তাই বললাম বুঝি?

তুই চাইলে সে মরবে বোধহয়, কিন্তু তারপর আর সারা জীবন তোর বরের মুখের দিকে নিষ্পাপ চোখে তাকাতে পারবি কখনও?

চাইনি গো, চাইনি।

তাহলে কী চাস পষ্ট করে বল তো!

আচ্ছা, এমন বুঝি হয় না যে, সে আমাকে ভালই বেসে ফেলল।

বড়বউ?

হ্যাঁ।

তাই কি বাসে পাগল? দুনিয়াটা কি তোর হাতের মোয়া? যা চাইবি তাই বুঝি পাওয়া যায়!

আমি তো তার পায়ে পড়তেও রাজি।

পায়ে পড়লেই যদি সব হত, ওলো, দুনিয়াটা তোর মনের মতো হবে বলেই ধরে নিয়েছিস বুঝি? অত সোজা নয়। দুনিয়া তার নিয়মে চলবে, যতই তুই চোখের জল ফেলিস আর বুক থাবড়ে হা-হুতোশ করিস। বরং দুনিয়ার নিয়ম মেনে চল দেখি।

দুনিয়ার নিয়ম যদি বুঝতুম।

কিছু পাবি, কিছু ছাড়বি— এই হল নিয়ম। সবারই তো ভাগ আছে রে, সেইটে আগে বুঝে নে। যার যার হক্কের জিনিস তার তারটা তো ছাড়তেই হবে তোকে।

ওইটেই তো সইতে পারিনা। এই একটা জিনিসই তো নিজের মতো করে চেয়েছি। আমার বর।

শোন বোকা, খুব যে বর-বর করিস, হ্যাঁ লা সে যদি আজ মরে তবে তো তোর পাখিই উড়ে গেল।

ওম্মা গো! ও কী সর্বনেশে কথা! ওরকম বলতে আছে?

কেন, সে কি মরবে না একদিন, যেমন সবাই মরে? ভেবে দেখতে বলছি, তাকে যে খানিক পেয়েছিস বলিস, কেউ কি বরকে পুরো পায়? পুরো কেউ পেয়েছে আজ অবধি? সব ওই সিকি বা আধুলি, ষোলো আনা নয়।

কিন্তু সে তো আমাকে সবটুকুই পেয়েছে। দিইনি আমি নিজের সব কিছু তাকে? জান বেটে দিইনি?

ছাই দিয়েছিস। সে তোকে রাজরানি করে রেখেছে, গায়ে আঁচটি লাগতে দেয়নি, তাই তোর অত ভালবাসার দেখনাই। তার যদি চালচুলো না থাকত, এমন ভালবাসা না থাকত তখন দেখতুম কেমন তোর একবগ্গা পিরিত।

তোমার মুখে আগুন।

তাই দে, কিন্তু ওঠ, চুল বাঁধ, সাজুগুজু কর। ওসব করলে মন ভাল হয়ে যায়।

কান্নার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বাসন্তী।

ঘুম ভাঙল চেঁচানিতে।

বলি, আঁচলের আড়ালে ও কী নিয়ে যাচ্ছ গো ঠাকরোন?

তা দিয়ে তোর দরকার কী রে মাগী?

অ্যাই খবর্দার, ওসব খারাপ কথা বলবে না বলছি।

আহা, কী এমন বললুম! মাগীকে মাগী বলবে না তো কি মেসোমশাই বলতে হবে নাকি লা? বড়লোকের চাকরানি বলে কি পাখা গজিয়েছে?

কথা চাপা দিও না। আঁচলের তলায় কী দেখাও আগে।

তোর বাপের মাথা।

ঘুম ভেঙে ঝুম হয়ে বসে রইল বাসন্তী।

মুক্তার সঙ্গে মায়ের লেগেছে। দুজনে প্রায়ই লাগে। ছেলেরা আর ছেলেদের বউরা মিলে মাকে তাড়িয়েছে বটে, কিন্তু মা হল দু কান কাটা। এখনও ওই বাড়ির জন্যই তার যত টান। এ-সংসার থেকে যা পারে কুড়িয়ে বাড়িয়ে বা চুরি করে এখনও ও-বাড়িতে পাচার করা চাই। আড়ালে-আবডালে নাতি- নাতনিরা এসে দাঁড়ায়। কখনও কচুবনের আড়ালে, কখনও ঘাটে। ইশারায় কথা হয়ে যায়। মশলাপাতি, আনাজ, গম কি চাল, এক শিশি তেল, কলাটা মুলোটা যা পারে চুপি চুপি দিয়ে আসে।

মাঝে মাঝে বাসন্তী বলে, হ্যাঁ মা, শুধু তাদের ভালটা দেখলে, তোমার জামাইয়ের ভালটা দেখলে না? তারা যখন মারধর করে হিঁচড়ে পথে বের করে দিয়েছিল তখন তোমার জামাই-ই তো তোমাকে তুলে এনে রেখেছে। তবু এ-সংসারের দিকে তোমার টান নেই কেন? এত অবিচার কি ধর্মে সইবে?

বুড়ি তটস্থ হয় বটে, তবে হার মানে না। বলে, না খেয়ে মরছে দু চোখে দেখে থাকি কী করে বল? তোর তো ভাসাভাসি, না হয় দিলামই একটু খুদ কুঁড়ো।

তা দিতে হলে বলেই তো নিতে পারো। চুরি করে দাও কেন?

আহা, চুরি হতে যাবে কেন, আমার কি হক নেই! তুই পেটের মেয়ে নোস?

বিয়ে হলে মেয়ে পর হয়ে যায়, এ তুমি জানো না? খেয়ে পরে আছ, সেই ঢের। বেশি বায়নাক্কা দেখলে কিন্তু অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

শুনে মরে যাই, বলি মানুষের মতো কি রেখেছিস? গুদোমঘরটায় ইঁদুর বেড়ালের মতো পড়ে আছি, ও কি থাকা হল? ওদিকে দালানকোটার ঘরগুলো তো হাঁ-হাঁ করছে, দরদ থাকলে না হয় দিতি একখানা ভাল ঘর। পাঁচজনে দেখে যে মুখে থু-থু দিচ্ছে তোর। বড় মুখ করে আবার বলতে এয়েছে, খাওয়া-পরা দিচ্ছে। কুকুর-বেড়ালকেও লোকে দেয়, বুঝলি? অত বড়াই করতে হবে না, তোরটাই কি থাকবে ভেবেছিস? উড়ে পুড়ে আংড়া হবে একদিন, দেখিস, মেগে-পেতে খাবি।

শুনে বড় ভয় পেয়ে যায় বাসন্তী। মা তো নয়, ডাইনি, কোনও কথা মুখে আটকায় না। শাপশাপান্তকে বড্ড ভয় তার। যদি ফলে যায়! তাই আর কথা বাড়ায় না সে।

কিন্তু মুক্তার ওসব ভয়-টয় নেই। সে প্রায়ই ঝেড়ে কাপড় পরায় মাকে। এখনও তার ঝনঝনে গলা আসছিল উঠোন থেকে। তুমুল হচ্ছে দুজনে।

মায়ের জন্য রসিক ভাল ব্যবস্থাই করতে চেয়েছিল। মরণের পড়ার ঘরের পাশের ঘরখানা। দিব্যি বড়-সড় আলো-হাওয়ার ঘর। কিন্তু বাসন্তীই রাজি হয়নি। বলেছিল, ভাল ঘরদোর পেলে পেয়ে বসবে, আর কখনও ফিরে যেতে চাইবে না। আর মায়ের মন তো জানি, চোরাপথে ছেলেদেরও আনাগোনা শুরু হবে। জেনেশুনে ঘরে খাল কেটে কুমির আনতে পারব না। আতান্তরে পড়েছে, দুদিন ওই লাকড়ির ঘরেই থাক। নইলে পেয়ে বসবে।

কথাটা খুব মিথ্যেও বলেনি বাসন্তী। সে জানে তার দাদারা ওত পেতেই আছে। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

অশান্তি আর ভাল লাগে না বাসন্তীর। একে সে মরছে নিজের মনের হাজারো জ্বালায়।

সে বারান্দায় এসে দেখল, মা উঠোনের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে। আঁচলের আবডালে একটা ছোট ধামা গোছের কিছু। আর এদিকে মুক্তা, তার হাতে উঠোন পরিষ্কার করার ঝাঁটাখানা, সেইটে আস্ফালন করেই সে বলছিল, আর কত এ-বাড়ির সর্বনাশ করবে ঠাকরোন? তোমার চেয়ে কালসাপও ভাল।

মা উর্ধ্বমুখ হয়ে তার দিকে চেয়ে বলল, শুনলি লা আস্পদ্দার কথা!

বাসন্তী মুক্তাকে একটা ধমক দিল, চুপ কর তো মুক্তা। আর চেঁচামেচি ভাল লাগছে না।

মুক্তা ওপর দিকে চেয়ে বলল, যদি দানছত্তর খুলে থাকো তাহলে বলার কিছু নেই, এ-বাড়ির ভালমন্দের সঙ্গে জুড়ে আছি বলে বলি, নইলে আমার কী? গতকালও আড়াই কেজি গম গেছে ও- বাড়িতে। এই দেখ, আবার কী যায়। পটলি ছুঁড়িটাকে তো দেখলুম ওই হোথা কচুবনের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে আছে শেয়ালের মতো। নিত্যি আসে। বলি, বাবুর ভিটেতে কি ঘুঘু চড়াবে শেষ অবধি? দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পোষা বই তো নয়।

বড় হতাশ লাগে বাসন্তীর। কথা না বাড়িয়ে সে ঘরে চলে এল, যা হচ্ছে হোক, সে আর ওসবের মধ্যে থাকবে না।

আবার মনে হয়, সে কী কথা! কত বিশ্বাস করে, কত নির্ভরতায় নিজের রক্ত জল করা বিষয় সম্পত্তি তার হাতে দিয়ে বসে আছে লোকটা। বাসন্তীর কি দায় নেই? সে কি পারে সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিতে? এসব রক্ষে করার জন্যই না সে বহাল আছে এখানে!

বিকেলে সে গিয়ে শান্তভাবেই মাকে বলল, অনেকদিন তো হল মা, এবার বরং বাড়ি যাও।

তাড়িয়ে দিচ্ছিস নাকি লা?

মেয়ের বাড়িতে থাকা কি ভাল? খারাপ দেখাচ্ছে না?

সে আগেকার দিনে বড় বড় বাড়িতে ওসব মানত। আমাদের মতো হাঘরেদের আবার নিয়ম কী লা? কেন, জামাই কিছু বলেছে?

সে বলার মতো লোক নয়, তুমিও তা জানো। মিথ্যে কথা বলব কেন মা, আমারই ব্যাপারটা ভাল লাগছে না।

হ্যাঁরে, আমি তোর সৎমা?

তাই কি বললুম! বরং তোমাকে মাসে মাসে কিছু থোক দেবোখন, যদিও তোমার ছেলেরা টের পেলে কেড়ে নেবে। তবু বলি আলগা থাকাই ভাল।

বুঝেছি বাপু, বুঝেছি। তোর সুখের সংসারে আমার শ্বাসটুকুও তোর সহ্য হয় না, কী চোখেই যে দেখলি আমাকে কে জানে! তা তোর আর দোষ কী? তুই কি আর সেই বাসন্তী আছিস? মন্তর করে তোর মাথাটাই খেয়ে রেখেছে বাঙাল। নইলে নিজের গর্ভধারিণী মাকে এমন অচ্ছেদ্দা কেউ করে?

বলে মা কাঁদতে বসল, বাসন্তী জানে, কান্নাটা ও-মানুষের মধ্যেই আছে। চোখে জল এনে ফেলতে দেরি হয় না।

খুব ক্লান্ত গলায় বাসন্তী বলল, সে তুমি যা ভাল বোঝো ভেবে নিও, কিন্তু বাড়ি ফিরে যাও। শত হলেও সেটা তোমার স্বামীর ভিটে। জামাইয়ের বাড়িতে থাকলে লোকে দুয়ো দেবে।

বাসন্তী চলে এল নিজের ঘরে। মন ভাল নেই। সংসারের এইসব তুচ্ছ, সংকীর্ণ ব্যাপার তার আর ভাল লাগে না। মনটা বড় ক্ষ্যাপা হয়ে আছে।

আজ শুক্রবার। শনিবার তার মন ভাল হয়। তার বর আসে। দুটো দিন তার মন ভরে থাকে।

এবার এলে সে বরের কাছে সব বলবে। সব মনের কথা, ভয়ের কথা, মন খারাপের কথা। বলে বলবে, আমার কী হবে বলে দাও। আমি কি সত্যিই তোমার কেউ হই?

কই গেলা গো?

ভীষণ চমকে গেল বাসন্তী। কার গলা! আজ তো তার আসার কথা নয়।

দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকে দেখল, রসিক দুটো মস্ত ব্যাগ বারান্দায় নামিয়ে রাখছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নেমে আসছিল বাসন্তী। রসিক কাণ্ড দেখে চেঁচিয়ে উঠল, আরে কর কি পোয়াতি মানুষ? পিছলাইয়া পড়বা নাকি?

বাহাত্তর

সিঁড়ির শেষ ধাপটায় ঠিকমতো পা রাখতে পারেনি বাসন্তী। খন্দের মতো ফাঁকায় পা পড়ে শরীর টাল খেয়ে গেল তার। চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে দুর্বল শরীর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল নাচে, বারান্দার শানের ওপর। সতর্ক ও তৎপর রসিক একটা লাফ দিয়ে গিয়ে জাপটে না ধরলে বাসন্তীর সর্বনাশ লেখা ছিল কপালে।

দেখছ কাণ্ড! ওই রকম আথালি-পাথালি হইয়া লামতে আছে!

কিছুক্ষণ বাসন্তীর হুঁশ ছিল না। রসিক পাঁজা করে ধরে তাকে বসাল বারান্দায় তারপর নরম গলায় বলল, ভয় নাই, কিছু হয় নাই তোমার। চক্ষু মেইলা চাও তো!

বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিল বাসন্তী হাঁ করে। প্রথমটায় কথা বলতে পারল না। তারপর হাঁফ-ধরা গলায় বলল, কী হয়েছে গো আমার?

কিছু হয় নাই।

দু হাত বাড়িয়ে স্বামীর দুখানা হাত চেপে ধরে বলল, আমি কি রাখতে পারব ওকে? ও পেটে আসার পর থেকেই কীসব হচ্ছে বলো তো! এত ভয় করে আমার!

রসিক হেসে বলল, ভয়ই তো তোমারে খাইল। এত ডরানের কী আছে? লও, উপরে লও তো, তোমার কথা শুনি।

বাসন্তী এবার একটু স্বাভাবিক বোধ করছে। এই একটা লোক কাছে থাকলে তার ভয় ভীতি থাকে না, বলভরসা হয়। কিন্তু এ-মানুষটা কাছে না থাকলেই সে যেন কেমনধারা হয়ে যায়, পায়ের নীচে যেন মাটি থাকে না।

বাসন্তী সামলে নিয়ে বলল, তুমি ওপরে গিয়ে বোসো, আমি চা নিয়ে আসছি।

থোও ফালাইয়া চা। অখন উপরে লও। এক কাপ চা মুক্তাই বানাইয়া আনতে পারব।

ও বুঝবে না। গুচ্ছের চিনি দিয়ে ফেলবে, লিকার কড়া হয়ে যাবে। দামি চা নষ্ট করবে। আমার শরীর এখন ঠিক আছে, পারব।

তা হইলে আমি নীচেই বসি। চা লইয়া উপরে উঠতে গিয়া আর এক বিপত্তি বাধাইবা।

কিছু হবে না।

চা নিয়ে এসে বাসন্তী দেখল, রসিক গভীর চিন্তায় মগ্ন। হাত বাড়িয়ে চা নিয়ে বলল, বোঝলা, আমি একটা কথা ভাবলাম।

কী কথা?

যতদিন প্রসব না হইতেছে ততদিন তোমারে আর দোতলায় থাকতে হইব না। আইজই ব্যবস্থা করতাছি। কিছুদিন আর সিড়ি ভাঙানোর কাম নাই।

তাই বুঝি হয়! আমার সব যে ওপরে। পোশাক-আসাক, টাকাপয়সা, গয়নাগাটি।

আরে দূর। বিলিব্যবস্থা করতে লহমাও লাগব না।

অত ভাবছ কেন? তোমার গলা শুনে হঠাৎ দিশাহারা হয়ে নামতে গিয়ে পা-টা ফসকে গিয়েছিল। ও কিছু না। এবার থেকে সাবধান হব।

আমার গলা শুইন্যা তোমার ওইরকম বেজাহান হওয়ার কী হইল? আমি কোন বিলাত থিক্যা আইলাম?

লজ্জা পেয়ে বাসন্তী মুখ নামিয়ে বলে, তোমার কথা খুব বোধহয় ভাবছিলাম। তাই হঠাৎ—

রসিকের কঠোর মুখখানা হঠাৎ স্নিগ্ধ হয়ে গেল।

সে একটু হেসে বলল, আমি কোন নূতন গোসাঁই আইলাম যে আমার কথা ভাবছিলা, আবার দুঃস্বপ্ন দ্যাখছ নাকি?

দুঃস্বপ্ন! সে তো রোজ দেখি। তুমি যদি এ সময়টায় কিছুদিন আমার কাছে থাকতে! তুমি থাকলে কিচ্ছু হয় না।

তা হইলে যে কারবার লাটে উঠব। খাইবা কী? হরিমটর?

সেই তো ভাবি। কী যে করি।

ঠাকুর-দ্যাবতায় তো তোমার খুব বিশ্বাস! না! তাগো ডাকোনা ক্যান?

তারা বুঝি আমার ডাকে সাড়া দেয়? আমি পাপী না?

এইটা আবার কী কথা! তুমি পাপী হইলা ক্যামনে?

সে আছে।

পাপীরই তো ভগবানরে বেশি দরকার। কী কও? পতিতপাবন না কী জানি কয়।

সে ঠিক। তবে আমার ওপর কেন যেন চটা।

রসিক একটু হাসল। তারপর কোমল গলায় বলল, ভগবান যদি চেইত্যা যায় তবে হ্যায় আর ভগবান থাকে কেমনে?

হ্যাঁ গো, তুমি বুঝি ভগবান মানো না?

মানুম না ক্যান? মাল বেইচ্যা খাই, ভগবান না মাইন্যা উপায় আছে? আমার গদিতে তো যাও নাই, ইয়া বড় নাদাপ্যাটা গণেশঠাকুর দেখতে পাইবা। সকালে বিকালে পুরুত আইয়া মালা চড়াইয়া যায়।

খুব ভাল। আমাকেও একটা ভাল দেখে গণেশঠাকুর এনে দিও তো। আমার একটা পটের গণেশ আছে, কিন্তু ছবিটা বডড আবছা। গণেশবাবার আহ্লাদী ভাবটা নেই। এনে দেবে?

দিমুনা ক্যান? আইজকাইল গণেশবাবার প্র্যাকটিস খুব ভাল। মূর্তিও মেলা পাওয়া যায়।

হ্যাঁ গো, দিদি কার ভক্ত জানো?

ক্যান কও তো!

এমনিই। মনে হয় দিদি খুব কালীর ভক্ত। তাই না?

বুঝলা কেমনে?

বলব? রাগ করবে না?

রাগের কী?

একদিন স্বপ্নে দেখলাম দিদি এলোচুলে বসে কালীপুজো করছে। কালীমূর্তির চোখদুটো যেন জীবন্ত!

মাইয়ালোকে পূজা করে নাকি?

স্বপ্নে দেখলাম, সত্যি নাও হতে পারে। স্পষ্ট শুনছিলাম দিদি বিড় বিড় করে মন্ত্র বলছে।

হ্যায় যে কার ভক্ত তা জানি না। তবে ঠাকুরঘরে সবরকমই আছে। শিব-দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রী, সন্তোষী মা সব।

দিদি বুঝি খুব পুজো-টুজো করে?

তোমারে আইজ দিদিতে পাইছে ক্যান?

একটা দীর্ঘশ্বাস পেলে বাসন্তী বলল, আমি ভাবি কী, আমি কি তার নখের যুগ্যি?

না হইলে কি গলায় দড়ি দিতে হইব নাকি? তাইন তাইনের মতো, তুমি তোমার মতো। তার লগে তো তোমার কাইজ্যা নাই।

আছে বইকী গো। মুখে ঝগড়া নেই ঠিকই, কিন্তু আমি তো দিদির চক্ষুশূল। তাই না বলো!

নাকি? ভাল। কারও চক্ষু শূলাইলে কী করবা? গিয়া তো আর তার চোখে মলম লাগাইতে পারবা না।

পায়ে তো পড়তে পারতাম।

খামাখা তার ঠ্যাং ধরতেই বা যাইবা ক্যান? তুমি তো কিছু দোষ কর নাই, করছি স্যান আমি। তুমি ঠ্যাং টানাটানি করলে লাভ কী?

আমারও কি দোষ নেই?

খুচাইয়া খুচাইয়া দোষ বাইর করনের কামটা কী? তুমি হইলা ঢ্যাপের দলা। মায়ে বাপে ধইরা বাইন্ধ্যা আমার লগে বিয়া দিয়া দিছিল। তোমার তো তাতে হাত আছিল না।

সে তো ঠিক কথা, তবু মনটা মানতে চায় না।

মনের বালাই বেশি থাকলে মাথার গণ্ডগোল হইব, বোঝলা? বিষয়-আশয় আছে, পোলাপান আছে, সংসারধর্ম আছে, এইসবে মনটা সই করতে পার নাই? দিদি-দিদি কইরা হ্যাদাইয়া মর ক্যান?

হ্যাঁ গো, তোমাকে একটা কথা বলব? কিছু মনে করবে না?

আরে কও, কও, সব কইয়া ফালাও, মনটা পরিষ্কার কর।

লোকে বলে আমি নাকি তোমার আসল বউ নই। আইনের চোখে নাকি আমার কোনও দাম নেই। সত্যি?

আইন? আইন তো দেখি সারাক্ষণই চক্ষু বুইজ্যা ঘুমাইয়া আছে। হ্যায় চাইলে স্যান কোনটা গতিক কোনটা বেগতিক তা বোঝন যাইব। আমরা কি আইনের লাগুড় পাই?

লোকে তো বলে দুটো বউ থাকা বে-আইনি।

লোকে মিছা কয় না। কিন্তু সরকারের যেমন আইন আছে তেমন আমাগরও কিছু কয়-কর্তব্য আছে। আমার তো মোটে দুগা বিয়া, আগে তো মানুষ গণ্ডায় গণ্ডায় করত।

আগের দিনে ওসব হত, আজকাল তো হয় না।

আজিকাইল আরও খারাপ কিছু হয়। দুইটা-তিনটা বিয়া হয় না বইল্যা কি সব সাধুপুরুষ হইয়া বইস্যা আছে নাকি। চোরায়-গোপ্তায় কত কী হয়। বিয়া করতে বুকের পাটা লাগে, বোঝলা? গৌরহরি উকিল আমার পিঠ চাপড়াইয়া যে কইছিল "তুমি বাপের ব্যাটা আছো হে" সে তো এমনি কয় নাই।

তাহলে কি আমি তোমার সত্যিকারের বউ?

মিছা-বউ তো আর না। এই লইয়া ধন্ধে পড়ছ নাকি?

চোখে জল আসছিল বাসন্তীর। আঁচলে চোখ মুছে বলল, যখন লোকে বলে আমি তোমার মিথ্যে বউ তখন আমি সইতে পারি না। দিদিকে তখন আমার ভারী হিংসে হয়।

রসিক সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে বলল, আইন মানুষই বানায়, মানুষই বদলায়। যখন যেমন দরকার। আইন লইয়া ভাববা না, সংসার লইয়া ভাব।

সব প্রশ্ন যে জল হয়ে গেল তা নয়; তবে দম ধরল বাসন্তী। বুক ঠান্ডা হল না, তবে জ্বলুনি একটু কমল। রসিকের জুলপিতে একটু পাক ধরেছে। শরীর অবশ্য সেই আগের মতোই মেদশূন্য এবং কঠিন ও পুরুষালি। কিন্তু রসিক আর নবীন যুবক নয়। বাসন্তীর চেয়ে বছর পনেরোর বড়। বাসন্তীর বয়সও তো বসে নেই। মেয়েদের বয়স রেলগাড়ির মতো দৌড়য়। তাদের বয়স হয়ে যাচ্ছে। তারা এখন মোহনার দিকে। এখন আর সম্পর্কের হেরফের হয় না।

রাতে দুজনের আদর সোহাগ হল খুব।

বাসন্তী বলল, এবার কী হবে গো? ছেলে না মেয়ে?

পোলা।

কেমন করে বুঝলে?

ওই যে কয় মাইয়ার মা সুন্দরী, পোলার মা বান্দরী। তোমার চেহারাখান ভাল দেখি না। ঝটকাইছে।

তার যে ভাই হবে একথা সে মায়ের কাছেই শুনেছে। শুনে যে খুশি হয়েছে তা নয়। বরং তার ভারী লজ্জা করে। কারণ, কী করে কোন প্রক্রিয়ায় ভাইবোন হয় তা সে আগে জানত না, সদ্য জেনেছে। আর সেটা এক ভীষণ অসভ্য কাজ। সেই অসভ্য কাজটা তার মা আর বাবা করেছে এটা ভাবতেই তার কেমন যেন মনটা বিকল হয়ে যায়, কান্না পায়। ভগবান, কেন এই বিচ্ছিরি নিয়ম। ওসব অসভ্যতা ছাড়া এমনিতে কোনও নিবাপদ প্রক্রিয়ায় কি ভাইবোন হতে পারে না?

দুপুরবেলায় তার প্রিয় গাছের তলায় অদৃশ্য শিবঠাকুরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সে। বুকে অভিমান, লজ্জা, ঘেন্না।

ঠাকুর, এসব অসভ্য নিয়ম তুমি বদলে দাও। ওভাবে কেন ভাইবোন হবে ঠাকুর? ছিঃ ছিঃ ভাবতেও যে লজ্জায় মরে যাই। ওভাবে কি আমিও হলাম ঠাকুর? দোহাই তোমার, এ নিয়ম পালটে দাও, তার চেয়ে বরং আকাশ থেকে নেমে আসুক শিশুদের বীজ। বৃষ্টির মতন। জল পড়ুক মায়েদের মাথায়, গায়ে। শিশু সঞ্চারিত হোক মাতৃগর্ভে। না হয় তো অন্য কিছু হোক, অন্য কোনও প্রক্রিয়ায়। ওই লজ্জাহীন বিচ্ছিরি কাজের ভিতর দিয়ে নয়। দোহাই ঠাকুর...

তার ভালমানুষ শিবঠাকুর সব তাতেই রাজি। হাই তুলে বলল, তাই হবে রে বাবা, এখন থেকে তাই হবে।

বর দিলে তো?

দিলাম।

বরটাকে ঠিক বিশ্বাস হয় না মরণের। বর দিলে হবে কী, ভোলাবাবা সব আবার ভুলে মেরে দেয়। শিবঠাকুরকে নিয়ে ওইটেই মুশকিল। এমনিতে মানুষটা বড্ডই ভাল, কারও সাতেপাঁচে নেই। আপনমনে বুঁদ হয়ে থাকে। মরণ সেই জন্যই শিবঠাকুরকে এত ভালবাসে। কিন্তু শিবঠাকুরের ভুলো মনের জন্য তার দেওয়া বরগুলো মোটেই ফলতে চায় না। তিনটে-চারটে বরের মধ্যে একটা হয়তো ফলল, বাকিগুলো ফলল না। এতে ভারী মুশকিল হয় মরণের। বরগুলো ফললে কত কী হয়ে যেত এতদিনে।

আমি হলাম মরণকুমার সাহা, আমার কথা তোমার মনে আছে তো ঠাকুর?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোকে আবার মনে থাকবে না!

তুমি তো ভীষণ ভুলে যাও। এই যে সেদিন পল্টন আমার জলছবিগুলো কেড়ে নিল তুমি কিছু করলে না। কী ভাল সব জলছবি মাকে দিয়ে বাবাকে বলিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছিলাম। বদলে ভিডিওগেমটা দেওয়ার কথা ছিল পল্টনের। দিল তা? তোমাকে কত করে বললাম, পল্টনের হাতটা যেন ভেঙে দিও ঠাকুর। বাঁ হাতটা ভাঙলেও হবে। শুনলে সে কথা?

বাঁ হাত বলেছিলি, না ডান হাত সেইটেই তো গুলিয়ে ফেললুম রে। তাই আর ভাঙা হয়নি বটে।

তাহলে আমার গায়ে আরও জোর দাও না কেন? একাই যাতে দশ জনকে ঠান্ডা করে দিতে পারি।

কেন, তোর জোর কি কম?

কম নয়, কিন্তু আর একটু হলে ভাল হয়। পল্টন আর গদাইকে খুব পেটাতে ইচ্ছে করে যে। দুটোই পাজি।

তুই পাজি নোস তো।

আমিও আছি একটু, তবে ওদের সঙ্গে পারি না।

ঝগড়া কাজিয়া কি ভাল? ভাব করে নে না।

তুমি কিন্তু কিচ্ছু পারো না শিবঠাকুর। জগু কী বলেছে জানো? ও নাকি মা কালীর কাছে যা চায় সব পায়। মা কালী নাকি তোমার চাইতে অনেক ভাল। সত্যি ঠাকুর?

আরে না না, কালী কি আমার মতো পারে?

আমিও তো তাই বললাম জগুকে। দুজনে একটু ঝগড়াও হল। পান্নাদি সেদিন বলছিল, সন্তোষী মা নাকি কালীর চেয়েও ভাল। সত্যি ঠাকুর?

ওরে, আমিই তোকে সব দেবোখন।

দিচ্ছ কোথায়? এরপর কিন্তু আমি ঠিক একদিন কালীভক্ত হয়ে যাব। তখন বুঝবে।

রাগ করিসনি বাপধন। আর ভুল হবে না।

হ্যাঁ ঠাকুর, তোমাকে যে বলেছিলাম পান্নাদির সঙ্গে আমার দাদার একটু ভাবসাব করে দাও, দিলে না তো!

দিইনি বুঝি! তা সে আর কী করা যাবে।

ওদিকে যে অর্ঘ্য ব্যানার্জির সঙ্গে পান্নাদির ভাব হয়ে গেল!

সে আবার কে রে?

পান্নাদির দাদার বন্ধু। দেখনি বুঝি? কী সুন্দর লম্বা পানা চেহারা কম্পিউটার ইনজিনিয়ার। এই তো বড়দিনের ছুটিতে এসে ঘুরে গেল। তারপর গেল হপ্তায় এসেছে। খবর আছে এ-হপ্তায়ও আসবে। খুব নাকি বড়লোকের ছেলে। তুমি কিন্তু কিচ্ছু পারো না ঠাকুর।

চোখ বুজেই মরণ টের পেল। শিবঠাকুর খসখস করে জটার নীচে মাথা চুলকে নিল। তারপর বলল, সব কি আর খেয়াল থাকে রে। চারদিকে কত কী হুটহাট হয়ে যায়।

ও ঠাকুর, তোমাকে উকুনে খাচ্ছে নাকি? মায়ের কাছে উকুনমারা তেল আছে, চুরি করে এনে দেব?

উকুনমারা তেলও আছে নাকি? দিস তো বাবা, কতকালের পুরনো জটা, উকুন তো হবেই।

পান্নাদির মুখখানা আজকাল খুব ঝলমল করে আর একটা লালচে আভাও দেখতে পায় মরণ। সেদিন জ্যাঠাইমার জন্য ডাব পাড়তে গাছে উঠেছিল মরণ। আজকাল গাছে ওঠা বারণ হয়েছে তার। বাবা হুকুম দিয়ে গেছে, এই বান্দর, গাছে উঠলে কিন্তু চ্যাঙ্গা-ব্যাঙ্গা কইরা ঠ্যাঙ্গামু। তবু চুরি করে কারও কারও কথায় এখনও গাছে-টাছে উঠতে হয় তাকে।

ডাব পেড়ে যখন নেমে এল তখন দেখল, পান্নাদির বাড়িতে খুব হই-চই। কারা সব এসেছে। বাইরের ঘরে হাসাহাসি হচ্ছে খুব।

উঁকি মেরে তখনই ছেলেটাকে দেখতে পেল মরণ। তার দাদাও সুন্দর বটে, কিন্তু এ আরও সুন্দর। কী লম্বা আর ফর্সা। আর মুখখানা অনেকটা ফিল্মস্টারের মতো। মরণ বেশি সিনেমা দেখেনি। টি ভিতে একটু আধটু। অন্যদের মতো সে ফিল্মস্টার বেশি চেনে না। তবে জানে ফিল্মস্টাররা খুব সুন্দর দেখতে হয়।

পরদিন সে পান্নাদিকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ, পান্নাদি, এই লোকটা কে এসেছিল তোমাদের বাড়িতে? সুন্দরপানা, লম্বা?

পান্নাদির মুখটা রাঙা হয়ে গেল হঠাৎ। মুখে টেপা একটু হাসি।

ও দাদার বন্ধু। অর্ঘ ব্যানার্জি।

ফিল্মস্টারের মতো দেখতে, না?

আছে একরকম।

আগে ওসব বুঝতে পারত না মরণ। আজকাল পারে।

আর বুঝতে পারে বলে তার মোটেই ভাল লাগে না। কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়। তার এত বুঝতে পারার দরকারই ছিল না।

পান্না বলল, তোর খুব উঁকিঝুঁকি দেওয়ার অভ্যাস, না? একদিন তোর মাকে বলে দেব।

বাঃ, উঁকিঝুঁকি হল বুঝি? আমি জ্যাঠাইমার জন্য ডাব পেড়ে আনলাম না? তখন দেখলাম তো!

পান্না হাসছিল, খুব সুন্দর লাগল বুঝি তোর?

খুব। তোমার লাগেনি?

মুখটা একটু বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভাব করে পান্না বলল, দেখতে খারাপ নয়। তবে বড্ড নিজের গল্প করে। অহংকার, বুঝলি?

না, ওসব বুঝতে পারে না মরণ। এখনও সব আবছায়া পরিষ্কার হয়ে যায়নি তার কাছে। তবে ধীরে ধীরে প্রাপ্তবয়স্কদের জগতের পর্দা একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে। আর যন্ত্রণা হচ্ছে তার। ভাল লাগছে না।

আজকাল সে কমবয়সি মেয়েদের দিকে তাকায়। তার নানারকম অদ্ভুত ইচ্ছে হয়। কেন এসব হয়? কেন এসব হতেই হয়?

জগুও সেদিন বলছিল, অনেক ব্যাপার আছে, বুঝলি?

কী ব্যাপার?

জগু হেসে বলে, একে একে দুই। মানে জানিস?

জানে, না জেনেও মরণ জেনে গেছে। এসব কথার মধ্যে যে একটা আমিষ গন্ধ পায়। তবে তার দুনিয়া যে পালটে যাচ্ছে, এটা খুব সত্যি কথা। শরীরে অনভিপ্রেত উত্তেজনা, মনের মধ্যে আনচান।

জগু কিছু অসভ্য কথা শুনিয়েছিল তাকে। শুনে তার কান গরম হয়ে গিয়েছিল। আবার খারাপও লাগছিল না।

বিজুদার দোতলার ঘরের ঘুলঘুলিতে আর আলমারির মাথায় চড়াইপাখি বাসা বেঁধেছে। সেখান থেকে একটা চড়াই-বাচ্চা পড়ে গেছে মেঝেয়। সেটা এখনও উড়তে শেখেনি। ও-বাড়িতে ভয়ংকর সব বেড়ালের উৎপাত।

বিজুদা তাকে ডেকে একদিন বলল, হ্যাঁ রে, একটা ব্যবস্থা করতে পারিস? তুই তো আগে খুব পাখির বাচ্চা চুরি করতি গাছে উঠে। এই বাচ্চাটাকে সাবধানে বাসায় তুলে দিতে পারবি না?

খুব পারবে মরণ। চড়াই বাচ্চা তুলতে গিয়েছিল বিকেলবেলা। রবিবার ছিল, মনে আছে। গিয়ে দেখে সোহাগদি আর বিজুদা কম্পিউটারের সামনে জোড়া লেগে বসা। দুজনেরই চোখ পর্দায় ধ্যানস্থ। তাকে দেখে কেউ চমকাল না। বিজুদা শুধু বলল, ছাদে ফোল্ডিং মইটা আছে। নিয়ে আয়। পাখির ছানাটা বোধহয় খাটের তলায় ঢুকেছে।

পাখির ছানাকে তার বাসায় স্থাপন করতে যেটুকু সময় লাগল তার, দেখল, দুজনে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। কিছু করছেও না। মনিটরের পর্দায় চোখ রেখে বসে আছে। সেখানে কীসব লেখা আর ছবি-ছক্কর ফুটে উঠছে।

রায়বাড়ির জ্যাঠাইমা ডেকে সেদিন তাকে দুটো গন্ধলেবু আর একটা বাতাবি দিল। গন্ধলেবু মরণের বাবা খুব ভালবাসে। বাতাবিটা কেউ খাবে না। এ-বাড়ির বাতাবি জোঁদো টক। আগে টক-মিষ্টির তফাত ছিল না মরণের কাছে। আজকাল হয়েছে।

জ্যাঠাইমা গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, ওদের একসঙ্গে দেখতে পাস?

কাদের?

সোহাগ আর বিজু! গাঁয়ে তো ঢি ঢি পড়ে গেছে। পাস না?

তিয়াত্তর

ঘড়ির দুটো কাঁটা হাতজোড় করে রাতের মতো বিদায় জানাচ্ছে সবাইকে। শুভরাত্রি বন্ধুগণ। রাত বারোটা।

আধো ঘুমের ভিতরেই একবার বাঁপাশ ফিরল সে। ফের ডানপাশ। অস্থিরতা, তার ঠোঁটে এখনও লেগে আছে একটি ভীরু চুম্বনের স্বাদ। ইট ওয়াজ এ কাওয়ার্ডলি কিস। আত্মবিশ্বাসহীন, কম্পিত, অগভীর। একটি চকিত চুম্বন থেকেও কত কী বুঝতে পারা যায়। বুঝতে পারা যায়, এই পুরুষটি আর কখনও কোনও মেয়েকে চুমু খায়নি। এই নীতিবাগীশ পুরুষটি তার কৌমার্য হারানোর ভয়ে জড়সড়, এবং চুম্বনের সময়ে তার ভিতরে চিৎকার করছে তার নানা সংস্কার। ফলে প্রাচীন পবিত্রতার শৃঙ্খল ঝনঝন করে বেজে উঠছে হাতে পায়ে। ফণা তুলছে পাপের ভয়। অসহায় পুরুষটি তাকে আলিঙ্গনও করতে পারেনি যথারীতি। গাঢ় শ্বাসে ভয়ের কাঁপন, বুকের টিপটিপ শব্দ শোনা যাচ্ছে দেহের বাইরেও। লজ্জায় চোখ বোজা, কোনও আশ্লেষ নেই, তীব্রতা নেই, অধিকারবোধ বা পৌরুষ নেই। শুধু অধরে অধরে কুশল বিনিময়ের মতো। ভিতর থেকে রাশ টেনে রাখল কে? কে বলো তো! বোধহয় ওর প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল, গোঁড়া পূর্বপুরুষদের ডি এন এ। নাকি জিন-এর পরম্পরা?

হাসি পেয়েছিল কি সোহাগের? মায়া হয়েছিল কি অসহায় পুরুষটির দিকে গোল গোল চোখে চেয়ে?

আশ্চর্যের বিষয় হল, সেসব হয়নি। সে ওই চকিত লঘু চুম্বনটিকে উপভোগ করেছিল। তার ঠোঁটে পুরুষদের অধরের নিষ্পেষণ কম হয়নি। প্যাশনেট কিস কাকে বলে তা সোহাগ জানে। কিন্তু আজকের ওই স্পর্শটির মতো এমন রোমান্টিক কোনওটাই ছিল না কখনও। ঠোঁটে স্বাদ লেগে আছে এখনও। বারবার তন্দ্রা ছুটে যাচ্ছে তার। বারবার পাশ ফিরছে। এত চঞ্চলতা কখনও বোধ করেনি সে।

জীবনে কোনও পুরুষের প্রয়োজন অনুভব করেনি বলেই এর আগে কখনও হাউড়ে পুরুষের হামলা একটুও ভাল লাগেনি তার। সোহাগ জানত তার জীবন অন্যরকম এবং একক। পুরুষ কেন, কোনও মানুষ না হলেও তার চলে। তার চারদিকের আবহমণ্ডলে নিত্যই সে কত সত্তার সন্ধান পায়। এই গাছপালা, বাতাস, পশুপাখি, জীবজন্তু তার সঙ্গে কত কথা কয়। পৃথিবীতে যত মানুষ জন্মেছে তাদের সকলের যেসব স্পন্দন আর চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে তারাও কাছে চলে আসে তার। সে টের পায় তাদের। কথাও বলে তাদের সঙ্গে। তার মা আর বাবার ধারণা তার মাথায় ছিট আছে, সে ভূতগ্রস্ত, প্রবলেম চাইল্ড। হয়তো তাদের ধারণা মিথ্যেও নয়। সে জানে সে স্বাভাবিক নয়। তার কথা শুনে অনেকেই অবাক হয়। আর তার ওই বিভোর নাচ দেখে কতজন বলেছে, একে ভূতে পেয়েছে।

হ্যাঁ, ভূতেই পায় তাকে। অনেক ভূত তার। আর ওই ভুতুড়ে জগৎই তার প্রিয়। ঘর সংসার আর মেয়েলিপনা তার একটুও সহ্য হয় না। তাই তার পুরুষে আসক্তিও জন্মায়নি কখনও।

পিসি সেদিন তার কথাবার্তা শুনে দুঃখ করে বলছিল, হ্যাঁ রে, তুইও কি শেষে আমার মতো হবি? এই যে একা একা টেনে নিচ্ছি নিজেকে এটা কি বেঁচে থাকা?

কেন পিসি, তুমি তো চমৎকার আছ! কত কাজ তোমার, কত রোজগার করছ।

সে তো ঠিকই রে। লোকে বলেও তাই। লোকে ভাবে, পয়সা হলেই হল, আর কিছুর দরকার নেই। কিন্তু পয়সা দিয়ে আমি কী করব বল তো! ব্যাঙ্কে আমার লাখ দুয়েক টাকা জমেছে, কিন্তু এ-টাকা দিয়ে কী করব যখন ভাবতে বসি তখন কূলকিনারা পাই না। কী করব বল তো টাকা দিয়ে? টাকা থেকে যদি নিংড়ে একটু আনন্দ পাওয়া যেত তাহলেও হত। আর কাজ! হাড়ভাঙা খাটুনিরও একটা আনন্দ হয় যদি সেটা কারও জন্য হয়।

তবে কী হলে ভাল হত পিসি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্ধ্যা বলে, ঘরসংসার হলে, স্বামী, ছেলে মেয়ে এসব থাকলে তখন খেটে আনন্দ।

তোমার কেবল এক কথা, পিসেমশাইকে খুব ভালবাসতে বুঝি?

তা নয়, ভাল করে চোখের দেখাই তো হল না, ভালবাসাটা হবে কেমন করে বল। সেরকম ভালবাসা নয়, এ হল অন্যরকম। কীরকম জানিস? বিয়ের পরই মনে হল, এ আমার নিজের মানুষ। এই আমার সম্বল, আমার আশ্রয়, আমার ইহকাল পরকাল, দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের ভিড় থেকে এই যে একজন উঠে এসে গলায় মালা পরিয়ে দিল, অমনি তার সঙ্গে বাদবাকি মানুষের তফাত হয়ে গেল।

এটাই তো প্রেম!

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বলে, না রে, তোরা যাকে ভালবাসা বলিস এ তা নয়, তার চেয়েও বেশি। ও তুই বুঝবি না। আমি তাকে কম খুশি করতে চেষ্টা করেছি? বাইরে থেকে এলে পা থেকে জুতো খুলে দিয়েছি, বাতাস করেছি। তার যত্নের এতটুকু ত্রুটি রাখিনি। তাকে পেয়ে যেন আমি উথলে উঠলাম, ডবল হয়ে গেলাম। আর তাতেই সে হাঁসফাঁস হয়ে গেল কিনা কে জানে। হয়তো অত আদেখলেপনা দেখেই বিমুখ হল। হয়তো সইল না।

যাই বলো পিসি, লোকটা কিন্তু আনগ্রেটফুল ছিল।

তা তো ছিলই। সে কি আর ছিল না। তবে আমি তো তার দোষগুণ বিচার করে দেখিনি, এমনকী সুন্দর না কুচ্ছিত সে কথাও মনে হয়নি।

লোকটা কি হ্যান্ডসাম ছিল পিসি?

আরে না। মাঝারি খেঁকুড়ে চেহারা, রোগা, রংটাও শ্যামলা। মুখের ছিরি ওই একরকম। তুই বুঝবি না, লোকটা বড় কথা নয়, সে হয়তো পছন্দ করার মতোও নয়, তবু তাকে নিয়েই আমার যে মাতামাতি সেটা হল আমার ব্যাপার। একটা মানুষকে পেয়েছি, এবার তাকে ঘিরেই লতিয়ে উঠব।

লোকটাকে তো তুমি ডিভোর্স দাওনি, না পিসি?

কী সব কাগজপত্র পাঠিয়েছিল সই করতে। আমি সই করেও দিয়েছি, তবু নাকি হয়নি। আমাকে খুব ধরেছিল যেন মামলা না করি।

করলে লোকটাকে বাইগামির চার্জে জেল খাটাতে পারতে।

লাভ কী বল। সে জেল খাটবে আর তার নতুন বউ চোখের জল ফেলে আমাকে শাপশাপান্ত করবে—সেটা কি ভাল? আমার যা গেছে তা তো আর ফিরে পেতাম না।

তুমি খুব সংসার করতে ভালবাসো, না পিসি?

সন্ধ্যা লাজুক একটু হেসে বলল, এক একটা মেয়ে সংসার করতেই জন্মায়। তারা আর কিছু চায় না। কত মেয়ে গান গায়, লেখাপড়ায় বড় হয়, মিস ইন্ডিয়া হয়। ফিল্মস্টার হয়, মন্ত্রী হয়, তাদের ধরে বেঁধে বিয়ে দিলে বলে, জীবনটা নষ্ট হল। আবার আমার মতো কিছু আছে যারা আর কিছু হতে চায় না। শুধু সংসার নিয়ে মেতে থাকতে চায়।

তুমি যা করেছ পিসি তা যে সংসার করার চেয়ে অনেক বেশি।

জানি রে জানি। লোকে তাও বলে। কিন্তু তারা তো আমার বুকের ভিতরটা দেখতে পায় না। সেই জায়গাটা বড্ড ফাঁকা।

তুমি সেই লোকটার কথা এখনও ভাবো?

দেখ, সত্যি কথা বলতে কি তার মুখটা এখন ভাল করে মনেই পড়ে না। এ তো ঠিক একটা লোকের ওপর টান নয়। ওই লোকটাকে ঘিরে যা গড়ে উঠতে পারত সেই সংসারের ওপর টান। ওসব বুঝবি না তুই।

সোহাগ যে বুঝতে পারে না তা নয়। অন্তত এটুকু বোঝে পৃথিবীতে এক একটা মানুষ এক একটা অবসেশন নিয়ে জন্মায়। পিসির সঙ্গে তার কি যোজন যোজন তফাত? সেটাও মনে হয় না তার। মাঝে মাঝে মনে হয় তার ভিতরেও একটা টোটাল সারেন্ডার আছে। অবশ্যই সেটা কোনও পুরুষমানুষের জন্য নয়। সেরকম প্রাণ সঁপে দেওয়ার মতো পুরুষমানুষ তো জন্মায় না। তবে কার জন্য হবে সেই সমর্পণ তা ভেবে পায় না সে।

পিসি বলে, আমার মতো হোস না রে। বড় কষ্ট।

আবার বিয়ে করতে পারো না কেন পিসি?

সন্ধ্যা হেসে বলে, বয়স বসে নেই রে। মনটাও বড় আঁচড়ে কামড়ে গেছে। এখন আর সেরকম হবে না। আরও কী জানিস? এখন আমার টাকা হয়েছে, কোমরের জোর হয়েছে, এখন কেউ বিয়ে করলে তার নজর থাকবে আমার টাকার উপর। এখন তো একটু একটু করে বুদ্ধিও খুলেছে আমার। আগের মতো বোকা তো নই। তাই স্বার্থপর দুনিয়াটাকে দেখতে পাই।

তাহলে তোমার কী হবে পিসি?

কী আবার হবে! অসুরের মতো খাটব, গুচ্ছের টাকা হবে আর তা দিয়ে কী করব ভেবে কূল পাব না। এখন এ-সংসারে আমার কত কদর হয়েছে দেখেছিস? সবাই তোতাই-পাতাই করে, বড় গলায় কেউ কথাটি কয় না। বিয়ে-ফেরত মেয়েমানুষের বাপের বাড়িতে কদর হয় দেখেছিস কখনও? হয় না। এ কদর আমার নয়, আমার টাকার। তলিয়ে ভাবতে গেলে বড় ঘেন্না আসে সবার ওপর। তাই আর ভাবি না। আস্তে আস্তে একটা যন্ত্র হয়ে যাচ্ছি।

পিসির মানসিকতাটা সোহাগের অদ্ভুত লাগে। এই স্বাধীনভাবে খেটে এত রোজগার করছে, পাঁচজনের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে তা পিসির পছন্দ নয়। এর চেয়ে কী করে বেশি পছন্দের হয় একজন অচেনা পুরুষের

সংসারে দাসীবৃত্তি করা এবং তার সন্তান ধারণ ও পালন করা? এবং সে পুরুষটাও নিতান্তই এক সাদামাটা সাধারণ মানুষ। এই বিস্ময়টা অনেক ব্যাখ্যা করেও মেটে না তার।

আজ রাতে পলকা তন্দ্রার মধ্যে বার বার সে পিসিকে দেখছিল। স্বপ্নই, তবে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ কিছু নয়। একবার দেখল, আকাশে দিগন্তে ঘোর মেঘ করেছে, পিসি তাকে বলছে, ওই দেখ, আজ ভাসিয়ে নেবে। ফের দেখল, পিসি একটা ব্যাগে জামাকাপড় গুছিয়ে নিচ্ছে। সে বলল, কোথায় যাবে পিসি? সন্ধ্যা একটা পোস্টকার্ড তার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, ওই দেখ না, ডেকে পাঠিয়েছে। সে অবাক হয়ে বলে, কে ডেকে পাঠিয়েছে পিসি? সন্ধ্যা মুখ টিপে হেসে বলল, কে আবার। আমার যম। কিন্তু সে ডেকে পাঠালে তো না গিয়ে উপায় নেই রে। সে চেঁচিয়ে বলল, তুমি যেও না পিসি। পিসি বলল, তাও কি হয়!

ঘুম ও জাগরণের একটা মাঝামাঝি চৌকাঠে সে স্পষ্ট টের পেল সে কথা কইছে, মেয়েদের কোনওদিন কিছু হয় না কেন জানো? তাদের মনটায় একটা দাসখত লেখাই থাকে।

ঘুম ভেঙে সে চারদিকে চাইল। অন্ধকার। পুঞ্জীভূত অন্ধকার। তারপর স্বপ্নটার কথা মনে পড়ল। সেই লোকটা যদি আজ পিসিকে ডেকে পাঠায় তাহলে কি পিসি সত্যি সত্যিই সব ছেড়ে চলে যাবে নাকি? ভাবতেই ভারী রাগ হচ্ছিল তার, মধ্যরাতে, একা একা।

ঠোঁটে হালকা লিপস্টিকের ছোঁয়ার মতো চুম্বনের সঙ্গে স্বাদ লেগে আছে। তার অধর ধর্ষিত হয়নি, নন্দিত হয়েছে। অন্ধকারে সে ভারী আরামে চোখ বুজল। মুখে একটু হাসি।

তারপর ভাবল, যদি সত্যিই কোনওদিন ডাকে লোকটা আর পিসি যদি সত্যিই চলে যায় তাহলেই বা ক্ষতি কী? যে যার নিজের জীবন তো নিজেই রচনা করবে। দাসীবৃত্তির মধ্যেই যদি কেউ আনন্দ পায় তো সে তাতে বাধা দেওয়ার কে?

ভেবে ফের একটু হাসল সোহাগ। একটু গরম লাগছে। আজকাল বেশ গরম পড়েছে এখানেও। পাখাটা কি চালিয়ে দেবে? না থাক। শেষরাতে হিম-টিম পড়লে তার অ্যালার্জি হবে।

তার শরীরেও সংকেত পৌঁছায়। নির্ভুল সংকেত। গভীর গুহার কবোষ্ণ অন্ধকারে তার শরীরে নানা স্পন্দন ছুঁয়ে যায়। ওঠো। জাগে। ধীরে, খুব ধীরে তোমার চোখ সইয়ে নাও জাগরণে। উপোসী, জীর্ণ শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জমে থাকা আলস্য ও ঘুম ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে তার। ক্লেশময় তার জীবন। শুধুই ক্লেশ, শুধুই ক্লান্তি, শুধুই পলায়ন।

তার বোধ নেই, বুদ্ধি নেই, স্মৃতিশক্তি নেই, কর্মফল নেই, পাপ বা পুণ্যও নেই। তার আহার বিস্বাদ ও কষ্টকর, তার মৈথুন বাধ্যতামূলক এক প্রক্রিয়ার বেদনা, তার বিশ্রাম উদ্বেগাকীর্ণ। ওই যে বাহির তাকে ডাক পাঠাচ্ছে ওখানেও কোনও মুক্তি নেই তার। সেখানেও বাধা ও বিরুদ্ধতা। বন্ধুর তার গতিপথ, বিপদসংকুল। তবু সে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। তাকে জাগতেই হয়। সংকেতময় শরীরে সুনির্দিষ্ট বার্তা ঠিক পৌঁছে যায়। না তার স্বাধীন ইচ্ছাও কিছু নেই। তাকে চালায় ক্ষুধা, ভয়, মৈথুন। তাকে চালায় সংকেত ও পারিপার্শ্বিক। সে

কখনও কোনও সৌন্দর্য দেখেনি, গান শোনেনি, স্থির জলে নিজের ছায়া দেখেও সে কখনও বোধ করেনি—ওই আমি।

আলস্য জড়ানো তার চোখ থেকে নেমে যাচ্ছে ঘুমের ভার। সে জাগছে। জাগছে।

তোমার কী খবর সোহাগ?

আমার! আমার কিছু এগোয় না। থেমে থাকে। আচ্ছা যা থেমে থাকে তাকেই কি স্থবির বলে?

আমি বাংলায় ভীষণ কাঁচা। তা বলে ইংরিজিতে পাকা নই। আমি সব বিষয়ে কাঁচা। তবু স্থবির মানে তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছ।

আমার হচ্ছে স্থবির জগৎ। আমার চারদিকে যা কিছু সব থেমে আছে। গাছপালা, মাটি, আকাশ।

আসলে কিন্তু ওসবও কিছু থেমে নেই। আহ্নিক গতি আছে না?

সে আছে। তবু আমার নিজস্ব জগতে কোনও ঘটনা ঘটেই না। বড় জোর পুকুরের স্থির জলে একটা ঢিল পড়ল। ঢেউ ভাঙল, তারপর আবার নিঃঝুম।

আমি সবাইকে কী বলি জানো?

কী বলো?

বলি আমাদের সোহাগ অন্য রকম মেয়ে, আর পাঁচজনের মতো নয়। কথাগুলো এমন যে চমকে উঠতে হয়, ভাবতে হয়। ভারী আচমকা কথা সব। তাই না?

আসলে আমার যা মনে হয় তাই বলি। কেন যেন সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতেই পারি না।

এরকমই তো ভাল। মাঝে মাঝে এই যে আমাকে চমকে দিয়ে যাও তার রেশ কয়েকদিন থাকে। কথাগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াঘাটা করি। কী খাবে বল তো আজ!

আমি বুঝি খেতে আসি?

আহা তাই বললাম বুঝি? গেরস্তবাড়িতে এলে কিছু মুখে দিতে হয়, এসব গাঁ দেশের নিয়ম যে। আজকাল কেউ আসেও না, খায়ও না। উনি যতদিন ছিলেন বাড়ি গমগম করত। এসোজন-বোসোজনের অভাব ছিল না। মাঝে মাঝে লোকের জ্বালায় বিরক্ত হয়েছি। আর বোধহয় তাই ভগবান শোধ নিলেন। এখন কেউ আসে না।

আচ্ছা উইডোদের খুব কষ্ট, না?

হ্যাঁ মা, বড্ড কষ্ট। আমার যেন ডান হাতখানাই নেই।

আমার পিসিরও খুব কষ্ট। তিনি উইডো নন, কিন্তু—

ওর কষ্ট আরও বেশি। মুখ দেখলে বুঝবে না, ভিতরে কত জ্বালা আর অপমান, শুনি এখন ওর ব্যবসা খুব ভাল চলছে।

স্টিল শি ইজ নট হ্যাপি।

জানি। আগে আসত-টাসত, আজকাল বোধহয় সময় পায় না। সংসারে সবাই ভারী ব্যস্ত, আমারই কেবল দিন কাটে না। ওই দুখুরিই আমার সম্বল, আর কাজের লোকেরা। বোসো, আজ ক্ষীর দিয়ে মোয়া খাওয়াই

তোমাকে।

উঠতে গিয়েও থমকায় বলাকা। তারপর হেসে বলে, বুঝেছি মিষ্টি জিনিস তো তোমার আবার পছন্দ নয়। কিন্তু কী জানো, এই বর্ধমানের লোকেরা মিষ্টির পোকা। তুমি কেন মিষ্টি ভালবাসো না বল তো!

আমার বোধহয় সুইট টুথ নেই।

আচ্ছা, তাহলে গরম চপ আনিয়ে দিচ্ছি। এখানে বেশ ভাল একটা খাবারের দোকান হয়েছে, বাজে জিনিস রাখে না। চমৎকার ভেজিটেবল চপ বানায়। খেয়ে দেখ।

তার চেয়ে বরং মোয়াই দিন।

বলাকা বসে পড়ে মোড়ায়, বলে, এ মেয়েকে নিয়ে যে কী করি। আমার বাড়িতে কত খাবারের আয়োজন। কত দুধ, ঘি, সবজি। কে খায় বল তো। বিলিয়েও শেষ করতে পারি না।

শুনেছি আপনি নাকি খুব ফ্রুগাল ইটার।

ও বাবা, তোমার ইংরিজি কি আমি বুঝি! তবে বোধহয় বলছ যে খুব কম খাই কি না। হ্যাঁ, এখন আর গলা দিয়ে ভাল খাবার নামতে চায় না। উনি খুব খেতে ভালবাসতেন। কিছু মুখে তুলতে গেলেই ওঁর কথা মনে পড়ে, আর খেতে ইচ্ছে হয় না।

আচ্ছা এটা কি অদ্ভুত নয়?

কোনটা অদ্ভুত?

এই আনক্যানি লাভ? এখন কেউ তো আপনার মতো ভাবতেই পারবে না।

কেন পারবে না! এরকমই তো হয়।

ইমপসিবল।

ইমপসিবল কেন?

আমার তো মনে হয় আপনাদের পৃথিবী আর নেই। এখন উই আর মোর প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড মোর লজিক্যাল।

বলাকা হাসে, সে তো ঠিকই। চারদিকে তাই তো দেখছি মা। তা এ-ও বোধহয় ভাল। আমাদের যে বাড়তি ব্যাপারটা আছে তার জন্য তো কষ্টই পেতে হয়। তোমাদের আমলের সম্পর্কই বোধহয় ভাল। কে কার কড়ি ধারে তাই না?

একটুও হাসল না সোহাগ। বরং গভীর একটা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বলাকার মুখের দিকে। অনেকক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থেকে বলল, হাউ ক্যান ইউ বি টোটালি মেসমেরাইজড বাই এ পারসন? আপনার অহংকার নেই? ব্যক্তিত্ব নেই? সেলফ রেসপেক্ট নেই?

বাবা রে বাবা! এ মেয়ের আজ হল কী? আজ আবার বুঝি মাথায় পোকা নড়ছে?

মাথা নেড়ে সোহাগ গম্ভীর মুখে বলে, না, আমি সত্যিই জানতে চাই। তর্ক করতে আসিনি। আমার সত্যিই আপনাকে দেখে অবাক লাগে।

এতে অবাক হওয়ার কী আছে বুঝি না বাপু। মায়েরা ছেলে-মেয়েকে যখন ভালবাসে তখন কি আর অহংকার, ব্যক্তিত্ব, সেলফ রেসপেক্ট কোনও বাধা হয়। পারলে প্রাণটা অবধি দিয়ে দেয়। তা সেই ভালবাসাটা

তো মায়ের ভিতরেই থাকে, তাই না? তা সেরকম ভালবাসা যদি স্বামীর ওপর হয় তাহলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হল?

খুব চিন্তিতভাবে সোহাগ বলাকার মুখের দিকে চেয়ে রইল। চট করে জবাব দিল না। বেশ খানিকটা বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আপনি ভীষণ বুদ্ধিমতী, তাই আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। বাট দেয়ার ইজ এ মিস্ট্রি ইন ইউ।

দুর পাগল। কী যে বলে! শোনো মেয়ে, আমার বিয়ে হয়েছিল মাত্র দশ বছর বয়সে। তখন আমার স্বামীর বয়স পঁচিশ বছর। এরকম বয়সের তফাতে বিয়ের কথা আজকালকার ছেলেমেয়েরা ভাবতেও পারবে না। তখন স্বামী কী জিনিস, তার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করতে হয় তাই তো জানতাম না। অন্য পুরুষ হলে কী করত জানি না, কিন্তু আমার স্বামী আমাকে আগলে আগলে রাখতেন, অনেকটা বাবার মতো। অসুখ হলে বাপের বাড়ি না পাঠিয়ে নিজে সেবা করতেন। ভালবাসা তো এমনি এমনি হয় না।

একটা কথা জিজ্ঞেস করলে কিছু মনে করবেন?

না রে বাপু!

ডিড হি ট্রাই সেক্স?

পাগল নাকি? সে সেইরকম পুরুষমানুষই ছিল না। শক্তিমান পুরুষের লক্ষণ কী জানো? সংযম। আর মেয়েরা শক্তিমানকেই সর্বস্ব দিতে চায়। এ তোমাদের মাসল ফোলানো শক্তি তো নয়।

ওঃ, ইউ রিয়েলি ওয়ারশিপ হিম।

বলাকা হেসে ফেলে বলল, শুনে শুনে কান পচে গেল। আমি তো জানি না কী এমন হাতিঘোড়া করেছি তার জন্য। আমি তো চেষ্টা করে কিছু করিনি। ভালবাসা হলে সব ভেসে যায়। দেখো না, এখন কেমন শূন্য হয়ে বসে আছি।

শূন্য হয়ে বসে আছি— কথাটা একটা মাছির মতো উড়ে উড়ে বারবার এসে বসছে তার মাথায়। গুনগুন করছে, সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সোহাগ বড় জ্বালাতন হল সারাদিন।

অ্যাই সোহাগ, কী হচ্ছে শুনি!

কী হচ্ছে?

আমার দাদাটিকে নাকি একদম পাত্তা দিচ্ছো না! তুমি কি চাও বিজুদা সাধু-টাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যাক?

গেলে ভালই তো হত। আমার তো মনে হয় সব পুরুষেরই কিছুদিন হিমালয়ে গিয়ে সাধু হয়ে থেকে আসা উচিত।

ওমা! বলে কী রে?

চুয়াত্তর

স্বপ্নহীন এক দীর্ঘ ঘুমের পর সে জেগে উঠল মাটির গভীর তলদেশে। সমস্ত শরীর জুড়ে বেজে যায় ক্ষুধার মাদল। অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পায় না। দেখার দরকারও নেই তার। তার চঞ্চল চেরা জিব মুহুর্মুহু ছোবল দিচ্ছে বাইরের বাতাসকে। বার্তাবহ ওই জিব তার কাছে অনেক সংবাদ পৌঁছে দেয়। নিজের দীর্ঘ চিত্রল শরীরের আলস্য এবার ঝেড়ে ফেলতে হবে। ফের জীবন ধারণ, ফের অন্বেষণ, ফের পলায়ন আর আত্মগোপন, ফের আত্মরক্ষার্থে আক্রমণ, স্মৃতিহীন, বোধ ও বিবেচনাহীন সে তার শরীরের সংকেত পেয়ে ধীর গতিতে একটু একটু করে এগোয়। শীতঘুমের পর তার শরীরে এখনও জড়তা, গতি শ্লথ। দীর্ঘ ঈষৎ আঁকাবাঁকা গর্তের মুখে গেলে অস্পষ্ট দিবালোকের একটা চাকতি। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সে নিঃশব্দে তার চারদিকটা দেখে।

ধানের উঁচু করা মরাইয়ের মাচানের তলায় বিষয়কর্মে ব্যস্ত ইঁদুরের যাতায়াত। শোনা যায় তাদের দুর্বোধ্য কিচকিচ শব্দ। একটি ইঁদুর গর্তের মুখ দ্রুত পেরিয়ে গেল, তার মুখের ওপর দিয়েই। সে তার ক্ষীণ মস্তিষ্কের সামান্য জৈব প্রয়োজনভিত্তিক সতর্কতায় তার চারদিকটা অনুধাবন করে নিল। নিয়তি-তাড়িত দ্বিতীয় ইঁদুরটি সামান্য অনভিজ্ঞতাবশে এসে গিয়েছিল গ্রাসের দূরত্বে। খর দাঁতে কয়েক দানা ধান জিবোচ্ছিল সে। বিদ্যুতের গতিতে সে মুখে তুলে নিল তাকে। আঁকুশির মতো দাঁতে বিদ্ধ ইঁদুরটা প্রাণপণে চেঁচাল খানিক। তারপর কম্পিত, চমকিত ছোট্ট শরীরটা অতি কষ্টে প্রাণপণ আয়াসে সে গিলতে লাগল। দীর্ঘ উপবাসের পর এ কোনও সুস্বাদ নয় তার কাছে। এ শুধু প্রয়োজন। শুধুই প্রয়োজন। আর কষ্ট। মুখ থেকে গলা অবধি টেনে নিতেও কষ্ট। গলা থেকে পেট। তার আহার্য গ্রহণও এক ধৈর্যশীল, ক্লেশকর, ধীর প্রক্রিয়া। আহারের কোনও স্বাদ ও আনন্দ নেই তার।

সতর্ক ইঁদুরেরা সরে গেছে নিরাপদ আড়ালে। সে ঝিম ধরে পড়ে রইল অনেকক্ষণ। মাচার তলাকার আবহাওয়ায় ভ্যাপসা গরম। এই তার বহির্গমনের উপযুক্ত ঋতু। ক্ষীণ দৃষ্টির চোখে সে মাচানের বাইরে রোদের ঝকঝকে তলোয়ার দেখতে পাচ্ছে, আলো ও ছায়াকে দ্বিখণ্ডিত করে সে এখন অপেক্ষা করছে তার জন্য।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

চোখের কি আনন্দ হয়? মনে হয় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই নিজস্ব আনন্দ, দুঃখ, বিষাদ ও উল্লাস আছে। হয়তো সবাই টের পায় না, কিন্তু সে পায়। ধীরেন জানে, অন্য সবাই তাকে ছিটিয়াল বলেই মনে করে। তা আছে বোধহয় তার মাথায় একটুছিট। যে মাথায় কাজের চিন্তা নেই, যে মাথায় বিদ্যে নেই, সৎ- কথা নেই, যে মাথা

নিজের অস্তিত্বের বাইরে বাদবাকি দুনিয়াটা নিয়ে ভাবল না সে মাথায় ছিট হবে না তো কি? তা আছে একটু ছিট। দুনিয়াটাও তো বড্ড ছোট তার। আগে তবু এ-গাঁ ও-গাঁ গতায়াত ছিল, গত কয়েক বছর এই গাঁয়ের গাছেই বড় আটক পড়ে গেছে।

এই যে দুনিয়াটা দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু এক মাপের নয়, এক চৌহদ্দিও নয় এর। লোক বুঝে দুনিয়াও ছোট-বড় হয়। এই গৌরহরিদা ছিলেন, তাঁর দুনিয়াটা কি ধীরেনের মতো ছোট রে বাবা! কত লোকজন আসছে যাচ্ছে, এসোজন-বোসোজন, মক্কেল-মুরুব্বি, উকিল-মুৎসুদ্দি, জজ-ব্যারিস্টার নিয়ে বিরাট ব্যাপার। কত লোকের সঙ্গে নিত্যি যোগাযোগ, কত জীবনের কত কথা এসে যোগ হচ্ছে জীবনে, যেমনটা খালবিল নদীনালার জল এসে দরিয়ায় পড়ে, তবে না বারদরিয়ার অত বড় প্রসার। সেই তুলনায় ধীরেনের ডোবায় জলই নেই মোটে। ছোট্ট এঁদো-পুকুর বই তো নয়।

পাঁচটা লোকের সঙ্গে কথা কইতে আর শুনতে বরাবর বড্ড ভালবাসে ধীরেন। কিন্তু তার সঙ্গে কথা কইবে কে? কার গরজ! তাই সে গিয়ে সন্ধেবেলার দিকে গৌরহরিদাদার চেম্বারে এক কোণে চেপে বসে থাকত। কথা শুনত। মামলা-মোকদ্দমার কূট কথাই সব। তবু তাইতেও ভারী আনন্দ হত তার। কত কী শোনা হয়ে যাচ্ছে, জীবনে যোগ হচ্ছে কিছু। গৌরহরিদা কিছু বলত না। কথা শোনা আর লোকের মুখচোখ হাবভাব দেখা। নেশার মতো ছিল ব্যাপারটা! গৌরহরিদাদা মাঝে মাঝে তাকে জিজ্ঞেস করত এই লোকটাকে দেখে কিছু বুঝলি? কেমন গোলগাল ভালমানুষের মতো মুখ, দেখে বোঝা যায় যে আটটা খুন করেছে? বড় মাপের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করলে নিজের মাপটাও একটু একটু করে বাড়ে।

কিন্তু কথা হল, ধীরেনেরও একটা আলাদা ছোট দুনিয়া আছে, যেমন সব মানুষেরই থাকে। সেই দুনিয়ায় ধীরেনের বোকা-বুদ্ধিতে নানা অদ্ভুত জিনিষ ধরা দেয়। এই সেদিন রাখাল রায়ের বাড়িতে দ্বাদশ ব্রাহ্মণ খাওয়াল। মায়ের বাৎসরিক, ধীরেন বামুন নয়, তবু পুরনো একটু আত্মীয়তা ছিল বলে তাকেও ডেকেছিল খেতে। ধীরেন এখন তু বললেই যায়। তা খাসির মাংস হয়েছিল সেদিন! হাড় চিবোতে গিয়ে ধীরেন টের পেল যৌবনকালে মাংস খাওয়ার সময়ে দাঁতের একটা আলাদা আনন্দ হত। মোটা মোটা হাড়ের মধ্যে ননী লুকিয়ে থাকে। চুষলে বেরোতে চায় না। পিছন দিকটা ভেঙে ভেন্টিলেশন না করে নিলে ওই ব্যাটা ননী বেরোবেও না। তা তখন দাঁতের জোর ছিল বটে, কড়াক করে মোটা হাড়ের গোড়া ভেঙে হাড়ের ভিতরে লুকিয়ে থাকা ননী বের করত। রাখালের বাড়িতে সেদিন খেতে বসে দেখল দাঁতের আর আনন্দ হচ্ছে না। হাড় ভাঙতে গিয়ে দাঁতই ভেঙে যাওয়ার দশা, ননীচোরা হাড় পাতে ফেলেই উঠতে হল।

বুড়ো হলে কোনও কোনও প্রত্যঙ্গে আনন্দ কমে যায় বটে, তবে কিছু থাকেও। এই যে তার চোখ দুখানা, দুটোতেই ছানি পড়েছিল। যত মলিন হল দৃষ্টি ততই যেন চোখ দুখানা মন খারাপ করে থাকত। এখন বাঁ চোখের ছানি কাটার পর একটা চোখে আনন্দ নেচে বেড়াচ্ছে। দেখে দেখে যেন আর ফুরোতে চায় না দেখা। কত কী দেখতে পায় ধীরেন এখন, মনে হয় যেন যৌবনকালেও এত ভাল দেখতে পেত না। সবই ভারী নতুন নতুন লাগে আজকাল।

নিজের বউয়ের মুখখানা সেদিন ভাল করে দেখছিল। সোজাসুজি নয়, সোজাসুজি তাকাবে অত সাহস আর নেই ধীরেন কাষ্ঠের। বউ পাঁজি না কী একটা উলোঝুলো চটি বই খুলে দেখছিল দাওয়ায় বসে। পাশ থেকে বাঁ চোখ দিয়ে খুব মন দিয়ে দেখছিল ধীরেন। কিছু ইতরবিশেষ মনে হল না। যৌবনের মুখটা তো নেই, সেই

জায়গায় কোন কুমোর এসে যেন আর একখানা মুখ বসিয়ে দিয়ে গেছে। যৌবনেও খ্যাঁকানো স্বভাব ছিল, তবে একটা চটক ছিল তখন। দেখতে তেমন খারাপ ছিল না, স্বভাবটা আরও তিরিক্ষে হয়েছে, আর মুখটা যেন অন্য মানুষের মুখ। তবু এই বউকে নিয়েই তো তার উত্তাল যৌবন ভারী উদ্দীপ্ত হত।

আজও কি হয়? নির্লজ্জ ধীরেন কাষ্ঠ সেই রাতে, এই বৃদ্ধ বয়সে তার বউয়ের কাছে শরীর চেয়েছিল। ওই বয়সে ভাঁটিয়ে-যাওয়া শরীর। তার বউ খুব অবাক হয়ে তার দিকে হ্যারিকেনের নিবু-নিবু আলোয় চেয়ে থেকে বলেছিল, গলায় দড়ি দাও গে। বেহায়া বেল্লিক পুরুষ।

না, অপমান আর গায়ে লেগে থাকে না আজকাল। তবে অপমানে পুরুষের কামজ্বর ছেড়ে যায়। সুরুত করে পারদ নেমে যায় নীচে। তবে ধীরেনের আত্মগ্লানি নেই। চেয়েছিল, দিল না, ব্যস।

তবে এই যে অনেকদিন পর কাম ভাবটা, এটা বোধহয় ছানি কাটানো চোখটারই গুণ। নইলে হয় কী করে?

ধীরেন ভেবেছিল, বাকি জীবনটা এক চোখেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে। ডান চোখ কাটানোর হাঙ্গামায় আর যাবে না। আজকাল ভাবে, তা কেন, এবার ডান চোখটাও কাটিয়ে নেওয়া যাক। শুধু দেখাই তো নয়। চোখের ভিতর দিয়ে নানা দৃশ্য এসে তার ভিতরটাকেও বোধহয় ঝাড়পোঁছ করে দিচ্ছে। পুরনো ঘরে নতুন রং লাগাচ্ছে। চোখের আনন্দে তার ভাঁটিয়ে-যাওয়া বয়সও ফিরে আসছে বুঝি।

দুজনে কফি খেতে খেতে মহিম গম্ভীর মুখ করে সব শুনল। তারপর একটু হেসে বলল, তোর মাথাটাই গেছে। পাগল কোথাকার! অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আবার আলাদা করে আনন্দ হয় নাকি? যত সব বাহাত্তুরে কথা।

ধীরেন কাষ্ঠ তর্ক করে না। তার পেটে বিদ্যে আর মাথায় বুদ্ধি কোনওটাই নেই। বড় মানুষদের সঙ্গে তাই সে কখনও কথার লড়াইতে নামে না। সে জানেই বা কতটুকু, বোঝেই বা কি। কিন্তু প্রকাশ্যে মেনে নিলেও মনে মনে সে যা বুঝেছে তাই বুঝেছে। যদি তা ভুলও হয় তাতেই বা কী? কত ভুল আঁকড়ে থেকে মানুষ বেমালুম জীবন কাটিয়ে দেয়। সব সত্য জানতেই হবে এমন কী মাথার দিব্যি দেওয়া আছে? দুনিয়াটা যে যার নিজের মতো করেই বোঝে। দুনিয়া তো আর একটা নয়। যত মানুষ তত দুনিয়া। ওই যে সব কুকুর বেড়াল পশুপাখি ওদের দুনিয়াও আলাদা রকমের। ধীরেন এরকমই বোঝে। আর বুঝটা যদি একদিন ভেঙে যায় তবে তার খুব কষ্ট হবে।

মহিম দুলে দুলে হাসছিল, বউমার ওপর চড়াও হয়েছিলি এই বয়সে, তোর আক্কেলটা কী রে?

কাঁচুমাচু হতে গিয়েও হতে পারল না ধীরেন। হেসে ফেলল, কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বলল, একটা তাড়নার মতো হল, ভাবলাম দোষের তো কিছু নয়।

তোর বয়স আশি ছাড়িয়েছে না?

তা তো হবেই।

ওসব করতে গেলে হার্ট অ্যাটাক না হয়ে যায়। পাগল কি আর গাছে ফলে! আহাম্মক কোথাকার।

বীরেন আহাম্মকের মতোই হাসছিল। তার পেটে কোনও কথা থাকতে চায় না। কাউকে-না-কাউকে বলে ফেলে, আগে গৌরহরিদাদাকে সব বলত। আজকাল মহিমদাদাকে বলে। বলে ফেলার মধ্যে একটা খালাস আছে। বললেই মনের ভারটা কমে যায়। অনুতাপ-টাপও থাকে না তেমন।

এই চোখটা কাটিয়ে ইস্তক আমার কীসব যেন হচ্ছে। ঠিক আগের মতো আর নেই আমি। মাঝে মাঝে ভারী ফুর্তির ভাব আসে। শরীরেও কীসব চাগাড় দিয়ে উঠছে।

দুনিয়ায় কত লোক ছানি কাটাচ্ছে তাদের এরকম ধারা হচ্ছে বলে শুনিনি তো! তোরই সব উদ্ভুটে ব্যাপার হয় কেন?

সেটাই তো ভাবছি।

এই বয়সে অত উচাটন ভাল নয়। সামলে সুমলে থাক। ঠাকুর-দেবতার নাম করলেও তো পারিস।

ভগবানের কথা উঠলে ধীরেন সত্যিকারের কাঁচুমাচু হয়ে পড়ে। ওই একটা ব্যাপারে সে বরাবর ফাঁকিতে থেকেছে। তার কেবলই মনে হয়, ও নাগালের বাইরের ব্যাপার। ধীরেন ঠিক নাস্তিক নয়, তবে ভাবে, তিনি যদি আছেন তো সবই দেখছেন-টেখছেন, সবই বুঝছেন, আর যা করার করবেনই। ডাকাডাকি করে লাভ নেই। ধীরেনের ডাকে বাড়ির পোষা কুকুরটাও নড়তে চায় না, ভগবান কোন ছাড়।

কফিতে আরও একটা চুমুক দিয়ে ধীরেন বলে, ভগবানকে ডেকে তেমন জুত পাই না দাদা। পাপীতাপী মানুষ তো। কত অপকর্ম করে বসে আছি, ভগবান তেমন খেয়াল করেননি হয়তো। ডাকাডাকি করলে হয়তো নড়েচড়ে বসবেন, ভাববেন, দেখি তো ব্যাটার খাতাখানা খুলে পাপপুণ্যির হিসেবটা। তাহলেই তো হয়ে গেল। একেবারে চিৎপাত করে ফেলে দেবেন।

তোকে নিয়ে আর পারা যায় না।

হেঁঃ হেঁঃ করে একটু হাসে ধীরেন কাষ্ঠ। তারপর বলে ধর্মকর্ম করতে বড় দেরিও হয়ে গেছে। এখন ওসব করতে গেলে ভগবান ভাববেন, মশকরা করছি। আরও একটা কথা দাদা।

কী কথা! বলে ফেল।

ভিতু মানুষের কি ধর্মকর্ম হয়? সব ব্যাপারেই যারা জুজুবুড়ি দেখে তাদের ধর্মকর্মেও জুজুবুড়ি ঘাপটি মেরে থাকে। ডাকছে হয়তো কালী বা কেষ্ট ঠাকুরকে, কিন্তু মনের মধ্যে খাপ পেতে আছে জুজুবুড়ির ভয়। তাই পুজো শেষ অবধি ওই জুজুবুড়ির পায়ে গিয়েই পড়ে।

দামড়া কোথাকার। তবে কথাটা খুব খারাপও বলিসনি। আমার এক বিধবা পিসিমাকে দেখেছি ধর্মের নামে এমন শুচিবায়ু করে বেড়াত যে শেষ অবধি মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছিল। তবু বলি ধর্ম না করিস অধর্মও করতে যাস না।

কফির কাপটা জগের জল দিয়ে ধুয়ে সাবধানে রেখে ধীরেন উঠল।

বড্ড রোদ ওঠে আজকাল, ছাতা নিয়ে বেরোসনি?

পুরনো ছাতাটার শিক-টিক ভেঙে রয়েছে দেখলাম। না সারালে চলবে না।

এই রোদ বেশি মাথায় না লাগানোই ভাল। তোর যে বয়স হয়েছে সে খেয়ালটা রাখিস তো!

রেখেই বা হবে কী? বয়সকে তো কেউ খাতির করছে না। রোদে জলে মরব কিনা বলতে পারি না। তবে মনে হয়, মরণ এখনও দূরে আছে।

ভাল, দূরে থাকাই ভাল।

কিন্তু খুব দূরেও ছিল না মরণ। সেটা মহিমদাদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে শর্টকাটে যাবে বলে ঘাসজমিতে কয়েক কদম হাঁটার পরই টের পেল ধীরেন।

দুদিন বৃষ্টি গেছে মাঝখানে। তাইতেই ঘাসগুলো যেন তেজালো হয়েছে একটু। চটিসুদ্ধ ডান পা বাড়িয়ে ফেলতে গিয়েও তার সদ্য কাটানো বাঁ চোখ ঘাসের গভীরে চিত্রল একটি হিলিবিলি চকিতে দেখতে পেয়ে

গিয়েছিল।

বাপ রে! বলে ধীরেন পিছোতে গিয়ে বেকায়দায় চিত হয়ে পড়ে গেল পিছনে। সাপটা প্রায় গা ঘেঁষে ফিসফাস করে আপন মনে কথা কইতে কইতে চলে গেল দূরে।

মাজায় বেশ লেগেছে। ধীরেন উঠে বসল। একটু দম নিয়ে হাঁটুতে ভর করে দাঁড়াল। না, তেমন কিছু নয়। অল্পের ওপর দিয়েই চোটটা গেছে। সে ঘাসজমি ছেড়ে রাস্তা ধরল।

বাঁ চোখই বাঁচিয়ে দিল তাকে। বেঁচে গিয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে তার। অনেকটা কামভাবের মতোই যেন একটা কিছু, ভারী অদ্ভুত লাগছে বটে। আনন্দটা একটা যেন সুড়সুড়ির মতো। সাপের বিচিত্র শরীরের এই গতি ওর মধ্যে কামের কোনও অনুষঙ্গ আছে নাকি রে বাবা! আশির কাছাকাছি বয়সে এসব আবার কীরকম ভাবসাব?

একবার ভাবল ফিরে গিয়ে কথাটা মহিমদাদাকে জিজ্ঞেস করবে। তারপর ভাবল, কাজ কী, তার কথাকে তো কেউ গুরুত্ব দেয় না। এই আবছা মাথায় সে যা বুঝেছে ওটুকুই তার থাক। বেশি বুঝে হবে কী।

তোমার হাতে পোস্টকার্ডটা দেখে আমার ভীষণ অবাক লাগছে।

কেন রে?

সেদিন স্বপ্ন দেখছিলাম তোমার বর তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছে আর তুমি তার কাছে চলে যাচ্ছ। সব ছেড়েছুড়ে।

ও মা! বলিস কী? সত্যি স্বপ্ন দেখেছিলি?

হ্যাঁ পিসি। আমি তোমার ওপর খুব রাগ করছিলাম।

অবাক কাণ্ড তো!

কেন পিসি?

এ তো সত্যিই তার চিঠি রে! আজকের ডাকেই এল! হ্যাঁ রে, তোর মধ্যে তো ভগবান অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন!

দুর! ওসব কিছু নয়। এটা সত্যিই তোমার হাজব্যান্ডের চিঠি?

হ্যাঁ। তবে এটা প্রথম নয়। মাস তিনেক আগে আরও একটা লিখেছিল। তাতে শুধু কুশল প্রশ্ন ছিল। আমি অবশ্য জবাব দিইনি।

এবার চিঠিতে কি তোমাকে যেতে লিখেছে?

করুণ একটু হেসে সন্ধ্যা বলল, না রে, সে আর আমাকে চায় না। তবে আমার টাকা চায়। পড়ে দেখ না। প্রেমপত্র তো নয়।

ও বাবা। আমি ছাপা বাংলা পড়তে পারি, কিন্তু হাতের লেখা বাংলা পড়তে পারি না। আর এই ভদ্রলোকের হ্যান্ডরাইটিং ভীষণ জড়ানো। তুমিই পড়ো না।

ও আর পড়ে কী হবে। দুর্গাপুরের কাছে কোথায় যেন বাড়ি করছে। টাকার জন্য কাজ আটকে গেছে। খুব করুণ করে কিছু ধার চেয়ে পাঠিয়েছে।

হি ইজ শেমলেস, তাই না?

আমি ভাবি, আমার আর কোনও খবর তার কাছে না পৌঁছলেও আমার টাকার খবর কিন্তু ঠিক পৌঁছে গেছে। টাকার কত ক্ষমতা দেখেছিস?

খবরটা কে দিল পিসি?

কত লোক আছে। মেয়েমানুষ ব্যবসা করে পয়সা করছে দেখে কত লোকের আঁতে লাগে, চোখ কটকট করে। তাদেরই কেউ জানিয়ে দিয়েছে।

দেবে নাকি টাকা?

এখনও ভাবিনি কিছু। আমার তো আর তার সংসার করা হল না, টাকাও জমে যাচ্ছে। কী করব বল তো! দেওয়া উচিত হবে কিনা সেইটেই ভেবে পাচ্ছি না।

ধার নিয়ে যদি শোধ না দেয়?

সেটা যে দেবে না তা খুব জানি। ধার বলে দেবও না। আমি শুধু উচিত অনুচিতের কথা ভাবছি।

এই একটা জায়গায় তোমার ভীষণ উইকনেস, তাই না পিসি? নইলে এমনিতে তুমি বেশ হার্ডেনড মেয়ে।

তোরা হলে সে চাইতেই সাহস পেত না। সে লোক চেনে। সে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না বটে, কিন্তু আমি তো মন থেকে উপড়ে ফেলতে পারিনি সম্পর্কটা। তাই দুর্বল হয়ে পড়ি।

তোমরা একটু কেমন যেন আছ। তাই না? তুমি, বলাকা।

এই ধিঙ্গি মেয়ে, বলাকা কী রে? আমরাই জেঠিমা ডাকি।

তা হোগ গে, আমার তো খুব বন্ধুর মতো মনে হয়।

দেব মাথায় গাঁট্টা, তা জেঠিমার আবার কী হল?

তোমার মতোই। একজন পুরুষকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। এটা কী করে হয় তাই ভাবছি। তোমাদের অবস্থা তো দাসী-বাঁদির চেয়েও খারাপ।

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বলল, তা নয় রে।

তাহলে?

সমাজের নিয়ম কি সব সময়ে সকলের ক্ষেত্রে খাটে? মানুষের মনের ভিতরটায় কত কী আছে, বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না।

তা বলে তুমি লোকটাকে টাকা দেবে?

দেবো বলিনি। ভাবছি। আমার তো অনেক টাকা জমে আছে, আমি মরলে সে টাকার কী গতি হবে কে জানে। তা সেই লোকটার যদি উপকার হয় সে কথাই ভাবছি। টাকা দিলে লোকটার হয়তো একটু আক্কেলও হবে। আয়নায় নিজের মুখ দেখতে লজ্জাও করবে। তাই না, বল!

সেসব আমি জানি না। শুধু জানি, তোমার কিচ্ছু হবে না। তুমি এক্কেবারে যা-তা।

সন্ধ্যা হেসে ফেলে। তারপর হঠাৎ চোখের জল সামলাতে শাড়ির আঁচল চেপে ধরে চোখে। একটু চুপ করে থাকে। তারপর ধরা-ধরা গলায় বলে, তবু যা হোক আমার একটা দাম হয়েছে তো তার কাছে, এতদিন বাদে। একটু গুরুত্ব তো দিচ্ছে, হাত পাতছে।

তোমার যা খুশি কর গে। আমি তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

সত্যিই বলেছিস, আমি একেবারে যাচ্ছেতাই। বড্ড সেন্টিমেন্টাল। কিন্তু কী জানিস, কয়েকদিন আগে বড়দার ঘরে টি ভি-তে একটা সিনেমা দেখছিলাম। ইংরেজি ছবি। তাতে একটা মেমসাহেব একটা সাহেবের জন্য যা ল্যালামি করছিল দেখলে তোর রাগ হত। ছেলেটা মেয়েটাকে একদম পাত্তা দিচ্চিল না, একবার তো ধাক্কা মেরে ফেলেই দিল। গালাগালও করছিল যেন। তবু মেয়েটা এমন হ্যাংলামি করছিল যে বলার নয়। ইংরিজি তো ভাল বুঝি না। ছবিটা দেখে ভাবলাম, সাহেবদের দেশেও তো এরকম হয়। ওরা অবশ্য স্বামী-স্ত্রী ছিল না, প্রেমিক-প্রেমিকাই হবে।

সেই ছবিটাই বুঝি তোমার ইনস্পিরেশন?

না রে। ছবিটা দেখে মনে হল, এরকম হয়, হতে পারে। ও-দেশে যেমন হয়, এ-দেশেও তেমন হয়।

সোহাগ হেসে ফেলল। বলল, এই জন্যই তোমাকে এত সুইট লাগে আমার।

সন্ধ্যা লাজুক হেসে বলে, বোকা বলে তো!

একজ্যাক্টলি। তুমি একদম বুদ্ধু আর বোকা। তাই এত সুইট। বুঝলে?

ভাগ্যিস বুদ্ধিমতী হইনি, তাহলে তো আমার সঙ্গে তোর এত ভাব হত না। হত, বল?

বোধহয় না।

হ্যাঁ রে, আমার পুষ্যি মেয়ে হবি?

ও আবার কী কথা পিসি? আমি তো তোমার মেয়েই।

মা বলে তো ডাকিস না!

তা ডাকতে পারি। কিন্তু তুমি যে মায়ের মতো বড় নও।

আমার বয়সই বুঝি বসে আছে!

তাহলেও তুমি আমার মা হওয়ার পক্ষে একটু বেশি ইয়ং।

সন্ধ্যা লাজুক হেসে বলে, তা অবিশ্যি ঠিক। আমি মা আর বাবার বুড়ো বয়সের সন্তান। বেশি বয়সে সন্তান হওয়াতে নাকি মা-বাবার নিন্দে হয়েছিল। থাক বাবা, পিসিই ডাকিস। মা ডাকলে আবার পাঁচটা কথা উঠবে। বউদিও পছন্দ করবে না। আসল কথা কী জানিস? একটা ভালবাসার লোক থাকলে কাজকর্ম করে একটা আনন্দ হয়। আমি ভেবে রেখেছি আমার সব টাকা-পয়সা, ব্যবসা-ট্যাবসা সব তোকেই দিয়ে যাব।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি যাবেটা কোথায়?

যখন মরব তখনকার কথা বলছি।

হ্যাঁ পিসি, তোমার বুঝি ইচ্ছামৃত্যু?

কেন রে, একদিন কি মরব না?

ইউ আর ইন মিড থার্টিজ। মরার বয়স হতে যে ঢের দেরি। ততদিনে আমি কোথা থেকে কোথায় চলে যাব তার কি ঠিক আছে? হিসেব করলে তোমার যখন মরার বয়স হবে তখন আমিও বুড়ি হয়ে যাব।

দুজনেই খুব হাসল।

কথা হচ্ছিল নিমের ঝিরঝিরে ছায়ায় দুটো মোড়া পেতে বসে। পাশেই ধানের মরাই। সামনে অনেকটা ঘাসজমি। একটা ভুঁই কুমড়োর গাছ লতিয়ে গেছে অনেক দূর অবধি। কুমড়ো ফলেছে অনেক। সবজে-সাদা

কচি কুমড়ো বয়ার মতো ভেসে আছে ঘাসের ওপর। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে সকালবেলার রোদে ওই ঘাসজমিটা।

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে ছিল সোহাগ। অবাক হয়ে দেখল ঘাসজমিটার মাঝামাঝি জায়গায় হঠাৎ একটা হাত উঠে আসছে শূন্যে। যেন ডুবন্ত কোনও মানুষ জলের ওপর অসহায় তার হাতখানা তুলে দিয়েছে। অবাক চোখের বিভ্রম খসে পড়তেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল সোহাগ।

সন্ধ্যা বলল, কী রে? কী হল?

দ্যাট স্নেক! আই লাভ দ্যাট স্নেক।

সন্ধ্যাও দেখতে পেল। প্রকাণ্ড পাকা বয়সের গোখরোটা ফণা তুলে আছে।

কোথায় যাচ্ছিস! বলে আর্তনাদ করে ওঠে সন্ধ্যা।

দাঁড়াও। আই মাস্ট হ্যাভ এ ক্লোজ লুক। বলেই ঘাসজমির দিকে ছুটে গেল সোহাগ।

করিস কী পাগল! মরবি নাকি? বলে সন্ধ্যা ছুটে গিয়ে একটা হাত ধরে ফেলে টেনে আনে সোহাগকে।

সোহাগ হিহি করে হেসে বলে, তুমিই না বলেছ ওটা বাস্তুসাপ! আমাদের পোষা!

দুর বোকা! বাস্তুসাপ বলেই কি আর বিষ নেই নাকি?

তুমি যে বলেছিলে ওরা কামড়ায় না!

সন্ধ্যা ভয়ার্ত চোখে সোহাগের দিকে চেয়ে বলে, সর্বনাশী মেয়ে বাবা তুই! বাস্তুসাপ বলে কি বুকে টেনে নিতে হবে নাকি? ক্ষেপি কোথাকার!

আমার যে খুব বিশ্বাস হয়েছিল, ওটা আমাদের পোষমানা সাপ।

ঘাসজমিতে উঁচু হয়ে থাকা হাতখানা বাতাসে খানিক দোল খাচ্ছিল। তার সাদাটে বুকে রোদ। চারদিকটাকে পেরিস্কোপের ভঙ্গিতে বুঝবার চেষ্টা করছিল সে। তারপর ধীরে ধীরে ডুবে গেল ঘাসের গভীরে।

আমার অনেকদিন ধরে একটা সাপ পুষবার শখ।

আচ্ছা মেয়ে রে বাবা! তুই বোধহয় সব পারিস। আমার বুকটা এখনও ধকধক করছে।

হি হি করে হাসল সোহাগ, কেন ভয় পাও পিসি? আমার তো একটুও ভয় করে না। আমি একদিন সাপটাকে ফলো করব। দেখব ও কোথায় কোথায় যায়, কী কী করে, ওর লাইফ স্টাইলটা কীরকম। হাত নেই। পা নেই। শুধু একটানা একটা শরীর, আশ্চর্য না?

এবার সন্ধ্যাও হেসে ফেলে, তার পর গম্ভীর হয়ে বলে, ওসব যদি করিস তাহলে আমার মরা মুখ দেখবি, এই বলে রাখলাম।

কেমন আছো পারুলদি?

একটু আগেই রাত এগারোটা বেজেছে, পারুল জানে। তবু একবার দেয়ালঘড়িটার দিকে তাকাল। এগারোটা কুড়ি। বলল, অ্যাই হনুমান, রাত সাড়ে এগারোটায় ফোন করে কুশল প্রশ্ন করা হচ্ছে? ব্যাপারটা কী তোর?

আহা, রাত সাড়ে এগারোটায় একটা লোক কেমন আছে তা জানার কৌতূহল কি হতে পারে না? ধরো সকালে হয়তো লোকটা ভাল আছে, বিকেলে খারাপ, রাত এগারোটায় হয়তো খুব ভাল। সেইজন্যই কুশল প্রশ্নও বিভিন্ন সময়ে, এমনকী আনগডলি আওয়ারেই করা উচিত।

থাপ্পড় খাবি।

শুয়ে পড়েছিলে নাকি?

না রে। ইয়ার এন্ডিং আসছে, হিসেবপত্তর নিয়ে বসেছি।

তোমার ছোটো ছেলেটা? হাউ ইজ হি?

ছেলের নামে একটু উথলে ওঠে পারুল। মাত্র তিন মাস বয়েস। তবু তার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা দেখতে পায় পারুল। মায়েরা দেখে।

আর বলিস না ভাই, যা দুষ্টু হয়েছে। ওকে নিয়েই তো সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়।

কেন, তোমাদের আয়া-টায়া নেই?

তা আছে। দুজন। তবু এটাকে আমি নিজের মতো করে মানুষ করতে চাই বলে আমাদের কাছে বেশি দিই না। হ্যাঁ রে বিজু, এত রাতে ফোন করলি যে হঠাৎ!

আরে আজকাল কেবল টিভি-র গুণে কোনও বাড়িতেই কেউ রাত বারোটা-একটার আগে শুতে যায় না। তাই ভাবলাম, তোমাকে একটু ফোন করে খবর নিই।

আসলে বেশি রাতে ফোন এলে বুকটা ধক করে ওঠে। কার কী হল সেই চিন্তা হয়।

আরে না না। ঘাবড়ানোর কিছু নেই।

তোর খবর কী?

নাথিং নিউ। যথাপূর্বং।

বাজে বকিস না। সব জানি।

কী জানো?

পান্নার সঙ্গে ফোনে আমার কথা হয়।

পান্না! ও আবার কী লাগিয়েছে তোমার কাছে?

যা সত্যি তাই বলেছে।

দুর দুর। যা শুনেছ সব বাজে কথা।

কী শুনেছি তা জানলি কী করে? এখনও তো বলিনি কিছু।

আসলে ওই সোহাগকে নিয়ে তো!

হ্যাঁ তো!

গাঁয়ের লোকেরা কূপমণ্ডুক হয়, জানো তো! মুখরোচক কিছু পেলেই হল।

তাহলে কি ঘটনাটা কি সত্যি নয়?

আরে না। আমার কম্পিউটারে ই-মেল চেক-টেক করে! বেশি কথাও হয় না আমাদের। বিশ্বাস করো।

করলাম। সোহাগ অন্য রকমের মেয়ে। অন্য সব মেয়ে যা করে ও তা কিছুতেই করবে না। সত্যি কথা বল তো, ওকে তোর ভাল লাগে?

এমনিতে ঠিকই আছে।

পছন্দ?

আহা, পছন্দের কথা উঠছে কেন?

বল না, আমি অনেকদিন আগেই মনে মনে তোর জন্যই ওকে বাছাই করে রেখেছিলাম।

তোমাদের কি সব সম্পর্কের একটা হেস্তনেস্ত না করে শান্তি নেই?

হেস্তনেস্ত আবার কী? মেয়ে পুরুষের দুজনের দুজনকে পছন্দ হলে বিয়ের কথা তো উঠবেই।

পারুলদি, তুমি কিন্তু কিছুদিন আগেও এত সেকেলে ছিলে না।

তোর আর বেশি একেলে হওয়ার দরকার নেই। তৈরি হ।

পাগল নাকি! এখনও আমার প্র্যাকটিস জমেনি।

বাজে কথা বলিস না। সব খবর জানি।

কী জানো?

বাবার সব মক্কেল এখন তোর হাতে। বাবার অর্ধেক করা মামলাগুলো সব তুই হাতে নিয়েছিস এবং এখন তোর রোরিং প্র্যাকটিস—ঠিক বলেছি?

যা শুনেছ ততটা নয়। যে কোনও গল্পের চারাগাছই বর্ধমান থেকে জামশেদপুর যেতে যেতে মহীরুহ হয়ে যায়।

গাড়িও তো কিনেছিস শুনলাম। সেটা কি আকাশ থেকে পড়ল?

আরে সেকেন্ডহ্যান্ড মারুতি এইট হান্ড্রেড, ও তো আজকাল হকারদেরও থাকে।

বাজে বকিস না, গাড়ির বাজার আমি ভালই জানি। সেকেন্ড হ্যান্ড কিনলি কেন? পান্না যে বলল, নতুন গাড়ি।

এক রকম নতুনই। আমার এক মাড়োয়ারি ক্লায়েন্ট কিনেছিল। হাজার কিলোমিটারও চলেনি।

হাজার কিলোমিটার! তাহলে তো একদম নতুন!

ওই এক রকম।

আর বিনয় করতে হবে না। গাড়িতে সোহাগকে চড়িয়েছিস?

সাহস পাইনি।

তার মানে?

ও ওসব গাড়িবাজি পছন্দ করে না।

তাহলে কী পছন্দ করে?

চুপচাপ বসে থাকা।

ওমা! তোদের মধ্যে ভালবাসার কথা হয় না?

পাগল নাকি?

তোরা কী রে?

এসব পোস্ট মডার্ন পারুলদি, তোমরা বুঝবে না। বড্ড সেকেলে আছ এখনও।

একটু পাগলি আছে ঠিকই, কিন্তু শি ইজ ভেরি গুড অ্যাট হার্ট, আমাকে কেন যে গডেস ভাবত কে জানে!

তোমাকে অনেকেই গডেস ভাবত পারুলদি।

মারব গাঁট্টা। কে আমাকে গডেস ভাবত রে?

এ-গাঁয়ের তৎকালীন ব্যর্থ যুবকেরা।

তোর মুন্ডু। শোন, তোদের ওই পোস্ট মডার্ন সম্পর্কটা যেন কেটে না যায়। আজকাল ছেলেতে-মেয়েতে ভাবসাব হতে না হতে বড্ড ছাড়কাট হয়ে যায়। তুই তো আবার কাঠখোট্টা গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের, তার ওপর পিউরিটান। তোর যে কী হবে কে জানে বাবা।

আমার কিছু হওয়ার নয়।

সেই জন্যই তো ভয়। তুই যেমন বেরসিক, তেমনি জুটেছে তোর সোহাগ পাগলি।

ইয়ে পারুলদি, কাল পরশু একবার চলে এসো না।

দুর পাগল! এখন কি আর যাওয়ার উপায় আছে! বললাম না ইয়ার এন্ডিং।

আরে রাখো তো ইয়ার এন্ডিং। ওসব করার জন্য তোমাদের অনেক কর্মচারী আছে। শোনো, বড়মার আজ একটু ব্রিদিং ট্রাবল হচ্ছে।

সর্বনাশ! এতক্ষণ বলিসনি?

আরে অ্যালার্মিং কিছু নয়। ডাক্তার এসে দেখে-টেখে গেছে।

আমি তো সন্ধেবেলাতেই মার সঙ্গে কথা বললাম। তখন তো—

তখন ছিল না। রাত আটটা নাগাদ ব্যাপারটা হয়। নাথিং সিরিয়াস।

সিরিয়াস না হলে আমাকে তুই যেতে বলতিস কি?

বড়মা নিজেই একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে। তোমাদের দেখতে চাইছে।

দাঁড়া আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলব।

আরে দাঁড়াও, শি ইজ আন্ডার সেডেটিভ। আমি তো বড়মার কাছেই আছি। শি ইজ পিসফুলি অ্যাস্লিপ, পারলে চলে এসো।

হ্যাঁ রে, সত্যি করে বল তো সিরিয়াস নয়?

আরে না।

দাদাদের খবর নিয়েছিস?

হ্যাঁ, ফোন করেছিলাম। দে উইল বি হিয়ার বাই টুমরো।

আমার বুকটা কাঁপছে রে। ডাক্তার কী বলল?

ডাক্তার বলেছে, ব্রংকিয়াল ব্লক থেকেও হতে পারে। কাল আমি বড়মাকে ই সি জি করাতে নিয়ে যাব বর্ধমানে। সকালবেলায়।

তুই আছিস, এটাই যা ভরসা।

আমি আছি পারুলদি। চিন্তা কোরো না। বড়মা উইল বি অলরাইট।

ফোনটা যখন রাখতে গেল পারুল তখন তার হাত শিথিল। চোখে জল। মা বাঁচবে তো!

দুপুরের খরসান আলোয় সে স্রোতের মতো বয়ে এল এতদূর। সে কি একটু পরিশ্রান্ত? দীঘল শরীর কিছু শ্লথ। সামনে কিছু জটিলতা। ডালপালা আগাছার অবরোধ। সে ধীর গতিতে পেরোল। তারপরই একটা বাধা। বিপদ কি?

সামনেই সাদা, মসৃণ একজোড়া পা। ভারী সুন্দর পা। কোনও সুন্দরীর পা। কিন্তু তার কোনও সৌন্দর্যের বোধ নেই। নারীর মর্মও সে বোঝে না। সে শুধু বোঝে বিপদ, বোঝে বাধা।

সন্দিহান, কুটিল চক্ষুর দৃষ্টিতে সে লক্ষ করল সাদা পা দুখানাকে। শত্রুপক্ষ? খাদ্য? প্রতিরোধ?

একটু অপেক্ষা করল সে। শরীরে তার ভয়ের সংকেত। সে ভয় পায়।

পা দুটো নড়ে। একটু এগোয়, ফের পিছোয়। বিরক্তিকর। সে একটা শ্বাস ছাড়ল। তারপর ধীরে উত্তোলিত করতে লাগল তার ফণা।

পঁচাত্তর

মনোরম বন্ধনগুলো এইসব সময়ে টের পাওয়া যায়। যেন লতায় পাতায়, মায়ায়, মোহে বেঁধে রেখেছে হাত-পা, এমনকী মগজ আর মনও। কখন বাঁধা পড়ে যায় তা মানুষ টেরও পায় না। এইসব সংকটের ডাক এলে টের পাওয়া যায়। বোঝা যায় একটা সিস্টেমের কত আঁকুশি, কত ফের-ফেরতা। মায়ের অসুখের খবর পেয়ে সকালেই রওনা হবে বলে তৈরি হতে গিয়ে পারুল এইসব বন্ধনকে টের পেল খুব। মাত্র দু-চার দিনের জন্য যাওয়া, তাতেও কত বাধা, কত অসুবিধে। বড় ছেলেমেয়ে দুটোর স্কুল খোলা বলে যাবে না, তার বর নতুন প্রোজেক্ট নিয়ে ছোটাছুটি করছে দিন-রাত, তার নিজেরও কি শ্বাস নেওয়ার সময় আছে? তাদের ব্যবসা বাড়ছে, কারখানা বড় হচ্ছে, নতুন কারখানা তৈরি হচ্ছে, কোটি কোটি টাকার লগ্নি। কত দায়ভার তার মাথার ওপরে। তার অনুপস্থিতি ঘরগেরস্থালিতেও কত শূন্যতার সৃষ্টি করতে পারে। এইসব বন্ধন সারা রাত তার হাত-পা শিথিল করেছে, মন হয়েছে বিকল। এখন হুট বলতেই ছুটকারা পাওয়া বড় কঠিন। একটা ইংলিশ মিডিয়ম স্কুল করছে তারা, চলছে একটা কম্পিউটার আর স্পোকেন ইংলিশ ইন্সটিটিউট। সবই পারুলের দায়িত্বে। আর দায়িত্বটা বিশাল। সে তার বরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই কাজ করে। কত বেকার ছেলেমেয়ের সামনে সম্ভাবনার পথ খুলে দিচ্ছে তারা।

খুব সকাল থেকেই বারবার ফোন করেছে মাকে। মা ধরেনি, ধরেছে বিজু বা পান্না।

বিজু বলল, আরে, টেনশনের কিছু নেই। তুমি ধীরেসুস্থে এসো।

মায়ের সঙ্গে কথা বলা যাবে না?

কেন যাবে না? কিন্তু এখনও ঘুমোচ্ছে যে।

মা তো এত বেলা অবধি ঘুমোয় না।

এটা তো নরম্যাল ঘুম নয় পারুলদি। শি ইজ আন্ডার সেডেটিভ।

ইস, আমার যে বুকের মধ্যে কেমন হচ্ছে।

ডাক্তার তো অ্যালার্মিং কিছু বলেনি, ভাবছ কেন?

ডাক্তারটা কেমন?

অনল বাগচীর খুব নাম। এদিকে সবাই তো প্রশংসাই করে। বিদেশি ডিগ্রি আছে।

পারুল বাচ্চাটাকে নিয়ে রওনা হল দশটা নাগাদ। তাদের সদ্য কেনা এ-সি গাড়িতে, সঙ্গে আয়া, লাঞ্চের বাস্কেট, জল।

তার মোবাইলে সবসময়ে নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছিল না। তবু ঘণ্টা খানেক বাদে পান্নাকে পাওয়া গেল ফোনে।

কী খবর রে, মা কেমন?

তুমি আসছ তো! ওঃ কী ভালই যে হবে।

দুর মুখপুড়ি, মায়ের কথা বল।

বড়মাকে নিয়ে বিজুদা তো বর্ধমানে গেছে। ই সি জি হবে, আরও কী কী সব টেস্ট যেন।

মা নরমালি যেতে পারল?

হ্যাঁ তো।

ব্রিদিং ট্রাবলটা?

একটু আছে। খুব সামান্য। সবাইকে দেখতে চাইছে। বড়মার ধারণা হয়েছে, আর বাঁচবে না। শুনে আমরা খুব হাসিঠাট্টা করেছি।

আমার ভীষণ টেনশন হচ্ছে।

অত ভেব না। আমরা তো সবাই কাল রাতে বড়মার কাছে ছিলাম।

কে কে?

বাবা, আমি, ছোটমা, বিজুদা। একজন নার্সও ছিল। তুমি একদম ভেব না। বড়মা ঠিক আছে।

মায়ের যদি সিরিয়াস কিছু না-ই হবে তবে তোরা সবাই মিলে মায়ের কাছে রাতে ছিলি কেন?

আমরা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। বড়মার তো কখনও তেমন অসুখ-বিসুখ করে না। তাই শ্বাসকষ্ট হচ্ছে শুনে সবাই চলে এলাম। আজ সকালে সোহাগও চলে এসেছে খবর শুনে। তুমি এখন কোথায় পারুলদি? গলাটা অস্পষ্ট শোনাচ্ছে কেন?

কোথায় তা কি আমিই জানি? একটা পেট্রল পাম্পে থেমেছি। গাড়িতে তেল নেওয়া হচ্ছে। যেতে যেতে বিকেল হয়ে যাবে।

পারুল ফোন কেটে দিল।

সোহাগ বলল, ওয়াজ দ্যাট গডেস?

পান্না হেসে বলল, হ্যাঁ। তোমার গডেস এখন একজন বিগ উওম্যান। অনেক টাকা। শুনলাম স্কুল খুলছে। আমাকে বলে রেখেছে, পাস করলেই চাকরি। কী মজা হবে বল তো!

নাক কুঁচকে সোহাগ বলল, চাকরিতে আর কীসের মজা?

মজা নয়! আমার তো ভাবতেই থ্রিল হচ্ছে। চাও তো তোমার জন্যও বলে রাখি।

সোহাগ হাসল, চাকরি-টাকরি আমার ভাল লাগে না। রোজ একটা লোক একই কাজ কীভাবে করে ভাবতে আমার অবাক লাগে।

আহা, আমরা তো রোজ ভাত খাই, ঘুমোই, দাঁত মাজি। সেগুলোও তো একই কাজ।

সোহাগ কথাটার জবাব দিল না। হেসে বলল, ফ্রক পরে আজ তোমাকে একদম বাচ্চা মেয়ের মতো দেখাচ্ছে। ভারী সুইট।

লজ্জা পেয়ে পান্না বলে, ফ্রক পরতেই আমার ভাল লাগে কেন বল তো! আজকাল পরছি কেন জান? শাড়ি পরে ঘুমোলে বড্ড জড়িয়ে যায় পায়ে-টায়ে। আমার শোওয়া তো বিশ্রী। একদিন ভোরবেলা উঠতে গিয়ে পায়ে শাড়ি জড়িয়ে দড়াম করে আছাড় খেয়েছি। সেই থেকে শোওয়ার সময় ফ্রক পরে শুই। আজ বড়মার ঘরদোর সারতে হবে বলে ফ্রকই পরেছি। কত সুবিধে বল।

দুখুরি এসে বলল, ও দিদি, ঠাকুরঘর সারবে না! সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে যে!

যাচ্ছি, যাচ্ছি, তুই বড্ড হুড়ো দিস।

ইস তাই বইকী। মা তো কোন ভোরবেলা ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে দেয়।

সোহাগ বলল, মে আই হেলপ? কিছু কাজ আমিও করতে পারি।

চলো, তাহলে ফুল তুলে আনি।

দোপাটি আর টগর ছাড়া এখন তেমন ফুল নেই বাগানে। আছে, লঙ্কাজবা, দু-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে কদিন আগে। ঘাস আর আগাছা উঠেছে তেড়েফুঁড়ে। বড় টগর গাছটা থেকে ডিং মেরে ফুল পাড়ছিল পান্না।

হঠাৎ ফোঁস শব্দটা শুনে কেঁপে উঠল। একটু হলেই সাজিটা পড়ে যেত হাত থেকে। চোখ বিস্ফারিত করে নীচে তাকাতেই স্পষ্ট চোখাচোখি হয়ে গেল সাপটার সঙ্গে। একটা চিৎকার দিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল সে। ভয়ে কাঠ। সাপের চোখ চোখের পলকে সম্মোহিত করে ফেলল তাকে। সে চোখ সরাতে পারছে না, নড়তে পারছে না, বাকরুদ্ধ, চোখে পলক নেই।

একটু পিছন থেকে এগিয়ে এল সোহাগ।

এই, চেঁচালে কেন? কী হয়েছে? এনিথিং রং?

সাপটা ফণা তুলে আছে স্থির হয়ে। কুটিল চোখে পলকহীন এক দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে বিবশ করে ফেলছে পান্নাকে।

সোহাগ তার হাত ধরে হ্যাঁচকা একটা টানে সরিয়ে নিল। তারপর বলল, ভয় পাচ্ছ কেন? ইট ইজ জাস্ট এ স্নেক।

অজ্ঞানই হয়ে যেত পান্না, সোহাগের হ্যাঁচকা টানে চৈতন্য হল তার।

সে চেঁচাল, পালাও, পালাও।

তাকে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে সোহাগ বলল, টেক ইট ইজি। দেখ, সাপটা চলে যাচ্ছে। দেখ, হাউ ম্যাগনিফিসেন্ট ইট ইজ। সাপের মতো গ্রেসফুল কিছু হয়? ভয়ের কী?

অবাক হয়ে পান্না বলল, তুমি সাপকে ভয় পাও না, না?

আমি কোনও কিছুকেই ভয় পাই না। নট ইভন লোনলিনেস।

বেলা বারোটার মধ্যেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গেল বলাকা। সিরিঞ্জ ভরে কত রক্ত শরীর থেকে টেনে নিল ওরা। তারপর এক্স-রে, ইসিজি, ইকো কার্ডিওগ্রাম।

বিজু, এবার রেহাই দে বাবা। বাড়ি চল তো, একটু শুয়ে থাকি।

হ্যাঁ বড়মা, সব হয়ে গেছে। এবার যাব।

তুই তো সকাল থেকে দাঁতে কুটোটিও কাটিসনি। মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

যা খেল্ দেখাচ্ছ, খিদে উবে গেছে। শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

লাগবে না, কত রক্ত নিয়ে নিল বল তো।

শ্বাসকষ্টটা?

তেমন টের পাচ্ছি না এখন। তবে কোমর টনটন করছে, চোখ মেলে চেয়ে থাকতে পারছি না।

ওটা কাল রাতের সেডেটিভের এফেক্ট। তার ওপর কিছু খাওনি।

রামহরি বিষয়কর্মে কোথাও গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, জল-টল কিছু খাবে বউদি? এখানে একটা দোকানে ভাল রসগোল্লা হয়।

না ভাই। একেবারে বাড়ি গিয়েই যা হয় খাব, স্নানও করিনি তো।

তেষ্টা পেয়ে থাকলে বোতলের জল কিনে আনি।

আমার খিদেতেষ্টা যে কত কমে গেছে আজকাল, তোমরা জান না।

জানব না কেন, খুব জানি। খাওয়া-দাওয়া ছেড়েছ বলেই তো শরীরের এই হাল। আজকাল সত্তর- বাহাত্তর বছরের মহিলারা লিপস্টিক মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখ গে যাও। তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি।

বলাকা ক্ষীণ একটু হাসল।

বাড়িতে ফিরেই অবশ্য মনটা ভাল হয়ে গেল। ছেলেরা, বউরা ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে গেছে। বাড়ি গমগম করছে লোকে। বাড়িতে পা দিতেই সবাই যেন আগলে নিল তাকে।

এই তো তার ওষুধ, এই তো চিকিৎসা। গুচ্ছের ট্যাবলেট গিলে কি আর বেঁচে থাকা যায়! বাঁচতে তো মানুষজনও চাই। এই সত্যি কথাটা বলাকা কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারে না। আর পারে না বলেই ভিতরে ভিতরে তার ভূমিক্ষয় হতে থাকে। আজ বুকটা বড় ঠান্ডা লাগছে।

স্নান খাওয়ার পর আজ আর শোবে না বলে ঠিক করেছিল বলাকা, কিন্তু একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে কখন অসতর্কভাবে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল তখন সন্ধে। ডাক্তার বসে নাড়ি দেখছে। ঘরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সবাই।

কী হয়েছে তার? কী হয়েছে? উঠে বসতে যেতেই মাথাটা কেমন করল।

ডাক্তার অনল বাগচী বলল, না না, উঠবেন না, চুপ করে শুয়ে থাকুন।

আমার কী হয়েছে ডাক্তার?

অনল বাগচী বলল, তেমন কিছুই তো নয়। একটু রেস্ট নিন।

রেস্ট! আর কত রেস্ট নেব বাবা!

ডাক্তার জবাব না দিয়ে প্রেশারের যন্ত্র বের করল।

একটু রাতের দিকে এল মহিম রায়। চোখে জল, গলা আবেগে কাঁপছে, চলে যাওয়ার কথা ভাবছেন নাকি বউঠান?

বলাকা হাসে, চলে আর যেতে পারছি কই? দেখছেন না, ডাক্তার বদ্যি, ওষুধপত্রে বাড়ি ভরে গেল। ডাক্তার বলে গেল, ভয়ের নাকি কিচ্ছু নেই। ওরা তো বোঝে না, চলে যাওয়াটা মোটেই ভয়ের ব্যাপার নয়।

আপনার যে ইচ্ছামৃত্যু বউঠান। শরীরে মনে যাদের পাপ নেই তারা যেদিন ইচ্ছে দেহ ছাড়তে পারে। আমাদের মতো পাপীতাপীদেরই নানা ভোগান্তি।

ওসব বলবেন না ঠাকুরপো, মরার কথা ভাবেন কেন?

ও আপনিও ভাববেন না, আপনি চলে গেলে, আমার মনে হয়, গাঁয়ের লক্ষ্মীই চলে যাবে। আপনি নমস্যা।

আমাকে আর পাপের তলায় ফেলবেন না ঠাকুরপো, পায়ে পড়ি, সম্পর্কে বড় হলেও আমি বয়সে আপনার ছোট, মনে রাখবেন।

মহিম মলিন হেসে বলে, বয়সটাই হল, আর কিছু হল না। গৌরদা গিয়ে অবধি বড় কাহিল হয়ে পড়েছি। আপনি গেলে যে সব যাবে।

মহিম চোখের জল মোছে। এ তার মন-ভোলানো কথা নয়। মনে মনে সে এই মহীয়সী নারীকে এই গাঁয়ের লক্ষ্মী বলেই ভেবে এসেছে। গৌরহরিকে বলেছেও সে কথা। গৌরহরি শুধু হাসত। সেই হাসির মধ্যে একটা উজ্জ্বল তৃপ্তি ফুটে উঠত। যেন প্রাইজ জেতার আনন্দ।

টর্চের ব্যাটারিটা বড্ড কমজোরি হয়ে গেছে, বদলাতে হবে। নিবু নিবু আলোয় পথ ঠাহর করে ফিরছিল মহিম। মনটা ভার। বউঠানের অসুখ-টসুখ শোনেনি কখনও। বলতে গেলে এই প্রথম। কিন্তু শরীর কি সিগন্যাল দিচ্ছে? বউঠান চলে গেলে একটা যুগই শেষ হয়ে যাবে যেন।

কাঞ্জিলালের জমিটার কাছ বরাবর রাস্তায় একটা আড়াআড়ি খাঁজ। একটা নালার মতো। টর্চের আলোটা ভাল পড়েনি সেখানে। আনমনে পা বাড়িয়েও হঠাৎ কী যেন মনে হল মহিমের। কে যেন টেনে ধরল পিছন থেকে। টর্চের বাতি আরও ক্ষীণ হয়েছে। চোখের জোরও তো কমে গেছে অনেক। শূন্যে বাড়ানো পা টেনে নিল মহিম। তারপর দেখতে পেল।

বিশাল লম্বা চিত্রিত একটা শরীর খুব ধীরে ধীরে রাস্তাটা পেরিয়ে যাচ্ছে। টর্চটা ধরে রইল মহিম। সাপটা অনেকক্ষণ ধরে রাস্তাটা পার হল।

চিন্তিত মহিম আবার হাঁটতে লাগল। এই রাতের অন্ধকারে সাপটা যে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে কে জানে।

নিজেও সে জানে না। আলো আর অন্ধকার কোনওটাই তার প্রিয় নয়। সে শুধু এক অনির্দ্দিষ্ট নির্দেশেই চলে। কখনও থামে, চারদিকটা ঠাহর করার চেষ্টা করে। সে ভয় পায়। এই পৃথিবীতে তার বসবাস কখনওই নিরাপদ নয়।

অন্ধকার মাঠের মধ্যে সাপটা একটু থামল। শরীরে একটা চলবলে ভাব। খোলস ছেড়ে যাচ্ছে দেহ। একটা ইটের পাঁজার শ্যাওলা ধরা খাঁজে সে প্রবাহিত করে দেয় নিজেকে। ইটের খাঁজে খাঁজে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার অনুভূতি। তবু সে নিজেকে প্রবাহিত রাখে। খাঁজে খাঁজে আটকে যায় তার আলগা খোলস। শরীরে নির্মোক খসে যেতে থাকে। সিরসির করে তার নতুন ত্বক। ধীরে ধীরে দীর্ঘ একটা মোজার মতো নিজের খোলসটি ছেড়ে সে বেরিয়ে আসে।

না, তার কোনও স্থায়ী গৃহ নেই, ঠিকানা নেই, গৃহিণী বা সংসারও নেই। সে একা, সে অসুখী। সে প্রবহমান এক অনন্ত একাকিত্ব।

তার হৃদয় নেই, প্রেম নেই। তবু বীজ বপনের অস্থিরতা আছে। শরীরে সেই চঞ্চলতা টের পায় সে। বারংবার সে শ্বাসবায়ু ত্যাগ করে। ক্ষীণ চোখে, ত্বকে, তার অস্পষ্ট ঘ্রাণশক্তি দিয়ে সে নারীগন্ধ খোঁজে। তার বিবাহের সময় এল। শরীরে অনাগত সন্তানের কোলাহল। সে সংবরণ জানে না। তার নারীশরীর চাই।

সে তাই খোঁজে। সর্পিল শরীরে কত খানাখন্দ, কত গহ্বর কন্দরে সে তার পিছল কামার্ত শরীর প্রবাহিত করে দেয়।

যখন চড়া রোদে ধুধু করছে মাঠঘাট, সে একটা বিশুষ্ক নালা পার হয়ে নিবিড় এক ঘাসজমির ভিতরে অকস্মাৎ দেখা পেল তার। নির্ভুল নারীগন্ধ পেয়ে গেল সে।

পূর্বরাগ ছিল না, ভূমিকাও নয়, তারা উভয়েই উত্তোলিত ফণায় মুখোমুখি হল। চোখে চোখ। নর ও নারী। তার পর মুহূর্তেই তীব্র ছোবল এসে পড়ল তার শরীরে। সে এই মুদ্রা চেনে। পালটা ছোবলে সে তার মহিলাকে আক্রমণ করে। ভাষাহীন, ভালবাসাহীন তাদের এই আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের ভিতরেই লুকোনো ইচ্ছা বেরিয়ে আসে যেন। তোমাকে চাই। ছোবলে ছোবলে চুম্বন নেই, কিন্তু আসঙ্গ আছে। আর ওই আক্রমণের ভিতরেই পাক খেয়ে জড়িয়ে যায় দুটো বাহুহীন শরীর। কাছাকাছি দুটি মুখে কোনও রূপতৃষ্ণা নেই, পছন্দ অপছন্দ নেই, নেই প্রিয় ফিসফাস। শুধু প্রয়োজন, শুধু মোক্ষণ। রতিক্রিয়া কোনও উপভোগ্য কাজ নয় তার কাছে। এ যেন শরীরের এক বাধ্যতামূলক নির্দেশ মাত্র। সে তার বীজের ভূমি খুঁজে পেল আজ দ্বিপ্রহরে। মাত্র এটুকুই।

ওরে শঙ্খ লেগেছে! শঙ্খ লেগেছে। একটা নতুন কাপড় নিয়ে আয়। ফেলে দে এ দুটোর ওপরে।

জিজিবুড়ির চিৎকার শুনে দোতলায় চমকে উঠল বাসন্তী।

ও মুক্তা, দ্যাখ তো, মা চেঁচায় কেন।

মুক্তা পা ছড়িয়ে বসে একটা কাঁথায় ফোঁড় তুলছিল। নতুন মানুষ আসছে এ-সংসারে কত কাঁথাকানি লাগবে। ঠোঁট উলটে বলল, সারাদিনই তো চেঁচায়, বোধহয় ঘরে ভাম-টাম ঢুকেছে।

তবু দ্যাখ ভাই। ও ঘরে বিছে-টিছে আছে। কামড়াল কি না দ্যাখ।

সে বিছে এখনও জন্মায়নি। কামড়ালে নিজেই মরবে। আফিং-খাওয়া শরীর বাপু, ওকে কামড়ালে রক্ষে আছে?

তোর ওই দোষ। কেবল ফুট কাটিস।

দেখছি বাবা, দেখছি।

মুক্তা উঠে এসে দোতলার রেলিং দিয়ে ঝুঁকে বলল, হয়েছে কী? চেঁচাচ্ছ কেন?

কানে কি ময়দা গুঁজে আছিস তোরা? শুনতে পাস না? এমন যোগ আর পাবি? সাপের শঙ্খ লেগেছে এদিককার বাগানে। একটা নতুন কাপড় নিয়ে আয় শিগগির।

ও মা! বলে মুক্তা ঘরে এসে বলল, একটা নতুন কাপড় দাও তো! সাপের শঙ্খ লেগেছে বলছে।

ওই আলমারিতে আছে, নিয়ে যা।

মুক্তা কাপড় বের করে নিয়ে যাচ্ছিল, বাসন্তী বলল, বেশি কাছে যাসনি। কামড়ে-টামড়ে দেবে। এ সময়টায় ওদের বিরক্ত করতে নেই কিন্তু।

জানি বাবা, জানি। তুমি শুয়ে থাকো তো।

মুক্তা দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। বাসন্তী উঠল। শরীর ভাল নেই। তার চেয়েও খারাপ তার মন। সেদিন যে সিঁড়ি থেকে পড়ে যাচ্ছিল সেই থেকে ভয় খামচে ধরে আছে বুক। পেটেরটা নষ্ট হয়ে যাবে না তো!

বারান্দায় এসে রেলিঙে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছিল বাসন্তী। কিন্তু ওদিকে জিজিবুড়ির ঘর আর উত্তর দিকের দালানের ফাঁকটায় কলার ঝাড় হওয়ায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জিজিবুড়ি আর মুক্তাকেও না।

সবসময়ে আজকাল তার বড্ড ভয় হয়। সব ব্যাপারেই ভয়। বছর তিনেক আগে শঙ্খ লাগা দুটো সাপকে ঢিল দিয়ে মেরে ফেলেছিল মরণ। বড্ড দস্যি ছেলে। খুব রাগ করেছিল বাসন্তী।

মারলি কেন রে যমদূত? মা মনসার বাহনকে কি মারতে আছে?

বড় করে মনসাপুজো করিয়ে মা মনসার কাছে অনেক মাথা কুটেছিল বাসন্তী, অবোধ ছেলে মা, ভুল করে তোমার বাহনকে মেরেছে। ক্ষমা করে দাও মা।

কিন্তু ওই দুরন্ত ছেলে কি কথা শোনে? বাপ ছাড়া কাউকে ডরায় না। তার পরও কতবার সাপ মেরেছে তার হিসেব নেই। এর ওর তার মুখে খবর পায় বাসন্তী। ছেলের ওপর রাগ করে, তারপর কাঁদে, তারপর ঠাকুর-দেবতার পায়ে মাথা খোঁড়ে। ওই যে মরণ গাছে ওঠে, পাখি কি ফড়িং মারে এসবই বাসন্তীকে ভারী ভয় খাইয়ে দেয়। পাপ হচ্ছে ছেলেটার, অধর্ম হচ্ছে, ভগবান যদি শাস্তি দেয়।

এভাবে মাকে কাঁদিয়ে, ভাবিয়েই এখন একটু বড় হয়েছে মরণ। বোনের দাদা হয়েছে, এখন হাতপায়ের চঞ্চলতা একটু কমেছে, দস্যিপনায় একটু ভাঁটার লক্ষণ। তবু সর্বদা কাঁটা হয়ে আছে বাসন্তী। ছেলেপুলে মানেই তো দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, ভয়, উদ্বেগ। এই যে বড় হচ্ছে হাম্মি, কম উৎকণ্ঠা ওকে নিয়ে! কখন পড়ে, কখন ব্যথা পায়, কখন কাঁদতে গিয়ে টাগ ধরে দম আটকায়। তার ওপর আর একজন এসেছেন পেটে। এখনই পেটের মধ্যে তার খলবলানি টের পায় বাসন্তী। ইনিও জানান দিচ্ছেন, কম দুষ্টুটি হবেন না জন্মানোর পর। খলবলানি থেকেই টের পায় বাসন্তী।

সিঁড়ি থেকে যেদিন পড়ে গেল তার পর পুরো একটা দিন বাচ্চাটা পেটের মধ্যে নড়েনি মোটে। কী ভয়ই যে পেয়েছিল সে! রসিক গিয়ে অনল ডাক্তারকে ডেকে আনল পরদিন সন্ধেবেলা। ডাক্তার নল লাগিয়ে কী যেন দেখে-টেখে বলল, মনে হয় বাচ্চা ঠিকই আছে। তবু একবার গায়নোকোলজিস্ট দেখিয়ে নিন।

তা আর দেখাতে হয়নি। একদিন চুপ থাকার পর দুষ্টুটা আবার দ্বিগুণ তেজে হাত-পা নাড়ছে, পাশ ফিরছে মায়ের পেটের মধ্যে।

রসিক বলে রেখেছে এইবার তোমার পোলা হইব। তা তাই হবে বোধহয়। ছেলে হলে বাসন্তীর আরও দুশ্চিন্তা বাড়বে। মেয়েদের তবু হাতে পায়ে দামালপনা নেই, তেমন হার্মাদও হয় না তারা। কিন্তু ছেলে হলে, বাসন্তী জানে, সে হবে মরণেরই দোসর। এইসব আগাম ভেবে তার সর্বদা বুক দুরদুর করে।

বাগানের দিক থেকে শাড়ি হাতে উঠোনে ঢুকে মুক্তা চেঁচিয়ে বলল, ওরেব্বাস! কী বড় বড় দুটো সাপ গো বউদি!

কী সাপ রে?

মাথায় খড়ম, সাক্ষাৎ গোখরো। তোমার নতুন শাড়িতে খুব গড়াগড়ি খেয়েছে দুজন।

ঘরেদোরে আসবে না তো!

না। ওদিক পানে চলে গেছে।

মরণের বাবা আবার ওখানেই রোজ সকালে কাককে রুটি খাওয়াতে যায়। একটু সাবধান করে দিতে হবে।

পৃথিবীটা যে কেন এত ভয়ভীতিতে ভরা কে জানে বাবা। একটা দিনও বাসন্তী নির্ভাবনায় কাটাতে পারে না।

আর ওই যে সম্পর্কের একটা কাঁটা বিঁধে আছে বুকে তাই থেকে সর্বক্ষণ কিছু কিছু রক্তক্ষরণ হয়। কে জানে বড়বউয়েরও তাই হয় কি না। দুজনে কি দুজনের মরণ চায়? না, না, ছিঃ ছিঃ, সে আর ভাববে না ওরকম। বড়বউয়ের একশো বছর পরমায়ু হোক।

শঙ্খ লাগা কাপড়টা এনে তার হাতে দিয়ে মুক্তা বলল, রেখে দাও যত্ন করে। দেখবে ঘরদোরে মা লক্ষ্মী উপচে পড়ছে।

কাপড়টা ফিরিয়ে দিয়ে বাসন্তী বলল, যত্ন করে ভাঁজ কর, তারপর আলমারির ওপরের তাকে রেখে দিগে যা।

শনিবার রাতে এক মধুর রতিক্রিয়ার পর সে যখন তার বরের গলা জড়িয়ে নিবিড় হয়ে শুয়েছে তখনও তার মনে হচ্ছিল, এত মাখামাখি, এত কাছাকাছির পরও কেউ আপন না হয়ে পারে?

গাঢ় স্বরে সে বলল, তুমি কাছে থাকলে আমার মনটা বড় ভাল থাকে। একটুও ভয় করে না, তুমি চলে গেলেই কেমন যেন হয়ে যাই।

রসিক তার সবল হাতে নিজের মেয়েমানুষটিকে আগলে ধরে বলল, এত ডরাও ক্যান? দুনিয়াটারে ক্যাজুয়েলি লইতে পার না?

সেটা কী গো?

সবসময় ভাববা দুনিয়ায় কেডা কার। চক্ষু বুজলেই কে কোনখানে যামু গিয়া তার কি কিছু ঠিক আছে?

এ কথায় কেঁপে উঠে রসিককে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে বুকে মাথা ঘষে সে। না না, তারা কেউ কোথাও যাবে না। এক বিশাল অচেনা অন্ধকার মহাবিশ্বে তারা কেউ কখনও ছিটকে যাবে না পরস্পরের কাছ থেকে। মরলেও ফের এই বর, এই ছেলে মেয়ে এদের ঠিক ফিরে ফিরে পাবে সে। পাবেই। না পেলে যে পাগল হয়ে যাবে। অস্ফুট স্বরে আকুল হয়ে সে বলে, আর বোলো না, আর কক্ষনও বোলো না ওরকম...

ভাঙা চাঁদ যে সোনার গুঁড়ো নির্জন নিশুতি রাতে মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিচ্ছিল চরাচরে সেই হিরন্ময় আবছায়ায় এক প্রকাণ্ড মেঠো ইঁদুরকে সে পেয়ে গেল তার হাতে। সে জানে, শুধু সে-ই জানে কী প্রাণান্তকর খাদ্যের সঙ্গে তার এই নিজস্ব লড়াই। খুব ধীরে এক ক্লেশকর প্রক্রিয়ায় সে গিলতে থাকে ইঁদুরটাকে। শরীরের সবটুকু শক্তি ও প্রয়াস দিয়ে, বড় ক্লান্ত লাগে তার, বড় পরিশ্রান্ত।

এই নিশুত রাতে কত কীট ও পতঙ্গ জেগে আছে চারদিকে। কত চোখ জ্বলছে নিবছে। খাদ্য ও খাদকের এই নিষ্ঠুর জগতে ক্ষুধা নিদ্রাহীন। রাতচরা পাখিরা অন্ধকার ডানায় ভর করে চক্কর দিচ্ছে ওপরে। মাটির অন্দরে অন্দরে চলেছে ক্ষুদ্রকায় জীবদের অন্তহীন চলাফেরা, বিষয়কর্ম। জেগে আছে পিঁপড়ে, ডাঁশ, জোনাকি। মেঠো ইঁদুরটাকে গিলে সে তার দীঘল শরীরে নিশ্চুপ প্রলম্বিত হয়ে থাকে আলের পাশে। চারদিকে হিরন্ময় আবছায়ায় সে এই জাগ্রত জগৎকে টের পায়।

কখনও এরকম হয়, সারাদিন ধরে মনটা যেন একটু খারাপ হয়ে থাকে। কারণটা বোঝা যায় না, অনেক ভাবলে, ভাবতে ভাবতে হয়তো মনে পড়ে যায়, কারও একটা আলাদা কথা, একটা রূঢ় চাউনি, একটু শীতল ব্যবহার বা ওইরকম তুচ্ছ কিছু। তুচ্ছ, তবু সারাদিন জেদি মাছির মতো উড়ে উড়ে এসে মনের ওপর বসে থাকে, কিংবা শরীরের দুরূহ খাঁজে লুকিয়ে থাকা লাল পিঁপড়ের মতো কুটুস কুটুস করে কামড়ায়। পারুল বড় জ্বালাতন হল।

অথচ মন খারাপের যেটা সবচেয়ে বড় কারণ অর্থাৎ মায়ের অসুখ, সেটা তেমন গুরুতর নয় বলে জানা গেছে। গতকাল যখন জামশেদপুর থেকে নতুন টয়েটো গাড়িটায় আসছিল তখন কী টেনশন! জ্যোতিপ্রকাশ তাকে বলে দিয়েছিল, তুমি টেনশন নিয়ে যাচ্ছ, সাবধান, ড্রাইভ কোরো না কিন্তু। বরের কথাটা রাখেনি পারুল। দুপুরের দিকে ধাবায় নেমে লাঞ্চ করে আসার পর তার ড্রাইভারের বারবার ঢুলুনি এসে যাচ্ছিল বলে পারুল বলল, তুমি পাশের সিটে বসে একটু ঘুমিয়ে নাও, নইলে অ্যাকসিডেন্ট করবে। ততক্ষণ আমি চালাচ্ছি। ড্রাইভার অবশ্য বলেছিল জর্দাপান বা গুটকা খেলেই ঘুম উড়ে যাবে। পারুল রিস্ক নেয়নি।

অনেকটাই ড্রাইভ করেছে পারুল। এক মুহূর্ত সময় যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য। সন্ধেবেলা এসে পৌঁছে দেখল, বাড়ি ভর্তি লোকজন জড়ো হয়েছে। দাদারা, বউদিরা, ছেলেমেয়েরা, তবে মা ভাল আছে। শরীর দুর্বল, তবে সিরিয়াস কিছু নয়। তাকে দেখে বলাকা হেসে বলল, হ্যাঁ মা, তুই নাকি অনেক কাজ ফেলে এসেছিস।

হ্যাঁ মা, কিন্তু তোমার চেয়ে তো কাজ বড় নয়।

বিজু বকছিল আমাকে। বলল, জানো পারুলদি এখন কী রকম ভি আই পি হয়ে গেছে? কোটি কোটি টাকার ব্যবসা ওদের। হুট করে আসতে পারে নাকি?

পারুলরা যে সাংঘাতিক বড়লোক হয়ে গেছে এটা সকলের মুখেই ঘুরেফিরে শুনতে পাচ্ছিল পারুল। বিনয়ের সঙ্গে অস্বীকার করছিল বটে, কিন্তু কথাটা তো আর মিথ্যে নয়। তারা এখন সত্যিই বড়লোক। বড়লোক আর ব্যস্ত লোক। এই বড়লোক হওয়ার পিছনে তার অবদানও খুব কম নেই। সে এখন ব্যবসা বোঝে, কারখানা তিনটের অন্ধিসন্ধি জানে, বাজার অর্থনীতির সব খবর রাখে। খুব শিগগিরই জ্যোতিপ্রকাশ তাকে বিজনেস টুরে দিল্লি বোম্বে পাঠাবে। ফিনান্সিয়াল ইয়ারের পর তাদের ইউরোপেও যাওয়ার কথা। আপাতত তার দম ফেলার সত্যিই সময় নেই। তার ল্যাপটপ কম্পিউটারে জমা কত যে তথ্য। এই যে সে মায়ের কাছে এল, নিজেকে ছিঁড়ে আনতে হল কত দায়দায়িত্ব থেকে!

তবে এসে খারাপও লাগছে না তার। যেন একটা পারিবারিক গেট টুগেদার। অসুখ গুরুতর নয় বলে দিব্যি আড্ডাও হচ্ছিল তাদের।

রাত্রিবেলা যখন ল্যাপটপ নিয়ে বসে হিসেবপত্র করছিল তখনই হঠাৎ মন খারাপটা টের পেল। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছিল না কেন খারাপ। কী এমন হয়েছে এর মধ্যে? বারবার কাজের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সে। ভ্রূ কুঁচকে ভাবছিল। কেন, কেন মনটা খারাপ রয়েছে?

অনেকক্ষণ ভাববার পর হঠাৎ চাবুকের মতো মনে পড়ে গেল কথাটা। বড়বউদি আজ তাকে দেখেই বলেছিল, এঃ পারুল, তোমার বেশ ফ্যাট হয়েছে!

হ্যাঁ, ওই কথাটাই। ওটাই তার মন খারাপের কারণ।

আর কারণটা মিথ্যেও নয়। সে নিজেও টের পাচ্ছে, ছেলে হওয়ার পর থেকেই তার শরীরের বাঁধন কিছু আলগা হয়েছে। ব্যবসার কাজে বেশি সময় দিতে গিয়ে কমে গেছে রোজকার ব্যায়াম। খাওয়াও হচ্ছে কিছু উলটোপালটা।

কিছুদিন আগেই জামশেদপুরের একজন পরিচিত বিউটিশিয়ান মেয়ে তাকে বলেছিল, মিসেস গাঙ্গুলি, মুখের মাসাজ করান। আপনার প্রোফাইলের শার্পনেস কমে যাচ্ছে।

খুব দুশ্চিন্তার হয়তো কিছুই নয়। কিন্তু মন কি সব কিছু মেনে নিতে চায়? তিন বারের মাতৃত্ব তার খাজনা নিয়েছে, খাজনা নিচ্ছে বয়স, খাজনা দিতে হচ্ছে ব্যবসার জন্য। অত্যধিক মানসিক টেনশন এবং শরীরকে না খাটানোর জন্য।

কিন্তু সকলের ওপরে হল বয়স।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ল্যাপটপে মনোযোগ দিতে যাচ্ছিল সে। খেয়াল হল রাত একটা বাজে। ব্যস্ততার সময়ে শরীরের ক্লান্তিও টের পাওয়া যায় না। নইলে যা জার্নি করেছে তাতে এতক্ষণ ঘুমে ঢুলে পড়ার কথা।

তার স্থির করা ছিল, ছোট ছেলেটাকে নিজের হাতে মানুষ করবে। ওর সবকিছু নিজেই করবে সে। বড় দুটোকে সময় দেয়নি, ওরা আয়ার কাছে মানুষ বলে তেমন যেন আপনও হয়নি তার। সূক্ষ্ম দূরত্ব রয়ে গেছে যেন একটু। ভেবেছিল ছোটটার বেলায় পুষিয়ে দেবে। আদর করে ওর নাম রেখেছে জুড়ান। তাকে জুড়িয়ে দেবে। কিন্তু ঘটনা সেরকম ঘটল না। সারাদিন পরিশ্রমের পর আর পারে না সে।

দিনের বেলা অফিস, মিটিং, নতুন স্কুলের জন্য ছোটাছুটি, জুড়ান সেই আয়ার হেফাজতে। রাতে সারাদিনে ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসে, তখন ঘুম থেকে উঠে কাঁথা পালটানো বা দুধ খাওয়ানোর শক্তিও থাকে না তার। তাই জুড়ানও অন্য দুই ছেলেমেয়ের মতোই আয়াকে মায়ের চেয়ে বেশি চিনেছে।

সন্তানদের একশো পারসেন্ট মা হওয়া আর হল না তার। ছেলেমেয়েরা অতি সৎ ভব্য, কেতাদুরস্ত, মায়ের সঙ্গে তারা সবসময়েই সৌজন্যমূলক আচরণ করে। কোনও বেয়াদপি করে না কখনও, আর সেটাই তার বুক থেকে মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস টেনে বের করে।

একা বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ এইসব ভাবল পারুল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

এঃ পারুল, তোমার ফ্যাট হয়ে যাচ্ছে! কথাটা সারা রাত ঘুমের মধ্যেও ক্রিয়া করল পারুলের মনে। অভ্যাসবশে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই কথাটা মনে হল তার, একটু জগিং করা দরকার। তারপর কিছু স্ট্রেচ আর ফ্রি হ্যান্ড। জামশেদপুরে তার অনেক ব্যায়ামের যন্ত্রপতি পড়ে আছে। কতকাল ছোঁয়া হয়নি সেগুলো।

সে উঠে পড়ল। বাথরুম সেরে এসে সে ট্রাকসুট পরে নিল। পায়ে গলাল স্লিপার। ঠিক বটে, গাঁয়ের রাস্তায় ট্রাকসুট পরে দৌড়লে লোকে অবাক হবে। হোক গে। গেঁয়ো ভূতেদের জন্য নিজেকে গুটিয়ে রাখার মানে হয় না। সেই যে মেয়েদের কত বড় শত্রু তা সে খুব ভাল জানে। থপথপে, পেটমোটা, কিম্ভূতকিমাকার হওয়ার চেয়ে বরং মরা ভাল।

স্নিগ্ধ ভোরের আবছা আলোয় সে বেরিয়ে পড়ল।

নির্জন রাস্তায় সে তার পায়ের টুপটাপ শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল। না, এখন সে আর আগের মতো হালকাপলকা নেই। শরীরের অনেক ঢিলা অংশ দৌড়ের তালে লাফাচ্ছে, বিশেষ করে পেট, বুক, নিতম্ব। হাঁফ ধরছে, ঘাম হচ্ছে।

গাঁয়ে আর আগেকার মতো ফাঁকা ফাঁকা ভাবটা নেই। কত বাড়িঘর উঠে গেছে। ভরাট হয়েছে কত শূন্যতা, বসত বাড়ছে, লোক বাড়ছে, এখন গাঁয়ে স্পষ্টই শহরের আদল।

ছুটতে ছুটতে রাস্তা ছেড়ে পোড়ো একটা জমি আড়াআড়ি পার হচ্ছিল সে। একটা আল। আলের ওপর সরু রাস্তা ধরে ছুটছিল সে।

আচমকাই—তাকে চমকে দিয়ে আলের পাশ থেকে চাবুকের মতো মাথা তুলল লেলিহান একটা প্রকাণ্ড সাপ।

পারুল শিহরিত হয়ে থেমে গেল, ভয়ে চিৎকার করতে গিয়ে হাঁ করে সে টের পেল গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরোচ্ছে না। তার হাত পায়ে শীতল শিথিলতা, নড়তে পারছে না পারুল। মাত্র কয়েক ফুট দূরে পারুলের কোমর সমান উঁচু ফণা তুলে আছে সাপ। পুব আকাশের সিঁদুরে আভায় লকলক করছে, ঝলসাচ্ছে মৃত্যুদূত। শিকড়-বাকড়ের মতো তার কালো চেরা জিব বারবার চেটে নিচ্ছে শূন্যতা।

বিহ্বল, অবশ পারুলের চোখে চোখ রেখে তাকে সম্পূর্ণ সম্মোহিত করে ফেলেছে সাপ। পারুল টের পাচ্ছে, তার আর কিচ্ছুটি করার নেই। সে চোখ সরাতে পারছে না, তার পলক পড়ছে না, হাতে পায়ে সাড় নেই। সাপটা এখন এগিয়ে এসে যদি ছোবল দেয়, পারুলকে বিনা প্রতিরোধে ছোবলটা খেতেই হবে। এত অসহায় নিজেকে কখনও লাগেনি তার। বহু বছর আগে আর একটি সাপ তাকে খেয়েছিল বটে, সে ছিল মানুষ সাপ। তার বিষে জর্জরিত পারুলের মন থেকে বিশ্বাস, প্রেম, নির্ভরতা সব ঝুরঝুর করে সরে গিয়েছিল। আবাল্য প্রণয়ে বিষ ঢেলে দিয়েছিল অমল। সেই বিষে এক পারুল মরল, এক অমলও মরল।

আজ জীবনের আর এক লগ্ন। সামনে কালসাপ ফণা তুলে তার অমোঘ সম্মোহনে আচ্ছন্ন করে ফেলছে পারুলকে। পারুলের দু চোখে জল, তার মন অসংলগ্ন এক সংলাপ বলে যাচ্ছে, আমাকে কামড়াবে তুমি? কেন কামড়াবে বলো। দেখ, আমার মতো রূপ তুমি দেখেছ কখনও? এত রূপ নষ্ট করে দেবে? জানো আমার জীবন কত সুন্দর, কত সুখ আমার! সব নষ্ট করে দেবে? আমার কত কাজ পড়ে আছে, সব যে ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আমার ছেলেমেয়েরা আর মা বলে ডাকবে না! তুমি কি জানো, আমার জুড়ান এখনও মা বলে চেনেনি আমাকে! আমাকে ভিক্ষা দাও আয়ু। আমাকে মেরো না। মেরো না...।

আজ এই ভোরে আলের ওপর চিকণ শরীরে দাঁড়িয়ে সম্মোহিত পারুল টের পেল, তার অস্তিত্ব থেকে ঝরে যাচ্ছে রূপ, যৌবন, সুখ, তার চালচিত্রে ঐশ্বর্যের পেখম গুটিয়ে নেতিয়ে পড়ে গেল। সে কাঁদছে, বাচ্চা একটা অবোধ মেয়ের মতো কেঁদে যাচ্ছে সে।

বিস্ফোরক কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পর সাপটা একটা তাচ্ছিল্যের শ্বাস ফেলে টেলিস্কোপের মতো ফণা নামিয়ে নিল। তারপর পোড়ো জমিটার ভিতরে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল চোখের পলকে।

না, পারুল পালাল না, সে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে নতজানু হয়ে বসল আলের ওপর। সাপের কাছ থেকে ভিক্ষালব্ধ প্রাণ, তুচ্ছ আয়ু যেন কাঙালিনীর মতো কুড়িয়ে নিল সে। সে বুঝতে পারল, কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে তাকে দুমড়ে, মুচড়ে নিংড়ে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে সাপটা, সে ফিসফিস করে বলল, আই অ্যাম নো গডেস, আই ওয়াজ নেভার এ গডেস, ওঃ গড।

কতক্ষণ বসেছিল তার হিসেব নেই, চোখে রোদ পড়ল, মাঠঘাট পরিদৃশ্যমান হল, চারদিকে সমবেত জাগরণের নানা শব্দ, ধীরে সংবিত ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়াল পারুল। চোখ মুছল। তারপর ফিরে এল বাড়িতে।

না, কারও কাছেই সে সাপের গল্পটা বলল না, যতদিন বাঁচবে ততদিন কারও কাছেই কখনও বলবে না। এ তো কোনও গৌরবগাথা নয়। এ তার এক পরাভবের গল্প। আজ ভিখারিণীর মতো লাগছে নিজেকে। অন্য রকম, যেন সে নয়।

সাপটা ঘাসজমি পেরিয়ে গেল। একটা ন্যাড়া ঢাল বেয়ে উপরে উঠে এল সে। এইখানে ঝিরিঝিরি গাছের ছায়া। একটা শ্লথ অবয়ব। একজন মানুষ পাজামা পরা দুটো পা ছড়িয়ে বসে আছে। পায়ে চটি। নিথর। সাপটা একটু থমকাল।

একটি ছোট্ট নৌকো পাল তুলে পাড়ি দিচ্ছে অনন্ত আকাশে। ধীর, অতি ধীর তার গতি, নৌকোয় কয়েকজন মানুষ। একটি শিশু, একটি বালক, এক কিশোর, একজন যুবক এবং জনৈক বৃদ্ধ। নৌকোর গতি ধীর। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। মাঝে মাঝে ছুটে আসছে অনিকেত উল্কা। মহাজাগতিক ধুলো। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে দূরাগত মহাবিস্ফোরণ বা সংঘর্ষ বা ঘূর্ণনের শব্দ। নক্ষত্রমণ্ডলীর ক্ষীণ আলোর আভায় তারা পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছে। তারা চলেছে ধীরে। কিন্তু অনায়াসে পেরিয়ে যাচ্ছে গ্রহ, নক্ষত্র, অতিকায় তারা বা কৃষ্ণগহ্বর।

বুড়োর হাতে পেনসিল, হাঁটুর ওপর রাখা একটা খাতা। বুড়ো মন দিয়ে একটা অঙ্ক কষছে।

যুবকটি জিজ্ঞেস করে, আর কত দূর?

বুড়ো খরখরে গলায় বলে, আর বেশি দূর নয় বাবারা। এসে গেছি। তবে ঠিকানাটা বড্ড প্যাঁচালো, অনেকটা ধাঁধার মতো। এই অঙ্কটা মিলে গেলেই ঠিকানাটা বেরিয়ে আসবে।

কিশোরটি বলে, আমার যে খিদে পেয়েছে বুড়ো।

আর একটু চেপে থাকো বাবা, কাছেপিঠেই এসে গেছি। অঙ্কটা মিললেই হয়ে গেল।

পিছনের বাচ্চাটা বলে উঠল, তুমি যে বলেছিলে বাবার কাছে নিয়ে যাবে!

হ্যাঁ গো দাদুভাই, বাবাও এখানেই আছেন। এইসব ধাঁধাধন্ধ কেটে গেলেই বাপের কোল। একটু রোখো বাবাসকল, অঙ্কটা মিললেই হয়।

বালকটি বলে ওঠে, আর অঙ্ক না মিললে?

না মিলে কি উপায় আছে শালার? সহজে ছাড়ব ভেবেছ? সেই কবে থেকে কষে আসছি, কষতে কষতে বুড়ো হয়ে গেলুম, না মিললে চলবে কেন?

যুবকটি চড়া গলায় বলে, অনেকক্ষণ ধরে তুমি ধাপ্পা দিয়ে যাচ্ছ বুড়ো, তোমার সব ফক্কিকারি। তোমার চালাকি আমি বুঝে গেছি। নৌকো ঝাঁকিয়ে এবার তোমাকে ফেলে দেব।

বুড়ো ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে মাথা চুলকোয়। ছেলেগুলোর দিকে চোরা চোখে চায়, তারপর বলে, অঙ্কটার মধ্যে কিছু ফক্কিকারি ভয় আছে বটে, কিন্তু মিলে যাওয়ারই কথা।

বাচ্চাটা চেঁচিয়ে বলল, আমি বাড়ি যাব।

যাবে বইকী বাবা, যাবে বইকী। এখানে কাছেপিঠেই তোমাদের বাড়িঘর। শুধু অঙ্কটা মিলে গেলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাড়ির ঘাটে ভিড়ে যাবে নৌকো।

এসব তোমার চালাকি বুড়ো।

বুড়ো আর্তনাদ করে ওঠে, না না, মাইরি বলছি। আমি ঘাটের গন্ধ পাচ্ছি।

যুবকটি হিংস্র গলায় বলে, ছাই পাচ্ছ। তোমার সব মিথ্যে কথা।

বুড়ো ভারী জড়সড় হয়ে বলে, না গো, বাবাসকল, এই শেষের পথটুকুই যা গোলমেলে। আর দু-চার লাইনের মধ্যেই অঙ্কটা মিলে যাবে মনে হয়। মেরে এনেছি প্রায়। আর অঙ্ক মিললেই কেল্লা ফতে।

অঙ্ক-ফঙ্ক আমরা বুঝি না। আমরা বাড়ি যেতে চাই।

বুড়ো ভয়ে ভয়ে বলে, সে তো আমিও যেতে চাই বাবাসকল। একটু চেপে বসে থাকো, আর দেরি নেই।

কতকাল ধরে তুমি একই কথা বলে যাচ্ছ বুড়ো! আর নয়, এবার তোমাকে নৌকো থেকে ফেলেই দেব।

বুড়ো ফঁৎ করে নাকটা ঝেড়ে নিয়ে আতঙ্কিত গলায় বলে, তাহলে যে বড্ড পাপ হবে বাবা! আত্মহত্যা যে পাপ।

আত্মহত্যা?

নয়! আমাকে মারলে তুমি যে তোমাকেই মারবে।

তার মানে?

ভাল ঠাহর করে দেখ দিকি বাবা, আমার মুখখানা চেনা লাগছে না?

না তো!

ওই যে একটা বড় তারা আসছে কাছে, তার আলোয় ভাল করে দেখ। চেনা লাগে?

যুবকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তাই তো! তুমিই তো বুড়ো বয়সের আমি!

বুড়ো শতখান হয়ে হেসে বলে, তাই তো বলছি বাবা, এক নৌকোয় এই আমরা কজনা কি আলাদা? ওই আঁতুড় থেকে এই সেকেলে বয়স অবধি একটাই যে লোক। আলাদা আলাদা মনে হয় বটে, আসলে একটাই লোক যে, আবার একটা লোক হয়েও আলাদা আলাদা বটে।

তার মানে কী?

ওইটেই তো ধাঁধা। আর ওই ধাঁধার জন্যই তো শালার অঙ্কটা মিলে গিয়েও মিলতে চায় না। কেবলই ফ্যাকড়া বেরোয়। একটু চুপ করে বোসো বাবারা। আর একবার মাথা ঠান্ডা করে অঙ্কটা শুরু থেকে কষে দেখি। কোথায় যে শালা ভুল হচ্ছে।

সবাই চুপ করে বসে রইল। নৌকোটা দুলে দুলে চলতে লাগল। কত যুগ কেটে যেতে লাগল। কত আলোকবর্ষ পার হল তারা। তবু পৌঁছল না। শুধু কাগজের ওপর পেনসিলের শব্দ হয়ে যাচ্ছে খস্ খস্ খস্ খস্।

গাছের নিবিড় ছায়ায় বসে লিখতে লিখতে অমল একটা খড়মড় শব্দ পেল। খেয়াল করল না। কিন্তু আচমকা পায়ের ওপর ঠান্ডা একটা স্পর্শ পেয়ে ঘোর লাগা চোখে চাইল। প্রথমটায় বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা। কালো লম্বা ভারী কী একটা জিনিস তার পায়ের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে থেকে হঠাৎ বুঝতে পারল সে, ওটা সাপ। অমল নড়ল না। ভয়ও পেল না তেমন। খুব অন্যমনস্কভাবে যেন, দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির পায়ের ওপর দিয়ে সাপের বিচিত্র গমন অবলোকন করতে লাগল সে।

সাপটা তার পা পেরিয়ে ঘাসজঙ্গলে মিলিয়ে যাওয়ার পর যে একটু হাসল। তারপর আবার মগ্ন হয়ে লিখতে লাগল।

সাড়ে চারটেয় স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছিল মরণ। কিছু দূর পর্যন্ত বন্ধুরা থাকে। তারপর খানিকটা পথ সে একা। কাঞ্জিলালদের জমিটা কোনাকুনি পার হওয়ার সময়েই দেখা হয়ে গেল তাদের। মুখোমুখি।

বোধহয় নিজের নিয়তির নির্দেশ টের পেয়েই সাপটা মরণের পথ থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছিল। মরণ টক করে একটা ঢিল তুলে নিয়ে ওর মুখের কাছে আলতো হাতে ছুড়ে দিল। জানে, এবার ও ফণা তুলবে। ফণা তোলাটাই দেখতে মজা।

তীব্র শ্বাসের শব্দ তুলে পাকা গোখরোটা প্রশ্ন চিহ্নের মতো উঠে দাঁড়াল শূন্যে।

মরণের ডান হাতে আধলা ইট। একটু নাচিয়ে নিল সে। তার টিপ অব্যর্থ, কখনও ফসকায় না।

ঢিলটা তুলেও ছিল মরণ। কিন্তু আচমকাই তার মনে পড়ে গেল, শিবঠাকুরের গলায় মালা হয়ে দোলে সাপ। ঠাকুরের জটা জড়িয়ে থাকে। সাপ মারলে শিব ঠাকুর রাগ করবেন না? কয়েকদিন আগেই শঙ্কর মাস্টারমশাই ক্লাসে পড়ানোর সময় বলছিলেন, সাপ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে।

মরণের মনে পড়ল, আজকাল গাঁয়ে আর বেশি সাপ দেখা যায় না তো আগের মতো। মাঠঘাট জুড়ে কত বাড়িঘর হচ্ছে, সাপের থাকার জায়গাই নেই আর বিশেষ।

মরণ চিন্তিতভাবে আধলাটা দোলাল হাতে।

সাপটা যেন করুণ চোখে চেয়ে ছিল মরণের দিকে। যেন প্রাণভিক্ষা চায়।

মরণ হঠাৎ ঢিলটা ফেলে দিয়ে বলল, যাঃ চলে যা। মারব না।

কৃতজ্ঞ সাপটা তার প্রাণ ভিক্ষা পেয়ে মাথা নত করল। তারপর মিলিয়ে গেল তার নিচু অন্ধকার জগতে।

মহৎ একটা কাজ করার পর প্রসন্ন মনে বাড়ি ফিরতে লাগল মরণ।